সেরা ৫০টি গল্প

প্রফুল্ল রায়

www.worldmets.com
All Bengali ebooks in pdf get here

আরো বাংলা বইয়ের
জন্য নিচের
দেওয়া
লিঙ্কে
ক্লিক
করুন

www.worldmets.com

www.worldmets.com - Bangla ebook pdf-
Download all Bangla book in pdf

প্রফুল্ল রায়

সেরা ৫০টি গল্প

সেরা ৫০টি গল্প

সেরা ৫০টি গল্প

প্রফুল্ল রায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SERA PANCHASTI GALPA
A collection of Bengali short stories By PRAFULLA ROY
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone · 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com

ISBN : 978-81-295-0894-2

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচি

শিকড় ১৫
অনুপ্রবেশ ২৪
জন্মদাতা ৪১
বাজি ৫১
শেষযাত্রা ৬২
শেষ দৃশ্য ৮০
মানুষের মহিমা ৮৯
চেনা মানুষের অচেনা কাহিনি ৯৬
সুদীপ এবং একটি খারাপ মেয়ে ১০৬
অসাধারণ ১১২
দেশ নেই ১১৭
প্রদর্শনী ১৩৬
প্রার্থী ১৪৩
খাঁচা ১৪৯
পাড়ি ১৬২
মলির জন্য ১৭১
পাওয়া ১৮৭
রক্তকমল ১৯৩
তারা তিনজন ২০৩
ওরা দু'জন ২১৬
কার্তিকের ঝড়, বন্যা এবং চুনাও ২২০
এক রমণীর গল্প ২২৬
জুহু বিচের সেই মেয়েটা ২৩৬
নাগমতী ২৪২
চোর ২৬৫
শবরী ২৭৪
সিপি ২৮৭
জনক ২৯৯
ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী ৩০৮
দুর্বোধ্য ৩২৪
ফিরে এলাম ৩২৮
নরকের পোকা ৩৩৯
একটি সাধারণ মানুষের কাহিনি ৩৪৬
সীমান্ত ৩৬১
বাদশা বেগম ৩৬৮
জন্মদাত্রী ৩৮৬
বিরুদ্ধ পক্ষ ৪০১
বিদেশী ৪০৭
ডোনার জন্য ৪১৯
দু'পিঠ ৪২৮
বর্ষায় একদিন ৪৩০
মল্লিকা ৪৪১
শমিতার উপাখ্যান ৪৫৪
ট্রেন ৪৭৭
স্বাদ ৪৮৬
কোনো একদিন ৪৯৯
প্রেম ৫১৪
শহিদের স্ত্রী ৫১৭
ফেরিওয়ালা ৫৩০
বেলাশেষে ৫৪০

কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

সূর্যাস্তের আগে
আবার যুদ্ধ
জীবনধারা
রচনাসমগ্র (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
শিখর পেরিয়ে
দুই দিগন্ত
মানুষের মহিমা
অতল জলের দিকে
মন্দ মেয়ের উপাখ্যান
সম্পর্ক
এক নায়িকার উপাখ্যান
এই ভুবনের ভার
ইস্পাতের ফলা
আকাশের নীচে মানুষ
মানুষী
অদিতির উপাখ্যান
সাধ-আহ্লাদ
চরিত্র
যুদ্ধযাত্রা
দুই দিগন্ত
জন্মভূমি
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
আক্রমণ
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
দায়বদ্ধ
চতুর্দিক
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
স্বর্গের ছবি
একাকী অরণ্যে
সন্ধিক্ষণ
অগ্নিকোণ
বিন্দুমাত্র
শীর্ষবিন্দু
রাবণবধ পালা
আধ ডজন চোর
তিনমূর্তির কীর্তি
ভালোমানুষ চোর
আধ ডজন ভূত
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
হীরের টুকরো
সোনার টাকা
আমাকে দেখুন ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
আমাকে দেখুন ৪ পর্ব একত্রে
সুখের পাখি অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
আলোয় ফেরা
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১ম, ২য়
সিন্ধুপারের পাখি
নোনাজল মিঠে মাটি
শ্রেষ্ঠ গল্প
অনুপ্রবেশ
মোহর
ক্রান্তিকাল
ক্ষমতার উৎস
গল্প সমগ্র ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
মানবজীবন
ভাগাভাগি
পরী এসেছিল
নানা সুতোর নকশা
মানুষের অধিকার
যৎসামান্য
কিশোর সমগ্র ১ম, ২য়
স্বপ্ন দেখার দিন

গল্প প্রসঙ্গে

এর আগেও নানা পত্রপত্রিকায় লিখেছি বা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানিয়েছি, আমাদের আদি নিবাস অখণ্ড বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। এখন সেটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একটি অংশ।

দেশভাগের পর পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে শিকড় ছিঁড়ে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে সীমান্তের এপারে চলে আসি। নিঃস্ব, সর্বস্ব-খোয়ানো এই মানবগোষ্ঠীর আমি একজন। আমাদের গায়ে একটি মোলায়েম তকমা সেঁটে দেওয়া হয়—'শরণার্থী'। শুরু হয় টিকে থাকার জন্য দাঁতে-দাঁত চাপা যুদ্ধ। দিনের পর দিন। 'জীবন সংগ্রাম' শব্দটি তখন আমাদের হাড়ে-মজ্জায় ঢুকে গেছে। সেটা যে কী নিদারুণ লড়াই, প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি।

নিয়তি বলে কি কিছু আছে? হয়তো আছে, হয়তো নেই। অনেকেরই ধারণা মানুষের জীবন হল নিয়তির হাতের পুতুল নাচ। অদৃশ্য, প্রবল কোনও শক্তি সুতোর টানে মানুষকে হাঁটাবে, ছোটাবে, হাসাবে, কাঁদাবে, কখনও বা হাতের টোকায় মহাশূন্যে ছুড়ে দিয়ে লহমায় মাটিতে আছড়ে ফেলে চুরমার করে ফেলবে।

নিয়তি মানি বা না-মানি, এমন কিছু ঘটেছিল আমার জীবনে যা আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। দেশভাগের পর সেই দুঃস্বপ্নের মতো দিনগুলোতে 'কাল কী খাব', এই আতঙ্কে শ্বাস আটকে আসত। মাসের শেষে কিছু টাকা পাব, এমন একটা কাজের খোঁজে আকাশ পাতাল চষে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ এক প্রবীণ খ্যাতিমান সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। বয়সের অনেক তফাত, তবু খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও হল। আমার এখনকার বয়সে স্মৃতি ধূসর হয়ে আসছে। তবু মনে আছে, সেই লেখকের কোনও একটি লেখার কটু মন্তব্য করায় তিনি ভীষণ উত্তেজিত হন। বলেন, 'আমার লেখা তো খারাপ বললে, একটা ভালো গল্প টল্প লিখে দেখাও, বুঝি তোমার কেরামতি। ফর ফর করে কমেন্ট করে দিলেই হল!'

কেমন যেন জেদ চেপে গেল আমার মাথায়। তিন রাত জেগে তিনটি গল্প লিখে ফেললাম। তার একটি ছাপা হল তখনকার সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়। অন্য দু'টি 'পরিচয়' এবং 'নতুন সাহিত্য'-এ। সেটা উনিশ শো চুয়ান্ন সাল। 'নতুন সাহিত্য' ছিল পঞ্চাশের দশকের এক চমৎকার, রুচিশোভন মাসিকপত্র। সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন। বহু উৎকৃষ্ট গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ তাতে ছাপা হয়েছে। অনেকদিন হল তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। অকালমৃত এই পত্রিকাটির জন্য এখনও বেদনা বোধ করি।

জীবনের লম্বা দৌড় প্রায় শেষ করে এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে পৌঁছে বর্ষীয়ান লেখকটির সঙ্গে অকিঞ্চিৎকর তর্কাতর্কির কথা ভাবলে এখন হাসি পায়, প্রথম যৌবনের সেই জেদকে ছেলেমানুষি মনে হয়। তবে স্বীকার করতেই হবে, সেই লেখকটি উসকে না দিলে কোনও দিন লেখালিখির কথা ভাবতাম না। পরবর্তী সময়ে উদার স্নেহে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তিনি প্রয়াত হয়েছেন প্রায় তিরিশ বছর আগে। এই সুযোগে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

একটি চাকরির জন্য ধাবমান একরোখা ঘোড়ার মতো ছুটছিলাম। গল্প তিনটি বেরুবার পর সেই দৌড় থেমে গেল। আমার লক্ষ্য এবং গন্তব্য পুরোপুরি পালটে যায়। নিয়তিই খুব সম্ভব আমার ঘাড়ে চেপে একের পর এক গল্প লিখিয়ে নিতে লাগল। লিখছি, সেই সব গল্প ছাপা হচ্ছে মাসিকে, সাপ্তাহিকে, দৈনিক পত্রিকার রবিবারের পাতায়। বহু পাঠক এবং তখনকার কীর্তিমান কোনও কোনও সাহিত্যিকেরও ভালো লাগছে। তাঁরা অকুণ্ঠভাবে তা জানিয়েও দিচ্ছেন। সে যে কী বিপুল উন্মদনা! ঘোরের মধ্যে সময় কেটে যাচ্ছে।

শুরুর দিকে বেশ কয়েক বছর লেখক হিসেবে আমি ছিলাম হোল-টাইমার। পরে নানা কারণে আমাকে চাকরি নিতে হয় কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

স্বভাবের দিক থেকে আমি চরম বাউণ্ডুলে। বিশেষ করে যৌবনের শুরু থেকে শেষ অবধি। তখন আমার পায়ের তলায় সরষে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এপারে চলে আসার পর বিশাল ভারতবর্ষকে নিজের চোখে দেখার এবং তার হৃৎস্পন্দন অনুভব করার অদম্য এক ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসেছিল। মাথায় পোকা নড়ে উঠল তো ঝুলিতে জামাকাপড় পুরে ছুটলাম হাওড়া কি শিয়ালদায়। স্টেশনে পৌঁছুবার পর কয়েক পলক ভেবে নিলাম। যে-জায়গার নামটি পছন্দ হল সেখানকার টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে বসলাম। গোটা বছরে তখন তিন চার মাসের বেশি কলকাতায় থাকা হতো না।

আমাদের এই বিশাল দেশ, তার প্রাচীন স্থাপত্য, তার মন্দির মসজিদ গীর্জা গুরুদ্বার, সুরম্য ঐতিহাসিক মিনার, কত অজস্র স্মৃতিস্তম্ভ, রাজা বাদশা সন্তদের সমাধিস্থল এবং কালজয়ী পুরাকীর্তি, তার মহিমান্বিত বনস্পতি, লতা-ফুল-গুল্ম, তার বিস্তীর্ণ পাহাড়মালা, নদী-সমুদ্র- জলপ্রপাত এবং সবার ওপরে তার বিচিত্র সব মানুষ, অগণিত জনজাতি, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিস্ময়কর জীবনযাপন প্রণালী, তাদের দারিদ্র, মহত্ত্ব, সারল্য, নানাবিধ সংস্কার, অস্তিত্বের সংগ্রাম, ধর্মবোধ—সব একাকার হয়ে অদ্ভুত নেশার ঘোরে আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত। ভারতবর্ষের আনাচ কানাচ ঘুরে এই দেশকে দেখার সুযোগ যে কারণে ঘটেছিল আমার সেই ভবঘুরে স্বভাবের কাছে আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকব।

সেই সময় কত জায়গায় যে কাটিয়েছি তার লেখাজোখা নেই। কখনও আন্দামানে, কখনও নাগা হিলস মণিপুর আসাম এবং উত্তরপূর্ব ভারতের নানা

অঞ্চলে, কখনও বিহারের রুক্ষ প্রান্তরে, ওড়িষায়, কখনও কোঙ্কন উপকূলে, গোয়ায়, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, কখনও বিন্ধ্য পর্বতের ওধারে দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগুলিতে। যে ক'জন নিখিল ভারতীয় বাঙালি লেখকের নাম আঙুলে গুনে বলা যায়, আমি তাদেরই একজন।

নিসর্গ, পুরাকীর্তি, শত শত বছরের প্রাচীন সৌধ আমাকে মুগ্ধ করেছে ঠিকই। এ-সবের চেয়ে মানুষের অফুরান মহিমায় আপ্লুত হয়েছি অনেক বেশি। অসামান্য বিচিত্র অগণিত মানুষ।

লেখক জীবনের প্রথম দিকে বছরে যে অল্প ক'দিন কলকাতায় থাকা হতো, পত্রপত্রিকাতে সম্পাদকদের তাগাদায় পাঁচ সাতটা গল্প লিখে তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে ফের এই শহর থেকে উধাও হতাম। যে-সব পত্রিকায় এই গল্পগুলো ছাপা হতো, কলকাতায় না-থাকার কারণে তার কপি বেশির ভাগ সময়েই আমার হাতে আসেনি। ভুলো, চূড়ান্ত অগোছালো স্বভাবের জন্য কপিগুলো জোগাড় করে যে রাখব, প্রায়ই তা হয়ে উঠত না। তাছাড়া নিজের লেখা সম্বন্ধে চিরকালই আমার প্রচণ্ড উদাসীনতা। তার নীট ফল এই, আমার বহু গল্প হারিয়ে গেছে।

নাম-করা পত্রপত্রিকা ছাড়াও বহু অখ্যাত কাগজে অনেক গল্প লিখেছি। দু-চারটে সংখ্যা কোনও রকমে ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকার পর রোগাটে চেহারার স্বল্পায়ু এই সব পত্রিকার অকালমৃত্যু ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মে। এই পত্রিকাগুলোর কী নাম, কোথায় ছিল তাদের ঠিকানা, কারাই বা সেগুলোর সম্পাদক, এতকাল পব আর মনে করতে পারি না। এগুলির সঙ্গে আমার বেশ কিছু গল্প চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে। গল্পগুলো উইদের ভোজে লেগেছে না ঠোঙায় পরিণত হয়েছে, বলতে পারব না।

পরে প্রকাশকদের আগ্রহে গল্পগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে গিয়ে রীতিমতো মাথায় হাত। অগত্যা বিখ্যাত যে-সব পত্রপত্রিকায় লিখেছি এবং এখনও যেগুলো মাথা উঁচিয়ে সগৌরবে টিকে আছে তাদের দপ্তরে দপ্তরে হানা দিয়ে বেশ কিছু গল্প উদ্ধার করা গেল। ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং কলকাতায় বেসরকারি প্রাচীন কিছু গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া গেল আরও ক'টি গল্প। কয়েকজন অনুজপ্রতিম লেখক এবং আমার লেখার অনুরাগী দু-চারজন পাঠক আরও কিছু গল্প জোগাড় করে দিলেন। এইভাবে একশো'রও বেশি গল্প পাওয়া গেল। সেই সব গল্প চারটি পর্বে 'প্রফুল্ল রায়ের গল্প সমগ্র' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আরও কয়েকটি পর্ব বের করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আমার গল্পগুলি থেকে একটি 'শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং একটি 'স্বনির্বাচিত গল্প'-এর সংকলন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তার পরও আমি বেশ কিছু গল্প লিখেছি। 'স্বনির্বাচিত গল্প' মোট আটাশটি গল্পের সংকলন। সেটি ফুরিয়ে গেছে।

এবছর 'দে'জ পাবলিশিং'-এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে'র পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার 'সেরা ৫০টি গল্প' প্রকাশিত হল। এই সংগ্রহে 'স্বনির্বাচিত গল্প'

থেকে কিছু গল্প রেখে বাকি অনেক গল্প যোগ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে অনেক নতুন নতুন গল্প যেগুলো গ্রন্থাকারে কখনও প্রকাশ করা হয়নি।

'সেরা ৫০টি গল্প' প্রকাশের পর 'স্বনির্বাচিত গল্প' গ্রন্থটি আর ছাপা হবে না।

'সেরা ৫০টি গল্প' সম্পর্কে দু-চার কথা খুব সম্ভব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তার আগে ছোট্ট একটু ভূমিকা করে নেওয়া যাক। সেটি গল্পগুলির লেখক প্রসঙ্গে।

নিজের সম্বন্ধে সাতকাহন ফাঁদতে আমায় খুবই সংকোচ। তবু সামান্য কিছু লিখতে হবে এই কারণে যে আমার জীবনের নানা বিচিত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দেশ এবং মানুষ সম্পর্কে ধ্যানধারণা এই সব গল্পে চারিয়ে আছে।

আগেই জানিয়েছি আমি নিখিল ভারতীয় বাঙালি লেখক। অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলায় পূর্বপুরুষদের গ্রাম ছেড়ে সর্বস্ব খুইয়ে একদিন খণ্ডিত বাংলার এই অংশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলাম। তারপর শুরু হয়েছে জীবনের লম্বা দৌড়।

চোখের পলক পড়তে না-পড়তেই চুয়াত্তর বছর পেরিয়ে পঁচাত্তরে পা রাখলাম। এই পঁচাত্তর বছরে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা পৃথিবী নামে এই গ্রহটিকে আমূল তোলপাড় করে দিয়েছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ এবং আমাদের এই বাংলাকে। এমন অজস্র বিধ্বংসী ঘটনার উল্লেখ হাজার বছরের ইতিহাসে বা পুরাকাহিনিতেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

আমার ছেলেবেলায় এদেশে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রাম দেখেছি। দেখেছি শত শত শহিদের আত্মত্যাগ। সমস্ত দেশের কারাগারগুলিতে এবং আন্দামানের সেলুলার জেলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধের শত সহস্র সেনানী। দেখেছি বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মহাসমর এদেশে হয়নি, দু-চারটে ছুটকো ছাটকা বোমা পড়েছে—এই পর্যন্ত। কিন্তু তার বিষ ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সকল স্তরে। মহাযুদ্ধের হাত ধরে এসেছে কালোবাজারি, মজুতদারি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কৃত্রিম অভাব তৈরি করার চেষ্টা। চোখের সামনে দেখেছি মুনাফালোভীদের চক্রান্তে সৃষ্ট পঞ্চাশের মহা মন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ অন্নহীন ক্ষুধার্ত মানুষ মাছির মতো অনাহারে অস্থিচর্মসার হয়ে মরে গেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল দাঙ্গা, গণহত্যা, ধর্ষণ, আগুন। কলকাতা নোয়াখালি বিহার লাহোর অমৃতসর জুড়ে শুধু হত্যা আর হত্যা। পৃথিবী বোধহয় এমন বিভীষিকা আগে আর দেখেনি। আরও কয়েক লক্ষ অসহায় নিরীহ মানুষের মৃত্যু হল। লুট হয়ে গেল হাজার হাজার তরুণী। তাদের বেশির ভাগকেই ধর্ষণ করে খুন করা হল; বাকিদের করা হল ধর্মান্তরিত। অবশেষে দেশভাগের চড়া দামে এল স্বাধীনতা। বাংলা পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশের প্রায় দেড় দু' কোটি মানুষ বহু পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ফেলে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে এপারে এল, এপার থেকে গেল ওপারে।

স্বাধীনতার পর একষট্টি বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু দেশভাগের জের কাটেনি। ওপার থেকে শরণার্থীদের আসার বিরাম নেই। সেই সঙ্গে দেশের নানা প্রান্তে সাম্প্রদায়িক সংঘাত লেগেই আছে। তার পাশাপাশি চলছে

সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের আতর্কিত হানা। চলছে নাশকতা। দেশের যে-কোনও প্রান্তে যে-কোনও মুহূর্তে ঘটছে বিস্ফোরণ। ভারতকে ছিন্নভিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা আইন। এ এক বিচিত্র ব্যবস্থা।

পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের অনেককেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আন্দামানে, দণ্ডকারণ্যে এবং ভারতের নানা প্রদেশেও। অনেকে নিজেরাই অন্নের সন্ধানে দূর দূর অঞ্চলে চলে গেছে। তিনটে প্রজন্ম পার হতে চলল। এই ভিন্ন প্রদেশবাসী উদ্বাস্তুদের বংশধরদের কেউ আর বাঙালি থাকছে না। বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি থেকে উৎখাত হয়ে, ছিন্নমূল এই জনগোষ্ঠীর কেউ ওড়িয়াভাষী, কেউ হিন্দিভাষী। নামেই তারা বাঙালি। স্বাধীনতা এসেছে ঠিকই কিন্তু এখনও অনেক উদ্বাস্তু মাথা তুলে আত্মনির্ভর, মর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয় নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনি।

এদেশে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি ভারতবাসী দারিদ্রসীমার নিচে। প্রতি একশো জনের মধ্যে হয়তো তিরিশ জনের অক্ষর পরিচয় হয়েছে। হাজার হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। বেশির ভাগ গ্রামেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। প্রাথমিক স্কুল নেই। শিক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ—সকল ক্ষেত্রেই শোচনীয় হাল।

এদেশের অনেক জায়গাই মধ্যযুগের অন্ধকারে ডুবে আছে। এখনও সতীদাহ চলছে অবাধে, চলছে বাল্যবিবাহ। কায়েম হয়ে আছে সহস্র বছরের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার। পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে হরিজনদের বস্তি, ধর্ষিত হচ্ছে গরিবের চেয়েও গরিব, অসহায় পরিবারের যুবতীরা।

একুশ শতকের প্রথম দশক পার হতে চলল। মধ্যযুগের বর্বরতার অবসান কবে ঘটবে, কে জানে।

জিনিসপত্রের দাম আগুন, কোটি কোটি মানুষ বেকার। হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন বেকারের। ভূমি সংস্কাব হয়েছে যৎসামান্য।

নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সশস্ত্র আন্দোলন, জঙ্গি হামলার আতঙ্ক, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—সব মিলিয়ে ভারতবর্ষ বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারা দেশ জুড়ে যে-কোনও মুহূর্তে মহা-বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

আদর্শবাদ, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে দেশের সীমানা পার করে দেওয়া হচ্ছে। রাজনীতি নামে একটা প্রবল পরাক্রান্ত অস্ত্র ক্রমশ চলে যাচ্ছে রোবোটের মতো যান্ত্রিক হৃদয়হীন মাসলম্যান বন্দুকবাজদের হাতে। বহু ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের জিম্মাদার হয়ে উঠছে মাফিয়ারা। কেউ সামনে থেকে, কেউ একটি শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে পুতুলনাচের সুতো টানছে।

দেশজোড়া নৈরাশ্য, নৈরাজ্য এবং গভীর তমসার মধ্যে মানুষকে আমি তার স্বমহিমায় আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি। এত ক্ষয় এবং ধ্বংসের মধ্যে যেখানে মনুষ্যত্বের এতটুকু স্ফুলিঙ্গ চোখে পড়ছে আমার লেখায় তা ধরতে

চেয়েছি। কেননা মানবিকতা এবং মূল্যবোধের বিকাশ ছাড়া কোনও দেশ বাঁচতে পারে না। এই দু'টি দিকে নজর দিলে ভারতবর্ষ অনিবার্য পতনের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

এই সংকলনে গৃহীত পঞ্চাশটি গল্পকে আমার সময়, আমার পঁচাত্তর বছরের অভিজ্ঞতা এবং আমার উপলব্ধির কিছুটা প্রতিফলন বলা যেতে পারে। টালমাটাল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পটভূমিতে বিভিন্ন স্তরের, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঠিক অবস্থানটি কোথায়, তাদের অস্তিত্বের নানা সংকট, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে বাইরের অভিঘাতে তারা কীভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে বা বিপর্যয়ের মধ্য থেকে কীভাবে ঘটছে তাদের উত্থান—বেশির ভাগ গল্প সেদিকে চোখ রেখে নির্বাচন করা হয়েছে।

গল্পগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অভিপ্রায় আমার নেই। পড়ার পর যদি পাঠক এগুলোর মধ্যে নিহিত আমার বক্তব্য বা অভীষ্ট ধরতে না পারেন, বুঝতে হবে আমার প্রয়াস ব্যর্থ। গল্পগুলি নিজেরাই তাদের সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবেব।

সংকলনের বেশ কয়েকটি গল্পের প্রথম প্রকাশের সাল-তারিখ জোগাড় করতে না-পারায় সঙ্গতি রাখার জন্য কোনও গল্পের পাশেই প্রথম প্রকাশকাল দেওয়া হল না।

উনিশ শো চুয়ান্নয় আমার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তার পর চুয়ান্ন বছর ধরে লিখেই চলেছি। এই সংকলনের গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ', 'আনন্দবাজর পত্রিকা', 'আজকাল', 'বিভাব', 'শিল্প ও সংস্কৃতি', 'বর্তমান', 'যুগান্তর', 'প্রসাদ', 'উল্টোরথ', 'মাতৃশক্তি', 'আমার সময়', 'বসুমতী', 'অমৃত', 'শনিবারের চিঠি', 'মুখপত্র', 'নবকল্লোল', 'পরিচয়', 'গল্পপত্র' ইত্যাদি পত্রিকার কোনও বিশেষ বা শারদীয় সংখ্যায়।

শিকড়

এক

জানালার পাশে একান্ত নিজস্ব ইজি চেয়ারটিতে আধশোয়া ভঙ্গিতে শরীর ছড়িয়ে দিয়ে চা খাচ্ছিলেন রাজমোহন। দশ বছর আগে রিটায়ার করেছেন। তারপর থেকে এভাবে চা খাওয়া তাঁর এক প্রিয় অভ্যাস।

দোতলার এই জানালা দিয়ে পুব এবং দক্ষিণের অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আশি ফিট চওড়া একটা রাস্তা সোজা পুব দিকে চলে গেছে, দক্ষিণে বড় একটা পার্ক। এই দু'টো দিক কোনোদিনই বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পার্ক সার্কাসের এই অঞ্চলটা এখনও বেশ নিরিবিলি আর খোলামেলা। চারিদিকে প্রচুর পাখি এবং গাছপালা। তবে কতদিন গাছ এবং পাখি-টাখি দেখা যাবে, জোর দিয়ে বলা যায় না। কেননা কলকাতার অন্য সব পাড়ার মতো কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোর নজর এখানেও এসে পড়েছে। যেভাবে কড়কড়ে নতুন নোটের বান্ডিলে অ্যাটাচি-কেস বোঝাই করে তারা হানা দিচ্ছে, যাদের জমি-জায়গা বা ছোটখাটো বাড়ি আছে তাদের মাথা ঘুরে যাওয়াই স্বাভাবিক। পুব আর উত্তর দিকটা বাদ দিয়ে পশ্চিম এবং দক্ষিণে এর মধ্যেই পুরনো বাড়ি ভেঙে হাই-রাইজ অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠতে শুরু করেছে। এভাবে চললে আর কতকাল? পাঁচ-সাত বছরে বাক্স টাইপের আমেরিকান আর্কিটেকচারে এ পাড়াও ছেয়ে যাবে।

একজন বড় প্রোমোটার বারকয়েক রাজমোহনের কাছেও ঘুরে গেছে। দশ কাঠা প্লটের মাঝখানে তাঁর এই দোতলা বাড়িটা ভেঙে তারা আট তলা হাইরাইজ তুলে একটা গোটা ফ্লোর তো দিতে চেয়েছেই, সেই সঙ্গে নগদ যা দিতে চেয়েছে সেটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখলে পরের পাঁচ জেনারেশনকে কিছু করতে হবে না, পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

রাজমোহন প্রথম দিনই 'না' বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটার অসীম ধৈর্য। তারপরও তিন চারবার এসে ধরনা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রূঢ়ভাবেই তাকে তাড়িয়ে দিতে হয়েছে। তিনি এখানে হাই-রাইজ তুলতে দেবেন না।

রাজমোহনের এই সিদ্ধান্ত মণীশকে খুশি করতে পারেনি। মণীশ তাঁর একমাত্র ছেলে। সে বোঝাতে চেয়েছিল, এত ছোট বাড়ি এবং চারপাশে এতটা ফাঁকা জায়গা ফেলে রাখার মানে হয় না। তা ছাড়া অতগুলো টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে গোঁয়ার্তুমি থাকতে পারে, দূরদর্শিতা নেই। ছেলের এসব কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি রাজমোহন। তবে তিনি জানেন, তাঁর মৃত্যুর পর খুব দেরি করবে না মণীশ, দু'মাস কাটতে না কাটতেই নিজে গিয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোকে ডেকে আনবে। গাছপালা পাখি নির্জনতা—এসব ব্যাপারে তার বাজে সেন্টিমেন্ট নেই।

দেশভাগের একমাসের মধ্যে তাঁদের ঢাকার বাড়ির সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করে এখানে চলে এসেছিলেন রাজমোহন। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ, মণীশের তিন।

মা বাবা এবং তাঁর স্ত্রী মণিমালা তখনও বেঁচে ছিলেন। সেই যে এসেছিলেন, তারপর একচল্লিশ বছর কেটে গেল।

ঢাকার বাড়ির সঙ্গে অবশ্য এ বাড়ির তুলনা হয় না। সেগুন বাগিচায় প্রায় এক বিঘে জায়গার মাঝখানে ছিল তাঁদের মাঝারি মাপের তেতলা। সামনের দিকে বিরাট বাগান, পেছনে পুকুর। ওখানেই রাজমোহনের জন্ম। জীবনের মূল শিকড়টা ঢাকার বাড়িতেই থেকে গেছে। কিন্তু একচল্লিশটা বছর তো কম সময় নয়। পার্ক সার্কাসের এই বাড়িতে আসার পর পরই বাবা মারা গেলেন, তার বছর চারেক বাদে মা। মণিমালাও গত বছর তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন। মণীশ এখন চুয়াল্লিশ বছরের প্রৌঢ়, বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির সে একজিকিউটিভ। পুত্রবধূ পরমা একটা কলেজে 'লিভ ভ্যাকান্সি'-তে পড়াচ্ছে। আপাতত টেম্পোরারি, তবে শীগ্‌গিরই পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে—রাজা আর বুনা। রাজার এখন আঠারো, সেন্ট জেভিয়ার্সে ইকনমিকস অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ইয়ার। বুনার বয়স ষোল, সে এবার স্কুল ফাইনাল দেবে।

রাজমোহন অনুভব করেন, একচল্লিশ বছরে তাঁর অস্তিত্বের দ্বিতীয় একটি শিকড় পার্ক সার্কাসের এই বাড়িতে ধীরে ধীরে চারিয়ে গেছে।

নভেম্বরের বিকেল দ্রুত জুড়িয়ে আসছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো।

চায়ে হালকা চুমুক দিতে দিতে অন্যমনস্কর মতো দূরে পার্কটার দিকে তাকিয়ে আছেন রাজমোহন। রোজ যা চোখে পড়ে, আজও ওখানে সেই একই ছবি। কিছু বয়স্ক মানুষ বেঞ্চে বসে আছে, কেউ কেউ সবুজ মাঠের চারপাশের বাঁধানো রাস্তায় অলস ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে। অজস্র বাচ্চা বল আর ব্যাট নিয়ে কম করে দশটা টেস্ট ম্যাচের আসর বসিয়ে দিয়েছে।

রাজমোহনের মস্তিষ্কে অন্য দিনের মতো আজও এলোমেলো নানা ভাবনা ছায়া ফেলে যাচ্ছে। ইদানীং কিছুদিন ধরেই ঢাকার বাড়িটার কথা মনে পড়ে। অ্যালবামে রাখা পুরনো ফোটোর মতো স্মৃতির অনেকটাই আবছা হয়ে গেছে, তবু বড় ইচ্ছা হয়, একবার ঢাকায় যান। গত জানুয়ারিতে তিনি সত্তর পেরিয়েছেন। এখনও যদি না যেতে পারেন, আর কখনও যাওয়া হবে না।

হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। নিশ্চয়ই রাজা কি বুনা তাদের কলেজ কিংবা স্কুল থেকে ফিরে এসেছে।

জানালার বাইরে চোখ রেখেও রাজমোহন টের পান, পরমা ওধারের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। একটু পরে ফিরে এসে সে এ-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। ডাকে, 'বাবা—'

মুখ ফিরিয়ে তাকান রাজমোহন।

পরমা বলে, 'ঢাকা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। নাম বললেন আবদুল করিম। তাঁর সঙ্গে একটি ছেলে আর একটি মেয়েও এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

ব্যাপারটা প্রায় টেলিপ্যাথির মতো। কিছুক্ষণ আগেই ঢাকার কথা ভাবছিলেন রাজমোহন। আর তখনই কিনা করিম সাহেবের খবর নিয়ে এল পরমা! পার্ক সার্কাসের এই বাড়িটা একচল্লিশ বছর আগে ছিল করিম সাহেবদেরই।

নিজের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করেন রাজমোহন। ব্যস্তভাবে ইজি চেয়ার থেকে উঠে পড়তে পড়তে বলেন, 'ওঁরা কোথায়?'

'নিচে ড্রইং রুমে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

'চল, চল—'

শ্বশুরের সঙ্গে আবার একতলায় নামতে নামতে পরমার হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'এঁর সঙ্গেই কি বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে কলকাতায় এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।' রাজমোহন বলেন, 'তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে দেখছি।'

পরমা উত্তর দেয় না, একটু হাসে শুধু।

ড্রইং রুমে করিম সাহেব বসে ছিলেন। তাঁর বয়স পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর। খাড়া নাক। প্রায় ছ ফিটের মতো হাইট, চুলদাড়ি সাদা ধবধবে। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্য বেশ ভালোই বলা যায়। শিরদাঁড়া অবশ্য খানিকটা নুয়ে পড়েছে, গায়ের চামড়া আগের মতো টান টান নেই। চুলের রং একেবারে পালটে গেছে। এটুকু ছাড়া শরীরের ফ্রেম প্রায় একচল্লিশ বছর আগের মতোই রয়েছে।

করিম সাহেবের ডান পাশে কুড়ি বাইশ বছরের এক ঝকঝকে তরুণী। বাঁয়ে পনেরো ষোল বছরের একটি কিশোর। দু'জনেরই পরনে জিনস। মেয়েটি জিনসের ওপর ঢোলা শার্ট পরেছে, ছেলেটি পরেছে স্পোর্টসম্যানদের মতো গেঞ্জি। দেখেই বোঝা যায়, দু'জনের পোশাকই বিদেশি—মেড ইন ইউ. এস. এ কিংবা কানাডা।

রাজমোহন ঘরে ঢুকতেই করিম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরেন। গাঢ় গলায় বলেন, 'ভালো আছেন তো?'

রাজমোহন বলেন, 'বয়েস কম হল না। একরকম চলে যাচ্ছে। আপনার কথা বলুন—'

রাজমোহনকে বুকের ভেতর থেকে মুক্ত করতে করতে করিম সাহেব বলেন, 'আমারও একই কথা। একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, বাঁ কাঁধে আর্থরাইটিস, দু' বছর আগে ছানি কাটিয়েছি। এরপরও যেটুকু ভালো থাক যায় তা-ই আছি। আই অ্যাম হ্যাপি।' বলে হাসতে থাকেন।

বোঝা যায়, আয়ুর শেষ প্রান্তে পৌঁছেও তাঁর কোনোরকম তিক্ততা বা হতাশা নেই। কৌতুকের সঙ্গে অম্লরস মিশিয়ে তিনি জীবনের ভালোমন্দকে নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন।

রাজমোহন হেসে হেসে বলেন, 'বসুন, বসুন—'

দু'জনে মুখোমুখি বসে পড়েন। তরুণী এবং কিশোরটিকে দেখিয়ে রাজমোহন বলেন, 'এরা নিশ্চয়ই নাতি-নাতনি?'

করিম সাহেব মাথা হেলিয়ে জানান, তহমিনা অর্থাৎ তরুণীটি তাঁর বড় ছেলের মেয়ে। কিশোরটি ছোট ছেলের ছেলে। তার নাম শামিম। তহমিনার মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ার চলছে। শামিম আসছে বার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে।

রাজমোহন বলেন, 'ওদের নিয়ে এসেছেন। খুব খুশি হয়েছি।' বলে পরমার সঙ্গে করিম সাহেবের আলাপ করিয়ে দেন।

পরমা নমস্কার করে বলে, 'আপনার কথা বাবার কাছে অনেক শুনেছি। আপনারা গল্প করুন। আমি চা নিয়ে আসছি।'

পরমা চলে যাবার পর করিম সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাজমোহনের সংসারের যাবতীয় খবর নেন এবং নিজের কথাও বলেন। তাঁর দুই ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের বড় অফিসার, ছোট ছেলে ডাক্তার। মেয়ে ইকনমিকসে এম. এ পাস করার পর বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে-জামাই টোরোন্টোতে রিসার্চ করছে। তাদের ছেলেপুলে হয়নি।

পরমা প্রচুর কেক, সন্দেশ, নোনতা খাবার এবং চা নিয়ে এল।

করিম সাহেব শুধু একটি সন্দেশ তুলে নেন। খেতে খেতে বলেন, 'মিষ্টি আমার কাছে টোটালি নিষিদ্ধ। তবু এই তালশাঁস সন্দেশটা খাব। অনেক দিন পর দেখলাম, লোভ সামলাতে পারছি না।' খেতে খেতে বলেন, 'আমাদের দেখে নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছেন।'

অল্প হেসে রাজমোহন বলেন, 'তা একটু হয়েছি। হঠাৎ এভাবে, মানে চিঠিটিঠি না দিয়ে—' বলতে বলতে থেমে যান।

রাজমোহনের মনোভাব বুঝতে পারছিলেন করিম সাহেব। বলেন, 'ভেবেছিলাম আপনাদের সারপ্রাইজ দেব। কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্টে প্লেনে ওঠার পর চিন্তা হল, এ-বাড়ি চিনতে পারব কি না। হয়ত ভেঙেটেঙে আরো বড় বাড়ি করেছেন, নইলে বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে গেছেন।' একটু থেমে বলেন, 'তারপর ভাবলাম, প্লেনে যখন উঠেই পড়েছি, একবার গিয়ে দেখাই যাক। আপনাদের সঙ্গে যদি দেখা না হয়, পুরনো বাড়ির জায়গায় যদি নতুন বাড়ি উঠে থাকে, আবার ঢাকায় ফিরে যাব।'

রাজমোহন চুপ করে থাকেন।

করিম সাহেব বলেন, 'ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বাড়িটা সেই রকমই আছে। জানেন রাজমোহন ভাই, বেশ কিছুদিন ধরেই বড় ইচ্ছা হচ্ছিল একবার এখানে আসি। এ-বাড়িতে আমাদের তিনটে জেনারেশন থেকে গেছে। আমার জন্ম এখানে, শাদিও এ-বাড়িতে, দুই ছেলের জন্মও হয়েছে। কত স্মৃতি!' আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে, 'জীবন তো শেষ হয়ে এল, কবে মাটির তলায় চলে যাব, ঠিক নেই। ভাবলাম, বাপ-দাদার ভিটে শেষ বারের মতো দেখে আসি। বুঝলেন কিনা, নাড়ির টান।'

করিম সাহেবের আবেগ রাজমোহনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছিল। আস্তে আস্তে তিনি মাথা নাড়েন।

করিম সাহেব আবার বলেন, 'তহমিনা আর শামিমকেও জোর করে নিয়ে এলাম। প্রতিটি মানুষের জানা দরকার, তার রুটটা কোথায়। দুনিয়ার কোথায় তার ওরিজিন, সেটা না জানলে কি চলে! পার্টিশান না হলে এখানেই ওরা জন্মাত, এখানেই থাকত।'

রাজমোহন বলেন, 'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনাদের মালপত্র কোথায়?'

'দুপুরে এসে পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলে উঠেছি। সুটকেস-টুটকেস ওখানেই রেখে এসেছি।'

ক্ষুব্ধ স্বরে রাজমোহন বলেন, 'এটা কীরকম হল! এ-বাড়ি যেমন আমাদের তেমনি আপনাদেরও। আমরা একচল্লিশ বছর আছি আর আপনারা জেনারেশনের পর জেনারেশন কাটিয়ে গেছেন। আমার নাতি-নাতনি স্কুল কলেজ থেকে ফিরে আসুক, তহমিনা আর শামিমের সঙ্গে গিয়ে হোটেল থেকে আপনাদের লাগেজ নিয়ে আসবে। যে ক'দিন কলকাতায় আছেন, আমাদের কাছেই থাকবেন।' পরমাকে বলেন, 'এঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দাও বউমা—'

পরমা বলে, 'দিচ্ছি বাবা।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যে রাজা এবং বুনা ফিরে আসে। বুনার গায়ে স্কুল ড্রেস, রাজার পরনে জিনস ও শার্ট। তাদের সঙ্গে করিম সাহেবদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়।

রাজারা করিম সাহেবকে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে। তহিমনাদের উদ্দেশে বলে, 'হাই—'

শামিম এবং তহমিনা এতক্ষণ চুপচাপ দুই বৃদ্ধের বকর বকর শুনে যাচ্ছিল। দেখে মনে হয়, ওদের নিজস্ব এলাকা থেকে টেনে হিঁচড়ে এমন একটা আবহাওয়ায় এনে ফেলা হয়েছে যেখানে একেবারেই আরাম বোধ করছে না। রাজাদের দেখে দু'জনের মুখচোখের চেহারা একেবারে বদলে যায়। হাত নেড়ে শামিমরা বলে, 'হাই—'

করিম সাহেব মজার গলায় বলেন, 'এখানেও হাই-টাই চলছে নাকি?'

রাজা হেসে হেসে বলে, 'চলবে না কেন? ওটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ ফর দ্য ইউথ।'

শামিম তহমিনা এবং বুনা সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়।

রাজমোহন বলেন, 'তোমাদের কিছুই বুঝি না বাপু।'

'জেনারেশন আর কমিউনিকেশন গ্যাপ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোকে আর বুনাকে একটা কাজ করতে হবে!'

'কী?'

'গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে তহমিনাদের নিয়ে ওদের হোটেলে যাবি। ওখানে ওদের মালপত্র রয়েছে। সেগুলো আনতে হবে।'

'ফাইন।'

'একটা কথা মনে রেখো।'

'বল।'

'যাবে আর আসবে। জোরে ড্রাইভ করবে না।'

রাজা রগড় করে বলে, 'দাদু, তোমাদের যা বয়েস তাতে এখন ব্যাক গিয়ারে চলছ। আমাদের একটু ফরোয়ার্ড মোশানে চলতে দাও।'

করিম সাহেব বলে ওঠেন, 'আমার নাতি-নাতনিরাও ঠিক এই কথাই বলে। এখনকার ছেলেমেয়েরা সব একরকম।'

রাজমোহন রাজাকে লক্ষ করে বলেন, 'তোমাকে যা বললাম তাই করবে।' তাঁর চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা।

রাজমোহনের দিকে এক পলক তাকিয়ে হেসে ফেলে রাজা, 'একেবারে চিফ অফ দা আর্মি স্টাফের হুকুম। ঠিক আছে বাবা, তাড়াতাড়িই ফিরে আসব, র‍্যাশ ড্রাইভ করব না। ডোন্ট ওরি—' পরমার দিকে ফিবে বলে, 'মা, ভীষণ খিদে পেয়েছে। এখানেই খেতে দাও—'

বুনা ওধার থেকে বলে, 'আমাকেও দিও মা। ওপর থেকে স্কুল ড্রেসটা চেঞ্জ করে আসি।' বলে ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে যায়। পাঁচ মিনিট পর দোতলা থেকে যখন নেমে আসে তার পরনেও জিনস আর শার্ট।

কোনো স্বয়ংক্রিয় নিয়মে একবার নিজের নাতি-নাতনি এবং পরক্ষণেই করিম সাহেবের নাতি-নাতনির দিকে তাকান রাজমোহন। নাঃ, এই জেনারেশনের পোশাক-টোশাকের দিক থেকে ঢাকা এবং কলকাতার মধ্যে কোনো তফাত নেই।

ঝড়ের বেগে খাওয়া সেরে তহমিনাদের নিয়ে চলে যায় রাজা।

কবিম সাহেব বলেন, 'মডার্ন জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা—সে ঢাকাতেই হোক কি কলকাতাতেই হোক—সব এক ছাঁচ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভাগ্যিস রাজা আর বুনাকে পাওয়া গেল, নইলে ঢাকায় ফিরে যাবার জন্যে শামিমরা আমাকে পাগল করে ফেলত।'

সস্নেহে হাসেন রাজমোহন। বলেন, 'চলুন, ওপরে যাওয়া যাক।'

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে অসীম ঔৎসুক্যে চারিদিকে তাকাতে থাকেন করিম সাহেব। সিঁড়ির পাশে যে লোহার গ্রিলের রেলিং, তার মাথায় কাঠের কারুকাজ-করা ঢাকনা। গভীর মমতায় তার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে করিম সাহেব বলেন, 'আমার নানার আব্বাজান ভারি শৌখিন মানুষ ছিলেন। রেলিংয়ে সিমেন্ট ঢালতে দেননি, চীনে ছুতোর ডেকে বার্মা টীক বসিয়েছিলেন। এ-বাড়ির যত দরজা জানালা সব বার্মা টীকের।'

দোতলায় নিজের ঘরে এনে করিম সাহেবকে পুরনো আমলের একটা চেয়ারে বসান রাজমোহন। পরমা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। নিজের ইজি চেয়ারটিতে বসতে বসতে পুত্রবধূকে তিনি বলেন, 'করিম সাহেবকে আমার ঘরেই ব্যবস্থা করে দিও। বাড়তি সিঙ্গল-বেড খাট আছে না?'

পরমা জানায়, 'আছে।'

'হারুকে দিয়ে ওটা এ-ঘরে এনে বিছানা করে দেবে।'

'আচ্ছা।'

রাজমোহন করিম সাহেবকে বলেন, 'আরেক কাপ চা হবে নাকি?'

করিম সাহেব বলেন, 'এখন আর খাব না। বেশি চা খেলে রাত্তিরে ঘুম হয় না।'

'তা হলে থাক।'

এদিকে সন্ধে নেমে গিয়েছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝি এই সময়টায় বিকেলের পর থেকেই মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করে। দূরের পার্ক এবং সামনের রাস্তাটা এর মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে। অবশ্য রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে, তবু বাইরে কোনো কিছুই তেমন স্পষ্ট নয়।

পরমা সুইচ টিপে ঘরের টিউব লাইট জ্বেলে দেয়। তারপর বলে, 'আমি এখন যাই। হারুকে বাজারে পাঠাতে হবে। কিছু দরকার হলে ডাকবেন।'

রাজমোহন বলেন, 'আচ্ছা—'

পরমা চলে যায়।

এবার কুণ্ঠিতভাবে করিম সাহেব বলেন, 'হঠাৎ এসে আপনাদের উদ্ব্যস্ত করে তুললাম। হোটেলে—'

রাজমোহন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'দয়া করে এই কথাটা আর মুখে আনবেন না।'

করিম সাহেব হেসে ফেলেন, 'আপনাকে নিয়ে পারা যায় না।'

খানিকক্ষণ দু'জনে পুরনো স্মৃতির মধ্যে ডুবে যান। দেশভাগের কথা, দাঙ্গার কথা, পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া, শরণার্থীদের কথা নতুন করে তাঁদের মনে পড়ে যায়। এরকম একটা দুঃসহ সময়ে কিভাবে বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে চিরকালের মতো তাঁরা এপার থেকে ওপারে এবং ওপার থেকে এপারে এসেছিলেন সেই সব ছবি তাঁদের সামনে অদৃশ্য কোনো টিভি স্ক্রিনে ফুটে উঠতে থাকে। ঘরের বাতাস ক্রমশ ঘন বিষাদে ভারী হয়ে যায়।

একসময় রাজমোহন বলেন, 'চলুন করিম সাহেব, আপনার বাড়িটা একবার ঘুরে দেখবেন। দু'বছর বাদে বাদে রং করা ছাড়া আমরা কিছুই বদলাইনি। খাট আলমারি টেবল চেয়ার, যেমন রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই রয়েছে।'

এই বাড়ি যখন এক্সচেঞ্জ করা হয়, কিছুই নিয়ে যাননি করিম সাহেব। আসবাবপত্র সবই ফেলে রেখে খালি হাত-পায়ে চলে গিয়েছিলেন। রাজমোহনরাও ঢাকার বাড়ি থেকে এক টুকরো কাঠও আনতে পারেননি।

করিম সাহেব বলেন, 'আজ থাক। কাল নাতি-নাতনি দু'টোকে নিয়ে সব দেখব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাজমোহন বলেন, 'একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।'

উৎসুক চোখে তাকান করিম সাহেব, জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'আমাদের ঢাকার বাড়িটা কি সেই রকমই আছে? শুনেছি ঢাকা নাকি একেবারে বদলে গেছে।'

22 Ou
P2 553
35132
24.9.10

'ঠিকই শুনেছেন। তবে আপনাদের বাড়িটা এখন পর্যন্ত আগের মতোই রেখেছি। তবে আর কতদিন পারব বুঝতে পারছি না।'

'কেন বলুন তো?'

'আপনাদের বাড়িতে প্রায় এক বিঘে জায়গা। কনস্ট্রাকশন কোম্পানির লোকেরা রোজ এসে জ্বালিয়ে মারছে। ওখানে মাল্টি-স্টোরিড বাড়ি করতে চায়। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি সবাইকে একটা করে বড় ফ্ল্যাট তো দেবেই, তা ছাড়া কয়েক লাখ টাকা নগদও দেবে। ছেলেরা রাজি হওয়ার জন্যে আমার ওপর প্রেসার দিচ্ছে।'

হুবহু এক ব্যাপার। এখানকার প্রোমোটাররা এবং মণীশ কিভাবে তাঁকে হাই-রাইজ বাড়ি করার জন্যে চাপ দিয়েছে, রাজমোহন জানিয়ে দেন। তারপর বিমর্ষ মুখে বলেন, 'দিনকাল পুরোপুরি বদলে গেছে। পূর্বপুরুষের স্মৃতির প্রতি একালের ছেলেমেয়েদের আর কোনো ফিলিংস নেই।'

একই রকম আক্ষেপ শোনা যায় করিম সাহেবের কথায়। সায় দিয়ে তিনি বলেন, 'যা বলেছেন রাজমোহন ভাই। ফর্টি সেভেনে যখন ঢাকায় যাই, আমার বড় ছেলের বয়স দশ, ছোটর ছয়। মেয়ের জন্ম তো ওখানেই। এতগুলো বছর যেখানে কাটল সেই বাড়ির ওপর ওদেরও এতটুকু মায়া নেই। আমি মারা গেলে এক মাসও কাটবে না, ছেলেরা ওই বাড়ি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেবে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রাজমোহন।

করিম সাহেব বলেন, 'একটা কথা বলছিলাম। ক'দিনের জন্যে সবাইকে নিয়ে একবার ঢাকায় আসুন। এরপর গেলে হয়তো বাপ-দাদার স্মৃতিচিহ্ন আর দেখতে পাবেন না।'

করিম সাহেবের একটা হাত নিজের করতলে তুলে নিয়ে রাজমোহন বলেন, 'কিছুদিন ধরে এই কথাটাই ভাবছিলাম। যাব, খুব শীগ্‌গিরই একবার ঢাকায় যাব। তার আগে আপনাকে চিঠি লিখে জানাব।'

দোতলায় রাজমোহনের ঘরে ছোট খাট আনিয়ে করিম সাহেবের জন্য বিছানা করে দিয়েছে পরমা। এই ঘরের সামনে দিয়ে প্যাসেজ চলে গেছে। ওটার শেষ মাথায় পাশাপাশি তিনটে ঘর। একটা ঘর রাজার, একটা বুনার, তৃতীয়টি মণীশ এবং পরমার। ঠিক হয়েছে বুনার ঘরে তহমিনা আর সে থাকবে। রাজাব ঘরে তার সঙ্গে থাকবে শামিম।

সাড়ে ন'টা বাজতে চলল। রাজমোহন এবং করিম সাহেব একনাগাড়ে কথাই বলে যাচ্ছেন।

সন্ধের আগে সেই যে রাজারা হোটেলে চলে গিয়েছিল, এখনও ফিরে আসেনি। হঠাৎ তাদের সম্বন্ধে সচেতন হলেন রাজমোহন। বলেন, 'এখান থেকে পার্ক স্ট্রিটে যেতে আসতে কুড়ি মিনিটও লাগে না। আরো না হয় আধ ঘন্টা বেশি দেওয়া গেল। গেছে সেই ছ'টায়। সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে কী করছে ওরা!'

করিম সাহেব হাসেন। বলেন, 'হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

আরো আধ ঘন্টা বাদে, দশটা পার করে রাজারা হই হই করতে করতে ফিরে আসে।

রাজমোহন বলেন, 'কী আশ্চর্য, তখন বলে দিলাম, যাবি আর আসবি। এতক্ষণ লাগল ফিরে আসতে!'

রাজা বলে, 'বা রে, শামিমরা এই প্রথম কলকাতায় এল। আমাদের সিটিটা ওদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম।'

'জোরে ড্রাইভ করিস নি তো?'

'তোমার মাথায় ওই ব্যাপারটা ফিক্সেশানের মতো আটকে আছে। তহমিনা আর শামিমকে জিগ্যেস কর। দশ কিলোমিটারের বেশি স্পিড তুলিনি। মাননীয় গ্র্যান্ড ফাদারের হুকুমটা মানতে হবে না?'

'ফাজলামো করতে হবে না। অনেক রাত হয়ে গেছে, হাতমুখ ধুয়ে সবাই খাবার ঘরে চলে এস।'

করিম সাহেবের হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ব্যস্তভাবে বলেন, 'মণীশ তো এখনও অফিস থেকে ফিরল না?'

রাজমোহন বলেন, 'অফিসের কাজে ও দিল্লি গেছে। সাতদিন পর ফিরবে।'

'তা হলে আর ওর সঙ্গে দেখা হল না।'

খাওয়া দাওয়ার পর করিম সাহেবকে নিয়ে নিজের ঘরে আসেন রাজমোহন।

নিচু টেবলে দু'টো কাচের গেলাস এবং জল রেখে যায় পরমা। আর রাজা তহমিনা শামিম আর বুনাকে নিয়ে তার ঘরে ঢোকে। বোঝা যাচ্ছে, বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা-টাড্ডা দিয়ে ওরা যে যার জায়গায় শুতে যাবে।

করিম সাহেব সস্নেহে বলেন, 'চারজনের বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি।'

রাজমোহন বলেন, 'বার্ডস অফ দা সেম ফেদার। ফেদার না ফ্লক কোনটা যেন?'

'দুই-ই।' করিম সাহেব মজার গলায় বলেন।

কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প করে দু'জনে পাশাপাশি খাটে শুয়ে পড়েন। রাজার ঘরে এই মুহূর্তে হালকা করে পপ মিউজিকের রেকর্ড চালিয়ে চারজনে হুল্লোড় চালাচ্ছে। ওদের কথা এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন রাজমোহনরা।

রাজা বলছে, 'থার্ড ওয়র্ল্ডের সিটিগুলোতে কোনো চার্ম নেই। আমার এক মামা ওয়েস্ট জার্মানিতে আছেন। বি. এ'টা পাস করতে পারলেই তাঁর কাছে চলে যাব।'

বুনা বলে, 'তুই আগে যা। পাঁচ বছর পর আমিও যাচ্ছি।'

তহমিনা জানায়, তার পিসিও কানাডায় তার এবং শামিমের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দু-এক বছরের মধ্যে তারাও টোরোন্টো চলে যাচ্ছে।

করিম সাহেব বলেন, 'শুনছেন?'

রাজমোহন বলেন, 'হুঁ—'

রাজাদের কথা শুনতে শুনতে একসময় দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েন।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর দেখা যায়, রাজারা চারজন বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

করিম সাহেব বলেন, 'এ কি, ফোর মাস্কেটিয়ার্স এই সকালবেলায় কোথায় যাচ্ছ?'

রাজা বলে, 'আমার আর বুনার বন্ধুদের সঙ্গে তহমিনা আর শামিমের আলাপ করিয়ে দেব। কাল রাত্তিরে আমরা প্রোগ্রাম করে ফেলেছি, হোল ক্যালকাটা আজ চষে ফেলব।'

'কিন্তু তোমার কলেজ, বুনার স্কুল নেই?'

'আজ থেকে আমাদের কলেজে চারদিন ছুটি। বুনাদেরও তাই।'

'তোমরা ফিরবে কখন?'

'সেই রাত্তিরে। আমরা বাইরে খেয়ে নেব।'

'কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম, তহমিনাকে আর শামিমকে আজ বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব।'

তহমিনা বলে, 'পরে দেখব দাদা—' বলে প্রায় ঝড় তুলে রাজাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

করিম সাহেবকে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ দেখায়। কিছুক্ষণ পর রাজমোহনের সঙ্গে তিনি বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। মনে পড়ে যায়, দোতলার দক্ষিণের ঘরটায় তাঁর আব্বা আর আম্মা থাকতেন। পাশের ঘরে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী। বিয়ের পর নতুন পত্নীকে নিয়ে প্রথম এ-ঘরেই এসেছিলেন। স্ত্রী আর নেই। ঢাকায় যাবার পর আর মোটে পনেরোটা বছর বেঁচে ছিলেন। একতলায় থাকতেন তাঁর এক বিধবা ফুপু আব নানা। তাঁরাও আজ আর কেউ নেই। সবারই এন্তেকাল হয়েছে।

মায়াবী আত্মার মতো ঘুরতে ঘুরতে করিম সাহেব নিচে নেমে সোজা পেছনের বাগানে চলে আসেন। একচল্লিশ বছর আগের প্রায় সবগুলো গাছ এখনও টিকে আছে। শিয়ালদার এক মেলা থেকে চারা কিনে এনে তিনি, তাঁর মা, স্ত্রী এবং আব্বাজান নানা রকমের আম, গোলাপজাম, বাতাবি লেবু, জামরুল আর কালোজামের গাছ লাগিয়েছিলেন। তাঁদের পরিবারের সবারই গাছের খুব শখ। জাতিস্মরের মতো তিনি প্রতিটি গাছ আলাদা আলাদা চিনতে পারলেন।

তাঁর পেছনে পেছনে যে রাজমোহন ঘুরছেন, সেদিকে খেয়াল নেই করিম সাহেবের। পূর্বপুরুষের এই বাড়ি, যেখানে তাঁর বিন্দুমাত্র স্বত্ব নেই, তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে দিন তিনেক কেটে গেল। এর মধ্যে একদিনও ভালো করে তহমিনাদের বাড়িটা দেখাতে পারলেন না করিম সাহেব। রোজই রাজাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায় ওরা, ফেরার কিছুমাত্র ঠিক থাকে না। যেটুকু সময় বাড়ি থাকে, সারাক্ষণ হুল্লোড়। রাজা আর বুনার বন্ধুরা ঝাঁকে ঝাঁকে সকালে কি দুপুরে কিংবা সন্ধেয় হানা দেয়। রাজমোহন এবং করিম সাহেব যখন একচল্লিশ বছর আগের স্মৃতির জগতে ফিরে যান, ওরা তখন কম্পিউটার, পপ-মিউজিক, ক্রিকেট, ওয়ার্ল্ড-কাপ, ওয়েস্ট জার্মানি, জাপান, কানাডা, আমেরিকা ইত্যাদি নিয়ে বহুদূরের চমকপ্রদ এক পৃথিবীর দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে। ওদের কোনো পিছুটান নেই।

পাঁচ দিন পর করিম সাহেবদের প্লেনে তুলে দেবার জন্য রাজমোহনরা সবাই দমদমে এলেন।

করিম সাহেব রাজমোহনের দু'হাত ধরে আন্তরিক গলায় বলেন, 'বেশি দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারেন একবার ঢাকার বাড়িটা দেখে যাবেন।'

রাজমোহন বলেন, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

'ক'টা দিন ভারি চমৎকার কাটল। কিন্তু একটা বড় আপশোশ থেকে গেল রাজমোহন ভাই।'

'কী?'

কিছুটা দূরে রাজা তহমিনা শামিম আর বুনা হেসে হেসে প্রচুর কথা বলছিল। নাতি-নাতনিকে দেখিয়ে করিম সাহেব বলেন, 'পূর্বপুরুষের বাড়িঘর ওরা ভালো করে দেখলই না। নিজের ওরিজিন সম্পর্কে ওদের কোনো টানই নেই। একেবারে রুটলেসের দল।'

করিম সাহেবের দুঃখটা বুঝতে পারছিলেন রাজমোহন। গাঢ় বিষাদ তাঁর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

অনুপ্রবেশ

এখনও ভালো করে ভোর হয়নি, রোদ উঠতে অনেক দেরি, এই সময় দলটা নর্থ বিহারের উঁচু হাইওয়ে থেকে নিঃশব্দে, পোকার মতো চুপিসারে কাচ্চী অর্থাৎ কাঁচা সড়কে নেমে আসে।

দুই পরিবারের নানা বয়সের মেয়েপুরুষ মিলিয়ে মোট আটটি মানুষ। এক পরিবারে ফরিদ এবং তার দাদী হাবিবা। অন্যটায় রাশেদারা। রাশেদা, তার আব্বা, আম্মা, দুই ছোট ভাই আর এক বয়স্ক রুগ্‌ণ ফুফু অর্থাৎ পিসি।

পুরুষদের পরনে লুঙ্গি বা পাজামা, শার্ট, তার ওপর চাদর কিংবা মোটা রোঁয়াওলা পুলওভার। মেয়েরা পরেছে ঢোলা সালোয়ার কামিজ আব চাদর। সবার মাথায় বা হাতে নানা লটবহর—টিনের ঢাউস বাক্স, বেতের টুকরি, বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়ের ব্যাগ, পোঁটলা-পুঁটলি ইত্যাদি।

এরা ছাড়া সকলের আগে আগে রয়েছে মধ্যবয়সী শওকত। সে ফরিদের দূর সম্পর্কের চাচা এবং আট জনের মনুষ্যবাহিনীটির গাইড।

ফাল্গুনের আধাআধি কেটে গেল। তবু বিহারের এই অঞ্চলে শীতের মেজাজ খানিকটা থেকেই গেছে। বিশেষ করে সন্ধেব পর থেকে রোদ ওঠার আগে পর্যন্ত সময়টায়।

কিছুক্ষণ আগে চাঁদ ডুবে গেছে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ জুড়ে রুপোর বুটির মতো অগুনতি তারা। একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তবে অন্ধকারের সঙ্গে সাদা কুয়াশা মিশে চারিদিক ঝাপসা হয়ে আছে। অদৃশ্য, টান টান স্রোতের মতো ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে হু হু করে। গায়ে লাগলে কাঁটা দেয়।

কাঁচা সড়কের দু'ধারে ঝোপঝাড়, উঁচু উঁচু ঝাঁকড়া পিপর গাছ। তারপর দু'পাশেই ফাঁকা মাঠ। দূরে বা কাছাকাছি গাঁ আছে কিনা বোঝা যায় না। যেদিকে যতদূর চোখ যায় সব অসাড়, নিঝুম। ঘুমের আরকে সমস্ত চরাচর ডুবে আছে।

চারপাশে অন্ধকারে আলোর ছুঁচের মতো ফোঁড় দিয়ে দিয়ে হাজার জোনাকি উড়ছে। পিপর গাছের ফোকর থেকে মাঝে মাঝে কামার পাখিদের কর্কশ চিৎকার ভোররাতের অগাধ শান্তিকে চুরমার করে দিচ্ছে। এ ছাড়া এই স্তব্ধতার মধ্যে একটানা সাঁই সাঁই একটা শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছে। সেটা হল রাশেদার ফুফু আনোয়ারার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা হাঁপানির টানের আওয়াজ। বোঝা যায়, তার চিরস্থায়ী শ্বাসকষ্টটা মারাত্মক বেড়ে গেছে।

চাপা, ক্ষীণ গলায় টেনে টেনে আনোয়ারা জিজ্ঞেস করে, 'আউর কিতনি দূর শওকতভাই?' কথা শেষ করে জোরে জোরে হাঁপাতে থাকে সে। এখানে, এই আকাশের নিচে এত বিশুদ্ধ বাতাস, তবু তার অকেজো ফুসফুসকে চাঙ্গা করে তোলার পক্ষে যেন পর্যাপ্ত নয়।

শওকত চলার গতি কমায় না। চলতে চলতেই দ্রুত পেছন ফিরে একবার তাকায় শুধু। বলে, 'এই নজদিগ। জোরে পা চালিয়ে এস।'

'আর যে পারছি না। বহোত কমজোর লাগছে। চোখের সামনে বিলকুল সব আন্ধেরা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জরুর মাটিতে পড়ে যাব।' আনোয়ারার গলার ভেতর থেকে কথাগুলো গোঙানির মতো বেরিয়ে আসতে থাকে।

'উপায় নেই বহেন। সূরয ওঠার আগে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। এখনও লগভগ তিন মিল (মাইল) রাস্তা।' বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয় শওকত, 'দুনিয়ার কারো নজরে পড়ার আগেই এই সড়ক পেরিয়ে যেতে হবে। কেউ দেখে ফেললে বহোত মুসিবত।'

এরপর আনোয়ারার আর কিছু বলার থাকে না। তার মাথা টলছিল। তবু তারই মধ্যে প্রাণপণে, দুর্বল জীর্ণ শরীরের শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি পা চালাতে থাকে।

আনোয়ারার ঠিক পেছনেই ছিল ফরিদ। তার মাথায় প্রকাণ্ড টিনের ট্রাঙ্ক, ডান হাত দিয়ে সেটা ধরে রেখেছে। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা বড় চটের ব্যাগ। সে আনোয়ারাকে লক্ষ করছিল। টলতে টলতে আনোয়ারা যখন প্রায় হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে, সেই সময় বাঁ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে ফরিদ। বলে, 'আমাকে ধরে ধরে চলুন ফুফু।'

আনোয়ারা বলে, 'তোমার মাথায় এত ভারী সামান। আমি হাত ধরলে সামলাতে পারবে না।'

'পারব।'

ফরিদের বাঁ হাত এবং কাঁধের ওপর শরীরের খানিকটা ভার রেখে হাঁটতে থাকে আনোয়ারা। বলে, 'বেটা ফরিদ, আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

ফরিদ বলে, 'কী?'

'শেষ পর্যন্ত আর পৌঁছুতে পারব না। তার আগেই এই সড়কের ধারে আমাকে তোমাদের গোর দিতে হবে।'

'এসব বলতে নেই। আমরা সবাই জিন্দা পৌঁছুব। হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলুন।'

আনোয়ারা আর কিছু বলে না। তার ফুসফুসের ভেতর থেকে সাঁই সাঁই আওয়াজটা বেরুতেই থাকে।

মালপত্র এবং একটি মানুষের ভার নিয়ে চলতে চলতে ফরিদের মনে হয়, পরিচিত দুনিয়ার বাইরে কোনও তুখোড় বাজিকরের ম্যাজিকে তারা বহুদূরের অচেনা, ঘুমন্ত এক গ্রহে এসে পড়েছে।

তিনদিন আগে টাউটেরা মাথাপিছু দু'শো টাকা আদায় করে তাদের আট জনকে পশ্চিম বাংলার বর্ডার পার করিয়ে দেয়। এপারেও সেই একই ব্যবস্থা। প্রতিটি মানুষের জন্য দু'শো টাকাই গুনে দিতে হয়, এক পয়সা কমবেশি না।

বর্ডার থেকে সোজা কলকাতায়। সেখান থেকে ট্রেনে কাটিহার। কাটিহার থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের অন্য একটা ট্রেনে সন্ধেবেলা ফরিদরা কামতাপুরে এসে নেমেছিল। সেখানে অপেক্ষা করছিল শওকত। সে-ই তাদের খানিকটা রাস্তা বয়েল গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসে। তারপর মাঝরাত থেকে শুরু হয়েছে অনবরত হাঁটা। শওকতের কথা যদি ঠিক হয়, আরও মাইল তিনেক তাদের হাঁটতে হবে।

ফরিদের বয়স তেইশ। তার জন্ম সাবেক ইস্ট পাকিস্তানে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ছ'বছর আগে।

সে শুনেছে, সাতচল্লিশে ইণ্ডিয়া দু' ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা মুদাস্‌সর আলি বিবি এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে বিহার থেকে ঢাকায় চলে যায়। ছেচল্লিশে বিহারে যে মারাত্মক দাঙ্গা হয়েছিল, সেই সময় তাদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফরিদদের কেউ মারা না গেলেও, চেনাজানা অনেকেই খুন হয়েছিল। তখন চারিদিকে শুধু হত্যা, আগুন,

রক্তস্রোত, লাশের পাহাড়, অবিশ্বাস, ঘৃণা আর উন্মত্ততা। এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় আতঙ্কে মুদাস্সরদের শ্বাস আটকে আসছিল। একটা মুহূর্তও আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। পুরুষানুক্রমে দু'শো বছর ধরে যেটা তাদের স্বদেশ, তা ফেলে এক শীতের রাতে তারা পালিয়ে যায়। পেছনে পড়ে থাকে জমিজমা এবং পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

ঢাকায় গিয়ে বেশিদিন বাঁচেনি মুদাস্সর আলি। এক বছরের ভেতরেই তার এন্তেকাল হল। তখন তার একমাত্র ছেলে রহমত পূর্ণ যুবক। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। প্রথম দিকে এটা সেটা করে নানারকম উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কেটেছে। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য জিনের মতো খেটে গেছে সে। হাতে কিছু টাকা জমলে এবং আরও কিছু 'করজ' নিয়ে একটা রেডিমেড পোশাকের দোকান দেয়। দু-তিন বছরের মধ্যে ব্যবসা জমে ওঠে। এরপর একমাত্র বোন মালেকার বিয়ে দিয়ে নিজেও শাদি করে রহমত। সাদির সাত বছরের মাথায় ফরিদের জন্ম।

নানা দুর্যোগ এবং টালমাটালের পর জীবনটাকে রহমত যখন মোটামুটি গুছিয়ে এনেছে, সেই সময় পর পর দু'টি মৃত্যু তাকে অনেকটা টলিয়ে দিয়ে যায়। প্রথমে মারা যায় মালেকা, তারপর ফরিদের আম্মা আমিনা। এই শোকও একসময় থিতিয়ে আসে। তবে মন এতই ভেঙে গিয়েছিল যে ঘর-সংসার বা রোজগারের দিকে তেমন নজর ছিল না। নেহাত যেটুকু না করলে নয়, সেটুকুই করে গেছে। বাড়িতে ফরিদকে আগলে রাখত তার দাদী হাবিবা।

এইভাবে কোনওরকমে চলে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। একই ধর্ম, তবু বাঙালি আর অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন চরম অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ, ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছিল দেশভাগের ঠিক আগে আগে সেই ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলোতে। তখন প্রতিপক্ষ ছিল অন্য ধর্মের মানুষ। পাকিস্তানের খুনি সাঁজোয়া বাহিনী ব্যারাক থেকে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান আর অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। গাঁয়েগঞ্জে এবং শহরে শহরে গড়ে উঠেছিল প্রবল প্রতিরোধ। তখন সারাদিনই চারিদিকে গুলির শব্দ, ট্যাঙ্কের কর্কশ আওয়াজ, বারুদের গন্ধ, লাশের পাহাড়, রক্তের নদী, ধর্ষণ, হত্যা, আগুন আর বিপন্ন বিধ্বস্ত মানুষের আর্ত চিৎকার।

রহমত আলি নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। রাজনৈতিক কূটকচাল তার মাথায় ঢুকত না। নিজের দোকান আর ভাঙাচোরা সংসারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অন্য কোনওদিকে তার নজর যেত না। কিন্তু চারপাশে যখন আগুন জ্বলছে, তার আঁচ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। একদিন তার দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হল, প্রচণ্ড মারও দেওয়া হয় তাকে, নেহাত আয়ুর জোরে সে বেঁচে যায়।

একদিন নিরাপত্তার কারণে হিন্দুস্থান থেকে ঢাকায় চলে এসেছিল সে। পূর্ব পাকিস্তানকেই গভীর আবেগে নতুন স্বদেশ ভেবে নিয়েছিল। মনে হয়েছিল, সব আতঙ্ক ভয় অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনা কেটে গেল। কিন্তু এবার তারা কোথায় যাবে?

একদিন মুক্তিযুদ্ধ থামে। জন্ম নেয় নতুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাতাস থেকে বারুদের গন্ধ, মাটি থেকে রক্তের দাগ মুছে যায়। কিন্তু উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে বিদ্বেষ সন্দেহ আর ঘৃণাটা থেকেই যায়।

তবু বেঁচে তো থাকতে হবে। রহমত জোড়াতাড়া দিয়ে আবার দোকান খোলে কিন্তু আগের মতো বেচাকেনা নেই। কামাই ভীষণ কমে যায়।

এদিকে স্থির হয়েছিল, পাকিস্তান উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানদের ঢাকা থেকে নিয়ে যাবে।

দু-চারজনকে নিয়েও যায় কিন্তু কয়েক লাখ মানুষ বাংলাদেশে পড়ে থাকে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে।

দিনের পর দিন কেটে যায়। বছরের পর বছর। পাকিস্তান থেকে রহমতদের নেবার জন্য প্লেন বা জাহাজ কোনওটাই আসে না।

এদিকে ফরিদ বড় হচ্ছিল। ক্রমশ স্কুল পেরিয়ে সে কলেজে যায়। কিন্তু বি. এ পরীক্ষায় বসার আগেই রহমত আলি দশ দিনের জ্বরে মারা গেল। এরপর পড়ার খরচ জোগাবে কে? ফরিদ কলেজ ছেড়ে দেয়। শুধু পয়সার অভাবের জন্য না, তীব্র হতাশায় তখন সে ভুগছে। কষ্ট করে বি. এ'র ডিগ্রিটা জোগাড় করতে পারলেও তার চাকরি হবে না। বাংলাদেশে তার ভবিষ্যৎ কী?

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখতে দেখতে সতেরো বছর কেটে যায়। ইণ্ডিয়ার পার্টিশনের সময় যে বিহারী মুসলমানেরা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই এখনও স্বপ্ন দেখে, লাহোর করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে যে কোনওদিন প্লেন এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে, তাদের বিশ্বাসে রীতিমতো চিড় ধরে গেছে। তারা আর করাচি লাহোরের প্লেনের ভরসা করে না। রাত্তিরে মীরপুরের উর্দুভাষীদের এলাকায় বসে গোপনে পরামর্শ করে, ইণ্ডিয়াতে, পূর্বপুরুষের ভিটেয় ফিরে গেলে কেমন হয়? তারা খবর পেয়েছে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাতচল্লিশে যে উর্দুভাষীরা করাচিতে চলে গিয়েছিল সেখানকার আদি বাসিন্দারা তাদের আদৌ পছন্দ করে না। উড়ে এসে জুড়ে বসা মোহাজিরদের সম্পর্কে তাদের প্রচণ্ড বিরূপতা। দাঙ্গা এবং খুন সেখানে লেগেই আছে। রুটির ভাগ কে আর অন্যকে দিতে চায়?

বেশ কিছুদিন পরামর্শের পর তারা মনস্থির করে ফেলে। সুদূর লাহোর বা করাচি থেকে বিহারের সেই গ্রামগুলি—যেখানে পুরুষ পরম্পরায় তাদের বাপ-দাদারা বাস করেছে—অনেক বেশি পরিচিত এবং কাছের। কিন্তু মুখের কথা খসালেই তো সেখানে যাওয়া যায় না। এক স্বাধীন দেশ থেকে আরেক স্বাধীন দেশে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আইন-কানুন যা-ই থাক, দুনিয়ায় টাউটেরাও থাকে। রাতের অন্ধকারে তারা মীরপুরে হানা দিতে শুরু করে। তারাই জানিয়ে দিয়েছিল প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠতে হবে। এমন একটা ফাঁকা জায়গার খোঁজ টাউটেরা দিয়েছিল যার আশেপাশে বসতি নেই। তা ছাড়া একসঙ্গে অনেকের যাওয়া বিপজ্জনক। লোকের চোখে পড়ে গেলে হইচই হবে। তাদের পরামর্শ হল, ছোট ছোট দলে আট-দশজন করে যাওয়া অনেক নিরাপদ। কিছুদিন পর যাওয়া বিলকুল বন্ধ। তারপর প্রতিক্রিয়া দেখে ফের অন্যদের যাবার ব্যবস্থা করা হবে।

ছক মাফিক প্রথম দলটা আসে পনেরো দিন আগে। তাদের সঙ্গে এসেছিল শওকত। সে চটপটে, চৌকশ, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তারপর থেকে প্রায় রোজই দু-তিনটে করে ফ্যামিলি আসছে। আজ এসেছে ফরিদরা।

রাশেদাদের আজ আসার কথা ছিল না। তার ফুফু আনোয়ারার খুবই শ্বাসকষ্ট চলছিল। ঠিক হয়েছিল, সে কিছুটা সুস্থ হলে পরের কোনও একটা দলের সঙ্গে ওরা আসবে। তবু যে আসতে হল, তার কারণ রাশেদা।

রাশেদার সঙ্গে ফরিদের শাদির কথাবার্তা এবং দেনমোহর অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। শাদিটা যে হয়নি তার কারণ ফরিদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবতে পারে না ফরিদ।

রাশেদা চায়নি তাদের ঢাকায় ফেলে আগেই ফরিদরা চলে যায়। কেঁদেকেটে এবং জেদ ধরে এমন এক কাণ্ড সে করে বসে যে শেষ পর্যন্ত তার আব্বা এবং আম্মাকেও বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

আগে থেকেই ঠিক করা আছে, কামতাপুর স্টেশনে রোজ অপেক্ষা করবে শওকত। সীমান্তের ওপার থেকে যারা আসবে তাদের জায়গামতো নিয়ে যাবে। আজও সে ফরিদদের নিয়ে চলেছে।

মুখ বুজে চুপচাপ সবাই হাঁটছিল। হঠাৎ রাশেদার আব্বা রমজান ডেকে ওঠে, 'শওকতভাই—'

মুখ না ফিরিয়েই সাড়া দেয় শওকত, 'হাঁ—'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানকার হালচাল কেমন?'

'এখনও গোলমাল হয়নি। তবে—'

'কী?'

'আমরা যে এসেছি, সেটা মনে হয় ওদিকের লোকেরা জেনে গেছে।'

খানিকটা পেছনে, মাথায় বাক্স আর কাঁধের ব্যাগ সামলে, আনোয়ারাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছিল ফরিদ। এখন শরীরের সব ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়েছে আনোয়ারা।

শওকতের কথাগুলো কানে আসতে চমকে ওঠে ফরিদ। রমজান জবাব দেবার আগেই সে বলে, 'শুনেছিলাম জায়গাটা ফাঁকা মাঠ, ওখানে লোকজন থাকে না।'

শওকত বলে, 'বিলকুল ঠিক।'

'তা হলে?'

ফরিদের প্রশ্নটার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না শওকতের। সে বলে, 'আরে বেটা, মানুষের আঁখ আর কানের মতো খতারনাক চীজ দুনিয়ায় আর একটাও পাবে না। জঙ্গলেই যাও কি দরিয়াতে গিয়েই লুকোও, কারও না কারও নজরে পড়ে যাবেই। একজন দেখে ফেললে দশ আদমির কানে উঠতে কতক্ষণ!' লম্বা লম্বা পায়ে রাস্তার দৈর্ঘ্য খানিকটা কমিয়ে দিয়ে আবার সে বলে, 'পরশু খালেদ চার 'মিল' দূরে বারহৌলির বাজারে আটা ডাল নিমক মরিচ কিনতে গিয়েছিল। সেখানে শুনে এসেছে, লোকেরা আমাদের ব্যাপারে বলাবলি করছিল। আমরা কোত্থেকে এসেছি, আচানক মাঠের দখল নিলাম কী করে—এই সব। বুঝতেই পারছ, জরুর কেউ না কেউ আমাদের দেখে গেছে।'

পুরো তিনটে দিন ভালো করে খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি। ট্রেনে, বাসে, সাইকেল রিকশায়, বয়েল গাড়িতে এবং পায়ে হেঁটে অনবরত তারা চলেছেই, চলেছেই। অসীম ক্লান্তিতে হাত-পা এবং কোমরের জোড় যেন আলগা হয়ে গেছে। ধুঁকে ধুঁকে এবড়োখেবড়ো কাঁচা সড়কে টক্কর খেতে খেতে কোনওরকমে শরীরটা খাড়া রেখে তারা হাঁটছিল। শওকতের কথাগুলো তাদের শিরদাঁড়ার ভেতর অনেকখানি আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেয়। সবার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন রমজান বলে, 'এখানে থাকতে পারব তো শওকত ভাই?'

শওকত গলায় জোর দিয়ে বলে, 'কোসিস তো করনা পড়েগা। ডরো মাত রমজান ভাই। একটা কিছু ব্যওস্থা জরুর হয়ে যাবে।'

বিশ ফুট পেছনে আসতে আসতে শওকতের দিকে সসম্ভ্রমে তাকায় ফরিদ। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই মানুষটাকে দেখে আসছে। সে শুনেছে, সাতচল্লিশে বিহারের দেহাত থেকে আরও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সে-ও ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। অতি সাধারণ গরিব

বিহারীরা গোড়ার দিকে যে ঢাকায় গুছিয়ে বসতে পেরেছিল সে জন্য শওকতের ভূমিকা কম নয়। সবার জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করতে একে ধরা, ওর কাছে আর্জি জানানো, তাকে সেলাম ঠোকা—কী না করেছে সে! আবার চল্লিশ বছর বাদে এই যে প্রায় রোজ ছোট ছোট দলে মানুষ বর্ডার পেরিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের দেশে চলেছে, তাতেও তার প্রবল উৎসাহ। কখনও ভেঙে পড়ে না শওকত, হতাশায় তার শিরদাঁড়া দুমড়ে যায় না, কোনও অবস্থাতেই হার মানতে শেখেনি। জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত আশাবাদী এই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে ফরিদ।

এদিকে রমজান আর কিছু বলে না। গভীর উৎকণ্ঠা তার ভেতরকার শেষ জীবনীশক্তিটুকুকে যেন চুরমার করে দিতে থাকে।

তারা চলেছে তো চলেছেই।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় অন্যমনস্ক হয়ে যায় ফরিদ। স্কুলে এবং কলেজে খানিকটা ইতিহাস পড়েছে সে। হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের কথা সে বলতে পারবে না। সেই সব সময়ে তাদের বংশের আদি পুরুষেরা কোথায় ছিল, কী-ই তখন তাদের পরিচয়, সে সম্পর্কে আদৌ কোনও ধারণা নেই ফরিদের। গত দু'শো বছরের কথাই সে শুধু বলতে পারে। কয়েক জেনারেশান ধরে তখন তারা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার প্রজা—ভারতীয় মুসলমান। দেশভাগের পর ঢাকায় গিয়ে তারা হয়ে যায় পাকিস্তানী। তারপর নিশ্চিতভাবে না হলেও বাংলাদেশে থাকার কারণে হয়ত বা বাংলাদেশী। আর এই মুহূর্তে ভোরের ঝাপসা আকাশের তলায় ইণ্ডিয়ার মাটির ওপর যখন পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে তখন তাদের কী আইডেনটিটি, সে জানে না।

ইতিহাসের সেই আদিযুগের দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীদের মতো তারা চলেছে একটি স্বদেশের জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেনটিটির সন্ধানে। আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা, কে বলবে!

সূর্য ওঠার ঠিক আগে আগে কাচ্চী অনেকটা তফাতে রেখে বিশাল এক পড়তি জমির মাঝখানে পৌঁছে যায় ফরিদরা।

এখানে বাঁশ টালি চট আর বাতিল পুরনো টিন দিয়ে তিরিশ চল্লিশটা ঘর তোলা হয়েছে। ঢাকা থেকে আগে যারা চলে এসেছিল, এই ঘরগুলো তাদের।

নির্জন নিঝুম মাঠের মাঝখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা এই ছন্নছাড়া উপনিবেশে এখনও কারো ঘুম ভাঙেনি।

শওকত বলে, 'পৌঁছ্‌চ গিয়া। তিন রোজ বহোত তখলিফ গেছে তোমাদের। এবার আরাম কর।'

ঘাড় এবং মাথা থেকে লটবহর নামিয়ে সবাই মাটিতে শরীর এলিয়ে বসে পড়ে। তাড়াতাড়ি ময়লা চাদর পেতে আনোয়ারাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। এতটা আসার ধকলে তার বুকে এখন একসঙ্গে দশটা হাপর ওঠানামা করছে।

ফরিদ একধারে বসে অসীম আগ্রহে চারিদিক লক্ষ করছিল। শওকত সঠিক খবরই দিয়েছে। এখান থেকে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, কোথাও মানুষজন বা দেহাতের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে একদিকের কাঁকুরে ভাঙা ততদূর ছড়ানো। আরেক দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে মজা বিল। শ্যাওলা আর লম্বা লম্বা ডাঁটিওলা জলজ ঘাসে সেটা বোঝাই। বিলের ধার ঘেঁষে প্রচুর ঝোপঝাড় আর বিরাট বিরাট সিমার এবং কড়াইয়া গাছ। গাছগুলোর মাথায় অগুনতি বক ডানা মুড়ে চুপচাপ বসে আছে।

এদিকে গলা তুলে শওকত ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, 'আরে ওসমান ভাইয়া, রুস্তম, নবাবজান, রহিমা চাচি—আর কত ঘুমোবে! ওঠ ওঠ, উঠে পড়। ওরা এসে গেছে।'

প্রথমে দু-একজন, তারপর একে একে শ'খানেক মানুষ ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে। ফরিদদের দেখে বলে, 'আ গিয়া তুমলোগ?'

রমজান নির্জীব স্বরে বলে, 'হাঁ। লেকেন বিলকুল মর গিয়া।'

ওসমান বলে, 'হাঁ, পয়দল অনেকটা রাস্তা আসতে হয়। পা আর কোমরের হাড্ডি বেঁকে যায়। পথে কোনও গোলমাল হয়েছে?'

'নেহী।'

'ইণ্ডিয়ার লোকজন সন্দেহ করেনি?'

'নেহী।'

'না করারই কথা। ইতনা বড়ে দেশ। কড়োর কড়োর (কোটি কোটি) আদমি। এখানে কে কার খবর রাখে!'

এরপর ঠিক হয়, আগে এসে যারা ঘর তুলেছে, তাদের কাছে ভাগাভাগি করে ফরিদরা দু-চারদিন থাকবে। তারপর বারহৌলির বাজার থেকে টালি বা পুরনো টিন কিনে এনে নিজেদের ঘর তুলে নেবে।

ফরিদ দূরমনস্কর মতো সবার কথা শুনছিল। আসলে বর্ডার পেরিয়ে এপারে আসতে আসতে নিজের মধ্যে তিনদিন আগে এক ধরনের উত্তেজনা টের পেয়েছিল সে। এখন, এই বিশাল মাঠের মাঝখানে এসে আচমকা সেটা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সে শুনেছে, এখান থেকে মনপখল গাঁ খুব দূরে নয়। মনপখল থেকেই চল্লিশ বছর আগে তার দাদা বিবি-ছেলেমেয়ে নিয়ে ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পূর্বপুরুষের সেই গ্রামটা দেখার জন্য প্রচণ্ড অস্থিরতা এই মুহূর্তে একগুঁয়ে জিনের মতো তার কাঁধে যেন চেপে বসে।

হঠাৎ ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'শওকতচাচা, মনপখল গাঁও কোথায়?'

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে ফরিদের দিকে তাকায় শওকত। বলে, 'এখান থেকে চার 'মিল' তফাতে বারহৌলি বাজার। সেখান থেকে আরও দু 'মিল' গেলে মনপখল। কেন জানতে চাইছ?'

'আমি আমাদের গাঁও দেখতে যাব।'

শওকত বলে, 'এখন না বেটা। আরও কিছুদিন দেখি, হালচাল ভালো করে বুঝি। গাঁও তো নজদিগ রইলই। সময় হলে যখন ইচ্ছা যেতে পারবে। আমারও তো ওই একই গাঁও, আমিও এখন পর্যন্ত যাইনি।'

এখানে যারা এসেছে তাদের সবাই মনপখল এবং তার চারপাশের গ্রামগুলো থেকে একদিন ঢাকায় চলে গিয়েছিল। তারাও শওকতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জানায়, এখন পর্যন্ত কেউ পিতৃভূমি দেখতে যায়নি। শুধু নিজেদের পুরনো গাঁওতেই না, অন্য কোনওদিকেও তারা পা বাড়ায়নি। ভয়ে ভয়ে, চাপা আতঙ্ক নিয়ে এই কাঁকুরে জমিতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তবে দু-একজন খুব সতর্ক ভঙ্গিতে বারহৌলি বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল।

এদের মনোভাব বুঝতে পারছিল ফরিদ। কেউ কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। চল্লিশ বছর আগে এটা তাদের দেশ ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তারা এ দেশের কেউ না। পিতৃভূমি বা জন্মভূমি দেখতে গিয়ে যদি বিপন্ন হতে হয়, তাই সেদিকে কেউ পা বাড়ায়নি।

ফরিদ আর কিছু বলে না।

শওকত এবার তাদের ব্যবস্থা করে দেয়। হাবিবা আর ফরিদ তাদের ঘর না তোলা পর্যন্ত থাকবে ওসমানদের সঙ্গে। রাশেদা আর আনোয়ারা থাকবে নবাবজানদের কাছে। রাশেদার দুই ভাই এবং আব্বা-আম্মার দায়িত্ব নেবে রুস্তম আর গহর শেখ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরগুলোর সামনে ফরিদরা শওকতকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। আজ আর ঢাকা থেকে কেউ আসবে না, তাই শওকতের কামতাপুরে যাওয়ার তাড়া নেই।

মাথার ওপর ঝকঝকে নীলাকাশ। সূর্য তার ঢালু গা বেয়ে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে। রোদে তাত থাকলেও গা পুড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রচুর উলটোপালটা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে। ফাল্গুনের রোদের সঙ্গে হাওয়া থাকায় মোটামুটি ভালোই লাগছে সবার।

ইণ্ডিয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ কী, এই নিয়ে কথা হচ্ছিল।

ফরিদ বলে, 'শওকতচাচা, কতদিন আমরা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারব? তুমি আসতে আসতে বলেছিলে, আমাদের খবর অনেকে জেনে গেছে। তারাই আমাদের টেনে বার করবে। কে জানে ভাগিয়ে দেবে কিনা। তা ছাড়া আরও একটা কথা ভাবার আছে।'

শওকত জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'ঢাকা থেকে আমরা কে আর ক'টা পয়সা আনতে পেরেছি! কামাই না করলে না খেয়ে মরতে হবে। সে জন্যেও এখান থেকে বেরুনোটা জরুরি।'

ফরিদের কথাগুলো অনেককে নাড়া দিয়ে যায়। তারা সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক ঠিক।'

শওকত গভীর আগ্রহে ফরিদের কথা শুনছিল এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। সে আস্তে আস্তে বলে, 'বেটা তুমি যা বললে, সব আমার মাথায় আছে। লেকেন সবুর। আমি এখানকার একটা লোকের খোঁজ পেয়েছি। মনে হচ্ছে, তাকে দিয়ে আমাদের অনেক মুশকিল আসান হবে। দো-চার রোজের ভেতর তার সঙ্গে দেখা করব।'

অন্য সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কে?'

শওকত জানায়, তার নাম এখন বলা যাবে না। সে পলিটিক্যাল পার্টির জবরদস্ত লিডার। তার নামে এ-অঞ্চলে বাঘ আর বকরি একঘাটে জল খায়। সে-ই একমাত্র তাদের বাঁচাতে পারে। তবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব সহজ ব্যাপার না।

ফরিদ এবং আরও অনেকে শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করে, 'এর খবর তোমাকে কে দিল?'

শওকত বলে, 'বর্ডারের এপারে ওপারে কত ধান্দায় কত দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানো? ধরে নাও তাদের কারো কাছ থেকে খবরটা পেয়েছি।'

ফরিদের সংশয় কাটে না। সে বলে, 'যদি লিডারের সঙ্গে দেখা করতে না পার?'

'করতেই হবে। এটা আমাদের বাঁচা-মরার সওয়াল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ফরিদ বলে, 'আরেকটা কথা বলব শওকত চাচা?'

শওকত বলে, 'একটা কেন, দশটা বিশটা, যে ক'টা ইচ্ছা—বল।'

'এই মাঠে পড়ে না থেকে আমাদের গাঁওগুলোতে চলে যাওয়াই তো ভালো। যারা আমাদের জমিনের ওপর বসে আছে তাদের হাতে-পায়ে ধরলে একটু থাকার জায়গা কি দেবে না?'

ফরিদের সারল্যে হেসে ফেলে শওকত। ছেলেটা প্রচুর লেখাপড়া করলেও অনেক ব্যাপারে একেবারেই ছেলেমানুষ, যেন বহুকাল আগের 'বচপনেই' থেকে গেছে। তার হয়ত ধারণা,

দুনিয়াটা পীর-দরবেশে থিক থিক করছে। এদের কাছে হাত পাতলেই যা ইচ্ছা পাওয়া যাবে। শওকতদের মতো মানুষ যারা না ইণ্ডিয়ান, না বাংলাদেশি, না পাকিস্তানী, যারা একটু আশ্রয়ের জন্য লুকিয়ে চুরিয়ে পুরনো স্বদেশে ঢুকে পড়েছে, এখন যদি ফেলে-যাওয়া জমির অংশ চাইতে যায় তার ফলাফল কী হতে পারে, চোখের সামনে ছবির মতো তা দেখতে পায় শওকত। সে ফরিদের কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে, 'ফরিদ বেটা, কেউ এক 'ধুর' জমিনও দেবে না। যা খোয়া গেছে তা কোনওদিনই ফেরত পাওয়া যাবে না। সমঝা?'

ফরিদরা আসার পর তিন দিন কেটে যায়। এর মধ্যে আরো কিছু মানুষ বর্ডারের ওপার থেকে চলে এসেছে।

আজ চতুর্থ দিন। সকালে উঠে বাসি রুটি আর আখের গুড় দিয়ে নাস্তা করে লোক আনতে কামতাপুরে চলে গেছে শওকত।

বেলা আরেকটু চড়লে ফরিদ ঠিক করে ফেলে, মনপখলে আজ যাবেই। পূর্বপুরুষের জন্মভূমি তাকে যেন প্রবল আকর্ষণে সেদিকে টানতে থাকে।

এখন যে যার ঘরের সামনের তকতকে ফাঁকা জায়গাটায় ঢিলেঢালা বসে কথা বলছে। পুরুষদের রোজগার-ধান্দার ব্যাপার নেই। মেয়েদের অবশ্য কাঠকুটো জ্বেলে ভাজি চাপাটি বানাতে হয়। তবু তাদেরও তেমন তাড়া থাকে না। ভূগোলের হট্টগোল থেকে বহুদূরে এই মাঠের মাঝখানে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনরাত শুধু মুখ গুঁজে পড়ে থাকা ছাড়া আপাতত কারও বিশেষ কিছু করার নেই।

ফরিদরা পায়ে পায়ে বিলের দিকে চলে যায়। ওসমানের কাছ থেকে আগেই সে জেনে নিয়েছিল কীভাবে বারহৌলি যেতে হবে। আর বারহৌলিতে একবার পৌঁছুতে পারলে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে ঠিক মনপখলে চলে যেতে পারবে।

বিলের কাছাকাছি ফরিদ যখন এসে পড়েছে, সেই সময় শুনতে পায়, 'এই শুনো—'

ঘুরে তাকাতেই ফরিদ দেখতে পায় রাশেদা। বেতের মতো পাতলা, ধারাল চেহারা তার। নাকমুখ কাটা কাটা। গায়ের রং পাকা গমের মতো। বড় বড় চোখ দু'টিতে আশ্চর্য যাদু মাখানো। বয়স উনিশ কুড়ি। ঢাকায় থাকতে মেয়েটা সেই কবে থেকে তাকে নজরে নজরে রেখেছে। তার চোখ এড়িয়ে কিছু করার বা কোথাও একটা পা ফেলার উপায় নেই।

রাশেদা কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ফরিদ ভেবেছিল মনপখলে যাওয়ার ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না। বলে, 'কই, কোথাও না। এই এখানে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম।'

'ঝুট।'

'মতলব?'

'তুমি মনপখল যাচ্ছ।'

ফরিদ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'নেহী নেহী। কে বললে?'

পলকহীন তাকিয়ে ছিল রাশেদা। সে বলে, 'আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

ধরা যখন পড়েই গেছে, তখন কী আর করা। ফরিদ বলে, 'সে অনেক দূর। যেতে ছ'মাইল। ফিরতে আবার ছ'মাইল। তোমার কষ্ট হবে।'

'হোক কষ্ট, আমি তো আর তোমার পায়ে হাঁটব না।'

'না না, ভালো করে ভেবে দেখ।'

'তোমার কোনও বাহানা শুনছি না। আমি যাবই। জানো তো রাশেদা কেমন জিদ্দি।'

অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হয় ফরিদকে।

বিলের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড় চিরে একটা সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে আধ মাইলের মতো হাঁটলে পাকা সড়ক বা পাক্কি। এই পাক্কিটা সোজা গিয়ে ঠেকেছে বারহৌলিতে।

কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কিতে ওঠে দু'জনে। দু'পাশে ফসলকাটা ফাঁকা মাঠ এবং আকাশে অজস্র পাখি দেখতে দেখতে আর কথা বলতে বলতে যখন তারা বারহৌলি পৌঁছয়, দুপুর হতে তখনও বেশ দেরি।

জায়গাটা রীতিমতো গমগমে। ছোটখাটো টাউনই বলা যায় বারহৌলিকে। প্রচুর লোকজন। বিজলি বাতি এসে গেছে। সাইকেল রিকশা আর বয়েল গাড়িতে চারিদিক ছয়লাপ। ফাঁকে ফাঁকে অটো আর স্কুটারও চোখে পড়ে। রাস্তার বেশির ভাগই পাকা। দু'ধারে একতলা দোতলা অগুনতি বাড়ি। অবশ্য টিনের এবং টালির ঘরও অজস্র। এরই একধারে জমজমাট বাজার।

মনপখলে গিয়ে খাবার টাবার কিছু পাওয়া যাবে কিনা, কে জানে। ফরিদরা বাজারে এসে মিঠাইয়ের দোকান থেকে বালুসাই, লাড্ডু আর পুরি কিনে, দোকানদারের কাছ থেকে মনপখলে যাওয়ার রাস্তার হদিশ জেনে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসে সেই সময় দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। ফরিদরা দাঁড়িয়ে যায়।

প্রথম দিকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় রাস্তার মোড় ঘুরে স্লোগান দিতে দিতে বিরাট একটা মিছিল আসছে। এবার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যায়।

'আগলা চুনাওমে আজীবলাল সিংকো—'

'ভোট দেঁ, ভোট দেঁ!'

'সমাজসেবক আজীবলাল—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

'দেশপ্রেমী আজীবলাল—'

'যুগ যুগ জীয়ে।'

'আজীবলালকা চিহ্ন—'

'হাঁথী ছাপ জিন্দাবাদ।'

'হাঁথী পর—'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

রাশেদার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় ফরিদ বলে,'এখানে চুনাও (নির্বাচন) আসছে।'

নির্বাচন, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি ঢাকাতেও তারা দেখেছে। এসব তাদের কাছে অজানা কিছু নয়। রাশেদা আস্তে মাথা নাড়ে, নিচু গলায় বলে, 'হাঁ।'

একসময় স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটা ফরিদদের সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর ওরা আর দাঁড়িয়ে থাকে না। বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকে এগিয়ে যায়।

বাজার এবং বারহৌলি টাউনের শেষ সীমা পেছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে ফরিদরা একটা চওড়া পিচের সড়কে এসে ওঠে। মিঠাইওলা বলে দিয়েছিল, এই সড়কটা মনপখলের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

এখানেও রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা ফসলের খেত। দূরে দূরে ঘন গাছপালার ভেতর কিষানদের গাঁ।

এ রাস্তায় প্রচুর গাড়িঘোড়া। দূরপাল্লার বাস, বয়েল কি ভৈসা গাড়ি, সাইকেল রিকশা, ট্রাক আর রোগা হাড্ডিসার ঘোড়ায়-টানা এক-আধটা টাঙ্গা। এক কিনার দিয়ে, গাড়িটাড়ির পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে দু'জনে সোজা হাঁটতে থাকে। মনপখলের দিকে যত এগোয়, আবেগে এবং উত্তেজনায় ফরিদের বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায়। রাশেদা কী ভাবছে, বোঝা যায় না। ফরিদের পাশে পাশে সে যেন চঞ্চল পাখির মতো উড়ে চলে।

মাইল দুই হাঁটার পর ওরা মনপখলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস কবলে তারা জানায়, এবার পাকা সড়ক থেকে নেমে ফরিদদের ডান দিকে যেতে হবে। মাঠের ভেতর দিয়ে খানিকটা গেলেই মনপখল গাঁও।

মাঠে মেনে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকে ফরিদ। তার পাশে একইভাবে উড়ে উড়ে চলেছে রাশেদা। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা মনপখল পৌঁছে যায়।

হালুইকর বলে দিয়েছিল, মনপখল গোয়ার বা গোয়ালাদের গাঁ। চারিদিকে অজস্র গরু-মোষ চরতে দেখে তা-ই মনে হয়।

এখন দুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদের ঝাঁঝ বেড়ে গেছে অনেকটা। তবে আগের মতোই জোরাল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

মনপখলে পৌঁছে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢোকে না ফরিদ। গাঁয়ের সীমানার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অগত্যা রাশেদাকেও থমকে যেতে হয়।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফরিদের আবেগ এবং উত্তেজনা রাশেদার মধ্যেও যেন চারিয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর রাশেদা বলে, 'কী হল, গাঁওয়ে ঢুকবে না?'

চমকে উঠে ফরিদ বলে, 'হাঁ চল।' যেতে যেতে গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে দেয় সে, 'হোঁশিয়ার, আমরা যে ঢাকা থেকে এসেছি কাউকে বলবে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

গ্রামে ঢুকে খানিকটা গেলেই বিরাট পুকুর। ফরিদ বলে, 'এই তালাও-এর ধারে বসে আগে খেয়ে নিই। তারপর কোথায় আমাদের পুরানো ঘরবাড়ি জমিন ছিল, খোঁজ করব।'

পুরি, মিঠাই এবং পুকুরের জল খেয়ে তারা পিতৃভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

ফরিদের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে। আগে আর কখনও সে এখানে আসেনি। ঢাকায় থাকতে আব্বা বা দাদীর কাছে মনপখলের কথা অনেক বার শুনেছে কিন্তু তখন কোনওরকম টান অনুভব করেনি। বহুদূরে উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলের নগণ্য অজানা এক ভূখণ্ডের জন্য তার প্রাণ উথলে ওঠেনি। পিতৃভূমি তার কাছে তখন নিতান্তই কথার কথা, ঝাপসা একটা আইডিয়া মাত্র। কিন্তু এখানকার মাটিতে পা দিয়ে ফরিদ টের পায়, না জন্মালেও বা আগে না দেখলেও তার অস্তিত্বের শিকড়টি মনপখলেই থেকে গেছে।

একটা ব্যাপার ভেবে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল, সাতচল্লিশে পার্টিশানের পর তার দাদা এবং রাশেদার দাদা এই গ্রামে থেকে সর্বস্ব খুইয়ে ঢাকায় চলে যায়। ঠিক চল্লিশ বছর বাদে তাদের দুই নাতি-নাতনি আশ্রয়ের খোঁজে, হয়ত বা আইডেনটিটির সন্ধানে এখানে চলে এসেছে।

একগুঁয়ে অভিযানকারীর মতো ফরিদ এবং রাশেদা মনপথলের ঘরে ঘরে হানা দিতে থাকে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দা যাদের বয়স কম তারা কেউ বলতেই পারল না, ফরিদের দাদা মুদাস্সর আলি এবং রাশেদার দাদা সামসুদ্দিন হোসেন নামে আদৌ কেউ মনপথলে ছিল কিনা। তবে তারা শুনেছে, অনেক কাল আগে এই গাঁওয়ে কিছু মুসলমান থাকত, আজাদির পর তারা কোথায় চলে গেছে, কে জানে। এখন আর কোনও মুসলিম ফ্যামিলি এখানে নেই।

কিছুটা হতাশ হলেও অদম্য উৎসাহে খোঁজ চালিয়েই যায় ফরিদরা। শেষ পর্যন্ত মনপথলের সবচেয়ে প্রাচীন লোকটি তাদের জানায় মুদাস্সর আলি এবং সামসুদ্দিন হোসেন এই গাঁওতেই থাকত। সে তাদের চিনত।

ফরিদের রক্তের ভেতর দিয়ে বিজলি চমকের মতো কিছু ঘটে যায়। সে বলে, 'মেহেরবানি করে বলুন তাদের ঘর কোথায় ছিল—' উত্তেজনায় আবেগে আগ্রহে তার গলা কাঁপতে থাকে।

বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'কিছু নেই বেটা।' তারপর আঙুল বাড়িয়ে দূরে যে জায়গাটা দেখিয়ে দেয় সেটা ফাঁকা শস্যক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, ঘরবাড়ির কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

সেখানে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ফরিদ আর রাশেদা। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিরে যায়।

বিকেলের ঢের আগেই তারা বারচৌলি বাজারে চলে আসে। এবারও দেখা যায় আরেকটা লম্বা মিছিল স্লোগানে স্লোগানে আকাশ চৌচির করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

'দশভকত রামবনবাস চৌবে—'

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'

'এম্লে বনেগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'মন্ত্রী বনেগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'রামরাজ লায়েগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'চৌবেজিকা চিহ্ পেঁড় পর—'

'আগলে চুনাওমে মোহর মারো, মোহর মারো।'

'তুমহারা হামারা উম্মীদবার কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'যবতক চান্দ্ সূরয হোগা—'

'তবতক চৌবেজিকা নারা হোগা।'

'চৌবেজি—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

রামবনবাসের নির্বাচনী মিছিল আজীবলালের মিছিলের চেয়ে কিছুটা বড় এবং বেশি জমকালো। কিন্তু সেদিকে ফরিদের লক্ষ ছিল না। সে শুনেছে মনপথলে তাদের বেশ বড় বাড়ি ছিল। পাকা মেঝে, ইটের দেওয়াল, চাল অবশ্য টিনের। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কী দেখে এল তারা? গভীর হতাশা চারিদিক থেকে যেন তাকে ঘিরে ধরতে থাকে।

সন্ধের আগে আগে, আকাশে দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফাঁকা কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সেই ছন্নছাড়া আস্তানায় পৌঁছে যায় ফরিদরা।

দিন সাতেক কেটে গেল।

এর মধ্যে ওপার থেকে আরও শ'খানেক মানুষ এসে পড়েছে। বাঁশ চট টালি ইত্যাদি জোড়াতাড়া দিয়ে আট দশটা নতুন ঘরও খাড়া করা হয়েছে। আরও ক'টা বানাবার তোড়জোড় চলছে।

সব মিলিয়ে এখন এখানে আড়াই শো'র মতো মানুষ। ঠিক হয়েছে, আপাতত বেশ কিছুদিন সীমান্তের ওধার থেকে লোক আসা বন্ধ থাকবে।

আজ সকালে নাস্তা সেরে শওকত ফরিদকে বলে, 'আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে বেটা।'

কোনও প্রশ্ন না করে ফরিদ বলে, 'যাব।'

কিছুক্ষণ পর তারা বেরিয়ে পড়ে। বিল এবং কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কিতে উঠে শওকত বলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জানো?'

এ দিকটা ফরিদের চেনা। এই রাস্তা দিয়েই ক'দিন আগে বারহৌলি হয়ে সে আর রাশেদা মনপত্থল গিয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখনও ফরিদ জানে না শওকত তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে—বারহৌলিতে, না মনপত্থলে? জবাব না দিয়ে উৎসুক চোখে শওকতকে লক্ষ করতে থাকে সে।

শওকত নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'আমরা যাচ্ছি বারহৌলি টৌনে। সেই পলটিকাল লিডারের সঙ্গে দেখা করতে। বড়ে আদমি, আংরেজি উংরেজি বলতে পারে। সঙ্গে একজন 'লিখিপড়ি' লোক থাকা দরকার। তাই তোমাকে নিয়ে এলাম।' শওকত একনাগাড়ে বলে যায়, 'ভেবে দেখলাম, আর দেরি করা ঠিক না। কখন কী হাঙ্গামা বেধে যাবে, হয়ত এখান থেকে আবার ভাগিয়ে দেবে। তার আগে লিডারকে ধরতে হবে। সিধা ওঁর পায়ে পড়ে যাব।'

শওকত খুবই দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। ষাট বছরের জীবনে ভারত পাকিস্তান আর বাংলাদেশে অজস্র দাঙ্গা গণহত্যা দেশভাগ অস্থিরতা আর উন্মাদনার সাক্ষী সে। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছে।

শওকতের কথাগুলো ফরিদকে বুঝিয়ে দেয়, ইণ্ডিয়ায় থাকতে হলে পলিটিক্যাল প্রোটেকশানটা একান্ত জরুরি। আর সেই উদ্দেশ্যেই আজ সে তাকে নিয়ে চলেছে।

ফরিদ আচমকা বলে ওঠে, 'আমরা কার কাছে যাচ্ছি চাচা? আজীবলাল সিং, না রামবনবাস চৌবে?' বলেই টের পায় গোলমাল করে ফেলেছে। সে যে বারহৌলির দিকে গিয়েছিল, আর বারেহৌলিতে গেলে নিশ্চয়ই মনপত্থলে হানা দিয়েছে, এটা এবার ধরা পড়ে যাবে।

শওকত অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকায়। বলে, 'ওঁদের নাম তুমি জানলে কী করে? বারহৌলিতে এসেছিলে?'

ফরিদ মুখ নিচু করে মাথা হেলিয়ে দেয়।

চোখের তারা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শওকতের। সে বলে, 'মনপত্থলেও গিয়েছিলে, তাই না?'

ফরিদ আধফোটা গলায় বলে, 'হাঁ।'

শওকত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, পরে মনপত্থলের কথা শোনা যাবে। এখন বল, আজীবলাল সিং আর রামবনবাস চৌবের কথা কার কাছে শুনেছ?'

ফরিদ সেদিনের দু'টো মিছিলের কথা জানায়।

শওকত বলে, 'ও, আচ্ছা। আমরা এখন রামবনবাস চৌবের কাছেই যাচ্ছি।'

বারহৌলি টাউনের এক মাথায় বাজার, আরেক মাথায় 'চতুর্বেদী ধাম'। বিশাল কমপাউণ্ডের মাঝখানে পুরনো আমলের দুর্গের মতো প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িটার মাথায় রামসীতা মন্দির। কামপাউণ্ড ঘিরে দশ ফুট উঁচু এবং তিনফুট চওড়া দেওয়াল। সামনের দিকে লোহার পাল্লা দেওয়া বিরাট গেট। সেখানে পাকানো গোঁফওলা বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান হাতে বন্দুক এবং গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়।

শওকতরা 'চতুর্বেদী ধাম'-এ পৌঁছে দারোয়ানকে জানায় রামবনবাস চৌবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

দারোয়ান ভুরু কুঁচকে দু'জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ে, 'ভাগ শালে—'

শওকতেরা চলে যায় না, সমানে কাকুতিমিনতি করতে থাকে। দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেবে না, তারাও নাছোড়বান্দা। দারোয়ানের মেজাজ ক্রমশ চড়তে থাকে, সেই সঙ্গে তার গলাও। চিৎকার করে সে বার বার হুঁশিয়ারি দেয়, না গেলে গুলি করে শওকতদের মাথা বিলকুল ছাতু করে দেবে।

এই সময় ভেতর থেকে গম্ভীর মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'দারবান, উ লোগোকো অন্দর আনে দো।'

গেটের পরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা হুড-খোলা প্রাচীন আমলের মোটর, দু'টো জিপ আর ঘোড়ার-টানা ফিটন দাঁড়িয়ে আছে। দু'টো নৌকর মোটর আর ফিটন ধোয়ামোছা করছে।

দূরে মূল বাড়িটার একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঢালা বারান্দায় ইজি চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে ডাক এডিশানের কাগজ পড়ছিলেন রামবনবাস। পাশে একটা নিচু টেবলে আরও অনেকগুলো খবরের কাগজ পর পর সাজানো। আর আছে দু-চারটে জরুরি ফাইল, কলম, দামি কাগজের রাইটিং প্যাড। নিচে একটা মোরাদাবাদি ফরসি, কলকের মাথা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে।

রামবনবাসের বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। মজবুত স্বাস্থ্য। এই বয়সেও চুলটুল বেশি পাকেনি, দাঁতগুলো অটুট। খাড়া নাক, ধারাল মুখ। শরীরে অতিরিক্ত মেদ নেই। চোখে অবশ্য চশমা রয়েছে।

বারান্দাটা মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে। শওকতেরা ভয়ে ভয়ে, প্রায় দমবন্ধ করে রামবনবাসের কাছাকাছি নিচের জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘাড় ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'সেলাম হুজৌর---'

রামবনবাস সোনার ফ্রেমের ওপর দিয়ে তীব্র চোখে তাদের দেখতে দেখতে বলেন, 'কী হয়েছে? শোর মচাচ্ছিলে কেন?'

'হুজৌর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দারবান আসতে দিচ্ছিল না।'

'কারা তোমরা? তোমাদের তো আগে কখনও দেখিনি।'

শওকত জানায়, তারা এখানে নতুন এসেছে। তবে চল্লিশ বছর আগে এ-অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিল।

কপালে ভাঁজ পড়ে রামবনবাসের। তিনি বলেন, 'মতলব?'

কীভাবে দেশভাগের পর তারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, তারপর বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকায় তাদের কী হাল হয়েছে এবং এখানে ফিরে না এসে তাদের উপায় ছিল না, ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে থাকে শওকত।

রামবনবাসের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায় যেন। খাড়া উঠে বসেন তিনি। বলেন, 'তোমরা লুকিয়ে চুরিয়ে ইণ্ডিয়ায় ঢুকেছ! ঘুসপৈঠিয়া—ইনফিলট্রেটরস। জানো এটা কত বড় বে-আইনি কাজ?'

শওকত এবং ফরিদ হাতজোড় করে একেবারে নুয়ে পড়ে। শওকত রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'হুজৌর মা-বাপ, আমাদের বাঁচান। ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। এখানে যদি থাকতে না পারি, বালবাচ্চা নিয়ে শেষ হয়ে যাব। এখন আপনার মেহেরবানি।'

অনেকক্ষণ কী ভাবেন রামবনবাস। তারপর বলেন, 'তোমরা কত লোক এসেছ?'

'লগভগ আড়াই শো হুজৌর।'

'আর আসবে?'

'হাঁ।'

'কত আসতে পারে?'

'বহোত আদমি। তবে এদিকে আর সাত আটশো'র বেশি আসবে না।'

একটু চুপ করে থাকার পর রামবনবাস আবার জিগ্যেস করেন, 'আমার খবর তোমাদের কে দিলে?'

টাউটদের নাম করে না শওকত। সসম্ভ্রমে শুধু বলে, 'দুনিয়ায় আপনার নাম কে না জানে। এখানে পা দিয়েই আপনার কথা শুনেছি মালিক।'

চাটুবাক্যে মোটামুটি খুশিই হন রামবনবাস। তবে বাইরে থেকে তা বোঝায় উপায় নেই। বলেন, 'আচ্ছা, এখন যাও।'

শওকত ভীরু গলায় জিগ্যেস করে, 'আমাদের কী হবে মালিক?'

'আমাকে ক'দিন ভাবতে দাও।'

রামবনবাস চলে যেতে বলেছেন, তবু দাঁড়িয়ে থাকে শওকতেরা।

রামবনবাস বিরক্ত হয়েই এবার বলেন, 'কী হল, গেলে না?'

শওকত মাথা আরও নুইয়ে দিয়ে বলে, 'হুজৌর, আমরা যে এসেছি, অনেকে জেনে গেছে। তারা যদি ঝঞ্ঝাট বাধায়?'

'চার রোজ বাদ তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

শওকতের আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। 'জি—' বলে এবং বারকয়েক সেলাম ঠুকে তারা বিদায় নেয়।

রামবনবাস চৌবে স্পষ্ট করে তাদের কোনও ভরসা দেননি। অবশ্য চারদিন পর আসতে বলেছেন। তখন তিনি কী বলবেন, কী করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। শওকতের গা ঘেঁষে চলতে চলতে উৎকণ্ঠায় দম আটকে আসতে থাকে ফরিদের। আংরেজি বলার জন্য শওকত তাকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু তার দরকার হয়নি। এতক্ষণ রামবনবাসের হাভেলিতে সে ছিল নির্বাক দর্শক। এবার হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে, 'চৌবেজিকে আমাদের কথা বলে কি ভালো হল চাচা?'

চিন্তাগ্রস্তের মতো শওকতও হাঁটছিল। ফরিদের প্রশ্নের ধাঁচটা ধরতে না পেরে বলে, 'মতলব?'

'ওরা পলিটিক্যাল লোক। যদি বিপদে ফেলে দেয়?'

অর্থাৎ রাজনীতি-করা লোকেরা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ফরিদের। শওকত বলে, 'কাউকে না কাউকে সাহারার জন্যে তো বলতেই হবে। পলটিক্যাল লিডার ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। এখন দেখা যাক।'

ফরিদ আর কিছু বলে না।

চারদিন নয়, ঠিক দু'দিন পর সকালবেলায় দু'টো ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা, হট্টাকট্টা চেহারার লোক এসে লাঠি ঠুকে চেঁচায়, 'কৌন হো শওকত মিঞা আউর ফরিদ আলি?'

মাঠের মাঝখানে সৃষ্টিছাড়া এই বসতিতে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। শওকত এবং ফরিদ ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমরা। কেন?'

'চৌবেজি তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছেন।'

চারদিনের বদলে দু'দিনের ভেতর কেন এই তলব, বুঝে উঠতে পারে না শওকত। ভীরু গলায় সে জানতে চায়, 'মালিক কেন যেতে বলেছেন, আপনারা জানেন?'

'নেহী।'

আর কোনও প্রশ্ন করে না শওকত। চারপাশের ত্রস্ত মানুষগুলোকে খানিকটা ভরসা দিয়ে ফরিদকে নিয়ে লোক দু'টোর সঙ্গে বারহৌলি চলে যায়।

দু'দিন আগে 'চতুর্বেদী ধাম'-এর একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো বারান্দায় একাই ছিলেন রামবনবাস। আজ তাঁকে ঘিরে গদি-মোড়া আরামদায়ক চেয়ারে চার-পাঁচজন বসে আছেন। চেহারা এবং পোশাক-আশাক দেখে আন্দাজ করা যায় তাঁরা মান্যগণ্য বিশিষ্ট সব মানুষ। উঁচু গলায়, উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিলেন। শওকতদের দেখে তাঁরা থেমে যান।

রামবনবাস বলেন, 'এদের কথাই আপনাদের বলেছিলাম।'

তাঁর সঙ্গীরা স্থির চোখে শওকতদের লক্ষ করতে থাকেন। একজন বলেন, 'এরাই তা হলে ঘুসপৈঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)। এদের কথা আমার কানে আগেই এসেছে। বিলের পাশে পড়তি জমি দখল করে ঘর তুলে বসেছে এরা।'

আরও ক'জন সায় দিয়ে বলেন, 'আমরাও খবরটা পেয়েছি।'

শুনতে শুনতে ভয়ানক ঘাবড়ে যায় শওকত আর ফরিদ। গলগল করে ঘামতে থাকে।

রামবনবাস শওকতকে বলেন, 'আজ তোমাদের একটা জরুরি কাজে ডাকিয়ে এনেছি। সেদিন তোমরা বলেছিলে, লগভগ আড়াইশো আদমি ওপার থেকে এসেছ।'

কাঁপা গলায় উত্তর দেয় শওকত 'জি।'

এবার রামবানবাস তাঁর সঙ্গীদের দিকে ফিরে জিগ্যেস করেন, 'আপনারা মনে করছেন, আগলা চুনাওতে আজীবলাল ভালো ভোট পাবে।'

সবাই সমস্বরে জানান, 'হাঁ।'

'কতগুলো সিওর ভোট হাতে থাকলে আমি জিততে পারি?'

'কমসে কম ছ'সাত শো।'

'ঠিক বলছেন?'

'হাঁ, জরুর।'

রামবনবাস আবার শওকতদের দিকে মুখ ফেরান। বলেন, 'সেদিন বলছিলে ওপার থেকে আরও ছ'সাত শো আদমি এখানে আসবে। এসে গেছে?'

'নেহী মালিক। শুনেছি কিছুদিন পর থেকে আসতে থাকবে।' শওকত শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রামবনবাস বলেন, 'এখানে আট মাস পর যে চুনাও হচ্ছে তা জানো?'

শওকত ফরিদকে দেখিয়ে বলে, 'জানি না। তবে বারহৌলি বাজারে ও দু'টো চুনাওর মিছিল দেখেছে। একটা আপনার, আরেকটা আজীবলাল সিংয়ের।'

'হাঁ।' রামবনবাস নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'এত আগে কেউ চুনাও নিয়ে মাথা ঘামায় না। লেকেন আজীবলাল ময়দানে নেমে পড়েছে। আমার পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব না। ভূচ্চরটা জেতার জন্য দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।' বলেই গলার ভেতর থেকে মোটা গমগমে আওয়াজ বার করেন, 'হোঁশিয়ার, ওদের পাল্লায় পড়বে না।'

ভীত মুখে শওকত বলে, 'নেহী মালিক, নেহী।'

'আর শোন, আগলা চুনাওতে আমাকে তোমরা ভোট দেবে। আমার চিহ্ন্ পেঁড়। পরে যারা ওপার থেকে আসবে তাদেরও আমাকে ভোট দিতে হবে।'

এই সময় নিজের মধ্যে খানিকটা সাহস জড়ো করে ফরিদ বলে, 'লেকেন মালিক আমরা ঘুসপৈঠিয়া, এদেশে ভোট দেব কী করে?'

তার মনোভাব বুঝতে পারছিলেন রামবনবাস। বে-আইনি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার নেই। তিনি বলেন, 'সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। লেকেন হোঁশিয়ার, আমাকে ভোট না দিলে তোমরা জিন্দা গোরে চলে যাবে।'

পাশ থেকে শশব্যস্তে শওকত বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ মালিক, আপনাকেই আমরা ভোট দেব, এই জবানের এদিক ওদিক হবে না। লেকেন আমাদের কী হবে? ফরিদ ক'দিন আগে মনপখল গিয়েছিল। সেখানে আমাদের বাপ-দাদার ঘর 'বরাবর' করে এখন চাষ হচ্ছে। আমরা কোথায় থাকব? কী করব?'

'ওখানে কিছু করা যাবে না। ভোটটা আগে দাও, ইণ্ডিয়ান বনো। তারপর ব্যওস্থা হয়ে যাবে।'

শওকত আর ফরিদ চুপ করে থাকে।

রামবনবাস আবার বলেন, 'আজ যে-সব কথা হল, কাউকে বলবে না। মুহ্ বিলকুল বন্ধ্।'

'হাঁ মালিক।'

আরও কিছুদিন কেটে যায়। এর মধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে নতুন কয়েক শো লোক এসে পড়ে।

এদিকে নির্বাচনের কারণে এ-অঞ্চলের আবহাওয়া ক্রমশ তেতে উঠতে থাকে। তারই ভেতর এক ঝিম ধরা দুপুরে দু'টো লোক এসে ভোটার্স লিস্টে তাদের নাম তুলে নিয়ে যায়। আর কয়েকদিন বাদে রামবনবাসের সুপারিশে তাদের রেশন কার্ডও হয়ে গেল।

দিন মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা ভয় আতঙ্ক—সবই ছিল কিন্তু কেউ এসে এতকাল ঝঞ্ঝাট বাধায়নি। কিন্তু ভোটার লিস্টে নাম ওঠা এবং রেশন কার্ড হয়ে যাবার পর একদিন বিকেলে আজীবলালের দু' আড়াই শো লোক চিৎকার করতে করতে এসে হানা দেয়।

'ঘুসপৈঠিয়া হিন্দুস্থানসে—'

'দফা হো, দফা হো।'

'বিদেশি—'

'ভারত ছোড়ো, ভারত ছোড়ো।'

ঘন্টাখানেক হল্লা করে লোকগুলো চলে যায়।

তারপর উর্ধ্বশ্বাসে শওকত আর ফরিদ বারহৌলিতে 'চতুর্বেদী ধাম'-এ চলে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত মুখে সব ঘটনা রামবনবাসকে জানায়।

রামবনবাস এতটুকু উত্তেজিত হন না। নিস্পৃহ সুরে বলেন, 'শোর মচানে দো শালে লোগকো। ভোটার লিস্টে তোমাদের নাম উঠেছে, রেশন কার্ডও হয়ে গেছে। এখন তোমরা ইণ্ডিয়ান। কোনও ভূচ্চরের ছোঁয়ার ক্ষমতা নেই তোমাদের চামড়ায় হাত ঠেকায়। চিন্তা মাত করনা। শুধু আমার ভোটের কথাটা মনে রেখো।'

'জি। জান গেলেও ভুলব না।'

ঘন্টাখানেক বাদে শওকতের সঙ্গে কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সৃষ্টিছাড়া বসতিতে ফিরে যেতে যেতে ফরিদের মাথায় সেই ভাবনাটাই বার বার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারও পব বাংলাদেশি। চুনাও-এর কারণে চল্লিশ বছর বাদে তারা নতুন আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।

দুরমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে চুনাওকে হাজার বার সেলাম জানায় ফরিদ।

জন্মদাতা

সবে অঘ্রানের শুরু। এরই মধ্যে তেজী উত্তুরে হাওয়া চরাচরের ওপর দিয়ে উলটোপালটা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে; বাতাসে ইদানীং ছুরির ধার। শীতটা এ-বছর বেশ জাঁকিয়ে পড়বে মনে হয়।

এখন দুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। কিন্তু রোদে না আছে তাত, না জেল্লা। ম্যাড়মেড়ে বর্ণহীন দিনের ভীরু আলো কুঁকড়ে পড়ে আছে চারপাশে।

মহকুমা শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে মজা নদীর বাঁধানো ঘাটটির দিকে এবার তাকানো যেতে পারে। একেবারে উঁচুতে, অনেকটা জায়গা জুড়ে চাতাল। সেটার দু'ধারে স্নানার্থীদের বসার জন্য একদা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এক দিকের সিমেন্টের বেঞ্চ কবেই ভেঙেচুরে ধসে গেছে। বাকিটা অবশ্য এখনও টিকে আছে, তবে সেটার গায়ে অগুনতি ফাটল। এই সব ফাটলে কয়েক পুরুষ ধরে চন্দ্রবোড়াদের বাড়বাড়ন্ত সংসার। পরম শান্তিতে তারা ওখানে বাস করে আসছে।

চাতাল থেকে মোট আঠারটি সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সবগুলোই ভাঙাচোরা, প্লাস্টার খসে হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। শেষ ধাপটার তলায় মজা নদীর স্থির জল।

নব্বই বছর আগে জনৈক যজ্ঞনাথ কুণ্ডু বহুজনহিতায় এই ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছিল। হয়ত পুণ্যলাভের কারণে, কিংবা নিজের নাম অক্ষয় করে রাখার তাড়নায়। চাতালের মাঝখানে গাঁথা শ্বেতপাথরের ফলকে তার নাম এবং ঘাট প্রতিষ্ঠার সন তারিখ অস্পষ্ট হয়ে এলেও একটু আধটু পড়া যায়। তবে আর কিছুদিন বাদে লোকজনের পায়ের ঘষায় যজ্ঞনাথ পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাবে। তার অমরত্বের আয়ু বড় জোর একানব্বই বা বিরানব্বই বছর।

চাতালের একমাত্র বেঞ্চে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে নিঝুম বসে আছে বিষ্টুপদ। আশেপাশে ফাটলের ভেতর কয়েক ডজন বিষাক্ত চন্দ্রবোড়া। সাপেদের সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা নেই।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স বিষ্টুপদর। ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে রুক্ষ জটপাকানো চুল। মুখভর্তি খাপচা খাপচা দাড়ি। গায়ের রং পোড়া তামাটে। খসখসে খই-ওড়া চামড়া। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তার ঢ্যাঙা মজবুত শরীর। লম্বাটে চোয়াড়ে মুখ। কপালে গালে হাতে উরুতে অজস্র কাটাছেঁড়ার দাগ। চোখের তলায় তিন পোঁচ গাঢ় কালি। হনু দু'টো মাংস ফুঁড়ে গজালের মতো বেরিয়ে এসেছে। এ-সব তার বেপরোয়া জীবনযাপনের পাকা ছাপ। মানুষটা যে সহজ নয়, এক নজরেই টের পাওয়া যায়।

ঘোলাটে চোখে সামনের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছে বিষ্টুপদ। হাজা-মজা নদীর ঠিক মাঝখানে ক'বছর ধরে চড়া পড়ছে। চড়ার বালি অঘ্রানের মরা রোদে চিক চিক করে। এধারে ওধারে দু-চারটে খড়বোঝাই নৌকো এবং চড়ার মাথায় পাতিবকের ঝাঁক ছাড়া আর কিছু নেই। অনেক দূরে নদীর ওপারে গাছগাছালির ঝাপসা লাইন ফুঁড়ে ইটখোলার চিমনি। তার মুখ থেকে গল গল করে ধোঁয়া বেরিয়ে বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে।

বিষ্টুপদর ডানপাশে পঞ্চাশ গজ তফাতে এ-অঞ্চলের প্রাচীন শ্মশান। সেখানে বিশাল বট ডালপালা ছড়িয়ে, মাটিতে ঝুরি নামিয়ে বুঝিবা ইতিহাসের আদি যুগ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় ভগা ডোমের কোমর-বাঁকা, ধসে-পড়া টালির চালের ঘর। ঘরটা এখন বন্ধ। দরজায় শেকল তুলে ভগা কোথায় উধাও হয়েছে, কে জানে। বটগাছের মাথায় শকুন উড়ছে। মাঝে মাঝে তাদের কর্কশ তীক্ষ্ণ চিৎকার বাতাসে করাত চালিয়ে যাচ্ছে। এই আওয়াজটুকু ছাড়া অগাধ নৈঃশব্দ্যে ডুবে আছে চারিদিক।

কত বছর ধরে ভগা ওই শ্মশান আগলে পড়ে আছে আর বিষ্টুপদ যজ্ঞনাথ কুণ্ডুর ঘাট দখল করে রেখেছে, তারা নিজেরাই জানে না। ভগার সর্বক্ষণের সঙ্গী কয়েক শো শকুন, বিষ্টুপদর সঙ্গী ডজন ডজন চন্দ্রবোড়া। এই প্রাণীগুলির সঙ্গে তাদের দীর্ঘকালের সহাবস্থান।

ঘাটের পেছন দিকে কাঁচা রাস্তা। তার পর থেকে ধু ধু কাঁকুরে মাঠ। রাস্তাটা মাঠ চিরে মহকুমা শহরের দিকে চলে গেছে।

মরা নদীর স্তব্ধ জল, বালির চড়া, বক, শকুন, মহাশ্মশান, চন্দ্রবোড়া, ফাঁকা পড়ো মাঠ আর অসীম নির্জনতার মধ্যে মনুষ্যজাতির একমাত্র প্রতিনিধি বিষ্টুপদ। ভগাকে বাদ দিলে সে ছাড়া এই মুহূর্তে এখানে আর কাউকেই মানাতো না।

বাইরে থেকে ধরা না গেলেও বিষ্টুপদ আজ ভীষণ উতলা। তার বুকের ভেতর অনেকক্ষণ ধরে শাবল চালিয়ে কারা যেন পাঁজরা-টাজরা চুরমার করে দিচ্ছে। সুনসান নদীতীরে এত বিশুদ্ধ বাতাস, তবু তার শ্বাস আটকে আসতে থাকে।

বিষ্টুপদর এই কষ্ট এবং অস্থিরতার কারণ দু'টো। এক, আজ ক'দিন ধরে একটা মড়াও শ্মশানে আসেনি। যতদূর মনে আছে, দিনতিনেক আগে মহকুমা শহরের নাম-করা কবিরাজ অঘোর চক্রবর্তীকে পুড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর মধ্যবয়সী তিন ছেলে। তারপর শ্মশানে আর চিতা জ্বলেনি।

শ্মশানে চিতা জ্বলার ওপর তার আর ভগার মরা-বাঁচা জড়িয়ে আছে। মড়া পোড়ালে তবেই কিছু মজুরি পায় ভগা। তারপর মৃতের ছেলেরা প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড দিতে ঘাটে আসে। পিণ্ডদানের আয়োজন করে দিয়ে বিষ্টুপদ পায় নগদ টাকা এবং কিছু আতপ চাল। চালটা তার প্রাপ্য নয় কিন্তু পুরোহিতের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা করে ওটা পেয়ে আসছে বিষ্টুপদ। নদীর ঘাটে

শ্রাদ্ধ কমই হয়ে থাকে। কেউ মা-বাপের কাজ 'নমো নমো' করে সারতে চাইলে এখানে আসে। তখনও পাঁচ দশটা টাকা জুটে যায়। সেই সঙ্গে আনাজপাতি, চালডাল, কিছু ফলমূল। তা ছাড়া ঘাট কামানো, পিতৃপুরুষের বাৎসরিক, এ-সব থেকেও কিছু না কিছু রোজগার আছে।

আগে ভালোই আয় হত বিষ্টুপদর। রোজই দু-চারটে পিণ্ডদান বাঁধা ছিল, আর মাঝেমধ্যে শ্রাদ্ধ এবং বাৎসরিক ক্রিয়াকর্ম। কিন্তু মাসছয়েক হল এ-অঞ্চলে মৃত্যুহার হঠাৎ বেজায় কমে গেছে। আগে দিনে যেখানে তিন চারটে মড়া শ্মশানে আসত এখন সেখানে রোজ চিতা জ্বলে না। কিন্তু একনাগাড়ে তিন দিন মড়া আসেনি, এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

অথচ মানুষ না মরলে বিষ্টুপদ বাঁচে কী করে? লোকজনের পরমায়ু বাড়া মানে তার আয়ুক্ষয়। তার রোজগারের ওপর চার চারটে পেটের অন্ন নির্ভর করছে। সে ছাড়া রয়েছে আমোদিনী এবং তাদের দু'টো ছেলেমেয়ে। চারজনের ভাতকাপড় জোগাতে এমনিতে কালঘাম ছুটে যায়। তার ওপর তিন দিন মড়া আসছে না। এ-সব নিয়ে এই ক'দিন ধরে উৎকণ্ঠায় এবং দুর্ভাবনায় মাথার শির ছিঁড়ে যাচ্ছিল বিষ্টুপদর। তার ওপর কিছুক্ষণ আগে একজন খবর দিয়ে গিয়েছিল, দিন কয়েক আগে তার বাবা মারা গেছে।

প্রথমটা এই মৃত্যুসংবাদ বিষ্টুপদর মাথায় ঢোকেনি। যে-লোকটা অর্থাৎ ধনঞ্জয়, খবর দিতে এসেছিল তাকেও চিনতে পারেনি সে। ধনঞ্জয় সম্পর্কে তার জ্ঞাতি কাকা, বাবার কিরকম যেন ভাই।

দেড়শো মাইল দূরে বর্ধমানের এক ছোট শহরে যে বাপের মৃত্যু হয়েছে তার মুখ বিষ্টুপদর স্মৃতি থেকে প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে। পনেরো কুড়ি বছরের ভেতর নিজের জন্মদাতার কথা আদৌ কখনও ভেবেছে কি না তাব মনে পড়ে না। কোনও সম্ভাবনা নেই, তবু বাবা যদি এই মুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, সে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ।

হাঁপানির রোগী, বুড়ো ধনঞ্জয় যে ট্রেনে বাসে, সাইকেল রিকশায় এবং পায়ে হেঁটে দেড়শো মাইল পাড়ি দিয়ে এই মজ্জা নদীর ঘাটে তাকে খুঁজে বার করে দুঃসংবাদটা দিতে এসেছিল, এতে তার এতটুকু স্বার্থ নেই। সে চায়, বাপের বিষয়-সম্পত্তির ভাগ বিষ্টুপদ পাক। যাবার সময় সৎ পরামর্শ দিয়ে গেছে, আজই যেন সে বাড়ি চলে যায় এবং চুলচেরা হিসেব করে নিজের অংশ বুঝে নেয়। দেরি করলে সমস্ত কিছুই তার ভাইদের গর্ভে ঢুকে যাবে। তখন কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

আপাত চোখে এটা ধনঞ্জয়ের নিঃস্বার্থ পরোপকার মনে হবে। কিন্তু এর ভেতর সূক্ষ্ম একটা মারপ্যাঁচ থাকলেও থাকতে পারে। বিষ্টুপদদের ভাইয়ে ভাইয়ে তুমুল অশান্তি হোক, হয়ত এটাই তার কাম্য।

ধনঞ্জয় লোকটা যে যথেষ্ট প্যাঁচোয়া, বিষ্টুপদর হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু এই ষড়যন্ত্রকারী জ্ঞাতি কাকাটির এত দূর ছুটে আসার কূট উদ্দেশ্য তার মাথায় এতটুকু দাগ কাটেনি।

বাপের মরার খবরে বিষ্টুপদর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া যৎসামান্য। এই পৃথিবীতে আকছার মানুষ মরছে। এ-ও যেন সেইরকমই একটি মৃত্যু, যার সঙ্গে বিষ্টুপদর বিন্দুমাত্র যোগ নেই। পুরোপুরি সম্পর্কহীন এই মৃত্যুর খবর তাকে গোড়ায় অভিভূত বা বিচলিত করতে পারেনি। যে উদাসীনতা নিয়ে লোকে বহুকাল আগের চেনা কোনও মানুষের মৃত্যু-সংবাদ শোনে, ঠিক সেইভাবেই ধনঞ্জয়ের কথা শুনে গেছে সে।

বিষ্টুপদ তার অতীতকে পুরোপুরি মুছে দিয়ে বহুকাল আগে এখানে চলে এসেছিল। তারপর

একটি দিনের জন্যও পেছন ফিরে তাকায়নি। দিবারাত্রি চারটে পেটের অন্নচিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সে।

প্রচুর পরামর্শ এবং সদুপদেশ দিয়ে ধনঞ্জয় চলে গেছে খানিকক্ষণ আগে। তারপর নিজের বাপের নয়, অঘোর চক্রবর্তীর মৃত্যুর ভাবনাটাই বিষ্টুপদকে ব্যাকুল করে রাখে। কেননা, কবিরাজ মারা গেছে তিন দিন আগে। আজ তার ছেলেদের চতুর্থীর পিণ্ড দেওয়ার কথা। এতটা বেলা হয়ে গেল, অথচ তারা কেউ ঘাটে আসছে না। নদীর পাড়ে না এসে চক্রবর্তীর ছেলেরা যদি বাড়ির কাছে কোনও পুকুরের ধারে বসে পিণ্ডদানের কাজটি চুকিয়ে ফেলে, তা হলে নগদ দশ বারোটা টাকা আর কিলো খানেক চাল পাওয়ার আশা নেই। এদিকে বিষ্টুপদর ঘরে আজ না আছে একটা পয়সা, না এক দানা চাল। নদীর ঘাট থেকে কিছু না নিয়ে গেলে উনুন ধরবে না। অবশ্য প্রবল দুশ্চিন্তার মধ্যেও অঘোর চক্রবর্তীদের পুরুত নিবারণ ভট্টাচার্যের ওপর বিষ্টুপদর অগাধ ভরসা। লোকটা তার ওপর প্রথম আলাপের দিন থেকেই যথেষ্ট সদয়। বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবারণ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত কবিরাজের ছেলেদের নদীর ঘাটে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে, যদি না অন্য কোনওরকম বাগড়া পড়ে।

এই সব দুর্ভাবনার চাপ সত্ত্বেও কখন যে বিষ্টুপদ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, নিজেই জানে না। যে নিরাসক্তি নিয়ে ধনঞ্জয়ের মুখে বাপের মৃত্যু-সংবাদ শুনেছিল, সেটা আর বজায় থাকছিল না। বুকের ভেতর চিনচিনে চাপা একটা কষ্ট টের পেতে শুরু করেছিল সে। যে-বাপের সঙ্গে পঁচিশ বছর আগে যাবতীয় সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছে, যার মুখ স্মৃতিতে প্রায় ঝাপসা, তার জন্য এরকম কষ্টের সঙ্গত কোনও কারণ খুঁজে পায় না বিষ্টুপদ। এই জনহীন নদীতীরে, অঘ্রানের নিঝুম দুপুরে চারিদিক জুড়ে যখন অগাধ শূন্যতা, বিষ্টুপদর শ্বাস আটকে আসতে থাকে।

'বিষ্টে, হ্যাঁরে বিষ্টে, আছিস?' দূর থেকে আচমকা চেনা গলা ভেসে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টুপদর স্নায়ুতে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায়। চমকে মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পায়, ঘাটের ওপাশের কাঁচা রাস্তায় পর পর চারটে সাইকেল রিকশা কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম রিকশা থেকে সবার আগে নেমে আসে নিবারণ ভটচায। পেছনের রিকশাগুলো থেকে একে একে অঘোর চক্রবর্তীর তিন ছেলে এবং ওদের দু'জন বয়স্ক আত্মীয়। এদের সবাইকেই চেনে বিষ্টুপদ। কারণ তার মতো অঘোর চক্রবর্তীরাও তিন মাইল দূরের মহকুমা শহরটির বাসিন্দা। ছোট জায়গা, সবাই সবার চেনা। বিষ্টুপদ দ্রুত রিকশাগুলোর কাছে দৌড়ে যায়।

নিবারণ ভট্টাচার্যের বয়স সত্তর বাহাত্তর। বয়সের চাপে শরীর তেউড়ে গেছে। গায়ে শাঁস বলে কিছু নেই। পিঠ বেঁকে যাওয়ায় খানিকটা কুঁজো দেখায়। নাক হুবহু টিয়াপাখির ঠোঁট, আর সেটার আগায় নিকেলের ফ্রেমে গোল বাই-ফোকাল চশমা ঝুলছে।

একদা নিবারণের গায়ের রং ছিল টকটকে। রোদে পুড়ে জলে ভিজে রংটা জ্বলে গেছে। চামড়া কুঁচকে জালি জালি। গাল দু'টো ভাঙা, চুল বেশির ভাগই সাদা হয়ে গেছে। মাথার পেছন দিকে মোটা টিকিতে ফুল গোঁজা।

পরনে গরদের আধময়লা ধুতি, তার ওপর এণ্ডির চাদর। চাদরের ফাঁক দিয়ে সাদা ধবধবে পৈতা বেরিয়ে এসেছে। পায়ে খড়ম। এই পোশাকেই শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস ভটচাযকে দেখা যায়। যে নিষ্ঠাবান পুরুতশ্রেণীটি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, নিবারণ তার শেষ প্রতিনিধি।

অঘোর চক্রবর্তীর তিন ছেলের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। তিনজনই বাপের সুসন্তান। বড়টি বিষ্টুপদরই সমবয়সী হবে, মহকুমা শহরের কলেজে পড়ায়। মেজোটি ম্যাজিস্ট্রেট, ছোটটিও বড় সরকারি চাকুরে। সুখে-থাকা সম্ভ্রান্ত চেহারা তাদের। তিনজনেরই গুরুদশার সাজ। কোমরে কম্বলের আসন গোঁজা।

নিবারণ তাড়া দিয়ে বলে, 'মালপত্রগুলো নামিয়ে আন বিষ্টে। হাত চালিয়ে তাড়াতাড়ি পিণ্ডের জোগাড় করে ফেল।'

রিকশায় বড় বড় তিন চারটে কাপড়ের ব্যাগ নানা জিনিসে ঠাসা। উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ আতপ, তিল, কলা, মধু, ঘি, দই, পেতলের ক্যান-এ কাঁচা দুধ, ফুল ফল দূর্বা, গঙ্গাজল, সন্দেশের প্যাকেট, ইত্যাদি।

ব্যাগগুলো হাতে ঝুলিয়ে বড় বড় পা ফেলে ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় বিষ্টুপদ। তার পাশাপাশি হাঁটতে থাকে নিবারণ। অঘোর চক্রবর্তীর ছেলে এবং আত্মীয়রা খানিকটা পেছনে রয়েছে।

বিষ্টুপদ বলে, 'বেলা দুপুর হয়ে গেল। ভাবলাম, আপনারা বুঝি আর এলেন না। ওদিকে কোথাও কাজকম্ম সেরে নিয়েছেন।'

নিবারণ চাপা গলায় বলে, 'তুই দু'টো পয়সা পাবি, আর আমি না এসে পারি? সব জোগাড়যন্তর করে বেরুতে বেরুতে এরা এত দেরি করে ফেললে যে কী বলব!'

বিষ্টুপদ উত্তর দেয় না।

নিবারণ ফের বলে, 'অঘোর কোবরেজ খুব পয়সাওলা লোক— জানিস তো?'

বিষ্টুপদ ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'জানি—'

'ছেলেরাও বড় বড় কাজ করে। দেদার রোজগার। ওদের দিয়ে আড়াই কিলো গোবিন্দভোগ আতপ কিনিয়েছি, কলা চব্বিশটা, ঘি-মধু-দুধ-দইও অনেকটা করে।' চোখের কোণ দিয়ে ইঙ্গিত করে নিবারণ বলতে থাকে, 'পিণ্ডদানে এত সব দরকার হয় না। কেন কিনিয়েছি, বুঝতে পেরেছিস কি?'

বিষ্টুপদ উত্তর দেয় না, ঘাড় ফিরিয়ে নিবারণের দিকে একবার তাকায় শুধু। তার চোখেমুখে অসীম কৃতজ্ঞতা। বিষ্টুপদর কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই নিবারণের, দু'জনের জীবনযাপনের পদ্ধতি আলাদা, কোনও দিক থেকেই তাদের মেলে না, তবু লোকটা অযাচিত সাহায্য করে আসছে। নিবারণ উপকার না করলে বিষ্টুপদদের উপোস করে মরতে হত।

নিবারণ এবার বলে, 'ওদের বলেছি, তোকে পঁচিশ টাকা মজুরি দিতে হবে।'

এত টাকা আগে আর কেউ কখনও দেয়নি বিষ্টুপদকে। সংশয়ের সুরে সে জিজ্ঞেস করে, 'দেবে?'

'নিশ্চয় দেবে। ওদের অত টাকা বাপের পিণ্ডি দিতে এসে হাতটান করলে নিন্দে হবে না?' নিবারণ ফিস ফিস করে নাগাড়ে বলে যায়, 'ওদের বোঝালাম, বাপের আত্মার শান্তির জন্যে সবাইকে তুষ্ট করা দরকার। ছেলেগুলোর বড় মন, এক কথায় রাজি হয়ে গেল। ওরা হাত খুলে না দিলে আমাদের চলে কী করে?'

বোঝা গেল, শুধু বিষ্টুপদর জন্যই নয়, নিজের জন্যও ভালোরকম প্রণামীর ব্যবস্থা করেছে নিবারণ।

ওরা ঘাটে এসে গিয়েছিল।

নিবারণ বলে, 'তাড়াতাড়ি বেদিটা করে দে। আমরা কিন্তু দেরি করব না। তিন মাইল ঠেঙিয়ে আবার বাড়ি ফিরতে হবে।'

ভারী ব্যাগগুলো চাতালে নামিয়ে রাখতে রাখতে বিষ্টুপদ শশব্যস্তে বলে, 'এক্ষুনি করে দিচ্ছি।' এরপর তার হাতে-পায়ে বিদ্যুৎ খেলতে থাকে। ঘাটের এক কোণে একটা ঝাঁটা, চটের টুকরো এবং প্লাস্টিকের পুরনো বালতি সারাক্ষণ মজুত থাকে। অস্বাভাবিক তৎপরতায় প্রথমে ঝাঁট দিয়ে চাতালটা সাফ করেই সে বালতি বোঝাই করে নদী থেকে এক হাতে জল এবং এক হাতে কাদার তাল নিয়ে আসে। ধুয়ে, চট দিয়ে মুছে চাতালটা তকতকে করে তোলে। তারপর কাদার তাল দিয়ে দেড় ফুট চওড়া, দেড় ফুট লম্বা এবং ছ' ইঞ্চি পুরু একটা নিখুঁত বেদি তৈরি করে ফেলে।

এ-সব করতে মিনিট পনেরোর বেশি সময় লাগে না বিষ্টুপদর। কেননা দীর্ঘকাল ধরে বেদি বানাতে বানাতে এর টেকনিক্যাল ব্যাপারটা এমনই রপ্ত করে ফেলেছে সে, চোখ বুজে বানালেও বেদির কোথাও এতটুকু উঁচুনিচু থাকবে না।

অঘোর চক্রবর্তীর তিন ছেলে এবং বয়স্ক আত্মীয় দু'জন একধারে দাঁড়িয়ে আছে। বেদি তৈরি হয়ে যাবার পর নিবারণ অঘোরের ছেলেদের স্নান করে আসতে বলে। ছেলেরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়।

আসন পেতে বসে ব্যাগ থেকে কলাপাতার বাণ্ডিল, প্রদীপ, চাল, তিল, ফুল, দূর্বা, কলার ছড়া, সন্দেশ, কোষাকুষি, কুশ ইত্যাদি বার করে সাজিয়ে রাখতে রাখতে নিবারণ বলে, 'প্রদীপটা জ্বেলে দে বিষ্টে—'

পেতলের ঝকঝকে পঞ্চমুখী প্রদীপে তেল ঢেলে, তুলোর সলতে পাকিয়ে জ্বেলে দেয় বিষ্টুপদ।

সঙ্গে করে পেতলের দু'টো ঘড়া নিয়ে এসেছিল অঘোরের ছেলেরা। সে দু'টো দেখিয়ে নিবারণ বলে, 'চক্কোত্তি মশায়ের ছেলেদের ঘড়া দিয়ে আয়। জল ভরে আনতে বলবি। ফিরে এসে কলাপাতাগুলো ধুয়ে দিবি।'

চুপচাপ ঘড়া এবং নিজের বালতি নিয়ে নদীতে নেমে যায় বিষ্টুপদ এবং প্রায় তক্ষুনি তরতর করে ওপরে উঠে এসে প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে কলা এবং কলাপাতা পরিষ্কার করে ধুয়ে একধারে গুছিয়ে রাখে।

এদিকে নিবারণের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। গামছা আট ভাঁজ করে মাথায় চাপিয়ে সে কোষাকুষি সাজিয়ে নেয়, কুশ পাকিয়ে আংটি তৈরি করে, ফুলদূর্বা গোছগাছ করে রাখে। সঙ্গে করে গঙ্গাজলের বোতল নিয়ে এসেছিল। বোতলটা খুলে হাতের তেলোয় জল ঢেলে পিণ্ডের যাবতীয় উপকরণের ওপর ছিটিয়ে ছিটিয়ে পবিত্র করে নেয়। বিড় বিড় করে চাপা গলায় মন্ত্র পড়তে থাকে, 'অপবিত্রঃ পবিত্রঃ বা—'

দমকা উত্তুরে হাওয়ায় প্রদীপের আলো নিভু নিভু হয়ে আসতে থাকে। ইশারায় বিষ্টুপদকে সিমেন্টের বেঞ্চের গা ঘেঁষে প্রদীপটা রাখতে বলে নিবারণ। তাতে বাতাসের ঝাপটা লাগবে না।

অঘোর চক্রবর্তীর ছেলেরা স্নান সেরে উঠে আসে। বড় ছেলে অভিজিৎ পিণ্ডদানের অধিকারী। ভেজা কাপড়েই তাকে কাজটা করতে হবে। নিবারণ বলে, 'বসে পড় বাবা—'

কম্বলের আসন বিছিয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে অভিজিৎ। অন্য দুই ছেলে মনোজিৎ এবং সুরজিৎ ইচ্ছা করলে গায়ের কাপড় শুকিয়ে পরে নিতে পারত। কিন্তু তারাও ভেজা কাপড়েই আসন পেতে বড় ভাইয়ের গা ঘেঁষে বসে পড়ে। তাদের দুই মধ্যবয়সী আত্মীয়ও আরেক ধারে বসে পড়েছে।

এখন আর কিছু করার নেই বিষ্টুপদর। চাতাল থেকে এক ধাপ নিচে নেমে সে চুপচাপ বসে থাকে। তার চোখ নিবারণের দিকে।

কয়েক বছরে এই নদীর ঘাটে কত যে পিণ্ডদান, মাতৃ বা পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন বিষ্টুপদকে করে দিতে হয়েছে, তার হিসেব নেই। এ-সব তাকে আদৌ বিচলিত করে না। ক'টা টাকা, কিছু ফল এবং চাল জোটানো ছাড়া এই অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে তার আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। অসীম উদাসীনতায় সে শুধু দেখে যায়।

এদিকে নিবারণ কলাপাতায় পুরো আড়াই কিলো গোবিন্দভোগ চাল ঢেলে ফেলেছে। তার ওপর মধু ঘি দই দুধ তিল ইত্যাদি খানিকটা করে ছড়িয়ে দেয়। বাকিটা শিশি বা পাত্রে পড়ে থাকে। তারপর খোসা ছাড়িয়ে ডজনখানেক মর্তমান কলা সেগুলোর পাশে গুছিয়ে রাখতে রাখতে অভিজিৎকে বলে, 'সব ভালো করে মেখে গোল গোল দলা পাকিয়ে ফেল বাবা।' বাকি বারোটা কলায় হাত দেয় না। সেগুলো আস্তই থাকে।

তিল কলাটলা দিয়ে চাল মাখা এবং ডেলা পাকানো হয়ে গেলে নিবারণ বলে, 'হাত ধুয়ে নাও।'

মনোজিৎ একটা ঘড়া থেকে দাদার হাতে জল ঢেলে দেয়।

এবার নিবারণের কথামতো মাটির বেদিতে আঙুল বসিয়ে বসিয়ে ক'টা গর্ত করে ফেলে অভিজিৎ। তারপর ফের হাত ধুয়ে আঙুলে কুশের আংটি পরে নেয়।

কিছুক্ষণ আগে যান্ত্রিক নিয়মে বিষ্টুপদ যখন অঘোর চক্রবর্তীর পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল তখন নিজের বাবার মৃত্যু সংবাদ তার মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আবার পুরনো কষ্ট এবং বিষাদ তার মধ্যে ফিরে আসে। অভিজিৎ পিণ্ডের যে আড়াই কিলো সুগন্ধি আতপ দলা পাকিয়ে রেখেছে তার সবটাই পেয়ে যাবে বিষ্টুপদ। শুধু চালটা ভালো করে ধুয়ে ঘি-কলা-তিল ইত্যাদি ছাড়িয়ে নিতে হবে। এর ভেতর দু-একটা মড়া কি আর শ্মশানে আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে। মানুষ এখনও অমর হয়ে যায়নি। তিনদিন বাদে কাউকে না কাউকে পিণ্ড দিতে বা আদ্যশ্রাদ্ধ করতে নদীর ঘাটে ছুটে আসতেই হবে। এটাই জাগতিক নিয়ম।

কিন্তু এ সব কিছুই ভাবছিল না বিষ্টুপদ। ঘাটের সিঁড়িতে বসে পলকহীন তাকিয়ে আছে অভিজিতের দিকে। সে শুনেছে, অভিজিৎ খুবই বিদ্বান, বয়সও হয়েছে কম না, চুলের অনেকটাই সাদা হয়ে গেছে। মানুষের মৃত্যু অবধারিত এবং মা-বাবা চিরদিন থাকে না, ইত্যাকার সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও এই জ্ঞানী অভিজ্ঞ মানুষটি পিতৃশোকে ভয়ানক কাতর হয়ে পড়েছে। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরতে থাকে।

নিবারণ ভটাচায টেনে টেনে সুরেলা গলায় মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে, 'নমঃ মধু, নমঃ মধু, নমঃ মধু—শাণ্ডিল্য গোত্রস্য প্রেতস্য অঘোর চক্রবর্তী দেবশর্মণঃ এতদ্ প্রথম পিণ্ডং পূরকম—'

নিবারণের সঙ্গে কাঁপা কাঁপা ভারী গলায় অভিজিৎ বলে যাচ্ছে, 'নমঃ মধু, নমঃ মধু, নমঃ মধু—'

মন্ত্রপাঠের একটানা শব্দ উত্তুরে বাতাসে ভর করে ওধারের ধু ধু মাঠ আর এপাশের মজা নদী, নির্জন শ্মশানের ওপর দিয়ে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। অঘ্রানের স্তব্ধ দুপুর ক্রমশ শোকাতুর এবং ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে।

অভিজিৎদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকের ভেতর ভাঙচুর শুরু হয়ে যায় বিষ্টুপদর। স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে আসা বাবার মুখ অদৃশ্য কোনও সিনেমার পর্দায় ফুটে উঠতে থাকে।

পঁচিশ বছর আগে সকল অর্থেই বিষ্টুপদ ছিল কুলাঙ্গার। যেমন বেপরোয়া তেমনি সৃষ্টিছাড়া। ভালো বংশের ছেলে হয়েও প্রচণ্ড নেশাভাং করত, নজর ছিল খারাপ দিকে। মেয়েমানুষের ব্যাপারে কত কেলেঙ্কারি এবং ঝঞ্ঝাট যে বাধিয়েছে তার হিসেব নেই। এই নিয়ে রোজ অশান্তি। কিন্তু যেদিন বিষ্টুপদ জানালো বেশ্যার মেয়ে আমোদিনীকে বিয়ে করবে সেদিন বাবা তাকে বাড়ি থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেয়। জানিয়ে দেয় সে ত্যাজ্যপুত্র, তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা হবে না।

বিষ্টুপদর গোঁ ছিল মারাত্মক। বাপের শাসানি সত্ত্বেও আমোদিনীকে সে ছাড়েনি। তাকে সঙ্গে নিয়েই বর্ধমান থেকে চলে আসে। এখানে ওখানে বারো ঘাটের জল খেয়ে শেষ পর্যন্ত এই মফস্বল শহরে এসে ঠেকেছে। এর মধ্যে দু'টো ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে তাদের।

আমোদিনীর মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার মতো বারুদ যেমন রয়েছে, তেমনি বিষ্টুপদর মতো দুর্ধর্ষ একটা পুরুষকে জুড়িয়ে ফেলার ক্ষমতাও। এই পঞ্চাশ বছর বয়সে বিষ্টুপদকে পোষ মানিয়ে একটা গৃহপালিত দায়িত্ববান জীব বানিয়ে ফেলেছে সে। তা ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে এখন তার ভাটার টান।

পঁচিশ বছর আগে বর্ধমানে তাদের সেই বাড়ি, বাবা, মা, ভাইবোনেরা, আত্মীয়-স্বজন— সবার মুখ এখন দেখতে পাচ্ছে বিষ্টুপদ। বিশেষ করে বাবার মুখটা ক্রমশ বড় হতে হতে সমস্ত চরাচরকে যেন ঢেকে দিচ্ছে।

বর্ধমানের জীবনটা যেন এ-জন্মের নয়, বহু হাজার বছর আগের কোনও এক পূর্বজন্মের ব্যাপার। জাতিস্মর হয়ে বিষ্টুপদ বুঝিবা তখনকার দৃশ্যাবলী দেখছিল।

অস্পষ্টভাবে তার কানে মন্ত্রপাঠ ভেসে আসতে থাকে।

'নমঃ শ্মশানালদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ,
ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভবঃ।
নমঃ আকাশস্থঃ নিরালম্বঃ বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ।
ইদং নীরমিদং—'

ঝাপসা চোখে অভিজিৎদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বিষ্টুপদর মনে পড়ে যায়, তিন দিন আগে তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। বড় ছেলে হিসেবে অভিজিতের মতো সে-ও পিণ্ডদান এবং শ্রাদ্ধের অধিকারী। যেহেতু সে ত্যাজ্যপুত্র, নিশ্চয়ই তার পরের ভাই আজ বাবার পিণ্ডদান করছে। সেই শ্বাসকষ্টটা বেড়েই চলে বিষ্টুপদর। বাবার মৃত্যুর খবরটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত তার কথা পঁচিশ বছরে ক'বার ভেবেছে, বিষ্টুপদর মনে পড়ে না। তার ধারণা ছিল, যাবতীয় সম্পর্ক ছিঁড়ে-খুঁড়ে সে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। কিন্তু অভিজিৎকে যত দেখছে, নিবারণের মন্ত্র যত কানে আসছে, ততই মনে হচ্ছে তা অসম্ভব, তার মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য একটা শিকড় থেকেই গিয়েছিল। সেটা উপড়ে ফেলা যায়নি।

নিবারণ ভটচায এক নাগাড়ে মন্ত্রপাঠ করেই চলেছে। আর তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে অভিজিতের গলায়।

'ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভবঃ।'

মন্ত্রের এই শ্লোকগুলি সবই বিষ্টুপদর জানা। বছরের পর বছর শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। শুধু তাই-ই না, শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে বা বাৎসরিক কাজে কী কী করতে হয়, চোখ বুজে সে বলে দিতে পারে।

অঘ্রানের সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশের দিকে খানিকটা নেমে গেছে। উত্তুরে হাওয়ার জোর আরও বাড়ছে। দূরে শ্মশানের প্রাচীন বট গাছটার মাথায় শকুনদের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যায়। ক'দিন মড়া দেখতে না পেয়ে তার অস্থির হয়ে উঠেছে।

এদিকে আসনে বসে পিণ্ডদানের কাজ শেষ করে ফেলেছে অভিজিৎ। নিবারণ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'এবার কলাপাতায় বাকি পিণ্ডটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস। কাককে উৎসর্গ করতে হবে।'

আগের মতোই চাতাল থেকে এক ধাপ নিচে বসে আছে বিষ্টুপদ। অন্যমনস্কের মতো সে লক্ষ করে, নিবারণের পেছন পেছন পিণ্ড নিয়ে চাতালের ওধারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে অভিজিৎ। ওদের সঙ্গে সুরজিৎ মনোজিৎও গেছে। শুধু আত্মীয় দু'জন বসে আছে চাতালে।

নিবারণের নির্দেশ অনুযায়ী কৃষ্ণচূড়ার তলায় পিণ্ডসুদ্ধ কলাপাতা একধারে নামিয়ে রেখে হাত জোড় করে দাঁড়ায় অভিজিৎ, তারপর তার সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে।

'নমঃ শাণ্ডিল্য গোত্রস্য প্রেতস্য অঘোরে চক্রবর্তী দেবশর্মণস্য তৃপ্ত্যর্থং
যমদ্বারাবস্থিত নানা দিগ্‌দেশীয় বায়সেভ্য এষ বলির্নময়ঃ।'

মন্ত্রপাঠের পর পিণ্ডটা তুলে কাকের উদ্দেশে নিবেদন করে অভিজিৎ।

'নমঃ কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে—'

নিবেদন হয়ে গিয়েছিল। নিবারণ বলল, 'চল, আমরা দূরে গিয়ে দাঁড়াই। নইলে কাক এসে পিণ্ড মুখে দেবে না।'

ওরা খানিকটা তফাতে যেতেই কোত্থেকে তিন চারটে ভুসো রঙের কাক বিদ্যুৎগতিতে উড়ে এসে পিণ্ড ঠোকরাতে শুরু করে।

নিবারণ বলে, 'কাকভোজন হয়ে গেছে। এখন চাতালে যে পিণ্ডগুলো রয়েছে সেগুলো জলে দিয়ে আরেক বার স্নান করে নিলেই তোমার কাজ শেষ। এস।'

নিবারণেরা ফের চাতালে ফিরে আসে। অভিজিৎ চালকলা এবং তিল মাখা বড় বড় পিণ্ডের দলা, ফুল, দূর্বা, মেষলোম, কুশ ইত্যাদি সমস্ত কিছু কলাপাতায় তুলে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিচে নেমে যায়। তার দুই ভাই এবং নিবারণও সঙ্গে যায়।

শেষ সিঁড়িতে এসে নিবারণ বলে, 'পিণ্ডগুলো আস্তে করে জলে নামিয়ে রাখো। ওই যে ওখানে—' আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দেয় সে।

পিণ্ডদানের এটাও একটা জরুরি প্রথা, এই ভেবে ছ'ইঞ্চি জলের তলায় অতি সন্তর্পণে পিণ্ডগুলো রাখে অভিজিৎ। সে জানে না, এর মধ্যে একটু চাতুরি আছে। দূরে ছুড়ে দিলে চালের দলা ছত্রাকার হয়ে জলে-কাদায় ছড়িয়ে যাবে। দু'চার দানার বেশি কিছুতেই উদ্ধার করা যাবে না। কিন্তু পাড়ের কাছে আলগোছে রেখে দিলে মজা নদীর স্থির জলে সহজে পিণ্ড ভাঙবে না। পরে বিষ্ণুপদ ওগুলো তুলে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে চালগুলো বার করে নিতে পারবে। এরকমই একটা গোপন বোঝাপড়া আছে দু'জনের মধ্যে।

পিণ্ড নামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় বার স্নান সেরে অভিজিৎ এবং তার ভাইয়েরা আবার ওপরে উঠে আসে।

বিষ্টুপদ একইভাবে ঠায় বসে আছে।

নিবারণ অভিজিতের বয়স্ক আত্মীয়দের উদ্দেশে বলে, 'বিষ্টের পয়সাটা দিয়ে দিন। বাকি

যে ঘি মধু কলা দুধ কাজে লাগল না সেগুলো ও পাবে।' তারপর বিষ্টুপদর দিকে ফিরে বলে, 'কি রে, তখন থেকেই বসে আছিস দেখছি, উঠে আয়।'

ঘোরের মধ্যে উঠে আসে বিষ্টুপদ। অভিজিতের এক আত্মীয় নগদ পঁচিশটা টাকা তার হাতে দিয়ে বলে, 'কি, খুশি তো?'

সামান্য কাজের জন্য এত টাকা আগে আর কখনও পায়নি বিষ্টুপদ। খুশিতে তার গলে পড়ার কথা। কিন্তু বাবার জন্য ভয়ানক একটা কষ্ট ছাড়া আর কোনও অনুভূতিই তার মধ্যে এখন কাজ করছিল না। শুধু স্বয়ংক্রিয় কোনও নিয়মে সে মাথাটা ডান পাশে হেলিয়ে দেয়।

নিবারণ এবার বিষ্টুপদকে একুট দূরে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বলে, 'তাড়াতাড়ি নদীতে গিয়ে চালটা তুলে আনিস। নইলে আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। আর ওই সব দুধ দই কলাটলা রইল।' বলে তাকে পিণ্ডদানের জায়গাটা দেখিয়ে দেয়।

ঝাপসা গলায় বিষ্টুপদ বলে, 'আচ্ছা—'

কিছুক্ষণ পর কোষাকুষি, পেতলের প্রদীপ, ঘড়া এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে নিবারণরা ঘাটের ওপাশের কাঁচা রাস্তাটায় চলে যায়। সেখানে যে চারটে সাইকেল রিকশায় করে ওরা এসেছিল সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

রিকশায় উঠতে উঠতে নিবারণ চেঁচিয়ে বলে, 'যাই রে বিষ্টে—'

বিষ্টুপদ উত্তর দেয় না।

রিকশাগুলো আস্তে আস্তে দূরে ফাঁকা কাঁকুরে মাঠের দিকে চলে যায়। তারপর কতটা সময় কেটে গেছে বিষ্টুপদর খেয়াল থাকে না। একসময় সে দেখতে পায়, সূর্য পশ্চিম আকাশে আরো হেলে গেছে, ম্যাড়মেড়ে রোদের তাপ আরো জুড়িয়ে যাচ্ছে। দূরের ধু ধু মাঠে সাইকেল রিকশাগুলো আর চোখে পড়ে না।

নদীর ঘাটে এই মুহূর্তে বিষ্টুপদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। শ্মশানের শকুনগুলো এখন ডানা ঝাপটাচ্ছে না বা চিৎকারও করে উঠছে না। বাতাস হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় সাঁই সাঁই আওয়াজটাও বন্ধ। নদীর চরে বকগুলোও ওড়াউড়ি করছে না, ডানা মুড়ে চুপচাপ বসে আছে।

এই নিস্তব্ধ মনুষ্যহীন চরাচরে বিষ্টুপদ একেবারে একা। অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো চাতালে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তারপর প্রায় টলতে টলতে সিঁড়ি ভেঙে নদীতে নেমে যায়।

একধারে স্থির স্বচ্ছ জলের তলায় পিণ্ডগুলি এখনও সেইভবেই পড়ে আছে, আলগা হয়ে ছড়িয়ে যায়নি। ঝুঁকে সেগুলো তুলতে তুলতে হঠাৎ বিষ্টুপদ টের পায়, বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে দিয়ে হু হু করে কান্না উঠে আসছে।

পিণ্ড হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বিষ্টুপদ। তারপর নিজের অজান্তেই কখন যেন কোমর-সমান জলে নেমে চালের ডেলাগুলি সামনে বাড়িয়ে বিড় বিড় করে বলতে থাকে ঃ

'নমঃ মধু, নমঃ মধু, নমঃ মধু
ভরদ্বাজ গোত্রস্য প্রেতস্য মেঘনাদ দেবশর্মণস্য এতৎ পিণ্ডং পূরকম—'

মেঘনাদ তার বাবার নাম। মুখস্থ মন্ত্রগুলি আওড়াতে আওড়াতে বিষ্টুপদ টের পায় তার চোখ ফেটে উষ্ণ জলস্রোত নেমে আসছে।

পুরো মন্ত্রপাঠের পর পিণ্ডগুলো অনেক দূরের জল ছুড়ে দেয় সে। তারপর ক'টা ডুব দিয়ে ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠতে থাকে।

বাজি

কেহরগঞ্জ টাউনের দুই নাম-করা জুয়াড়ি হল মোটেরাম এবং চুহালাল। তাদের আসল নাম কী ছিল কেউ জানে না, তারা নিজেরাও বেমালুম কবেই তা ভুলে গেছে। দু'জনের বাপ-মায়ের দেওয়া আদি নাম নিয়ে কেহরগঞ্জের লোকজন কোনওদিন মাথা ঘামায় না। এ-ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

মোটেরাম ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা বিশাল চেহারার একটা মানুষ। এই কারণে তার নামের গোড়ায় 'মোটে' শব্দটা জুড়ে গেছে। আর চুহালাল হল রোগা, কমজোরি, বিলকুল ইঁদুরের মতো ছোটখাটো আদমি। তাই তাকে ডাকা হয়—চুহালাল। প্রথম প্রথম মজা করেই এভাবে তাদের ডাকা হত। পরে এই দুই নামেই তারা বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

মোটেরাম এবং চুহালালের কথা পরে। তার আগে কেহরগঞ্জ টাউন সম্পর্কে কিছু জানানো দরকার।

কেহরগঞ্জ উত্তর বিহারের নগণ্য এক শহর। ইন্ডিয়া—ইন্ডিয়া কেন, বিহারের মানচিত্রেও এই শহরটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাজার কুড়ি মানুষ, তিরিশ চল্লিশটা বেঢপ চেহারার পাকা কোঠি, এলোমেলো গজিয়ে ওঠা টিন এবং টালির চালের বিদঘুটে বাড়িঘর, কাঁচা খোলা নর্দমা, গোটা পঁচিশেক টাঙ্গা, শ' খানেক সাইকেল রিকশা, বড় বড় চাকা-ওলা হুডখোলা পুরনো আমলের ক'টা মোটর, অগুনতি বয়েল আর ভৈসা গাড়ি—এই নিয়ে কেহরগঞ্জ। আর আছে প্রচুর মশা, কয়েক কোটি মাছি, গণ্ডা গণ্ডা ধর্মের ষাঁড়, বেওয়ারিশ কুকুর, ইত্যাদি। এখানকার রাস্তাগুলো বেশির ভাগই কাচ্চী বা কাঁচা সড়ক, পা ফেললেই ধুলোয় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। দু' চারটে রাস্তায় অবশ্য কিছু কিছু খোয়া আর ইঞ্চি দেড়েক পিচের একটা স্তর চোখে পড়ে। এবং কী আশ্চর্য, এখানে একটা মিউনিসিপ্যালিটিও আছে আর বছর তিনেক হল বিজলিও এসেছে।

মিউনিসিপ্যালিটির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় এভাবে। মাঝে মাঝে ওখানকার হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে লোকজন এসে কাঁচা নর্দমায় মশা-মারা তেল ছিটিয়ে যায় আর ট্যাক্স কালেক্টররা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ট্যাক্স আদায় করে। বছরে মোটে একবার বার্ষিক শ্রাদ্ধের মতো কয়েকটা রাস্তায় কিছু খোয়া ফেলে পিচ ঢালা হয়।

এখানে যে বিজলি এসেছে তার রকমসকম বেজায় গোলমেলে। ভোল্টেজ এতই কম যে বিজলি বাতির চেয়ে কেরোসিন-লণ্ঠনের তেজ বেশি। তা ছাড়া আরো একটা মুশকিল রয়েছে। যখন তখন বিজলি চলে যায়, আর একবার গেলে কখন ফিরবে কেউ জানে না।

এখানে হইচই কম। পৃথিবীর যাবতীয় হট্টগোল থেকে অনেক, অনেক দূরে উত্তর বিহারের এই কেহরগঞ্জ টাউন।

ফি শনিবার শহরের পুব দিকের শেষ মাথায় জাঁকিয়ে হাট বসে। পুরো ছ'টি দিন ঝিমিয়ে থাকার পর হাটের দিন কেহরগঞ্জে কিছুটা চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা দেখা দেয়। কিন্তু তা শুধু এই একটি দিনের জন্যই।

আজ শনিবার। বহুকালের নিয়ম অনুযায়ী আজও কেহরগঞ্জে হাট বসেছে।

হাটের ধার ঘেঁষে সিগরা নদী। নদীর কিনার থেকে উঠে-আসা পুরনো ভাঙাচোরা পাথরের বাঁধের ওপর অত্যন্ত বেজার মুখে বসে আছে মোটেরাম এবং চুহালাল। তাদের এই বিমর্ষতার কারণ পরে বলা যাবে।

মোটেরাম এবং চুহালাল দু'জনেই টাঙ্গা চালায়। একসময় দু'জনেরই নিজস্ব গাড়ি এবং ঘোড়া ছিল কিন্তু জুয়া খেলে খেলে এমনই হাল যে গাড়িঘোড়া সবই বেচে দিতে হল। এখন নিজেদের গাড়িই ভাড়া নিয়ে তাদের পেট চালাতে হয়। নতুন মালিক দিনের শেষে নগদ সাতটি টাকা ভাড়া গুনে নেয়। তার ওপর দু'জনেরই যা কামাই তা দিয়ে নিজের নিজের সংসারের এবং ঘোড়ার দানাপানি জোটাতে হয়। তা ছাড়া জুয়ার খরচ তো রয়েছেই।

অঘুন বা অঘ্রান মাস শেষ হয়ে এল। এখন সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর অনড় দাঁড়িয়ে আছে। এই দুপুর বেলাতেও হাওয়া বেশ কনকনে। হিমালয় বেশি দূরে নয়। অঘ্রান পড়তে না পড়তেই এখানে বাতাসে হিমের গুঁড়ো মিশতে শুরু করে। দুপুরের রোদও তাকে তাতিয়ে তুলতে পারে না।

বাঁধের তলায় সিগরা নদী এখন বড় শান্ত, তার জলে না আছে ঢেউ, না স্রোত। দু-একটা নৌকো খুবই আলসে ভঙ্গিতে এধারে ওধারে ভেসে বেড়াচ্ছে। পরদেশি শুগার ঝাঁক বাতাস চিরে চিরে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উড়ে যাচ্ছে।

এবার মোটেরাম এবং চুহালালকে লক্ষ করা যেতে পারে। দু'জনেরই বয়স চল্লিশের নিচে। মোটেরামের পরনে এই মুহূর্তে ময়লা ঢলঢলে পায়জামা আর ডোরাকাটা সবুজ শার্ট, তার ওপর ধুসো কম্বল জড়ানো, পায়ে কাঁচা চামড়ার তালি-মারা চপ্পল। মাথায় শীত ঠেকাবার জন্য পোকায়-কাটা কম্ফোর্টার পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে। চুহালালের পরনে নোংরা ধুতি আর কুর্তা। ধুতির কোঁচা পাকিয়ে পেছনে গোঁজা। কুর্তার ওপর একটা ছেঁড়া সুতোর সুজনি জড়ানো রয়েছে। পায়ে টায়ার-কাটা রবারের চটি। শীতের কারণে তার মাথায় একটা চিটচিটে গামছা পাগড়ির মতো আটকানো।

ওরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে সামনে কয়েক হাত দূরে অনেকগুলো ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেগুলোর তলায় একদিকে সারি সারি টাঙ্গা, আরেক দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে সাইকেল রিকশা। তার পর থেকেই হাটের শুরু। প্রায় সিকি মাইল জায়গা জুড়ে বিশাল হাটটা মানুষের ভিড়ে এবং তাদের হাঁকাহাঁকিতে গমগম করছে।

মোটেরাম জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আজকের দিনটা একেবারে চৌপট হয়ে গেল চুহা—'

চুহালাল বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে, 'হাঁ। সূরয মাথার ওপর চড়তে না চড়তেই পাকিটের (পকেটের) পুরা পাইসা খতম। এখনও আধা রোজ পড়ে রয়েছে। দিনটাই বিলকুল বরবাদ।' সে-ও হুস করে জোরে শ্বাস ছাড়ে।

অর্থাৎ হাটে এসে অভ্যাসমতো প্রথমেই আজ দু'জনে চলে গিয়েছিল জুয়ার আড্ডায়। প্রতি হাটেই এখানে জমজমাট জুয়ার আসর বসে। জুয়া খেলাটা মোটেরামদের কাছে একেবারে ধর্মপালনের মতো। আজ যে ক'টা বাজি তারা ধরেছে, সব গুলোতেই হেরে পকেট ফাঁক করে ফেলেছে। নতুন বাজি ধরার মতো ফুটো কড়িও তাদের কাছে নেই। সেই কারণেই মোটেরাম এবং চুহালাল ভয়ানক বিমর্ষ।

হাটে এসে জুয়ার আড্ডায় ঢোকার আগে কালালীতে গিয়ে দু'জনে খানিকটা নেশা করেছিল। যতই তারা দারু বা তাড়ি টাড়ি খাক, পুরোপুরি বেহুঁশ হয়ে পড়ে না। চোখ সামান্য লাল হয়ে ওঠে আর মাথা অল্প অল্প কাঁপে। এর বেশি আর কিছু না।

মোটেরাম একটু চিন্তা করে বলে, 'ধারে খেলবি?'

দু'জনের জুয়াড়ি হিসাবে এতই সুনাম এবং মর্যাদা যে আশেপাশে বিশ তিরিশ মাইলের ভেতর যত জুয়ার আড্ডা বসে সব জায়গায় তাদের ধারে খেলতে দেওয়া হয়। হেরে গেলে

এবং পকেটে সেই মুহূর্তে পয়সা না থাকলে পরে এসে তারা বাজির টাকা দিয়ে যায়। পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠুক, দুনিয়া রসাতলে যাক, হেরে যাওয়া বাজির ঋণ তারা শোধ করবেই। এই একটা ব্যাপারে তাদের অসীম সততা। এ-অঞ্চলের প্রতিটি জুয়াড়ি এবং জুয়ার আড্ডার মালিক এই কারণে তাদের যথেষ্ট খাতির করে থাকে।

আসলে মোটেরাম এবং চুহালালের কাছে জুয়া আর ভগোয়ান রামজির পুজো প্রায় একই ব্যাপার। সেখানে কোনওরকম ফাঁকি বা ধোঁকাবাজি নেই।

চুহালাল বলে, 'নেহী মোটরু, ধারে খেলব না। তিন রোজ মালিকের গাড়ির কিরায়া দিতে পারিনি। লালার দুকান থেকে আটা ডাল মরিচ নিমক নিয়েছিলাম বাকিতে। লালা সুবাহ্ সাম, দু'বার করে তাগাদা দিচ্ছে। তার ওপর বরাতটা আজ খুবই খারাপ, একটা বাজিও লাগাতে পারলাম না।' একটু থেমে বলে, 'করজ করে আজ আর খেলছি না।'

মোটেরাম তাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করে, 'ঠিক আছে, ধারে তোকে খেলতে হবে না। হাটিয়ায় টাঙ্গার কিরায়া আজ অনেক পাবি। কিছু পাইসা পেলে দো-চার বাজি লাগিয়ে দেব, কী বলিস?'

চুহালালের খানিক আগের সিদ্ধান্ত এবার টলে যায়। মিনমিনে গলায় বলে, 'লেকেন ঘরবালী বলছিল, ঘরে ডাল আটা আনাজ কিচ্ছু নেই। এ-সব না নিয়ে গেলে চুল্‌হা জ্বলবে না —'

মোটেরাম বলে, 'আমারও তো সেই হাল। তাই বলে হাটিয়ায় এসে পাইসা নেই বলে বাজি ধরব না! আদত খারাপ হয়ে যাবে বিলকুল। সওয়ারি পাকড়া, দো-দশ রুপাইয়া কামা, তারপর ফির জুয়াকা তাম্বু··'

তার কথা শেষ হবার আগেই দূর থেকে মাইকের আওয়াজ ভেসে আসে।

কেহবগঞ্জের রাস্তাঘাটে আকছার মাইকে হিন্দি সিনেমার গান বাজানো হয়। সেটা নতুন কোনও ব্যাপার না। প্রথমটা মোটেরামরা খেয়াল করে নি, কিন্তু আওয়াজটা কাছে এগিয়ে আসতেই টের পাওয়া গেল, ওটা গান না। কেউ ভারি মোটা গলায় একটানা কিছু বলে যাচ্ছে।

মোটেরাম বলল, 'কা বোলতা রে?'

চুহালাল মাইকের কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না। সে ডান হাতটা হাওয়ায় ঘুরিয়ে বলল, 'কৌন জানে!'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায় কয়েকটা সাইকেল রিকশা মিছিল করে এগিয়ে আসছে, সেগুলোর পেছনে একটা খোলা জিপ, জিপের পেছনে আবার ডজনখানেক সাইকেল রিকশা।

একেবারে প্রথম রিকশাটায় বসে আছে একটা মাঝবয়সী হট্টাকট্টা চেহারার লোক। সে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'ভোলেচাঁদকো—'

সামনে-পেছনে সবগুলো সাইকেল রিকশা অল্পবয়সী ছেলেছোকরাতে বোঝাই। তারা গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করছে, 'ভোট দো, ভোট দো।'

মাঝখানের খোলা জিপটায় হাতজোড় করে বিগলিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি চর্বির পাহাড় অর্থাৎ ভোলেচাঁদ দাস। লোকটা লালদাসিয়া কায়াথ।

ভোলেচাঁদের বয়স ষাটের কাছাকাছি। গলা টলা বলতে তার কিছুই নেই। বিশাল শরীরের ওপর সরাসরি মাথাটা ঠেসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা, পেছন দিকে একগোছা মোটা টিকি। প্রকাণ্ড গোল মুখে ছোট ছোট চোখ। ভুরুতে লোম নেই বললেই হয়। থুতনির তলায় চার পাঁচটা পুরু থাক।

এই মুহূর্তে ভোলেচাঁদের পরনে ফিনফিনে মিলের ধুতি আর ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি। তার ওপর তুষের শাল। ধুতিটা দেহাতি ধরনে পরা। তার গলায় একটা মোটা গাঁদা ফুলের মালা ঝুলছে। কপাল জুড়ে লাল চন্দনের লম্বা তিলক।

ভোলেচাঁদকে চেনে না এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না কেহরগঞ্জে। শহরের ঠিক মাঝখানে যে চক বাজারটা রয়েছে সেখানে তার বিরাট ভেজিটেবল অয়েলের দোকান। তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে সে বনস্পতি তেল বেচে আসছে। মোটামুটি ভালোই পয়সা করেছে সে। দোতলা কোঠি বানিয়েছে। গোটা দুই টাঙ্গা আছে, আর আছে দশ বারোটা বয়েল গাড়ি। টাঙ্গা এবং বয়েল গাড়িগুলো সে ভাড়ায় খাটায়। বনস্পতি তেলওলা নির্বাচনে নেমে গেছে, এটা কেহরগঞ্জে একটা বিস্ময়কর ঘটনা। হাটের সব লোক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ জিপ এবং সাইকেল রিকশাগুলোর পেছন পেছন হাঁটতেও শুরু করেছে।

স্লোগান সমানে চলছেই।

'আগেলা চুনাওমে কৌন জিতেগা?'

'ভোলেচাঁদ দাস, ভোলেচাঁদ দাস।'

'ভোলেচাঁদজি—'

'এম্লে বনেগা।'

'ভোলেচাঁদজি—'

'মনিস্টার বনেগা।'

এই সব স্লোগানের মধ্যে সামনের রিকশার এক ভলান্টিয়ার একটা ছাপা পোস্টার তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'দেখিয়ে, এহী হ্যায় ভোলেচাঁদজিকা চিহ্ন—' পোস্টারটায় একটা বড় হরিণ আঁকা রয়েছে। সেটা দেখিয়ে সে আবার বলে, 'আগেলা চুনাওমে হিরণ পর মোহর মারো—' অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে হরিণ চিহ্নের ওপর ছাপ মেরে ভোলেচাঁদকে নির্বাচনে তরিয়ে দিতে হবে।

অন্য ভলান্টিয়াররা ধুয়ো ধরে, 'মোহর মারো, মোহর মারো—'

'দেশপ্রেমী ভোলেচাঁদজি—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

ভোলেচাঁদ দাসের নির্বাচনী মিছিল ধীরে ধীরে হাটের অন্য দিকে চলে যায়।

চুহালাল আর মোটেরাম একেবারে থ। অনেকক্ষণ পর চুহালাল বলে, 'কা রে মটরু, চুনাও আ গিয়া—কা?'

মোটেরাম বলে, 'হাঁ। তাই তো দেখছি।'

'ভোলেচাঁদ তেলবালাও চুনাওতে নেমে গেল!'

'দেশপ্রেমী ভি বন গিয়া।'

'হাঁ। আজীব দুনিয়া।'

একটু চুপচাপ। তারপর কী ভেবে চুহালাল বলে, 'এর আগে কবে যেন চুনাও হয়েছিল?'

মোটেরাম মনে মনে সময়ের হিসেব কষে বলে, 'পাঁচ সাল আগে।'

'দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচগো সাল কেটে গেল!'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে কী বলতে যাচ্ছিল মোটেরাম, তার আগেই আবার উত্তুরে হাওয়ায় মাইকের শব্দ ভেসে আসে।

যেদিক থেকে ভোলেচাঁদের মিছিল এসেছিল সেদিক থেকেই আওয়াজটা আসছে।

বাঁধের ওপর থেকে মোটেরামেরা চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। চুহালাল অবাক হয়ে বলে, 'ফির মাইক!'

ততক্ষণে দ্বিতীয় মিছিলটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। এবার আর সাইকেল রিকশা এবং জিপ নয়, পঁচিশ তিরিশটা টাঙ্গা আস্তে আস্তে লাইন করে আসছে। একেবারে প্রথম টাঙ্গাটায় মাইক হাতে রোগা চিমড়ে চেহারার একটা লোক অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

'বজরঙ্গীলালজিকো—'

পেছনের টাঙ্গাগুলোতে অনেকগুলো ছোকরা দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। তারা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ভোট দিজিয়ে, ভোট দিজিয়ে—'

এই শোভাযাত্রার সব চেয়ে দর্শনীয় বস্তু হল সামনের দিক থেকে দু নম্বর টাঙ্গাটা। সেটাতে কোচোয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং বজরঙ্গীলাল। লোকটা রোগা এবং বেজায় ঢ্যাঙা। ঘোড়ার মতো মুখ তার। অস্বাভাবিক লম্বা বলে রীতিমতো কুঁজো দেখায়। গলাটা ধড় থেকে হাতখানেক উঁচুতে। টেরাবেঁকা মুখ। হুঁকোর খোলের মতো মাথার চাঁদিতে অল্প চুল রয়েছে। এ ছাড়া দু'পাশে একেবারে কান পর্যন্ত ক্ষুর দিয়ে চেঁছে সাফ করে ফেলা হয়েছে। সিঁথিটা মাথার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। লোকটার পরনে ধুতি, ডবল-কাফ দেওয়া ফুল শার্টের ওপর আলপাকার গলাবন্ধ কোট। দুই কানের লতিতে সোনার মাকড়ি। গাঁটপাকানো আঙুলে হিরে পান্না চুনি ইত্যাদি মিলিয়ে চার পাঁচটা আংটি। বাইরে থেকে যা দেখা যায় না তা হল কোমরে এবং হাতের বাজুতে চার-পাঁচটা তাবিজও রয়েছে।

বজরঙ্গীলাল কেহরগঞ্জের মোটামুটি পয়সাওলা লোক এবং নাম-করা কৃপণ। এই টাউনে তিন চারটে পাকা কোঠি আছে তার। সেগুলো থেকে ভালো ভাড়া পায়। তা ছাড়া সুদে টাকা খাটিয়েও প্রচুর পয়সাকড়ি করেছে। কিন্তু পল্‌টিকস অর্থাৎ রাজনীতিতে এখন অঢেল পয়সা, তাই ভোলেচাঁদের মতো সে-ও চুনাওতে নেমেছে।

উটের মতো বিদঘুটে চেহারার খ্যাতিমান কৃপণ এই লোকটা নির্বাচনে নেমেছে, এরকম চমকপ্রদ ঘটনা কেহরগঞ্জের ইতিহাসে খুব বেশি একটা ঘটে নি।

সেই চিমড়ে লোকটা আবার চেঁচায়, 'সমাজসেবী বজরঙ্গীলালকো—'

'মদত কর, মদত কর।'

চিমড়ে লোকটা ভোলেচাঁদের নির্বাচনী এজেন্টের মতো একটা পোস্টার তুলে ধরে। সেটাতে বজরঙ্গীলালের প্রতীক একটা বেড়ালের ছবি আঁকা রয়েছে। লোকটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'বজরঙ্গীলালজিকা চিহ্ন কা হ্যায়?'

বজরঙ্গীর অন্য চুনাও কর্মীরা গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বিল্লি বিল্লি বিল্লি—'

'বিল্লিমে—'

'মোহর মারো।'

'সমাজসেবী বজরঙ্গীলাল—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

বাঁধের ওপর বসে কেহরগঞ্জের দুই তুখোড় জুয়াড়ি তাজ্জব হয়ে বজরঙ্গীর মিছিল দেখতে থাকে। একসময় মোটেরাম বলে, 'ভোটকা তৌহার (পার্বণ) আ গিয়া—'

অন্যমনস্কর মতো চুহালাল জবাব দেয়, 'হাঁ—'

'শালে কলিযুগ বিলকুল পুরা হো গিয়া—'

'কী করে বুঝলি?'

'তেলবালা ভোলেচাঁদ দেশপ্রেমী বনে গেল! আর মক্ষিচুষ সুদখোর বজরঙ্গী বনলো সমাজসেবক! হোয় হোয় হোয়, কা আজীব দুনিয়া! দো শালে চুনাওতে নেমে আমাদের ভোট চাইতে বেরিয়েছে!'

আশেপাশে যারা ছিল তাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু এখানেই না, বিকিকিনি কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে ভোলেচাঁদ এবং বজরঙ্গীলালের চুনাওতে নামার ঘটনাটা নিয়ে গোটা কেহ্‌রগঞ্জের হাটিয়া জুড়ে আপাতত তুমুল হই চই চলছে।

বজরঙ্গীর টাঙ্গার মিছিল সামনের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে ঘুরতেই আচমকা চুহালালের মাথায় বিজলি চমকে যায়। সে বলে, 'এ মটরু—'

'কা?' মোটেরাম ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়।

'চুনাওতে কে জিতবে তোর মনে হয়—বজরঙ্গীলাল না ভোলেচাঁদ?'

'কেউ না। তেলবালা আর মক্ষিচুষ হেরে চৌপট হয়ে যাবে।'

'নেহী নেহী।'

'কা নেহী?'

চুহালাল একটু ভেবে বলে, 'আমার মনে হচ্ছে তেলবালা ভোলেচাঁদ আগেলা চুনাওতে জিতে যাবে। ওর অনেক পাইসা। জানিস না যার পাইসা আছে সে-ই চুনাওতে জেতে। না হলে আগের বার ফটেগিলাল শর্মা জিততে পারত? সিরেফ রুপাইয়ার জোরে ভোট কিনে নিল।'

কথাগুলো মোটেরামের মস্তিষ্কে ছোটখাটো ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। সে বলে, 'ঠিক বাত্‌' তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে এভাবে শুরু করে, 'হামনিকা মালুম হোতা ভোলেচাঁদ নেহী জিতেগা।'

চুহালাল চোখ কুঁচকে বলে, 'তা হলে কে জিতবে?'

'বজরঙ্গীলাল—'

'ওহী মক্ষিচুষ!'

আস্তে ঘাড় হেলিয়ে মোটেরাম বলে, 'হাঁ।'

কেউ, বিশেষ করে মোটেরাম তার কথায় সায় না দিলে ভীষণ খেপে যায় চুহালাল। চড়া গলায় সে বলে, 'কী করে বুঝলি?'

'বজরঙ্গীর বহোত পাইসা।' বলে পকেট থেকে কাঁচা তামাক এবং চুন বার করে বাঁ হাতের তেলোতে ডলে ডলে খৈনি বানিয়ে ফেলে। খানিকটা নিজে রেখে বাকিটা চুহালালের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

চুহালাল তার খৈনিটা নিচের পাটির দাঁত এবং ঠোঁটের মাঝখানে পুরে বলে, 'কভী নেহী। জিতবে তেলবালা। ওর এত্তে পাইসা যে কেহ্‌রগঞ্জের পুরা ভোট কিনে নিতে পারে।'

'নেহী'— কোনওভাবেই চুহালালের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব হয় না মোটেরামের। তার ধারণা মক্ষিচুষ সুদখোর বজরঙ্গীলালের টাকা ভোলেচাঁদের চেয়ে অনেক, অনেক গুণ বেশি।

দুব্‌লা পাতলা কমজোরি চুহালালের চেহারা যেমনই হোক, তেজটা মারাত্মক। কারণে অকারণে তার মেজাজ চড়ে যায়। বাঁধ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে চোখ লাল করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে চেঁচায়, 'শালে কুত্তা, আমি বলছি তেলবালার পাইসা বেশি। ভোলেচাঁদ জরুর জিতেগা।'

মোটেরামও কম যায় না। সে-ও হ্যাঁচকা টানে বিপুল শরীরটাকে নিচে নামিয়ে, গলার শিরা ছিঁড়ে চিৎকার করতে থাকে, 'শালে ভূচ্চর কাঁহিকা, আমি বলছি মক্ষিচুষের জ্যাদা পাইসা। চুনাওতে সে-ই জিতবে।' বলে বাঁধের ওপর প্রচণ্ড জোরে থাপ্পড় মারে।

সেই ছেলেবেলা থেকে দু'জনের গাঢ় বন্ধুত্ব। একটা দিনও একজনকে ছাড়া আরেক জনের চলে না। আবার প্রতি মুহূর্তে তাদের আকচাআকচি, ঝগড়াঝাঁটি এবং হল্লাবাজি। একেক দিন মারপিটও হয়ে যায়, তখন কথাবার্তা বন্ধ থাকে। কিন্তু দু'জনের বন্ধুত্বের ভিত এতই মজবুত যে দু'দিন যেতে না যেতে আবার গলায় গলায় ভাব।

চুহালালও ছাড়ার পাত্র নয়। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে সেও বাঁধের ওপর চাপড় মেরে বলে, 'ঠিক হ্যায়, বাজি হয়ে যাক। আমি বলছি তেলবালা জিতবে।'

মোটেরামও চুহালালের মতোই গলা চড়ায়, 'হোক বাজি। আমি বলছি মক্ষিচুষ জিতবে,

তাস, কৌড়ি এবং বালা থেকে শুরু করে এমন কোনো জুয়া নেই যা চুহালাল আর মোটেরাম খেলে না। শুধু তাই না, দুনিয়ার সব কিছুর ওপর ওরা বাজি ধরে। আকাশের উড়ন্ত পাখি পুব দিকে যেতে যেতে উত্তরে ঘুরে যাবে কিনা, ফির্তুপ্রসাদ মাড়োয়ারির সাদা ঘোড়ার ক'টা দাঁত আছে, জেঠ মাহিনার কোন তারিখে বারিষ নামবে, জঙ্গিলাল গাড়োয়ানের পুতহুর ছেলে হবে না মেয়ে হবে, ইত্যাদি নানা ব্যাপারেই বাজি ধরে বসে।

চুহালাল বলে, 'কেত্তে বাজি? বাতা বাতা -- '

মোটেরামের চেহারাটা হাতির মতো বিশাল হলেও ভেতরে ভেতরে সে একটি মিটমিটে হারামজাদা। তার মাথায় সারাক্ষণ খুব সূক্ষ্ম ধরনের শয়তানি চলছে। মোটেরাম বলে, 'জরু বাজি -- '

প্রথমটা বুঝতে পারে না চুহালাল। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলে, 'মতলব?'

'মতলব আমি হারলে আমার জরু তোর হয়ে যাবে। তুই হারলে তোর ঘরবালী আমার ঘরে চলে আসবে। কা রে, রাজি?'

বাজির ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই রাগে চিড়বিড়িয়ে ওঠে চুহালাল, 'গিদ্ধড় ভুচ্চরকা ছৌয়া, তোর হাতির মতো ঘরবালী আমার ঘাড়ে গছাতে চাস! পাঁচগো বাচ্চা পয়দা করে ওই আওরাতটার আছেটো কা? আর আমার ঘরবালী পরী য্যায়সা। একগো বাচ্চা এখনও পয়দা করেনি। শালে হারামজাদ কাঁহিকা---' শেষ গালাগালটা আবার মোটেরামের উদ্দেশে।

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছে চুহালাল। মোটেরামের জেনানা অর্থাৎ স্ত্রী তার সঙ্গে জুড়ি মিলিয়ে আরেকটি চর্বির পাহাড়। তার চেহারায় না আছে ছিরিছাঁদ, না তার স্বভাবে এতটুকু মাধুর্য। সাত আট বছরে পাঁচ পাঁচটা বাচ্চার জন্ম দিয়ে একেবারে বেঢপ হয়ে গেছে সে। তা ছাড়া মেজাজটা মারাত্মক। সর্বক্ষণ তেরিয়া হয়েই থাকে। দিনরাত তার মুখ চলে, কর্কশ গলায় এমনই চেঁচায় যে বাড়ির আধ মাইলের মধ্যে কাক-চিল ঘেঁষতে পারে না। সেদিক থেকে চুহালালের জেনানা ডানাকাটা পরী না হলেও তাকে সুন্দরীই বলা যায়। পাতলা কোমর, নাকমুখ কাটা কাটা, বড় বড় টানা চোখ, মাথায় প্রচুর চুল। জোড়া বেলের মতো দৃঢ় সুগোল দুই স্তন, কোমরের তলার দিকটা সুঠাম এবং বিশাল। ভারী উরু, রংটি মাজা কাঁসার মতো। শরীরে এক ছটাক বাজে চর্বি নেই। সে যখন কোমর নাচিয়ে হাঁটে আর চোখ ঘুরিয়ে তেরছা নজরে তাকায় তখন চারপাশের মানুষের বুকে যেন বিজলি খেলে যায়। বাজিতে হেরে এইরকম খুবসুরত চটকদার ঘরবালীকে কিছুতেই খোয়াতে চায় না চুহালাল। আর জিতলে সে পাবে কিনা একটা 'হাথী য্যায়সা' চর্বির ঢিবি। তার ঘাড়ে সারা জীবনের জন্য একটি পাহাড় চেপে যাবে। হার জিত দু'দিক থেকেই তার বিরাট ক্ষতি।'

মোটেরাম মিটিমিটি হেসে বলে, 'তা হলে বাজিটা কী হবে?'

'তিনশো রুপাইয়া।' চুহালালের মুখ ফসকে এই বিরাট টাকার অঙ্কটা বেরিয়ে আসে।

তারা এমনিতে দু পাঁচ টাকার বেশি বাজি ধরে না। তিনশো টাকা শুনে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে মোটেরাম। ব্যাপারটা তার কানে এতই অবিশ্বাস্য ঠেকে যে আবার জিজ্ঞেস করে, 'কী বললি?'

চুহালাল খেঁকিয়ে ওঠে, 'কানে শুনতে পাস না? বহির (কালা) বন গিয়া, কা?'

মোটেরাম একটু চিন্তা করে বলে, 'হেরে গেলে তিনশো রুপাইয়া দিবি তো?'

বাঁধের ওপর আরেক বার প্রচণ্ড চাপড় কষিয়ে চুহালাল বলে, 'জরুর। মরদকা বাত হাঁথীকা দাঁত। গলার নলিয়া দিয়ে যা বেরিয়েছে তা আর পেটের ভেতর ঢুকিয়ে নেব না।'

মোটেরাম পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

চুহালাল ফের বলে, 'কা রে, অব গুংগা বন গিয়া? বাজিতে হারলে রুপাইয়া দিবি না?'

বাঁধানো ইটের বাঁধে মোটেরামও জোরে ঘুষি হাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'জরুর। আমাবও মরদকা বাত, হাঁথীকা দাঁত। চুনাও কবে?'

মোটেরাম পিছু না হটে সোজাসুজি যে বাজির লড়াইতে নেমে পড়েছে তাতে খুশিই হয় চুহালাল। বলে, 'হোগা এক দো মাহিনাকা বাদ—'

একসময় তিনটে চেনা লোক এসে মোটেরামকে বলে, তুরন্ত তাদের নয়া মহল্লায় পৌঁছে দিতে হবে। সওয়ারি নিয়ে মোটেরাম চলে যায়। চুহালালকেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয় না। কিছুক্ষণ পর তারও ভাড়া জুটে যায়।

দুই

দিন দশেক কেটে গেছে। এর মধ্যে কেহরগঞ্জে ভোটের বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে। অঘ্রানের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ক্রমশ উত্তেজনা এবং উত্তাপ ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।

এবার এখানে চুনাও মাঘের গোড়ার দিকে। মাঝখানে পুরো দেড় মাস সময়ও নেই। আর ভোলেচাঁদ এবং বজরঙ্গীলাল শুধু এই দু'জন প্রার্থীই আগামী নির্বাচনে নামে নি, বড় বড় রাজনৈতিক দলের আরো পাঁচজন ক্যান্ডিডেট কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। তাদের দু-তিনজনের অঢেল পয়সা, চুনাওতে খাটার জন্য লোকজনও প্রচুর। এই নির্বাচনী যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কে জিতে বেরিয়ে আসবে, আগেভাগে বলা খুবই মুশকিল।

সারাদিন কেহরগঞ্জের কাঁচা সড়কে ধুলো উড়িয়ে সাত সাতজন ক্যান্ডিডেটের সাইকেল রিকশা বা টাঙ্গার মিছিল চলেছে। সেই সঙ্গে চলেছে পদযাত্রা। ফলে এত ধুলো উড়ছে যে কেহরগঞ্জের আকাশে সারাক্ষণ সেগুলো হাতখানেক পুরু স্তরের মতো জমে থাকে। মিছিল, পদযাত্রা ছাড়া চলছে মিটিং। বিরাট বিরাট জনসভায় মাইক ফাটিয়ে গাঁক গাঁক করে প্রার্থীরা এবং তাদের দলবল প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচ বছর পর চুনাও আসে, চুনাও যায়। কেহরগঞ্জে এখন পঞ্চবার্ষিকী উত্তেজনা বা তৌহার। দিবারাত্রি চারিদিকে গানের ধুয়োর মতো শোনা যাচ্ছে, 'ভোট দো, ভোট দো—'

অন্য ক্যান্ডিডেটদের নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই মোটেরাম এবং চুহালালের। মোটেরামের নজর মক্ষিচুষ সুদখোর বিদঘুটে চেহারার বজরঙ্গীলালের ওপর। আর চুহালাল চোখ রেখেছে ভেজিটেবল তেলবালা ভোলেচাঁদের দিকে।

নির্বাচনের তারিখ যত এগিয়ে আসছে ততই তাদের বুকের 'তড়পনা' বেড়েই চলেছে।

আরো একটা ব্যাপারে দু'জনের রাতের ঘুম বিলকুল ছুটে গেছে। কেননা চুহালাল এবং মোটেরাম অতীব সৎ আর নিষ্ঠাবান জুয়াড়ি। বাজির যে-টাকাটা তারা একবার কবুল করে বসেছে সেটা প্রাণ গেলেও দিতেই হবে। অথচ তাদের ঘরে জমানো ফুটো পয়সাও নেই। জুয়ায় সর্বস্ব খুইয়ে টাঙ্গার গাড়ি ঘোড়া দুইই বেচে দিতে হয়েছে। কিন্তু দু'জনেই তাল ঠুকে গলাবাজি করে জানিয়ে দিয়েছিল, মরদকা বাত, হাঁথীকা দাঁত। তাই বাজি ধরার দিন থেকে তারা প্রাণপণে দিনরাত টাঙ্গা ছুটিয়ে, সওয়ারি বয়ে অনেক বেশি খেটে চলেছে। বাড়তি কামাইয়ের টাকাটা তারা জমিয়ে রাখছে। চুনাওর ফলাফল না বেরুনো পযন্ত দু'জনে প্রতিজ্ঞা করেছে এক দান জুয়া তো খেলবেই না, জুয়ার আড্ডার এক মাইলের মধ্যেও যাবে না। ক'দিনে যেটুকু জমিয়েছে, জুয়ায় হেরে গেলে মরদের বাত আর হাতির দাঁত থাকবে না। মোট কথা, আর পঁয়ত্রিশ চল্লিশ দিনের ভেতর নগদ তিনশোটি টাকা জমিয়ে ফেলতেই হবে।

হাটের দিন সিগরা নদীর পারে পিপর গাছগুলোর তলায় টাঙ্গার আড্ডায় দু'জনের দেখা হয়। অন্য দিন শহরের মাঝমধ্যিখানে চক বাজারে যে টাঙ্গার স্ট্যান্ডটা আছে সেখানে ভোর হতে না-হতে তারা সওয়ারির আশায় এসে বসে থাকে।

চোখাচোখি হলেই চুনাওয়ের কথা। মোটেরাম বলে, 'বজরঙ্গীলাল জরুর জিতেগা। যা পাইসা খরচা করছে, ভাবতে পারবি না। ভলিন্টারদের সুবেহ্ খাওয়াচ্ছে পুরী হালোয়া আউর গুলাবজামুন, দুফারে বঢ়িয়া ভাতকা ভোজন, রাতমে পরেঠা ভাজি বুন্দিয়া বালুসাই। ভলিন্টাররা চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বজরঙ্গীজির জন্যে গলা দিয়ে খুন নিকলে দিচ্ছে।'

চুহালাল হাওয়ায় হাত নাচাতে নাচাতে বলে, 'তোর মক্ষিচুষ কেত্তে পাইসা আর খরচা করবে! জেতার জন্যে টাকা ওড়াচ্ছে তেলবালা ভোলেচাঁদজি। যা খিলাচ্ছে পিলাচ্ছে, সে-সব নাম তোর চোদ্দ পুরুষেও কানে শোনে নি। চোখে দ্যাখে নি। পুলাও, মালাই, কলাকন্দ, কলকাত্তাকা রাজভোগ, বাদাম বরফি, পিস্তা—'

মোটেরাম নাকের ভেতর ঘুঁত ঘুঁত আওয়াজ করে। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, 'যা যা শালে, তেলবালা খিলাবে এসব!'

খেপে আগুন হয়ে যায় চুহালাল, 'তেলবালা খিলাবে না তো কি তোর বাপ খিলাবে!'

এরপর তুমুল বচসা শুরু হয় দ'জনের। বচসাটা কোনও কোনও দিন হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। অবশ্য তা আর কতক্ষণ! দু-চার ঘণ্টা পর আবার গলায় গলায় ভাব হয়ে যায়।

তিন

আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। চুনাও-এর তারিখ দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। কেহরগঞ্জের আবহাওয়ায় এখন প্রবল উত্তেজনা আর উত্তাপ। মিটিং মিছিল এবং পদযাত্রা আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। স্লোগানে স্লোগানে এখানকার আকাশ চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

চুনাও যত এগিয়ে আসছে, মোটেরাম এবং চুহালালের উত্তেজনাও ততই চড়ছে। স্নায়ুগুলো সারাক্ষণ তাদের টান টান হয়ে থাকে। নির্বাচন আর তিনশো টাকার বাজি দু'জনের মাথায় চেপে বসে গেছে যেন। তাদের জেদ, যেভাবেই হোক, বাজিটা জিততেই হবে।

আজকাল আর কারুর নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। যতক্ষণ সওয়ারি পাওয়া যায়, দু'জনে পাগলের মতো কেহরগঞ্জের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় টাঙ্গা ছোটায়। তার ফাঁকে ফাঁকে

মোটেরাম ছোটে বজরঙ্গীলালের মিছিলে বা মিটিংয়ে। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে সে-ও 'ভোট দো ভোট দো' করে গলা ফাটাতে থাকে। আসলে বজরঙ্গীর চুনাও-কর্মীদের ওপর সে পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছে না। উত্তেজনাটা তার এত প্রচণ্ড যে বজরঙ্গীকে জেতাবার জন্য ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যতটা পারে কাজ করে দেয়। কখনও পোস্টার সাঁটে, কখনও বা স্লোগান দিতে দিতে গলা চিরে ফেলে। এ-ব্যাপারটা সে করে যাচ্ছে অত্যন্ত গোপনে। কোনওভাবেই যাতে চুহালাল টের না পায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ার থাকে।

মোটেরাম জানে না, চুহালালও তার মতোই লুকিয়ে চুরিয়ে ভোলেচাঁদের জন্য খেটে যাচ্ছে। তারও একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, তেলবালাকে নির্বাচনে জেতাতে হবে।

কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত জানাজানি হয়ে যায়। একদিন ভোরে টাঙ্গা নিয়ে মোটেরাম চক বাজারে আসতেই চুহালাল তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। দাঁত খিঁচিয়ে, হাত নেড়ে, চোখমুখের উগ্র ভঙ্গি করে প্রথমে তোড়ে খানিকক্ষণ খিস্তি করে নেয় সে। তারপর বলে, 'শালে গিদ্ধড়কে ছৌয়া, চুপকে চুপকে মক্ষিচুষের ভলিন্টার বনেছিস! তুই চেল্লালেই সুদখোরটা জিতে যাবে?'

মোটেরামের কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। সে পকেট থেকে জং-ধরা চৌকো কৌটো বার করে। ওটার ভেতর তামাক পাতা আর চুন রয়েছে। বাঁ হাতের চেটোয় পরিমাণমতো চুন তামাক নিয়ে খৈনি ডলতে ডলতে পিট পিট করে চুহালালের দিকে তাকায়। তারপর ধীরেসুস্থে খৈনির পুরোটাই জিভের তলায় ঢুকিয়ে চোখ বুজে থাকে। একসময় চোখ মেলে পিচিক করে খানিকটা খয়েরি রংয়ের থুতু ফেলে, আস্তে আস্তে খুব মজাদার ভঙ্গিতে বলে, 'আমি মক্ষিচুষের ভলিন্টার হলে কসুর হয়ে যায়, আর তুই ভূচ্চরের ছৌয়া তেলবালার ভলিন্টার হলে কিছু হয় না— কা রে?'

চুহালাল হকচকিয়ে যায়। মোটেরাম যে তার খবরটা পেয়ে গেছে, এটা সে ভাবতে পারে নি। আরেক দফা খিস্তি গলা দিয়ে বার করতে গিয়ে সেগুলো তক্ষুনি গিলে ফেলে। স্থির চোখে মোটেরামকে দেখতে দেখতে হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠে, 'শালে কুত্তা কাঁহিকা! ঠিক হ্যায়, শোধবোধ।' একটু থেমে ফের বলে, 'তুই মক্ষিচুষের হয়ে খেটে যা, আমি খাটি তেলবালার জন্যে। দেখি কে জেতে!'

দু'জনের মধ্যে এভাবে রফা হয়ে যায়।

এরপর স্লোগান দিয়ে দিয়ে চুহালালদের গলা ফেঁসে যায়। চোখ এত লাল হয়ে ওঠে, মনে হয়, শরীরের সব রক্ত সেখানে গিয়ে জমা হয়েছে। রাত জেগে চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে।

ব্যাপারটা ধরা পড়ার পর দু'জনেই আজকাল পরস্পরকে জানায়, তাদের ক্যান্ডিডেটের কে কোথায় পদযাত্রায় বেরিয়েছিল, কোন মহল্লায় গিয়ে মিটিং করেছে, কোন কোন রাস্তায় মিছিল করে এসেছে, ইত্যাদি।

আরো কয়েক দিন পর ভয়াবহ একটা খবর নিয়ে আসে মোটেরাম, 'সত্যনাশ হয়ে গেছে রে চুহা—'

চুহালাল ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'কা?'

'মালুম হচ্ছে, মক্ষিচুষের পাইসা খতম হয়ে গেছে।' মোটেরামকে ভীষণ বিমর্ষ দেখায়।

চুহালাল সামনের দিকে ঝুঁকে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'কী করে বুঝলি?'

মোটেরাম জানায়, চুনাও-এর খরচ চালাবার জন্য বজরঙ্গীলাল দু-তিনটে বাড়ি নাকি বেচে দিয়েছে। সে বলেছে, 'এম্লে' হতে পারলে ওরকম পঞ্চাশটা বাড়ি করে ফেলতে পারবে। আর কোনওভাবে 'মনিস্টার' হতে পারলে পুরা কেহরগঞ্জটাই কিনে নেবে।

মোটেরাম যা জানে না তা হল এইরকম। এবার কোনও পলিটিক্যাল পার্টিরই এককভাবে সরকার বানানো খুবই কষ্টকর। তখন নির্দল এম. এল. এ-দের নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তাই চুনাওতে জেতার জন্য বজরঙ্গীলালের মতো ক্যান্ডিডেটরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাচ্ছে। সর্বস্ব খরচ করে, এমনকি বাড়িঘর বেচে ধারধোর করেও যদি কোনওরকমে এম. এল. এ-টা হওয়া যায় তা হলে খরচের বিশ গুণ তুলে নিতে পারবে।

চুহালাল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে, তবে কিছু বলে না।

দিন তিনেক পর চুহালালও প্রায় একই রকম খবর নিয়ে আসে। তেলবালা ভোলেচাঁদও নির্বাচনের খরচ মেটাতে তার সবগুলো টাঙ্গা এবং বয়েল গাড়ি বেচে দিয়েছে। তারও মরণপণ জেদ, যেভাবে হোক এম. এল. এ হতেই হবে। ভোলেচাঁদেরও বিরাট আশা, মিনিস্টার সে হবেই।

চার

চুনাও এর আর চার দিন বাকি। এর মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মোটেরাম এবং চুহালালের গলা একেবারে বসে গেছে। কথা বললে ফ্যাঁসফেসে একটু আওয়াজ বেরোয় মাত্র। চোখ যেন রক্তের ডেলা। চোখের তলার কালি আরো গাঢ় হয়েছে। মোটেরামের কোমরে ক' বছর ধরে বাতের ব্যথা চলছে, সেটা এখন ভীষণ চাগিয়ে উঠেছে। এদিকে ঠাণ্ডা টাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়ে বসেছে চুহালাল। বাত এবং জ্বরে কাবু হলেও তারা কি আর ঘরে বসে আছে, না এটা ঘরে বসে থাকার সময়? দিনরাত তারা যেন পায়ে চাকা বেঁধে ঘুরছে। বাজিটা জিততেই হবে।

একটি মাস 'গতব চুরণ' খেটে দু'জনেই বাজির তিনশোটি টাকা জমিয়ে ফেলেছে। সেদিক থেকে একটা দুশ্চিন্তা অন্তত কেটেছে। এখন যে-ই হারুক, নাকের ওপর টাকাটা ছুড়ে দিতে পারবে। তবু হারতে কে আর চায়?

এদিকে বজরঙ্গীলালকে চুনাও-এর খরচ জোগাতে আরো ক'টা বাড়ি বেচে দিতে হয়েছে। ভোলেচাঁদ তার বনস্পতি তেলের দোকান এক মারোয়াড়ির কাছে বাঁধা দিয়েছে। এই চুনাওতে হারলে তারা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কোমর সিধে করে জীবনে আর দাঁড়াতে হবে না। কাজেই প্রার্থী এবং দুই জুয়াড়ির মধ্যে এখন মারাত্মক যুদ্ধ চলছে।

শেষ পর্যন্ত চুনাও হয়ে গেল। পরের দিন রেজাল্ট বেরুবে কেহরগঞ্জ কালেক্টরেট অফিস থেকে।

নির্বাচনের দিন প্রতিটি 'বুথে' উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে দুই জুয়াড়ি। আঁচ করতে চেষ্টা করেছে তাদের ক্যান্ডিডেটদের পক্ষে কিরকম ভোট টোট পড়ছে। পরের দিন ভোর হতে না হতেই কালেক্টরেট অফিসে গিয়ে তারা হাজির। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোট গোনা শুরু হয়। মানুষের ভিড়ে এবং উত্তেজনায় জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠতে থাকে। চুহালাল এবং মোটেরামের হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন কখনও দারুণ বেড়ে যায়, কখনও থেমে আসে।

বিকেল চারটেয় মাইকে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ভোলেচাঁদ এবং বজরঙ্গীলাল

দু'জনেই হেরে ভূত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এত কম ভোট পেয়েছে যে তাদের জামানতও পুরোপুরি জব্দ।

রেজাল্ট শোনার পর কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থাকে দুই জুয়াড়ি। তারপর আচমকা জোরে শ্বাস ফেলে প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, 'যাক, আমরা বাজি হারিনি। তিনশো রুপাইয়া বিলকুল বচ্ গিয়া। মরুক শালে তেলবালা আউর মক্ষিচুষ।'

এই নির্বাচনে কে জিতল তা নিয়ে তাদের আর আদৌ মাথাব্যথা নেই। দুই জুয়াড়ি হাত ধরাধরি করে নিজের নিজের টাঙ্গার দিকে চলে যায়।

শেষ যাত্রা

পড়ন্ত বেলায় উত্তুরে হাওয়ার মুখে কুটোর মতো লাট খেতে খেতে খবরটা নিয়ে এল লগা, 'সব্বোনাশ হয়ে গেচে গ মাসিরা—'

কলকাতা থেকে অনেক দূরে অখ্যাত এই মফস্বল শহরটার নাম মহারাজপুর। তার এক কোণে ওঁচা মেয়েমানুষদের যে সৃষ্টিছাড়া কলোনিটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে সেটা চকিত হয়ে উঠল।

কলোনি আর কি, একটা চৌকো উঠোন ঘিরে ফুটিফাটা টিনের চালের কোমর-বাঁকা সারি সারি সাতাশটি ঘর, সেগুলোর সামনে দিয়ে টানা বারান্দা। পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য ছাব্বিশটা মেয়েমানুষ এখানকার একটি করে ঘরের স্থায়ী বাসিন্দা। সাতাশ নম্বর ঘরটা এই কলোনির স্বত্বাধিকারিণী বা মালকিন কেষ্টভামিনীর।

মেয়েমানুষগুলোর বেশির ভাগেরই ফুল বা পাখির নামে নাম। তারা কেউ চাঁপা, কেউ জবা, কেউ মালতী, কেউ টিয়া, ময়না বা কোকিলা। বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের ভেতর। তাদের জীবনযাপনের স্পষ্ট ছাপ পড়েছে তাদের ক্ষয়াটে চেহারায়। ভাঙা গাল, চোখের তলায় চিরস্থায়ী কালির পোঁচ, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

শীতের বিকেল ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। এর মধ্যে মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। সূর্য ডুবতে আর দেরি নেই। হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতো পশ্চিমের আকাশ আরক্ত হয়ে আছে। কিন্তু কতক্ষণ আর, দেখতে দেখতে শীতের সন্ধে নেমে আসবে ঝপ করে। চরাচর ঢেকে যাবে হিমে আর অন্ধকারে।

এই মুহূর্তে উঠোনের মাঝখানে বিকেলের নিভু নিভু রোদের আঁচ গায়ে মেখে মেয়েমানুষগুলো কেউ খোঁপা বেঁধে রুপোর কাঁটা গুঁজে দিচ্ছিল, কেউ ঠোঁটে রং ঘষে, মুখে পাউডার আর সস্তা ক্রিম লাগিয়ে ক্ষয়ের চিহ্নগুলো ঢাকছিল। চেহারায় চটক না ফোটালে রাতের নাগরেরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

সন্ধে নামলেই লুচ্চা-মাতালেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে হানা দেবে। রাত যত বাড়বে, জমে উঠবে নরকের এই খাসতালুক। তারই প্রস্তুতি চলছে সারা বিকেল ধরে।

মেয়েমানুষগুলো যেখানে বসে আছে সেখান থেকে খানিকটা দূরে নিজের ঘরের সামনের দাওয়ায় বসে একা সাপলুডো খেলছিল কেষ্টভামিনী। বেঢপ মাংসল চেহারা তার, একেবারে

ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। গায়ের কালো রংটি যেন পালিশ করা, এমনই তার জেল্লা। চাকার মতো গোল মুখ, বড় বড় লালচে চোখ, থুতনির তলায় চর্বির তিনটি পুরু থাক। নাকে সোনার ফাঁদি নথ, কানে মাকড়ি, গলায় তেঁতুল-পাতা হার। কেষ্টভামিনীর দাপটে গোটা মেয়েপাড়াটা সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে।

লগা ঘুণে-খাওয়া সদর দরজাটা পেরিয়ে উঠোনের মাঝ বরাবর চলে এসেছিল। ফের সে পাগলের মতো হাউমাউ করে ওঠে, 'এ কী হল গ!'

লগার গলার স্বরে এমন তীব্র আকুলতা ছিল যে সাতাশ জোড়া চোখ তার দিকে চকিতে ঘুরে তাকায়।

লগার বয়স উনিশ কুড়ি। রোগা ডিগডিগে পোকায়-কাটা চেহারা, গালে খাপচা খাপচা নরম দাড়ি, জট-পাকানো রুক্ষ চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেগুলোর সঙ্গে সাত জন্ম চিরুনি বা তেলের সম্পর্ক নেই। তার পরনে তালি-মারা ফুলপ্যান্ট আর হাত-কাটা ফতুয়া ধরনের জামা।

এখন যারা এ-পাড়ার বাসিন্দা তাদের আগের জেনারেশানের একটি মেয়েমানুষ একদা লগাকে জন্ম দিয়েছিল। সেই গর্ভধারিণী কবেই মরে ফৌত হয়ে গেছে কিন্তু লগা এখানেই পড়ে আছে। তার মতো বেজন্মা, বিষ্ঠার পোকাদের এই নরক ছাড়া যাবার জায়গাই বা কোথায়? চাঁপা, জবা, ময়না, টিয়া, এখানকার সবাই তার মাসি। দিনরাত সে তাদের ফাই-ফরমাশ খাটে, তার বদলে একেক দিন একেক জনের কাছে খেতে পায়। বারান্দা থেকে কেষ্টভামিনী বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই রে মড়াখেগো, অমন চেল্লাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে পষ্ট করে বল।'

লগা বলে, 'বাবামাশায় বুঝিন আর বাঁচবে নি গ মাসিরা, তেনার মুখ দে গ্যাঁজলা বারুচ্চে, চোখ উলটে গেচে।'

মুহূর্তে গোটা মেয়েপাড়াটা একেবারে ঝিম মেরে যায়। এমন যে জবরদস্ত কেষ্টভামিনী, যার গলার আওয়াজে এ-পাড়ার ত্রিসীমানায় কাক চিল ঘেঁষে না, সে পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

লগা আরও ক'পা এগিয়ে কেষ্টভামিনীর কাছাকাছি চলে আসে। ব্যাকুলভাবে বলে, 'বসে থেকো নি গ কেষ্টমাসি, শীগ্‌গিরি চল। দ্যাকো যদিন বাবামাশায়রে বাঁচাতি পার।'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফোটে কেষ্টভামিনীর। সে শুধোয়, 'বাবামাশায়ের অমন অবস্তা, তুই জানলি কী করে?'

'বা রে, বিকেল বেলা আমি ওনার ডাক্তেরখানা সাফ করতে যাই না?'

কেষ্টভামিনীর এবার খেয়াল হয়, এ-পাড়ার মেয়েমানুষদের হাজার রকম হুকুম তামিল করার পর সকাল বিকেল, দু'বেলা বাবামাশায়ের ডাক্তারখানায় গিয়ে ঝেড়েমুছে সব ফিটফাট করে দেয় লগা, তার জন্য রাস্তার টিউবওয়েল থেকে কুঁজোয় ভরে জল নিয়ে আসে, কোনও কোনও দিন কেরোসিন কুকারে চাট্টি ভাতও ফুটিয়ে দেয়। আজ এবেলা গিয়ে বাবামাশায়কে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে চলে এসেছে।

কেষ্টভামিনী আর বসে থাকে না, ধড়মড় করে উঠে পড়ে। নিজের ঘরে ঢুকে টিনের তোরঙ্গ থেকে কিছু টাকা বার করে আঁচলে বেঁধে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে বলে, 'চল।'

অন্য মেয়েমানুষগুলো ততক্ষণে উঠোনের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে তারা কেষ্টভামিনীকে বলে, 'আমরাও যাব কেষ্টমাসি।'

আর কিছুক্ষণের মধ্যে এ-পাড়ায় খদ্দেরদের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে। সারারাত শরীর বেচে মেয়েমানুষগুলো যা পায়, এলাকার মালকিন হিসেবে তার চার ভাগের এক ভাগ

কেষ্টভামিনীর প্রাপ্য। এখন যদি ওরা তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, আজকের ব্যবসাটি একেবারে মাটি। ছাব্বিশটি মেয়েমানুষের রাতভর রোজগারের সিকিভাগ তো কম কথা নয়। মনে হচ্ছে আজ আর সে আশা নেই। অনেকগুলো টাকা পুরো বরবাদ।

অন্যদিন এ-সময় কেউ বেরুবার কথা মুখে আনলে মাথায় আগুন ধরে যেত কেষ্টভামিনীর। চেঁচিয়ে, গালাগাল দিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত সে। কিন্তু বাবামাশায়ের কথা আলাদা। তার জন্য একদিন কেন, দশদিন ব্যবসা বন্ধ রাখা যায়। ওই লোকটার কাছে এ-পাড়ার বাসিন্দাদের ঋণের শেষ নেই। তার সম্বন্ধে এমন একটা খারাপ খবর শোনার পর কেউ কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে?

কেষ্টভামিনী বলে, 'আচ্ছা চল—'

মেয়েমানুষগুলো যে জামাকাপড়ে ছিল তাই পরেই, নিজের নিজের ঘরে তালা লাগিয়ে কেষ্টভামিনী আর লগার সঙ্গে বেরুতে যাবে, এমন সময় বাধা পড়ে। উটকো দু-একটা খদ্দের এর মধ্যেই দিশি মদ গিলে টং হয়ে হানা দেয়। মানুসের আদিম প্রবৃত্তির তো বিনাশ নেই। এই জন্তুগুলো দিনরাতের বাছবিচার করে না।

একটা মাঝবয়সী লোক, তার নাম মহীন, ভারী থলথলে চেহারা, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, চোখের তলায় কালি, দৃষ্টি ঢুলুঢুলু এবং আরক্ত, এ-অঞ্চলে একটি ছোট যাত্রাদলের মালিক, জড়ানো গলায় বলে, 'ই কী, মিছিল করে সব চললে কুথায়!'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আজ আমাদের ক্ষেমা করেন মহীনবাবু, কাল আসবেন।'

মহীন চিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'শরীল তেতে উঠল আজ, আর চান করব কিনা কাল! মাই'র আর কি!'

তার সঙ্গী একটা ক্ষয়াটে চেহারার লোক নেশার ঘোরে সমানে টলছিল। ডাইনে বাঁয়ে এলোমেলো পা ফেলে কোনও রকমে নিজেকে খাড়া রেখেছে সে। কেষ্টভামিনীর থুতনির কাছে হাত ঘুরিয়ে বলে, 'সোনামণি, যে দোকান খুলেচ তার ঝাঁপ বন্ধ করা যায় না। কত টাকা চাও, অ্যাঁ? এই লাও।' বলে পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে হাওয়ায় নাচাতে থাকে।

কেষ্টভামিনীর মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু শত হলেও খদ্দের লক্ষ্মী, তাদের চটানো ঠিক নয়। যতটা সম্ভব শান্ত মুখে বলে, 'দয়া করে আজ আপনারা যান।'

মহীন ওধার থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যাব মানে! মোজ করার জন্যি এলাম, মেজাজটা চটকে দিওনি।'

এদিকে একটা নিরেট চেহারার লোক টগর নামে মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়, 'চল শালী, ঘরে চল।'

এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না কেষ্টভামিনী। তার ভেতর থেকে মেয়েপাড়ার জাঁদরেল স্বত্বাধিকারিণীটি বেরিয়ে আসে। আগুনখাকীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরেট লোকটার হাত থেকে টগরকে ছিনিয়ে নিতে নিতে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করতে থাকে, 'অ্যাই পুষ্প, অ্যাই টিয়া, তোরা হাঁ করে দেকছিস কী! লুচ্চো জানোয়ারগুলোনরে গলাধাক্কা দে বার করে দে।'

কেষ্টভামিনীর হুকুমটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েমানুষগুলো মহীনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। সেই সঙ্গে দুই পক্ষে চলতে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত কিছু গালাগালির আদানপ্রদান।

একদিকে চারটে নেশাখোর মাতাল, আরেক দিকে সাতাশটা মেয়েমানুষ। হোক মেয়ে, এত

জনের সঙ্গে চারজন পারবে কেন? টেনে হেঁচড়ে টগরেরা তাদের বাইরে বার করে দিয়ে নিজেরাও বেরিয়ে পড়ে।

মেয়েমানুষদের এই পাড়াটা মহারাজপুরের শেষ মাথায়। এর বাঁ পাশ দিয়ে একটা মজা নদী বয়ে গেছে। নদীটার পারে শ্মশানঘাটা, পুরনো শিবমন্দির।

পাড়াটার ডান পাশ দিয়ে একটা খোয়া-ওঠা আঁকাবাঁকা রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটার দু'ধারে ধানকল, সুরকি কল, লেদ মেশিনের ছোটখাটো ক'টা কারখানা। আর আছে ধানচালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলো আড়ত। সেসব পেরিয়ে গেলে একটা হেলে-পড়া পুরনো ঘরে 'ভুবন ফার্মেসি'। ঘরটার মাথায় টুটোফুটো টিনের চাল। দেওয়াল আর মেঝে অবশ্য পাকা, কিন্তু চুনবালি আর সিমেন্ট খসে খসে দগদগে ঘায়ের মতো দেখায়। রাস্তার দিকের দরজার মাথায় মান্ধাতার আমলের যে সাইনবোর্ডটা তেরছা অবস্থায় ঝুলে আছে, বছরের পর বছর জলে ধুয়ে এবং রোদে পুড়ে তার বেশির ভাগটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে; দু-চারটে অক্ষর ছাড়া আর কিছুই পড়া যায় না।

'ভুবন ফার্মেসি' যার নামে সেই ভুবন চক্রবর্তী হল কেষ্টভামিনীদের বাবামাশায়। এই ফার্মেসি বা ডাক্তারখানাটার পর খানিকটা জায়গা জুড়ে আগাছায় ভরা একটা উঁচুনিচু মাঠ। মাঠের ওপার থেকে শুরু হয়েছে মূল শহর। আসলে মহারাজপুরের সুখী সংসারী মানুষেরা মেয়েপাড়া আর 'ভুবন ফার্মেসি'র ছোঁয়াচ থেকে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। যারা কোনও বিশেষ কারণে ধানকল, সুরকি কল বা শ্মশানঘাটার দিকে চলে আসে, দ্রুত কাজ টাজ শেষ করে ফিরে যায়। এখানকার বিষাক্ত আবহাওয়ার ভাইরাস যাতে কামড় দিতে না পারে সেজন্য তাদের সতর্কতার শেষ নেই।

মেয়েপাড়া সম্পর্কে মহারাজপুরবাসীদের মনোভাব না হয় বোঝা যায় কিন্তু 'ভুবন ফার্মেসি'র ব্যাপারে কেন তাদের এত ঘৃণা, নোংরা জীবাণুর মতো কেন তারা ওটাকে এড়াতে চায়, সে কথা পরে।

কেষ্টভামিনীরা যখন 'ভুবন ফার্মেসি'তে এসে পৌঁছুল, সন্ধে নামতে শুরু করেছে। ক'টি লোক ফার্মেসির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিল, খুব সম্ভব ভুবন চক্কোত্তি সম্পর্কেই। ওদের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ।

কেষ্টভামিনী লোকগুলোকে মোটামুটি চেনে, এই অঞ্চলেরই ধানকল বা সুরকি কল-টলের মজুর। ওরা নিশ্চয়ই বাবামাশায়ের খবরটা পেয়ে ছুটে এসেছে।

এক পলক লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ডাক্তারখানায় ঢুকে পড়ে কেষ্টভামিনী এবং তার পেছন পেছন অন্য মেয়েরা।

ঘরটা বিরাট। মাঝখানে পর পর চারটে ওষুধ বোঝাই পুরনো আলমারি, সেগুলোর বেশির ভাগেরই পাল্লার কাচ নেই। সামনে টেবিল চেয়ার। টেবিলটার অবস্থা কহতব্য নয়, তার একটা পা আবার ভাঙা, কোনও রকমে জোড়াতোড়া দিয়ে সেটা খাড়া রাখা হয়েছে।

একটা ময়লা চিটচিটে চাদর দিয়ে টেবিলটা ঢাকা, তার ওপর ডাঁই-করা কাগজপত্র, স্টেথোস্কোপ, দোয়াত, কালি, ব্লাড প্রেসার মাপার মেশিন ইত্যাদি। এখানে বসেই রোগী দেখে থাকে ভুবন চক্কোত্তি। টেবিলের সামনের দিকে দু'টো কাঠের বেঞ্চ। সেগুলো রোগীদের বসার জন্য।

ওষুধের আলমারির পেছন দিকে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। বাঁ দিকে একটা বড় তক্তপোশে

সর্বক্ষণ তেলচিটে অনন্ত শয্যা পাতা থাকে। ভুবন চক্কোত্তি ওখানে শোয়। মোট কথা, এই ঘরখানা একসঙ্গে ভুবন চক্কোত্তির রান্নাঘর, শোওয়ার ঘর এবং ডাক্তারখানা।

ঘরের মাঝখানে একটা বেশি পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল। তার আলোয় দেখা গেল বাঁ ধারের তক্তপোশটায় কাত হয়ে পড়ে আছে ভুবন চক্কোত্তি। তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ভারী চেহারা, গোল মাংসল মুখ। মাথার একটি চুলও কালো নেই। গালে সাত আট দিনের দাড়ি। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া।

লগা যা খবর দিয়েছিল তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। কেষ্টভামিনীরা তক্তপোশের কাছে এগিয়ে এসে দেখল, ভুবনের চোখ আধবোজা, মুখ বাঁ দিকে খানিকটা বেঁকে গেছে আর গাল বেয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে।

দু'দিন আগেও মেয়েপাড়ায় গিয়েছিল ভুবন চক্কোত্তি। তখনও তাকে যুবকদের মতো তাজা, টগবগে দেখাচ্ছিল। মেয়েদের সঙ্গে কত রগড় টগড় করল। কে ভাবতে পেরেছিল দু'দিনের মধ্যে তার এমন হাল হবে!

কেষ্টভামিনী অনেকখানি ঝুঁকে আস্তে আস্তে ডাকে, 'বাবামাশায়—বাবামাশায়—'

ভুবনের দিক থেকে সাড়া নেই।

কেষ্টভামিনী আরও বারকয়েক ডাকাডাকি করল। কিন্তু একই ভাবে নিশ্চল পড়ে থাকে ভুবন। এই পৃথিবীর কোনও শব্দ তার কানে পৌঁছেছে কিনা বোঝা যায় না।

কেষ্টভামিনী এবার কাঁপা গলায় তার সঙ্গিনীদের শুধোয়, 'কী করি বল দিকিন?'

মেয়েমানুষগুলো শ্বাসরুদ্ধের মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে থেকে জবা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, 'দ্যাকো তো বাবামাশায়ের নাড়ি চলচে কিনা।'

ব্রাহ্মণ হলেও ভুবন চক্কোত্তিকে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তাদের ভয় বা সংকোচ নেই। ভুবন নিজেই সেসব অনেক আগে ভাঙিয়ে দিয়েছে। কত বার মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে তার কি হিসেব আছে? তা ছাড়া রোগবালাই হলে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে তাকেও তো পরীক্ষা করতে হয়।

কেষ্টভামিনী ভুবনের হাতটা তুলে আঙুল দিয়ে নাড়ি টিপে ধরে। একবার মনে হয় তিরতির করে চলছে। পরক্ষণে মনে হয়, না, ওটা একেবারেই থেমে গেছে।

খুব সন্তর্পণে ভুবনের হাতটা বিছানায় নামিয়ে রেখে তার কপালে নিজের ডান হাতটা রাখে কেষ্টভামিনী। ভুবনের গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। এবার আরও ঝুঁকে তার ফতুয়ার বোতাম খুলে বুকের ওপর কান ঠেকিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'মনে লাগচে আশা আচে। বুকটা ধুকুর ধুকুর করচে।'

টগর বলে, 'বাবামাশায়রে বাঁচানোর জন্যি কিচু তো করা দরকার।'

প্রথম দিকটায় একটু দিশেহারা হয়ে পড়লেও নিজেকে সামলে নিয়েছে কেষ্টভামিনী। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়েপাড়ার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মালকিনটি, কোনও কারণেই যে সহজে বিচলিত হয় না, ভেঙে পড়ে না। বলে, 'আমি এক্ষুনি ডাক্তের ডেকে আনচি।' বলে অন্য মেয়েদের 'ভুবন ফার্মেসি'তে রেখে শুধুমাত্র জবাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে যায়।

ভুবনের ডাক্তারখানার পর আগাছা-ভর্তি ডাঙাটা পার হতেই একটা ফাঁকা সাইকেল-রিকশা পাওয়া গেল। জবাকে নিয়ে সেটায় উঠে কেষ্টভামিনী বলে, 'বাজার পাড়ায় চল।' মহারাজপুরের এক কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকলেও এ শহরের নাড়িনক্ষত্রের খবর তার জানা। বাজার পাড়াতেই রয়েছে এখানকার সবগুলো ডাক্তারখানা।

'ভুবন ফার্মেসি'র পর আগাছায় ভর্তি এবড়োখেবড়ো ডাঙাটা পেরুলে ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়িঘর। সেখান থেকে আরও খানিকটা গেলে শহরের জমজমাট চেহারাটা চোখে পড়ে। মেয়েপাড়ার বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে বহুদূরে সুখী, ভদ্র, সংসারী মানুষদের নিজস্ব এই পৃথিবী, যেখানে কেষ্টভামিনীরা দূষিত জীবাণুর মতো অবাঞ্ছিত।

চলতে চলতে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা মনে পড়ছিল কেষ্টভামিনীর। সেই সময়টায় বর্ধমানের গাঁ থেকে তাকে ফুসলে বার করে নিয়ে এসেছিল তারই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। শহরে নিয়ে তাকে রানী করে রাখবে, পটের বিবির মতো সেজে গুজে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাবে সে, ইত্যাকার নানা রঙিন স্বপ্নে তাকে একেবারে জাদু করে ফেলেছিল সেই ফন্দিবাজ লুচ্চাটা। তার আগে হাজার হাজার যুবতী ঘোরের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যা করে বসে তা-ই করেছিল কেষ্টভামিনী। এমন এক ফাঁদে সে পা দিয়েছিল যেখান থেকে বেরিয়ে আর কোনও দিন বাড়ি ফেরা যায় না।

দিন কয়েক ফুর্তি টুর্তি লোটার পর মহারাজপুরের মেয়েপাড়ায় তাকে পৌঁছে দিয়ে সেই আত্মীয়টি উধাও হয়ে যায়। প্রথম প্রথম যা হয়, খুবই কান্নাকাটি করেছিল কেষ্টভামিনী, তিনদিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খায়নি। কতবার আত্মহত্যার চিন্তাটা তার মাথায় এসেছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু জীবন এক বিষম ব্যাপার। ধীরে ধীরে কবে যে মেয়েপাড়ার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, এতকাল পর আর মনে পড়ে না।

সেই পঁচিশ বা তিরিশ বছর আগে এখনকার মতো বেঢপ আর থলথলে ছিল না কেষ্টভামিনী। কালো হলেও চেহারাটা ছিল ছুরির ফলার মতো। এমন একটা চটক ছিল যে তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যেত না। তার মেয়েপাড়ায় আসার খবরটা চারপাশে আগুনের হলকার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজপুরের যত জঘন্য লুচ্চার পাল এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। তার ফল হল এই, বছরখানেকের ভেতর চাকা চাকা ঘায়ে ভরে গেল সারা শরীর।

সেই সময় মেয়েপাড়ার মালকিন ছিল প্রমদা। ভয়ঙ্কর জাঁদরেল মেয়েমানুষ। চিলের মতো ধারাল গলায় চেঁচিয়ে সে বলেছে, 'পারার ঘা লিয়ে আমার একেনে থাকা চলবে নি। খদ্দেররা জানতে পারলে এধার মাড়াবে নি' ব্যবসাটি পুরো লষ্ট। তাড়াতাড়ি যদিন সারাতে পারিস, থাকতে পাবি, লইলে দূর করে দুবো।'

কেষ্টভামিনীর তো বাড়ি ফেরার উপায় নেই। এই নরকেই তাকে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। কাজেই রোগ না সারালেই নয়। কিন্তু কোথায় ডাক্তার কোথায় বদ্যি, কিছুই জানত না সে। যে মেয়েরা তখন এখানকার বাসিন্দা ছিল তাদের হাতেপায়ে ধরে বলেছে, যদি একজন ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু তার ওপর সবার ছিল ভীষণ হিংসে, পারলে ওরা তাকে ছিঁড়ে খেত। কেননা সে আসার পর খদ্দেররা কেউ আর ওদের দিকে তাকাত না। মুখ ঝামটা দিয়ে ওরা সাফ বলে দিয়েছিল, 'আমাদের কাচে মরতে এসিচিস কেন লা মাগী! যে লাগরেরা তোরে পারার ঘা দে পালিয়েচে তারা কুথায়? যা যা, তাদের কাচে যা।'

কেষ্টভামিনী বুঝতে পেরেছিল, ওদের কারো কাছেই সাহায্যের আশা-ভরসা নেই। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত সে একা একাই সকালে বেরিয়ে পড়েছিল। ধানকল, সুরকি কল, তেলকল, বড় বড় গুদাম আর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেছনে ফেলে আসল শহরে চলে গিয়েছিল সে।

এখনকার কিছুই প্রায় তখন চিনত না কেষ্টভামিনী। একে ওকে জিগ্যেস করে করে শেষ পর্যন্ত বাজার পাড়ায় এসে হাজির হয়।

সেই সময় মহারাজপুরের সবচেয়ে নাম-করা ডাক্তার ছিল ত্রৈলোক্য হালদার। দুর্দান্ত পসার তার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চৌকো মুখ, শুঁয়োপোকার মতো ভুরু দু'টো সবসময় কুঁচকেই আছে। অত্যন্ত খেঁকুরে, রগচটা ধরনের লোক। তার ডাক্তারখানায় গিয়ে দাঁড়াতেই রুক্ষ গলায় জিগ্যেস করেছিল, 'কী চাই?'

কেষ্টভামিনী হালদারের মুখচোখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলেছে, 'ডাক্তারবাবু, আমার বড় ব্যারাম।'

ত্রৈলোক্য তাকিয়েই ছিল। মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের চেহারায় মার্কামারা একটা ছাপ থাকে। কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্রই বুঝে নিয়েছে, সে কোত্থেকে এসেছে। তীব্র ঘৃণায় তার ভুরু আরো কুঁচকে গিয়েছিল। গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে ত্রৈলোক্য চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'সক্কালবেলায় নরক দর্শন! যা যা, বেরো এখান থেকে।'

তবু দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টভামিনী। হাতজোড় করে কাতর গলায় বলেছে, 'ডাক্তারবাবু, তাড়ায়ে দেবেন না। রোগ না সারলে আমি মরে যাব।'

'যত সব নর্দমার পোকা! তোরা বেঁচে থাকলে দুনিয়ার কোন উপকারটা হবে শুনি?' ডাক্তারখানার কমপাউণ্ডারকে ডেকে ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'মাগীটাকে লাথি মেরে বার করে ওই জায়গায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও।'

লাথি আর মারতে হয়নি, নিজেই বেরিয়ে এসেছিল কেষ্টভামিনী।

মহারাজপুরে তখন আরো চার পাঁচজন পাস-করা ডাক্তার ছিল। হালদারের অমন চমৎকার অভ্যর্থনার পরও তাদের সবার কাছে গেছে কেষ্টভামিনী কিন্তু সকলেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ্যার চিকিৎসা তারা করবে না।

ফলে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিল কেষ্টভামিনী। সেই সঙ্গে আতঙ্কিতও। যে-রোগটি তার হয়েছে সেটা কতখানি মারাত্মক তা সে জানে। তবে কি বিনা চিকিৎসায় পচে গলে, যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে তাকে মরতে হবে? মাসি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ব্যারাম না সারালে পাড়ায় থাকতে দেবে না। যা ছোঁয়াচে রোগ, অন্যদের ধরলে আর দেখতে হবে না, মেয়েপাড়া উজাড় হয়ে যাবে। তাকে থাকতে দিয়ে মাসি ওইরকম কোনও ঝুঁকি নিতে পারে না। কিন্তু মেয়েপাড়া ছাড়তে হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মহারাজপুরের খোয়া-ওঠা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কেষ্টভামিনীর নজরে পড়ল, প্রকাণ্ড এক পুরনো দোতলা বাড়ির সামনের দিকের একটা ঘরের দরজার মাথায় টিনের সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা আছে, 'ভুবন ফার্মেসি'। তার নিচে ডাক্তার ভুবন চক্রবর্তী। বাংলাটা মোটামুটি পড়তে আর লিখতে পারত সে, তাই জানতে পেরেছিল ওটা ডাক্তারখানা।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কেষ্টভামিনী। আগের ডাক্তারখানাগুলোতে তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, ঠিক করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলে সে। বড় জোর অন্য জায়গার মতো এখান থেকেও তাকে বার করে দেবে, তার বেশি তো কিছু নয়।

কেষ্টভামিনী যখন এ-সব ভাবছে, সেইসময় ভেতর থেকে একটা ভারী গলা ভেসে এসেছিল, 'কে, কে ওখানে?'

ভারী হলেও কণ্ঠস্বরটি ভয়-ধরানো নয়। পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কেষ্টভামিনী বলেছে, 'আমি, আমি—'

ভেতরে ক'টা ওষুধের আলমারি, টেবিল চেয়ার। এক কোণে আধময়লা একটা পর্দা টাঙিয়ে তার ওপাশে রোগী দেখার ব্যবস্থা।

টেবিলের ওধারে যে ডাক্তারবাবুটি বসে ছিল তার বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। নাকের তলায় ঝুপো গোঁফ। পরনে গলাবন্ধ কোট আর ধুতি। ডাক্তারের ডান পাশে একটা লোক, খুব সম্ভব তার কমপাউণ্ডার। সেই সকালবেলায় রোগী টোগী ছিল না, ডাক্তারখানা একেবারে ফাঁকা।

ভুবন চক্রবর্তী পুরোপুরি পাস-করা ডাক্তার নয়। বাঁকুড়া না কোথায় যেন মেডিক্যাল স্কুলে বছর দুই যাতায়াত করেছিল। সেই পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এই বিদ্যেতেই কাজ চলে যেত। পাস-করাদের মতো পসার না হলেও রোগীটোগী কম হত না তার ডাক্তারখানায়।

ভুবন বলেছিল, 'ভেতরে এস।'

ডাক্তারখানায় ঢুকে টেবিলের এপারেই মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে কেষ্টভামিনী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলেছে, 'আমারে বাঁচান বাবামাশায়।' কেন যে তার মুখ দিয়ে বাবামাশায় শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল, নিজেই জানে না। শুধু মনে হয়েছিল এই মানুষটির করুণা পাওয়া যেতে পারে।

ভুবন বলেছিল 'আগে বোসো। তারপর বল কী হয়েছে তোমার।'

মেয়েপাড়ার বাইরের কেউ তাকে বসতে বলবে, কেষ্টভামিনীর কাছে এটা একেবারে আশাতীত। সেই সকাল থেকে যে লাঞ্ছনা আর ঘৃণা জুটেছে, তারপর ভুবন চক্রবর্তীর এই সদয় ব্যবহারে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটা চেয়ারে খুব জড়সড় হয়ে বসে মুখ নামিয়ে রেখে সে বলেছে, 'আমি কুথায়, কুন লরকে থাকি, লিচ্চয় বুঝতে পারচেন।'

বিব্রতভাবে ভুবন বলেছে, 'ঠিক আছে, ব্যারামের কথাটা বল।'

কোন বিষম রোগ তাকে ধরেছে, এরপর তার বিবরণ দিয়ে ব্যাকুলভাবে কেষ্টভামিনী বলেছে, 'আপনি ছাড়া আমাকে বাঁচাবার আর কেউ লেই বাবামাশায়।'

একটু চুপ করে থেকেছে ভুবন। বাজারের একটি মেয়ের চিকিৎসা করবে কি করবে না, সেটাই যেন ভেবে উঠতে পারছিল না।

উৎকণ্ঠায় শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল কেষ্টভামিনীর। সে বলেছে, 'বাবামাশায়, আপনার দয়া কি পাব না? রাস্তায় পড়ে পড়ে মরে যাব?'

কেষ্টভামিনীর শেষ কথাগুলো ভুবনকে যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল সে, বলেছিল, 'চিন্তা করিস না, আমি তোকে সারিয়ে তুলব।' তুমি থেকে এক লহমায় তুইতে নেমে গিয়েছিল সে।

সেদিন থেকেই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কেষ্টভামিনীর গা ভর্তি ঘা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়েছিল ভুবন। ওষুধে কতটা কাজ হচ্ছে তা দেখার জন্য রোজ সকালে একবার করে ডাক্তারখানায় আসতেও বলেছিল। কৃতজ্ঞতায় দু'চোখে জল এসে গেছে কেষ্টভামিনীর। ধিক্কার, ঘৃণা আর লাঞ্ছনা ছাড়া তারা তো এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর কাছ থেকে কিছুই পায় না। ভুবনের সহানুভূতি তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে।

মাসখানেকের ভেতর রোগ সেরে গিয়েছিল কেষ্টভামিনীর। কিন্তু বাবামাশায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা থেকেই যায়। সারা রাত জন্তুর দল তার শরীরটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কামড়ে আঁচড়ে শেষ করে দেবার পর সকালে চান করে সে চলে আসত 'ভুবন ফার্মেসি'তে। ভেতরে ঢুকত না, বাইরে দাঁড়িয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে যেত।

এইভাবেই চলছিল।

খারাপ রোগ বেছে বেছে শুধু কেষ্টভামিনীকেই ধরবে, এমন কোনও কথা নেই। যে লুচ্চার পাল রাতে হানা দেয়, শুধু কেষ্টভামিনীরই না, অন্য মেয়েদের শরীরেও তারা বিষাক্ত জীবাণু

ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ফলে অনিবার্য নিয়মে তাদের গায়েও একদিন না একদিন দগদগে পারার ঘা ফুটে বেরুতে থাকে।

রোগাক্রান্ত দিশেহারা মেয়েরা গিয়ে ধরে কেষ্টভামিনীকে, 'যে ডাক্তার তোরে সারায়ে দেচেন আমাদের তেনার কাচে নে চল। যন্তন্নায় মরে যাচ্চি রে।'

এরাই একদিন ডাক্তারদের হদিস দিয়ে তাকে এতটুকু সাহায্য যে করেনি সেটা আর মনে করে রাখেনি কেষ্টভামিনী। সে ওদের সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'তে নিয়ে গিয়েছিল। ভুবন তাদেরও ফিরিয়ে দেয়নি। বরং বলেছে, 'কেষ্টভামিনী যখন নিয়ে এসেছে তখন ভেবো না। ধরে নাও রোগ সেরেই গেছে।'

এইভাবে মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে ভালো রকমের সম্পর্ক হয়ে গেল ভুবন ডাক্তারের। কিন্তু অন্য দিকে প্রচণ্ড ধুন্ধুমার বেধে যায়। যে-বাড়িটায় ভুবনের ডাক্তারখানা সেটা তার পৈতৃক আমলের। তার বাবা-মা বহুদিন আগেই মারা গেছে, স্ত্রীও বেঁচে নেই, তার ছেলেমেয়ে হয়নি। সে একেবারে ঝাড়া হাত-পা মানুষ। কিন্তু বাড়িতে ছিল সাত সাতটা ভাই। তারা বাজারের মেয়েদের নানা কুৎসিত রোগ নিয়ে রোজ আসাটা আদৌ পছন্দ করছিল না। এই নিয়ে অশান্তি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ভাইরা বলছিল, এই বিষ্ঠার পোকাদের বাড়িতে আনা চলবে না। ভুবনের জন্য তাদের এত বড় চক্রবর্তী-বংশ একেবারে অপবিত্র হয়ে গেল। শুধু তা-ই নয়, এরা নিয়মিত আসার কারণে তলায় তলায় আরও কত সর্বনাশ হয়ে গেছে, কে জানে। কেননা বাড়িতে যুবক ছেলেছোকরা তো কম নেই। তারা এইসব নোংরা ওঁচা মেয়েমানুষগুলোর ফাঁদে যে লুকিয়ে লুকিয়ে পা দিয়ে বসেনি তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? চক্রবর্তীরা নিষ্ঠাবান সৎ ব্রাহ্মণ, তাদের শুদ্ধতা আর রইল না। বাড়িটা বাজারের মেয়েদের একটা কলোনি হয়ে উঠল। ওদের আর এখানে আসা চলবে না।

ভাইদের সঙ্গে গোলমালের ব্যাপারটা তখনই জানতে পারেনি কেষ্টভামিনী, জেনেছিল অনেক পরে।

যাই হোক, মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়া সম্ভব ছিল না ভুবনের পক্ষে। প্রথমত, এই দুঃখী অসহায় মেয়েগুলোর ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল তার। তার চেয়েও জোরালো কারণটা হল পয়সা। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ থেকে মহারাজপুরে এসে সে যখন ডিসপেনসারি খুলে বসল তখন এখানে পাস-করা ডাক্তার ছিল হাতে-গোনা তিন চারজন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সারা দেশ জুড়ে যে জনবিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করেছিল তার হাওয়া এসে লেগেছিল এই শহরেও। তা ছাড়া সে আমলের পূর্ব পাকিস্তান থেকে হু হু করে শরণার্থীর ঢলও নেমেছিল এখানে। অনিবার্য নিয়মে ডাক্তারের সংখ্যাও বেড়ে চলল। নতুন যে-সব ডাক্তার এল তাদের নামের পাশে লম্বা ডিগ্রি। তাদের ছেড়ে রোগ সারাতে কেউ ভুবন ডাক্তারের কাছে আসবে কেন? তার হাতে রয়ে গেল কিছু গরিব গুর্বো, ধানকল সুরকি কলের মজুর আর মেয়েপাড়ার ওঁচা ক'টি মেয়েমানুষ। এদের, বিশেষ করে মেয়েমানুষগুলোর তার ওপর অগাধ আস্থা। তাদের আনুগত্যের ভেতর কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। বাঁচুক মরুক, ভুবনের হাতের ওষুধটি ছাড়া তাদের চলবে না। ভুবনেরও ওদের ছাড়া গতি নেই।

ভুবন ভাইদের বুঝিয়েছে, 'মেয়েগুলো ভালো রে, নেহাত কপালের ফেরে পাঁকে নামতে হয়েছে।'

ভাইরা বলেছে, 'বেশ্যা আবার ভালো! নচ্ছার পাপীর দল।'

'পাপী হয়ে কেউ জন্মায় না। ওদের এই অবস্থার জন্যে আমাদের সোশাল সিস্টেমটাই দায়ী।'

সমাজতত্ত্বের এ-সব গূঢ় ব্যাখ্যা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না ভাইদের। তাদের সাফ কথা, বাজারের মেয়েদের বাড়িতে আনা চলবে না। ডিসপেনসারিটা যদিও রাস্তার দিকে, তবু সেটা বাড়িরই একটা অংশ তো।

এই নিয়ে একদিন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। ভুবন চক্রবর্তী ঠিক করে ফেলল, ভাইদের সংস্রবে আর থাকবে না। বাড়ি থেকে ডিসপেনসারি তুলে নিয়ে সে চলে এল গুদাম ঘরগুলোর কাছাকাছি একটা টিনের চালায়। সেই থেকে পঁচিশ তিরিশটা বছর এখানেই কেটে গেল তার। মহারাজপুরের যে অংশে সুখী, ভদ্র, সামাজিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ মানুষেরা থাকে তার সঙ্গে ভুবনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তিরিশ বছর কম সময় নয়। এর মধ্যে মহারাজপুর যেমন বদলে গেছে তেমনি পরিবর্তন হয়েছে মেয়েপাড়াতেও। সেদিনের ছিপছিপে পাতলা গড়নের যুবতী কেষ্টভামিনী এখন থলথলে ভারী চেহারার মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ এবং সে আমলের অন্য যুবতী মেয়েরা বেশির ভাগই মরে হেজে সাফ। কেউ কেউ পাড়া ছেড়ে কোথায় চলে গেছে তার হদিস কেষ্টভামিনীরা রাখে না। পৃথিবীর কোথাও ফাঁকা জায়গা তো পড়ে থাকে না। অনিবার্য নিয়মেই নতুন জেনারেশানের মেয়েরা এসে গেছে।

এতগুলো বছর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মেয়েগুলোর পাশেপাশেই আছে ভুবন চক্রবর্তী। রোগ বালাইয়ের চিকিৎসা তো করেই, পুলিশ বা লুচ্চারা হামলা করলে সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায়। যেন দশ হাত দিয়ে মেয়েগুলোকে আগলে রেখেছে ভুবন। দুই প্রজন্ম ধরে, কেষ্টভামিনী থেকে এখনকার টগর বা টিয়া-ময়নাদের সে বাবামাশায়।

আগাছায় ভরা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে কখন যে কেষ্টভামিনীদের রিকশাটা মহারাজপুরের বাজারপাড়ায় চলে এসেছিল, খেয়াল নেই। এটাই শহরের সবচেয়ে জমকালো অংশ। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই বাজারপাড়ার সঙ্গে এখনকার বাজারপাড়ার মিল সামান্যই। আগে বেশির ভাগই ছিল টিনের চালের ঘর, ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ দু-চারটে বেঢপ চেহারার একতলা কি দোতলা। এখন যেদিকে যতদূর চোখ যায় লাইন দিয়ে নতুন নতুন তেতলা আর চারতলা বাড়ি। সেগুলোর নিচের তলায় বিরাট বিরাট সব দোকান। কলকাতার ধাঁচে দুর্দান্ত সব শো-উইণ্ডো। কোনওটা টিভির, কোনওটা টেক্সটাইল মিলের। ওষুধের দোকান, রেস্তোরাঁ, ব্যাঙ্ক, ডাক্তারদের চেম্বার, সিনেমা হল, সব এখানেই। সারাদিন তো বটেই, অনেক রাত পর্যন্ত জায়গাটা গমগম করতে থাকে।

এখানকার সমস্ত কিছুই কেষ্টভামিনীর মুখস্থ। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই যে প্রথম এখানে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডাক্তারের খোঁজে ছুটে এসেছিল, তারপর কতবার এসেছে তার হিসেব নেই।

'রিলায়েন্স ফার্মেসি' নামে একটা বড় ডাক্তারখানার সামনে এসে রিকশা থামায় কেষ্টভামিনী। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ে।

ডাক্তারখানার সামনের দিকে সারি সারি কাচের আলমারি দিয়ে সাজানো ওষুধের দোকান, পেছন দিকে ডাক্তার হিরণ্ময় সেনের চেম্বার। হিরণ্ময়ের বয়স বেশি না, চল্লিশের অনেক নিচে। কিন্তু এর মধ্যেই যথেষ্ট নাম করে ফেলেছে। উঠতি ডাক্তারদের মধ্যে তার পসার সবচেয়ে বেশি। সর্বক্ষণ তার চেম্বারে লাইন লেগে থাকে।

ওষুধের আলমারিগুলোর ডান পাশ দিয়ে একটা সরু প্যাসেজ চলে গেছে ভেতর দিকে। তার শেষ মাথায় রোগীদের জন্য ওয়েটিং রুম, তারপর দরজায় পর্দা-লাগানো ডাক্তারের চেম্বার।

ওয়েটিং রুমে ভিড় ছিল। সেখানে এসে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর কেষ্টভামিনীর ডাক পড়ল।

বড় টেবিলের ওধার থেকে লম্বা ঝকঝকে চেহারার হিরণ্ময় ডাক্তার বলে, 'বলুন কী হয়েছে?'

দিনকাল এখন অনেক বদলে গেছে। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্র এই মহারাজপুরের ডাক্তাররা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখনকার ডাক্তাররা একেবারে অন্যরকম। রোগটা কার তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। টাকাটা কার কাছ থেকে এল—চোর, লুচ্চা না বেশ্যা, সে সম্বন্ধে তাদের দুর্ভাবনা নেই। ওদের কাছে রোগ সারিয়ে টাকা পাওয়াটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আর সব কিছুই অর্থহীন।

হাতজোড় করে কেষ্টভামিনী বলে, 'ডাক্তারবাবু আপনারে আমার সন্‌গে যেতি হবে। বাবামাশায় মরতি বসেচে, আপনি তেনারে বাঁচান।'

হিরণ্ময় হকচকিয়ে যায়, 'বাবামাশায় কে?'

ভুবন ডাক্তারের নাম বলে কেষ্টভামিনী কিন্তু নামটা আদৌ হিরণ্ময় আগে শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। আসলে ভুবন সেই যে মহারাজপুরের আদি এলাকা ছেড়ে ধানকল সুরকি কলের কাছে চলে গিয়েছিল, তারপর এদিকে আর বিশেষ আসেনি। তার সঙ্গে এ-অঞ্চলের যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে। মহারাজপুরের ভদ্রপাড়ার মানুষজন তাকে মনে করে রাখেনি।

হিরণ্ময় ভুবন সম্পর্কে আর কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করে না। শুধু জিগ্যেস করে, 'তাঁকে দেখতে কোথায় যেতে হবে?'

কেষ্টভামিনী বলে, 'ওই যে ধানকল খড়কলগুলোন যেকেনে আচে সেকেনে—'

'এক্ষুনি বেরুতে পারব না। অনেক রোগী অপেক্ষা করছে, তাদের দেখতে ঘন্টাখানেক লেগে যাবে। তারপর যেতে পারি।'

'আমরা বসচি ডাক্তারবাবু। আপনি কাজ সেরে লিন।'

'আমার ভিজিট কত জানা আছে?'

'না।'

'রোগীর বাড়ি গেলে চৌষট্টি টাকা নিই আর যাতায়াতের রিকশা ভাড়া।'

এতগুলো টাকা! বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে কেষ্টভামিনীর। পরক্ষণে মনে পড়ে, ভুবন চক্রবর্তী একদিন তার নতুন জীবন দিয়েছিল। শুধু তা-ই না, মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের জন্য নিজেদের বাড়িঘর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল। তার জন্য সামান্য ক'টা টাকা সে খরচ করতে পারবে না? তা ছাড়া কেষ্টভামিনী জানে, সুস্থ হবার পর ভুবন চক্রবর্তী হিসেব করে তার প্রতিটি পয়সা ফেরত দিয়ে দেবে। কারো কাছেই সে ঋণী হয়ে থাকতে চায় না।

কেষ্টভামিনী বলে, 'দেব ডাক্তারবাবু, আপনি যা কইলেন তা-ই দেব।'

এরপর ভুবন ডাক্তারের রোগের লক্ষণগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে কেষ্টভামিনীকে ওয়েটিং রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে হিরণ্ময়।

কিন্তু একঘন্টা নয়, প্রায় ঘন্টাদেড়েক বাদে কেষ্টভামিনীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে হিরণ্ময়। রাস্তায় এসে দু'টো সাইকেল রিকশা নেওয়া হয়। সামনের রিকশায় ওঠে কেষ্টভামিনী আর জবা, পেছনেরটায় হিরণ্ময়, তার সঙ্গে ওষুধপত্রে বোঝাই ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগ। আগে আগে থেকে কেষ্টভামিনীরা হিরণ্ময়ের রিকশাটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

'ভুবন ফার্মেসি'তে যখন ওরা পৌঁছুল, বেশ রাত হয়ে গেছে। এ-পাড়ায় এমনিতে লোক চলাচল যেটুকু হয় তার বেশির ভাগটাই দিনের বেলায়। সন্ধের পর, বিশেষ করে শীতকালে জায়গাটা নির্জন হয়ে যায়। এখন তো একেবারেই নিঝুম।

লগার মুখে সেই পড়ন্ত বেলায় ভুবনের খবরটা পাওয়ার পর মেয়েপাড়া ফাঁকা করে যাবা কেষ্টভামিনীর সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সেই টগর টিয়া ময়নারা এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকজন ভুবনের বিছানার কাছাকাছি ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে আছে। তাদের মধ্যে লগাকেও দেখা যাচ্ছে। তবে ধানকল, সুরকিকল কি লেদ মেশিনের মজুররা আর নেই, তারা সন্ধের পর পরই চলে গেছে।

মেয়েমানুষগুলোর চোখেমুখে ঘোর উৎকণ্ঠা। কেষ্টভামিনী কখন ডাক্তার নিয়ে ফিরবে সেজন্য তারা পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সাইকেল রিকশা থেকে নেমে কেষ্টভামিনী তাড়া লাগানোর সুরে লগাকে বলে, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তরবাবুর বাক্সটা লাবিয়ে নে আয়।'

হিরণ্ময় নেমে পড়েছিল। কেষ্টভামিনী তাকে সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'র ভেতর চলে আসে। পেছন পেছন মেডিক্যাল ব্যাগ নিয়ে আসে লগা এবং অন্য মেয়েরা।

যে মেয়েমানুষগুলো ভুবনকে ঘিরে বসে ছিল, হিরণ্ময়দের দেখে উঠে দাঁড়ায়।

হিরণ্ময় বলে, 'রোগীর ঘরে এত ভিড় কেন? আপনারা বাইরে যান।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আমিও যাব?'

'না। আপনি থাকুন।'

মেয়েরা বাইরে গিয়ে দরজার কাছে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুবনকে পরীক্ষা করতে করতে হিরণ্ময় বুঝে যায় মারাত্মক ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। মুখের বাঁ দিকে আর শরীরের নিচের অংশটায় পক্ষাঘাতের সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট।

কেষ্টভামিনী শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে, 'বাবামাশায়ের কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

'স্ট্রোক।' বলেই হিরণ্ময়ের খেয়াল হয়, ইংরেজি শব্দটা বোধহয় বুঝতে পারবে না কেষ্টভামিনী। সোজা বাংলায় বুঝিয়ে দেয়, 'বুকেব অসুখ।'

'বাঁচবে তো?'

'দু'দিন না কাটলে বলতে পারব না।

কেষ্টভামিনী বলে, 'বাবামাশায়রে বাঁচায়ে তোলেন ডাক্তারবাবু।'

হিরণ্ময় বলে, 'বাঁচা মরা মানুষের হাতে নেই, তবে ডাক্তার হিসেবে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'অনেক রকম পবীক্ষা করতে হবে রোগীর। তার ওপর ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশান, এ-সব তো আছেই। প্রচুর খরচ।'

খরচের কথায় ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে যায় কেষ্টভামিনী। ঢোক গিয়ে বলে, 'কিরকম লাগবে যদিন বলেন—'

হিরণ্ময় জানায়, রোগীর যা হাল তাতে আজই দু-একটা পরীক্ষা করা দরকার। সেগুলো করা না হলে ভালো করে চিকিৎসা শুরু করা যাবে না। প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আপাতত শ'তিনেক টাকা চাই।

কেষ্টভামিনীর ঘরে জমানো টাকা নিশ্চয়ই আছে। তার থেকে শ'খানেকের মতো নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল তাতেই হয়ে যাবে। কিন্তু আরো তিনশো বার করাটা খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। ওই তিনশোতেও যে হবে না, সেটা হিরণ্ময় ডাক্তার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।

কেষ্টভামিনীর সঞ্চয় তো অফুরন্ত নয় যে ভুবনের চিকিৎসায় যাবতীয় খরচ জুগিয়ে যেতে পারবে। তা ছাড়া তারও ভবিষ্যৎ বলে একটা কিছু আছে। হাতের সম্বল ভেঙে ফেললে বিপদে পড়তে হবে।

কেষ্টভামিনী বলে, 'খরচার ব্যাপারটা আমাদের এট্টু ভাবতে দ্যান ডাক্তারবাবু।'

হিরণ্ময় বলে, 'তা ভাবুন। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। যা করার আজই করে ফেলতে হবে কিন্তু।'

একটু চিন্তা করে কেষ্টভামিনী বলে, 'আজই আপনারে জানায়ে দেব।'

'আমি ন'টা পর্যন্ত চেম্বারে থাকব। এলে তার ভেতর আসবেন।'

'আচ্ছা।'

এবার ভুবনকে একটা ইঞ্জেকশান দেয় হিরণ্ময়। তারপর কয়েকটা ট্যাবলেট কেষ্টভামিনীকে দিয়ে বলে, 'এখন জ্ঞান নেই ভুবনবাবুর, জ্ঞান ফিরলে তিন ঘন্টা পর পর একটা করে ট্যাবলেট খাইয়ে দেবেন। আর রাত্তিরে সবসময় ওঁর কাছে লোক রাখবেন। আরো খারাপ কিছু বুঝলে আমাকে খবর দেবেন। চেম্বারের ওপরেই দোতলায় আমি থাকি।'

কেষ্টভামিনী ঘাড় কাত করে বলে, 'দেব।'

হিরণ্ময় সাইকেল রিকশাটা বাইরের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। নিজের ফি, ট্যাবলেট ইঞ্জেকশানের দাম এবং রিকশাভাড়া নিয়ে একসময় চলে যায়।

যে-মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ঘরে ডেকে এনে কেষ্টভামিনী শুধোয়, 'সবই তো শুনলি। একন কী করা?'

মেয়েরা চুপ করে থাকে।

কেষ্টভামিনী আবার বলে, 'আমার একলার পক্ষে এত বড় রোগের চিকিচ্ছা চালানো অসোম্ভব।'

কেউ উত্তর দেবার আগে জবা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, 'ট্যাকার জন্যি বাবামাশায় মরে যাবে? তুমি আমাদের কী করতে বল?'

তক্ষুনি কিছু বলে না কেষ্টভামিনী। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে শুরু করে, 'তোদের হাল তো জানি। তবু না বলে পারচি না। সব্বাই মিলে কিচু কিচু দিলে একজনার ওপর চাপটা পড়ে না। এদিকে বাবামাশায়ের পেরানটা বেঁচে যায়। একন ভেবেচিন্তে দ্যাক কী করবি।'

অনেকক্ষণ মেয়েমানুষগুলো নিজেদের ভেতর চাপা গলায় আলোচনা করে নেয়। কেউ কি আর প্রাণ ধরে জমানো টাকায় হাত দিতে চায়? কিন্তু ভুবন চক্রবর্তীর কথা আলাদা। তার জন্য ওরা সব পারে।

ভিড়ের ভেতর থেকে টগর বলে ওঠে, 'আমি দেব কিচু ট্যাকা। আমারে বাবামাশায় যে ব্যারাম থিকে বাঁচায়েছিল তা কি কুনোদিন ভুলব! আমি বেঁচে থাকতি বিনি চিকিচ্ছায় বাবামাশায়রে মরতি দেব নি।' তার গলা আবেগে কাঁপতে থাকে।

টগরের আবেগ বিদ্যুৎগতিতে অন্য মেয়েদের মধ্যেও চারিয়ে যায়। তারা একসঙ্গে বলতে থাকে, 'ট্যাকার জন্যি ভেবো না মাসি। আমরাও দেব।'

কে কত দিতে পারবে, জেনে নেয় কেষ্টভামিনী। দেখা গেল সাতশো টাকার মতো পাওয়া যাবে। ঠিক হল, আপাতত এই দিয়েই ভুবন চক্রবর্তীর পরীক্ষা-টরীক্ষাগুলো শুরু হোক, পরে আরো টাকার দরকার হলে দেখা যাবে।

কেষ্টভামিনী বলে, 'তোরা তো কেউ ট্যাকা সন্‌গে করে আনিস নি?'

মেয়েরা বলে, 'না। লগা খবর দিতেই তো তোমার সন্‌গে দৌড়ে চলে এলাম।'

'তা হলে যা, নে আয়।'

টিয়া ময়নারা মেয়েপাড়ায় গিয়ে টাকা নিয়ে আসে।

কেষ্টভামিনী এবার আর নিজে হিরণ্ময় ডাক্তারের চেম্বারে গেল না, তিনশো টাকা দিয়ে জবা আর টিয়াকে পাঠিয়ে দিল। তারপর অন্য মেয়েদের উদ্দেশে বলে, 'ঘরগুলোন সব ফাঁকা পড়ে আচে। সব্বাই একেনে থেকে কী হবে? আমি তো রইচিই, দু-চারজন আমার সন্‌গে থাক। বাকিরা পাড়ায় ফিরে যা। লইলে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ঘরের তালা ভেঙে চেঁচেপুচে সব নে যাবে। ব্যবসাটি তো আজ একরকম মাটিই হল। যারা যাবি, দ্যাক যদিন দু'টো পয়সা কামাই হয়।'

কিন্তু ভুবনকে এই অবস্থায় ফেলে একটি মেয়েও তাদের পাড়ায় ফিরে যেতে রাজি হল না। তারা এখানেই থেকে যাবে। রোগবালাই হলে কত রাত তো রোজগার বন্ধ থাকে। ধরা যাক, আজ তেমন কিছু একটা হয়েছে তাদের।

কেষ্টভামিনী বলে, 'তা না হয় থাকলি, কিন্তন ঘরদোর পাহারা দেবার জন্যি কারুর না কারুর থাকা তো দরকার।'

অনেক পরামর্শের পর লগাকে পাঠানো হল। রাতটা সে মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের পার্থিব সম্পত্তিগুলি পাহারা দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জবা আর টিয়ার সঙ্গে হিরণ্ময় আবার 'ভুবন ফার্মেসি'তে এল। সঙ্গে সেই ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগটা তো রয়েছেই, তা ছাড়া এনেছে একটা বড় সুটকেস। সুটকেসটা খুলে নানারকম যন্ত্রপাতি আর ফিতে বার করে ভুবনের হাতে পায়ে বুকে লাগিয়ে কী একটা কল চালিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লম্বাটে ফালি কাগজে উঁচু নিচু দাগ পড়তে লাগল। দমবন্ধ করে কেষ্টভামিনীরা সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় কাগজটা বার করে চোখের সামনে ধরে কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে হিরণ্ময়। তারপর বলে, 'কাল সকালে এসে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। রোগী যেমন শুয়ে আছে তেমনি থাকবে। নাড়াচাড়া করবেন না।'

কেষ্টভামিনী ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'কেমন দেকলেন ডাক্তারবাবু?'

উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসে হিরণ্ময়। তার ওই হাসিটাই বুঝিয়ে দেয়, ভুবনের অবস্থা আশাপ্রদ কিছু নয়।

ভুবনকে আরো একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে হিরণ্ময় চলে যায়। আর ভুবনের বিছানার চারপাশ ঘিরে মেঝেতে চুপচাপ বসে থাকে মেয়েমানুষগুলো। সেই দুপুরে খেয়েছে তারা, তারপর এতটা রাত হল। স্বাভাবিক নিয়মেই খিদে পাওয়া উচিত। কিন্তু খিদে তেষ্টার কোনও বোধই এখন তাদের নেই। মনে মনে তারা বিড় বিড় করতে থাকে, 'হেই মা কালী, বাবামাশায়রে সারায়ে দাও। হেই মা—'

মাঝরাতে চারিদিক যখন আরও নিষুতি হয়ে যায়, অন্ধকারে আর কুয়াশায় যখন ডুবে যায় সমস্ত চরাচর, সেই সময় শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদল মাতাল লুচ্চা এসে হানা দেয় 'ভুবন ফার্মেসি'তে। মেয়েপাড়ায় জবা টগরদের না পেয়ে তারা এখানে হানা দিয়েছে। সেই আদিম জৈব প্রবৃত্তি, তার তো বিনাশ নেই।

বেহুঁশ, রোগাক্রান্ত বাবামাশায়ের আরোগ্য কামনায় সাতাশটি মেয়েমানুষ তদ্গত হয়ে যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে তখন এই জন্তুগুলো এসে পড়ায় তারা মারাত্মক খেপে ওঠে। জানোয়ারেরা তাদের টেনে হেঁচড়ে মেয়েপাড়ায় নিয়ে যাবে, কিন্তু তারা যাবে না। এই নিয়ে মধ্যরাতের স্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে দু-পক্ষে তুমুল গালাগাল চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষগুলো আঁচড়ে, লাথি মারতে মারতে লুচ্চার পালকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর বাকি রাতটা নির্বিঘ্নেই কেটে যায়।

সেই যে ভুবন চক্রবর্তী চোখ বুজে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে ছিল তার কোনও হেরফের ঘটেনি। জ্ঞান ফেরেনি তার, বরং মুখের বাঁ ধারটা আরো খানিকটা বেঁকে যেন শক্ত হয়ে গেছে।

মেয়েমানুষগুলো সারারাত কেউ দু'চোখের পাতা এক করে নি, পলকহীন ভুবনের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল।

ভুবনকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যায় কেষ্টভামিনীর। বার বার আবছাভাবে কেউ যেন জানিয়ে দেয় লক্ষণটা ভালো নয়। ভুবনের মুখের ওপর ঝুঁকে সে কাঁপা গলায় ডাকতে থাকে, 'বাবামাশায়, বাবামাশায়—'

সাড়া নেই।

এবার ভুবনের বুকে কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠে কেষ্টভামিনী। শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে। দ্রুত হাত সরিয়ে অন্য মেয়েদের বলে, 'আমি ডাক্তারবাবুর কাচে যাচ্চি।'

এই ভোরবেলায় রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কোথাও জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। রিকশার চিহ্নমাত্র নেই। অগত্যা একরকম দৌড়ুতে দৌড়ুতেই কেষ্টভামিনী বাজার পাড়ায় এসে হিরণ্ময় ডাক্তারের ঘুম ভাঙায়।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে হিরণ্ময় নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। সাত সকালে কেষ্টভামিনীকে দেখে অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে?'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আমার বড্ড ভয় করচে ডাক্তারবাবু। দয়া করে চলেন।'

'রোগীর জ্ঞান ফিরেছিল?'

'না।'

কিছু একটা আন্দাজ করে নেয় হিরণ্ময়। আর কোনও প্রশ্ন না করে বলে, 'রাস্তায় গিয়ে দেখুন রিকশা পাওয়া যায় কিনা। আমি আসছি।'

এর মধ্যে রোদ উঠে গিয়েছিল। দু-চারটে রিকশাও বেরিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে হিরণ্ময় ডাক্তারকে সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'তে ফিরে আসে কেষ্টভামিনী।

ভুবনের গায়ে একবার হাত দেয় হিরণ্ময়, তারপর দ্রুত নাকের কাছে হাতটা এনে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াটি বুঝতে চেষ্টা করে। পরক্ষণে স্টেথোস্কোপ বুকে লাগিয়েই তুলে নেয়। তার মুখে হতাশা আর বিষাদের ছাপ ফুটে উঠতে থাকে।

সাতাশটি মেয়েমানুষের হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে গিয়েছিল। শঙ্কাতুর মুখে একদৃষ্টে তারা তাকিয়ে আছে হিরণ্ময়ের দিকে।

কেষ্টভামিনী একসময় রুদ্ধ স্বরে জিগ্যেস করে, 'কেমন দেকলেন ডাক্তারবাবু?'

বিমর্ষ সুরে হিরণ্ময় বলে, 'কিছুই করা গেল না। ভুবনবাবু মারা গেছেন।'

'ভুবন ফার্মেসি'র টিনের চালের প্রকাণ্ড ঘরটার ভেতর সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দমকা হাওয়ার মতো শোকের উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ে। সাতাশটি মেয়েমানুষ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এই শোকের পরিবেশেই কাগজে কী যেন লিখে কেষ্টভামিনীকে দিতে দিতে হিরণ্ময় বলে, 'এটা ডেথ সার্টিফিকেট। ভুবনবাবুকে সৎকার করতে নিয়ে গেলে শ্মশানে এটা লাগবে।'

আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়িয়ে সার্টিফিকেটটা নেয় কেষ্টভামিনী।

মেডিক্যাল ব্যাগটা আজ আর খুলতে হয়নি। সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে হিরণ্ময় বলে, 'আচ্ছা চলি।'

আঁচলের গিঁট খুলে টাকা বার করতে করতে কেষ্টভামিনী বলে, 'আপনার ট্যাকাটা ডাক্তারবাবু—'

কী ভেবে হিরণ্ময় বলে, 'থাক। ওটা আর দিতে হবে না।' বলে চলে যায়।

এদিকে প্রাথমিক শোকের উচ্ছ্বাস কিছুটা থিতিয়ে এলে কেষ্টভামিনী বলে, 'এখন কী করা—হ্যাঁ রে মেয়েরা?' আসলে ভুবনের এমন আচমকা মৃত্যুতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। কী করবে, কী করা উচিত, ভেবে উঠতে পারছে না।

মেয়েমানুষগুলোর মনের অবস্থাও কেষ্টভামিনীর মতোই। বিহ্বলের মতো তার দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে।

বেলা ক্রমশ বাড়ছিল। সূর্য পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। গাঢ় কুয়াশা কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদে ভরে গেছে চারিদিক।

মৃত্যুর গন্ধ কীভাবে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়। সুবকি কল, ধানকল আর বড় বড় গুদামের মজুরেরা একজন দু'জন করে 'ভুবন ফার্মেসি'র সামনে এসে জড়ো হতে থাকে। তাদের কেউ কেউ চাপা শব্দ করে কাঁদছিল, কেউ বা হাতের পিঠে চোখের জল মুছছিল। আসলে ভুবন চক্রবর্তীর মতো আপনজন তো তাদের কেউ ছিল না।

মেয়েমানুষগুলো মুহ্যমানের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে। কেষ্টভামিনী বলে, 'কী রে, তোরা চুপ করে আচিস কেন? কিচু বল।' বাইরে থেকে তাকে যতই জবরদস্ত মনে হোক, আসলে মানুষটা ভেতরে ভেতরে খানিকটা দুর্বল, বিশেষ করে মৃত্যু টৃত্যুর ব্যাপারে খুব অস্থির হয়ে পড়ে।

বয়স কম হলেও মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথা মুক্তার। বয়স তিরিশ বত্রিশ। শ্যামলা চেহারার শান্তশিষ্ট মেয়েমানুষটি মেয়েপাড়ার অন্য বাসিন্দাদের থেকে একটু আলাদা। সে বলে, 'বাবামাশায়রে তো একেনে ফেলে রাখা যাবে নি, শ্মোশানে নে যেতি হবে। কিন্তুন—'

কেষ্টভামিনী বলে, 'কিন্তুন কী?'

'বাবামশায়ের ভাইরা তো এই শহরে থাকে। এ-সময় তেনাদের খবর না দিলে আমরা পাপের ভাগী হয়ে থাকব। তাছাড়া মুকি আগুন দেবার জন্যি নিজেদের লোক দরকার।'

এই কথাটা আগে মাথায় আসে নি কেষ্টভামিনীর। সত্যিই তো, শেষ সময়ে ছেলে, ভাই বা রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের হাতের আগুনটুকু না পাওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। বাবামাশায় তাদের যতই কাছের মানুষ হোক, তার ভাইদের এই অন্তিম মুহূর্তে খবর দিতেই হবে। কেষ্টভামিনী বলে, 'ঠিক বুলেচিস। আমি নিজে যাব তেনাদের কাচে। কিন্তু—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়।

'কী?'

'বাবামাশায়ের সন্‌গে ওনাদের তো কোনও সম্পক্ক ছিলনি। অ্যাদ্দিন পর গেয়ে বুললে কি আসবে?'

'আমাদের দিক থেকে এট্টা কত্তব্য তো আচে। এলে এল, না এলে আর কী করব? মনকে বুঝোতে পারব, আমরা তিরুটি (ক্রটি) করি নি।'

কাজেই একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রিকশায় করে বেরিয়ে পড়ে কেষ্টভামিনী। বহুকাল আগে সারা গায়ে পারার ঘা নিয়ে প্রথম যে-বাড়িতে ভুবন চক্রবর্তীর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছিল, ভুবনের ভাইরা এখনও সেখানেই আছে।

মহারাজপুর মাঝখানের পঁচিশ তিরিশ বছরে অনেক বদলে গেছে কিন্তু ভুবন চক্রবর্তীদের পৈতৃক বাড়িটা সেই আগের মতোই আছে। ঠিক আগের মতো নয়, আরো পুরনো এবং জীর্ণ হয়েছে। দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে যে ইট বেরিয়ে পড়েছে সেগুলোতে নোনা লেগে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে আছে। ওটা যে ভাগের বাড়ি, একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যায়। সর্বত্র অযত্ন আর উদাসীনতার ছাপ। আসলে কেউ টাকা খরচ করতে চায় না।

বাড়িটার কাছে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ে কেষ্টভামিনী। যেখানে একদা 'ভুবন ফার্মেসি' ছিল, এখন সেটা একটা লন্ড্রি। হয়ত ভুবনের ভাইরা ভাড়া দিয়েছে লন্ড্রিওলাকে।

ভয়ে ভয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়তে একটা মধ্যবয়সী থলথলে চেহারার লোক বেরিয়ে আসে। চোখমুখের যা ছাঁচ তাতে তাকে ভুবন চক্রবর্তীর ভাই বলে সহজেই শনাক্ত করা যায়।

কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্র ঘৃণায় লোকটির কপাল কুঁচকে যায়। কেষ্টভামিনী কোত্থেকে আসছে সেটা না বলে দিলেও চলে। মেয়েপাড়ার জীবনযাপনের চিরস্থায়ী ছাপ তো আর মুখ থেকে এ-জন্মে তুলে ফেলা যাবে না।

লোকটি যে খুবই তেরিয়া মেজাজের সেটা তার গলা শুনেই টের পাওয়া যায়, 'কী চাই?'

বুক কাঁপছিল কেষ্টভামিনীর। হাতজোড় করে সে বলে, 'বাবামাশায় মারা গেচে।'

লোকটা খেঁকিয়ে ওঠে, 'কে বাবামাশায়?'

'ভোবন—ভোবন চক্কোত্তি মাশায়।'

লোকটা এবার চেঁচাতে গিয়েও থমকে যায়। এদিকে তার চিৎকার শুনে আরও কয়েক জন বাড়ির ভেতর থেকে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ওই লোকটাকে জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে মেজদা?'

লোকটা বলে, 'এই মাগীটা বলছে, দাদা নাকি মারা গেছে।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'তেনারে শ্মোশানে নে যেতি হবে। মুকি আগুন দেওয়ার জন্যি আপনার লোক দরকার। তাই—'

লোকটা অন্য ভাইদের সঙ্গে নিচু গলায় ফিস ফিস করে কী পরামর্শ করে নেয়। তারপর ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'বেশ্যার নাড়ি টিপে যে এতকাল বেঁচে ছিল তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যাও, ভাগো।'

'কিন্তু মুকি আগুন—'

কথা শেষ হবার আগে দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কেষ্টভামিনী কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে; তারপর ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে রিকশায় গিয়ে ওঠে।

'ভুবন ফার্মেসি'তে ফিরে এসে কেষ্টভামিনী সব জানালে অন্য মেয়েমানুষরা বলে, 'একন তা হলে উপায়?'

কেউ উত্তর দেয় না।

অনেকক্ষণ পর কেষ্টভামিনী বলে, 'আমি একটা কথা ভেবিচি।'

'কী?'

'কারোরে যকন পাচ্চি না, বাবামাশায়ের মুকি আমরাই আগুন দেব।'

মেয়েমানুষগুলো ভীষণ চমকে ওঠে। টগর বলে, 'কিন্তুক বাবামাশায় যে বামুন।' অর্থাৎ তাদের কাছে ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি করার মতো মহাপাপ আর হয় না।

ভুবন চক্রবর্তীর ভাইদের কাছে যাবার আগে কেষ্টভামিনীর মধ্যে যে দুর্বলতা আর দিশেহারা ভাবটা ছিল সেটা এর মধ্যে অনেকখানি কাটিয়ে নিয়েছে সে। কেষ্টভামিনী জানায়, বামুন হোক আর যা-ই হোক, ভুবন চক্রবর্তী তাদের বাবামাশাই। জন্মটাই নেহাত দেয়নি, নইলে পিতার যাবতীয় কর্তব্যই অকাতরে পালন করে গেছে। মৃত্যুর পর মুখাগ্নি ছাড়া তার সৎকার হবে, তা ভাবা যায় না। মুখে সামান্য একটু অগ্নিস্পর্শের জন্য ভুবনের পরলোকের পথ দুর্গম হয়ে উঠুক সেটা একেবারেই চায় না সে।

মেয়েমানুষগুলোর দ্বিধা তবু কাটে না। তারা বলে, 'কিন্তুন—'

কেষ্টভামিনী বলে, 'লরকে তো ডুবেই আচি। বামুনের মুকি আগুন ঠেকিয়ে আর কত ডুবব! মরার পর আমাদের কী হবে, তা লিয়ে ভেবে কী হবে!'

মেয়েরা আর আপত্তি করে না।

কাজেই খেলো কাঠের সস্তা একখানা খাট আসে, সেই সঙ্গে ফুল, খই। সযত্নে খাটে তোলা হয় ভুবনকে।

আরো কিছুক্ষণ পর এ-অঞ্চলের মানুষজন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে সাতাশটি ওঁচা মেয়েমানুষ খই ছড়িয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে খাটে শায়িত ভুবন চক্রবর্তীর নশ্বর দেহ কাঁধে তুলে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন দৃশ্য মহারাজপুরে আগে আর কখনও দেখা যায়নি।

শ্মশানটা শহরের শেষ মাথায় একটা মজা নদীর পাড়ে। সেখানে এসে ডোমকে দিয়ে চিতা সাজায় কেষ্টভামিনীরা। কাছাকাছিই থাকে শ্মশানের পুরুত নীলকণ্ঠ ভটচায। টগর গিয়ে তাকে ডেকে আনে।

এক সময় মন্ত্র পড়ে সাতাশটি মেয়েমানুষকে দিয়ে ভুবনের মুখাগ্নি করায় নীলকণ্ঠ। তারপর ডোম, যার নাম জগা, চিতায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

ভুবনের দেহ এই পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর মেয়েমানুষগুলো নদীতে স্নান করে মেয়েপাড়ায় ফিরে যায়।

কয়েক দিন বাদে শ্মশানের লাগোয়া নদীর পাড়ে সকাল বেলায় শ্রাদ্ধের আসর বসে। সাতাশটি মেয়ে স্নান করে নতুন কাপড় পরে, শুদ্ধ মনে জোড়হাতে আসর ঘিরে বসে থাকে।

সবার বড় বলে শ্রাদ্ধের অধিকারটা কেষ্টভামিনীর ওপরেই বর্তেছে। পুরুত নীলকণ্ঠ ভটচাযের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে মন্ত্র পড়ে যায়........

'ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভবঃ
নমঃ আকাশস্থঃ বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ।
ইদং নীরমিদং—'

মন্ত্রোচ্চারণের একটানা গম্ভীর সুর সমস্ত চরাচরে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

শেষ দৃশ্য

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে কিছুক্ষণ জিরোবার পর দোতলায় নিজস্ব লাইব্রেরিতে চলে এলেন মনোবীণা—ডক্টর মনোবীণা সেন।

বিশাল এই পড়ার ঘরখানায় তিন দিকের দেওয়ালের ভেতর ক্যাবিনেট বসিয়ে অগুনতি বই ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে প্রকাণ্ড গ্লাস-টপ টেবলটার সামনে বসে মনোবীণা লেখাপড়ার কাজ করেন সেটার একধারে টেলিফোন, রাইটিং প্যাড, পেন-স্ট্যান্ড, পিন এবং ক্লিপের বাক্স, রেডি রেকোনার, কাগজ কাটার ছুরি, স্টেপলার ইত্যাদি। আরেক দিকে ডাঁই-করা বই, ফাইল, দেশ বিদেশের হিস্টোরিক্যাল ম্যাগাজিন।

যাঁরা তাঁর সঙ্গে নানা দরকারে দেখা করতে আসেন তাঁদের বসার জন্য টেবলের উলটোদিকে আটটা গদি-মোড়া চেয়ার। এ ছাড়া এধারে ওধারে রয়েছে ক'টা সোফা, ডিভান। সেগুলোর কোনও কোনওটার ওপর স্তূপাকার বই। যে দেওয়ালটায় বইয়ের ক্যাবিনেট নেই, তার গা ঘেঁষে রয়েছে রঙিন মাছের অ্যাকোয়েরিয়াম।

এ-বাড়িতে সবসুদ্ধু তিনজন মানুষ। মনোবীণা, তাঁর স্বামী পরমেশ এবং তাঁদের একমাত্র ছেলে রজত। তিনজনের জন্য আলাদা আলাদা তিনটে পড়াশোনার ঘর। মনোবীণা ইতিহাসের অধ্যাপিকা, ডক্টরেট করেছেন অক্সফোর্ডে। দু'বছর হল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিটায়ার করে ব্রিটিশ আমলে বাংলার কৃষকদের ওপর একটা বই লিখছেন। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন এডুকেশন কমিটির তিনি চেয়ারপার্সন বা সম্মানিত সদস্য।

ঐতিহাসিক এবং অধ্যাপিকা হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

তাঁর স্বামী পরমেশ সেন অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের নাম-করা অধ্যাপক। তিনিও বছর চারেক আগে রিটায়ার করে সরকারি এবং বেসরকারি নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন।

তাঁদের ছেলে রজত ইকোনমিকসের লেকচারার। বছর খানেক হল সে একটা বিখ্যাত সরকারি কলেজে চাকরি পেয়েছে।

মা এবং ছেলের স্টাডি দোতলায়, পরমেশেরটা নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোরে। এই তিনজন ছাড়া আছে চার পাঁচটি কাজের লোক, ড্রাইভার ইত্যাদি।

মনোবীণা তাঁর টেবলের সামনে ফোম-বসানো রিভলভিং চেয়ারে বসলেন। বয়স প্রায় সাতষট্টি। গায়ের রং কালোও নয়, ফর্সাও নয়। দুইয়ের মাঝামাঝি। এখনও চমৎকার স্বাস্থ্য তাঁর। একটা দাঁতও পড়ে নি, ত্বক মোটামুটি মসৃণ। লম্বাটে মুখ, পুরু ফ্রেমের চশমার ওধারে উজ্জ্বল চোখ। চুলের আধাআধি সাদা হয়ে গেছে। শিরদাঁড়া এখনও টান টান। এক ফোঁটা অনাবশ্যক চর্বি নেই। তাঁকে ঘিরে এমন এক প্রখর ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা বাদ দিয়ে তাঁকে ভাবা যায় না।

মনোবীণা এ-বছর আমেদাবাদে যে হিস্ট্রি কংগ্রেস হচ্ছে তার মূল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। দু'মাস পর অধিবেশন বসবে, তার জন্য সভাপতির ভাষণ লিখতে হবে। তা ছাড়া হিস্ট্রি কংগ্রেসের কুড়ি দিন বাদে মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে কনভোকেশন অর্থাৎ সমাবর্তন ভাষণ

দিতে হবে। তাঁর অজস্র দায়িত্বের মধ্যে এই কাজ দু'টো অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য বেশি সময়ও হাতে নেই।

মনোবীণা ঠিক করে রেখেছেন, আজ হিস্ট্রি কংগ্রেসের ভাষণটা লিখতে শুরু করবেন।

টেবলের ওপর পঁচিশ তিরিশটা চিঠি এবং প্যাকেট খুব যত্ন করে সাজানো। এটা নিশ্চয়ই সতীশের কাজ। প্রতিদিনের চিঠিপত্র ওভাবে গুছিয়ে রেখে যায় সে।

হাত না দিয়েও মনোবীণা বলে দিতে পারেন, চিঠি আর প্যাকেটের বেশির ভাগই এসেছে স্টেট আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন দপ্তর এবং নানা ইউনিভার্সিটি থেকে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত চিঠিও কিছু কিছু আছে। হিস্ট্রি কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে চিঠিপত্র এবং টেলিগ্রাম আসা বেশ বেড়ে গেছে।

মনোবীণা ঠিক করলেন, আজকের চিঠিগুলো দেখার পর লেখায় হাত দেবেন।

পড়ার ঘরে আসার আগে সতীশকে কফির কথা বলে এসেছিলেন। সে একটা ট্রে-তে কফির কাপ, আর কিছু কাজু এবং বিস্কুট এনে টেবলের ওপর রেখে চলে যায়। লোকটা মাঝবয়সী। পেটানো স্বাস্থ্য তার। কথা খুব কম বলে, কিন্তু কাজের ব্যাপারে দারুণ চটপটে।

কফি খেতে খেতে এনভেলপ এবং প্যাকেটের মুখ কাঁচি দিয়ে কেটে ভেতর থেকে চিঠি টিঠি বার করতে লাগলেন। প্রথম দু'টো চিঠি এসেছে মাদ্রাজ এবং নাগপুর ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে, তিনটে প্যাকেট এসেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তিন দপ্তর থেকে। প্যাকেটগুলো সরিয়ে রেখে পরের চিঠিটি তুলে নেন মনোবীণা। সাধারণ খামের ওপর হাতে লেখা তাঁর নাম ঠিকানা। অক্ষরগুলো এঁকেবেঁকে গেছে। মনে হয়, কেউ কাঁপা হাতে লিখেছে।

কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর খাম কেটে চিঠি বার করেন মনোবীণা। সাদা কাগজের ওপর একই ছাঁদে আঁকাবাঁকা হরফে কয়েকটি লাইন লেখা রয়েছে। তিনি পড়তে শুরু করেন।

'জানি দুরাশা, তবু চিঠিটা শেষ পর্যন্ত না লিখে পারলাম না।

'আমি মৃত্যুশয্যায়। যদি একবার আসতে পার, কৃতার্থ হব। না এলেও আক্ষেপ নেই। প্রত্যাশা বিফল হবে জানি, তবুও যতক্ষণ শেষ নিঃশ্বাস না পড়ে, অপেক্ষা করে থাকব।—শিবতোষ।'

দু' তিন বার চিঠিটা পড়লেন মনোবীণা। প্রথমটা কপাল কুঁচকে গেল তাঁর। কত কাল? প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বাদেও লোকটাকে চিনতে এতটুকু অসুবিধা হয় না। শিবতোষের স্পর্ধায় তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান।

ধীরে ধীরে চিঠি থেকে চোখ সরিয়ে সামনের বিশাল জানালা দিয়ে বাইরে তাকান মনোবীণা। এখানে অর্থাৎ এই সল্টলেকে চারিদিক পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম এবং নিরিবিলি। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক প্রচুর গাছপালা, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। এখন, এই অক্টোবরের বিকেলে ঝলমলে মায়াবী রোদে প্রচুর পাখি উড়ছে।

মনোবীণার পড়ার ঘরের জানালার ফ্রেমে অলৌকিক একটি ছবি যেন আটকানো। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই তাঁর। কোনও অদৃশ্য টিভি স্ক্রিনে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার এক লম্পট মাতাল উড়নচণ্ডে যুবকের মুখ ফুটে উঠতে থাকে। সে মুখ শিবতোষ দাশগুপ্তের।

পঁয়ত্রিশ বছর তাকে দেখেন নি মনোবীণা। শিবতোষের সঙ্গে যখন তাঁর ডিভোর্স হয়ে যায় তখন তাঁর বয়স ছিল বত্রিশ। এতকাল বাদেও তার চেহারাটি যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এই পৃথিবীতে যতটা খারাপ হওয়া যায়, শিবতোষ ছিল তা-ই। তবু স্বীকার করতেই হবে সে ছিল আশ্চর্য সুপুরুষ। প্রায় ছ'ফিটের মতো হাইট, মসৃণ ত্বক। গায়ের রংয়ে উজ্জ্বল হলুদ

আভা। ভরাট মুখ তার, পাতলা নাক দুই ভুরুর মাঝখান থেকে নেমে এসেছে। ব্যাকব্রাশ-করা ঘন চুল, চওড়া কপাল। তার তাকানোর মধ্যে স্বপ্নের মতো কিছু মাখানো থাকত।

এমন রূপবান পুরুষ জীবনে আর একটিও দেখেন নি মনোবীণা। প্রথম দিকে শিবতোষ তাঁকে যতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, পরে তিনি তাকে তার চেয়েও বেশি ঘৃণা করতেন।

'মা—'

কার ডাকে চমকে জানালার বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকান মনোবীণা। ওধারে দরজার সামনে রজত দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর এবং পরমেশের একমাত্র সন্তান। ঝকঝকে চেহারা তার। বয়স সাতাশ আটাশ।

মনোবীণা অন্যমনস্কর মতো জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বলবি?'

'তুমি কি আজ আর বেরুবে?'

'কেন রে?'

'আমি গাড়িটা নিয়ে কলেজ স্ট্রিট যাব। ক'টা বই কিনতে হবে।'

এক মুহূর্ত আগেও সেভাবে কিছু ভাবেন নি মনোবীণা। হঠাৎ তিনি যেন মনস্থির করে ফেলেন। বলেন, 'আমাকে আর একবার বেরুতে হবে। তুই নিচে গিয়ে গাড়িতে বোস। আমি শাড়িটা বদলে আসছি।'

'আচ্ছা—' রজত ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকে।

আর শোওয়ার ঘরে গিয়ে শুধু শাড়িই পালটান না মনোবীণা, আলমারি থেকে ব্যাঙ্কের চেক-বই বার করে ব্যাগের ভেতর নিয়ে নেন। তারপর নিচে এসে দেখেন, ড্রাইভার রামধারী সিং স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। ব্যাক সিটে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল রজত, সে দরজা খুলে দেয়।

পরমেশ কলকাতায় নেই, একটা কনফারেন্সে পেপার পড়ার জন্য দিল্লি গেছেন।

গাড়িতে উঠে রজতের পাশে বসতে বসতে মনোবীণা বলেন, 'রামধারী, আগে শ্যামবাজার চল।'

'জি—' বলে স্টার্ট দেয় রামধারী।

এই বিকেলবেলায় রাস্তায় প্রচুর লোকজন। পপুলেশান এক্সপ্লোসন কাকে বলে কলকাতায় এলে টের পাওয়া যায়। চারিদিকে থিকথিকে ভিড়। তা ছাড়া, স্রোতের মতো ছুটছে ট্যাক্সি বাস মিনি ট্রাক অটো ট্রাম। ফাঁকে ফাঁকে রিকশা।

দু'ধারের দৃশ্যাবলী কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না মনোবীণা। অদৃশ্য পর্দায় ফের শিবতোষের মুখ ভেসে উঠতে থাকে।

এক বিয়ে-বাড়িতে তার সঙ্গে মনোবীণার আলাপ। তখন এম. এ পড়ছেন তিনি। দুর্দান্ত ছাত্রী। ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইন্টারমিডিয়েটে স্ট্যান্ড করেছেন। বি. এ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড। এম.এ'তেও যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট বা সেকেন্ড হবেন, তা অবধারিত।

চমৎকার কথা বলতে পারত শিবতোষ। তাকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন মনোবীণা। তাঁর মতো চাপা সংযত ইনট্রোভার্ট ধরনের মেয়ের কী যে হয়ে গিয়েছিল, নিজেই জানেন না। বিয়ে-বাড়ির সেই আলাপটা সেখানেই থেমে থাকে নি। বলা যায়, আগ্রহটা তাঁর দিক থেকেই ছিল বেশি। পরেও শিবতোষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন।

আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা, তারপর শিবতোষের সঙ্গে বিয়েটাও এম.এ পরীক্ষার আগেই যে হয়ে গিয়েছিল, সেটা একরকম তাঁরই জেদে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সংযমী এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী

মনোবীণা জীবনে একবারই অতি সাধারণ মেয়ের মতো যে ভুলটি করেছিলেন তা হল এই বিয়ে। কিন্তু তখন তিনি এমনই আচ্ছন্ন যে ভালোমন্দ বোঝার মতো মনের অবস্থা অবশ্যই ছিল না।

তাঁর বাবা ছিলেন ফিজিক্সের অধ্যাপক। এ-বিয়েতে বাবার প্রবল আপত্তি ছিল। প্রথমত, শিবতোষরা প্রচণ্ড বড়লোক। তাদের তিন জেনারেশনের স্টিভেডরি ব্যবসা। প্রচুর পয়সা থাকলেও লেখাপড়ার দিকটায় বলার মতো কিছু ছিল না। ওদের বংশের কেউ কলেজের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি। শিবতোষের বাবা এবং ঠাকুরদা টায়টোয় পাস কোর্সের বি.এ। পিসিটিসিরা স্কুলের বাউন্ডারি ছাড়াবার আগেই শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল। আর শিবতোষ দু দু'বার বি. কম ফেল করে কলেজে যাওয়াই ছেড়ে দেয়।

মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় মনোবীণারা ছিলেন তাই। বিরাট ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, বিশাল বাড়িটাড়ি না থাকলেও লেখাপড়ার ব্যাপারে তাঁদের কিঞ্চিৎ অহঙ্কার ছিল। এই বংশের ছেলেমেয়ে এমন কেউ নেই যে ইউনিভার্সিটি থেকে শেষ ডিগ্রিটা আনতে যায় নি। কেউ কেউ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ হার্ভার্ড বা টোরোন্টো থেকেও ডক্টরেট করে এসেছে।

আসলে গোলমালটা এখানেই। বাবার ধারণা ছিল, দুই পরিবারের কালচারে এতই তফাত যে মনোবীণা শিবতোষের সঙ্গে একেবারেই মানিয়ে নিতে পারবেন না।

আশ্চর্য, বিয়ের ব্যাপারে শিবতোষদের বাড়ি থেকে কিন্তু আপত্তি হয় নি। খুব সম্ভব সেটা লেখাপড়ার জন্য, মনোবীণাদের ফ্যামিলির খ্যাতির কারণে। দারুণ সুন্দরী না হলেও অসাধারণ বিদুষী একটি পুত্রবধূ পাওয়া খুব সহজ ছিল না। বিশেষ করে শিবতোষ যেখানে বি. কম'-টাও পাস করতে পারে নি।

বিয়ে হয়ে যাবার পর শ্বশুরবাড়িতে এসে ঘোরের মধ্যে ক'টা মাস কেটে গেছে মনোবীণার। তারই ভেতর তিনি লক্ষ করেছেন, মেয়েদের ব্যাপারে এ-বাড়ির লোকেরা ভীষণ কনজারভেটিভ। তাদের চলাফেরায় দারুণ কড়াকড়ি। একা একা কেউ রাস্তায় বেরোক, এরা তা চাইত না। বাইরের লোকজন এলে হুট করে তাদের সামনে মেয়েরা যাক, এটা ভাল চোখে দেখা হত না। এ-বাড়িতে প্রচুর নিষেধাজ্ঞা, মেয়েদের জন্য অনেক দরজা জানালা বন্ধ ছিল।

অথচ মনোবীণাদের বাড়ির ছবিটা একেবারে উলটো। সেখানে মেয়ে আর ছেলেদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই। সবার জন্যই দরজা জানালা খোলা। অমন মুক্ত আবহাওয়া থেকে শিবতোষদের বাড়ি আসার পর মনোবীণা টের পাচ্ছিলেন, কখন যেন নিঃশব্দে তাঁর হাতে পায়ে অদৃশ্য একটি শিকল পরানো হয়েছে। তবু এরই মধ্যে এম.এ পরীক্ষাটা দিয়েছিলেন। কোনওরকমে ফার্স্ট ক্লাসটা পেয়েছেন। ফার্স্ট বা সেকেন্ড হতে পারেন নি।

সমস্যাটা প্রথম দেখা দিল যখন মনোবীণা রিসার্চ করতে চাইলেন।

শিবতোষদের ছিল জয়েন্ট ফ্যামিলি। তার বাবারা হলেন দুই ভাই। বাবা বড়। কাকা আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। চার পিসি শিবতোষের। তাঁরা সবাই তখন পরের ঘরে।

শিবতোষ আর মনোবীণা ছাড়া শ্বশুরবাড়িতে তখন ছিলেন শ্বশুর, শাশুড়ি, বিধবা খুড়শাশুড়ি আর শিবতোষের নব্বই বছরের বুড়ো অথর্ব ঠাকুমা।

রিসার্চের ব্যাপারে আপত্তি এসেছিল সবার কাছ থেকে। এম.এ'র ডিগ্রি পাওয়া গেছে। এই যথেষ্ট। বাড়ির বউয়ের পক্ষে আর পড়াশোনার দরকার নেই। কিন্তু মনোবীণা রিসার্চ করবেনই। এই নিয়ে যখন টেনশন চলছে সেই সময় হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা যান শ্বশুর। গবেষণার ব্যাপারটা তখনকার মতো চাপা পড়ে যায়।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা এসে পড়ে শিবতোষের হাতে। যতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন, স্বভাবটা যেন খাপে আটকানো ছিল তার। এবার সেটা ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকে মনোবীণা টের পাচ্ছিলেন, শিবতোষ মদ টদ খায়। এককে দিন রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বেশ মাতাল হয়েই বাড়ি ফিরত। ওর পিসতুতো বোনেদের মুখেই তিনি শুনেছিলেন, মেয়েদের নিয়ে আগে অনেক কেলেঙ্কারি করেছে শিবতোষ। কিন্তু তখন কিছু করার ছিল না।

যাই হোক, ব্যবসা হাতে পাওয়ার পর দু'হাতে টাকা ওড়াতে থাকে শিবতোষ। বাবা বেঁচে থাকতে যেটুকু রাখঢাক ছিল, সেটা আর রইল না। বিয়ের পর কিছুদিন বিদুষী স্ত্রীকে মূল্যবান সম্পত্তি মনে হত। তারপর দ্রুত মোহ কেটে যেতে থাকে। মদ মেয়েমানুষ জুয়া ইত্যাদি ব্যাপারে এতই সে মেতে ওঠে যে তিন জেনারেশনের পারিবারিক ব্যবসাটি দু' বছরের মধ্যে প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।

মনোবীণা এ-সব মেনে নেন নি। প্রচণ্ড অশান্তি এবং তিক্ততার পর তিনি একদিন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সোজা বাবার কাছে চলে আসেন। আর কখনও সেখানে ফিরে যান নি।

মনে পড়ে, বাবা প্রথম প্রথম শিবতোষের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে বলেছিলেন কিন্তু ততদিনে মনস্থির করে ফেলেছেন তিনি। যে জেদ নিয়ে একদা শিবতোষকে বিয়ে করেছিলেন, সেই জেদটাই আরো জোরালো হয়ে তাঁকে দিয়ে ডিভোর্সের মামলা করে ছাড়ে। তখনকার দিনে বিবাহ-বিচ্ছেদটা আকছার ঘটত না। এই নিয়ে কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। সারা কলকাতা যেন তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল।

ডিভোর্স প্রথমে দিতে চায়নি শিবতোষ। যতরকম নোংরামো এবং অসভ্যতা করা সম্ভব, সব করেছে সে। মনোবীণার আত্মীয়স্বজন আর চেনাজানা সবার কাছে বেনামি চিঠি পাঠিয়ে কুৎসা ছড়িয়ে গেছে। সামাজিক দিক থেকে তাঁকে চূড়ান্ত অপদস্থ এবং অসম্মান করার ব্যবস্থা করেছে। তবু শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স ঠেকানো যায় নি।

এই সময় পরমেশকে আবার দেখেন মনোবীণা।

পরমেশ কলেজে তাঁর বাবার ছাত্র ছিলেন। তখন মাঝে মধ্যে তাঁদের বাড়ি আসতেন। সামান্য আলাপ-টালাপও হয়েছিল। কিন্তু মনোবীণা তাঁকে তেমনভাবে মনে করে রাখেন নি।

এখানকার পড়া শেষ করে বেশ কয়েক বছর আমেরিকায় কাটিয়ে রিসার্চ করেছেন পরমেশ। দেশে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে ফিরে এসে একদিন পুরনো মাস্টারমশাই অর্থাৎ মনোবীণার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নতুন করে এবার তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় মনোবীণার। সমস্ত শোনার পর গভীর সহানুভূতি এবং অসীম উদারতায় পরমেশ তাঁকে কাছে টেনে নেন। এরপর দ্বিতীয় বার বিয়ে। বিয়ের কয়েক মাস বাদে একটা স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ডে চলে যান মনোবীণা। ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ। তারপর আর পেছন ফিরে তাকানোর সময় পান নি। দ্বিতীয় বার জীবন তাঁকে বঞ্চিত করে নি। এবার শুধুই সম্মান সাফল্য খ্যাতি এবং পরিপূর্ণতা। এর মধ্যে একদিন রজতের জন্ম হয়েছে।

নানা কাজের ভেতর দু-একবার কারা যেন খবর দিয়েছিল, শিবতোষের মা এবং কাকিমা মারা গেছেন। আর শিবতোষ ক্রমশ নিজেকে শেষ করে চলেছে।

হঠাৎ রামধারী সিংয়ের গলা কানে আসতে চমকে ওঠেন মনোবীণা, মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'কী বলছ?'

রামধারী বলে, 'মা'জি, আমরা শ্যামবাজারে এসে গেছি।'

এতক্ষণ খেয়াল করেননি, এবার মনোবীণার চোখে পড়ে, তাঁরা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে এসে পড়েছেন। বলেন, 'গাড়ি থামাও, আমি এখানে নেমে যাব।'

পাশ থেকে রজত বলে, 'এখানে কেন? কোথায় যাবে বল। সেখানে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।'

'দরকার নেই। কাছেই যাব। তোরা কলেজ স্ট্রিট চলে যা।'

আসলে মনোবীণা চান না, ছেলে তাঁর সঙ্গে যাক। সেটা খুবই অস্বস্তিকর।

রজত খুবই নম্র, শান্ত ধরনের ছেলে, মা বাবা যা বলেন তা নিঃশব্দে মেনে নেয়। সে আর কিছু বলে না।

রামধারী ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয়। দরজা খুলে নামতে নামতে মনোবীণা বলেন, 'তোর বই কেনা হলে বাড়ি চলে যাস। আমি ট্যাক্সি করে চলে যাব।'

'তোমার ফিরতে দেরি হবে?'

'না না, বড় জোর ঘন্টা দুই লাগবে। সাতটা, সাড়ে-সাতটার ভেতর ফিরে যাব।'

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রামধারীরা চলে যায়। আর মনোবীণা চওড়া রাস্তা পেরিয়ে ওধারের অন্য একটা মাঝারি রাস্তায় চলে আসেন। চলতে চলতে টের পান, বুকের ভেতর দিয়ে হাজারটা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে।

পঁয়ত্রিশ বছর বাদে তিনি এই রাস্তায় এলেন। এতগুলো বছর কেটে গেছে কিন্তু এখানকার কিছুই পালটায় নি। বাড়িঘর দোকানপাট হুবহু সেদিনের মতোই রয়েছে।

চলতে চলতে মনোবীণার মনে হয়, কিছুই তাঁর স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে যায় নি। কোন বাড়িটা কাদের ছিল, সব নির্ভুল বলে দিতে পারবেন।

মিনিট তিনেক হাঁটার পর বাঁ দিকে একটা বিরাট কম্পাউন্ডওলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান মনোবীণা। সামনের লোহার গেটের একটা পাল্লা ভেঙেচুরে গেছে, জং-ধরা অন্য পাল্লাটা হাট করে খোলা।

গেটের পর একসময় চমৎকার ফুলের বাগান ছিল, তার মাঝখান দিয়ে নুড়ির পথ। বাগানটা এখন আগাছার জঙ্গল। আর পথটায় নুড়ি টুড়ি নেই, শুধুই শ্যাওলা-ধরা স্যাঁতসেঁতে মাটি।

জঙ্গলের ওধারে বড় বড় থামওলা বিশাল তেতলা বাড়ি। বাড়িটা যেন ভগ্নস্তূপ। পলেস্তারা খসে কবে যেন দেওয়ালের ইট বেরিয়ে পড়েছে। ছাদ ফাটিয়ে বট আর অশ্বত্থেরা মাথা তুলে আছে। একটা জানালাও আর আস্ত নেই। খড়খড়ি আর কাচের পাল্লা ভেঙেচুরে গেছে।

নোনা-ধরা ভাঙাচোরা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে আছে। যে কোনওদিন হুড়মুড় করে ধসে পড়বে।

এই বাড়িটা একদিন গমগম করত। কাজের লোক, দারোয়ান, ড্রাইভার ইত্যাদি মিলিয়ে ছিল আট দশ জন। এখন ভেতরে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। চারিদিক নির্জন, সুনসান, স্তব্ধ। শুধু ছাদের কার্নিসে বসে ক'টা কাক থেকে থেকে কর্কশ গলায় কা কা করে উঠছে।

এ-বাড়িতে এখন কেউ কি থাকে? ভাবতেই মনোবীণার মনে পড়ল, শিবতোষ এখানকারই ঠিকানা দিয়েছে। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ গেটের পাশের দেওয়ালে একটা বড় টিনের পাতে কালো হরফের লেখাটা চোখে পড়ে। 'দিস বিল্ডিং ইজ এ প্রপার্টি অফ রমেশ আগরওয়াল।' তার নিচে একটা ঠিকানাও লেখা রয়েছে। অর্থাৎ বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে।

লেখাটা পড়ার পর কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন মনোবীণা, তারপর ধীরে ধীরে ভেতরে চলে আসেন। আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মেটে পিছল পথটা পেরোলেই গাড়ি বারান্দা। তারপর আটটা চওড়া সিঁড়ির মাথায় ঢালা বারান্দা। একসময় সিঁড়ি এবং বারান্দা শ্বেত পাথরে বাঁধানো ছিল। এখন পাথর টাথর প্রায় নেই বললেই হয়, শুধু চারিদিকে চৌকো চৌকো গর্ত।

এ-বাড়ির সব কিছু মনোবীণার মুখস্থ। চল্লিশ বছর পরও চোখ বুজে এখানকার কোথায় কী আছে বলে দিতে পারবেন।

নিচের সিঁড়ি, বারান্দা ইত্যাদি পেছনে ফেলে বড় দরজা দিয়ে ভেতরে চলে আসেন মনোবীণা।

দরজা পেরোলেই লম্বা প্যাসেজ। সেটার ডান দিকে একদা সুসজ্জিত প্রকাণ্ড ড্রইং রুম ছিল। তার উলটো দিকে দোতলায় যাবার কাঠের সিঁড়ি। চল্লিশ বছর আগে সিঁড়ি এবং তার পাশের কাঠের রেলিংয়ের ওপর ছিল পেতলের নকশা-করা প্যানেলিং। এখন পেতল টেতল নেই। সিঁড়ি, রেলিং ক্ষয়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে।

ওপরে উঠতে উঠতে মনোবীণার হঠাৎ মনে হয়, আজ এতকাল পরে তিনি এ-বাড়িতে এলেন কেন? শিবতোষের কাতর আর্জিই তার কারণ? নাকি এখানে আসার জন্য একটা গোপন ইচ্ছা তাঁর মনের কোনও অনাবিষ্কৃত অংশে লুকিয়ে ছিল? ভাবতেই মনোবীণার পা থেমে যায়। যার সঙ্গে পঁয়ত্রিশ বছর আগেই অসীম তিক্ততায় সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তাকে দেখতে আসার কোনও সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না। শিবতোষকে চিঠি লিখে তাঁর অক্ষমতা বা অনিচ্ছা জানিয়ে দিতে পারতেন মনোবীণা। কিংবা তার করুণ অনুরোধ পুরোপুরি উপেক্ষাও করা যেত।

ফিরে যাবেন কিনা যখন ভাবছেন, সেই সময় ধনঞ্জয়কে দেখতে পান মনোবীণা। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তারপর তিনটি সিঁড়ি ভাঙলেই দোতলার চওড়া প্যাসেজ। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছে ধনঞ্জয়।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে ধনঞ্জয়ের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। দারুণ চটপটে কর্মঠ লোক ছিল সে। এখন মাথার চুল দাড়ি গোঁফ ভুরু, সব সাদা ধবধবে। পিঠ বেঁকে গেছে। শরীর এত রুগ্‌ণ যে টান টান হয়ে দাঁড়াবার মতো শক্তিটুকুও তার অবশিষ্ট নেই। তোবড়ানো গাল, গজালের মতো ফুঁড়ে বেরুনো কণ্ঠার হাড়, শুকনো গাছের ডালের মতো শির বার-হওয়া হাত-পা দেখলে কে বলবে এই লোকটা একসময় এত বড় বাড়ি দাপিয়ে কাজ করত।

পাকা ভুরুর ওপর হাত রেখে মনোবীণাকে ভালো করে ঠাহর করার চেষ্টা করে ধনঞ্জয়। তার চোখে জোর নেই, বোধহয় ছানি পড়েছে।

ধনঞ্জয় বলে, 'কে ওখানে দাঁড়িয়ে?'

বোঝা যায়, ধনঞ্জয় তাঁকে চিনতে পারে নি। চোখে ছানি পড়ে এ-একরকম ভালোই হয়েছে। নইলে কেঁদে কেটে, হইচই বাধিয়ে সে একটা কাণ্ডই বাধিয়ে ফেলত।

এখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই। মনোবীণা বলেন, 'আমাকে চিনবে না। শিবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে ধনঞ্জয়। তারপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, 'আসুন।'

দোতলায় উঠে ডান দিকের প্যাসেজ ধরে পাশাপাশি চলতে চলতে ধনঞ্জয় নিজের মনেই বকে যায়, 'কত কাল বাদে এ-বাড়িতে লোক এল! কেউ তো আর আজকাল আসে না।'

এই প্যাসেজটার শেষ মাথায় একসময় একটা বিরাট গ্র্যান্ডফাদার ক্লক ছিল। সেটা এখনও আছে, তবে চলছে না। আজ, কাল, না দু'বছর, পাঁচ বছর কিংবা তারও আগে কবে যে দু'টো বেজে ওটা বন্ধ হয়ে গেছে, কে জানে।

এধারে ওধারে ঘুলঘুলিতে প্রচুর পায়রা। আন্দাজ করা যায়, বহুকাল ধরে পুরুষানুক্রমে ওরা ওখানে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে।

একটা ঘরের সামনে এসে ধনঞ্জয় চেঁচিয়ে বলে, 'একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে।'

ভেতর থেকে দুর্বল কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'কে?'

'চিনি না।'

'আসতে বল।'

ধনঞ্জয় মনোবীণাকে 'যান' বলে পেছন ফিরে চলে যায়।

প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী মনোবীণা হঠাৎ টের পান তাঁর শরীর কাঁপছে। নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগে। তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে চলে আসেন।

এ-ঘরের সিলিং থেকে বালি-সিমেন্টের চাঙড় খসে চারিদিকে ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে। পুরনো মডেলের বিরাট বিরাট ব্লেড-ওলা দু'টো ফ্যান স্থির হয়ে আছে। এধারে ওধারে প্রাচীন কালেব ভারী ভারী রং-চটা সব আসবাব। অযত্নে অব্যবহারে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এক কোণে, জানালার ধার ঘেঁষে একটা প্রকাণ্ড ভাঙাচোরা খাটের মাঝখানে তেলচিটে নোংরা বিছানায় যে শুয়ে আছে, আগে থেকে না জানা থাকলে তাকে শিবতোষ বলে চিনতেই পারতেন না মনোবীণা।

এই বাড়িটার মতোই সে যেন একটা ধ্বংসস্তূপ। শরীর বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে আছে। ভাঙাচোরা মুখ। চোখ এক আঙুল গর্তে ঢোকানো, তার তলায় গাঢ় কালির পোঁচ। চামড়া কুঁচকে ঝলঝল করছে। সারা গায়ে শাঁস বলতে কিছু নেই। চুল উঠে উঠে মাথার আধাআধি পর্যন্ত মাঠ হয়ে গেছে। সব হাড় এবং শিরা চামড়ার তলা থেকে ফুটে বেরিয়েছে।

বুকের ভেতর থেকে অনবরত সাঁই সাঁই করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল শিবতোষের। যে-সুপুরুষ যুবকটিকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে মনোবীণা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাকে এই জীর্ণ পঙ্গু শয্যাশায়ী শিবতোষের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পায়ের আওয়াজে মাথাটা ডান পাশে কাত করে তাকায় শিবতোষ। সে কিন্তু মনোবীণাকে এক পলক দেখেই চিনতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু ঘটে যায়। চোখ দু'টো অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করতে থাকে। মনে হয়, তার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

একটা হাত সামান্য তুলে শিবতোষ বলে, 'আমার ওঠার শক্তি নেই। কষ্ট করে তুমি যদি এখানে আসো—' চাপা উত্তেজনায়, হয়তো বা খুশিতে তার গলা কাঁপতে থাকে।

মনোবীণা এগিয়ে যান। খাটের পাশে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার রয়েছে। সেটা দেখিয়ে শিবতোষ বলে, 'বোসো বোসো—' মনোবীণা বসার পর বলে, 'ডান দিকটা প্যারালিসিস হয়ে গেছে। আমি কিন্তু শুয়ে শুয়েই কথা বলছি—'

মনোবীণা ব্যস্তভাবে বলেন, 'ঠিক আছে। ওঠার চেষ্টা করতে হবে না।'

বিষণ্ণ হাসে শিবতোষ, 'চেষ্টা করলেও পারব না।'

মনোবীণা জিগ্যেস করেন, 'প্যারালিসিসটা কবে হল?'

'বছর দেড়েক আগে। সেই থেকে বেড-রিডন।'

'ডাক্তার দেখাচ্ছ?'

'গোড়ার দিকে দেখিয়েছি। এখন আর দেখাই না। যা সারবে না তার জন্যে টাকা ঢেলে লাভ নেই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

পলকহীন মনোবীণার দিকে তাকিয়ে আছে শিবতোষ। সে বলে, 'তুমি যে শেষ পর্যন্ত আসবে, ভাবতে পারি নি।'

মনোবীণা উত্তর দেন না।

শিবতোষ আবার বলে, 'দেশে বিদেশে তোমার কত নাম। খবরের কাগজে তোমার ছবি বেরোয়। তোমার সম্বন্ধে যখন লেখা দেখি, গর্ব হয়। কিন্তু সে-কথা কাউকে মুখ ফুটে বলার অধিকার আমার নেই।'

বিব্রত বোধ করতে থাকেন মনোবীণা। বলেন, 'এ-সব কথা থাক।'

শিবতোষ যেন শুনতে পায় না। সে নিজের ঝোঁকেই বলে যায়, 'তুমি ডিভোর্স নিয়ে ঠিক করেছ। এখানে থাকলে লাইফটা নষ্ট হয়ে যেত।'

এই প্রসঙ্গ মনোবীণার পক্ষে ভীষণ অস্বস্তিকর। পারতপক্ষে তিনি এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে চান না। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলেন, 'ঢোকার সময় গেটের পাশে দেখলাম, কে এক রমেশ আগরওয়াল এ-বাড়ির মালিক।'

শিবতোষ বলে, 'হ্যাঁ। রমেশের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার করেছিলাম। ঋণের দায়ে শেষ পর্যন্ত স্বত্ব লিখে দিতে হল। তবে লোকটার দয়ামায়া আছে। যতদিন বেঁচে থাকব, এখান থেকে উচ্ছেদ করবে না। অবশ্য—'

মনোবীণা রুদ্ধশ্বাসে জিগ্যেস করেন, 'কী?'

শিবতোষ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলে, 'বেশি দিন রমেশকে অপেক্ষা করতে হবে না। আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। বড় জোর দু'চার মাস।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন না মনোবীণা। বুকের ভেতর গাঢ় বিষাদের মতো কিছু একটা অনুভব করেন। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'এভাবে ভাবছ কেন?'

'এটাই সত্যি যে।'

এবার মনোবীণা বলেন, 'বাড়িতে ধনঞ্জয় ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না তো।'

শিবতোষ বলে, 'আর কেউ নেই যে। বাবা মা কাকিমা ঠাকুমা—সব আগেই মারা গেছে। কাজের লোকেরা এক এক করে সরে পড়েছে। শুধু টিকে আছে ওই ধনঞ্জয়টা।'

এর পর কখনও টুকরো টুকরো কথায়, কখনও নীরবতায় সময় কেটে যায়।

উত্তর কলকাতার আকাশ থেকে বিকেলের আলো মুছে যেতে থাকে। খুব সম্ভব ওধারের উঁচু উঁচু ঘিঞ্জি বাড়িগুলোর আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে। মিহি অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

একসময় মনোবীণা বলেন, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

শিবতোষ আবছা গলায় বলে, 'তা তো হবেই।'

চোখের কোণ দিয়ে মনোবীণা একবার শিবতোষকে লক্ষ করেন। তারপর বলেন, 'আমাকে আসতে লিখেছিলে কেন? তোমার কি কিছু টাকা পয়সার দরকার? সংকোচ না করে বল।'

চমকে ওঠে শিবতোষ। সুস্থ সক্ষম হাতটা প্রবল বেগে নেড়ে বলে, 'না—না—না—' আর্ত

তীক্ষ্ণ চিৎকারের মতো শব্দগুলো তার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে, 'আমার কিছুই চাই না।'

হকচকিয়ে যান মনোবীণা। প্রচণ্ড অস্বস্তি এবং গ্লানি বোধ করতে থাকেন তিনি। ভুল বুঝে চেক-বই সঙ্গে এনেছিলেন। বলেন, 'তা হলে?'

'তোমার সঙ্গে অনেক ইতরামো করেছি। তোমার জীবনটা প্রায় ধ্বংসই করে দিচ্ছিলাম।' বলে একটু থামে শিবতোষ। তারপর শ্বাসটানার মতো শব্দ করতে করতে বলে যায়, 'আর কিছুই না, শুধু একটু ক্ষমা চাই। এরপর আর হয়তো সময় পাব না। তাই চিঠিটা লিখেছিলাম।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন মনোবীণা।

মানুষের মহিমা

পুরনো আমলের নরম গদিওলা বিশাল খাটটার ঠিক মাঝখানে শুয়ে আছেন রেবতীমোহন। তাঁর দু'চোখ বোজা। গলার ভেতর থেকে কিছুক্ষণ পর পর আধফোটা কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

মাথার ওপর পঞ্চাশ বছর আগের চার ব্লেডের ফ্যানটা ফুল স্পিডে ঘুরে যাচ্ছে। তবু প্রচুর ঘামছেন রেবতীমোহন। পরনের পায়জামা এবং পাঞ্জাবি ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।

ওল্ড বালিগঞ্জের নিরিবিলি অভিজাত পাড়ায় বিরাট কমপাউন্ডওলা বাড়ির দোতলায় রেবতীমোহনের এই বেডরুম। গথিক স্টাইলের এই বাড়িটা তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, এই সেঞ্চুরির গোড়ার দিকে।

রেবতীমোহনের পাশে বসে তোয়ালে দিয়ে মাঝে মাঝেই তাঁর গলা কপাল মুছে দিচ্ছে সুতপা। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চামড়ার তলা থেকে দানা দানা ঘাম ফুটে বেরুচ্ছে। এ-সব কীসের লক্ষণ বুঝতে অসুবিধা হয় না তার। ঠিক দু'বছর আগে একবার মারাত্মক হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে রেবতীমোহনের। হুবহু সেই সব চিহ্নই আজ আবার দেখা যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন মুখে পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় সুতপা ডাকে, 'বাবা, বাবা—'

রেবতীমোহন উত্তর দেন না।

সাড়া যে পাওয়া যাবে না, সেটা ভালো করেই জানে সুতপা। রেবতীমোহন অজ্ঞান হয়ে আছেন। কোনও কিছু শোনা বা অনুভব করার শক্তি তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে। তবু যে সুতপা প্রায়ই ডাকছে তার কাবণ একটাই। নির্জীব হলেও একটা জীবন্ত মানুষের কণ্ঠস্বর তো শোনা যাচ্ছে। সে ছাড়া ওল্ড বালিগঞ্জের এত বড়ো বাড়িতে সুস্থ সবল মানুষ আর একজনও নেই। দু'টি কাজের লোক ছিল পরশু পর্যন্ত। তাদের একজনের মা মারা গেছে, আরেক জনের মেয়ের বিয়ে। দু'জনকেই ছুটি দিতে হয়েছে। দশ বারো দিনের আগে কেউ ফিরবে না।

বাইরে এই মুহূর্তে তুমুল বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মেঘের একটানা গজরানি। আকাশটাকে আড়াআড়ি চিরে, থেকে থেকেই বিদ্যুৎ চমকে যায়।

শুরু হয়েছিল সেই বিকেলে। তারপর একনাগাড়ে ঝরেই চলেছে। সিসার ফলার মতো লক্ষ কোটি বৃষ্টির ফোঁটা আকাশ থেকে অনবরত নেমে আসছে। এই বৃষ্টি আদৌ যে থামবে

তার কোনও লক্ষণই নেই। কলকাতা যেন মহাবিশ্বের আদিম কোনও দুর্যোগের দিনে ফিরে গেছে।

সুতপা বুঝতে পারছিল, এখনই ডাক্তার ডাকা দরকার। কিন্তু কাজের লোকেরা তো নেই-ই, তা ছাড়া টেলিফোনটাও সপ্তাহ দুয়েক ধরে অচল হয়ে আছে। বার বার খবর দিয়েও কিছুই হয়নি। জীবন্ত মানুষের পৃথিবী থেকে এই রাত্তিরে তারা যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

চোখ তুলে একবার সামনের দিকে তাকায় সুতপা। এ-বাড়ির অন্য সব কামরার আসবাবের মতোই রেবতীমোহনের এই বেডরুমের খাট আলমারি ডিভান ড্রেসিং টেবল, সব কিছুতেই প্রাচীনত্বের ছাপ মারা। একধারে নিচু ডিভানে ঘুমোচ্ছে টুটুল। পাঁচ বছরের টুটুল সুতপার একমাত্র ছেলে। রেবতীমোহনের পাশের ঘরটাই সুতপা এবং টুটুলের। কিন্তু খানিকক্ষণ আগে রেবতীমোহনের স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিতেই সুতপা ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে এনে ওই ডিভানটায় শুইয়ে দিয়েছে।

টুটুলের মাথার কাছে একটা গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক। পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ তুলে সেটা দিনরাত বেজে যায়। সুতপা দেখল, এখন বারোটা বেজে চল্লিশ। এই দুর্যোগের রাতে কলকাতা যখন রসাতলে তলিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সেই সময় কীভাবে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, ভেবে পায় না সুতপা। আশি বছরের এক রোগাক্রান্ত বেহুঁশ বৃদ্ধ, ঘুমন্ত একটি শিশু ছাড়া এ-বাড়িতে আর যে কেউ নেই। অরক্ষিত তাদের ফেলে বেরুনোও যায় না। বেরুলেও এই মধ্যরাতে ট্যাক্সি বা অটো কিছুই পাওয়া যাবে না। তার মতো তরুণীর পক্ষে একা একা প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দেড় কিলোমিটার হেঁটে হাউস ফিজিসিয়ানকে ডেকে আনা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু একটা কিছু না করলেই নয়।

অথচ রেবতীমোহনকে নিয়ে সুতপার এত যে উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনা, তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। দেড় বছর আগে অমলের সঙ্গে ডিভোর্স হবার পরই এই বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবার কথা। কোর্ট রায় দিয়েছিল, যতদিন না টুটুল সাবালক হচ্ছে, তার কাছেই থাকবে।

অমল রেবতীমোহনের একমাত্র ছেলে। একটা বড়ো মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির সে টপ একজিকিউটিভ। তার সঙ্গে সুতপার বিয়েটা কোনও দিক থেকেই সুখের হয়নি। টুটুলের জন্মের কিছুদিন পর থেকেই তাদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। তখন প্রতি সপ্তাহে দু-তিন দিন বাড়ি ফিরত না অমল। পরে মাসে এক-আধদিন হয়তো আসত। খবর পাওয়া গিয়েছিল লাউডন স্ট্রিটে একটা সিন্ধি মেয়েকে নিয়ে সে থাকে। যাকে 'লিভ টুগেদার' বলে, তা-ই আর কী। তাকে ফেরাবার জন্য রেবতীমোহন এবং সুতপা প্রথম দিকে অনেক বুঝিয়েছে। অমল সে সব কানেও তোলেনি। পরে এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি এবং তিক্ততা লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত কোর্টে না গিয়ে উপায় ছিল না।

ডিভোর্স হয়ে যাবার পর টুটুলকে নিয়ে দিল্লিতে মা-বাবার কাছে চলেই যেত সুতপা। কিন্তু রেবতীমোহন যেতে দেননি। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আইডিয়ালিস্ট এবং হৃদয়বান এই মানুষটির চরিত্র ইস্পাতের ফলার মতো ঝকঝকে। কোনওরকম অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপস করতে জানেন না।

ডিভোর্স হয়ে যাবার পর ছেলেকে তিনি আর এই বাড়িতে ঢুকতে দেননি। তাঁর যাবতীয় প্রপার্টি, ব্যাঙ্কের টাকা এবং বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার—সব সুতপার নামে লিখে দিয়েছিলেন। সুতপা প্রবল আপত্তি করেছে, রেবতীমোহনের আত্মীয়স্বজনেরা এসে অনেক বুঝিয়েছে কিন্তু

একরোখা জেদি মানুষটিকে টলানো যায়নি। তিনি সুতপা এবং টুটুলকে এই বাড়ি থেকে যেতেও দেননি। সুতপার জীবনে যে চরম ক্ষতি হয়ে গেছে, হয়তো এভাবেই তার কিছুটা পূরণ করতে চেয়েছেন রেবতীমোহন।

হঠাৎ গোঙানির মতো আওয়াজে চমকে রেবতীমোহনের দিকে তাকায় সুতপা। আর তাকিয়েই মনে হয়, তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। রেবতীমোহনের চোখ দু'টো এখন খোলা, দৃষ্টি স্থির। ঠোঁটদু'টো অনেকটা ফাঁক হয়ে আছে, জিভ গালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সবচেয়ে যেটা ভয়াবহ, তা হল মুখটা আস্তে আস্তে ডানদিকে বেঁকে যাচ্ছে। আর এখন প্রচণ্ড ঘামছেন রেবতীমোহন। শরীরের সব জলীয় পদার্থ গল গল করে বার হয়ে আসছে তাঁর।

রেবতীমোহনকে দেখতে দেখতে মারাত্মক ভয় পেয়ে যায় সুতপা। সে অস্থির ভাঙা গলায় সামনে ডাকতে থাকে, 'বাবা, কী কষ্ট হচ্ছে আপনার? বলুন--বলুন—'

আগের মতোই কোনও সাড়া নেই।

এই মুহূর্তে কিছু একটা করা খুব জরুরি, এবং তা করতেই হবে। কিন্তু কী যে করবে, ভেবে পায় না সুতপা। চিন্তা করার শক্তিটাই তার দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতরটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। এখন যদি একটা সুস্থ সবল মানুষ তার পাশে থাকত, অনেকটা ভরসা পেত সুতপা।

প্রচণ্ড স্নায়বিক ভীতি এবং অস্থিরতার মধ্যেও সুতপা স্থির করে ফেলে, রেবতীমোহনকে বাঁচাতেই হবে। অন্তত শেষ একটা চেষ্টা না করলেই নয়। একটা মানুষকে এমন নিরুপায়ভাবে মরতে দেওয়া যায় না। মরিয়া হয়েই খাট থেকে নেমে পড়ে সে। একটা ছাতা আর টর্চ খুঁজে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। যেভাবেই হোক, ডাক্তার নিয়ে আসতেই হবে।

ঘরের জানালা টানালা বন্ধ থাকায় বৃষ্টির আওয়াজ ততটা জোরালো মনে হচ্ছিল না। বাইরে আসতেই শব্দটা পঞ্চাশ গুণ হয়ে কানের পর্দায় ধাক্কা দিতে থাকে। ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে, আকাশটা গলে গলে নেমে আসছে। দশ ফুট দূরের কিছুই প্রায় এখন আর দেখা যাচ্ছে না। অবিরাম বৃষ্টির আড়ালে সব কিছু বিলীন হয়ে গেছে।

রেবতীমোহনের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দেয় সুতপা। তারপর প্যাসেজে, ব্যালকনিতে এবং একতলায় নামার সিঁড়িতে যেখানে যত আলো রয়েছে, সুইচ টিপে টিপে জ্বালিয়ে দিতে লাগল সে। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে, আলোগুলো জ্বলতে থাক।

নিচে এসে ভয়ানক দমে যায় সুতপা। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে লন। তারপর উঁচু কমপাউন্ড ওয়ালের গায়ে ভারী লোহার গেট। লন-এ প্রায় এক ফুট জল দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তা থেকে এই বাড়িটা বেশ উঁচুতে। বাড়ির লন-এরই যদি এই হাল হয়ে থাকে, রাস্তাটা নিশ্চয়ই দেড় দু-ফুট জলের তলায় ডুবে গেছে।

সুতপা লক্ষ করল, এ রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোও জ্বলছে না। শুধু রাস্তাতেই নয়, খানিকটা দূরে দূরে বড়ো কমপাউন্ডের ভেতর বাংলা টাইপের যে-বাড়িগুলো রয়েছে সে-সব জায়গাতেও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। যতদূর চোখ যায়, নিরেট অন্ধকার এবং অবিরাম বৃষ্টিপাত সব কিছু ঢেকে রেখেছে। রাস্তার জল আর জমাট অন্ধকার ঠেলে দেড় কিলোমিটার দূরে ডাক্তারের বাড়ি আদৌ পৌঁছুতে পারবে কিনা, সুতপা জানে না।

এই রাস্তায় প্রতিটি ম্যানহোলের মুখ খোলা। লোহার ঢাকনিগুলো কবেই চুরি হয়ে গেছে। অন্ধকারে জলের তলায় অদৃশ্য ম্যানহোলে পা পড়লে সুতপা কোথায় তলিয়ে যাবে, কে জানে।

কয়েক মুহূর্তে দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সুতপা। তারপর হঠাৎ অদম্য এক জেদ তার ওপর যেন ভর করে। যা হবার হোক, তবু ডাক্তারের কাছে তাকে যেতেই হবে।

সুইচ টিপে নিচের পোর্টিকোর আলো জ্বালে সুতপা। লন-এর দু'ধারে উঁচু পোস্টে দু'টো ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা আছে। ও-দু'টো জ্বললে গোটা লন-এর এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সবটা দেখা যায়।

ফ্লাড লাইটের বোতাম টিপেই চমকে ওঠে সুতপা। প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেও দেখতে পায়, কে যেন গেট টপকে লাফ দিয়ে এপারে নেমে পড়ল। তার মুখচোখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও আবছাভাবে বোঝা যায় সে একটা মানুষই। কী উদ্দেশ্যে এই দুর্যোগের রাতে সে এ-বাড়িতে ঢুকেছে তা জলের মতো পরিষ্কার। ভেতর দিক দিয়ে তালা লাগানো বলে লোকটাকে ওভাবে গেট পেরুতে হয়েছে।

ভয়ে আতঙ্কে শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায় সুতপার। বৃষ্টির আওয়াজ তো আছেই, সেই সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে মেঘ ডেকে যাচ্ছে, কাছে দূরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাজও পড়ছে। এত শব্দের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। লোকটা বিনা বাধায় তাকে খুন করে নির্বিঘ্নে এ-বাড়ির সব কিছু লুট করে নিয়ে যেতে পারে।

লোকটাও সুতপাকে দেখতে পেয়েছিল। এই সৃষ্টিছাড়া বর্ষার রাতে পৃথিবী যখন গাঢ় অন্ধকার এবং বৃষ্টিতে ডুবে যাচ্ছে, আচমকা কেউ ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে দেবে, এটা খুব সম্ভব সে ভাবতে পারেনি। গেটে পিঠ ঠেকিয়ে লোকটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কিছু সুতপার মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। লোকটা যেমনই হোক—খুনি, ডাকাত, ছেনতাইবাজ বা অন্য কোনও ধরনের সমাজবিরোধী—তবু একটা মানুষ তো। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিজের অজান্তেই সুতপা জোরে জোরে ডাকে, 'এখানে একটু আসবেন—'

বৃষ্টি বা মেঘের ডাক ছাপিয়ে সুতপার গলা লোকটার কানে ঠিকই পৌঁছে যায়। কিন্তু সে উত্তর দেয় না।

আরো বারকয়েক ডাকাডাকির পর লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। হয়তো ভাবে, একটা কম বয়সের তরুণী কতটা আর ক্ষতি করতে পারবে!

কাছাকাছি আসতে লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যায়। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। চারকোণা, চোয়াড়ে মুখ। গাল বসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চোখ এক ইঞ্চি গর্তে ঢোকানো। কপালে গালে বসন্ত ছাড়াও প্রচুর কাটাকুটির দাগ। ওগুলো যে বেদম মারের চিহ্ন, বলে দিতে হয় না।

লোকটার পরনে তালিমারা খাটো ফুলপ্যান্ট আর হাত-কাটা কালো জামা, পায়ের কেডসটাতেও অগুনতি তালি। কোমরে ইঞ্চি আটেক একটা খাপে কিছু পোরা আছে। ওটা কী, সুতপা এক পলক দেখে বুঝে নেয়। তেমন বুঝলে সে বেপরোয়া ছুরি চালিয়ে দিতে পারে। সে যে কোন স্তরের জীব, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়।

লোকটার সারা গা এবং জামা-প্যান্ট থেকে জল ঝরে ঝরে পোর্টিকোর তলাটা ভিজে যেতে থাকে। সে যে অনেকক্ষণ ভিজেছে সেটা তার সিঁটানো আঙল এবং ঠোঁট দেখে বোঝা যায়।

পোর্টিকোর সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সুতপা, নিচে লোকটা। সন্দিগ্ধ সতর্ক দৃষ্টিতে সে সুতপাকে লক্ষ করছে।

সুতপা ব্যাকুলভাবে এবার বলে, 'আমাদের ভীষণ বিপদ। দয়া করে একটু সাহায্য করবেন?'

এর জন্য লোকটা প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। সুতপার ওপর চোখ রেখে চাপা গলায় বলে, 'কী সাহায্য?'

'আমার শ্বশুর মশাই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাড়িতে আমি আর আমার পাঁচ বছরের ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। টেলিফোনটাও ক'দিন ধরে অচল হয়ে আছে। এখনই একজন ডাক্তার না ডাকলে শ্বশুরমশাইকে বাঁচানো যাবে না।'

'তা আমাকে কী করতে হবে?'

'যদি কষ্ট করে আমাদের ফ্যামিলির ডাক্তারকে একটা খবর দেন—'

লোকটা চুপ।

সুতপা এবার প্রায় মিনতিই করতে থাকে, 'বিশ্বাস না হলে একবার ওপরে এসে আমার শ্বশুরমশাইকে দেখে যান—' ঝোঁকের মাথায় বলতে বলতে থেমে যায় সে। এমন জঘন্য ধরনের একটা লোককে কোনওভাবেই যে ওপরে নিয়ে যাওয়া উচিত না, সেটা মনে পড়তেই ভেতরে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

লোকটা রুক্ষ গলায় বলে, 'নকশাবাজি ছাড়ুন। আপনার কথায় ওপরে যাই, আর আপনি ফাঁসিয়ে দিন! ও সব ধান্দা চলবে না মেমসাহেব।'

এই ধরনের কথা আগে কখনও শোনেনি সুতপা। বুঝতে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে না। লোকটা তাকে একেবারেই বিশ্বাস করছে না। তার ধারণা ভুলিয়ে ভালিয়ে সুতপা তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ফাঁদে ফেলে দেবে। অসহায় ভঙ্গিতে সে বলে, 'আমি কী বিপদে পড়েছি, ওপরে না গেলে কেমন করে দেখাব?'

সুতপার মুখচোখ দেখে এবং কণ্ঠস্বর শুনে লোকটার হয়তো মনে হয়, সে সত্যিই বলছে। কিন্তু সে খুব সম্ভব জগতের কোনও মানুষকেই বিশ্বাস করে না। জলে ভিজে তার কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। সে বলে, 'যত ঝামেলাতেই পড়ুন, আমি ক্যাঁচাকলে পা ঢোকাচ্ছি না। যা বলার এখানেই বলে ফেলুন।'

সুতপা এবার হতাশই হয়ে পড়ে। যে-লোকটা প্রথম থেকেই তাকে অবিশ্বাস করছে তার কাছ থেকে কোনওরকম উপকার বা সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা, সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবু নৈরাশ্যের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে সুতপা বলে, 'আমাদের ফ্যামিলির ডাক্তারকে যদি একবার খবর দেন—'একটু থেমে আবার বলে, 'মানে, আমার মতো একটা মেয়ের পক্ষে একা একা এই ঝড়বৃষ্টিতে বেরুনো—'বলতে বলতে চুপ করে যায় সে।

সাহায্যের প্রস্তাবটা ঠিক এই চেহারায় আসবে ভাবতে পারেনি লোকটা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুতপার বিপন্নতা খানিকটা যেন আঁচ করতে পারে সে। বলে, 'ডাক্তারের কাছে আমাকে পাঠিয়ে ওপরে গিয়ে ফোন করে দিন। ডাক্তার আমাকে ধরে—' কথাটা আর শেষ করে না সে।

সুতপা বলে, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমাদের ফোন বেশ কিছুদিন খারাপ হয়ে আছে। ওটা ঠিক থাকলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না।'

লোকটা একটু চিন্তা করে বলে, 'আপনাদের ডাক্তার কোথায় থাকে?'

সুতপা একটা রাস্তার নাম এবং বাড়ির নম্বর বলে। লোকটা প্রায় লাফিয়ে ওঠে, 'ওরি শ্লা, ওখানে যেতে এখন ইস্টিমার লাগবে। রাস্তা ফাস্তার যা হাল হয়েছে! আপনি কি মেমসাহেব আমাকে যমের বাড়ি চালান করতে চান?'

এ-কথার উত্তর হয় না। সুতপা চুপ করে থাকে।

সুতপার মুখের দিকে তাকিয়ে এবার হয়তো করুণাই হয় লোকটার। সে বলে, 'ঠিক আছে। আপনি যখন ঝামেলায় পড়েই গেছেন তখন দেখি কী করা যায়। ডাক্তারের ঠিকানাটা যেন কী বলছিলেন—'

সুতপা রাস্তার নাম এবং বাড়ির নম্বর আরেকবার জানিয়ে দেয়। লোকটা আর দাঁড়ায় না। পোর্টিকো পেরিয়ে গেটের দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ কিছু মনে পড়তে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সুতপা পেছন থেকে ডাকে, 'শুনুন—'

প্রবল তোড়ে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। ভিজতে ভিজতে থমকে দাঁড়ায় লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলে, 'আবার কী?'

সুতপা বলে, 'একটু দাঁড়ান, আপনাকে একটা ছাতা এনে দিচ্ছি। আর গেটেও তালা লাগানো রয়েছে। ওটা খুলে না দিলে—'

এমন হাস্যকর অসম্ভব কথা বোধহয় লোকটা আগে আর কখনও শোনেনি। অদ্ভুত হাসে সে, একটি কথাও না বলে প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, লন পেরিয়ে, গেট টপকে বাইরের রাস্তায় নেমে যায়। পরক্ষণে তার সিলুয়েট হয়ে যাওয়া শরীরের ঝাপসা কাঠামো গাঢ় অন্ধকার এবং বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়।

লোকটা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পোর্টিকোর তলায় দাঁড়িয়ে থাকে সুতপা। তারপর চারিদিকের সবগুলো আলো জ্বালিয়ে রেখেই রেবতীমোহনের ঘরে ফিরে আসে। এই ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে পুরো লন, গেট এবং সামনের রাস্তার অনেকটা অংশ দেখা যায়।

সুতপা লক্ষ করল, টুটুল আগের মতোই অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। আর রেবতীমোহন একইরকম চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখ তেমনই খোলা, গলার ভেতর থেকে আবছা ঘড়ঘড়ে গোঙানি বেরিয়ে আসছে। তবে মুখটা একদিকে আরো কিছুটা বেঁকে গেছে। খানিকক্ষণ আগে যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনই ঘামছেন।

একসময় রেবতীমোহন ছিলেন আশ্চর্য সুপুরুষ। দারুণ স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। প্রথম স্ট্রোকটি হবার পর শরীর ভেঙেচুরে এখন ধ্বংসস্তূপ। আরেকটা স্ট্রোকের ধাক্কা সামলাতে পারবেন কিনা, কে জানে।

পাশে বসে তোয়ালে দিয়ে রেবতীমোহনের ঘাম মুছিয়ে দেয় সুতপা। তারপর রোগা ফ্যাকাশে ডান হাতটি তুলে নাড়ি দেখে। তিরতির করে সেটা ওঠানামা করছে। বুকের ওপর হাত রেখে টের পায়, হৃৎপিণ্ড এখনও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

রেবতীমোহনের শুশ্রূষা করতে করতে বার বার সুতপা গেটের দিকে তাকায়। লোকটা সেই যে গেছে, তারপর ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কিন্তু এখনও ডাক্তার আসছেন না। চেহারা চালচলন দেখে লোকটাকে যেটুকু বোঝা গেছে তাতে তার কাছে কোনওরকম দায়িত্ববোধ আশা করা যায় না। হয়তো ডাক্তারকে সে খবর না দিয়েই চলে গেছে। রেবতীমোহনের যা অবস্থা, ডাক্তার না এলে কী হবে, ভাবতে সাহস হয় না সুতপার।

আরো আধঘণ্টা অসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়ে সুতপা যখন বুঝতে পারে তার শেষ আশাটুকুও প্রায় বিলীন হয়ে এসেছে, সেই সময় গেটের কাছে একটা প্রাইভেট কারের হেড লাইটের জোরালো আলো এসে পড়ে। পরক্ষণেই সেই লোকটার চিৎকার শোনা যায়, 'মেমসাহেব, তালা খুলে দিন। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছি।'

সুতপা টের পায়, ঝিমিয়ে-আসা অবসন্ন হৃৎপিণ্ডে আচমকা হাজারটা ঘোড়া যেন ঝড়ের গতিতে ছুটতে শুরু করেছে। সে প্রায় লাফ দিয়েই খাট থেকে নেমে, গেটের চাবি নিয়ে, একসঙ্গে দু'তিনটে সিঁড়ি টপকে টপকে একতলায় এসে দৌড়ে গিয়ে তালা খুলে দেয়।

বৃষ্টি অঝোরে ঝরেই যাচ্ছে।

একটু পর একটা গাড়ি লন পেরিয়ে পোর্টিকোর তলায় এসে থামে। দরজা খুলে সুতপাদের পারিবারিক চিকিৎসক মধ্যবয়সী ডাক্তার সেন নেমে আসেন। তাঁর গায়ে রেন-কোট। হাতে ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগ। একটু দূরে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা শরীর বেয়ে জলের স্রোত নেমে আসছে। বোঝাই যায়, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে সমস্ত রাস্তা কোমর সমান জল ঠেলে ঠেলে সে ডাক্তারের কাছে খবর দিতে গিয়েছিল।

সুতপাও গেট খুলতে গিয়ে ভিজে গিয়েছিল। ডাক্তার সেনের গাড়ি পৌঁছবার আগেই সে পোর্টিকোর তলায় চলে এসেছে।

ডাক্তার সেন বলেন, 'কী ব্যাপার সুতপা? কী হয়েছে তোমার শ্বশুরের?'

সুতপা বলে, 'রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে, আরেকবার অ্যাটাক হয়েছে?'

ডাক্তার সেন চমকে ওঠেন, 'চল চল—' লম্বা লম্বা পায়ে তিনি সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন। তাঁর পাশাপাশি সুতপাও ওপরে উঠতে থাকে।

দোতলায় এসে ক্ষিপ্র গতিতে রেবতীমোহনের হার্ট টার্ট পরীক্ষা করে পর পর দু'টো ইঞ্জেকশান দেন ডাক্তার সেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে গোঙানি বন্ধ হয়ে যায়, মুখটা ফের স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

রোগীর মুখচোখের পরিবর্তন দেখতে দেখতে টেনশান কেটে যেতে থাকে ডাক্তার সেনের। বলেন, 'ধাক্কাটা বোধহয় এবারও কাটিয়ে উঠলেন তোমার শ্বশুরমশাই। তবে কাল ইসিজি না করে এর বেশি আর কিছু বলব না। পেশেন্টের কাছে বাকি রাতটা আমাকে থাকতে হবে।' একটু থেমে বলেন, 'এখন এই ইঞ্জেকশান দু'টো না পড়লে ফেটাল কিছু ঘটে যেতে পারত। লোকটাকে ঠিক সময়েই পাঠিয়েছিলে। কে লোকটা? আগে তো কখনও তোমাদের বাড়িতে দেখিনি।'

সুতপা হকচকিয়ে যায়। ডাক্তার আসার পর লোকটার কথা তার খেয়াল ছিল না। তার মাথা থেকে সে বেরিয়ে গিয়েছিল। জড়ানো গলায় কোনওরকমে সুতপা বলে, 'আমাদের আত্মীয় বলতে পারেন।'

'খুব সিনসিয়ার লোক। দুর্দান্ত দায়িত্ববোধ। সারাটা রাস্তা ভিজে, জল ঠেলতে ঠেলতে গেছে। আমার ড্রাইভার তো ক'দিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে। নিজেকেই গাড়ি চালিয়ে আসতে হল। এত জল যে খানিকটা আসতে না আসতেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বাকি রাস্তা ওই ছেলেটা আমার গাড়ি ঠেলে নিয়ে এসেছে।'

ডাক্তার সেনের শেষ কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছিল না সুতপা। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ডাক্তার সেন, আপনি পেশেন্টের কাছে একটু বসুন। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।'

নিচে পোর্টিকোর তলায় এসে থমকে দাঁড়ায় সুতপা। যার জন্য নেমে আসা তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতপার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সে অপেক্ষা করেনি। এই বিশাল মহানগরে অন্তহীন দুর্যোগের মধ্যে লোকটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে, কে বলবে।

কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে সুতপার মনে হয়, মানুষ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। তার ওপর এখনও কিঞ্চিৎ ভরসা রাখা যায়।

চেনা মানুষের অচেনা কাহিনি

এই লেখাটাকে কোনওভাবেই নিখুঁত শাস্ত্রসম্মত গল্প বলা যাবে না। একটি মানুষকে যেমন দেখেছি হুবহু সেইভাবেই তাকে এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। ছাব্বিশ বছর আগের কথা। তখন আমার পায়ের নিচে সর্ষে। গোটা ভারতবর্ষ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি। আজ যদি থাকি নাগাহিলসে, দু' মাস বাদে দণ্ডকারণ্যে। সেখানে কিছুদিন কাটতে না কাটতেই ছুটি আন্দামানে বা বিকানীরে অথবা কোঙ্কন কোস্টে।

সেই উনিশ শো ষাটে, চাকরি বাকরি করি না, পিছুটান তেমন কিছু নেই, ধরাবাঁধা কোনও ব্যাপারে মন বসে না। অবশ্য তখন আমার দশ বারোখানা বই বাজারে বেরিয়ে গেছে, সেগুলো বিক্রি টিক্রিও খারাপ হয় না। পাঠকদের কাছে আমার নাম একেবারে অপরিচিত নয়। তবু ভবিষ্যতে কী হবে আমার অবলম্বন, কী হবে রোজগারের পথ, সাহিত্য সাংবাদিকতা না বিশুদ্ধ কোনও চাকরি, এসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাই না। অল্প বয়সে জীবনকে নিয়ে এলোপাথাড়ি এক্সপেরিমেন্ট করার মতো আমোদ আর কী থাকতে পারে।

সেই সময় বোম্বাই ছবির রমরমা বাজার। পোস্টারে, কিওস্কে বিরাট বিরাট হোর্ডিংয়ে আর খবরের কাগজের পাতা জুড়ে চোখ-ধাঁধানো সব ছবি আর নাম—রাজ কাপুর, দিলীপকুমার, দেব আনন্দ, অশোককুমার, সুরাইয়া, মধুবালা, নিম্মি, মীনাকুমারী, নৌসাদ, শচীনদেব বর্মন, শঙ্কর-জয়কিষণ, লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোসলে, গীতা দত্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি। সারা দেশের প্রচুর নামী কবি আর গল্পলেখক বোম্বাইকে স্থায়ী ঠিকানা করে ফেলেছেন। কৃষণ চন্দর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইসমত চুগতাই, শৈলেন্দ্র, খাজা আমেদ আব্বাস, নবেন্দু ঘোষ, কাইফি আজমি, হসরত সুলতানপুরী, এমনি অনেকে।

ভাবলাম, বোম্বাইতে গেলে কেমন হয়? এশিয়ার হলিউড প্রবল আকর্ষণে তখন আমাকে আরব সাগরের দিকে টানছে। যেখানে বছরে চারশো ছবি হয়, ফিল্মে যেখানে দু-তিন হাজার কোটি টাকা খাটে সেখানে আমার কি একটু জায়গা হবে না? হোক আর নাই হোক, একবার গিয়ে দেখাই যাক না। কপাল ঠুকে একদিন বম্বে মেলে উঠে বসলাম এবং ভারতবর্ষের সব চাইতে চমকদার টিনসেল টাউনে পৌঁছে গেলাম।

দু-চারজন বন্ধু আগে থেকেই বোম্বাই ফিল্মে কাজ করতেন। তাঁরাই আমাকে নিয়ে হই হই করে এই প্রোডিউসার, সেই ডিরেক্টর, অমুক ফিল্ম স্টার ইত্যাদি অনেকের কাছে নিয়ে গেলেন। বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হল। বন্ধুদের কল্যাণে গ্ল্যামার-ওয়ার্ল্ডের একধারে আমার একটু জায়গা হয়ে গেল। বোম্বাই ফিল্মের কেকটি এতই বড় মাপের যে তার সামান্য ভাগ দিতে কেউ কাতর নয়।

চিত্র পরিচালক এইচ. এস. রাওয়ালদের এক আত্মীয় বা তাঁদের গ্রামের এক ভদ্রলোকেব একটি হোটেল ছিল বোম্বাইয়ের শহরতলি খারে। বন্ধুরা আমাকে সেখানে নিয়ে তুলেছিলেন। এই হোটেলে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে এসেছি।

বোম্বাই কাজের শহর। হাত-পা ছড়িয়ে জুত করে আড্ডা দেবার সময় তার নেই। ভোর চারটে থেকে রাত একটা পর্যন্ত এই শহর অবিরাম ছুটছে। আমিও এই দৌড়ের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

এখানে ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের কাজের স্টাইলটা এইরকম, বিশেষ করে যারা গল্প বা চিত্রনাট্যের সঙ্গে জড়িত।

সকালে উঠেই স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে ডিরেক্টরের বাড়ি অথবা নির্দিষ্ট কোনও হোটেলে ছুটতে হয়। সেখানে গল্পের চুলচেরা ডিসকাসন, ডেভলপমেন্ট এবং সিন-টিন লেখা চলতে থাকে একটানা সারা দিন ধরে। যতদিন চিত্রনাট্য শেষ না হচ্ছে, এটা চলবেই।

সেদিন আমার হোটেল থেকে বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডের লম্বা লাইনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাকে জুহুর একটা হোটেলে ন'টার ভেতর পৌঁছুতে হবে। সেখানে ডিরেক্টর আসবেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, আমার সামনে দু-তিনজনের পর একটি লোক বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দূরে ঘোড় বন্দর রোডের দিকে তাকাচ্ছে। তাকে বেশ অধৈর্য আর উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। হয়তো তার খুব তাড়া আছে কিন্তু বাস আসছে না, সেই কারণেই অস্থিরতা। লোকটির বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। সরু করে কামানো লালচে গোঁফ, মাথার চুলও লালচে। মেদহীন, টান টান চেহারা। চামড়া কর্কশ। মুখ কাটা কাটা, কিছুটা চোয়াড়ে ধরনের, ধারাল থুতনি। পরনে আধ ময়লা চুস্ত আর নকশাদার গোলাপি পাঞ্জাবি, পায়ে নাগরা টাইপের শুঁড়তোলা জুতো। বাঁ হাতে স্টিলের একটা বালা।

এই মুখটা আমার অচেনা নয়, কিন্তু আগে কোথায় দেখেছি, ঠিক মনে করতে পারছি না।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা ঘটে যায়। বাসের কিউ থেকে বেরিয়ে ক'পা এগিয়ে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সরাসরি বাংলা ভাষাতেই জিগ্যেস করি, 'তুমি মাধবমামা না?' লোকটা যে বিশুদ্ধ বাঙালি এবং আমার মায়ের আপন খুড়তুতো ভাই, সে-সম্পর্কে এখন আমার এতটুকু সংশয় নেই। যতই চুস্ত এবং নাগরা পরে থাক, তাকে ঠিক ধরে ফেলেছি।

লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'জি, কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

'আমি বিনু।'

অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মাধবমামা। বোম্বাইয়ের শহরতলিতে বাসের লম্বা লাইনে ষোল বছর বাদে আমি তাকে আবিষ্কার করব, এটা সে ভাবতে পারেনি।

মাধবমামা বলল, 'তোমাকে একেবারেই চিনতে পারিনি, চেহারা খুব বদলে গেছে।'

হেসে বললাম, 'আমি কিন্তু তোমাকে দেখেই চিনি ফেলেছি। তুমি তেমন একটা বদলাওনি। তবে জামা কাপড়ের নমুনা দেখে একটু খটকা লেগেছিল। প্রথমটা মনে হয়েছিল নন-বেঙ্গলি।'

মাধবমামাও হাসল, কিছু বলল না।

একসময় কলকাতায় থাকতে আমি ছিলাম মাধবমামার সারাক্ষণের সঙ্গী। যদিও মামা-ভাগনে, সম্পর্কটা কিন্তু বন্ধুর মতো। কতদিন পর তার সঙ্গে দেখা! টের পাচ্ছি, ভেতরে ভেতরে জোরালো আবেগ স্রোতের মতো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চিত্রনাট্যের কাজ আরেক দিন হবে। মাধবমামাকে এতকাল পর যখন পাওয়া গেছে তখন কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। তার একটা হাত ধরে বাসের লাইন থেকে বার করে আনলাম। বললাম, 'এস আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

রাস্তার ওধারে একটা উদিপি রেস্তোরাঁ দেখিয়ে বললাম, 'ওখানে। কফি খেতে খেতে তোমার কথা শুনব।' আসলে মাধবমামা সম্পর্কে আমার মনে এখন অপার কৌতূহল এবং হাজারটা প্রশ্ন।

ষোল বছর আগে সেকেন্ড গ্রেট ওয়ার যেদিন শেষ হল, কাগজে বেরুল জাপানের সারেন্ডারের বিরাট খবর, তার পরের দিন মাধবমামা কলকাতা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

তখন ভবানীপুরে একই বাড়িতে থাকতাম আমরা আর মাধবমামারা। একতলায় ওরা, দোতলায় আমরা। আমাদের বাড়িওলা লাহারা থাকতেন বেলেঘাটায়। ফি মাসের ভাড়া সেখানে দিয়ে আসতে হত। মাধবমামা আমাদের দুই ফ্যামিলির ভাড়া বেলেঘাটায় পৌঁছে দিত।

জাপানের আত্মসমর্পণের পরের দিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে মাধবমামা ভাড়া দিতে গেল। সেই যে উনিশশো পঁয়তাল্লিশের আগস্টে ভবানীপুর থেকে বেরুল তার ষোল বছর পর বোম্বাইয়ের বাসের কিউতে আবার তাকে দেখলাম।

এই ষোল বছরে মাধবমামার বড় ভাইরা অর্থাৎ ননীমামা মাখনমামা ভাইকে খুঁজে বার করার জন্য লালবাজারের মিসিং স্কোয়াডে কতবার যে ধরনা দিয়েছে! খবরের কাগজে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে মাধবমামার ছবি দিয়ে কম করে পঁচিশ তিরিশ বার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—'যেখানেই থাক, পত্রপাঠ চলিয়া আইস। টাকার দরকার হইলে অবিলম্বে লিখিবে। তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া মা শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন।'

সত্যিই ছেলের জন্য মাধবমামার মা অর্থাৎ আমার ছোট দিদিমার খাওয়া ঘুম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পীর ফকির মন্দির দরগা জ্যোতিষী তান্ত্রিক—নানা জায়গায় কতজনের কাছে যে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি! অলৌকিক বা আধিদৈবিক যে কোনও উপায়ে কেউ যদি ছেলের হদিস দিতে পারে। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

শেষ পর্যন্ত একটা স্ট্রোক হয়ে গেল ছোট দিদিমার। সেই সঙ্গে পক্ষাঘাতে বাঁ দিকটা পড়ে গিয়ে কয়েক বছর শয্যাশায়ী থাকার পর মারাও গেলেন। মৃত্যুর সময় নিরুদ্দেশ ছেলের মুখটা যে শেষ বার দেখে একটু শান্তি পাবেন, তা আর ঘটল না। গভীর আক্ষেপ এবং কষ্ট নিয়ে ছোট দিদিমা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অথচ মাধবমামার উধাও হওয়াটা আমাদের কাছে একটা জট-পাকানো ধাঁধার মতোই মনে হয়েছে। মাধবমামার বাবা তার ছেলেবেলাতেই মারা যান। তাই বলে বড় ভাইরা বা তাঁদের স্ত্রীরা কেউ তাকে অনাদর করতেন না। বরং অতিরিক্ত আদর-যত্নে তাকে মানুষ করেছেন। পরীক্ষায় ফেল বা প্রেমে ব্যর্থতা কিংবা অভিভাবকদের নির্দয় ব্যবহার, যে-সব কারণে লোকে বাড়ি ছাড়ে তেমন কোনও ব্যাপারই ঘটেনি। তবু মাধবমামা উধাও হয়ে গেল।

রাস্তা পেরিয়ে উদিপিদের রেস্তোরাঁয় গিয়ে মুখোমুখি বসলাম। বেয়ারাকে কফি আর পকোড়ার অর্ডার দিয়ে মাধবমামার দিকে তাকালাম। কিন্তু আমি কিছু জিগ্যেস করার আগেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সম্বন্ধে যাবতীয় খবর জেনে নিল মাধবমামা। আমি কী করছি, কবে বম্বে এসেছি, বিয়ে-টিয়ে করেছি কিনা, ইত্যাদি। আমার মা-বাবা ভাইবোনদের সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন করল। তারপর মুখ নামিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল, 'আচ্ছা আমাব—' বলেই চুপ করে গেল।

মাধবমামা কী বলতে চায়, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি। বলতে গিয়েও সে যে থেমে গেল, তার কারণটাও আমার অজানা নয়। টেবলের ওপর অনেকটা ঝুঁকে বললাম, 'ননীমামা মাখনমামাদের কথা জানতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে মাধবমামা, 'দাদা বৌদিরা কেমন আছে? আর মা?' বহুকাল বাড়ির সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখেনি, সেই অপরাধ বোধে মাধবমামা আমার দিকে তাকাতে

পর্যন্ত পারছে না। তার ঘাড় টেবলের ওপর আরো নুয়ে পড়েছে। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, সে বাংলা বলছে বটে, তাতে রীতিমতো মারাঠি টান।

জানালাম, 'ননীমামা আর মামীমারা ভালোই আছেন। ননীমামা বছর দুই হল রিটায়ার করেছেন। তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মাখনমামা আসছে বছর রিটায়ার করবেন। তাঁর ছেলে বাচ্চু এ-বছর যাদবপুর থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফাইনাল দেবে। তবে ছোট দিদিমা—'

আমার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠল মাধবমামা। উদ্বিগ্ন মুখে জিগ্যেস করল, 'মা কী?'

'ছোট দিদিমা নেই।'

'নেই!' দ্রুত মুখ তুলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রইল মাধবমামা। তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকল। অনেকক্ষণ পর যখন হাত সরাল চোখ দু'টো লালচে, গাল বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে নেমে আসছে। ধরা ধরা, ভাঙা গলায় মাধবমামা জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছিল মায়ের?'

কিভাবে, কত দুঃখ পেয়ে যে ছোট দিদিমা মারা গেছেন, সব বললাম। তাঁর কষ্টকর মৃত্যুর জন্য মাধবমামা পুরোপুরি দায়ী, সেটা বুঝিয়ে দিলাম।

মাধবমামা উত্তর দিল না, স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বেযারা কফি আর পকোড়া দিয়ে গেল। মাধবমামা পকোড়া খেল না। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কর মতো কফিতে চুমুক দিতে লাগল।

একসময় আস্তে করে ডাকলাম, 'আচ্ছা মামা—'

বিষণ্ণ গলায় মাধবমামা বলল, 'কী বলছ?'

'সেই যে যুদ্ধের পর কাউকে কিছু না জানিয়ে উধাও হলে, তারপর ষোলটা বছর কী করলে? দুম করে কলকাতা থেকে চলেই বা এলে কেন? তোমার সঙ্গে কেউ তো খারাপ ব্যবহার করেনি।'

'না, করেনি।'

'তবে?'

মায়ের মৃত্যু-সংবাদ আচমকা যে ধাক্কাটা দিয়েছিল তা খানিকটা সামলে নিয়েছে মাধবমামা। উদাসীন ভঙ্গিতে সে বলল, 'কী হবে সে-সব শুনে?'

আমি নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইলাম, 'না, তুমি বল।'

তক্ষুনি কিছু বলল না মাধবমামা। মুখ নামিয়ে কফি খেতে লাগল। তারপর থেমে থেমে, টুকরো টুকরোভাবে যা বলল তা এইরকম।

নাইনটিন ফর্টি ফাইভে জাপানের সারেন্ডারের পরদিন বাড়ি ভাড়ার টাকা নিয়ে সেই যে সে বেরিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত বেলেঘাটায় লাহাদের বাড়ি আর যায়নি। শিয়ালদা স্টেশনের কাছে এসে কী ভেবে উলটোদিকে প্যারামাউন্ট সিনেমায় ঢুকে পড়েছিল। ইচ্ছে, ম্যাটিনি শোয়ে একটা হিন্দি ছবি দেখে বেলেঘাটায় যাবে। কলকাতায় তখন এত মানুষ ছিল না, পপুলেশন এক্সপ্লোসন বা জন-বিস্ফোরণের কথা ভাবাই যেত না, ট্রাফিক জ্যামের কথা তখন কেউ শোনেনি। বাড়ি ভাড়া দিয়ে বাস ধরলে সাতটা সাড়ে-সাতটার ভেতরে ফিরে আসার কথা। কিন্তু ছবি দেখে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে নেশাচ্ছন্নের মতো সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এসেছিল মাধবমামা। তার বুকের ভেতরটা তখন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। আরব সাগরের পারে স্বপ্নের শহর বোম্বাই, তার চমৎকার সিন-সিনারি, মালাবার এবং কামবালা হিলের পাহাড়চূড়ায়

ছবির মতো সাজানো সব বাড়ি, শান্তা আপ্তে আর অশোককুমারের রোমান্টিক অভিনয়, সব মিলিয়ে সেই অল্প বয়সে মাধবমামার মনে হয়েছিল, বোম্বাই গিয়ে অশোককুমার হতে না পারলে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। বোম্বাই তখন তাকে প্রবল আকর্ষণে চুম্বকের মতো টানছে।

বেলেঘাটায় যাবার কথা মনেও রইল না মাধবমামার। শিয়ালদা থেকে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে সোজা সে চলে যায় হাওড়া স্টেশনে। সেই সময় বম্বে মেল ছাড়ত সন্ধেবেলায়। বাড়ি ভাড়ার টাকা ছাড়াও নিজের জমানো আরো কিছু টাকা সঙ্গে ছিল। একটা টিকিট কেটে সোজা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে বসে। পুরো দু'টো রাত ট্রেনে কাটিয়ে তৃতীয় দিন দুপুরে সে পৌঁছে যায় ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে।

বোম্বাই শহরের কিছুই জানা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে সে ক্রফোর্ড মার্কেটের পেছনে এক সরু গলিতে খুব সস্তা খেলো ধরনের গুজরাটি হোটেলে ওঠে।

লম্বা ট্রেন জার্নিতে প্রচণ্ড ধকল গেছে। গায়ের ব্যথা মারতে সেই দিনটা শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দেয়। পরের দিনটা মালাবার হিল, মেরিন ড্রাইভ, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, জুহু বীচ, এইসব দেখে কেটে যায়।

ঠিকানা টিকানা জুটিয়ে তার পরের দিন থেকে ফিল্ম স্টুডিওগুলোতে হানা দিতে থাকে মাধবমামা। স্টুডিওগুলো তো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পাশাপাশি নেই। কোনওটা আন্ধেরিতে, কোনওটা চেম্বুরে, কোনওটা দাদারে, কোনোটা ব্যান্ড স্ট্যান্ডের কাছে। মাধবমামা যে হোটেলে উঠেছে সেখান থেকে স্টুডিওগুলো পনেরো কুড়ি কি পঁচিশ মাইল দূরে দূরে। সকালে উঠেই স্নানটি সেরে চা খেয়ে সাবার্বন ট্রেনে বা দোতলা ট্রামে করে সে বেরিয়ে পড়ে, ফিরতে ফিরতে রাত।

রাজকমল, মোহন, রূপতারা, মডার্ন, বম্বে টকিজ, মেহবুব স্টুডিও, শ্রীসাউন্ড— পনেরো দিন সাত সাতটা স্টুডিওর সামনে এসে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে থেকেছে মাধবমামা, গেটের দারোয়ানদের প্রায় পায়ে ধরেছে কিন্তু দরজা খোলেনি। মাঝে মাঝে দামি দামি গাড়িতে করে সিনেমার পর্দায় দেখা নায়ক-নায়িকারা ভেতরে ঢুকে গেছে। পলকের জন্য গেটটা খুলেই আবার বন্ধ হয়েছে। মাধবমামা আশায় আশায় থাকত, খিদেয় পেট জ্বলে গেলেও গেটের সামনে থেকে নড়ত না। কত গল্প শুনেছে সে, রাস্তায় এরকম দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অনেকে ডিরেক্টর, হিরো বা হিরোইনদের নজরে পড়েছে, তারপর তাদের ভাগ্য ফিরে গেছে। তেমন একটা ঘটনা তার জীবনেও কি ঘটতে পারে না? কিন্তু কিছুই ঘটেনি।

মাসখানেকের ভেতর মাধবমামার সব টাকা ফুরিয়ে গেল। বাড়িতে যে টাকার জন্য চিঠি লিখবে তার মুখ নেই। অগত্যা—

জিগ্যেস করলাম, 'অগত্যা কী?'

মাধবমামা বলল, 'যে হোটেলে উঠেছিলাম, সেখানে ভাণ্ডি মাজার কাজ নিলাম।' সংকোচে তার মাথা নুয়ে পড়ল যেন।

'ভাণ্ডি কী?'

'বাসন। অবশ্য এর ফাঁকে ফাঁকে স্টুডিওতেও যেতে লাগলাম। এইভাবে বছরখানেক কেটে গেল।'

'তারপর নিশ্চয়ই অ্যাক্টিংয়ের চান্স পেয়েছিলে?'

'পেলে তো সিনেমাতেই আমাকে দেখতে পেতে।'

'এক বছর চেষ্টা করেও কিছু হল না?'

'এক বছর কী বলছ! সারা জীবন ঘোরাঘুরি করে মাথার চুল পাকিয়েও অনেকের কিছু হয় না।'

'যখন চান্স পাওয়া গেল না তখন কী করলে? ক্রফোর্ড মার্কেটের সেই হোটেলে এখনও আছ নাকি?' বলতে পারলাম না, ষোল বছর ধরে মাধবমামা গুজরাটি হোটেলে বাসন মেজে যাচ্ছে কিনা।

মাধবমামা আমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল। বলল, 'না না, ওই হোটেলে আর থাকি না, ভাণ্ডিও মাজি না। এক বছর পর ওখান থেকে চলে গিয়েছিলাম।'

'কী করছ তা হলে?'

'গুজরাটি হোটেল ছাড়ার পর নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সান্তাক্রুজে দিল্লির এক বড় মিঠাইবালার কাছে কাজ নিয়েছি। ওখানেই আছি।'

'কী কাজ করো ওখানে?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাধবমামা বলল, 'রসগোল্লা বানাই।'

অনেকটা সময় হাঁ হয়ে রইলাম। যে অশোককুমার হবার জন্য একদিন বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিল তার পরিণতি এই? মিঠাইয়ের দোকানে রসগোল্লা বানাবার কারিগর! খানিকটা সামলে উঠে জিগ্যেস করলাম, 'তোমাদের দোকানটা কোথায়?'

'সান্তাক্রুজ ওয়েস্টে, স্টেশনের গায়ে।'

'থাক কোথায়?'

এবার ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ে মাধবমামা। বলে, 'সে অনেক দূরে, আন্ধেরিতে। তুমি খুঁজে বার করতে পারবে না।'

বললাম, 'খুব পারব। তুমি ঠিকানাটা দাও না। আন্ধেরি স্টেশনে নেমে কোন দিকে যেতে হবে বল। ইস্টে, না ওয়েস্টে?'

'ইস্টে। ওদিকের রাস্তাঘাট ভালো না। তা ছাড়া হাঁটতে হবে অনেকটা। আমি বরং তোমার হোটেলে গিয়ে দেখা করব।'

বুঝতে পারছি, মাধবমামা আমাকে ঠিকানা দিতে চায় না। এটা আমি আশা করি নি। ভেবেছিলাম সে আমাকে তার বাড়িতে টেনে নিয়ে যাবে। বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিকানা দেবার যখন ইচ্ছে নেই, দিও না। সময় পেলে আমার হোটেলেই এস।'

আমার চোখেমুখে এবং গলার স্বরে ক্ষোভটা গোপন থাকে নি, পরিষ্কার ফুটে বেরিয়েছে। মাধবমামা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল. তারপর বলল, 'এবার আমাকে যেতে হবে। কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল এবং আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ট্যাক্সি ডেকে হুড়মুড় করে তার ভেতর ঢুকে পড়ল।

সেই যে মাধবমামা উদিপি রেস্তোরাঁ থেকে চলে গিয়েছিল তারপর মাসখানেক কেটে গেছে। এর ভেতর চিত্রনাট্যের কাজ নিয়ে সারাদিন আমাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে মাধবমামাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। একমাস পর কাজের চাপ হালকা হলে তার কথা মনে পড়ল। মাধবমামা এর মধ্যে তো আমার হোটেলে একদিনও আসে নি। অবশ্য এই একটা মাস নিজের হোটেলে আমি অল্পক্ষণই থেকেছি। বেশির ভাগই কেটেছে অন্য বড় হোটেলে। আমার ডিরেক্টর ফাইভ-স্টার হোটেলের এয়ার-কন্ডিশনড স্যুইট ছাড়া একেবারেই কনসেনট্রেট করতে

পারেন না। আজে বাজে জায়গায় ভাবনা চিন্তাগুলো নাকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। মন একাগ্র না হলে কাজের ভীষণ অসুবিধা।

এমনও হতে পারে, আমি যখন হোটেলে থাকতাম না সেই সময় হয়তো মাধবমামা এসে ঘুরে গেছে। অবশ্য একটা খটকাও রয়েছে। যদি এসেই থাকে রিসেপশানে একটা দু'টো লাইনও তো লিখে রেখে যেতে পারত। পরে আমার মনে হল, সে আসে নি।

যে এড়াতে চায় তার কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো। কিন্তু হঠাৎ অদম্য এক কৌতূহল এবং জেদ আমাকে পেয়ে বসে। মনে হল, এই বোম্বাই শহরে সে এমন কিছু করেছে বা এমন কিছুতে জড়িয়ে পড়েছে যা গোপন রাখতে চায়। বিশেষ করে আত্মীয়স্বজন বা চেনাশোনা মানুষের মধ্যে জানাজানি হোক, এটা তার কাছে একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আমাকে তা জানতেই হবে। সে এড়াতে চাইলেও আমি তাকে ছাড়ছি না।

যেদিন চিত্রনাট্য ফাইনাল করে পরিচালকের হাতে তুলে দিলাম তার পরের দিনই সান্তাক্রুজ ওয়েস্টে এসে দিল্লিওলা মিঠাইয়ের বিশাল দোকানটা খুঁজে বার করলাম। তবে এখানে আসার সময় আমার মনে নতুন একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যে-বাড়ির ঠিকানা দিতে চায় না সে কি তার কাজের জায়গার সঠিক ঠিকানা দিয়েছে?

দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। তারই ভেতর জায়গা করে নিয়ে কাউন্টারে একটা সেলসম্যানের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। বললাম, 'এখানে মাধব তালুকদার নামে কেউ কাজ করে?'

লোকটা খুবই ভদ্র, ব্যবহার চমৎকার। হিন্দিতে বলল, 'থোড়েসে ঠহ্‌রিয়ে।' আমাকে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত কয়েকজন খদ্দেরকে মিঠাইয়ের প্যাকেট বেঁধে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'মাধব তালুকদার—বঙ্গালী হালুইকর? হাঁ, মাধব আমাদের কারখানায় কাজ করে।'

আমার টেনশন কিছুটা কাটল। এখানে কাজ করার কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়। বললাম, 'তাকে একটু খবর দিতে হবে। আমি তার রিস্তেদার, অনেক দূর থেকে আসছি।'

'পাঁচ মিনিট ঠহ্‌রিয়ে—' বলে একটা লোককে ডেকে কারখানায় পাঠিয়ে দিল সেলসম্যান। কিছুক্ষণ বাদে লোকটা ফিরে এসে খবর দিল, মাধবমামা পাঁচ দিন ধরে কাজে আসছে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সেলসম্যানকে জিগ্যেস করলাম, 'ওর বাড়ির ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

'হাঁ হাঁ, বেশক। আন্ধেরি ইস্ট, মহাকালীর কাছে। প্রভাকর রাও পাটিলের চৌল।'

আমার মাথায় গোঁ চেপে গিয়েছিল। দিল্লিওলা মিঠায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা সান্তাক্রুজ স্টেশনে চলে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে আন্ধেরিতে।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে সারা গায়ে ঘাম ছুটিয়ে আন্ধেরি ইস্টের মহাকালীতে প্রভাকর রাওয়ের চৌল খুঁজে বার করলাম। এটা একটা দুর্দান্ত অভিযানের পর্যায়েই পড়ে।

বম্বে শহরের চৌলগুলোকে প্রায় বস্তিই বলা যায়। এক একটা চৌলে কম করে পাঁচ সাতশো মানুষ থাকে।

প্রভাকর রাও পাটিলের চৌলটা টানা ব্যারাকের মতো। বাড়িটা দোতলা, মাথায় অ্যাসবেস্টসের চাল। একতলা দোতলা মিলিয়ে কম করে দু-আড়াইশোর মতো ঘর। মনে হল, একেক ঘরে একেকটা ফ্যামিলি থাকে। সারা ভারতবর্ষের সব প্রভিন্সের মানুষ এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাঙালি বিহারী ওড়িয়া কেরেলি পাঞ্জাবি সিন্ধি মারাঠি গুজরাটি কোঙ্কনি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান, কী নেই? সত্যিকারের সহাবস্থান আর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ঘটেছে বম্বের এই চৌলগুলোতে।

প্রভাকর রাও পাটিলের চৌলের শুরুটা বোঝা যায় কিন্তু কোথায় যে শেষ, ধরা যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ লক্ষ করার পর বোঝা গেল, গেট বলতে এ-বাড়ির কিছু নেই। যেখান দিয়ে খুশি ঢুকে পড়া যায়।

কপাল ঠুকে ঢুকেও পড়লাম। সারা চৌলটায় হাঁস মুরগির ছানার মতো শ'খানেক কাচ্চাবাচ্চা চেঁচামেচি আর হুল্লোড় করে যাচ্ছে।

আমি যেখান দিয়ে ঢুকেছি তার মুখোমুখি একটা ঘরের বারান্দায় বসে হাফপ্যান্ট-পরা আধবুড়ো ক্ষয়াটে চেহারার একটা লম্বা লোক বিড়ি ফুঁকছিল। অচেনা মানুষ দেখে বিড়ি ফোঁকা স্থগিত রেখে সে উঠে দাঁড়াল। জিগ্যেস করল, 'রাও, কাকে খুঁজছেন?' লোকটা যদিও হিন্দিতে বলছে তবু তার কথায় স্পষ্ট মারাঠি টান। লোকটা যে মহারাষ্ট্রীয়, সন্দেহ নেই।

কী কারণে এসেছি জানিয়ে দিলাম।

লোকটা বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

সে আমাকে নিয়ে একটু দূরে দোতলার সিঁড়িতে নিয়ে তুলল। ওপরে আসতেই দেখা গেল, ডান পাশে টানা বারান্দা চলে গেছে, বাঁয়ে সারি সারি ঘর।

আমার গাইড ডাইনে আঙুল বাড়িয়ে বারান্দার শেষ মাথাটা দেখিয়ে বলল, 'ওখানে শেষ ঘরটায় মাধব থাকে। যদি ওকে না পান, পাশের ঘরে পুষ্পাকে জিগ্যেস করলে পাত্তা মিলে যাবে।' লোকটা আর দাঁড়াল না, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

আমি এগিয়ে গেলাম। পাশের ঘরগুলো থেকে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ আমাকে লক্ষ করতে লাগল।

শেষ ঘরটায় মাধবমামাকে পাওয়া গেল না। সেই লোকটার কথামতো পাশের ঘরের সামনে এসে ডাকলাম, 'একটু শুনবেন?'

দরজাটা খোলাই রয়েছে। ভেতরে লোকজন যে আছে, বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের একটি মহিলা বেরিয়ে এল। কাছা দিয়ে শাড়ি পরার ধরন দেখে টের পাওয়া যায় সে মারাঠি।

মহিলাটির মাথায় প্রচুর চুল। স্বাস্থ্য বেশ অটুট। মুখে কাঁচা সজীব একটা ভাব আছে।

মহিলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। তাকে মাধবমামার কথা বললাম। আমাকে দাঁড়াতে বলে সে ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই মাধবমামা বেরিয়ে এল এবং আমাকে দেখে এমনই হকচকিয়ে গেল যে খানিকক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

মাধবমামার পরনে এই মুহূর্তে ময়লা চুস্ত আর গেঞ্জি। একটা বাচ্চা কাঁখে, আর একটা কাঁধে। তার মুখে চার পাঁচদিনের খাপচা খাপচা দাড়ি।

দেখামাত্র যা বোঝা গেল, তা এইরকম। মাধবমামা একটা মারাঠি মেয়েকে বিয়ে করে এখানে সংসার পেতেছে। সম্ভবত এই ব্যাপারটা সে আমার কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্য জাতের একটি মেয়েকে বিয়ে করার মধ্যে কী পাপবোধ থাকতে পারে আমার মাথায় এল না। এটা খুনখারাপি বা রাহাজানি ধরনের অপরাধ নয় যে আত্মীয়স্বজনের কাছে লুকিয়ে বেড়াতে হবে।

একসময় কিছুটা ধাতস্থ হয়ে মাধবমামা বলল, 'তুমি!'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, আমিই।'

'এই চৌলের ঠিকানা পেলে কিভাবে?'

কিভাবে পেয়েছি, জানালাম।

তার জন্য এতটা ছোটাছুটি করব, মাধবমামা ভাবতে পারেনি। অবাক চোখে সে তাকিয়ে রইল।

আমি এবার বললাম, 'কি, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবে?'

মাধবমামা লজ্জা পেল। দ্রুত বাচ্চা দু'টোকে কাঁধ এবং কোমর থেকে নামিয়ে বলল, 'চল, আমার ঘরে যাই।'

একটু খটকা লাগল। মাধবমামা তার ঘরে নিয়ে যেতে চাইছে। এটা কি তা হলে তার ঘর নয়? লক্ষ করলাম, মাধবমামার পেছনে দাঁড়িয়ে সেই মহিলাটি আমাকে পলকহীন দেখে যাচ্ছে। তার চোখে সংশয়। বুঝে উঠতে পারছে না আমি কে এবং কী উদ্দেশ্যে হঠাৎ এখানে হানা দিয়েছি।

মাধবমামা ঘাড় ফিরিয়ে মহিলাটিকে মারাঠিতে বলল, 'আমাদের চা পাঠিয়ে দিও।'

বম্বেতে কিছুদিন আছি, অল্পস্বল্প মারাঠি বুঝি। মহিলাটি মুখে কিছু বলল না, আমার দিকে চোখ রেখে আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল।

মাধবমামা আর দাঁড়াল না, আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে এল।

একধারে চওড়া ফিতের খাটিয়ায় বিছানা পাতা। সেটার পাশে খেলো কাঠের আলমারি। আরেক ধারে বসার জন্য তিন চারটে সস্তা চেয়ার। দেওয়ালে গণপতির মূর্তিওলা বিরাট ক্যালেন্ডার ঝুলছে।

আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে মাধবমামা মুখোমুখি বসল। পাশের ঘরের মহিলাটি সম্বন্ধে আমার প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু মাধবমামা তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি বা তার ব্যাপারে একটি কথাও বলেনি। অথচ যেভাবে মাধবমামাকে একটু আগে ওঘরে দেখেছি এবং যেভাবে সে মহিলাটিকে চা দিয়ে যেতে বলল তাতে দু'জনের সম্পর্ক যে খুবই ঘনিষ্ঠ, এক পলকেই তা টের পাওয়া যায়।

তবে মাধবমামা যখন কিছু বলল না তখন যেচে কিছু জিগ্যেস করতে যাওয়াটা অশোভন। আমি একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম, 'সেদিন তোমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারিনি। আচ্ছা মামা, একটা কথা জিগ্যেস করব?'

সন্দিগ্ধ চোখে মাধবমামা আমার দিকে তাকাল, 'কী?'

'কলকাতায় কি তোমার একেবারেই ফিরতে ইচ্ছে করে না? আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে এতদূরে একা একা পড়ে আছ। তাদের কথা একবারও কি মনে পড়ে না?'

মাধবমামাকে বেশ বিচলিত দেখাল। বলল, 'সবাইকেই মনে পড়ে। কলকাতায় তো সবসময় যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু যাওয়া আর হয় কই?'

'যাওয়া হয় না কেন?'

'তোমাকে সেদিনই বলেছি, কোন মুখে বাড়ি ফিরব!'

মাধবমামার মনোভাবটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তার দাদারা সবাই শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সিনেমার টানে বম্বেতে ছুটে এসে তার কিছুই হল না। এক ধরনের গ্লানি এবং হীনম্মন্যতায় সর্বক্ষণ সে ভুগছে। তাই চেনা-জানা সবাইকে এড়িয়ে চলতে চায়।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কলকাতায় গেলে কেউ তাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করবে না, বরং আন্তরিকভাবে খুশিই হবে কিন্তু তা বলার আগেই সেই মহিলাটি চা, কারিপাতা মেশানো মিষ্টি চিঁড়ে ভাজা এবং লাড্ডু নিয়ে এল। তার পেছন পেছন সেই বাচ্চা দু'টো তো এলই, আর এল ওদের চেয়ে সাত আট বছরের বড় একটি মেয়ে। মুখচোখের আদল দেখে মনে হল এরা সবাই ওই মহিলারই ছেলেমেয়ে।

বাচ্চা দু'টো ঘরে ঢুকেই হুটোপুটি শুরু করে দিল। এ-ঘর যেন তাদেরই খাস তালুক। বড় মেয়েটা বেশ শান্ত, সে খাটিয়ার এককোণে বসে সরল চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

সেই বাচ্চা দু'টো হঠাৎ হুল্লোড় স্থগিত রেখে মাধবমামার থালা থেকে ছোঁ মেরে লাড্ডু আর চিঁড়ে ভাজা তুলে, মুখে পুরেই আবার নতুন উদ্যমে হইহই শুরু করল। গভীর স্নেহে তাদের দিকে একপলক তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিল মাধবমামা। তারপর বলল, 'আরো যে জন্যে কলকাতায় যেতে পারি না তা হল এরা—' বলে বাচ্চা দু'টোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল, 'ওরা ভীষণ ভোগে। আজ যদি চুড্ডাটা জ্বরে পড়ে, কাল পুড্ডাটাকে ডিসেন্ট্রিতে ধরে। বলতে নেই, গণপতির কৃপায় এখন কিছুদিন ভালো আছে ওরা। তাছাড়া ওই মেয়েটা, তনি—ও পড়ে অনেক দূরে। ওর স্কুলের বাস নেই, তাই পৌঁছে দিতে হয় সকালে। ওর মা বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসে। এ-সব নিয়ে এত জড়িয়ে আছি যে এখানে থেকে নড়বার উপায় নেই।'

এতক্ষণে সুযোগ পাওয়া গেল। বেশ অনুযোগের সুরেই বললাম, 'তোমার ব্যবহারে আমি কিন্তু খুব দুঃখ পেয়েছি।'

মাধবমামা চমকে উঠল, 'কেন, কী করেছি আমি!'

'মামীর সঙ্গে এখনও কিন্তু আমার আলাপ করিয়ে দাও নি।'

'কে মামী!' মাধবমামার দু'চোখে অপার বিস্ময় ফুটে বেরোয়।

আমি দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সেই মহিলাকে দেখিয়ে দিলাম।

শশব্যস্তে জিভ কেটে মাধবমামা বলে উঠল, 'ছি ছি, ও তো পুষ্পা ভাবী। আমি এখনও বিয়েই করি নি।'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'তা হলে—'

এরপর মাধবমামা যা বলল তা এইরকম। বম্বে আসার পর বছরখানেক স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘোরাঘুরির পর যখন সিনেমার ব্যাপারে তার পুরোপুরি মোহভঙ্গ ঘটে গেছে, সেইসময় পুষ্পার স্বামী শিবার সঙ্গে তার আলাপ। শিবার পুরো নাম শিবরাও নায়েক। তখন অল্প বয়েস। শিবার সঙ্গে বন্ধুত্বটা গাঢ় হতে বেশি সময় লাগেনি। শিবা একটা কাপড়ের কলে কাজ করত। ফ্যাক্টরিতে মাধবমামাকে ঢোকাবার জন্য সে কম চেষ্টা করে নি। কিন্তু কিছুই করতে পারে নি।

শিবা অবশ্য এখানে ওখানে নানা জায়গায় টেম্পোরারি কাজ জুটিয়ে দিয়েছে মাধবমামাকে। সান্তাক্রুজে দিল্লিওলা মিঠাইয়ের দোকানের চাকরিটাও তারই জন্য হয়েছে। শিবা বরাবর আন্ধেরির এই চৌলটায় থাকত। দিল্লিওলা মিঠাইয়ের দোকানে কাজ হবার পর মাধবমামাকে এখানে ঠিক তার পাশের ঘরটাতে এনে তুলল। আর সেবারই পুষ্পার সঙ্গে শিবার বিয়ে হল। তারপর একে একে তনি হল, চুড্ডা হল, পুড্ডা হল। সুখে-দুঃখে ভালোয়-মন্দয় শিবাদের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেল মাধবমামা।

দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বছর দুই আগে কারখানার এক অ্যাকসিডেন্টে শিবা মারা যায়। তারপর থেকে পুষ্পাদের সঙ্গে আরো জড়িয়ে গেল মাধবমামা।

মাধবমামা গাঢ় আন্তরিক গলায় বলতে লাগল, 'বল, এদের ফেলে একদিনের জন্যেও আমি কি কোথাও গিয়ে থাকতে পারি? আমি ছাড়া ওদের যে আর কেউ নেই।'

হঠাৎ আমার চোখ চলে গেল পুষ্পার দিকে। খুব সম্ভব বাংলা ভাষাটা কিছু কিছু বোঝে সে। তার চোখেমুখে এই মুহূর্তে যা ফুটে বেরিয়েছে তা শুধুই কৃতজ্ঞতা নয়। পুষ্পার চোখের

দৃষ্টি বুঝিয়ে দিল তার সঙ্গে মাধবমামার সম্পর্কটা ঠিক কী। নইলে যত গভীর ঘনিষ্ঠতাই থাক, মৃত বন্ধুর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের জন্য কেউ এতটা জড়িয়ে পড়ে না।

মাধবমামা এবার বলল, 'আমাদের বাড়িতে বলে দিও, এদিকটা একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে পারলে একবার ঠিক কলকাতায় যাব, সবার সঙ্গে দেখা করে আসব। কতকাল দাদা বৌদিদের দেখি না!'

মাধবমামা যা-ই বলুক, আমি কিন্তু জানি আরবসাগরের পাড়ের এই শহর থেকে বারো শো মাইল দূরের অন্য এক শহরে আর কোনওদিনই তার যাওয়া হবে না। যত দিন যাবে, সে এখানে আরো আরো বেশি করে জড়িয়ে যাবে।

সুদীপ এবং একটি খারাপ মেয়ে

এই দুপুর বেলায় ডাউন লোকাল ট্রেনটায় একেবারেই ভিড় টিড় নেই। সুদীপ যে কম্পার্টমেন্টে জানালার ধার ঘেঁষে বসে আছে সেখানে মাত্র দশ বারোটি প্যাসেঞ্জার। তারা এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

দুপুরের দিকে দু-এক ঘণ্টা বাদ দিলে সাবার্বন লাইনের ট্রেনগুলোতে ছুঁচ গলাবার জায়গা থাকে না। এখন কামরাগুলো এমনই ফাঁকা, ইচ্ছা করলে শুয়েও যাওয়া যায়।

এই সময়টা কোনও দিন বাড়ি ফেরে না সুদীপ। আচমকা অফিসে স্ট্রাইক হয়ে যাওয়ায় করার কিছুই ছিল না। এয়ার-কণ্ডিশন্ড সিনেমা হলে গিয়ে কোনও বিদেশি রোমান্টিক ছবিটবি দেখে ঘণ্টা তিনেক আরামে কাটিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু ফিল্ম দেখতে আজ ভালো লাগছিল না।

কলকাতা থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে বীরপুরের নতুন টাউনশিপে বাড়ি করেছে সুদীপরা। এ-লাইনের সে একজন ঝানু ডেইলি প্যাসেঞ্জার। সকালে আটটা পঁচিশের ট্রেন ধরে কলকাতায় আসে, ফেরে ছ'টা চল্লিশ কি সাতটা আটের ডাউন লোকালে। একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে ছোট মাপের একজন এক্‌জিকিউটিভ সে।

সুদীপের বয়স আটাশ উনত্রিশ। ছ' ফিটের মতো হাইট, মেদহীন টান টান চেহারা, স্পোর্টসম্যানদের মতো দারুণ স্বাস্থ্য, গায়ের রং বাদামি, চুল ব্যাকব্রাশ-করা, পরনে দামি সাফারি স্যুট।

এখনও বিয়ে টিয়ে হয়নি সুদীপের। এ-নিয়ে বাড়ি থেকে নিয়মিত চাপও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনস্থির করে উঠতে পারেনি সে। আরো দু-তিনটে বছর ভারহীন ফুরফুরে জীবন কাটাতে চায় সুদীপ। তারপর ওই ব্যাপারে ভাবা যেতে পারে। আসলে ভেতর থেকে কোনও রকম তাড়াই অনুভব করে না সে।

সচ্চরিত্র যুবক হিসাবে বীরপুরে সুদীপের বেশ সুনাম। তার বিরুদ্ধে এই নতুন শহরে কোনও দিন তেমন কিছু শোনা যায়নি।

জানালার বাইরে দূরমনস্কের মতো তাকিয়ে আছে সুদীপ। শিয়ালদা থেকে তিন-চার কিলোমিটার যেতে না-যেতেই দু'ধারে অবারিত সবুজ ধানখেত, কানায় কানায় ভরা খাল,

খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, সাঁকোর মাথায় মুনি ঋষিদের স্টাইলে বসে থাকা মাছরাঙা কি বক। মাথার ওপর দিয়ে বাতাস চিরে চিরে বুনো পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে পেন্সিলের আঁচড়ের মতো এক-আধটা আবছা গ্রাম কিংবা উদ্বাস্তু কলোনি।

একেকটা স্টেশন আসে, আধ মিনিটও থামে না ট্রেনটা। শশব্যস্তে দু-চারজন প্যাসেঞ্জার নামিয়ে, কয়েকজনকে তুলে আবার দৌড় লাগায়।

আকাশের গায়ে বোহেমিয়ান কিছু মেঘ, আদিগন্ত ধানের খেত বা পাখি টাখি, একটানা এই দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে একসময় কামরার ভেতর মুখ ফেরায় সুদীপ। আর তখনই দেখতে পায় তিন চারটে 'রো' পর কোনাকুনি একটা জানালার পাশে বসে আছে প্রীতি। লক্ষ করে, প্রীতিও পলকহীন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। হয়তো অনেকক্ষণ সে ওভাবে তাকে দেখে যাচ্ছে, সুদীপ টের পায়নি।

প্রীতির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মতো। গায়ের রং কালো না ফর্সাও না, দুইয়ের মাঝামাঝি। মুখ ডিম্বাকৃতি, ছোট্ট কপালের ওপর ঘন চুলের ঘের। চুল অবশ্য লম্বা নয়, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। বড় বড় টানা চোখ প্রতিমার কথা মনে করিয়ে দেয়, গলাটি যেন নিখুঁত ফুলদানি। নিটোল হাত দু'টি কাঁধ থেকে সটান নেমে এসেছে, আঙুল লম্বাটে, পাতলা ঠোঁট, ম্যানিকিওর করা নখ।

প্রীতির পরনে এই মুহূর্তে রঙিন সিনথেটিক শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউজ, পায়ে হালকা ফ্যাশনেবল স্লিপার। গলায় সরু চেইন। বুকের যে-লকেটটা ঝুলছে সেটা মীনে-করা ছোট্ট একটা নৌকো।

কতদিন পর প্রীতিকে এত কাছ থেকে দেখল সুদীপ? পাঁচ ছ'বছর তো নিশ্চয়ই। তখন তার মুখ ছিল আরো ভরাট, মসৃণ ত্বক থেকে দ্যুতি বেরিয়ে আসত যেন, চুল খুলে দিলে কোমর ছাপিয়ে যেত।

একটু ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রীতির সমস্ত চেহারায় কালচে সরের মতো একটা ছোপ পড়েছে, চোখে মুখে পৃথিবীর যাবতীয় ক্লান্তি। মুখের সেই ভরাট ভাবটা আগের মতো নেই, সেখানে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে, কণ্ঠার হাড় খানিকটা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। দৃষ্টিতে আর নিষ্পাপ সারল্য নেই, সেখানে এক কর্কশ রুক্ষতা। হয়তো বা আক্রোশ।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল সুদীপের। চোখ দু'টো সরিয়ে আবার যে জানালার বাইরে তাকাবে, তা-ও পারছিল না। যাদুকরীর মতো রহস্যময় কোনও শক্তিতে প্রীতি তার চোখ দু'টিকে নিজের চোখের ভেতর আটকে রেখেছে।

রোজ এই লাইনে সকালে কলকাতায় গিয়ে সন্ধেয় ফিরে আসে সুদীপ। আগেই তার কানে এসেছে, প্রীতিও নাকি নিয়মিত কলকাতায় যায়। কিন্তু অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। হয়তো তার যাতায়াতের সময় আলাদা।

আজ এতকাল বাদে দুপুরের এই ফাঁকা ট্রেনে প্রীতির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটা যেন অদৃশ্য নিয়তিরই নির্দেশ। স্বয়ংক্রিয় কোনও নিয়মে কখন যে সুদীপ তার মুখোমুখি এসে বসে, নিজেই জানে না।

কতদিন পর এত কাছে এসে বসল সুদীপ? পাঁচ ছ'বছর তো হবেই। প্রীতির শরীরে অল্পস্বল্প ভাঙচুর শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও থেকে গেছে অভ্রান্ত তীব্র আকর্ষণ, অবিকল যেমনটি ছিল পাঁচ ছ'বছর আগে। সুদীপেব হৃৎপিণ্ডে হাজারটা ঘোড়া ঝড় তুলে ছুটতে থাকে। তার নিশ্বাস গাঢ় হয়ে আসে।

হঠাৎ সুদীপ বলে, 'অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল।'

প্রীতি স্থির চোখে তাকিয়েই আছে। তার চাউনি বুঝিয়ে দেয়, পৃথিবীর কাউকেই সে বিশ্বাস করে না। আস্তে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'হ্যাঁ।'

'অথচ একসময় রোজ আমাদের দেখা হত। তারপর—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় সুদীপ।

প্রীতি উত্তর দেয় না।

সুদীপের কথাটা ঠিক। বছর ছয়েক আগে পর্যন্ত বীরপুরে তাদের পাড়াতেই বাড়ি ভাড়া করে থাকত প্রীতিরা। সুদীপদের বাড়ির পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর ওদের ছোট্ট একতলা। বাড়িওলার বদলির চাকরি। আজ দিল্লি, কাল হায়দ্রাবাদ, পরশু বরোদা, এই করে অনবরত ছুটতে হত তাকে। প্রীতিরাই গোটা বাড়িটা নিয়ে থাকত।

চমকে দেবার মতো কোনও ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই প্রীতিদের। সাদামাঠা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি যেমন হয় অবিকল তা-ই। প্রীতিরা তিন চার ভাইবোন। প্রীতি সবার বড়। এ ছাড়া মা, বাবা। বাবা একটা প্রাইভেট ফার্মে মাঝারি ধরনের কাজ করতেন। অঢেল টাকা পয়সা, পর্যাপ্ত আরাম না থাকলেও অভাব ছিল না।

প্রীতিরা ছিল সুদীপদের সব চেয়ে কাছের প্রতিবেশী। দু'বাড়ির লোকজনদের মধ্যে মেলামেশা, যাতায়াত ছিল যথেষ্ট। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও ওরা প্রায় আত্মীয়র মতোই।

সুদীপ যখন সায়েন্স কলেজে এম. এসসি পড়ছে তখন প্রীতি বীরপুর কলেজে বি. এ ফার্স্ট ইয়ারে। যৌবনের সেই গোড়ার দিকে সুদীপ আর প্রীতির মনে হয়েছিল, পরস্পরকে ছাড়া বেঁচে থাকার মানে নেই।

হয়তো তারা যা চেয়েছিল একদিন তা-ই পেয়ে যেত। দুই বাড়ির অভিভাবকদেরও সেইরকম ইচ্ছাই যে ছিল, মোটামুটি তা তারা জানতো। কোথাও কোনও বাধা ছিল না। শুধু সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়ে সুদীপের একটা চাকরি টাকরি পাওয়া আর প্রীতির বি. এ'টা পাস করা, তারপরেই হয়তো দু' বাড়ির মা-বাবারা আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন।

কিন্তু ভবিষ্যতের যে-ছকটি তারা কেটে রেখেছিল, সেটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। তাদের ঠুনকো স্বপ্ন একদিন তছনছ হয়ে যায়। সুদীপ সবে সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়েছে আর প্রীতির সেকেন্ড ইয়ার চলছে, হঠাৎ অফিসে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হল প্রীতির বাবার। হাসপাতাল বা নার্সিংহোম পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যাবার সুযোগ পাওয়া যায় নি।

বাবার মৃত্যুর পর প্রীতিদের সংসার একেবারে অথই জলে গিয়ে পড়ে। সুদীপের মা-বাবা যতটা পেরেছেন, করেছেন। প্রীতির বাবার অফিস থেকে তাঁর পুরনো লোনটোন কেটে প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুয়িটির টাকা যা পাওয়া গিয়েছিল তাতে কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাটতে থাকে।

কিন্তু এভাবে তো চিরদিন চলে না। প্রীতি কলেজ ছেড়ে দিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আর কলকাতার অফিস পাড়ায় ঘুরতে লাগল কিন্তু তার আত্মীয়স্বজনদের ভেতর কেউ মিনিস্টার বা এম. পি নেই যে চাইলেই চাকরি জুটে যাবে।

সুদীপ তাকে অনেকবার বুঝিয়েছে, বি. এ'টা অন্তত পাস করা অত্যন্ত জরুরি। একটা ডিগ্রি টিগ্রি না থাকলে চাকরি বাকরি অসম্ভব। প্রীতি সেটা ভালো করেই জানতো কিন্তু সংসার যখন ডুবে যাচ্ছে, পড়াশোনা চালানোর মতো শৌখিনতা তার মানায় না।

অবশ্য সুদীপ এবং তার বাবাও প্রীতির একটা কাজের জন্য একে ওকে ধরেছেন। কিন্তু তাঁরাও সাধারণ মধ্যবিত্ত। তাঁদের সামর্থ্য আর কতটুকু! ক্ষমতাবান আত্মীয়স্বজন বা জানাশোনাও তাঁদের তেমন কেউ নেই যাকে ধরলে কাজ হয়।

এদিকে হাতের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রীতিদের। কয়েক মাস বাড়িভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওলা উঠে যাবার জন্য নোটিশ দিয়েছে।

নিজেদের সংসার চালিয়ে পাঁচ ছ'জনের আরেকটি পরিবার টানা অসম্ভব, বিশেষ করে সুদীপদের পক্ষে। তাদের বাড়িতেও বাবা ছাড়া তখন আর কারো চাকরি টাকরি হয়নি।

যতদিন প্রীতির বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড টান্ডের টাকা ছিল, তার সঙ্গে সুদীপদের সাহায্য মিলিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে তারা চালিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু হাতের টাকাটা ফুরিয়ে যাবার পর সংসার প্রায় অচল হয়ে যায় প্রীতিদের।

এদিকে যথেষ্ট সহানুভূতি সত্ত্বেও ক্রমশ সুদীপের মা বাবা বিরক্ত হতে শুরু করেছিলেন। নিজেদের সংসার বাঁচিয়ে তবে তো অন্যের সম্বন্ধে উদারতা দেখানো যায়। পরের দিকে প্রীতিদের বাড়ির কেউ এলে মুখ গম্ভীর হয়ে যেত মা-বাবার।

এই সময় দু'বছরের একটা ট্রেনিং নিতে হায়দ্রাবাদ চলে যায় সুদীপ। যাবার আগে প্রীতিকে বলেছিল, কোনওরকমে কষ্ট টষ্ট করে দু'টো বছর যেন কাটিয়ে দেয় সে। ট্রেনিংয়ের পর ফিরে এলে ভালো কিছু একটা সে পাবেই। তখন আর দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না।

হায়দ্রাবাদে গিয়ে ট্রেনিং পিরিয়ডে সুদীপ যে অ্যালাওয়েন্স পেত তাতে টায়টোয় তার খরচটাই চলে যেত। তা থেকে বাঁচিয়ে যে কিছু পাঠাবে তার উপায় ছিল না।

হায়দ্রাবাদে যাবার পর প্রীতিকে সপ্তাহে একখানা চিঠি লিখত সুদীপ। প্রথম একটা মাস নিয়মিত উত্তর পেয়েছে সে। তারপর থেকে প্রীতির চিঠি বন্ধ হয়ে যায়।

সুদীপ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। মাকে চিঠি লিখে প্রীতিদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল সে। মা উত্তর দিতেন ঠিকই কিন্তু প্রীতিদের ব্যাপারে একটি লাইনও লিখতেন না।

অনেকবার লেখার পর মা জানিয়েছিলেন, প্রীতিরা তাঁদের পাড়া থেকে উঠে গেছে, তাদের নতুন ঠিকানা তাঁর জানা নেই। আরো যে কথাটা লিখেছিলেন সেটা খুবই মারাত্মক। এরপর থেকে প্রীতিদের সম্পর্কে সুদীপ যেন মাথা না ঘামায়। প্রীতি এমন কিছু কাণ্ড করেছে যা মা হয়ে তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

সুদীপ একবার ভেবেছিল, হায়দ্রাবাদ থেকে সেই মুহূর্তে বীরপুর ফিরে আসে। কিন্তু মিডল ক্লাস মানসিকতা তাকে ফিরতে দেয়নি। হায়দ্রাবাদের এই ট্রেনিংটা তাকে অনেক কিছুই দেবে। ভালো চাকরি, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, এমনকি বিদেশে যাবার সুযোগ। এটা হাতছাড়া করা যায় না। একটি মেয়ের চেয়ে এই ট্রেনিং অনেক বেশি মূল্যবান। তবে প্রীতির জন্য চাপা একটা কষ্ট তার বুকের ভেতর থেকেই যায়।

দু'বছর পর হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে প্রীতিদের সম্পর্কে সব খবরই পেয়ে যায় সুদীপ। একসঙ্গে পুরোটা কেউ তাকে বলেনি, টুকরো টুকরো ভাবে এর তার কাছ থেকে সে যা শুনেছে জোড়া লাগালে এরকম দাঁড়ায়।

চাকরি বাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সেই পুরনো রাস্তায় নেমে গেছে প্রীতি। সংসার বাঁচাবার জন্য সে রোজ কলকাতায় গিয়ে হোটেলে হোটেলে রাত কাটিয়ে আসে। নিজের শরীরের দামে ভাই-বোন এবং মাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে।

এতে নতুনত্ব কিছু নেই। সেই পুরনো গল্প, পুরনো সমস্যা।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা গোপনই ছিল। জানাজানি হবার পর পাড়ার লোকেরা জোর করে প্রীতিদের তুলে দেয়। এমন একটি মেয়ে থাকলে আবহাওয়া দূষিত হয়ে যাবে।

তাড়িয়ে দেবার পর বীরপুরের উত্তর দিকের শেষ মাথায় প্রীতিরা একটা বাড়িতে উঠে যায়।

সব জানার পর বিষাদে মন ভরে গেছে সুদীপের। ভেবেছে, তখনই প্রীতির কাছে ছুটে যায় কিন্তু বাধাটা এসেছে নিজের ভেতর থেকেই। তার চরিত্রে বিস্ফোরণ ঘটাবার শক্তি বা সাহস কোনওটাই নেই। নেহাতই সব দিক বাঁচিয়ে, নিজের সুনাম এবং ভবিষ্যৎ রক্ষা করে যদি কিছু করা যায়, এমনই মাঝারি মাপের অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবক সে। প্রীতি নরকের যে-লেভেলে নেমে গেছে সেখান থেকে তাকে তুলে আনার শক্তি বা দুর্জয় সাহস সুদীপের নেই। প্রীতির কাছে তার আর যাওয়া হয়নি। নিজের সুরক্ষিত দুর্গে দাঁড়িয়ে প্রীতির জন্য তার কষ্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই কষ্টের তীব্রতা ক্রমশ ফিকে হয়ে গেছে।

হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরার পর বেশিদিন বসে থাকতে হয়নি, তিন মাসের মধ্যেই মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে একজিকিউটিভের পোস্ট পেয়ে যায় সুদীপ।

তারপর এতদিন বাদে ফাঁকা ট্রেনের কামরায় প্রীতির সঙ্গে দেখা হল।

সুদীপ এবার জিগ্যেস করে, 'কেমন আছ প্রীতি?'

প্রীতির মুখ আগের মতোই নিরাসক্ত। আবেগশূন্য গলায় সে বলে, 'বেঁচে আছি।' একটু চুপ করে থাকে সে। তারপর আবার শুরু করে, 'আপনি তো বেশ ভালোই আছেন, মনে হচ্ছে।'

'আপনি' শব্দটা সুদীপের কানে সামান্য ধাক্কা দিয়ে যায়। সে বলে, 'ভালো আর কি। একটা চাকরি পেয়েছি, সেটাই করে যাচ্ছি। কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি একসময় আমাকে 'তুমি' করেই বলতে।'

'হয়তো বলতাম। ঠিক মনে পড়ে না। আর পড়লেই বা কী?' বলে অদ্ভুত হাসে প্রীতি।

সে কী ইঙ্গিত দিয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুদীপ ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করে। একবার ভাবে, নিজের সিটে ফিরে যায় কিন্তু প্রীতির শরীরে এখনও এমন প্রবল আকর্ষণ রয়েছে যা দুর্দান্ত কোনও শক্তিতে তাকে মুখোমুখি বসিয়ে রাখে।

সুদীপ সামনের দিকে অল্প ঝুঁকে বলে, 'হায়দ্রাবাদ থেকে তোমাকে রেগুলার চিঠি লিখেছি। প্রথম দিকে তোমার উত্তর পেলেও—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রীতি বলে ওঠে, 'ও-সব কথা থাক। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনাদের পাড়া থেকে আমাদের গায়ের জোরে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কারণটাও আপনার অজানা নেই। এরপর আপনাকে চিঠি লেখার কোনও মানে হয়?'

সুদীপ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'তবু—'

প্রীতি উত্তর দেয় না, তার কপাল সামান্য কুঁচকে যায় শুধু।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর প্রীতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'হায়দ্রাবাদ থেকে কবে ফিরেছেন?'

'বছর চারেক হবে—' বলেই থমকে যায় সুদীপ। কেননা এরপর নিশ্চয়ই একটি মারাত্মক প্রশ্ন করে বসবে প্রীতি। বীরপুর তো খুব বড় শহর নয় আর প্রীতির এতই দুর্নাম যে তার বাড়িটা সবাই চেনে। খোঁজখবর নিয়ে একবারও কি সেখানে যেতে পারত না সুদীপ? অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠায় শ্বাস আটকে যায় তার।

প্রীতি শুধু বলে, 'ও', কিন্তু সেই ভয়ানক প্রশ্নটা আর করে না।

একটু অপেক্ষা করে সুদীপ। ফুসফুসের আবদ্ধ বাতাস আস্তে আস্তে বার করে দিয়ে কী ভেবে সে একেবারে আলাদা প্রসঙ্গে চলে যায়, 'এই দুপুরবেলা কোত্থেকে ফিরছ?'

প্রশ্নটা অপ্রয়োজনীয়। সুদীপ ভালো করেই জানে প্রীতি কোত্থেকে ফিরছে। কিন্তু অন্য

পক্ষের যেখানে আদৌ কৌতূহল নেই, শুধুই গভীর অনাসক্তি, সেখানে কথা চালিয়ে যেতে হলে কিছু না কিছু বলতেই হয়।

প্রীতি বলে, 'আর কোত্থেকে? কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফিরছি।'

জেনেশুনেও সুদীপ এবার জিগ্যেস করে, 'তুমি কি রেগুলার কলকাতায় যাও?'

'না গিয়ে উপায় কী? বেচাকেনার অত বড় বাজার আর কোথায় পাব?'

প্রীতি সঠিকভাবে কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে সুদীপ বলে, 'বাজার মানে?'

এদিকে ইলেকট্রিক ট্রেন ঝড় তুলে মাঠ-ঘাট ধানখেত পেরিয়ে যেতে থাকে।

প্রীতি বলে, 'বাজার মানে বাজার।' বলতে বলতে ঝপ করে গলা নামিয়ে দেয়, 'নিজেকে রোজ আমি ওখানে বেচতে যাই।'

হঠাৎ সমস্ত চরাচরের ওপর আশ্চর্য স্তব্ধতা নেমে আসে। ট্রেনের শব্দ, বাইরে উলটোপালটা হাওয়ার আওয়াজ বা হকারদের হাঁকাহাঁকি, কিছুই যেন শুনতে পায় না সুদীপ। এত স্পষ্ট করে কঠিন সত্যটা প্রীতি যে বলতে পারে, তা ছিল অভাবনীয়। অনেক পালটে গেছে সে।

কিছুক্ষণ বাদে ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামলে চমকে ওঠে সুদীপ। প্ল্যাটফর্মে পাথরের ফলকে বাংলা হিন্দি এবং ইংরেজিতে নাম লেখা রয়েছে উদয়পুর।

উদয়পুরের পরই বীরপুর। মাঝখানে চার কিলোমিটারের দূরত্ব। এই রাস্তাটুকু পেরুতে ইলেকট্রিক ট্রেনের পাঁচ মিনিটও লাগবে না। সুদীপ ভাবে এখনই তার উঠে পড়া উচিত। কেননা বীরপুরে পৌঁছুলে স্টেশনে চেনাজানা কেউ যদি প্রীতির সঙ্গে তাকে নামতে দেখে, তার পরিণতি সুখকর হবে না। অথচ এবারও নিজের সিটে ফিরে যেতে পারছিল না সে।

ট্রেন ছেড়ে দেয়।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্থানপতন অনুভব করতে করতে সুদীপ বলে, 'তোমার সঙ্গে আর কি দেখা হবে না?'

প্রীতি উত্তর দেয় না, অদ্ভুত চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে।

সুদীপ টের পায় তার স্নায়ুমণ্ডলী এই মুহূর্তে প্রচণ্ড উত্তেজনায় টান টান হয়ে যাচ্ছে। বলে, 'কাল বিকেলে সাড়ে পাঁচটার সময় মেট্রোর নিচে আমি ওয়েট করব। তুমি কি আসবে? মানে বুঝতেই পারছ, বীরপুরে দেখা করাটা –'

ঘাড় ঈষৎ কাত করে প্রীতি, তার চোখে আগুনের ফুলকির মতো কিছু একটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। অত্যন্ত শান্ত গলায় সে বলে, 'আমার সময়ের কত দাম আপনার ধারণা আছে?'

কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল সুদীপ কিন্তু ট্রেনের স্পিড আচমকা কমে যাওয়ায় চমকে জানালার বাইরে তাকায়। আর তখনই খানিকটা দূরে বীরপুর স্টেশনের লাল বাড়িটা তার চোখে পড়ে। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর ট্রেন ওখানে পৌঁছে যাবে। শশব্যস্তে ধড়মড় করে উঠে দরজার দিকে পা বাড়ায় সুদীপ।

প্রীতি তাকিয়েই ছিল। সুদীপের মনোভাব বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। চাপা, কর্কশ গলায় ডাকে, 'শুনুন।'

থমকে দাঁড়িয়ে যায় সুদীপ।

প্রীতি বলে, 'আমি খুব খারাপ কিন্তু আপনি আমার চেয়েও অনেক খারাপ।' বলে আঙুল বাড়িয়ে দরজা দেখিয়ে দেয়, 'যান।'

উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সুদীপ। ট্রেন স্টেশনে থামতে না থামতেই লাফিয়ে নেমে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে। পেছন ফিরে তাকাতে তার আর সাহস হয় না।

অসাধারণ

দোতলার বিশাল ব্যালকনিতে একটা চওড়া বেতের সোফায় বসে আছেন আশালতা। তাঁর কোলের ওপর একটা খোলা বই—'উইমেন ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'।

আশালতার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এখনও তাঁর শরীর এতটুকু ভাঙেনি। এই বয়সে এমন চমৎকার অটুট স্বাস্থ্য ক্বচিৎ চোখে পড়ে। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। টান টান মসৃণ ত্বকে কোথাও একটুকু ভাঁজ নেই। নাকমুখ কাটা কাটা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

এই পঞ্চাশেও আশালতার গালে গলায় বা থুতনির তলায়, কোথাও অনাবশ্যক চর্বি জমেনি। সিঁথির দু' পাশে ঘন কালো চুলের ফাঁকে দু চারটে রুপোর তার ছাড়া বয়সের আর কোনো চিহ্নই তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর সুশ্রী চেহারাটি ঘিরে রয়েছে অটুট এক ব্যক্তিত্ব।

আশালতা সাউথ ক্যালকাটার একটা কলেজে ইতিহাস পড়ান। সাতাশ বছর আগে তাঁর বয়স যখন পঁচিশ, স্বামী মারা যান। দুই বছরের ছেলে রাজাকে নিয়ে তিনি বিধবা হন। বাবা নেই, তবে দাদারা ছিলেন। শ্বশুর নেই, দেওর এবং ভাসুরেরা ছিলেন। তাঁরা ভালোমানুষ, সহৃদয়। সবাই আশালতাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কারো মুখাপেক্ষী হননি আশালতা। নিজের পায়েই তিনি দাঁড়াতে চেয়েছেন। কাউকে ক্ষুণ্ণ না করে হাসিমুখে বলেছেন, 'আপনারা তো আছেনই। আমি একটু চেষ্টা করে দেখি না—'

প্রথম দিকে স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন আশালতা। কয়েক বছর পর কলেজের কাজটা পান। পড়ানো এবং রাজাকে মানুষ করে তোলা, এই নিয়েই দিন কেটে গেছে। অবশ্য সেই সঙ্গে মেয়েদের নানা অর্গানাইজেশনের তিনি সক্রিয় মেম্বার। যেমন, 'নারী জাগরণ সমিতি', 'উইমেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি', ইত্যাদি।

যে-রাজা দু-বছর বয়সে তার বাবাকে হারায় সে এখন ছাব্বিশ বছরের টগবগে যুবক, একটা শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের জুনিয়র অফিসার। এক বছর আগে আশালতা তার বিয়ে দিয়েছেন। ছেলের বউ রঞ্জা এবার ইংরেজি নিয়ে এম. এ পাস করেছে।

যে-বাড়িটার দোতলার ব্যালকনিতে এই মুহূর্তে আশালতা বসে আছেন সেটাতে সবসুদ্ধু আটটা ফ্ল্যাট। তাঁদের কলেজের আটজন অধ্যাপক অধ্যাপিকা কো-অপারেটিভ করে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লোন নিয়ে বাড়িটা তৈরি করেছেন। তিনি পেয়েছেন দোতলার এই ফ্ল্যাটটা।

জীবনে কোনও ব্যাপারেই ক্ষোভ নেই আশালতার। ভারতবর্ষের মতো দেশে একটি মেয়ের পক্ষে কারো সাহায্য না নিয়ে তিনি যা করেছেন তা প্রায় অভাবনীয়। গর্ব নয়, নিজের দিকে তাকালে এক ধরনের তৃপ্তিই বোধ করেন।

জানুয়ারি মাস শেষ হয়ে এল। আজ কী একটা কারণে স্টুডেন্টস স্ট্রাইক। তাই আচমকা ছুটি পেয়ে গেছেন আশালতা।

এখন দুপুর। কলকাতার ওপর দিয়ে শীতের উলটোপালটা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। নরম নিস্তেজ মায়াবী রোদের ঢল নেমেছে চারিদিকে।

দুপুরে ঘুমনোর অভ্যাস কোনও কালেই নেই আশালতার। খাওয়াদাওয়ার পর একটা বই নিয়ে ব্যালকনিতে এসে বসেছেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর লক্ষ নেই। একটি দু'টি পাতার বেশি পড়াও হয়নি।

আশালতাদের বাড়ির সামনের দিক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। তারপর বেশ বড় একটা পার্ক। কিছু গাছপালাও রয়েছে। খুব বেশি গাড়ি টাড়ি এদিকের রাস্তায় আসে না। নির্জন, ঘুমন্ত দুপুরে সারা গায়ে শীতের আরামদায়ক রোদ মেখে পার্কের দিকে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগছে আশালতার।

এখন ফ্ল্যাটে তিনি এবং রঞ্জা ছাড়া অন্য কেউ নেই। রাজা সেই ন'টায় অফিসে বেরিয়ে গেছে। রঞ্জা তার ঘরে হয় শুয়ে আছে, নইলে রেডিও চালিয়ে গান টান শুনছে।

হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে চমকে ওঠেন আশালতা। এই দুপুরবেলা কে আসতে পারে? রাজাই কি ফিরে এল? কিন্তু না, সকালে বেরুবার সময় সে বলে গেছে, আজ ফিরতে দেরি হবে। বড়দা আর মেজদা কাছাকাছিই থাকেন। বউদিরা ছুটির দিনে প্রায়ই দুপুরের দিকে আসেন। কিন্তু ওঁরা কি জানেন, আজ তাঁর কলেজ স্ট্রাইক? অনেক সময় ফেরিওলারা ঢুকে পড়ে কিংবা মার্কেট সার্ভে করার জন্য নানা কোম্পানির লোকেরা।

আশালতা উঠতে যাবেন, ওধারের দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। রঞ্জা তা হলে ঘুমোয় নি। বোঝা যাচ্ছে, সে-ই দরজাটা খুলে দিয়েছে।

রঞ্জা খুবই বুদ্ধিমতী। হকার টকারদের কী করে ঠেকাতে হয়, সে জানে। আশালতা আর উঠলেন না। ফের পার্কের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। ওখানে প্রচুর পাখি উড়ছে। এই কলকাতা শহরে আর কোনো এলাকায় একসঙ্গে এত পাখি দেখা যায় না।

অন্যমনস্কর মতো পাখি, শীতের রোদ বা পার্কের গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকলেও আশালতার কান ছিল বাইরের দরজাটার দিকে। ওটা খোলার শব্দ কানে এসেছিল। কিন্তু বন্ধ করা হয়েছে কিনা, বুঝতে পারছেন না।

বউদিরা এলে এতক্ষণে হইচই করতে করতে এই ব্যালকনিতে চলে আসতেন। আশালতার দুই বউদিই দারুণ আমুদে আর প্রচুর কথা বলতে পারেন।

ওদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। রঞ্জা কি দরজা বন্ধ না করেই আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছে?

আধ ঘন্টা পর কোলের বইটা সামনের নিচু ছোট টেবিলে রেখে আস্তে আস্তে উঠে পড়েন আশালতা। ব্যালকনির বাঁ দিক থেকে একটা সরু প্যাসেজ সোজা বাইরের দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাসেজ পেরিয়ে সেখানে আসতেই চোখে পড়ে দরজাটা বন্ধ করা হয়নি, পাল্লা দু'টো শুধু ভেজানো রয়েছে।

রঞ্জা খুবই সাবধানী মেয়ে। আশালতা তাঁর কলেজে আর রাজা ব্যাঙ্কে বেরিয়ে গেলে সে একাই ফ্ল্যাটে থাকে। দরজার পাল্লায় একটা ছোট গোল কাচ বসানো রয়েছে। কেউ এলে প্রথমে সেই কাচের ভেতর দিয়ে দেখে নেয়। চেনাজানা না হলে কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেয় না। তা ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও সে দরজা খোলা রাখে না। সেই রঞ্জা এরকম একটা ভুল করল কী করে? আশালতা ভাবলেন, হয়তো চোখে ঘুম থাকায় দরজা বন্ধ করার কথা তার খেয়াল ছিল না।

ছিটকিনি আটকাতে যাবেন, সেই সময় একটা অচেনা চাপা গলা শুনতে পেলেন আশালতা। চমকে ওঠেন তিনি।

বাইরের দরজার বাঁ পাশে ড্রয়িং রুম। কণ্ঠস্বরটা আসছে সেখান থেকে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন আশালতা। তারপর নিঃশব্দে ড্রইং রুমের কাছাকাছি চলে আসেন। এই ঘরের দরজার একটা পাল্লা বন্ধ, অন্য পাল্লাটার আধাআধি খোলা।

আড়ালে দাঁড়িয়ে অন্যের কথা শোনা বা আড়িপাতা একেবারেই পছন্দ করেন না আশালতা। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দেওয়াটা তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার। কিন্তু তীব্র কৌতূহল এবং বিস্ময় আশালতাকে ড্রইং রুমের বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দেয়।

আধ-খোলা পাল্লার ফাঁক দিয়ে ভেতরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ছে। ওখানে মুখোমুখি দু'টো সোফায় বসে আছে রঞ্জা এবং অচেনা একটি যুবক। ওরা এমনভাবে বসেছে, যাতে মুখের সামান্য একটা অংশই চোখে পড়ছে।

আশালতা যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখান থেকে রঞ্জাদের দেখা যায় কিন্তু রঞ্জারা তাঁকে দেখতে পাবে না।

যুবকটি বলছিল, 'কিছু একটা কমপেনসেশন আমার চাই। তোমাকে তো পেলামই না, শাঁসাল মক্কেল পেয়েই তার সঙ্গে ঝুলে পড়লে। ব্যাঙ্ক অফিসার ছেড়ে কে আর বেকারের গলায় মালা চড়াবে! ভালোই করেছ। লাইফে প্র্যাকটিক্যাল হওয়া খুব ইমপর্টান্ট ব্যাপার। কিন্তু আমার কথাটাও তো সিমপ্যাথেটিকালি তোমার ভাবা উচিত।'

রঞ্জার মুখের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, মারাত্মক ভয় পেয়ে গেছে সে। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলে, 'কী চাও তুমি?' তার গলা ভীষণ কাঁপছে।

যুবকটি বলে, 'বেকারেরা কী আর চাইতে পারে? ক্যাশের খুব অভাব। আপাতত শ'পাঁচেক টাকা দাও।'

'আমি—আমি টাকা কোথায় পাব?'

'তোমার শাশুড়ি প্রফেসার, হাজব্যান্ড ব্যাঙ্কের বিগ বস্। তোমার টাকার অভাব? কুইক-কুইক। ঢোকার সময় ওধারের ব্যালকনিতে একজন মহিলাকে বসে থাকতে দেখলাম। মনে হচ্ছে তোমার শাশুড়ি। হুট করে উনি এধারে চলে এলে ঝামেলা হয়ে যাবে। আমি ঠিক কেটে পড়ব, তুমি কিন্তু দারুণ প্যাঁচে পড়ে যাবে।'

'বিশ্বাস কর সমীর, আমার কাছে কিছুই থাকে না। টাকাপয়সা সব মায়ের আলমারিতে।'

'বিশ্বাস করি না। যা বললাম, চটপট নিয়ে এস। আরেকটা কথা, দু'মাস পর পর আমি আসব। পাঁচশো করে রেডি রাখবে।'

দু' হাতে মুখ ঢেকে এবার কেঁদে ফেলে রঞ্জা। জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে গোঙানির মতো শব্দ করে বলতে থাকে, 'আমার এত বড় ক্ষতি করে দিও না সমীর। প্লিজ, তুমি চলে যাও। তোমার পায়ে পড়ি—'

সমীর বলে, 'খালি হাতে ফিরে যাবার জন্যে আসি নি রঞ্জা। আর দেরি কোরো না।'

বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় আশালতার কাছে। বিয়ের আগে সমীরের সঙ্গে নিশ্চয়ই রঞ্জার কিছু একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তারই সুতো ধরে ছোকরা এখানে হাজির হয়েছে। আশালতার মুখ নিজের অজান্তেই ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে থাকে।

ভাঙা ভাঙা, ঝাপসা গলায় রঞ্জা বলে, 'কবে কী একটু হয়েছিল, তার জন্যে আমার সর্বনাশ করতে চাও?'

সমীর বলে, 'আজেবাজে কথার দরকার নেই, ক্যাশটা চটপট নিয়ে এস।'

'বললাম তো, আমার কাছে টাকা পয়সা থাকে না।'

'বেশ। যে তিনটে চিঠি আমাকে লিখেছিলে সেগুলো সঙ্গে করেই এনেছি। ওগুলো নিয়ে তোমার শাশুড়ির কাছেই তা হলে যাওয়া যাক।'

আঁতকে ওঠে রঞ্জা। দুই হাত এবং মাথা প্রবল বেগে নাড়তে নাড়তে বলে, 'না না, প্লিজ—'

আশালতা এই পর্যন্ত শোনার পর যেভাবে এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দে বাইরের দরজা খুলে নিচে নেমে যান। বাড়ির গেটের কাছে বসে একটা জবরদস্ত চেহারার বন্দুকওলা হিন্দুস্থানী দারোয়ান সারাক্ষণ পাহারা দেয়। নাম মঙ্গল সিং।

আশালতাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায় মঙ্গল। বলে, 'মা'জি কিছু দরকার আছে?' বহুকাল কলকাতায় থাকায় চমৎকার বাংলা বলতে পারে সে।

আশালতা বলেন, 'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে এস।'

মঙ্গল সিংকে সঙ্গে করে দোতলায় এসে নিজেদের ফ্ল্যাটের বাইরে তাকে অপেক্ষা করতে বলেন আশালতা। তারপর আবার ড্রইং রুমের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। এবার তাঁর চোখে পড়ে রঞ্জা তার হাতের আংটিটা খুলতে খুলতে বলছে, 'এটা ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছু দেওয়া সম্ভব নয়।'

সমীর বলে, 'কী আর করা যাবে, ওটাই দাও—'

রঞ্জা আংটিটা দিতে যাবে, আশালতা অবিচলিত ভঙ্গিতে দরজাটা পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েন। বলেন, 'বউমা, আংটিটা পরে ফেল।'

চমকে পেছন ফেরে রঞ্জা। মুহূর্তে তার মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে যায়। পরক্ষণেই দু' হাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

এদিকে আশালতাকে দেখে সমীর রীতিমতো নার্ভাস হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার ধারণা ছিল, চুপচাপ কাজ সেরে সে সরে পড়তে পারবে।

আশালতা রঞ্জার দিকে ফিরেও তাকান না। সোজাসুজি সমীরের চোখের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলেন, 'এস আমার সঙ্গে।'

কাঁপা গলায় সমীর বলে, 'কোথায়?'

'আমি যেখানে নিয়ে যাব। এস—'

'কী চান আপনি?'

'এস—'

আশালতার মধ্যে এমন এক অনমনীয় ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস থাকে না সমীরের। ঘাড় নিচু করে তাঁর সঙ্গে বাইরের প্যাসেজে তাকে যেতে হয়। ব্যালকনির দিকে যেতে যেতে আশালতা ডাকেন, 'মঙ্গল সিং ভেতরে এস।'

'আসছি মা'জি—' মঙ্গল সিং দরজা ঠেলে প্যাসেজে ঢোকে।

চোখের ইঙ্গিতে মঙ্গল সিংকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন আশালতা।

একটু পর তিনজন ব্যালকনিতে চলে আসে। আশালতা মঙ্গল সিংকে একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে সমীরের দিকে ফেরেন। একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বলেন, 'বোসো।'

যন্ত্রচালিতের মতো সমীর বসে পড়লে তার মুখোমুখি আশালতাও বসেন। বলেন, 'তোমার নাম তো সমীর। সমীর কী?'

এতক্ষণে প্রাথমিক ভয়টা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে সমীর। রূঢ় ভঙ্গিতে সে বলে, 'যদি না বলি?'

'বল—'

এ সেই আদেশ যার সামনে মাথা নোয়াতেই হয়। সমীর বলে, 'সান্যাল।'

'বাবার নাম?'

'মনোতোষ সান্যাল।'

'ঠিকানা—'

এবার মরিয়া হয়ে ওঠে সমীর। বলে, 'আমার ঠিকানা দিয়ে কী করবেন?'

কঠোর গলায় আশালতা বলেন, 'তাড়াতাড়ি বল।'

ব্যারাকপুরের একটা রাস্তার নাম এবং নম্বর বলে সমীর। তার কপালে দানা দানা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

রঞ্জাও ব্যারাকপুরেরই মেয়ে। আশালতার মনে হল, সমীরদের রাস্তাটা রঞ্জার বাপের বাড়ির কাছেই হবে। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'যে চিঠি তিনটে দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিলে সেগুলো আমাকে দাও।'

সমীরের চোখেমুখে উগ্রতা ফুটে বেরোয়। কর্কশ গলায় সে বলে, 'দেব না।'

'সত্যিই দেবে না?'

'বললাম তো।'

এবার মঙ্গল সিং-এর দিকে তাকিয়ে আশালতা বলেন, 'এই বদ ছোকরার ওপর নজর রেখ। আমি পুলিশকে ফোন করে আসি।'

আশালতা উঠতে যাবেন, দ্রুত পকেটে হাত পুরে সমীর তিনটে চিঠি বার করে টেবলের ওপর রাখতে রাখতে বলে, 'এই নিন।' প্রচণ্ড ভয়ে এবার সে কাঁপতে শুরু করেছে।

চিঠি তিনটে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে চোখ বুলিয়ে নিলেন আশালতা। কম বয়সের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না তাঁর। একসময় চিঠিগুলো টেবলের ওপর বই চাপা দিয়ে রাখতে রাখতে মঙ্গল সিংকে বলেন, 'এই বদ ছোকরাকে এবার ঘাড় ধরে বাড়ির বার করে দিয়ে এস। ফের যদি কখনও এখানে ঢোকার চেষ্টা করে পুলিশের হাতে তুলে দেবে।'

মঙ্গল সিং অবশ্য সমীরের ঘাড় ধরে না। বিশাল থাবায় একটা হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর চিঠি তিনটে হাতে নিয়ে ড্রইং রুমে চলে আসেন আশালতা।

মেঝেতে জুট কার্পেটের ওপর মুখ গুঁজে সমানে কেঁদে চলেছে রঞ্জা। গাঢ় গলায় আশালতা বলেন, 'অমন করে কাঁদে না বউমা। ওঠ—'

মুখটা সামান্য তুলে সজল চোখে একপলক আশালতাকে দেখে নেয় রঞ্জা। তারপর ব্যাকুলভাবে তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে। তার কান্নার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। জড়ানো, আবছা গলায় সে বলে, 'আমার কী হবে মা?'

রঞ্জাকে তুলে একটা সোফায় নিজের পাশে বসিয়ে আশালতা বলেন, 'কী আবার হবে? কবে কাকে কী লিখেছিলে, তার জন্যে বাকি জীবন নষ্ট হয়ে যায় নাকি? ওই বদমাশ ছেলেটার কাছ থেকে চিঠিগুলো আমি রেখে দিয়েছি। এইগুলো তো?'

মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়ে রঞ্জা।

'দারোয়ানকে বলে দিয়েছি, এ-বাড়িতে ফের ঢোকার চেষ্টা করলে ছোকরাকে যেন পুলিশের হাতে তুলে দেয়।'

রঞ্জা বলে, 'কিন্তু ও যদি জানতে পারে?'

চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে আশালতা বলেন, 'রাজার কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমিই রাজাকে সব বলব। কম বয়সে ভুল করেছিলে, সেটা যেমন সত্যি, আবার রাজাকে যে ভালোবাস সেটা তো কম সত্যি নয়। আশা করি, আমার ছেলে তা বুঝতে পারবে।' বলে রঞ্জাকে কাছে টেনে নেন আশালতা।

অভিভূত, কৃতজ্ঞ রঞ্জা এক অসাধারণ মহিলার কোমল বুকে মুখ রেখে নতুন করে কাঁদে। আশালতা গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

দেশ নেই

এবড়োখেবড়ো, উঁচু একটা টিলার মাথায় পাশাপাশি বসে আছে তিনজন—আসাদ, জহুরা আর জরিনা। সামনে আরবসাগর। সেখানে জেলেদের অগুনতি মোটর বোট ভেসে বেড়াচ্ছে। নানা রঙের পালতোলা নৌকোও প্রচুর। আর আছে ঝাঁকে ঝাঁকে সি-গাল। সাগরপাখিগুলোর নজর সারাক্ষণ জলের দিকে। মাছ চোখে পড়লেই ছোঁ মেরে ধারাল ঠোঁট দিয়ে গেঁথে তুলে আনছে। পলকে ঠুকরে ঠুকরে খেয়েই শিকারের খোঁজে আবার নতুন উদ্যমে সমুদ্রে হানা দিচ্ছে। টিলার নিচের দিকের পাথরে বিপুল আক্রোশে একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

অনেক দূরে আকাশ যেখানে আধখানা বৃত্তের আকারে দিগন্ত ছুঁয়েছে, সূর্যটা রক্তবর্ণ গোলক হয়ে সেখানে আটকে আছে। সন্ধে নামতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। এই মুম্বাই শহরে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দু'টোই হয় বেশ দেরিতে।

টিলার পেছন দিকে তেলের মতো মসৃণ রাস্তা। তার দু'ধারে লাইন দিয়ে নারকেল গাছ। তারপর মাঝারি হাইটের একটা পাহাড়। পাহাড়টার গায়ে বিশাল বিশাল কমপাউন্ডওলা বাংলোগুলো ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। আর রয়েছে অসংখ্য হাই-রাইজ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফাস্টফুডের স্টল। বাঁদিকে কোনাকুনি মাউন্ট মেরি চার্চ, যার চুড়োর ধবধবে ক্রস আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। সব মিলিয়ে আশ্চর্য এক খোয়াবনামা।

এই জায়গাটার নাম ব্যান্ড স্ট্যান্ড।

এবার আসাদদের দিকে তাকানো যেতে পারে। আসাদের বয়স পঁয়ত্রিশ। শিরা বার-করা হাত-পা, দুই হাতের চেটোয় ঝামার মতো কড়া। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আঙুলগুলো গাঁট-পাকানো এবং থ্যাবড়া। দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে যে পেটের দানা জোটাতে হয়, সর্বাঙ্গে তার ছাপ স্পষ্ট।

এই মুহূর্তে আসাদের গায়ে পরিপাটি সাজপোশাক। ইস্তিরি-করা চাপা পাজামা আর লম্বা ঝুলের ডোরাকাটা সবুজ ফুলশার্ট। মুখ পরিষ্কার কামানো, মাথায় টেড়ি-কাটা ফাঁপানো চুল।

জহুরার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। রূপসী না হলেও দেখতে মোটামুটি ভালো। বেশ স্বাস্থ্যবতী। কপালে, গালে এবং থুতনিতে বসন্তের অস্পষ্ট দাগ। সুর্মা-টানা বড় বড় চোখে

লাজুক চাউনি। পরনে রঙিন সালোয়ার-কামিজ। নাকে লাল পাথর বসানো নাকফুল, হাতে গোছা গোছা কাচের চুড়ি, গলায় চাঁদির হার।

জহুরার ছোট বোন জরিনা। তার বয়স আঠারো-উনিশ। দেখেই বোঝা যায়, ভীষণ চঞ্চল আর ছটফটে। বেশ সুশ্রী। বড় বোনের তুলনায় অনেক ফর্সাও। লম্বাটে ভরাট মুখ। ঘন চুল দুই বেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রেখেছে। তারও পরনে জংলা ছিটের সালোয়ার-কামিজ। মেয়েটার ভেতর একটা অদৃশ্য হাসির ফোয়ারা রয়েছে, সেটা সারাক্ষণ উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

জরিনা বসেছে জহুরা আর আসাদের মাঝখানে। অনবরত কলকল করে চলেছে সে। কথাও বলতে পারে মেয়েটা! সেই সঙ্গে সমানে হাসি।

জহুরারা থাকে মুম্বাই শহরের এক মাথায়—কটন গ্রিন এলাকায়, সিকি কিলোমিটার লম্বা ব্যারাকের মতো 'চৌল'-এর একটা কামরায়। আসাদ অনেক বছর থেকেছে এই শহরেরই মাহিম ক্রিকের ধারে একটা ঝোপড়পট্টিতে। দিনকয়েক হল বান্দ্রা ইস্টের ধারাভি বস্তিতে নগদ দশ হাজার টাকা পাগড়ি দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে সে। এশিয়ার সবচেয়ে বড় বস্তি হিসেবে ধারাভির দুনিয়াজোড়া নাম। নরকের চাইতেও জঘন্য ঝোপড়পট্টিতে তো আর নতুন বিবিকে এনে তোলা যায় না। আর কয়েকদিন বাদেই জহুরার সঙ্গে তার শাদি।

জহুরাদের দেশ ছিল বিহারের সাহারসায়। আসাদের বাড়ি ছিল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে, যার এখনকার নাম বাংলাদেশ। পিতৃভূমি তাদের যেখানেই থাক, মুম্বাই-ই তাদের আসল স্বদেশ। বহু বছর তারা এখানে আছে। এই শহরের গভীর স্তর পর্যন্ত তাদের শিকড় ছড়িয়ে গেছে। মুম্বাই ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

এই যে তিনজন এখন আরবসাগরের গায়ে ব্যান্ড স্ট্যান্ডের টিলাটির মাথায় বসে আছে, সেটা অকারণে নয়। দুনিয়ায় কেউ নেই আসাদের। মা-বাপ কবেই মরে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের কথায় তো ঘর-সংসার পাতা যায় না। তার জন্য কত কিছু দরকার। সে-সব কেনাকাটার জন্য জহুরার আব্বাজান নিয়ামত আলিকে রাজি করিয়ে দুই বোনকে নিয়ে এসেছে সে। ওরা, বিশেষ করে জহুরা নতুন সংসারের জন্য বাসনকোসন, স্টোভ, বেলুন-চাকি এবং অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র পছন্দ করে কিনে নেবে। তারপর ওদের কটন গ্রিনে পৌঁছে দিয়ে আসবে আসাদ।

কিন্তু সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে, সেটা হাতছাড়া করেনি সে। ভাবী বিবি এবং শালীকে নিয়ে সরাসরি বাজারে চলে যায়নি। সে ঠিক করেছে সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়েটেড়িয়ে কোনও উদিপি হোটেলে দু'জনকে খাইয়ে লিঙ্কিং রোডের মার্কেটে যাবে।

পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে কোনওদিন যুবতী মেয়েদের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়নি আসাদের। আসলে বেঁচে থাকার জন্য তাকে উদয়াস্ত এতই খাটতে হয়েছে যে, অন্য কোনও দিকে তাকাবার ফুরসত হয়নি। অথচ সারাদিন একটানা খাটুনির পর ঝোপড়পট্টির ময়লা তেলচিটে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কতবার ভেবেছে, তার শাদি হবে, একটি মনের মতো তরুণী এসে তার সুখের সংসার গড়ে তুলবে, আদরে সোহাগে সেবায় যত্নে তাকে বিভোর করে রাখবে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই তো বিয়ে হয় না। তার জন্য পয়সা চাই। কত বছর ধরে ইচ্ছাপূরণের জন্য একটি একটি করে টাকা জমিয়ে আসছে আসাদ। এখন তাঁর সঞ্চয় প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার। তার থেকে দশ হাজার পাগড়ি দিয়ে ঘর নিয়েছে। বাকি টাকাটা বিয়েতে খরচ করবে।

জহুরা মাত্র সাত হাত দূরে বসে আছে। এই কাম্য নারীটি কয়েকদিনের মধ্যে তার একান্ত নিজস্ব হয়ে যাবে। সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

জরিনা একটানা বকে চলেছে, 'আসাদভাই, বংগালিদের সঙ্গে আমাদের এই পয়লা রিস্তেদারি হচ্ছে, তা কি জানো?' মুম্বাইতে একটা ভাষা চালু আছে, সেটা হিন্দি উর্দু এবং মারাঠির মিশ্রণ। বেশির ভাগ মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলে। জরিনাও বলল।

আসাদ বলে, 'জানি। তোমার আব্বু আর আম্মীও সেদিন বলছিল।'

জরিনা বলে, 'আমার বহিন চাঁদকা টুকরা। এই কথাটা সব সময় মনে রাখবে।'

আসাদ তক্ষুনি ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয়, 'হাঁ হাঁ, জরুর।' জবাব দিতে দিতে আড়ে আড়ে জহুরার দিকে তাকায়। দেখে, একজোড়া লাজুক কালো চোখ তাকে লক্ষ করছে। চোখাচোখি হতেই জহুরার মুখে রক্তাভা ছড়িয়ে যায়। দ্রুত চোখ নামিয়ে নেয় সে।

জরিনা বলে, 'আমার বহিনকে মাথায় করে রেখো।'

আসাদ মজার গলায় বলে, 'জরুর। চাঁদকা টুকরার বহিন তো হীরেকা টুকরা। তাকেও মাথায় করে রাখব।'

কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগে জরিনার। তারপর চোখ কুঁচকে, মুখ ভেংচে বলে ওঠে, 'ই-হি-হি-হি, আমি তোমার মাথায় চড়তে যাব কেন? আমাকে অন্য আদমি চড়াবে।'

'সেই আদমিটাকে তোমার আব্বু কি খুঁজে পেয়েছে?'

'এখনও পায়নি, লেকিন পাবে তো। তামাম জিন্দেগি আমি বাপের ঘরে পড়ে থাকব নাকি?'

আসাদ ঠোঁট টিপে, হেসে হেসে বলে, 'যিতনা রোজ কেউ না জুটছে, আমার মাথাতেই থাকো না।'

জরিনা বলে, 'শখ কত ' দুই জেনানাকে চড়াবার মতো তাগদ তোমার আছে?'

'চড়েই দেখ, আছে কিনা।'

'মাজাক ছাড়। একটা কথা ধ্যান দিয়ে শোন—'

'বল।'

জরিনা বলে, 'আমার বহিনকে ইজ্জৎ দিও। সে তোমার ঘর রোশনি করে রাখবে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ—রাখবে।

'আউর এক বাত—'

'কী?'

জরিনার গলা এবার ভারী হয়ে আসে, 'বহিন অনেক দুখ পেয়েছে। তাকে আর কষ্ট দিও না।'

নিজের অজান্তেই আসাদের দুই চোখ জহুরার দিকে চলে যায়। খানিক আগেও তাকে দারুণ হাসিখুশি আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ভেতর থেকে অপার আনন্দের ঝলক উঠে এসে তার চোখেমুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন খুব ম্লান দেখাচ্ছে। কেউ যেন মুহূর্তে তার সমস্তটুকু খুশি, জীবনের সব রোশনাই শুষে নিয়েছে।

জরিনা যে ইঙ্গিত দিয়েছে, তা বুঝতে না পারার কারণ নেই। নিয়ামত আলি কোনওরকম লুকোছাপা করেনি। স্পষ্ট করে আসাদকে জানিয়ে দিয়েছে, আগে একবার শাদি হয়েছিল জহুরার। কিন্তু সে বিয়েটা আদৌ সুখের হয়নি। তার আগের স্বামী জাভেদ খান মুম্বাই পোর্টে কাজ করত। মাইনে বেশ ভালোই। কিন্তু লোকটা মার্কামারা বদমাশ। মাতাল, দুশ্চরিত্র,

বদমেজাজি। পেটে ঠাররা (এক ধরনের উগ্র দিশি মদ) পড়লে জাভেদের ওপর খোদ শয়তান ভর করত। মেয়েমানুষ নিয়ে তার কত যে কুকীর্তি তার ঠিক নেই। জহুরা এ-নিয়ে কিছু বললে মারতে মারতে তাকে বেহুঁশ করে ফেলত।

এরকম একটা জঘন্য খুনে ধরনের লোকের সঙ্গে সারাজীবন কাটানো অসম্ভব। স্বাভাবিক নিয়মেই শাদিটা কাটান-ছাড়ান হয়ে গিয়েছিল। তালাকের পর নিয়ামত বড় মেয়েকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। শুধু তাই না, তার নিকার জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তার এবং তার বিবির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। দু'টো মাত্র মেয়ে, ছেলে নেই। তাদের ভালমন্দ কিছু হয়ে গেলে মেয়েদের কী হবে? এই সমাজে অরক্ষিত যুবতীদের হাজারটা বিপদ। নিয়ামত ঠিক করে ফেলেছিল, যেভাবেই হোক, আগে জহুরার গতি করবে, তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জরিনার শাদি দেবে। ওপরওলার মেহেরবানিতে শেষ পর্যন্ত আসাদের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে। নিয়ামত আসাদের দুই হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে বলেছে, জহুরা বড় শান্ত, বড় নম্র, তার চাহিদা কম, স্বভাবটা মধুর। আসাদ যেন তাকে দেখে।

ঠিক একই কথা বলল জরিনা। আসাদ গাঢ় গলায় বলে, 'চিন্তা কোরো না জরিনা। আমার দিক থেকে তোমার বহিন কোনওদিন কষ্ট পাবে না।'

জরিনার ওপাশে একজোড়া কৃতজ্ঞ চোখে আলো ফুটে ওঠে।

সূর্য যখন আরবসাগরে আধাআধি নেমে গেছে সেই সময় জরিনা বলে, 'এবার উঠতে হবে আসাদভাই। ফিরতে দেরি হলে আব্বু খুব ভাববে।'

আসাদ বলল, 'হাঁ হাঁ, চল—'

টিলা থেকে নেমে নিচের রাস্তায় চলে এল তারা। তারপর একটা উদিপি রেস্তোরাঁয় রাওয়া দোসা, উপমা, আর কফি খেয়ে অটো ধরে সোজা লিঙ্কিং রোডে। অনেকটা এলাকা জুড়ে এখানে বিশাল মার্কেট। ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে নতুন সংসারের জন্য নানা জিনিসপত্র কিনে ট্যাক্সির মাথায় চাপিয়ে এবার কটন গ্রিন। দুই বোনকে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই ধারাভি ফিরে আসবে সে।

লিঙ্কিং রোড থেকে বান্দ্রা পেরিয়ে মাহিমের দিকে যেতে যেতে আসাদ জরিনাকে বলল, 'বহিনের জন্যে কেমন ঘর ভাড়া নিয়েছি, এক নজর দেখে যাও না—' জরিনা উপলক্ষ মাত্র, আসলে তার একান্ত ইচ্ছা, কোথায় সংসার পাতবে জহুরা, আগেই তা নিজের চোখে দেখে যাক।

কেনাকাটা সারতে সারতে রাত হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ভেপার ল্যাম্পগুলো তো বটেই, দু'ধারের আকাশছোঁয়া হাই-রাইজগুলোতে এবং সারি সারি শপিং আর্কেডে নিওন আলো জ্বলে উঠেছে। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, নানা রঙের চোখধাঁধানো রোশনাই।

জরিনা ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'না না আসাদভাই, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। পন্দ্র রোজ পরেই তো শাদি। তারপর কত আসা যাবে।'

আসাদ আর কিছু বলল না। কটন গ্রিনে জহুরাদের নামিয়ে দিয়ে ধারাভিতে যখন পৌঁছুল, দশটা বেজে গেছে।

বস্তিটা প্রায় দু-আড়াই কিলোমিটার জুড়ে। টিন, টালি আর অ্যাসবেস্টসের ছাউনি মাথায় নিয়ে চাপ-বাঁধা ঘরের পর ঘর। সুড়ঙ্গের মতো অসংখ্য গলি সাপের মতো হাজারটা পাক খেয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে।

বস্তিটায় ঢোকার কত যে মুখ তার গোনাগুনতি নেই। আসাদের ঘরে যেতে হলে দক্ষিণ দিকের একটা গলি দিয়ে ঢুকতে হয়। গলিটা এত সরু যে ট্যাক্সি যাওয়ার জায়গা নেই। অগত্যা বস্তির বাইরের চওড়া রাস্তায় গাড়িটা থামাতে হয়।

হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান পিক্র, হেন জাত নেই যা ধারাভিতে পাওয়া যাবে না। বাঙালি বিহারি শিখ গোয়াঞ্চি তামিল অন্ধ্রি থেকে শুরু করে ওড়িয়া সিন্ধি গুজরাটি—সারা ভারতবর্ষ এখানে দলা পাকিয়ে আছে। বলা যায়, জায়গাটা ছোটখাটো একটা ইন্ডিয়া।

নিরীহ, সাতেপাঁচে থাকে না, খেটে-খাওয়া অজস্র মানুষ যেমন এখানে আছে, তেমনি রয়েছে খুনি, বুটলেগার, চোরাই চালানদারদের বিশাল এক বাহিনী। 'সুপারি' অর্থাৎ টাকা নিয়ে খুন করাটা এদের অনেকের কাছে জলভাত। খবরের কাগজে যাদের 'কনট্রাক্ট কিলার' বলে, এরা হল তাই। ছুরি-ছোরা, বে-আইনি দিশি বন্দুক থেকে এ কে ফর্টিসেভেন রাইফেল পর্যন্ত এখানে মজুত রয়েছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে ধারাভি হল হাজার রকম ক্রাইমের মেটার্নিটি হোম। তবে একটা অঘোষিত নিয়ম চালু আছে, ধারাভির ক্রিমিনালরা এখানকার সাধারণ ভালো মানুষজনের গায়ে একটা আঙুল পর্যন্ত ঠেকায় না। এই আচরণবিধি মেনে চলা হয় বলে জঘন্য অপরাধীদের সঙ্গে নির্বিবাদী লোকজনের সহাবস্থানটা বহুকাল ধরে চলে আসছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছিল আসাদ। মালপত্র যখন নামাতে যাবে, সেই সময় রাস্তার ওধারের তেরপলের ছাউনিওলা চায়ের দোকান থেকে চলে আসে রজিবুল হক। লোকটা আধবুড়ো, গাল ভাঙা, মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখের কোলে কালির পোঁচ। পরনে আধময়লা, চাপা পাজামা আর লম্বা ঝুলের সস্তা ছিটের ফুলশার্ট, পায়ে পুরনো কোলাপুরি চটি।

রজিবুল আর আসাদ একই বিল্ডারের কাছে কাজ করে। রজিবুল ইউ পি'র আদি বাসিন্দা, আঠারো বছর বয়সে বোম্বাই'তে (এখনকার মুম্বাই) চলে এসেছিল। তারপর থেকে এই শহরই তার ঘরবাড়ি।

রজিবুলের কেউ নেই দুনিয়ায়। শাদি একটা সে করেছিল, দু'টো বাচ্চাও হয়েছিল, সব মরে ফৌত হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে আর একটা শাদি সে নিশ্চয়ই করতে পারত কিন্তু বিবি-বাচ্চাদের মৌতের পর ঘর-সংসার থেকে তার মন উঠে গেছে। রজিবুল ধারাভিতেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে বেশ কয়েক বছর। সে-ই এখানে আসাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

রজিবুল খানিকটা দূরে আসাদকে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তোর জন্যে সেই সামসে চায়কা দুকানে বসে আছি।' সে জানে আজ বিয়েব কেনাকাটা করতে গেছে আসাদ। ফিরতে তার রাত হবে।

রজিবুলের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে আসাদ, 'কী হয়েছে চাচা?' সে রজিবুলকে চাচা বলে। লোকটা তার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী।

'বহুত মুসিবৎ।'

'মতলব?'

'পুলিশ তোর তালাশে মাহিমের ঝোপড়পট্টিতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঠিকানা জোগাড় করে ধারাভি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

আসাদ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সৎ। চুরি জোচ্চুরি ফেরেববাজি, কোনওরকম নোংরা কাজে সে নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে রোজগার করে। পুলিশ তার খোঁজ করছে, এটা তার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক খবর। এমন কোনও গর্হিত অপরাধ সে করেনি যাতে ওরা তার

পেছনে লাগতে পারে। আসাদের শ্বাস আটকে আসে। কাঁপা গলায় সে বলে, 'কী কসুর আমার? কেন আমাকে তালাশ করছে?'

আসাদেব কানে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে রজিবুল বলে, 'তুই ইন্ডিয়ার লোক না, বাংলাদেশ থেকে এসেছিস। উসি লিয়ে—' দম বন্ধ হয়ে আসে আসাদের। ভয়ে ভয়ে সে বলে, 'লেকেন চাচা—'

'কী?'

'আমি তো সেই পাঁছ বছর বয়েসে এখানে এসেছি। এখন আমার পঁয়তিশ চলছে। তিরিশ সাল আমি মুম্বাইতে আছি। তোমরা তো সব জানো—'

রজিবুল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বিষণ্ণ মুখে বলে, 'আমি জানলে কী হবে? পুলিশ মনে করছে তুই ঘুসপেঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)।'

একটু চুপচাপ।

তারপর আসাদ জিগ্যেস করে, 'বাংলাদেশ থেকে আরো অনেকেই এসেছে। তাদেরও কি খুঁজছে?'

রজিবুল বলে, 'সেইরকমই শুনছি।'

'কী করতে চায় ওরা?'

'ও তো মালুম নেহি। তব্—'

'তব্ কী?'

রজিবুল জানায়, ওদের মতলব ভালো নয়, নিশ্চয়ই কোনওরকম দুরভিসন্ধি রয়েছে।

আসাদ বলল, 'এখন তুমি আমাকে কী করতে বল চাচা?'

রজিবুল বলে, 'পুলিশের নাক হল কুত্তার নাক। একবার যখন গন্ধ পেয়েছে, আবার তোর খোঁজে এখানে এসে হাজির হবে।'

ওদিকে ট্যাক্সিওলা অধৈর্য হয়ে উঠছিল। সে তাড়া লাগায়, 'মিয়াঁসাব, আপনার সামান নামিয়ে কেরায়া মিটিয়ে দিন। আমি আর দাঁড়াতে পারব না।'

আসাদ পুলিশের নাম শুনে এতটাই তটস্থ হয়ে উঠেছে যে তার মাথা কাজ করছিল না। জিগ্যেস করল, 'তুমি আমাকে কী করতে বল চাচা?'

একটু চিন্তা করে রজিবুল আসাদকে মালপত্র নামিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিতে বলে। তক্ষুনি তাই করে আসাদ। তারপর জানতে চায়, 'এবার?'

রজিবুল বলল, 'তুই এখন ক'রোজ অন্য কোথাও গিয়ে থাক। তারপর হালচাল ভালো বুঝলে খবর দেব। তখন চলে আসিস।'

'কোথায় থাকব?'

'ঘাটকোপারে তোদের দেশের কিছু লোকজন থাকে। তাদের কাছে চলে যা।'

বিয়ের জন্য যে জিনিসপত্র কিনেছে সেগুলো দেখিয়ে আসাদ জিগ্যেস করে, 'এগুলোর কী হবে?'

'আমার ঘরে এখন রেখে দিচ্ছি। পরে নিস।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপচাপ।

তারপর আসাদ বলে, 'চাচা, তুমি তো আমার সব কথা জানো। পন্দ্র রোজ বাদে—' বলতে বলতে চুপ করে যায়। তার গলার স্বর বিষাদ-ভরা, করুণ। চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছাপ।

আসাদ যা বলতে চেয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি রজিবুলের। সে বলে, 'পন্দ্র রোজ বাদ তোর শাদি তো?'

'হাঁ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ।

আসাদের বিয়ের ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সবই জানে রজিবুল। শাদির তারিখ পাকা করতে যে ক'জন কটন গ্রিনে তার সঙ্গে জহুরা-জরিনার আব্বাজান নিয়ামত আলির চৌলে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে রজিবুলও ছিল। নিয়ামত আলিকে সে খুব ভালো করেই চেনে।

রজিবুল বলল, 'দু'চার রোজ দ্যাখ। যদি মনে হয় পুলিশ হাঙ্গামা করতে পারে, নিয়ামত মিয়াঁর সঙ্গে দেখা করে সব জানিয়ে শাদির তারিখ কয়েক রোজ পিছিয়ে দিবি।'

স্বপ্নপূরণের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল আসাদ। সেটা যে এভাবে ধাক্কা খাবে, ভাবতে পারেনি সে। অপার নৈরাশ্য তাকে চারপাশ থেকে যেন ঘিরে ধরে। উত্তর না দিয়ে মুখ নামিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

রজিবুল কী ভেবে এবার বলে, 'ঠিক আছে, তোকে যেতে হবে না। আমিই এক সময় গিয়ে নিয়ামত মিয়াঁকে জানিয়ে আসব।'

ধীরে ধীরে মাথা হেলিয়ে দেয় আসাদ। ধাক্কাটা তার মনেই শুধু লাগেনি, সে জানে, বিয়ের তারিখ পিছোবার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও নিশ্চয়ই ভেঙে পড়বে। এই বিয়েটা ঘিরে জহুরাও তো কম স্বপ্ন দেখেনি।

বিমর্ষ মুখে আসাদ বলে, 'একা তুমি এত সামান নিয়ে যেতে পারবে না। চল, দু'জনে ধরাধরি করে তোমার ঘরে পৌঁছে দিই। তারপর আমি ঘাটকোপার চলে যাব।'

কী একটু ভেবে রজিবুল বলে, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। মালুম হচ্ছে, আজ আর পুলিশ এখানে আসবে না। রাতটা তোর কামরাতেই থেকে যা। কাল সুবে সুবে উঠে একসাথ কাজে চলে যাব। সেখান থেকে সোজা ঘাটকোপার চলে যাস।'

'ঠিক হ্যায়।'

মালপত্র কাঁধে এবং মাথায় চাপিয়ে দু'জনে ধারাভি বস্তির ভেতর ঢুকে যায়।

সারারাত আতঙ্কে ভালো ঘুম হয় না আসাদের। পুলিশ কেন তার খোঁজ করছে, আকাশপাতাল তোলপাড় করেও সে ভেবে পায় না। কত রকম চিন্তা যে চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কেউ কি ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে? পুলিশের কাছে এমন কিছু লাগিয়েছে যাতে সে বিপদে পড়ে যায়। কিন্তু তার এজাতীয় মারাত্মক শত্রুতা কে করতে পারে? সে তো কখনও কারো কোনও ক্ষতি করেনি।

কিছুদিন ধরে আবছাভাবে একটা গুজব হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নাকি হন্যে হয়ে কাদের খুঁজছে। ব্যাপারটা নিয়ে আসাদ আদৌ মাথা ঘামায়নি। কেনই বা ঘামাবে? পুলিশ যাদের তল্লাশ করে সে অন্তত সেই দলে পড়ে না, এমন একটা নিশ্চিত ধারণা ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক বলে মুম্বাইতে সকাল হয় অনেক দেরিতে। আসাদ যখন বিছানা ছেড়ে উঠল, তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি, চারিদিকে আবছা অন্ধকার।

ভোর হতে না-হতেই রাস্তার কলগুলোতে লম্বা লাইন পড়ে যায়। দু'টো বড় প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে আসাদ যখন একটা কলের কাছে পৌঁছুল, তখন সামনে কুড়ি-বাইশ জন দাঁড়িয়ে আছে।

বালতিতে জল ভরে মুখ ধুয়ে চান সারতে সারতে রোদ উঠে গেল। নিজের কামরায় এসে ভেজা জামাপ্যান্ট পালটে শুকনো পোশাক পরে একটা বড় কাপড়ের ব্যাগে বাড়তি ক'টা শার্ট আর ফুলপ্যান্ট ভরে নেয় আসাদ। কতদিন ঘাটকোপারে থাকতে হবে, কে জানে। কাল বিয়ের কেনাকাটা করার পর যে-টাকাটা বেঁচেছে তাও সঙ্গে নিল। তারপর ঘরে যখন তালা লাগাতে যাবে, রজিবুল এসে হাজির। এর মধ্যে তারও চানটান সারা হয়ে গেছে। তারা একই লেবার কন্ট্রাক্টরের কাছে কাজ করে।

অন্যদিন রোদ ওঠার আগে ঘুম ভাঙে না আসাদের। ধারাভিতে আসার পর, কিংবা তারও আগে যখন সে মাহিমের ঝোপড়পট্টিতে থাকত, রজিবুলকে গিয়ে ডেকে তুলতে হত। আজ আসাদকে চানটান সেরে ফিটফাট দেখে খুশিই হল সে। বলল, 'বহুত আচ্ছা। আজ আর তোকে ডাকতে হয়নি। বিলকুল রেডি—' মাঝে মাঝে দু'একটা ইংরেজিও বলে সে। এই মুম্বাই শহরে, যেখানে সারা ইন্ডিয়ার তো বটেই, অন্য বহু দেশের, বহু জাতের মানুষের বাস। ইংরেজি জবানটা এখানে ভালোই চালু রয়েছে।

আসাদ উত্তর দিল না। নিঃশব্দে ঘরে তালা লাগিয়ে চাবিটা রজিবুলকে দিতে দিতে বলল, 'পুলিশের ঝামেলা যতদিন না মিটছে, এটা তোমার কাছে রাখো।'

কী বলতে গিয়ে আসাদের মুখের ওপর নজরটা আটকে যায় রজিবুলের। চানটান করার পরও তার চোখের তলায় কালির ছোপ থেকে গেছে। চোখের সাদা অংশটা লালচে। সারা মুখে কেমন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ।

রজিবুল জিগ্যেস করল, 'কি রে, রাতে ঘুম হয়নি?'

আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ, 'না। চোখ বুজে এলেই ঘুমটা বার বার ভেঙে যাচ্ছিল।'

রজিবুল তার পিঠে একটা হাত রেখে নরম গলায় বলল, 'পুলিশ তোকে ঢুঁড়ছে শুনে ঘাবড়ে গেছিস, না?'

আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ।

রজিবুল বলে, 'অত ডরাবার কিছু নেই। সব কুছ ঠিক হো যায়েগা। এখন চল। আর দেরি করলে ট্রেনে অ্যায়সা ভিড় হবে যে উঠতে পারবি না। সাড়ে ন'টায় হাজিরা না দিলে তিওয়ারিজির বাচ্চার বহুৎ গুস্সা হবে।'

আসাদ উত্তর দেয় না।

তেওয়ারিজি হল লেবার কন্ট্রাক্টরের নজরদার। তার কাজ হল লেবাররা ঠিকমতো কাজ করছে, না ফাঁকি মারছে সে-সব তদারক করা। লোকটার একেবারে গিধের নজর। তার চোখে ধুলো দিয়ে যে কাজে একটু ঢিলে দেবে, বা একটু বসে আয়েশ করে বিড়ি টানবে তার জো নেই। লোকটার মুখ একেবারে পচা নর্দমা, বাছা বাছা খিস্তি দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়বে। অন্য বিল্ডারদের চেয়ে মজুরিটা ওরা বেশিই দিয়ে থাকে। পয়সা যেমন দেয়, খুনপসিনা ঝরিয়ে তেমনই তা উশুলও করে নেয়।

রজিবুল আর আসাদ পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে। ধারাভি বস্তির মুখ থেকে মিনিট তিনেক গেলে বড় রাস্তা। সেখান থেকে বাস ধরে প্রথমে বান্দ্রা স্টেশন। বান্দ্রা থেকে ট্রেনে আন্ধেরি।

বান্দ্রায় এসে ওরা যখন ট্রেন ধরল, প্রচণ্ড ভিড় শুরু হয়ে গেছে। এই এক শহর যা সর্বক্ষণ ব্যস্ত, রাতের তিনটে ঘণ্টা বাদ দিলে অনবরত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

টিকিট কেটে ঠেলেঠুলে লোকজনে-ঠাসা একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ে আসাদ আর রজিবুল।

আন্ধেরি স্টেশনে নেমে আসাদরা বাস ধরল। ওদের যেতে হবে আন্ধেরি ইস্টের মহাখালিতে। সেখানে 'রামানি অ্যাসোসিয়েটস' নামে সিন্ধিদের নাম-করা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বিশাল একটা হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি করছে। সব মিলিয়ে চব্বিশটা সতেরো তলা হাই-রাইজ। এর মধ্যে থাকবে পার্ক, সুইমিং পুল, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, প্রিপারেটরি স্কুল থেকে হাইস্কুল, কমিউনিটি হল এবং বিনোদনের নানা ব্যবস্থা। পঁচিশ জন লেবার কন্ট্রাক্টরের প্রায় দু' হাজার লেবারার ওখানে সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত কাজ করছে। সময় বাঁধা আছে, তিন বছরের ভেতর কমপ্লেক্স শেষ করে ফেলতে হবে।

কমপ্লেক্সের একেবারে শেষ দিকে যে বিল্ডিং দু'টো উঠছে, সেখানে কাজ করে আসাদরা। ন'টা পঁচিশে ওরা সাইটে পৌঁছে যায়। এর মধ্যে অসংখ্য লেবারার এসে গেছে। তাদের সুপারভাইজার বা নজরদার তিওয়ারিজি একটা প্রকাণ্ড চেয়ারে জাম হয়ে বসে আছে। তার সামনে চৌকো টেবিলের ওপর হাজিরার মোটা খাতা খোলা রয়েছে।

লোকটার ওজন প্রায় দেড়শো কেজি, বাদামি রং গায়ের, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। গলা বলতে বিশেষ কিছু নেই। প্রকাণ্ড মাথাটা ঠেসে ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'মহাভারত' সিরিয়ালে ভীমের হাতে যে গদা থাকে, তিওয়ারিজির হাত দু'টো সেইরকম। চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা, মাথার পেছন দিকে মোটা টিকির ডগায় লাল গোলাপ ফুল বাঁধা। থুতনির তলায় তিন থাক চর্বি। লালচে গোলাকার চোখের তারা দু'টো সর্বক্ষণ বাঁই বাঁই করে ঘুরছে। পরনে পাতলা ফিনফিনে মিলের ধুতি, যেটার কাছা পাকিয়ে পেছন দিকে গোঁজা। গায়ে জালি-কাটা গোলাপি গেঞ্জির ওপর সিল্কের হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। গলায় সোনার চেন, বাঁ হাতেব কবজিতে চওড়া স্টিল ব্যান্ডের জবরদস্ত ঘড়ি। পায়ে পুরু চামড়ার চপ্পল।

লোকটার আদি বাড়ি বেনারসে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অল্প বয়স থেকে মজুর খাটিয়ে খাটিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছে।

এই কমপ্লেক্সে তিওয়ারিজির তাঁবেতে আশি জন লেবাবার রয়েছে। প্রত্যেকের নামটাম সব তার মুখস্থ।

অন্য দিনের মতো লেবারাররা এসে আজও তিওয়ারিজির সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আসাদরা লাইনের একেবারে পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

তিওয়ারিজি কাউকে কিছু জিগ্যেস করে না। মুখ দেখে চটপট হাজিরা খাতায় লেবারারদের নামের পাশে টিক মারে। যার নামে টিক মারা হচ্ছে, সে সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে সরে যাচ্ছে।

হাজিরার মার্কা লাগাতে বেশি সময় লাগে না। তারপর ভারী, কর্কশ গলায় তিওয়ারিজি হেঁকে ওঠে, 'কাম চালু কর দে—'

কাজ শুরু হয়ে যায়।

এখন কমপ্লেক্সের সবগুলো বিল্ডিংয়েই ঢালাইয়ের কাজ চলছে। কোনওটা পাঁচতলা, কোনওটা বা ছ'তলা পর্যন্ত উঠেছে। আজ আসাদদের দু'টো বিল্ডিংয়ে সাত তলার ঢালাই হবে।

গত কয়েক দিন ধরে ছ'তলার ওপর অগুনতি শাল কাঠের খুঁটির ওপর পুরো সাততলা জুড়ে মজবুত পাটাতন পেতে তার ওপর লোহার রডের ফ্রেম তৈরি করা হয়েছিল। এই ফ্রেমে সিমেন্ট বালিটালির মিশ্রণ ঢালা হবে।

রজিবুলের ডিউটি হল মিক্সার চালানো। প্রকাণ্ড কড়াইয়ের মতো স্টিলের কন্টেনারে স্টোন চিপস, বালি, জল আর সিমেন্ট ঢেলে ইলেকট্রিসিটিতে সেটা চালানো হয়। স্টোন চিপস-টিপসের মণ্ড তৈরি হলে সেগুলো কড়াইতে করে বিল্ডিংয়ের গায়ের ভারা বেয়ে ওপরে লোহার ফ্রেমে ঢেলে আসা হয়। আসাদ আরো অনেকের সঙ্গে এই কাজটাই করে।

শুধু ওদের দুই বিল্ডিংয়েই নয়, চারপাশের অন্য বিল্ডিংগুলোতেও ঢালাইয়ের তোড়জোড় চলছে।

একসময় পঞ্চাশ-ষাটটা মিক্সার চালু হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে একটানা বিকট আওয়াজে কানের পর্দা চৌচির হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

রজ্জিবুল যে-মিক্সারটা চালাচ্ছে তার সামনে কড়াই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আসাদ, রফিক, ফকিরা, আমিনুল, মুজিব, ভানুপ্রসাদ, চতুরলাল, রবি, ভালুয়া এমনই অনেকে। স্টোন চিপসের মণ্ড তৈরি হলেই ওরা সেগুলো কড়াই বোঝাই করে ঢালতে নিয়ে যাবে।

আসাদের মতোই আটাশ কি তিরিশ বছর আগে রফিক, ফকিরা আর মুজিব তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের মা-বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল। তারপর নানা ঘাটের জল খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত বম্বেতে (তখনও বম্বে মুম্বাই হয়নি)।

রফিক, ফকিরা আর মুজিব থাকে মুলুন্দের কাছে রেল লাইনের ধারের ঝোপড়পট্টিতে।

রফিক এধারে ওধারে তাকিয়ে চাপা গলায় আসাদকে জিগ্যেস করে, 'একটা খবর শুনেছিস?'

আসাদ জানতে চায়, 'কী খবর?'

'পাকিস্তান থেকে যারা চলে এসেছিল তাদের নাকি পুলিশ তালাশ করছে।'

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে আসাদের। কাঁপা গলায় সে বলে, 'তোকে কে বলল?'

কয়েকজনের নাম করল রফিক। তারা অবশ্য বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরদের খাতায় নাম লেখায়নি। ওরা কেউ কাজ করে কাপড়ের কলে বা ছোটখাটো প্লাস্টিকের কারখানায়, কেউ রাস্তার চায়ের দোকানে বা হোটেলে, কেউ জুহু বিচে নারিয়েল পানি বেচে। থাকেও মুম্বাইয়ের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বেশির ভাগই ঝোপড়পট্টিতে। কেউ কেউ রাস্তার ফুটপাতে, সমুদ্রের ধারে কিংবা পার্কে। রফিক থাকে সিওন স্টেশনের কাছাকাছি একটা বস্তিতে।

আসাদ জিজ্ঞেস করে, 'পুলিশ ওদের কী বলেছে?'

স্টোন চিপসের মণ্ড তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অন্য লেবারার সেগুলো কড়াইতে ভরে বিল্ডিংগুলোর দিকে যেতে শুরু করেছে।

ওদিকে নিজস্ব চেয়ারটিতে বসে শকুনের মতো চারিদিকে লক্ষ রাখছিল তিওয়ারিজি। রফিক আর আসাদকে কথা বলতে দেখে খেপে ওঠে, 'এই কুত্তার বাচ্চারা, আভি ভি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গপ মারছিস! কাম চালু নেহি হুয়া—কিয়া?'

আসাদরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারা জানে কাজে কারো গাফিলতি দেখলে মাথায় খুন চড়ে যায় তিওয়ারিজির। শুধু চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে খিস্তিখেউড় আর গালাগালিই নয়, দিনের শেষে মজুরি দেওয়ার সময় কিছু পয়সাও কেটে নেয়। বলে, 'শালে লোগ তোদের ফাইন করে দিলাম।'

রফিক সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে আসাদকে বলে, 'দুপুরে টিফিন খাবার সময় কথা হবে। নইলে ওই গিদ্ধড় পেটে মারবে, পুরা পয়সা দেবে না।' শশব্যস্তে তারা মিক্সারের কাছে চলে যায়। তারপর একটানা কাজ।

সাড়ে ন'টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত পয়লা শিফট। তারপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট টিফিন। টিফিন শেষ হলে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। একনাগাড়ে ঢালাইয়ের মালমশলা বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

প্রথম শিফট শেষ হওয়ার পর ঘণ্টা বাজে।

আসাদরা হাতমুখ ধুয়ে নিজেদের কিছুটা সাফসুতরো করে নেয়। কাছাকাছি রাস্তার ধারে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় সারি সারি উদিপিদের সস্তা হোটেল। সেখানে ভাত চাপাটি পুরি ইডলি দোসা উপমা থেকে পাও-ভাজি পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। তাছাড়া গুজরাটি থালিও মেলে যাতে স্টেনলেস স্টিলের পরাতে ছোট-বড় নানা খোপে দেওয়া হয় খানিকটা ভাত, খান ছয়েক পুরি, ডাল, তিনচার রকমের সবজি, আচার এবং টক দই।

প্রতিটি হোটেলের সামনে বসে খাবার জন্য লম্বা লম্বা বেঞ্চ পাতা।

আসাদ, রফিক, ফকিরা এবং মুজিব একটা হোটেল থেকে গুজরাটি থালি কিনে মুখোমুখি বসে পড়ে।

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে আসাদ রফিককে সেই আগের কথাটা জিগ্যেস করে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের লোকেদের খুঁজে বার করে পুলিশ কী বলছে?

রফিক বলে, 'তা বলতে পারব না। তবে তালাশ করছে, এটুকুই জানি।'

অন্য যে দু'জন বসে আছে, ফকিরা আর মুজিব—তারাও বলে, নানা জায়গায় পুলিশি হানার কথাটা তারাও শুনেছে।

ফকিরা বলল, 'কাল রাতে একটা দরকারে আমি গোরেগাঁওতে গিয়েছিলাম। সেখানে হামিদের সঙ্গে দেখা। ও বলল, পুলিশ ওদের ঝোপড়পট্টিতে গিয়েছিল।' হামিদ পাকিস্তান থেকে এসেছিল বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়। ওদের বাড়ি ছিল সিলেটে।

উদ্বিগ্ন মুখে আসাদ জানতে চায়. 'কেন হামিদের কাছে গিয়েছিল শুনলে?'

'হাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে ফকিরা।

'কী?'

'ওদের রেশন কার্ড দেখতে চেয়েছিল।'

'তারপর?'

'রেশন কার্ড দেখে চলে গেল। কোনও ঝামেলা করেনি।'

রফিক, ফকিরা একই জায়গায় থাকে। রফিক তাকে বলল, 'হামিদের ওখানে পুলিশ গেছে, আমাকে বলিসনি তো?'

ফকিরা বলল, 'অনেক রাতে মুলুন্দ ফিরেছি। তখন তোরা ঘুমিয়ে পড়েছিস। সকালে উঠে গোসল সেরে তোর সঙ্গেই ট্রেন ধরলাম। তখনও যে বলব, খেয়াল ছিল না।'

রুদ্ধশ্বাসে ফকিরাদের কথা শুনছিল আসাদ। বলল, 'পুলিশ রেশন কার্ড দেখতে চাইল কেন?'

ফকিরা বলল, 'জানি না।'

সবাইকে ভীষণ উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। এতকাল বাদে পুলিশ কেন বেছে বেছে তিরিশ বছর আগের পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না।

আসাদ থালি থেকে ভাত কি পুরি তুলে খাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু কী খাচ্ছে, তার স্বাদ গন্ধ কিছুই টের পাচ্ছিল না। তার যে সঙ্গীরা কাছাকাছি বসে আছে তারা নানা জায়গায় পুলিশের হানার কথা শুনেছে কিন্তু ওদের কারো কাছে এখনও পুলিশ যায়নি, কিন্তু বিপদটা সরাসরি তার ঘাড়ের ওপরই এসে পড়েছে।

আসাদ একটু ভেবে বলল, 'আমি কিন্তু খুব মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই।'

ফকিরা আর মুজিব চমকে ওঠে। মুজিব জিগ্যেস করে, 'কিসের মুশকিল?'

কাল রাতে যা যা ঘটেছে, অর্থাৎ তার খোঁজে পুলিশের মাহিমের ঝোপড়পট্টি থেকে ধারাভিতে হানা দেওয়া পর্যন্ত সব বলে যায় আসাদ।

মুজিবরা হতচকিত। ফকিরা বলল, 'তোর না পনেরো দিন পর শাদি?'

আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ, 'হাঁ, নয়া সংসারের জন্যে অনেক কেনাকাটাও করে ফেলেছি। কিন্তু খুব ডর লাগছে।'

উদিপি হোটেলের সামনে হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে আসে।

খানিকক্ষণ বাদে আসাদকে ভরসা দেওয়ার জন্য ফকিরা বলে, 'কিসের ডর? ওই যে হামিদদের ওখানে পুলিশ গিয়েছিল, তাতে কি ওদের কিছু হয়েছে? তোরও কিছু হবে না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'রজিবুল চাচা আমাকে কয়েকদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে বলেছে। পুলিশের ঝঞ্ঝাটটা চুকে গেলে যেন ধারাভিতে ফিরে আসি।'

রজিবুলের মতো অভিজ্ঞ, বয়স্ক লোক যখন ধারাভিতে আপাতত থাকতে বারণ করছে তখন সেটা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।

মুজিব জিগ্যেস করল, 'কী করবি তা হলে?'

'ঘাটকোপারে আমাদের গাঁয়ের দু'চারজন লোক থাকে। তাদের কাছে চলে যাব।'

'আজই?'

'হাঁ। ডিউটি খতম হওয়ার পর। ওখান থেকে আন্ধেরিতে যাওয়া-আসা করতে হবে। দু'বার করে ট্রেন আর বাস পালটাতে হবে। ভাড়াও পড়বে অনেক। কিন্তু কী আর করা যাবে!' আসাদের মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে ওঠে।

মুজিবের হঠাৎ কী মনে পড়ে যায়। চিন্তাগ্রস্তের মতো সে বলে, 'পনেরো দিন পর তোর শাদি ঠিক হয়ে আছে। তার কী হবে?' ওর বিয়ের খবরটা মুজিবরা অনেকেই জানে। সে তাদের আগাম দাওয়াতও করে রেখেছে। ভোজের রীতিমতো এলাহি বন্দোবস্তও করা হয়েছে—বিরিয়ানি, মিরচি-চিকেন, রসগোল্লা আর ফিরনি। বিয়ের দিন সারারাত গানবাজনা হইহল্লা হবে। কিন্তু হাল যা দাঁড়িয়েছে, সব কিছু বরবাদ না হয়ে যায়!

আসাদ বলল, 'রজিবুল চাচা শাদির তারিখ পিছিয়ে দিতে বলেছে।'

মুজিব ভেবে বলল, 'সেই ভালো।' ফকিরাও মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেয়।

ওধারে কনস্ট্রাকশনের 'সাইট' থেকে পরের শিফটের ঘণ্টা বেজে ওঠে। কখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে, আসাদরা টের পায়নি। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে, হোটেলের দাম চুকিয়ে ওরা 'সাইট'-এর দিকে ছোটে।

রজিবুল বলেছিল, বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দেবার খবরটা সে নিজেই নিয়ামত আলিকে দিয়ে আসবে। কিন্তু সাড়ে ছ'টায় ডিউটি শেষ হওয়ার পর মজুরি বুঝে নিয়ে আসাদকে বলল, 'আজই নিয়ামত মিয়াঁর সঙ্গে দেখা করব। তুইও আমার সঙ্গে চল—'

নিয়ামত আলিরা, বিশেষ করে জুহরা কত আশা নিয়ে শাদির তারিখটার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ব্যান্ড স্ট্যান্ডে সমুদ্রের ধারে টিলার মাথায় জুহরা আর জরিনার পাশে বসে কালকের বিকেলটা স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছিল। তারা তিনজন ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে কত কেনাকাটা করল। একটা সুখের সংসার গড়ে তুলবে। আর আজ গিয়ে শাদির তারিখ পিছোবার কথা

বললে জহুরার প্রতিক্রিয়া কী হবে, কতটা ভেঙে পড়বে সে, ভাবতেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় আসাদের। দ্বিধার সুরে সে বলে. 'আমার না গেলে চলে না চাচা?'

রজিবুল বলে, 'না। আমি একা গিয়ে বললে ওরা হয়তো মেনে নেবে। লেকেন তোর মুখ থেকে শুনলে বহুত ভরসা পাবে। ভাববে আচানক শাদিটা পিছিয়ে দেওয়ার পেছনে তোর বুরা কোনো মতলব নেই। পুলিশের কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে বলবি।'

লোক দিয়ে খবর পাঠানোর চেয়ে নিজে গিয়ে বলা যে অনেক বেশি জরুরি, এই দিকটা আগে তলিয়ে দেখেনি আসাদ। বলল, 'ঠিক আছে চাচা—'

আন্ধেরি থেকে ট্রেন ধরে ওরা প্রথমে আসে বান্দ্রা। সেখান থেকে হারবার লাইনের গাড়িতে কটন গ্রিন। নিয়ামত আলিদের চৌল স্টেশন থেকে বাসে মিনিট পাঁচেকের পথ। হেঁটে গেলে কম করে পঁচিশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা। আন্ধেরি থেকে এতটা আসতে বাসে-ট্রেনে প্রচুর ভাড়া লেগেছে। পয়সা বাঁচাবার জন্য ওরা হাঁটতে থাকে।

ব্যারাকের মতো যে দোতলা চৌলটায় নিয়ামত আলিরা থাকে, সেটার মাথায় টালির ছাউনি। একতলা দোতলা মিলিয়ে চৌলটায় কম করে শ'দুই কামরা। প্রতিটি কামরায় একটা করে ফ্যামিলি। ধারাভি বস্তির মতো এই চৌলটাও মিনি ইন্ডিয়া। সারা ভারতবর্ষের এমন কোনো প্রভিন্সের আর জাতের লোক নেই যাদের এখানে পাওয়া যাবে না।

নিয়ামত আলিরা থাকে দোতলার কোণের দিকেব একটা কামরায়। সে কাজ করে কাছাকাছি একটা কটন মিলে।

নিয়ামত খানিক আগে মিল থেকে ডিউটি শেষ করে ফিরে এসেছে।

রজিবুল আর আসাদকে দেখে দারুণ সাড়া পড়ে গেল।

যথেষ্ট খাতিরদারি করে তাদের বসানো হল। নিয়ামত আলি আর জরিনা তাদের কাছাকাছি ঘন হয়ে বসে। নিয়ামতের বিবি রুকসানা ভাবী দামাদ এবং তার মাতব্বর অভিভাবক রজিবুলের জন্য নমকিন, লাড্ডু, গুলাবজামুন আর চা নিয়ে এসে ওদের সামনে সাজিয়ে দিয়ে খানিক দূরে গিয়ে বসল। জহুরা অবশ্য ধারেকাছে নেই। তবে কামরার পেছন দিকে যে দরজাটা রয়েছে তার ওপাশে ছোট্ট রান্নাঘর। দরজাব পাল্লার আড়ালে একজোড়া সলজ্জ কালো চোখ বার বার নজরে পড়ছিল আসাদের।

হঠাৎ আসাদরা না জানিয়ে এসে পড়ায় নিয়ামতরা যতটা খুশি, তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক। নিয়ামত আর রুকসানা বিবির হয়তো মনে হল, পনেরো দিন পরেই শাদি, কালও জহুরার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে আসাদ, তবু ভাবী জামাই বোধহয় তাদের মেয়েকে রোজ না দেখে থাকতে পারছে না। না, এই শাদিটা সুখেরই হবে জহুরার। আগের মতো ব্যর্থ হয়ে যাবে না।

নিয়ামত জিগ্যেস করে, 'আচানক কী মনে করে রজিবুল ভাই?'

রজিবুল বলে, 'একটা খবর আছে।'

'আগে চা-পানি খাও, তারপর শোনা যাবে।'

'না। আগেই শোন।'

নিয়ামত কিছুতেই শুনবে না। খাওয়ার জন্য সে প্রায় কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। কিন্তু রজিবুলদের খাওয়ার ইচ্ছা একেবারেই নেই। কিন্তু নিয়ামত এবং রুকসানা এমনই নাছোড়বান্দা যে একটু-আধটু মুখে তুলতেই হয়।

খাওয়া শেষ হলে নিয়ামত বলে, 'এবার খবরটা শোনা যাক।'

রজিবুল গলা খাঁকরে পরিষ্কার করে নেয়। তারপর বিমর্ষ মুখে বলে, 'শুনলে তোমাদের খারাপ লাগবে।'

'মতলব?' নিয়ামতরা সবাই চমকে ওঠে।

রজিবুল মুখ নিচু করে বলে, 'আসাদ আর জহুরার শাদির তারিখটা পিছিয়ে দিতে হবে।'

কামরার ভেতর যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, মুহূর্তে তা স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে হয়, ক'টা কাঠের পুতুল নিশ্চল বসে আছে।

অনেকক্ষণ পর ব্যাকুলভাবে নিয়ামত জিগ্যেস করে, 'পুরা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, মহল্লার লোকজন সবাই জেনে গেছে। এখন কী করে শাদি পিছাব? লোকজন পুছলে কী বলব? আমার ইজ্জৎকা সওয়াল রজিবুল ভাই—'

রজিবুল বলে, 'বুঝতে পারছি। লেকেন এ ছাড়া এখন আর উপায় নেই।'

রজিবুলের দুই হাত জড়িয়ে ধরে নিয়ামত জিগ্যেস করে, 'কেন উপায় নেই? কী হয়েছে?' তার গলায় আরো বেশি করে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

রজিবুল আসাদকে বলে, 'তুই বল—'

আসাদ পুলিশের ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়।

আর্তস্বরে নিয়ামত জিগ্যেস করে, 'পুলিশ তোমার পেছনে লেগেছে কেন? ক্যা কসুর তুমহারা?'

আসাদ জানায়, জীবনে কোনো অন্যায় সে করেনি, কারো ক্ষতি তো নয়ই।

'তাহলে তোমাকে পুলিশ ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে কেন?'

আসাদ চমকে ওঠে। পুলিশের ব্যাপারে নিয়ামতের মনে কি অন্য কোনোরকম সন্দেহ দেখা দিয়েছে? সে লক্ষ করে, জারনার মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। আর ওড়নার প্রান্ত মুখে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রুকসানা। আসাদের কলিজায় প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে যখন সে দেখতে পায় রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকে লাজুক একজোড়া কালো চোখ সরে গেছে।

দু' হাতে মুখ ঢেকে জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে আসাদ বলে, 'আমি জানি না, জানি না, জানি না। আমি জীবনে কোনো খারাপ কাজ কখনও করিনি।'

রজিবুল বলে, 'আমি আসাদকে কম বয়েস থেকে চিনি। ওর মতো ভালো ছেলে হয় না।'

মুহ্যমানের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকে নিয়ামত। তারপর বলে, 'চৌলের পড়োশি আর আমার রিস্তেদারদের এখন আমি কী বলব?'

এরকম একটা প্রশ্ন যে নিয়ামত করতে পারে সেটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল রজিবুল। বলল, 'বলবে, আচানক কিছু অসুবিধা হয়েছে, তাই তারিখ পিছোতে হচ্ছে। মানুষের জিন্দেগিতে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে আগে থেকে তার হদিস পাওয়া যায় না। সব কিছুর জন্য তৈরি থাকতে হয়।'

এ-জাতীয় দার্শনিক কথাবার্তায় খুব একটা যে সান্ত্বনা পেল নিয়ামত তা মনে হয় না। হতাশার সুরে জিগ্যেস করল, 'শাদিটার জন্যে কতদিন দেরি করতে হবে?'

'ফিকর মাত কর। বেশিদিন নয়, পাঁচ-সাত রোজের ভেতর তোমাকে জানিয়ে দেব।' বলে ভরসা দেওয়ার ভঙ্গিতে নিয়ামতের কাঁধে হাত রাখে রজিবুল।

রজিবুলের ছোঁয়ায় কতটা আশ্বস্ত হয়, নিয়ামতই জানে। সংশয় এবং হতাশার শেষ প্রান্ত থেকে যেন ঝাপসা গলায় বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

'আমরা তাহলে আজ চলি—'

নিয়ামত ওদের দু'জনকে খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে যায়। স্টেশনে এসে রজিবুল বান্দ্রার ট্রেন ধরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আসাদেরও ট্রেন আসে। সে যাবে ঘাটকোপার।

ঘাটকোপারে রেল লাইনের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে যে ঝোপড়পট্টি, সেখানে বিবি-বাচ্চা নিয়ে থাকে আইনুল, জব্বাব আর কলিমুদ্দিন। আসাদদের সঙ্গে ওরাও একদিন তাদের আব্বা-আম্মাদের সঙ্গে এই শহরে চলে এসেছিল। আসাদের মতো ওদের মা-বাপও অনেক আগেই মরে গেছে। বড় হয়ে বিয়েটিয়ে করে এখানেই আইনুলরা ঘর-সংসার পেতে বসেছে। ওদের কেউ রাস্তার ধারের ছোটখাটো হোটেলে বর্তন ধোয়ার কাজ করে, কেউ ফেরিওলা, কেউ দুপুরে খাবার সময় অফিসে অফিসে লাঞ্চের ডাব্বা পৌঁছে দেয়।

আসাদের কথা শুনে আইনুলদের রীতিমতো চিন্তিত দেখায়। কলিমুদ্দিন জানাল, পুলিশ যে নানা জায়গায় হানা দিচ্ছে, এরকম কানাঘুষো তারাও শুনেছে। তবে তাদের ঘাটকোপারে এখনও কেউ আসেনি।

কলিমুদ্দিনরা মানুষ ভালো। আসাদকে তারা ফিরিয়ে দিল না। তাদের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। ঠিক হল, যতদিন না পুলিশের হাঙ্গামাটা চুকে যাচ্ছে, এখান থেকেই আন্ধেরির বিল্ডিং সাইটে যাতায়াত করবে আসাদ। পুলিশ যদি ফের ধারাভিতে আসে, সে খবর রজিবুলের কাছেই পাওয়া যাবে।

দিন ছয়েক ঘাটকোপার থেকে ডিউটিতে গেল আসাদ। সাইটে পৌঁছেই রোজ তার প্রথম কাজ হল, রজিবুলকে আড়ালে ডেকে জিগ্যেস করা, 'চাচা, ওরা কি আর এসেছিল?'

রজিবুল আস্তে মাথা নাড়ে, 'না।'

ছ'দিন কেটে যাওয়ার পর উৎকণ্ঠা যখন অনেক কমে গেছে, শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে এসেছে, আসাদ বলে, 'তোমার কী মনে হয়, পুলিশ আর আসবে?'

রজিবুল কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দেয়, 'এ ক'দিন যখন আসেনি, তখন মালুম হচ্ছে আর আসতে না-ও পারে।'

'ঘাটকোপার থেকে এত দূরে রোজ আসতে কষ্ট হয়, তা ছাড়া গাড়ি ভাড়াতে অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। ধারাভিতে ফিরে আসব কি? তুমি কী বল?'

'এখনই আসিস না। আর ক'রোজ দ্যাখ—'

অর্থাৎ পুলিশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে চাইছে রজিবুল। ওদের বিশ্বাস নেই। এ ক'দিন আসেনি বলে যে আর আসবে না, " আসাদের চিন্তাটা মাথা থেকে ওরা বার করে দিয়েছে, জোর দিয়ে তা বলা যায় না। আরো কয়েকটা দিন গেলে বোঝা যাবে, আসাদের ব্যাপারে তারা সত্যিই হাত ধুয়ে ফেলেছে। কাজেই খুব সাবধানে এগোতে হবে।

আসাদ মাথা হেলিয়ে বলে, 'আচ্ছা—' কী কারণে রজিবুল তাকে আপাতত আরো কিছুদিন ঘাটকোপারে থাকতে বলছে, তা বুঝতে পারছে সে।

এই ছ'দিনে নিয়ামত আলি তিনবার আন্ধেরির সাইটে এসে খোঁজখবর নিয়ে গেছে। যার মাথায় মেয়ের শাদির চিন্তা সে কি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে? পুলিশের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিয়েছে। তার মতো করে নিয়ামত ধরে নিয়েছে, আসাদ এখন বিপদমুক্ত। অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে সে রজিবুলকে বলেছে, 'তাহলে এই মাসেই আর-একটা দিন দেখে শাদির বন্দোবস্ত করে ফেলি?'

আসাদের মতো নিয়ামত আলিকে তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছে রজিবুল। বলেছে, 'আরো কয়েকটা রোজ সবুর কর।' পুলিশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বহুদর্শী মানুষটার সংশয় এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

চিন্তিতভাবে নিয়ামত জিজ্ঞেস করেছে, 'ক' রোজ?'

একটু ভেবে রজিবুল বলেছে, 'দশ-বারো রোজ।'

আরো দশ-বারো দিনের মধ্যে যখন কিছুই ঘটল না, তখন ধরেই নেওয়া হল, সমস্যা কেটে গেছে। পুলিশ হয়তো উড়ো কোনো খবর পেয়ে আসাদের খোঁজে ছুটে এসেছিল। যখন বুঝেছে, সে কোনো অন্যায় করেনি, তাকে সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ নেই, তখন তার পেছনে ধাওয়া করা ছেড়ে দিয়েছে।

নিশ্চিন্ত রজিবুল বলেছে, 'ঝামেলা কেটে গেছে। এবার তুই ধারাভিতে ফিরে আয়।'

মাথার ওপর যে প্রচণ্ড দুর্ভাবনা এতদিন পাহাড়ের মতো চেপে বসেছিল, সেটা সরে যাওয়ায় এখন আসাদ খুব হালকা বোধ করছে। প্রায় একটা মাস কী মারাত্মক উৎকণ্ঠায় যে তার কেটেছে! দিবারাত্রি তীব্র আতঙ্ক তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াত। এখন শাদির কথা ছাড়া অন্য কিছুই ভাববে না। রজিবুলের সঙ্গে পরামর্শ করে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলবে। জহুরাকে ঘিরে তার সেই পুরনো, পরমাশ্চর্য স্বপ্নটা ফিরে আসছে। নিয়ামত আলিকেও জানিয়ে দিতে হবে, সে যেন নতুন করে বিয়ের তোড়জোড় শুরু করে দেয়। এবার আর কোনোরকম বিঘ্ন ঘটবে না।

রজিবুলের কথামতো ধারাভিতে ফিরে এসেছে আসাদ। আন্ধেরিতে ডিউটি দিয়ে ফিরে আসার পর ঘর সাফসুতরো করেছে। নতুন বিবির জন্য দরজির দোকানে পর্দা বানাতে দিয়েছে। সে যখন একা ছিল, তখন দরজা-জানালায় কিছু থাকত না, সব হা-হা করত। কিন্তু বিবি এলে ঘর তো আর বে-আব্রু রাখা যায় না।

শোওয়ার জন্য তার একটা পুরনো, তিন পা-ওলা তক্তপোশ আছে। সেটার চতুর্থ পায়াটির জন্য ইট সাজিয়ে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নিত। ওটাকে দু-একদিনের ভেতর বিদায় করবে সে। দাদার মার্কেটে সস্তা আসবাবের দোকানে খাট দেখে এসেছে। সেটা কিনে নিয়ে আসবে। জহুরার আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা নিজের সাধ্যমতো করে ফেলবে আসাদ। এর জন্য কিছু ধারটার করতে হলেও করবে।

কিন্তু স্বপ্নের অনেক কাছাকাছি পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত তা পূরণ হল না।

ধারাভিতে আসার দু'দিন পর আন্ধেরি থেকে ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল আসাদ। গেল একমাসে একটা ফ্লোর ঢালাই হওয়ার পর তক্তা খুলে তার ওপরের ফ্লোরটা ঢালাইয়ের কাজ চলছে। সারাদিন খাটুনির পর শরীর ভেঙে আসছিল তার। ভেবেছিল, কিছুক্ষণ জিরিয়ে স্নানটান সেরে রাস্তার দোকান থেকে চা খেয়ে আসবে।

এখন প্রায় আটটার মতো বাজে। দূরে বান্দ্রার বিশাল ওভারব্রিজ থেকে শুরু করে বাঁদিকে মাহিম চার্চ, সামনে অনেক দূরে সমুদ্রের খাড়ির ওধারে অগুনতি হাই-রাইজগুলোতে শুধু আলো আর আলো। রাস্তায় রাস্তায় সোডিয়াম ভেপারের রোশনাইতে সব মায়াবী স্বপ্নের মতো মনে হয়।

চোখ বুজে এসেছিল আসাদের। হঠাৎ কয়েক জোড়া বুটের ভারী আওয়াজ কানে আসে, তারপর জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে কর্কশ গলা শোনা যায়, 'দরওয়াজা খোল—দরওয়াজা খোল—'

মুহূর্তে চটকা ভেঙে যায় আসাদের। ধড়মড় করে বিছানা থেকে নেমে এসে দরজা খুলতেই দেখা যায় পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টর আর চারজন কনস্টেবল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কনস্টেবলদের হাতে রাইফেল।

পুলিশ অফিসারটি জিগ্যেস করল, 'তুমি আসাদুল মিয়াঁ?'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল আসাদের। না, এত করেও পুলিশকে এড়ানো গেল না। শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক তারা এসে হাজির হয়েছে। বেশির ভাগ মারাঠি পুলিশের চেহারায় নিরেট ভাবলেশহীনতা থাকে। তাদের দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল আসাদের। কোনোরকমে বলতে পারল, 'জি, সাব।'

অফিসার বলল, 'দো রোজ তোমাকে ঢুঁড়ে গেছি। কী মনে করেছ, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই মুম্বাই শহরে লুকিয়ে থাকতে পারবে?'

দম-আটকানো গলায় আসাদ বলে, 'নেহী সাব, আমি আমার দোস্তদের কাছে গিয়েছিলাম। ক' রোজ সেখানে থাকতে হয়েছে। মেহেরবানি করে যদি বলেন, কেন আমাকে খুঁজছিলেন—'

'আমাদের কাছে খবর আছে, তুমি ইন্ডিয়ার লোক না। বাংলাদেশের ঘুসপৈঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)।'

এদিকে পুলিশের আসার খবর পেয়ে রজিবুল ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে। শুধু সে-ই না, ধারাভি বস্তির আরো অনেকে। আসাদের ঘরের সামনে রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। সবার চোখেমুখে প্রবল উদ্বেগ।

হাতজোড় করে আসাদ বলে, 'নেহী সাব, নেহী—' রজিবুল ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে কাতর গলায় বলে, 'সাব, আসাদ আচ্ছা লেড়কা। তিশ সাল ইন্ডিয়ায় আছে। ও এখানকার আদমি।'

অফিসার কড়া চোখে রজিবুলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, 'তুমি কে?'

'অ্যায়সা কোঈ রিস্তেদারি নেহী। তবে ও আমার ছেলের মতো। আমাকে চাচা বলে।'

মুখ ফিরিয়ে আবার আসাদের দিকে তাকায় অফিসার, 'তোমার ওই চাচা বলল, ত্রিশ বছর ইন্ডিয়ায় আছ, তার আগে কোথায় ছিলে? সচ সচ কহোগে।'

আসাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সে জানায়, পাঁচ বছর বয়সে সে মা-বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল। তারপব থেকে এটাই তার দেশ।

অফিসার প্রচণ্ড জোরে ধমক লাগায়, 'ঝুট। তুমি হালফিল ইন্ডিয়ায় এসেছ।'

রজিবুল প্রায় মরিয়া হয়ে এবার বলে, 'নেহী সাব। আসাদ বচপন থেকেই এখানে আছে।'

অফিসার হুমকে ওঠে, 'তুমি একটা কথাও আর বলবে না। বিলকুল চুপ।' বলে ফের আসাদকে বলে, 'তুমি যে ত্রিশ বছর এখানে আছ, সেটা ঠিক কিনা কী করে বুঝব?'

আসাদ বলে, 'আমি ধারাভিতে এক-দেড় মাহিনা হল এসেছি। এর আগে যেখানে যেখানে থাকতাম, সেই সব জায়গার লোকজনকে জিগ্যেস করলে বলবে। তাছাড়া আমি অনেক জায়গায় বহুৎ আদমির সঙ্গে কাজ করেছি। তারাও বলবে।'

'ওসব শুনতে চাই না। রেশন কার্ড আছে?'

'নেহী সাব।'

'আর কী পরিচয়পত্র আছে যা থেকে জানা যাবে তুমি ইন্ডিয়ার লোক?'

কিছুদিন ধরে আসাদ শুনে আসছে, অনেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুলিশ রেশন কার্ডের খোঁজ করছে। তার কারণটা এতদিনে জানা গেল। আসাদের বয়স যখন পনেরো ষোল, তখন তার মা-বাপ মারা যায়। তারপর থেকে অনেকদিন এটা সেটা করে, অর্থাৎ নানা উঞ্ছবৃত্তিতে পেটের

দানা জোগাড় করেছে সে। এই ক'বছর হল, রিয়েল এস্টেটের লেবার কন্ট্রাক্টরদের কাছে কাজ নিয়েছে। যখন যেখানে মাথা গোঁজার জায়গা জুটেছে, সেখানে শুয়ে পড়েছে। কতকাল যে তার স্থায়ী কোনো ঠিকানা ছিল না! ঠিকানা না থাকলে রেশন কার্ডটা হবে কী করে? তাছাড়া ওটা যে খুবই জরুরি সেটা কখনও সে ভাবেনি। দিন কেটে যাচ্ছিল, তাতেই আসাদ খুশি।

কিন্তু একটা রেশন কার্ড বা অন্য পরিচয়পত্রের জন্য একদিন যে তাকে বিপদে পড়তে হবে, কে জানত ? সেটা না থাকায় প্রায় সারা জীবনটা আসাদ যে-দেশে কাটিয়ে দিল, এখন দেখা যাচ্ছে সে সেখানকার কেউ নয়।

অদ্ভুত এক ভয়ে মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল আসাদের। সে বলল, 'সাব--সাব—' এটুকু বলার পর তার গলা বুজে গেল।

অফিসার এবার জিগ্যেস করল, 'বলছ তো অনেক সাল এখানে আছ। ভোট দিয়েছ কখনও?'

আস্তে মাথা নাড়ে আসাদ, 'না।'

'ভোটের জন্য ফোটো তোলা হয়েছিল, তা জানো?'

'শুনেছিলাম।'

'তোমার ফোটো তুলিয়েছিলে?'

'না, সাব। ঝোপড়পট্টিতে থাকতাম। কেউ আমাকে ফোটো তোলার কথা বলেনি।'

এতক্ষণ মাঝে মধ্যে ধমক ধামক দিলেও মোটামুটি ভালোভাবেই কথা বলছিল অফিসার। এবার তার মেজাজটা হঠাৎ ভীষণ উগ্র হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে, 'শালে ঘুসপৈঠিয়া। রেশন কার্ড নেই, ফোটো আইডেনটিটি কার্ড নেই—বলে কিনা ইন্ডিয়ান! চল থানায়—'

অফিসারের দু' পা জড়িয়ে ধরে আসাদ। বলে, 'বিশ্বাস করুন সাব, পাঁচ সাল যখন বয়েস, চলে এসেছি। ইন্ডিয়াই আমার দেশ।'

রজিবুল সন্ত্রস্তভাবে বলে, 'সাব, আসাদের রেশন কার্ড হয়নি। ওর ভুল হয়ে গেছে। লেকিন ও সচমুচ তিশ সাল এখানে আছে—'

অফিসার দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে ওঠে, 'তোকে চুপ করে থাকতে বলেছিলাম না? কুত্তা কাঁহিকা, ওর হয়ে দালালি করছ!'

'না সাব, যা সচ তাই বলছি। ওর ওপর মেহেরবানি করুন। ক'রোজ বাদে ওর শাদি ঠিক হয়ে আছে—'

রজিবুলের কাকুতিমিনতি কানেই তোলে না অফিসার। কনস্টেবলদের উদ্দেশে বলে, 'আসাদুল মিয়াঁকে নিয়ে এস—'

শুধু আসাদই নয়, থানায় আরো অনেক পরিচয়পত্রহীন ঘুসপৈঠিয়াকে ধরে এনে আটকে রাখা হয়েছে। আসাদ তাদের অনেককে চেনে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ওরাও বহুকাল আগে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল। তাদের কেন এত বছর বাদে পুলিশ ধরে এনেছে, কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই ভীষণ উৎকণ্ঠিত।

পরদিন সন্ধ্যায় রজিবুল নিয়ামত আলিকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। নিয়ামত একেবারে ভেঙে পড়েছে। দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে সে ঝাপসা গলায় সমানে বলে যাচ্ছে, 'কী হবে আমার লেড়কিটার?'

রজিবুলের এমনিতে ভীষণ মনের জোর। সহজে সে হতাশ হয়ে পড়ে না, কিন্তু আজ দেখে

মনে হল, তার বয়স হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। চোখের কোলে কালি, গাল বসে গেছে। খুবই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে প্রবল হতাশার সুরে রজিবুল আসাদকে বলল, 'তোর জন্যে কিছুই করতে পারলাম না রে।' জানায় আজ সে ডিউটি দিতে আন্ধেরিতে যায়নি। সকালে উঠেই চলে গিয়েছিল কটন গ্রিনে নিয়ামত আলির চৌলে। আসাদের খবরটা দিয়ে তাকে সঙ্গে করে বহু লোকের সঙ্গে দেখা করেছে, যদি আসাদের নামে একটা রেশন কার্ড বার করা যায়। পরিচয়পত্রের জোরে সে তাহলে ইন্ডিয়ায় থেকে যেতে পারবে। কিন্তু তারা খুবই তুচ্ছ, পোকামাকড়েরও অধম। কেউ রজিবুলদের কথায় কান দেয়নি। উলটে তাদের সন্দেহ, রেশন কার্ডের জন্য যখন এত ধরাধরি করছে, নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো গলদ আছে। তারা রজিবুলদের রাস্তার কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে।

দিনতিনেক পর থানায় যাদের ধরে আনা হয়েছিল, তাদের ট্রেনে তুলে পুলিশের একটা দল পশ্চিম বাংলার বর্ডারে নিয়ে আসে। বর্ডার পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'এরা ঘুসপৈঠিয়া। ইন্ডিয়ায় বেআইনি ঢুকে পড়েছে। ওদের বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিন।'

কোথায় কত দূরে পড়ে রইল মুম্বাই শহর! আসাদ যেন আচমকা পরিচিত পৃথিবী থেকে অন্য এক অজানা গ্রহে চলে এসেছে। বার বার একজোড়া লাজুক কালো চোখ তার সামনে ভেসে উঠছিল। নাঃ, জহুরার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হবে না। বুকের ভেতরটা তার চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।

বর্ডার-পুলিশ আসাদদের সীমানা পার করে ওধারে ঠেলে দেয়, কিন্তু ওদিকেও সীমান্তবাহিনী রয়েছে। তারা এতগুলো মানুষকে ঢুকতে দেখে জেরা শুরু করে। তার সঙ্গীরা কে কী বলছে, কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না আসাদ। একজন অফিসারের প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, মা-বাবার মুখে শুনেছে, তাদের আদি বাড়ি ছিল মুন্সিগঞ্জের কাছাকাছি একটা গ্রামে।

অফিসার জিগ্যেস করে, 'গ্রামের নাম কী?'

আসাদ বলে, 'মনে নেই। খুব ছোটবেলায় গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।'

'গ্রামে তোমার কে কে আছে?'

'জানি না সাব।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন করে অফিসার। কিন্তু কোনোটারই সঠিক, সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না। তাছাড়া যে বাংলা ভাষাটা আসাদ বলছে তাতে যথেষ্ট গোলমাল। তার কথায় হিন্দি, উর্দু আর মারাঠি মেশানো অদ্ভুত একটা টান।

অফিসার তার সহকর্মীদের সঙ্গে চাপা গলায় কী পরামর্শ করে আসাদকে বলে, 'তুমি এদেশের লোক নও। ইন্ডিয়ায় চলে যাও।'

'কিন্তু সাব—'

আসাদের কোনো কথাই শোনা হয় না। তাকে এবং তার সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের ইন্ডিয়ার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। সে জানে, আবার তাকে ওধার থেকে এধারে পাঠানো হবে।

তার যখন জন্ম হয়, সে ছিল পূর্ব পাকিস্তানি। তারপর তিরিশ বছর ধরে ভারতীয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়ে গেছে। এতকাল বাদে দেখা যাচ্ছে সে ভারতীয়ও নয়, বাংলাদেশিও না। তার কোনো দেশ নেই।

উদভ্রান্তের মতো বর্ডারের দিকে এগোতে থাকে আসাদ।

প্রদর্শনী

সন্ধেবেলা বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরুতে পেরুতে ওধারের বাস স্ট্যান্ডে মেয়েটাকে দেখতে পেল অনিমেষ। মাসখানেক ধরে কি তারও বেশি, প্রায় রোজই ঠিক এই সময়ে মেয়েটাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে সে। অনিমেষ যখন কলকাতা থেকে ফেরে, খুব সম্ভব মেয়েটা তখন কলকাতায় যায়।

রাত্তিরে কলকাতার অর্ধেক ফাঁকা করে কয়েক লাখ মানুষ যখন বেরিয়ে যায় তখন মেয়েটা ওই বিশাল মেট্রোপলিসে গিয়ে কী করে? সেখানে তার কী কাজ? অনিমেষ এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। মনে মনে একটা পছন্দসই উত্তরও খাড়া করেছে। তার ধারণা, মেয়েটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কাজ করে, কিংবা কোনো হাসপাতালে। দু'টোই এমার্জেন্সি সারভিস। রাতে সেখানে ডিউটি দিতে হয়।

এ ধারে আসতেই চোখাচোখি হয়ে গেল, রোজই হয়। হলেই একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নেয় মেয়েটা। আজ কিন্তু নামালো না, তাকিয়েই রইল।

তার বয়স তেইশ চব্বিশ। গায়ের রং ফর্সাও না কালোও না, দুইয়ের মাঝামাঝি। লম্বাটে মুখ, পাতলা নাক, ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় টানা চোখ। সরু মসৃণ গলা। কোমর-ছাপানো অজস্র চুল একবেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে।

এই একমাস ধরে একই পোশাকে তাকে দেখে আসছে অনিমেষ। বুটিকের কাজ-করা একটা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে ব্লাউজ। গলায় সস্তা দার্জিলিং স্টোনের একটা হার, কানে ওই পাথরেরই ইয়ার রিং। বাঁ হাতে ছোট্ট চৌকো ঘড়ি। তবে দুই ভুরুর মধ্যবর্তী কপালে কোনোদিন সবুজ টিপ থাকে, কোনোদিন লাল। আজকের রংটা গোলাপি। হাত-পা, মুখ, আলাদা আলাদাভাবে দেখতে গেলে মনে হবে, তেমন কিছু নয়, খুবই সাধারণ। কিন্তু সব মিলিয়ে মেয়েটার চেহারায় এমন একটা ম্যাজিক আছে যে চোখ ফেরানো যায় না।

মেয়েটা আজ ওভাবে তাকিয়ে থাকায় খুবই অস্বস্তি হচ্ছে অনিমেষের। সেই সঙ্গে এক ধরনের আকর্ষণও বোধ করছে। কী করবে যখন সে ভাবছে সেই সময় মেয়েটাই এগিয়ে এল। বলল, 'একটা কথা জিগ্যেস করব?'

মেয়েটার মধ্যে কোথাও আড়ষ্টতা নেই। খুবই স্মার্ট আর স্বচ্ছন্দ সে। তবু হুট করে সে যে কাছে চলে আসবে, এটা ভাবা যায় নি। অনিমেষ ব্যস্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, করুন না—'

'একমাস ধরে আপনাকে দেখছি। আমি যখন কলকাতায় যাই আপনি তখন ফেরেন।'

মেয়েটা তা হলে তাকেও লক্ষ করেছে। আধফোটা গলায় অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ।'

মেয়েটা আবার বলল, 'আমার মনে হয়, আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

অনিমেষ হকচকিয়ে যায়। বিব্রতভাবে বলে, 'হ্যাঁ। মানে—'

'আমার সম্বন্ধে আপনার খুব কৌতূহল, তাই না অনিমেষবাবু?' মেয়েটা তখনও চোখ সরায় নি। পলকহীন অনিমেষের দিকে তাকিয়েই আছে।

অনিমেষ চমকে উঠল, 'আপনি আমাকে চেনেন!'

'আপনাকে আমাদের শহরে কে না চেনে! এম. এ'তে কত ভালো রেজাল্ট করেছিলেন। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়েছিল। সবার মুখে মুখে আপনার নাম।' বলে একটু থামে মেয়েটি। পরক্ষণেই আবার শুরু করে, 'আপনার মতো ভালো ছেলে এ শহরে আর কেউ নেই।'

প্রায় অচেনা এক তরুণীর মুখে নিজের প্রশংসাটুকু শুনতে ভালোই লাগল অনিমেষের। সেই সঙ্গে একটু সংকোচও। লাজুক হেসে সে বলল, 'কী যে বলেন!'

এ জায়গাটা কলকাতা থেকে মাইল পনেরো দূরে। ইদানীং গ্রেটার ক্যালকাটা ডেভলাপমেন্ট স্কিমের ভেতর পড়ে গেছে। নইলে এটা কলকাতারই প্রায় সমবয়সী ছোট শহর। এইটিন্থ সেঞ্চুরিতে ইংরেজরা এখানে কিছু ঘরবাড়িটাড়ি বানিয়েছিল। সেগুলো ঘিরে ক্রমশ টাউনশিপ গড়ে উঠেছে।

অনিমেষরা এখানকার পুরনো বাসিন্দা। পুরনো এবং বনেদি। পাঁচ-ছ' জেনারেশন ধরে তারা এখানে আছে। ব্রিটিশ রাজত্বে এজেন্সির বিজনেসে তার ঠাকুরদার বাবা এবং ঠাকুরদা প্রচুর পয়সা করেছিলেন। এখন অবশ্য অত রমরমা নেই। বাবার আমলে বংশানুক্রমিক ব্যবসা উঠে গেছে। অবস্থা পড়তির দিকে। তবু ব্যাঙ্কে এবং কোম্পানির শেয়ারে যা আছে তাতে নিচের দুই পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে খেয়ে যেতে পারবে। তা ছাড়া রয়েছে বিঘেখানেক জায়গা জুড়ে গথিক স্ট্রাকচারের মোটা মোটা থামওলা প্রকাণ্ড বাড়ি।

এইরকম পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কিছু না করলেও পারত অনিমেষ। বখে গেলেও কারো কিছু বলার ছিল না। কিন্তু অনিমেষ অন্যরকম মেটিরিয়ালে তৈরি। তার বয়স এখন ছাব্বিশ। কোনো নেশা নেই তার। সিগারেট পর্যন্ত খায় না। স্কুল ফাইনাল থেকে এম. এ পর্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছে। তারপর কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি পেয়েছে। আপাতত জুনিয়র অফিসারের গ্রেড। তবে প্রোমোশন পেতে দেরি হবে না।

রোজ আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলকাতায় যায় অনিমেষ, ফেরে সন্ধেবেলা।

মেয়েটা বলল, 'এবার আমার নামটা বলি, তাতে কথা বলতে সুবিধে হবে। আমি সুচরিতা।' একটু থেমে কী ভেবে অন্যমনস্কর মতো বলল, 'নামের যোগ্য অবশ্য আমি নই।' বলে গলার ভেতর তীক্ষ্ণ শব্দ করে একটু হাসল।

অনিমেষের মনে হল ঠাট্টা। সে বলল, 'আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক খবর জানেন। আমি কিন্তু আপনার ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

সুচরিতা ফের অনিমেষের দিকে তাকাল। আস্তে করে বলল, 'জানতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' মৃদু হেসে মাথা নাড়ল অনিমেষ।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুচরিতা। তারপর বলল, 'এক কাজ করুন।'

'কী?'

'আমাদের বাড়ি চলুন। ভালো করে আলাপও হবে। আমার সম্বন্ধে আপনার অনেক কিছু জানাও হয়ে যাবে।' সুচরিতার তাকানোর ভঙ্গি অন্যরকম হয়ে উঠতে লাগল। কেমন যেন ধারাল আর দূরভেদী।

অনিমেষ তার চাউনির এই পরিবর্তন ভালো করে লক্ষ করল না। বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি তো কলকাতায় যাবার জন্যে বেরিয়েছিলেন।'

অনিমেষকে থামিয়ে দিয়ে সুচরিতা বলল, 'একদিন কলকাতায় না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কলকাতা যেমন চলছে তেমনই চলবে। আসুন—'

সুচরিতার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারল না অনিমেষ। বলল, 'আপনাদের বাড়ি কোথায়?'

'নিউ কলোনিতে।'

এ শহরের পেছন দিক দিয়ে গঙ্গা চলে গেছে। নিউ কলোনি তারই পাড়ে। এই বাস স্ট্যান্ডটা থেকে কম করে দু' আড়াই মাইল দূরে।

অনিমেষ একটু ভেবে বলল, 'আপনাদের বাড়ি গেলে কেউ কিছু মনে করবেন না তো? মানে আমাকে কেউ চেনেন না। আমার সঙ্গে—'

'কেউ কিছু মনে করবে না। গেলেই বুঝতে পারবেন।' গলার স্বরে অদ্ভুত একটা টান দিয়ে কথাগুলো বলল সুচরিতা। তারপর শব্দ করে হাসল।

অদম্য কৌতূহলে দ্বিধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত অনিমেষ ঠিক করে ফেলল, সুচরিতার সঙ্গে যাবে। বলল, 'নিউ কলোনি অনেকটা দূরে। কিভাবে যাবেন?'

'কেন, সাইকেল রিকশায়।'

এ কথাটা আগেই মনে হয়েছিল অনিমেষের। কিন্তু প্রায় অচেনা এক তরুণীকে রিকশায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে যাবার প্রস্তাব দিলে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ভাবতে অস্বস্তি হচ্ছিল। সুচরিতা রিকশার কথা বলায় সে আরাম বোধ করল। সারাদিন কাজের পর ভিড়ের বাসে গাদাগাদি করে এসে এখন আর দু'আড়াই মাইল হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। তবে পাশে বসে যেতে হবে, এটা ভাবতে এক ধরনের অস্বাচ্ছন্দ্যও হতে লাগল।

সুচরিতা এবার তাড়াই লাগাল, 'কী হল, আসুন।'

বাস স্ট্যান্ড থেকে ক'পা দূরে ঝাঁকড়া-মাথা দু'টো রেন-ট্রি। তার তলায় রিকশা স্ট্যান্ড। সেখানে গিয়ে দু'জনে একটা রিকশায় উঠল। সুচরিতাই রিকশাওলাকে বলল, 'নিউ কলোনি চল।'

রিকশা মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। রাস্তাটা এ শহরের শিরদাঁড়া হয়ে সোজা গঙ্গার ধারে চলে গেছে।

বেশির ভাগ দিনই কলকাতা থেকে ফিরে এখানে আলো দেখতে পাওয়া যায় না। লোডশেডিং-এর অন্ধকারে চারিদিক ডুবে থাকে। আজ অঢেল আলো।

ঝোঁকের মাথায় বা দুর্বোধ্য কোনো আকর্ষণে সুচরিতার সঙ্গে সাইকেল রিকশায় উঠবার পরই অনিমেষের মনে হয়েছে, না গেলেই ভালো হত। এ শহরের অনেকেই তাকে চেনে। বাবা-মা, দাদা-বউদিরা মাঝে মাঝে কেনাকাটা করতে বা অন্য দরকারে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের কেউ একটি মেয়ের সঙ্গে তাকে এভাবে যেতে দেখলে খুবই অবাক হয়ে যাবেন। এ নিয়ে অনেক কিছু ভাববেনও। সেটাই স্বাভাবিক।

একটি তরুণীর পাশে বসে রিকশা-ভ্রমণ এমন কোনো চমকপ্রদ ঘটনা নয়। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা আকছার এখানে ওখানে ঘুরছে। কিন্তু অনিমেষের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। ভালো ছেলে হিসেবে এ শহরে তার যথেষ্ট সুনাম। কেউ কখনও তাকে মেয়ে নিয়ে ঘুরতে দেখেনি। অনিমেষকে খানিকটা মরালিস্টই বলা যায়।

এ শহর যেন আদ্যিকালের কোনো নগর। এখানকার সব কিছুই প্রাচীন। ফাঁকা জায়গা নেই বললেই হয়। পুরনো বাড়িঘর আর মন্দিরে চারিদিক ঘিঞ্জি হয়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে চমক দেবার মতো এক-আধটা নতুন বাড়ি। দু'ধারে খোলা ড্রেনের পাশে ডাঁই-করা আবর্জনা। এই মেইন রোডটা থেকে সরু সরু অগুনতি গলি দু'পাশে বেরিয়ে গেছে।

অনিমেষদের সাইকেল রিকশাটা যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেটা শহরের সব চাইতে জমজমাট অংশ। এটা বাজারপাড়া। দু'ধারে দোকানপাট, মুখোমুখি দু'টো সিনেমা হল। লোডশেডিং না হওয়ায় চারিদিক ঝলমল করছে।

রাস্তায় এখন প্রচুর লোকজন। তবে সব চাইতে বেশি ভিড় সিনেমা হল দু'টোর সামনে। থিকথিকে মানুষজনের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে বেল বাজাতে বাজাতে গাদা গাদা সাইকেল রিকশা ছুটছে। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রাইভেট বাস। সেগুলো মানুষে ঠাসা, এমনকি ছাদের ওপরও প্যাসেঞ্জার তোলা হয়েছে।

অনিমেষের ছেলেবেলায় এত মানুষ এ শহরে ছিল না। জায়গাটা ছিল মোটামুটি নিরিবিলি, শান্ত, নিরুত্তেজ, কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যে হুড়হুড় করে পপুলেশন বেড়ে গেছে। কলকাতা মেট্রোপলিস উপচে জলোচ্ছ্বাসের মতো মানুষের ঢল নেমে এসেছে শহরতলিগুলোতে। 'পপুলেশন এক্সপ্লোসন' কাকে বলে, এখানে পা দিলেই টের পাওয়া যায়।

সুচরিতার পাশে নিজেকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে বসে আছে অনিমেষ। তবু গায়ে গা ঠেকেই যাচ্ছে।

একান্তভাবে অনিমেষ এই মুহূর্তে লোডশেডিং চাইছে আর ভয়ের চোখে অনবরত রাস্তার দু'পাশে তাকাচ্ছে। ঈশ্বর বা ভগবান-টগবান নিয়ে কখনও সে মাথা ঘামায় না। এখন মনে মনে সে বলতে লাগল, 'হে ঈশ্বর, চেনাশোনা কারো চোখে যেন পড়ে না যাই।' তার চোখমুখ দেখে মনে হয়, প্রকাশ্যে সে যেন ভয়াবহ পাপকর্ম করে ধরা পড়েছে।

অনিমেষ একবার ভাবল, রিকশা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। কিন্তু তাও পারল না।

হঠাৎ পাশ থেকে সুচরিতা ডাকল, 'অনিমেষবাবু—'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল অনিমেষ।

সুচরিতা ফের বলল, 'খুব বিপদে পড়ে গেছেন, না?'

অনিমেষ চমকে উঠল। বিমূঢ়ের মতো বলল, 'বিপদ! কিসের?'

'এই যে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, সেটা বিপদ নয়?' বলে দূরভেদী চোখে অনিমেষের দিকে তাকাল সুচরিতা।

অনিমেষ উত্তর দিল না। জামার তলায় অদৃশ্য পোকা হাঁটার মতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

সুচরিতা এবার বলল, 'এভাবে আমার সঙ্গে রিকশায় উঠে পড়া ঠিক হয়নি, তাই না?'

চাপা, নিচু গলায় অনিমেষ বলল, 'এ কথা বলছেন কেন?'

উত্তর না দিয়ে সুচরিতা প্রশ্ন করল, 'পাছে কেউ আপনাকে আমার সঙ্গে দেখে ফেলে, সেই ভয়টা কিছুতেই কাটাতে পারছেন না, কেমন?'

মেয়েটা কি থট-রিডার? মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যের মনের কথা পড়তে পারে? ঢোক গিলে অনিমেষ বলল, 'না না, ভয় আবার কী?' বলল বটে, গলার স্বর খুব নিস্তেজ শোনাল।

'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'রিকশাওলাকে থামতে বলি। আপনি এখানে নেমে যান। ভালো ছেলের সুনামটা অন্তত বজায় থাক।'

নিজের মধ্যে কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগল। হয়তো পৌরুষে বা দুর্জ্ঞেয় কোনো অহঙ্কারে। সে বলল, 'রিকশা থামাতে হবে না।'

মজার গলায় সুচরিতা বলল, 'নাঃ, আপনাকে আর ভীরু বলা যাবে না।' বলে রিনরিনে শব্দ করে একটু হাসল।

একসময় বাজার পাড়ার জমকালো অংশটা পেরিয়ে সাইকেল রিকশা অনেকটা এগিয়ে যায়। তবু ভয় কাটে না অনিমেষের। তার চেনাশোনা মানুষ এ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আজ লোডশেডিং-এর কোনো সম্ভাবনাই নেই। তার রক্তচাপ ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়ে আলো জ্বলতেই থাকে।

হঠাৎ অনিমেষের মনে হয়, সুচরিতার সঙ্গে আলাপ করতে এসে এভাবে চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় না। সে জিগ্যেস করে, 'আপনারা এখানে নতুন এসেছেন, না?'

সুচরিতা বলে, 'ঠিক নতুন না, তিন চার বছর আছি।'

গঙ্গার ধারের নিউ কলোনিটা হয়েছে বছর পাঁচেক আগে। ওখানকার লোকজনেরা বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। তার মানে কলোনি বসবার প্রায় শুরু থেকেই সুচরিতারা আছে। অনিমেষ বলল, 'এই মাসখানেক ধরে আপনাকে দেখছি। তার আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে দেখেছি।'

'তাই বুঝি?'

'আপনাদের বাড়িটাও বাইরে থেকে দেখেছি। শুনেছি আপনারা এখানে একশো বছরেরও বেশি আছেন। খুব অ্যারিস্টোক্রাট ফ্যামিলি।'

অনিমেষ বলল, 'অ্যারিস্টোক্রাট আবার কী। তবে অনেক দিন এখানে আছি, সেটা ঠিক।'

একটু চুপ।

তারপর সুচরিতা বলল, 'আপনাদের মতো এমন ব্রিলিয়ান্ট ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের নেই।'

অনিমেষ বিব্রত হল। বলল, 'আমার পূর্বপুরুষেরা চান্স পেয়ে কিছু টাকা পয়সা বাড়ি টাড়ি করে গেছেন। কিন্তু আমি এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। এর ভেতর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসছে কেন?'

'একটু ধৈর্য ধরুন। আমাদের বাড়ি গিয়ে আপনাকে একটা এক্‌জিবিশন দেখাব। তখন আপনার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যাবেন।'

একসময় সাইকেল রিকশাটা নিউ কলোনিতে পৌঁছে গেল। এখানে বেশির ভাগই টিন বা টালির ঘর। মাঝে মধ্যে দু'একটা একতলা বাড়ি। দেখেই টের পাওয়া যায়, মিডল ক্লাসের একেবারে নিচের স্তরে যারা রয়েছে এটা তাদেরই উপনিবেশ।

রিকশা থেকে নেমে ভাড়াটা অনিমেষই মিটিয়ে দিল। তারপর তাকে সঙ্গে করে কলোনির শেষ মাথায় একটা টালির চালের বাড়িতে নিয়ে এল সুচরিতা।

মোট খানতিনেক ঘর। দু'টো ঘরে তিন ইঞ্চি ইটের দেওয়াল। বাকি ঘরটায় বাঁশের বেড়া। সবগুলো ঘরের মেঝে অবশ্য পাকা। উঠোনের একধারে উঁচু বাঁধানো জায়গায় তুলসীমঞ্চ। এধারে ওধারে দু'চারটে গাঁদা এবং সন্ধ্যামালতীর গাছ চোখে পড়ে।

সুচরিতা একটা ঘরে অনিমেষকে বসিয়ে বলল, 'প্লিজ একটু একলা থাকুন। আমি আসছি।' বলেই বেরিয়ে গেল।

আর্থিক দিক থেকে সুচরিতারা কোন লেভেলে পড়ে আছে, ঘরটার দিকে এক পলক তাকালেই টের পাওয়া যায়।

অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে টিম টিম করে। তাতেই দেখা গেল, ডান দিকে তিন পা-ওলা একটা তক্তপোশ। বাকি পায়ার জায়গায় ইট বসানো। সেটার ওপর ময়লা বিছানা পাতা। চিটচিটে বালিশের ওয়াড় ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। তক্তপোশটার তলায় পুরনো টিনের বাক্স, হাঁড়িকুড়ি, ভাঙাচোরা হারমোনিয়ামের ধ্বংসাবশেষ, ইত্যাদি। এক কোণে দড়িতে ক'টা ময়লা শাড়িটাড়ি ঝুলছে।

অনিমেষ যে ঘুণে-ধরা চেয়ারটায় বসেছে সেটার হাতল ভাঙা। সামনের ছোট টেবলটায় খবরের কাগজের কভার। তার ওপর অসংখ্য চায়ের দাগ। ক'টা মলাট ছেঁড়া সিনেমা ম্যাগাজিন এলোমেলো পড়ে আছে। মাথার ওপর এধারে ওধারে ঝুল জমেছে।

ডানদিকের দেওয়ালে বিড়ি কোম্পানির বাংলা ক্যালেন্ডারে একটা সেক্সি চেহারার মাংসল মেয়েমানুষ কুৎসিত 'পোজ' নিয়ে বসে আছে। সেদিক থেকে চোখ ফেরাতেই বাঁ দিকের দেওয়ালে দৃষ্টি আটকে গেল অনিমেষের। একটা বাইশ তেইশ বছরের যুবকের ফোটো সেখানে ঝুলছে। মুখটা খুবই চেনা। কিন্তু নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এই সময় সুচরিতা আবার ফিরে এল। বলল, 'দুঃখিত, আপনাকে চা খাওয়াতে পারলাম না। বাড়িতে চা আছে, দুধ-চিনি নেই।'

এই জন্যই তা হলে তাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিল সুচরিতা? দ্রুত মুখ ফিরিয়ে অনিমেষ ব্যস্তভাবে বলল, 'না না, চায়ের দরকার নেই।' বলতে বলতেই তার চোখ আবার বাঁ দিকের দেয়ালে ফিরে গেল।

সুচরিতা অনিমেষকে লক্ষ করছিল, বলল, 'কী দেখছেন?'

ফোটোটা দেখাতে দেখাতে অনিমেষ বলল, 'এ কে বলুন তো? খুব চেনা লাগছে।'

সুচরিতা বলল, 'যাক, ভালোই হল। ছোটদাকে দিয়েই আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা শুরু করি।'

মুখ ফিরিয়ে অনিমেষ প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'ছোটদা?'

'হ্যাঁ, ওই যার ফটো দেখছিলেন। ওর নাম অনল।'

এবার মনে পড়ে গেল অনিমেষের। ক'বছর আগে যখন উগ্র রাজনৈতিক মুভমেন্টে সারা দেশ তোলপাড় হচ্ছে সেই সময় এই শহরে অনলের নামটা লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। পরে অনিমেষ জেনেছে, পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে সে মারা গেছে। অনল তা হলে সুচরিতার ভাই!

সুচরিতা বলতে লাগল, 'আপনি যখন এই শহরেরই ছেলে তখন ছোটদার সব খবরই জানেন।'

অনিমেষ বলল, 'সব না হলেও কিছু কিছু জানি।'

'ছোটদা ছিল আমাদের ফ্যামিলির সব চাইতে ব্রাইট ছেলে। এম. এসসি পড়ছিল। আমরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।' বলে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুচরিতা। তারপর বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'বা রে, বাড়িতে নিয়ে এলাম কেন? সবার সঙ্গে আলাপ করবেন না? আসুন আসুন—'

একরকম জোর করেই অনিমেষকে নিয়ে শেষ ঘরটায় চলে এল সুচরিতা। একটা নোংরা বিছানায় অথর্ব এক বৃদ্ধা শুয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। সারা শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই।

সুচরিতা বলল, 'আমার মা। ছোটদা মারা যাবার পর শকে স্ট্রোক হয়েছিল। তারপর প্যারালিসিসে ডান দিকটা পড়ে গেছে, কথা বলতে পারে না। লোক চিনতে পারে না। আসুন।'

এবার সুচরিতার সঙ্গে মাঝখানের ঘরটায় এল অনিমেষ। এখানে চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের একটি লোককে দেখা গেল। মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। চোয়াল ভাঙা, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রুক্ষ চুল, চোখ দু' আঙুল গর্তে। পরনে তালিমারা লুঙ্গি আর ঢলঢলে ছেঁড়া পাঞ্জাবি।

সুচরিতা বলল, 'আমার বড়দা শরদিন্দু মিত্র।' শরদিন্দুকে বলল, 'ইনি অনিমেষ সান্যাল। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন, এখন বড় চাকরি করেন। এখানকার সব চাইতে বড় বাড়িটা ওঁদের। বিরাট বড়লোক। ভীষণ অ্যারিস্ট্রোক্রাট।'

শরদিন্দু নমস্কারের ভঙ্গিতে দু'টো হাত তুলল। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল অনিমেষ—হাত কোথায়? কনুই পর্যন্ত আছে শরদিন্দুর, নিচের দিকটা নেই।

পাশ থেকে সুচরিতা বলল, 'বড়দা একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। একটু অসাবধান হওয়াতে অ্যাকসিডেন্টটা হয়ে গেল। পাঁচ হাজার টাকা কমপেনসেশন পেয়েছিল। কবেই শেষ হয়ে গেছে। আসুন—'

বাইরে আসতে আসতে 'রানিং কমেন্টারি' দেবার মতো সুচরিতা বলতে লাগল, 'অ্যাকসিডেন্টটার কিছুদিন পরই বৌদি একটা ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেল। দু'টো বাচ্চা নিয়ে দাদা এখন বেকার। এ অবস্থায় কে কাজ দেবে বলুন। একমাত্র ভিক্ষে ছাড়া রোজগারের আর কোনো পথ নেই ওর। সেই লেভেলে এখনও ও নামতে পারেনি। চলুন, এবার রান্নাঘরের দিকটায় যাওয়া যাক। আমার ছোট বোন শোভা আর দাদার বাচ্চা দু'টো ওখানে রয়েছে। ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

আর্টিস্ট যেমন আর্ট গ্যালারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার একজিবিশন দেখায় অবিকল সেইভাবে সুচরিতা তাদের ফ্যামিলিটা দেখাচ্ছে। কিন্তু এই পরিবেশে এদের দেখতে দেখতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল অনিমেষের। সে বলল, 'আজ থাক, আমাকে ফিরতে হবে। একটা জরুরি কাজের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

অদ্ভুত হাসল সুচরিতা। বলল, 'জানতাম আমাদের বাড়িতে আসার পর আপনার জরুরি কাজ মনে পড়ে যাবে। ঠিক আছে, শোভার সঙ্গে আলাপ করতে হবে না। ওর সম্পর্কে একটা খবর দিচ্ছি। এখনও শোভার বিয়ে হয়নি।' বলেই ঝুপ করে গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে দেয়, 'কিন্তু এর মধ্যেই একবার অ্যাবরশন করতে হয়েছে।'

অনিমেষ চমকে উঠল।

সুচরিতা এবার বলল, 'আর বড়দার বাচ্চা দু'টোর মারাত্মক খিদে। একেক জন পুরো দু'টো অ্যাডাল্ট লোকের মতো খায়।'

নার্ভগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছিল অনিমেষের। সে বলল, 'এবার আমাকে যেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'যে জন্যে এতদূর এলেন সেটাই তো বাকি থেকে গেল।'

'কিসের কথা বলছেন?'

'আমার সম্বন্ধে তো কিছুই শুনলেন না। চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। যেতে যেতে বলব।'

'আপনি আর কষ্ট করে যাবেন না।'

'কষ্ট আবার কী?'

বড় রাস্তায় সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে যেতে নিজের কথা বলে গেল সুচরিতা, 'এই যে ফ্যামিলিটা দেখলেন, এর সব দায়িত্ব এখন আমার। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত পড়েছি। তাতে তো চাকরি হয় না। তাই সন্ধেবেলা আমাকে কলকাতায় যেতে হয়। সারা রাত হোটেলে কাটিয়ে ভোরে ফিরে আসি। বুঝতেই পারছেন—' একটু থেমে বলল, 'আশা করি আমার ব্যাপারে আপনার সব কৌতূহল মিটে গেছে। নিশ্চয়ই আর আমাদের দেখা হবে না। হওয়া উচিতও নয়।'

নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল অনিমেষের। শেষের দিকটা কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না যেন। লাফিয়ে সামনের একটা রিকশায় উঠে পড়ল সে।

দ্রুত রিকশাটার পাশে এসে সুচরিতা বলল, 'একটা কথা—'

সুচরিতার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না অনিমেষ। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কী?'

'শোভা জানিয়েছে ঘরে চাল-আটা কিছু নেই। গোটা পঁচিশেক টাকা দিতে পারেন। ধার বলে নিচ্ছি, কিন্তু কোনোদিনই ফেরত দিতে পারব না।'

পার্স খুলে টাকা বার করে সুচরিতাকে দিয়েই অনিমেষ শ্বাসরুদ্ধের মতো রিকশাওলাকে বলল, 'চ্যাটার্জিপাড়া চল। জলদি—'

ঝড়ের গতিতে সাইকেল রিকশা ছুটতে লাগল।

সুচরিতা অনিমেষের রিকশার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ওধারের দোকানগুলোর দিকে চলল। আটা-টাটা কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে তো।

প্রার্থী

তৌহরলালজি একজন বিখ্যাত জননেতা। উত্তর বিহারের পিপরগঞ্জ অঞ্চলের তিনি এম. এল. এ। স্থানীয় মানুষজন বলে 'এম্লে'।

সাতচল্লিশে দেশ যখন স্বাধীন হল তখন তাঁর বয়স মোটে সাত। বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, রশিদ আলি ডে বা বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহের সময় তৌহরলালজি অবোধ শিশু মাত্র। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জেল খেটেছেন, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন, সুদূর আন্দামানে যাঁদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সেইসব নায়কদের নামের তালিকায় তৌহরলালজিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি হলেন পোস্ট-ইন্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়ট অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তীকালের দেশপ্রেমী।

রাজনীতিটা তাঁর শখ। আসলে তিনি একজন অত্যন্ত সফল ব্যবসাদার। পিপরগঞ্জের চল্লিশ মাইলের ভেতর তৌহরলালজির মতো বড় টিম্বার মার্চেন্ট আর নেই। এছাড়া বনস্পতি তেল, স্কুটার, সাইকেল, বেবিফুড, কেরোসিন, রেডিও, সেলাই কল থেকে শুরু করে ডিটারজেন্ট পাউডার, গায়ে-মাখা সাবান, ছোট পাম্প-সেট, ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসপত্রের তিনি এখানকার একমাত্র ডিলার। এদিকের ছোটখাটো দোকানদারেরা তাঁর কাছ থেকেই মাল কিনে নিয়ে বেচে থাকে। ব্যবসা বাদ দিলেও তৌহরলালজিরা ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট। স্বনামে এবং বেনামে

তাঁদের যে কত জমি-জমা তার হিসেব রাখা মুশকিল। ফিউডাল সিস্টেমের সঙ্গে সুকৌশলে ব্যবসাদারিটা মেশাতে পেরেছেন তৌহরলালজি। ফলে ব্যাঙ্ক এবং ঘরের ভারী ভারী প্রকাণ্ড আলমারিগুলোতে টাকার পাহাড়।

এত টাকা, এত জমিজমা, এত বড় ব্যবসা, কিন্তু তাতে মান-সম্মানটা কোথায়? সামাজিক প্রতিষ্ঠা কতটুকু? এইসব প্রশ্নই একদিন তৌহরলালজিকে রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয়। পোলিটিক্যাল পাওয়ার হাতে থাকলে সমস্ত এলাকাটা হাতের মুঠোয় চলে আসবে। যাঁর টাকা, বন্দুক এবং লাঠির জোর রয়েছে তাঁর পক্ষে গরিব, আনপড়দের ভোট আদায় করে এম. এল. এ হওয়া খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। সুতরাং দশ বছর ধরে তৌহরলালজি পিপরগঞ্জ এলাকার এম. এল. এ। অঢেল টাকা এবং প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও এটা মানতেই হবে স্বার্থে ঘা না পড়লে বা কেউ না খোঁচালে তিনি একেবারে মাটির মানুষ।

পিপরগঞ্জ শহরের একধারে বিশাল কম্পাউন্ডের ভেতর তৌহরলালজির প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি।

ফি রবিবার সকালের দিকে একতলার ঢালা বারান্দায় তিনি আম-দরবার বসান। এখানে তাঁর এলাকার সব মানুষের গতিবিধি অবাধ। তারা তাঁর কাছে এদিন তাদের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতে আসে। এইভাবেই তৌহরলালজি জনসংযোগ করে থাকেন।

অন্য সব রবিবারের মতো আজও দরবার বসেছে। বারান্দার এক প্রান্তে ধবধবে ফরাস পাতা। চারিদিকে অনেকগুলো বড় বড় তাকিয়া। উরুর তলায়, বুকে, পিঠে এবং কোমরে চার-পাঁচটা তাকিয়া ঠেসে রেখে দেড় কুইন্টাল ওজনের তৌহরলালজি আধশোয়া অবস্থায় কাত হয়ে আছেন। তাঁর পরনে ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর চুস্ত। সোফা-সেট চেয়ার-টেবল বিশেষ পছন্দ করেন না তৌহরলালজি, ফরাস টরাসে হাত-পা ছড়িয়ে তিনি বেশ আরাম বোধ করেন। সব ব্যাপারেই পুরনো ফিউডাল চালটাকে তিনি বজায় রেখেছেন।

এই মুহূর্তে তাঁকে ঘিরে ফরাসে তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ লোকজন বসে আছে। এরা আসলে মোসাহেবের দল। পিপরগঞ্জের মানুষ তাদের সম্বন্ধে যা বলাবলি করে তা হল—পা-চাটা কুত্তার পাল।

বারান্দার অন্য প্রান্তে ঢালা শতরঞ্চি পাতা। সেখানে গরিব-গুর্বো-আনপড় কিছু মানুষ। এরা প্রার্থীর দল। তৌহরলালজির কাছে কোনো না কোনো আবেদন নিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে বসে আছে রাজেশ—রাজেশ ঝা। তেইশ চব্বিশ বছরের টগবগে তাজা একটি যুবক। পলকহীন সে তৌহরলালজির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একটা মাঝবয়সী কুঁজো ধরনের লোক প্রার্থীদের নাম লিখে তৌহরলালজির কাছে রেখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁর হুকুম মতো নম্বর অনুযায়ী একেক জনকে ডাকছে। কামতালাল, চৌধারি দুসাদ, বজরঙ্গী, মহাদেও, রামনগিন ইত্যাদি।

নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে একেক জন উঠে জোড়হাতে সোজা তৌহরলালজির কাছে চলে আসে। মাথাটা শ্বেতপাথরের বারান্দায় ঠেকিয়ে বলে, 'হুজৌর নমস্তে—' তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করেই থাকে এবং ওইভাবেই তাদের অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি শুনিয়ে যায়।

কারো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না টাকার অভাবে। এখন হুজৌর যদি কৃপা করে কিছু ব্যবস্থা করেন, সে চিরকাল তাঁর কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। কারো গাঁয়ে রাস্তা নেই, রাস্তা করে দিতে

হবে। কারো পড়শি জোর করে তার জমির গম কেটে নিয়ে গেছে, তাকে হুজুরের শায়েস্তা করতে হবে, ইত্যাদি।

রাজা-মহারাজার স্টাইলে হাত তুলে সবাইকে ভরসা দিয়ে যাচ্ছেন তৌহরলালজি। কাউকেই নিরাশ করছেন না। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, এই অঞ্চলের তাবত মানুষের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। এম. এল. এ হবার পর সবাই তাঁকে কল্পতরু ঠাউরে নিয়েছে।

দূরে বসে একনাগাড়ে এত লোকের অভাব এবং দুঃখের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্তি বোধ করছিল রাজেশ। তা ছাড়া, তৌহরলালজির রাজকীয় ব্যাপার স্যাপার দেখে ভেতরে ভেতরে বিরক্তও হচ্ছিল। এই লোকটা, পোস্ট ইণ্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়ট, স্বাধীনতার জন্য একটা আঙুলও তোলেনি। অবশ্য তার পক্ষে এটুকুই বলা যায়, চল্লিশ সালে যার জন্ম এবং সাতচল্লিশে যার বয়স মাত্র সাত তার পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কী করেই বা সম্ভব? এটা মেনে নিলেও বড় আকারের একটা প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীনতার পর মানুষের জন্য, দেশের জন্য কী করেছেন তিনি? একটা ঘষা পয়সাও নিজের পকেট থেকে খরচ করেন নি। যৌবনের গোড়ায় ছিলেন দুর্ধর্ষ লম্পট। মেয়েঘটিত ব্যাপারে কত বার ফেঁসে যেতে যেতে স্রেফ পয়সার জোরে যে বেঁচে গেছেন!

পরে অবশ্য 'আওরত' সংক্রান্ত দোষটা কেটে যায়। তখন তাঁর নজর পড়ে টাকার ওপর। অঢেল অর্থ জমানোর পর এম. এল. এ হয়ে নিজের একটি সম্ভ্রান্ত ইমেজ তৈরি করতে চেষ্টা করছেন।

রাতারাতি দেশপ্রেমী বনে যাওয়া এই মানুষটাকে, যাঁর কোনো স্যাক্রিফাইস নেই, জনগণের জন্য একটা আঙুলও যে কোনোদিন তোলে নি—মনে মনে ঘৃণা করে রাজেশ। তবু যে তৌহরলালজির কাছে তাকে কৃপাপ্রার্থী হয়ে আসতে হয়েছে তার কারণ রামনাথ ঝা। রামনাথ রাজেশের বাবা।

এখানে, তৌহরলালজির আম দরবারে আসার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না রাজেশের। রামনাথই একরকম জোর করে তাকে তৌহরলালজির কাছে পাঠিয়েছেন। অথচ এটা তাঁর পক্ষে একসময় অভাবনীয়ই ছিল।

রামনাথ একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। জীবনের প্রায় সিকি ভাগ ইংরেজের জেলে কেটে গেছে তাঁর। মেরুদণ্ডটি ইস্পাতের তৈরি। কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি, কখনও কারো কাছ থেকে সামান্য সুযোগ নেন নি। দুঃখ, নির্যাতন এবং অনটনের মধ্যেও এই সমুন্নত মানুষটি মাথা নোয়ান নি।

স্বাধীনতার পর নির্যাতিত দেশপ্রেমিকদের যে তাম্রপত্র দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে তিনি তা গ্রহণ করেন নি। এমনকি পেনশনও নেন নি। সবিনয়ে হাতজোড় করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'দেশের জন্যে কাজ করেছি, সে কি কিছু পাব বলে? দয়া করে আমাকে লোভী করে তুলবেন না। একটা কিছু পেলে আরো বড় কিছু পেতে ইচ্ছে করবে। আমি সেটা একেবারেই চাই না।'

সেই মানুষটি এখন প্রায় শয্যাশায়ী। বোঝাই যাচ্ছে, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। সারা জীবন যিনি ইস্পাতের মতো শক্ত শিরদাঁড়া খাড়া রেখেছেন, এই শেষ সময়ে তাঁকে মাথা নোয়াতে হল। তার কারণ রাজেশ।

নিজের জন্য জীবনে যিনি কিছুই চান নি, কারো কাছে হাত পাতেন নি, নিজের মর্যাদাকে কখনও কোনো কারণে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেননি, শেষ পর্যন্ত তিনিই রাজেশের জন্য

তৌহরলালজির কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য রাজেশের জন্য কোথাও চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া।

রাজেশ বছরখানেক আগে বি. এ পাস করে বসে আছে। নানা জায়গায় গাদা গাদা দরখাস্ত পাঠিয়েও চাকরি টাকরি তো দূরের কথা, ইন্টারভিউ পর্যন্ত পায় নি। অবশ্য অ্যাপ্লিকেশনে বাবার নামের জায়গায় রামনাথ ঝা'ই শুধু লিখে দিয়েছে। তিনি যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং নির্যাতিত দেশসেবক, সে সব আদৌ উল্লেখ করে নি। বাবুজির নাম ভাঙিয়ে কোনোরকম অনুগ্রহ চায় না রাজেশ।

রামনাথ বুঝতে পারছিলেন, তদ্বির ছাড়া রাজেশের চাকরি হবে না। এর জন্য জোরালো খুঁটি দরকার। তাঁর দিন তো শেষ হয়ে এল। তারপর রাজেশের কী হবে? ছেলের ব্যাপারে তিনি এতই শঙ্কিত যে জীবনের শেষ সময়ে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজটি করে বসলেন। রাজেশ অবশ্য আপত্তি করেছিল, কিন্তু রামনাথ শোনেন নি।

চিঠি পাওয়ার পর তৌহরলালজি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছেন। রামনাথকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি জানিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর কাছে রাজেশকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। তাঁর চিঠি পাওয়ার পর একরকম তাড়া দিয়েই রাজেশকে এখানে পাঠিয়েছেন রামনাথ।

রাজেশের ডাক পড়ে সবার শেষে। সে কাছে যেতেই তৌহরলালজি যথেষ্ট খাতির করে বলেন, 'বোসো বেটা, বোসো।'

রাজেশ লক্ষ করল, অন্য কোনো উমেদার বা দর্শনার্থীকে বসতে বলেন নি তৌহরলালজি। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজেদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে গেছে। তাকে আলাদাভাবে যে এই খাতিরদারি করা হচ্ছে রামনাথের কারণে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না রাজেশের। ফরাসের এক কোণে চুপচাপ বসে পড়ে সে।

তৌহরলালজি এবার বেশ ব্যস্তভাবে একটা নৌকরকে দিয়ে প্রচুর লাড্ডু, নিমকিন এবং উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই আনিয়ে রাজেশকে বলেন, 'খা লেও বেটা।'

বিব্রতভাবে রাজেশ বলে, 'না না, এ সবের দরকার নেই। আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।'

'এই প্রথম আমাদের কোঠিতে এলে। একটু মুহ্‌মিঠা না করলে মনে খুব কষ্ট হবে। খাও, খাও—'

ফের আপত্তি জানালে অনেক কথা শুনতে হবে। তাই একটা লাড্ডু এবং ঠাণ্ডাই-এর গেলাস তুলে নেয় রাজেশ।

তৌহরলালজি এবার বলেন, 'তোমাকে আগেই ডাকা উচিত ছিল। তবু অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হল। কারণটা কী জানো?'

প্রশ্ন না করে রাজেশ মুখ ফিরিয়ে তৌহরলালজির দিকে তাকায়।

তৌহরলালজি থামেননি। সমানে বলে যান, 'কারণটা তুমি আমার আপনা আদমী। ঐরু-গৈরু-ভৈরুদের (রামা-শ্যামা-যদু-মধু অর্থাৎ অতি সাধারণ মানুষ) সামনে তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা নেই। সেই জন্যে ওদের বিদায় করে দিলাম।'

রাজেশ উত্তর দেয় না।

কাত হয়ে থাকতে থাকতে এবার ধীরে ধীরে উঠে বসেন রামনাথ। একটা নৌকর দৌড়ে তার পিঠের দিকে আরো গোটাকতক তাকিয়া সাজিয়ে দেয়। তিনি সেগুলোর ওপর ঠেসান দিয়ে রাজেশের দিকে ঝোঁকেন। বলেন, 'রামনাথজি, মানে তোমার বাবুজি আমাদের গৌরব।

কান্ত্রির জন্যে কত বছর তিনি জেলে কাটিয়েছেন। এরকম ত্যাগী দেশপ্রেমী সারা দেশে দু'চারজনের বেশি জন্মান নি। হোল ইন্ডিয়া তাঁর জন্যে গর্বিত। তবু আমাদের গর্বটা অন্য সবার থেকে বেশি, কেননা তিনি আমাদের এই এলাকার মানুষ।' তোড়ে কথা বলার পর কিছুক্ষণ দম নিয়ে ফের শুরু করেন তৌহরলালজি, 'রামনাথজি আমাকে চিঠি দিয়েছেন। আমারই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করা উচিত ছিল। লেকেন যাই নি বিশেষ একটা কারণে। আমি চাইছিলাম তুমি এখানে আসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

রাজেশ অবাক হয়ে যায়। তৌহরলালজিকে পিপরগঞ্জের রাস্তায় দূর থেকে দেখলেও তাঁর সঙ্গে আলাপ টালাপ হয় নি। আলাপের কোনো হেতুও ছিল না। সে রাঁচিতে মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছে। ছুটিছাটায় পিপরগঞ্জে আসত। শুনেছে, দু'একবার নাকি তৌহরলালজি তাদের বাড়ি এসেছেন। তবে তার সঙ্গে কোনোবারেই দেখা হয়নি।

রাজেশ বলে, 'আমার সঙ্গে কী জরুরি কথা?'

রহস্যময় হেসে তৌহরলালজি বলেন, 'সব বলব। তার আগে একটা খবর দিয়ে রাখি।'

'কী?'

'পাটনা আর জামশেদপুরে বড় বড় চার পাঁচজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সঙ্গে তোমার নৌকরির ব্যাপারে কথা বলেছি। সবাই তোমাকে তাঁদের কোম্পানিতে পেতে চান। এক মাসের ভেতর তোমার নৌকরি হয়ে যাবে। কোম্পানিগুলোর নাম বলে দেব। কোথায় কাজ করবে, সেটা রামনাথজির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নিয়ো।'

এত বড় একটা খবর শোনার পরও রাজেশ কোনোরকম উচ্ছ্বাস দেখায় না। সে চুপ করে থাকে।

তৌহরলালজি বলেন, 'কি, খুশি তো?'

ভদ্রতার খাতিরে কিছু একটা উত্তর দিতে যাবে, সেই সময় হঠাৎ রাজেশের মনে পড়ে যায় রামনাথ ঝা'র মতো একজন নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধেয় দেশপ্রেমিককে তার জন্য জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তৌহরলালের মতো একজন অসৎ ধান্দাবাজ লোকের কাছে হাত পাততে হয়েছে। এক ধরনের গ্লানিতে তার মন ভরে যাচ্ছিল।

তৌহরলালজি জবাবের জন্য অপেক্ষা করেন না। বলেন, 'চাকরির ব্যাপারটা হয়ে গেল। এবার জরুরি কথাটা বলি।'

তৌহরলালের বলার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যাতে ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যায় রাজেশ।

তৌহরলাল বলতে থাকেন 'কথাটা বলছি এই কারণে যে তোমরা হলে আমার আপনজন। রামনাথজি ইচ্ছা করলে অন্য কাউকে তোমার নৌকরির জন্যে বলতে পারতেন। তবু কৃপা করে আমাকে বললেন কেন? কারণ উনি আমাকে নিজের লোক মনে করেন।'

এত ধানাই পানাই ভালো লাগছিল না রাজেশের। শান্ত, নিস্পৃহ মুখে সে বলে, 'যা বলার বলুন না—'

তৌহরলালজি গলা খাঁকরে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। তারপর বলেন, 'নিশ্চয়ই শুনেছ তিন চার মাস পর চুনাও আসছে?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলায় রাজেশ।

'এবার ইলেকশানে লড়াইটা খুব জোরদার হবে। শুনছি একজন হরিজন ক্যান্ডিডেট এবং একজন মাইনোরিটি কমিউনিটির ক্যান্ডিডেট এবার চুনাওতে নামছে। এখানে মুসলিম আর

শিডউল্ড কাস্টের প্রচুর ভোট রয়েছে। দুই ক্যান্ডিডেটেরই যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স। ওরা মুসলিম আর হরিজন ভোট পুরোটাই প্রায় টেনে নেবে। এতকাল এই ভোটগুলোর ওপর ভরসা করেই আমি জিতে এসেছি। আমার প্রবলেমটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

রাজেশ জবাব দেয় না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শুধু।

তৌহরলাল ফের বললেন, 'আমাকে এই সমস্যা থেকে একমাত্র বাঁচাতে পারেন তোমার বাপুজি।'

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভুরু কুঁচকে যায় রাজেশের। সে জিগ্যেস করে, 'কিভাবে?'

'তিনি এখানকার সব চেয়ে রেসপেক্টেড পার্সন। হরিজন হোক, কাস্ট হিন্দু হোক, মুসলিম, ক্রিশ্চান, আদিবাসী, যাই হোক না, রামনাথজি যাকে যা বলবেন চোখ বুজে সে তাই করবে। পাবলিকের কাছে ওঁর ভাবমূরত, মতলব ইমেজের তুলনা হয় না। তা ছাড়া উনি আমার এত বড় আপনজন—ওয়েল উইশার।'

সমস্ত ব্যাপারটা এবার জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় রাজেশের কাছে। সে বলে, 'আপনি চাইছেন বাপুজি হরিজন আর মুসলিমদের মহল্লায় গিয়ে আপনার হয়ে ক্যামপেন করুন—এই তো?'

তৌহরলালের সমস্ত মুখ হাসিতে চকচক করতে থাকে। রাজেশের একটা হাত ধরে বলেন, 'তুমি ঠিক ধরেছ বেটা। তবে রামনাথজি অসুস্থ মানুষ। তাঁকে রোজ রোজ ঘোরাতে চাই না। স্রিফ একদিন গাড়িতে করে উনি আমাদের সঙ্গে পিপরগঞ্জের নানা এলাকায় ঘুরবেন। স্রিফ একটা দিন। তাতেই আমার কাজ হয়ে যাবে।'

হিসেবটা চমৎকার কষে নিয়েছেন তৌহরলাল। কি মসৃণভাবেই না তিনি রামনাথকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে চাইছেন! তুখোড় ফন্দিবাজ লোকটাকে দেখতে দেখতে শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় রাজেশের, মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে, 'আপনি আমার নৌকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। বাপুজি আপনাকে ইলেকশানে জিতিয়ে দেবেন। এইরকম একটা প্ল্যান বোধহয় আপনার মাথায় রয়েছে, তাই না?'

রাজেশের কথায় কোথাও কি সূক্ষ্ম খোঁচা রয়েছে? একটু থতিয়ে যান তৌহরলাল। তারপর হালকা চালে স্নেহময় অভিভাবকের মতো বলেন, 'নটি বয়। ব্যাপারটা মোটামুটি ঠিকই ধরেছ।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার বাপুজির সঙ্গে এখন রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।'

'জানি বৈকি, নিশ্চয়ই জানি।'

'এর আগের বার একজন ক্যান্ডিডেট বাপুজিকে গিয়ে ধরেছিল তাঁর হয়ে চুনাও-এর মিটিংয়ে কিছু বলার জন্যে। বাপুজি তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন।'

'তুমি ওই জগ্গিলাল সহায়ের কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'রামনাথজি ওকে ভাগিয়ে দিয়ে খুব ভালো করেছেন। জগ্গিলাল একটা জঘন্য লোক—জানবর য্যায়সা। অ্যান্টি-সোশাল, ভ্রষ্টাচারী।'

'সে ঠিক আছে। কিন্তু যিনি রাজনীতি করেন না তাঁকে আপনার ক্যামপেনে টেনে আনা ঠিক হবে না।'

তৌহরলাল অমায়িক হেসে বলেন, 'আমার কথা আলাগ। ওই যে বললাম আমি তোমাদের আপনজন—স্রিফ মেরে আপনে।'

স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রাজেশ। তারপর বলে, 'আপনাকে এবার একটা কথা বলি। আমার নৌকরির দাম হিসেবে ইলেকশানে বাপুজিকে কাজে লাগাতে চাইছেন। এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমার নৌকরির দরকার নেই। আচ্ছা চলি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রাজেশ। তারপর পেছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বারান্দা থেকে নিচে নেমে সোজা গেটের বাইরে চলে আসে।

তার জন্য রামনাথ অনেকটাই নিচে নেমেছেন। এই শেষ বয়সে বাপুজিকে আর নামাতে পারবে না রাজেশ। তাঁর মর্যাদা তাকে রাখতেই হবে।

খাঁচা

বাংলা-বিহার সীমান্তের কাছাকাছি পুরনো নোংরা মফঃস্বল শহরের একধারে এই পাড়াটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। চোয়াড়ে ক্ষয়াটে হতচ্ছাড়া চেহারার কুড়ি পঁচিশটা মেয়েমানুষ এখানকার বাসিন্দা। সারাটা দিন তারা ঘুমিয়ে কি নিজেদের মধ্যে এলোমেলা গল্প করে কাটিয়ে দেয়। সূর্য ডুবে গেলে জলো কালির মতো ফিকে অন্ধকার যখন নামে, সেই সময় এই মেয়েমানুষেরা নরকের খাসমহলে একের পর এক সন্ধ্যাবাতি জ্বেলে দেয়।

পাড়া আর কি, মাঝখানে চৌকো বড় একটা উঠোনকে ঘিরে টানা ব্যারাকের মতো ক'টা বাড়ি। সেগুলোর মাথায় ভা ঙাচোরা টিনের চাল। দেওয়াল আর মেঝে অবশ্য পাকা। তবে প্ল্যাস্টার খসে কবেই দেওয়ালগুলোর নোনা-ধরা ইট বেরিয়ে পড়েছে। সিমেন্ট চটে গিয়ে ঘরের মেঝে এবড়োখেবড়ো।

ব্যারাকগুলোর সামনের দিকে ঘুণে-কাটা নড়বড়ে একটা দরজা। ওটা দিয়েই এ পাড়ায় ঢুকতে হয়। প্রায় গোটা দিনই দরজাটা বন্ধ থাকে, সন্ধে হলেই হাট করে খুলে দেওয়া হয়। ওটার এমন হাল যে জোরে ধাক্কা দিলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তবু সদর দরজা বলে কথা। একটা ধোঁকার টাটি তো খাড়া রাখতেই হয়।

ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর আগে, সেই যুদ্ধের সময় এই ব্যারাকগুলো ছিল আমেরিকান টমিদের ছাউনি। যুদ্ধ থামলে তারা চলে যায়। তারপর বেশ কিছুদিন ব্যারাকগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। স্বাধীনতার সাত আট বছর বাদে এই মফঃস্বল শহরের আড়তদার জনৈক হর্ষনাথ কুণ্ডু ওগুলো কিনে মেয়েদের পাড়া বসায়। লোকটা দূরদর্শী। সে বুঝতে পেরেছিল, ধানচালের ব্যবসার চেয়ে মেয়েদের নিয়ে এই কারবারে অনেক বেশি পয়সা।

পাড়াটা এখন আর হর্ষনাথের হাতে নেই। সাতাত্তর বছর বয়সে বাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার পর কেষ্টভামিনী দাসীকে 'লিজ' দিয়ে দেয় সে।

কেষ্টভামিনী তার পঞ্চান্ন বছর বয়স, এক কুইন্টাল ওজনের বিপুল শরীর, বাজখাঁই গলা আর প্রচণ্ড দাপট নিয়ে ব্যারাকেই থাকে। সে এখানকার 'বাড়িউলি' এবং এতগুলি মেয়ের পাহারাদার। এই পাড়াটা তার খাস তালুক, তার হুকুম ছাড়া এখানে কোনো কিছু হওয়ার জো নেই।

যুদ্ধের আমলে ব্যারাকগুলোর ভেতরে পার্টিসান ওয়াল ছিল না। হর্ষনাথ পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল তুলে অগুনতি খুপরি বানিয়ে দিয়েছিল। মেয়েদের জন্য মাথাপিছু একখানা করে খুপরি। রান্নাবান্নাও তারই মধ্যে। খুপরিগুলোর সামনে দিয়ে টানা বারান্দা চলে গেছে।

উঠোনের একধারে তিনটে বাঁধানো কুয়ো। কুয়োগুলোর গা ঘেঁষে ছোট ছোট ক'টা খোপ, সামনের দিকে পুরনো চট ঝোলানো। এগুলোতে স্নানের ব্যবস্থা।

এই প্রাচীন শহরের ডান দিকে মাইল তিনেক গেলে বড় মাপের তিন চারটে কয়লাখনি। বাঁ দিকে চার মাইল দূরে ক'বছর হল বিরাট লোহার কারখানা বসেছে, কারখানাটা ঘিরে গড়ে উঠেছে বেশ বড় মাপের নতুন টাউনশিপ।

কাজেই মেয়েপাড়ার ব্যবসা রমরম করে চলছে। সন্ধে হতে না হতেই কয়লা-খনি আর কারখানার দিক থেকে মাতাল আর লম্পটের ঝাঁক এখানে হানা দিতে শুরু করে। ভদ্রলোকদের ক্বচিৎ কখনও এ পাড়ায় দেখা যায়। এখানকার খদ্দেরদের বেশির ভাগই চোর জোচ্চোর ফেরেববাজ গুণ্ডা বদমাস ইত্যাদি।

সবে আশ্বিনের শুরু। গোটা বর্ষার জলে ধুয়ে শরতের আকাশ ঝকঝক করছে। মনে হয়, মাথার ওপর আদিগন্ত ফ্রেমে কেউ যেন পালিশ-করা একখানা নীল আয়না বাঁধিয়ে রেখেছে। অবশ্য এ কোণে সে কোণে পেঁজা তুলোর মতো ভারহীন সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝির ঝির করে অদৃশ্য স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে সুখদায়ক বাতাস।

এখন ভরদুপুর। সমস্ত চরাচর জুড়ে শরতের নরম মায়াবী রোদ ছড়িয়ে আছে।

এই দুপুরবেলায় মেয়েপাড়াটা ঝিম মেরে পড়ে থাকে। চারিদিক সুনসান। গাছপালার মাথায় বা ব্যারাকগুলোর চালে কাকেদের কর্কশ চিৎকার, ফাঁকে ফাঁকে ঘুঘুর ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

এ পাড়ার বাসিন্দা বেশির ভাগ মেয়েই রাঁধাবাড়া এবং খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে টানা ঘুম লাগাচ্ছে। দু-চারজন ঢালা বারান্দায় গোলোকধাম আর লুডোর ছক পেতে বসেছে।

দক্ষিণ দিকের ব্যারাকের টানা বারান্দার একেবারে শেষ মাথায় একটা বড় পাখির খাঁচা ঝুলছে। ভেতরে দাঁড়ের ওপর বসে আছে একজোড়া সবুজ টিয়া। তাদের ছোলা খাওয়াতে খাওয়াতে বুলি শেখাচ্ছে যমুনা, 'বল পিরিতের আঠা।'

পাখি দু'টোকে অনেক কথা শিখিয়েছে যমুনা। যেমন, 'রসের নাগব', 'সাতকেলে ভাতার' কিংবা 'শয়তানের ছানা'। একটাও ঠাকুর দেবতার নাম শেখায়নি সে। যমুনার ধারণা, তাদের এই নরকে ভগবান টগবান কোনোদিন ঢুকবে না। কাজেই ঠাকুর দেবতার মহিমাকীর্তন শিখিয়ে কী লাভ?

'পিরিতের আঠা' শব্দ দু'টো ঘাড় বাঁকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে জোড়া টিয়া কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারে না। গরর্র্ গরর্র্ করে অদ্ভুত আওয়াজ করে যায়। কথাটা তাদের গলায় বসানো একদিনের কাজ নয়, পাখিদের বোল শেখাতে প্রচুর ধৈর্য এবং সময় দরকার।

এবার যমুনার দিকে তাকানো যেতে পারে। তার বয়স তেইশ চব্বিশ। এ পাড়ার আর সব বাসিন্দাদের থেকে সে অনেকটাই আলাদা। অন্য মেয়েদের গাল এর মধ্যেই ভেঙে গেছে, চোয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে হাড়। তাদের চোখের তলায় তিন পোঁচ করে গাঢ় কালি। গায়ের চামড়া খরখরে, দৃষ্টি ঘোলাটে, গাঁট পাকানো আঙুল, বিড়ি টেনে টেনে ঠোঁট কালচে। লালিত্য বলতে তাদের মধ্যে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কেউ যেন তাদের শরীরের সবটুকু শাঁস শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিক থেকে যমুনা যেন এ পাড়ার কেউ নয়। এখানকার জীবনযাপনের অল্পস্বল্প ছাপ পড়লেও সে বুঝিবা তাজা নিষ্পাপ যুবতীই থেকে গেছে। মুখখানা ভরাট, মাথাভর্তি প্রচুর চুল, চমৎকার স্বাস্থ্য। গায়ের চামড়া মসৃণ, চোয়াল বা কণ্ঠার হাড় চামড়ার তলা থেকে অন্যদের মতো এখনও ফুটে বেরোয় নি। সে বিড়ি বা পানদোক্তা খায় না, দাঁতগুলো তার ধবধবে সাদা।

যমুনার সব আকর্ষণ তার চোখে। এমন বড়, টানা টানা, নরম চোখ ক্বচিৎ দেখা যায়। এই জঘন্য নর্দমায় পড়ে থাকলেও তার বাছ-বিচার আছে, পছন্দ-অপছন্দ আছে। যাকে তাকে সে নিজের ঘরে ঢোকায় না। দেখে বা কথা বলে যদি ভালো না লাগে, তাকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না যমুনা। অথচ তাকে ঘিরে সন্ধের পর ভনভনে পোকার মতো ভিড় লেগে যায়।

যমুনার নাম শুধু চোর জোচ্চোর মাতাল লম্পটরাই জানে না, দূরের টাউনশিপ আর কয়লাখনি এলাকায় যে সব ভদ্রলোকেরা রয়েছে তাদের কাছেও তার খবর কিভাবে যেন পৌঁছে গেছে। মাঝরাতে চারিদিক ঘুমের আরকে ডুবে গেলে লুকিয়ে চুরিয়ে, চাদরে মুখ ঢেকে এদের কেউ কেউ যমুনার ঘরের দরজায় এসে টোকা দেয়।

এখানে যারা আসে তারা সবাই প্রথমে চায় যমুনাকে। তাকে না পেলে অন্য কথা। এজন্য বাকি মেয়েরা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে, প্রতি মুহূর্তে হয়তো মনে মনে যমুনার মৃত্যুকামনা করে। নরকেও প্রতিদ্বন্দ্বী কম নেই।

নিঝুম দুপুরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে আচমকা কোথায় যেন মাইক বেজে ওঠে। এক মনে পাখিদের বোল শেখাতে শেখাতে চমকে ওঠে যমুনা। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ব্যারাকের সামনে ধুলোভর্তি রাস্তার খানিকটা দেখা যায়। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সেদিকে তাকায় যমুনা। তার চোখে পড়ে একটা সাইকেল রিকশা আস্তে আস্তে উত্তর থেকে দক্ষিণে আয়রন অ্যান্ড স্টীল ফ্যাক্টরির টাউনশিপের দিকে চলেছে। দু'টো অল্প বয়সের ছোকরা পাশাপাশি উঁচু সিটে বসে আছে। তাদের একজনের হাতে ছোট মাইক। মুখের কাছে মাইকটা তুলে ধরে সে একটানা বলে যাচ্ছে, 'মায়েরা বোনেরা দাদারা ভাইয়েরা, আগামীকাল শুক্রবার 'মোহিনী' সিনেমায় নতুন ছবি 'মনের মানুষ' শুরু হচ্ছে। এতে আছেন মহানায়ক বরুণ সমাদ্দার, নায়িকা স্বপ্নসুন্দরী দীপান্বিতা। এঁদের সঙ্গে পাবেন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভিলেন নরেশ মুৎসুদ্দিকে। নাচে আছেন মিস বিজয়লক্ষ্মী টি—বম্বে। এ ছবিতে বিজয়লক্ষ্মীর নাচ দেখলে মনে হবে এক জাদুনগরীতে চলে গেছেন। এছাড়া রয়েছে আরো বিখ্যাত বিখ্যাত সব শিল্পী। হরেন বিশ্বাস, মধু গোস্বামী, সোনালি বটব্যাল, মণি সান্যাল, এমনি অনেকে। কাল দলে দলে, সবান্ধবে, সপরিবারে, কাচ্চাবাচ্চাসুদ্ধ 'মোহিনী' সিনেমায় চলে আসুন। 'মনের মানুষ' দেখে দিল খুশ করে যান। আপনি যেমনটি চান, এ ছবি ঠিক তা-ই। মনে রাখবেন, পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের টিকিট লাগে না।' একটু থেমে, দম নিয়ে ফের নতুন উদ্যমে শুরু করে ছোকরা, 'আপনাদের এই সঙ্গে একটা সুখবর দিই, কাল বেলা তিনটেয় ম্যাটিনি শো'য়ে উপস্থিত থাকবেন স্বপ্নসুন্দরী দীপান্বিতা আর 'মনের মানুষ' ছবির পরিচালক ভারতবিখ্যাত অমরেশ চৌধুরি। এই দু'জনকে দেখার সুযোগ হারাবেন না। মনে রাখবেন জীবনে সুযোগ একবারই আসে, দু'বার নয়।'

সাইকেল রিকশাটার সামনে পেছনে একপাল ছেলেমেয়ে জুটে গেছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

মাইক হাতে ছোকরাটার পাশে আরেকটি যে যুবক বসে আছে সে সমানে রঙিন হ্যান্ডবিল বিলি করে যাচ্ছে।

মাইকে ছোকরাটি নতুন করে 'মনের মানুষ'-এর আরো মহিমা কীর্তন শুরু করে দিয়েছিল

কিন্তু পরিচালক অমরেশ চৌধুরীর নামটা শোনার পর অন্য কিছুই যমুনার কানে ঢুকছে না, চারপাশের দৃশ্যাবলী ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে যেন।

একসময় সাইকেল রিকশাটা অনেক দূরে চলে যায়। মাইকের শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে। এতক্ষণ পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ছিল যমুনা, এবার আস্তে আস্তে গোড়ালি নামিয়ে সামনের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দূরমনস্কর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

অমরেশ চৌধুরীর নাম কত দিন বাদে শুনল সে? পরিষ্কার মনে আছে—ঠিক দু'বছর। গেল বারের আগের বার আশ্বিন মাসে, পুজোর আগে আগে অমরেশ চৌধুরী তার বিরাট ইউনিট নিয়ে এই শহরে 'মনের মানুষ' ছবির শুটিং করতে এসেছিল। তার সঙ্গে যমুনার জীবনযাপনের কোনোরকম মিল নেই। তারা পরস্পরের অচেনা, বহু দূরের আলাদা আলাদা পৃথিবীর মানুষ। তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না, তবু অদ্ভুতভাবে আলাপটা হয়ে গিয়েছিল।

অমরেশকে নিয়ে ভাবনাটা বেশিদূর এগোয় না। সদর দরজায় কর্কশ আওয়াজ করে কড়া নড়ে ওঠে, সেই সঙ্গে গণেশের সর্দি-বসা ভারি গলা ভেসে আসে, 'অ্যাই, দোর খোল—'

যান্ত্রিক নিয়মে রোজ এই সময়টা গণেশ এসে সদরের কড়া নাড়ে। জানা সত্ত্বেও যমুনা এমনই অন্যমনস্ক ছিল যে আওয়াজটায় চমকে ওঠে।

এদিকে বারান্দার ও মাথায় যে মেয়েরা গোলোকধাম খেলছিল তাদের একজন দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে। গণেশ ভেতরে ঢুকতেই মেয়েটা আবার খিল আটকে দেয়।

গণেশের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। পেটানো লোহার পাতের মতো তার শরীর। দরজার পাল্লার মতো চওড়া বুক, হাত পায়ের হাড়গুলো মোটা মোটা আর মজবুত, ছড়ানো মাংসল কাঁধ, চৌকো ভারী মুখ। গালে এবং হাতে লম্বা কাটা দাগগুলো বুঝিয়ে দেয় লোকটা মারাত্মক।

গণেশের পরনে চাপা নীল প্যান্ট আর বোতামহীন রং-চটা হাফ শার্ট, পায়ে টায়ার-কাটা চটি। লোকটা এ পাড়ার দালাল, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এখানকার বাসিন্দাদের রক্ষাকর্তা। বাড়িউলি কেষ্টভামিনী দাসীর সে ডান হাত এবং নানা ঝঞ্ঝাটে প্রধান অস্ত্র।

কেষ্টভামিনীর যে ধরনের ব্যবসা তাতে যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে এখানে হামলা হতে পারে। নিয়মিত যারা এ পাড়ায় হানা দেয় সেই সব চোর জোচ্চোর হারামজাদারা যখন তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের ধাতস্থ করার জন্য গণেশের মতো একজন জবরদস্ত জেনারেল দরকার।

চেহারা যেমনই হোক, গণেশের কথাবার্তায় ব্যবহারে একটা সাদাসিধে আন্তরিক ব্যাপার আছে, কিন্তু দরকারের সময় প্যান্টের খাঁজ থেকে পলকে দশ ইঞ্চি ফলার ছুরি বার করে ফেলে সে।

গণেশের এক হাতে একটা বড় কাপড়ের ব্যাগ, আরেক হাতে রঙিন এক গোছা কাগজ। সেগুলো 'মনের মানুষ' ছবির হ্যান্ডবিল।

যে মেয়েটা দরজা খুলে দিয়েছিল তার নাম টিয়া। সে বলে, 'আমার জন্যে বেলফুলের মালা এনেছ তো গণেশদা?'

গণেশের হাতের ব্যাগটা বেল আর জুঁইয়ের মালায় বোঝাই। এখানকার বাসিন্দাদের পক্ষে সাজগোজটা খুবই জরুরি। খাপরা-ওঠা মুখ, শিরা-বেরিয়ে-পড়া রোগা হাত আর ভাঙাচোরা শরীর সস্তা পাউডার রুজ এবং ফুলের মালায় সাজিয়ে খদ্দেরের চোখ যতটা ধাঁধানো যায়! নইলে কেউ ফিরেও তাকাবে না।

গণেশ এই মেয়েদের ফুল জোগান দেয়। সন্ধেবেলা বিকিকিনির বাজারে দাঁড়াবার আগে মেক-আপটা তো চাই। সাজতে গুজতে ঘন্টা দেড়-দুই লেগে যায়। তাই দুপুরেই ফুল নিয়ে আসে গণেশ।

ওধারে অন্য মেয়েরা অর্থাৎ বকুল গোলাপ বেলা চাঁপা রূপা মুক্তো আর পান্না গোলোকধাম আর লুডো ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। এরা সবাই জানে তাদের জন্য মালা নিয়ে এসেছে গণেশ। তবু রোজকার মতো একই প্রশ্ন করে, 'টাটকা ভালো মালা এনেছ তো?'

গণেশ অন্য সব দিনের মতোই সর্দি-বসা গলাটা নরম করে বলে, 'এনিচি বাপু, এনিচি। দু'টো বাজার চষে ভালো ভালো মাল লিয়ে এয়েচি।'

গণেশ জানে, এখানকার মেয়েগুলোর জীবনে নিত্যনতুন ঘটনা ঘটে না, কথা বলার মতো বিষয়ও অতি সামান্য। তাই রোজ একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে হয়। এতে আদৌ বিরক্ত হয় না গণেশ, ঝাঁঝিয়েও ওঠে না। পেটের জন্য এরা যেখানে এসে ঠেকেছে, প্রতিদিন যে গ্লানি আর অসম্মান গায়ে মেখে এদের ভাতকাপড় জোটাতে হয় তাতে রীতিমতো কষ্টই পায় গণেশ, দুঃখী মেয়েগুলোর জন্য অসীম সহানুভূতিতে তার মন ভরে যায়। আবার এটাও সে জানে, এরা এই নরকে না এলে তার নিজেরও পেটের ভাত জুটত না, কেননা বেশ্যাপাড়ার দালালি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কাজ সে শেখেনি।

মেয়েগুলো বলে, 'মালা দাও গণেশদা—'

গণেশ এ পাড়ায় পা দিয়েই বারান্দার এক কোণে যমুনাকে দেখতে পেয়েছিল। সে বলে, 'যমুনার সন্গে একটা দরকারি কথা সেরে তোদের কাচে আসচি। এট্টু সবুর কর।'

গোটা উঠোনটা ইট পেতে সিমেন্ট দিয়ে পয়েন্টিং করা। তার ওপর দিয়ে বড় বড় পা ফেলে গণেশ যমুনার দিকে এগিয়ে যায়।

হিংসেয় অন্য মেয়েদের চোখগুলো জ্বলতে থাকে। তারা জানে যমুনার ব্যাপারে গণেশের রীতিমতো পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। দামি দামি পয়সাওলা 'বাবু' সে তাকেই জুটিয়ে দেয়, ওর সঙ্গেই গণেশের যত জরুরি পরামর্শ। রাগে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে গেলেও গণেশের সামনে মুখ ফুটে তা বলার উপায় নেই। গণেশ যে ধরনের মানুষ, ভালোর ভালো, মন্দর মন্দ, একবার খেপে গেলে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

যমুনার কাছে এসে গণেশ বলে, 'চল, তোর ঘরে যাই। কথা আচে।'

যমুনা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখোমুখি যে ঘরখানা, সেটা তারই। গণেশের হাতে রঙিন হ্যান্ডবিল দেখে আন্দাজ করে নেয়, ঘরে গিয়ে সে কী বলবে।

নিঃশব্দে, একটি কথাও না বলে যমুনা গণেশকে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে আসে।

এখানে সব কিছু পরিপাটি করে সাজানো। এক ধারে তক্তপোশে ভাঁজহীন ধবধবে বিছানা। আরেক ধারে ছোট আলমারি, খেলো কাঠের ড্রেসিং টেবিল, সাজের টেবিলটার ওপর পাউডার রুজ আলতা সেন্ট এবং ক্রিমের রকমারি কৌটো আর শিশি। দেওয়ালে দেবদেবীর কোনো ছবি নেই, ভগবান টগবানকে নিজের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না যমুনা। দেওয়ালে অবশ্য অন্য ধরনের কিছু ছবি আছে। সেগুলো সবই প্রাকৃতিক দৃশ্যের—যেমন বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়া, নিবিড় দেবদারুর বন কিংবা সমুদ্রের বেলাভূমি।

আরেক কোণে রয়েছে একটা উঁচু টেবিল আর দু'টি চেয়ার। এই টেবলটার ওপর মলাট দিয়ে যমুনা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে বেশ ক'টি বই। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে হাল আমলের লেখকদের গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি রয়েছে উলবোনা রন্ধনপ্রণালী স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ের বই।

স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ যমুনার মতো মেয়েরা কোনোকালেই পায় না। নিজের চেষ্টায় অনেকটাই শিখেছে সে, একটু আধটু ইংরেজিও জানে।

অন্য মেয়েরা দিনের বেলায় যখন ঘুমিয়ে, গোলোকধাম আর লুডো খেলে কিংবা পরস্পরের সঙ্গে অকারণে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে সময় কাটায়, তখন হয় পাখিকে দানা খাওয়ায় যমুনা কিংবা শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। সব দিন হয়ে ওঠে না, তবে ফি রবিবার তিন চারখানা বাংলা খবরের কাগজ গণেশকে দিয়ে কেনায়। এই সব পত্রপত্রিকায় রবিবারের ম্যাগাজিনে যে সব লেখাটেখা থাকে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। এতেও অন্য মেয়েদের ঘোর আপত্তি। মুখ বাঁকিয়ে বিদ্রূপের গলায় তারা বলে, 'আচিস তো বাপু নদ্দমায় মুখ গুঁজে। বেচিস গায়ের মাংস। তার আবার বিদ্যেসাগর হবার সাধ! মুকে আগুন!'

অন্যদের মনোভাব যা-ই হোক, এই পড়াশোনার কারণে মনে মনে যমুনাকে যথেষ্ট সমীহ করে থাকে গণেশ।

যমুনা ওপাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলে, 'বোসো গণেশদা।'

ডান হাতের থলে মেঝেতে নামিয়ে রেখে চেয়ারটায় বসতে বসতে গণেশ বলে, 'আজ কী কারবার হয়েচে জানিস?' কারবার শব্দটা তার কথার মাত্রা।

যমুনা লক্ষ করে, গণেশের চোখেমুখে এবং গলার স্বরে উত্তেজনা ফুটে বেরিয়েছে। বিছানার এক কোণে আলতোভাবে বসে খুব শান্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'মনে হচ্ছে—জানি।'

কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গণেশ। তারপর বাঁ হাতে হ্যান্ডবিলগুলো উঁচুতে তুলে জিগ্যেস করে, 'এগুলো দেকেচিস?'

যমুনা জানায়, হাতে পায়নি, তবে দূর থেকে হ্যান্ডবিলগুলো দেখেছে।

গণেশ বলে, 'কোতায় দেকলি?'

কিছুক্ষণ আগে সিনেমার লোকেরা সাইকেল রিকশায় করে মাইকে চেঁচাতে চেঁচাতে এবং হ্যান্ডবিল বিলি করতে করতে যে এ পাড়ার সামনে দিয়ে গেছে তা জানিয়ে দেয় যমুনা।

হাতের হ্যান্ডবিলটা নাড়তে নাড়তে গণেশ বলে, 'এতে কী নেকা আচে জানিস?'

'পড়িনি, কিন্তু জানি। কাল থেকে 'মোহিনী' সিনেমায় 'মনের মানুষ' দেখানো হবে।'

'আরো মজা আচে, পড়ে দ্যাখ। এই ধর।'

হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডবিলটা নেয় যমুনা। কারা কারা 'মনের মানুষ' ছবিতে অভিনয় করেছে তাদের নাম কায়দা-করা বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে। তলায় আলাদা করে লাল বর্ডারের ভেতর রয়েছে পরিচালক অমরেশ চৌধুরী আর নায়িকা দীপান্বিতার নাম। জানানো হয়েছে তাঁরা কাল চারটের শো'য়ে এ ছবির উদ্বোধন করবেন।

লেখাপড়ার দিক থেকে গণেশ একেবারে আকাট। তার পেটে দশটা গুঁতো মারলেও 'ক' অক্ষর বেরুবে না। একজনকে দিয়ে খানিকক্ষণ আগে হ্যান্ডবিল পড়িয়েছে সে। এতে কী লেখা আছে, সব তার জানা। তবু যমুনাকে বলে, 'পড়ে শোনা দিকিন।'

যমুনা জোরে জোরে পড়ে যায়। শুনতে শুনতে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে গণেশের, চোখদু'টো কুঁচকে যায়। চাপা ঘড়ঘড়ে গলায় সে বলে, 'তোর নাম কোতাও লেই?'

'না।'

'ভালো করে দেকিচিস?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।'

'কী কারবার রে? অমরেশ শালার খজরামোটা বুজলি? বলেছিল না, 'মনের মানুষ' বেরুবার সোময় তোর নাম ছেপিয়ে দেবে?'

মাথা হেলিয়ে যমুনা জানায়, এইরকম একটা আশ্বাস তাকে দেওয়া হয়েছিল।

'আর কী বলেছিল?'

উত্তর দেয় না যমুনা। আস্তে আস্তে মুখটা ডান দিকে ফেরায়। সেখানে দেওয়াল ফুটিয়ে একটা জানালা বার করা হয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে ধোঁয়াটে রঙের পাহাড়ের রেঞ্জ চোখে পড়ে। কয়লাখনিগুলো ওখানেই। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে যেন দেখতে পায়, দু'বছর আগের সেই দিনগুলো অদৃশ্য সিনেমার পর্দায় ফুটে উঠছে।

অমরেশ চৌধুরিরা সেবার আয়রন ফ্যাক্টরির টাউনশিপে এসে উঠেছিল। উদ্দেশ্য এখানকার পাহাড়ের ভিসুয়ালস, কোল মাইন, আয়রন ফ্যাক্টরি ইত্যাদি ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে শুটিং করা। 'মনের মানুষ' ছবির গল্পে এসব নাকি খুবই জরুরি।

এই ছবির একটা জায়গায় নায়ক এক দেহ-পসারিণীর প্রেমে পড়বে। মেয়েটি পেটের জন্য নোংরা ঘাঁটলেও তার অন্তঃকরণ অতি পবিত্র। সে-ও নায়ককে আন্তরিক ভালোবেসেছে। কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না, এদিকে নায়কের বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছে। এই মেয়েটিও খুব ভালো, স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, অত্যন্ত পতিব্রতা। দুই নারীর প্রেম নিয়ে এ ছবিতে তীব্র নাটকীয়তা তৈরি করা হয়েছে। চরম ক্লাইমেক্সে গণিকা মেয়েটির আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটবে, ইত্যাদি।

অমরেশের মাথায় বাই চাগিয়ে উঠল সত্যিকারের একটি বেশ্যাকে দিয়ে দেহ-পসারিণীর রোলটা করাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে গণেশের সন্ধান পায়। গণেশ তাকে যমুনার কাছে নিয়ে আসে।

কলকাতা থেকে দেড় দুশো মাইল দূরে এমন বাজে নোংরা বেশ্যাপাড়ায় যমুনার মতো একটা মেয়েকে পাওয়া যাবে, ভাবতে পারেনি অমরেশ। যমুনার কথাবার্তা, আচরণ মুগ্ধ করেছিল তাকে। যে মেয়েটিকে ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারে মানাতো সে কিনা নর্দমায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে! অমরেশ মনস্থির করে ফেলেছিল, তার ছবির গণিকার রোলটা যমুনাকে দেবে। সেদিনই কনট্রাক্ট করে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে গিয়েছিল।

যমুনা চমকে দিয়েছিল অমরেশ এবং তার ইউনিটকে। যে মেয়েটা কোনোদিন কড়া আর্ক ল্যাম্পের আলোয় ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায়নি সে চমৎকার অভিনয় করে গেছে। যেভাবে তাকে দাঁড়াতে বা সংলাপ বলতে কিংবা মুখচোখের বিশেষ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে বলা হয়েছে তক্ষুনি হুবহু তা-ই করেছিল যমুনা। একটি শটও এন জি হয়নি, নষ্ট হয়নি এক সেন্টিমিটার ফিল্মও। একবারেই প্রতিটি দৃশ্য ওকে হয়েছিল।

যমুনার মধ্যে এক দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী লুকনো ছিল। তাকে আবিষ্কার করতে পেরে দারুণ উত্তেজিত অমরেশ। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে সে চাপা গলায় বার বার বলেছে 'দেখবে, এই ছবি রিলিজ হলে তোমার খুব নাম হবে। রাতারাতি তুমি ফেমাস হয়ে যাবে।'

ফেমাস শব্দটার মানে যমুনার অজানা নয়। দারুণ ভালো লেগেছিল তার, আবার লজ্জাও পাচ্ছিল। তবে এই প্রশংসা এবং সুখ্যাতি তাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তার পা মাটিতেই ছিল। সে কী, এই পৃথিবীতে তার সঠিক জায়গাটি কোন আবর্জনার মধ্যে, এক মুহূর্তের জন্যও তা ভোলেনি যমুনা। নতমুখে, নখ খুঁটিতে খুঁটিতে আধফোটা গলায় বলেছে, 'আমার কথা আপনি সবই জানেন। আমাদের মতো মেয়েদের আবার নাম!'

অমরেশ যমুনার কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ গলায় বলেছে, 'নিজেকে এত ছোট ভাবো কেন?

ইচ্ছে করে তো আর ওই হেল-এ যাওনি। এই সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে, বিশেষ করে মেয়েদের নষ্ট করে দিচ্ছে। আমাদের সোশাল প্যাটার্নই এর জন্যে দায়ী।'

সমাজ-ব্যবস্থা ট্যবস্থার মতো ভারী ভারী ব্যাপারগুলো ভালো করে মাথায় ঢোকেনি যমুনার। কিন্তু অমরেশের বলার মধ্যে এমন আন্তরিকতা এবং গাঢ় গভীর সহানুভূতি ছিল যা তাকে আমূল নাড়া দিয়ে গেছে। তার মতো মেয়েদের সম্বন্ধে এভাবে আগে আর কাউকে বলতে শোনেনি। মনুষ্যজাতির যে ওঁচা প্রতিনিধিরা রাতের অন্ধকারে তার কাছে হানা দেয় তারা হল চোর জোচ্চোর খুনি মাতাল ফেরেববাজ ধর্ষণকারী ছেনতাইওলা, ইত্যাদি। এরা সবাই মিলে মানুষ সম্পর্কে তার ধারণা প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। মানুষকে সে বিশ্বাস করে না, এদের সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধা নেই। এ জাতীয় মনোভাব সত্ত্বেও অমরেশকে ভালো লেগে গিয়েছিল। সে যাদের চেনে, প্রতিদিন রাতে এসে মানুষ সম্পর্কে তার অশ্রদ্ধা বিরূপতা এবং বিদ্বেষকে যারা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে যায় অমরেশ তাদের কেউ নয়। সে যেন এক অলৌকিক নিষ্পাপ জগতের বাসিন্দা, অপার্থিব কোনো নিয়মে যমুনার কাছে চলে এসেছে।

অমরেশ ফের বলেছে, 'তুমি যে পাড়ায় থাকো, এইরকম সব এলাকা থেকে কত বড় বড় ফিল্ম আর স্টেজের আর্টিস্ট বেরিয়েছে জানো?' বাংলা নাটক ও সিনেমার আদি যুগে কলকাতার বেশ্যাপাড়ার কোন কোন মেয়ে শিল্পী হিসেবে সারা দেশে মাতিয়ে দিয়েছিল তাদের লম্বা তালিকা মুখস্থ বলে গিয়েছিল অমরেশ। সেই সঙ্গে জানিয়েছে, 'এরা আমাদের গর্ব।'

মুগ্ধ হয়ে শুনে গেছে যমুনা।

অমরেশ এবার বলেছে, 'তোমার মধ্যে কী দারুণ ব্যাপার আছে, জানো না। আমার পরের ছবিতে তোমাকে আরো বড় রোল দেব। দু-একটা ছবি রিলিজ করলে প্রোডিউসার আর ডিরেক্টররা তোমার কাছে লাইন লাগাবে।'

এ সব অলীক ঘটনা তার মতো মেয়ের জীবনে যে ঘটতে পারে না, এ রকম পরিষ্কার ধারণা যমুনার ছিল। তবু অমরেশের কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছিল তার, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা হচ্ছিল। সে বলেছে, 'আমার কাছে এ সব স্বপ্ন।'

অমরেশ বলেছে, 'জানো তো আমরা ড্রিম মার্চেন্ট।'

কথাটার অর্থ জানত না যমুনা। সে জিগ্যেস করেছে, 'মানে?'

অমরেশ বলেছে, 'সপনোকা সওদাগর।' একটু থেমে আবার শুরু করেছে, 'সওদাগর না বলে স্বপ্নের ফেরিওলা বলতে পার। আমরা ফিল্মের মধ্যে স্বপ্ন ঢুকিয়ে ফেরি করে বেড়াই।'

যমুনা দারুণ বুদ্ধিমতী। সে বলেছে, 'কিন্তু সে স্বপ্ন কি সত্যি হয়?'

'না। তবে তোমার বেলায় হবে।'

বেশ কয়েকদিন ধরে শুটিং চলেছিল। এর ভেতর মাঝে মাঝেই লুকিয়ে চুরিয়ে স্টীল ফ্যাক্টরির টাউনশিপ থেকে এসে যমুনার কাছে রাত কাটিয়ে গেছে অমরেশ।

কত মানুষই তো এসেছে তার জীবনে। এরা মানুষ না, আগাপাশতলা জন্তু। সেই প্রথম অমরেশের মধ্যে তার কাম্য পুরুষটিকে যেন পেয়ে গিয়েছিল যমুনা। কথায়বার্তায়, ব্যবহারে এমন সুন্দর, সহৃদয়, সহানভূতিশীল মানুষ আগে আর কখনও দেখেনি সে।

দিন দশেক এ অঞ্চলে কাটিয়ে অমরেশ তার ইউনিট নিয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে সে জানিয়ে গেছে, খুব শিগ্‌গিরই, তার নতুন ছবিতে অভিনয় করার জন্য লোক পাঠিয়ে যমুনাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। তারপর আর তাকে পেছন দিকে ফিরতে হবে না। কলকাতা তার জন্য গোলাপ বাগান সাজিয়ে দেবে।

অমরেশ আরো বলেছিল, 'মনের মানুষ' ছবি যেখানে যেখানে রিলিজ করবে সেই সব হল-এ যমুনাকে নিয়ে গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

কিন্তু সেই যে অমরেশ তার ভেতরকার ঘুমন্ত দুরাশাকে উসকে দিয়ে চলে গিয়েছিল, তারপর দু'টো বছর কেটে গেছে। কিন্তু যমুনার কাছে সে আর লোক পাঠায়নি বা চিঠি লেখেনি কিংবা অন্য কোনোভাবেই যোগাযোগ করেনি। দু'শো মাইল দূরের মহানগর তার স্মৃতি থেকে এক ওঁচা বেশ্যাপাড়ার নগণ্য দেহ-পসারিণীকে একেবারে মুছে দিয়ে থাকবে।

ধীরে ধীরে যমুনার স্বপ্নের চড়া রং মলিন হতে হতে ঝাপসা হয়ে গেছে। অমরেশের কথা যখন সে ভুলতে বসেছে এবং ধরেই নিয়েছে এখানে নর্দমার নোংরা পোকার মতো মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হবে বাকি জীবন এবং এটাই তার অনিবার্য নিয়তি, সেইসময় খবর এল কাল 'মোহিনী' সিনেমায় অমরেশ আসছে।

যমুনা ভাবে, আয়রন ফ্যাক্টরির টাউনশিপে যখন আসবেই, তখন তার কথা কি একবারও মনে পড়বে না অমরেশের? ম্রিয়মাণ ক্ষীণ একটু আশা কোথায় যেন চাপা পড়ে ছিল। হঠাৎ সেটা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। অমরেশ কোনো কারণে তাদের পাড়ায় না আসতে পারলেও লোক পাঠিয়ে তাকে কি আর ছবি দেখার জন্য নিয়ে যাবে না? সে কথা দিয়ে গিয়েছিল, ছবি যেখানেই রিলিজ করবে সেখানেই যমুনাকে নিয়ে যাবে। অন্য কোথাও রিলিজ করছে কিনা সে জানে না। কিন্তু যমুনা এ অঞ্চলের বাসিন্দা, 'মনের মানুষ'-এ বড় একটা 'রোল' করেছে, তা ছাড়া এখানে ছবিটা রিলিজ করছে। তাকে খবর না দিয়ে পারবে না অমরেশ। সে —

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই গণেশ বলে ওঠে, 'ওই শালা তোকে বলেছিল না, সিনেমায় হিরো-ইন ফিরো-ইন বেনিয়ে দেবে?'

যমুনা চমকে গণেশের দিকে তাকায় । এই নরকে একমাত্র এই একটি লোককেই সে খানিকটা বিশ্বাস করে। নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা তাকে বলে। অমরেশের কথাও তাকে জানিয়েছিল।

যমুনা আধফোটা গলায় বলে, 'হ্যাঁ, বলেছিল।'

'তারপর খজড়াটা এ ধার মাড়ায়নি। সপনো ফপনো দেকিয়ে রাত্তিরে এসে মধুটি ঠিক লুটে লিয়ে গেচে। ওকে ছাড়বি নি যমুনা।'

'তুমি কি আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলছ?'

'যদি লিজে থিকে না আসে কি খপর না দেয়, নিঘ্ঘাত দেকা করবি।'

'দেখি।'

'দেকি লয়, যা বলচি তা-ই করবি। শালাকে ছাড়া হবে না।' বলতে বলতে কাপড়ের থলে থেকে দু'গাছা জুঁইয়ের মোটা মালা বার করে টেবলের ওপর রাখে গণেশ, 'এই তোর মালা রইল। আমি একন যাই।'

গণেশ চলে যায়।

দুরাশা আর আশাভঙ্গের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে যমুনা।

পরদিন সকাল থেকেই সে টের পায়, অদ্ভুত এক উত্তেজনা তার মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে। বেলা যত চড়ে সেটা ক্রমশ বাড়তেই থাকে।

কিছুক্ষণ পর পরই বারান্দায় এসে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে পাঁচিলের ওপারের রাস্তাটার দিকে তাকায় যমুনা। এই বুঝি 'মোহিনী সিনেমা' থেকে অমরেশের লোক এল। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত অনেক বার বারান্দায় ছোটাছুটি করেও কারো দেখা পাওয়া গেল না।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে কোনোরকমে স্নান সেরে, চাট্টি চাল ফুটিয়ে খেয়ে নেয় যমুনা। খেতে খেতে মনস্থির করে ফেলে, গণেশের কথামতো আর কিছুক্ষণ দেখে সে নিজেই 'মোহিনী সিনেমা'য় চলে যাবে।

বেলা একটু হেলে গেলে নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে সাজতে বসে যমুনা। চুল বেঁধে খোঁপায় যখন রুপোর কাঁটা গুঁজছে সেই সময় আয়নায় তার মুখের পাশে কেষ্টভামিনীর চাকার মতো গোল মাংসল মুখ ফুটে ওঠে। সে চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে।

যমুনা বেশ অবাক হয়েই ঘুরে বসে। কেষ্টভামিনী এই পাড়ারই পুব দিকের দু'খানা বড় ঘর নিয়ে থাকে এবং তার এই সাম্রাজ্যটি প্রবল দাপটে চালিয়ে যায়। দুপুরবেলায় ঝাড়া তিন-চার ঘন্টা সে পরিপাটি দিবানিদ্রা দিয়ে থাকে। আজ সেটি স্থগিত রেখে কেন যে কেষ্টভামিনী তার কাছে হানা দিয়েছে, বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে যমুনা।

কেষ্টভামিনীও কম অবাক হয়নি। এ পাড়ার মেয়েরা সেই পড়ন্ত বেলায় সাজগোজ করতে বসে। এই তো সবে দুপুর পেরুল। এর মধ্যে যমুনার সাজার কারণ সে বুঝতে পারে না।

একসময় যমুনা বলে, 'তুমি কেষ্টমাসি! আজ ঘুমোও নি যে?'

কেষ্টভামিনী তার বিপুল শরীর এবং সর্বাঙ্গে দু তিন কেজির মতো জমকালো সোনা-রুপোর গয়না নিয়ে হেলেদুলে ঘরে ঢুকে থপ করে যমুনার কাছে বসে পড়ে। বলে, 'শুয়ে তো ছিলুম। চোখও বুজে এসেছিল, কিন্তু ঘুমুতে দিলে কই? তা তুই সাত তাড়াতাড়ি সাজতে বসেছিস যে?'

যমুনা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই কেষ্টভামিনী ফের বলে ওঠে, 'সাজচিস, ভালোই করচিস। আগরওলা লোক দিয়ে গাড়ি পেঠিয়েচে। ঢ্যামনাটা আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে বিছানা থেকে তুলে ছাড়লে। তাড়াতাড়ি সেজেগুজে লে, লোকটার সন্‌গে বেরুতে হবে।'

আগরওলা কোল মাইন অঞ্চলের বড় ব্যবসাদার। ধানকল, কোল্ড স্টোরেজ ছাড়াও সাইকেলের বড় ডিলার। বেশির ভাগ সময় কলকাতায় কাটায়। সেখানেও তার প্রচুর ব্যবসা। মাঝে মধ্যে এখানে এলে যমুনাকে তার চাই-ই। কয়েকটা রাতের জন্য তার কাছে যমুনার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

আগরওলা লোকটা ভালো। বাইরের মেয়ে নিয়ে যারা ফুর্তি ফার্তা করে তাদের হল 'ফেল কড়ি মাখ তেল'। কিন্তু যমুনা সম্পর্কে আগরওলার আলাদা একটা টান আছে। সেটা তার ভালো ব্যবহার, সুন্দর রুচি এবং চেহারার স্নিগ্ধ লাবণ্যের কারণে। যমুনার জন্য অঢেল পয়সাও খরচ করে সে। শুধু যমুনাই না, আগরওলা তাকে ইচ্ছামতো পাওয়ার জন্য কেষ্টভামিনীকেও সন্তুষ্ট রাখে। ভালো পয়সা সে-ও পেয়ে থাকে। কাজেই আগরওলার ডাক যখন এসেছে, কেষ্টভামিনী দুপুরের ঘুমটি শিকেয় তুলে ছুটে এসেছে। অন্য কেউ এসময় এলে চিৎকার এবং খিস্তিখেউড়ে তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দিত।

এদিকে আগরওলার নাম শুনে চমকে উঠেছে যমুনা। তার যে ধরনের ব্যবসা তাতে এইরকম খদ্দেররা লক্ষ্মী। আগরওলা সম্পর্কে তার খানিকটা দুর্বলতাও আছে। আর যাই হোক, এখানে যারা রোজ সন্ধেয় হানা দেয় সে তাদের মতো জন্তু নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন দূরবর্তী মোহময় এক স্বপ্ন আবছা সংকেতের মতো চোখের সামনে ফুটে উঠতে শুরু করেছে তখন আগরওলার গাড়ি পাঠানো তাকে অস্থির করে তোলে। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটে যায়।

যমুনা বলে, 'আগরওলার লোককে ফিরিয়ে দাও মাসি।'

হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়ছিল কেষ্টভামিনী। ফের আস্তে আস্তে বসে পড়ে। ভুরু এবং কপাল কুঁচকে যায়, চোখের দৃষ্টি খর হয়ে ওঠে। সে বলে, 'কী বলচিস লা ছুঁড়ি, আগরওলার নোককে ফিরিয়ে দেব! মাতাটা কি তোর খারাপ হয়ে গেল!'

যমুনা বলে, 'আমি আজ আগরওলার ওখানে যেতে পারব না। আমার অন্য কাজ আছে।'

কেষ্টভামিনীর ভেতর থেকে এবার জবরদস্ত বাড়িউলি প্রবল প্রতাপে বেরিয়ে আসে। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলে, 'কী এমন রাজকায্য শুনি!'

'আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'কোতায়?'

যমুনা উত্তর দেয় না। কেষ্টভামিনীকে খানিকটা অগ্রাহ্য করেই দুই ভুরুর মাঝখানে একটি গাঢ় গোলাপী টিপ আঁকতে থাকে।

রাগে কেষ্টভামিনীর নাকের পাটা ফুলে ওঠে। গলায় মাংসের থাকগুলি কাঁপতে থাকে। আগের স্বরেই আবার বলে, 'কথার জবাব দিচ্চিস না যে?'

যমুনা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'মোহিনী সিনেমায়।'

'অ, তা হলে ওরা যা বলাবলি করচে সেটাই ঠিক। সিনেমার সে-ই ছোঁড়াটা সেবার এসে তোর মাথা খেয়ে গিয়েচিল। শুনলাম, আজ ফের আসচে। 'মোহিনী হল'-এ কী সব হবে। শ্যামের বাঁশি শুনতে পেয়েচিস বুঝিন?'

যমুনা উত্তর দেয় না।

কেষ্টভামিনী জানে যমুনা তার হাতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। এখানকার আর দশটা হতচ্ছাড়া চেহারার ছুকরির সামনে যেভাবে দাপট দেখানো যায়, যমুনার সঙ্গে সবসময় তেমনটি চলবে না। যমুনা যদি তার চোখে ধুলো দিয়ে কোনোদিন ফুড়ুৎ করে, তার এই মেয়েপাড়া একেবারে কানা হয়ে যাবে। যমুনাকে দেখিয়ে কত টাকা যে সে কামিয়ে থাকে একমাত্র সে-ই জানে। কাজেই তার সঙ্গে খুব হিসেব করে কথা বলতে হয়। কখনও গরম, কখনও নরম।

কেষ্টভামিনী এবার যমুনার পিঠে একখানা হাত রেখে গলায় যতখানি সম্ভব মায়া ঢেলে বলে, 'ও সব তাল ছাড় যমুনা। কলকাতায় থাকে ওই ছোঁড়া। চেনা নেই, জানা নেই, দু'দিনের জন্যি এসে তোর মাতাটা বিগড়ে দিয়ে গেল। ওর খপ্পরে পড়লে তোর কী সব্বনাশ করবে, কোথায় লিয়ে ভাসিয়ে দেবে, তার কি কিচু ঠিকঠিকানা আচে!'

যেন মেয়েমানুষ হিসেবে যমুনার সর্বনাশের কিছু বাকি আছে এবং এখনও সে ভেসে যায় নি! মনে মনে হেসেই ফেলে সে আর গভীর মনোযোগে টিপটা এঁকে যায়।

কেষ্টভামিনী বলে, 'কি রে, আমার কতা কানে গেল?'

নিচু গলায় যমুনা উত্তর দেয়, 'গেছে।'

সংশয়ের গলায় কেষ্টভামিনী জিগ্যেস করে, 'তা হলে আগরওলার ওকেনেই যাচ্চিস তো?'

'না।'

'ওই সিনেমার ছোঁড়াটার কাচেই যাবি?'

'তাই তো ভেবেছি।'

'আমি যে গলায় রক্ত তুলে তোকে বোজালাম, তার ফল হল এই?'

যমুনা চুপ।

একটা চোখ ছোট করে কিছু ভাবে কেষ্টভামিনী। পঁচিশ বছর এই মেয়ে-পাড়া চালাচ্ছে। এখানকার ছুকরিদের মনস্তত্ত্ব তার নখের ডগায়। এতক্ষণ পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণীর মতো যমুনাকে

বুঝিয়েছে। এখন নিজের আসল মূর্তিটা অদৃশ্য খাপের ভেতর থেকে বার করে আনে। এক ঝটকায় বিশাল শরীরটা টেনে তুলে কোমরে হাত রেখে, চোখ লাল করে, চিৎকারে খিস্তিতে সমস্ত পাড়াটাকে তটস্থ করে তোলে।

'খজরী-মাগী, পাকনা গজিয়েচে! হয় আগরওলার গাড়িতে উটবি, লইলে লাতি মেরে একেন থিকে বার করে দেব। মালপত্তর গুচিয়ে লে।'

কেষ্টভামিনী যেন বড় রকমের এক জুয়ায় বাজি ধরে বসে। সে জানে, এখান থেকে চলে যাবার ঝুঁকি নেওয়া এই মুহূর্তে যমুনার পক্ষে খুব সহজ নয়। অবশ্য সিনেমার সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হলে মেয়েটা কী করবে, সেটা আগে থেকে বলা যায় না। ঝোঁকের মাথায় মানুষ কত কী-ই তো করে বসে! তার সঙ্গে দেখাটাই করতে দেবে না কেষ্টভামিনী।

আগরওলা ঠিক সময়েই লোক পাঠিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আগরওলার গাড়িতেই উঠতে হয় যমুনাকে। কেষ্টভামিনীর মেয়েপাড়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারে না।

পেছনের সিটের আরামদায়ক নরম গদিতে বসে আছে যমুনা। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে উমাপদ। লোকটাকে অনেকদিন ধরেই চেনে যমুনা। আগরওলার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে বছরে আট-দশ বার এসে সে এই মেয়ে-পাড়া থেকে তাকে নিয়ে যায়। আগরওলার প্রতি তার আনুগত্য প্রায় কুকুরের মতো।

উমাপদর বয়স চল্লিশের ওপরে। ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা মজবুত চেহারা। গায়ের রং ঘোর কালো। গোল মাংসল মুখে বসন্তের দাগ। ট্যারাবাঁকা দাঁত পান-জর্দার চিরস্থায়ী কালচে রঙে ছোপানো। ডান গালে একটা বড় আঁচিল, থ্যাবড়া থুতনি। পরনে ফিনফিনে ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। তলায় জালি-কাটা গোলাপি গেঞ্জি। গলায় সোনার চেন।

চেহারা যেমনই হোক, উমাপদ মানুষটা খারাপ নয়। নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে তার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে।

কোল মাইনের দিকে যেতে যেতে উমাপদ ঘাড় ফিরিয়ে জিগ্যেস করে, 'এবার অনেকদিন পর তোমায় লিয়ে যাচ্চি।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল যমুনা। অন্যমনস্কর মতো সে জবাব দেয়, 'হুঁ।'

'আগরওলাজি তিন মাস ইদিকে আসেন নি, তাই তোমাদের একানে আমারও আসা হয়নি।'

'হুঁ।'

'তুমি ভালো আচো তো দিদি?'

কিছু ভাবছিল যমুনা। হঠাৎ সে মনস্থির করে ফেলে। সামনের দিকে ঝুঁকে বলে, 'উমাপদদা আমার একটা কথা রাখবে?' তার চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে অসীম ব্যগ্রতা।

উমাপদ বেশ অবাকই হয়। বলে, 'কী?'

'আগরওলাজির ওখানে যাবার আগে একবার 'মোহিনী সিনেমা'টা ঘুরে যেতে চাই।'

'সে তো উলটোদিকে, সেই লোহা ফ্যাক্টরির টাউনে।'

'হ্যাঁ।'

'অতটা ঘুরে গেলে দেরি হয়ে যাবে যে দিদি। আগরওলাজি খেপে যাবেন।'

'আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলব।'

দ্বিধান্বিতভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকে উমাপদ। তারপর জিগেস করে, 'মোহিনী সিনেমা'য় জরুরি কাজ আচে?'

যমুনা মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'অন্য একদিন ওটা করলে হয় না?'

'না।'

'ঠিক আচে, তোমাকে আমি লিয়ে যাচ্চি, কিন্তুন যত তাড়াতাড়ি পার কাজটা চুকিয়ে ফেল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার চিন্তা নেই।'

অগত্যা উমাপদ ড্রাইভারকে গাড়ির মুখ ঘুরিযে লোহা কারখানার টাউনশিপের দিকে যেতে বলে।

'মোহিনী সিনেমা'য় পৌছে দেখা যায়, চারিদিকে প্রচন্ড ভিড়। সামনের কোলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটার মাথায় 'হাউস ফুল' বোর্ড। জন পনেরো কুড়ি আর্মড পুলিশ গেটের বাইরে পাহারা দিচ্ছে। হল-টার সারা গায়ে 'মনের মানুষ' ছবির বিরাট বিরাট হোর্ডিং। সেগুলোতে হিরো বরুণ সমাদ্দার, হিরোইন দীপান্বিতা, ড্যান্সার বিজয়লক্ষ্মী টি, ভিলেন নরেশ মুৎসুদ্দির বড় বড় রঙিন ছবি। তা ছাড়া টাইপ ক্যারেক্টার আর্টিস্ট মধু গোস্বামী, সোনালি বটব্যাল, হরেন বিশ্বাসের ছবি রয়েছে। কিন্তু কোথাও যমুনার ছবি বা নাম দেখা যায় না।

গাড়ি থেকে নেমে মানুষের থিকথিকে ভিড় ঠেলে গেটের কাছে চলে আসে যমুনা। পুলিশ তাকে আটকে দেয়।

যমুনা বলে, 'ডিরেক্টর অমরেশ চৌধুরি কি এসেছেন?'

পুলিশ জানায়, শুধু অমরেশ চৌধুরিই না, নায়িকা দীপান্বিতাও পৌছে গেছেন।

যমুনা বলে, 'অমরেশ চৌধুরি সঙ্গে আমি একটু দেখা করব। বিশেষ দরকার।'

পুলিশ জানায়, দেখা হওয়া সম্ভব নয়। এখন আর কাউকে ভেতরে যেতে দেবার হুকুম নেই।

হাতজোড় করে বার বার অনুরোধ জানায় যমুনা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেটের ওধারে 'মোহিনী সিনেমা'র ম্যানেজার নকুলেশ চট্টরাজ ব্যস্তভাবে এখানকার কয়েকজন এমপ্লয়িকে হাত নেড়ে নেড়ে কী সব বলছে। লোকটাকে অনেক দিন ধরেই চেনে যমুনা। মাঝরাতে প্রায়ই তার ঘরে হানা দেয় সে।

যমুনা খানিকটা ভরসা পায়। একমাত্র নকুলেশই ইচ্ছা করলে গেটের তালা খুলে দিতে পারে। প্রায় বেপরোয়া ভঙ্গিতেই সে গেটের আরো কাছে গিয়ে ডাকে, 'নকুলেশবাবু।'

নকুলেশ তাকে দেখে চমকে ওঠে। রাতে যার ঘরে লুকিয়ে চুরিয়ে যাওয়া যায়, দিনের আলোয় লোকজনের সামনে তাকে দেখে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের মতো সে বলে, 'কী ব্যাপার? কাকে চাই?'

'অমরেশ চৌধুরির সঙ্গে একবার দেখা করব। দু মিনিটের বেশি কথা বলব না।'

মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে কর্কশ গলায় নকুলেশ বলে, 'না, এখন দেখা হবে না।' বলে আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে ভেতরের দিকে উধাও হয়ে যায়।

হতাশ বিপর্যস্ত যমুনা বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে ফের আগরওলার গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

পাড়ি

কিষুণপুরা উত্তর বিহারের ছোট্ট একটি শহর। এ অঞ্চলের লোকজনেরা বলে 'টৌন'।

শহর আর কী! ধুলো বোঝাই কয়েকটা এবড়ো খেবড়ো খোয়ার রাস্তা, হতচ্ছাড়া চেহারার টালি বা টিনের চালের সারি সারি ঘর, কাঁচা নর্দমার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা, অলিতে গলিতে শিবমন্দির কি বজরঙ্গবলীর মূরত, টাঙ্গা, সাইকেল রিকশা, গৈয়া কি ভৈসা গাড়ি—এইসব নিয়ে শহর কিষুণপুরা উত্তর বিহারের এক কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

বছর দেড়েক আগে 'বিজলি' এসেছে এবং একটা মিউনিসিপ্যালিটিও আছে এখানে। কিন্তু এ শহরের মানুষ এতই গরিব আর এমনই হাভাতে যে তাদের বেশির ভাগেরই ঘরে রাত্তিরে এখনও আবহমান কালের সেই কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলে। কচিৎ দু-একটা বাড়িতে বিজলি বাতি দেখা যায়। তবে সন্ধের পর রাস্তায় রাস্তায় টিমটিমে ইলেকট্রিকের আলো চোখে পড়ে। রাত ন'টার পর সেগুলো অবশ্য নিবিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু কিষুণপুরায় পুব দিকের শেষ মাথায় এলে যে কেউ চমকে যাবে। গোটা শহরটার ছোঁয়া বাঁচিয়ে এখানে চতুর্বেদী বা চৌবেদের বিশাল তেতলা বাড়ি। প্রায় দু' একর জায়গা ঘিরে উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল, বাড়িটা ঠিক তার মাঝখানে। সামনের গেটে গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে ভোজপুরি দারোয়ানেরা দিনরাত পাহারা দেয়। বাড়িটার ছাদে রয়েছে রামসীতা মন্দির, সেটার চূড়া দেড় দু'মাইল দূর থেকেও নজরে পড়ে।

চৌবেরা কিষুণপুরা, শুধু কিষুণপুরাই বা কেন, আশপাশের পঞ্চাশ-ষাট মাইলের মধ্যে সবচেয়ে বড় জমিমালিক।

এই শহরের দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে মাঠ। মাঝখান দিয়ে একটা নহর বা খাল সোজা চলে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। তার এক ধারে ফসলের খেত, আরেক ধারে বালি আর কাঁকরে-ভরা পড়তি জমি। দু'ধারের শস্যক্ষেত্র এবং বাঁজা মাঠ—এ সবই চৌবেদের।

ফাল্গুন মাস শেষ হয়ে এল।

ক'দিন আগে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তৌহর হোলির মাতামাতি শেষ হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আরো কিছুদিন এখানে বসন্তের সুখদায়ক ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে যাবার কথা। কিন্তু আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা মুশকিল। ফাল্গুন শেষ হতে না হতেই এখানে গরম পড়ে গেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উলটোপালটা লু-বাতাস চারিদিকে ঘোড়া ছোটাতে থাকে।

এখন দুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। প্রবল আক্রোশে সেটা গনগনে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্যের দিকে তাকালে চোখ যেন ঝলসে যাবে।

কিছুক্ষণ আগে কিষুণপুরা টাউন থেকে বেরিয়ে একটা বয়েল গাড়ি দক্ষিণ দিকের বাঁজা মাঠের ওপর দিয়ে এখন এগিয়ে চলেছে। গাড়িটার তেলহীন চাকা থেকে কর্কশ ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ বেরুতে থাকে।

মাঠটা আড়াআড়ি চিরে একটা ভাঙাচোরা রাস্তা অনেক দূরে হাইওয়েতে গিয়ে ঠেকেছে। রাস্তা আর কী! বছরের ন'মাস ওটা হাঁটুভর ধুলোয় ডুবে থাকে, বৃষ্টির তিনটে মাস সেই ধুলো থকথকে গলা মাংসের মতো হয়ে যায়।

বয়েল গাড়িটা চালাচ্ছে মাঝবয়সী ভিরগুরাম। রোগা ক্ষয়াটে চেহারা তার। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। গালে খাপচা খাপচা কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখ এক আঙুল ভেতরে ঢোকানো। পরনে তালি-মারা ময়লা জামা, কোমরে নেংটির মতো এক ফালি ন্যাকড়া, মাথায় রোদ ঠেকাবার জন্য ঢাউস পাগড়ি। তার সারা শরীরে অভাব আর উপোসের ছাপ।

ভিরগুরামের বয়েল দু'টোর হালও তারই মতো। তেমনই হাড়-বার করা, তেমনই কমজোর। প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে কোনোরকমে গাড়িটা টেনে নিয়ে চলেছে জন্তু দু'টো।

পরপর তিন বছর এ অঞ্চলে মারাত্মক খরা চলছে। ফসল প্রায় কিছুই হয়নি। এমন অজন্মা চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও চোখে দেখেনি। ইদানীং মানুষের হাতে পয়সা নেই। কাজেই মাল বা সওয়ারি বওয়ার জন্য কে আর ভিরগুরামকে ডাকবে! তার কামাই সিকিভাগে নেমে গেছে। এখন তার যা রোজগার তাতে নিজের এবং বয়েল দু'টোর দু'বেলা পেটের দানা জোটানো প্রায় অসম্ভব। বেশির ভাগ দিনই তাদের আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়, কোনো কোনো দিন পুরো উপোস। ফলে তাদের শরীরে সারবস্তু আর কিছু নেই।

এই প্রচণ্ড রোদে গাড়ি বার করে বয়েল দু'টোকে কষ্ট দেবার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না ভিরগুরামের। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। কেননা আজ চার দিন পর বিষুণগঞ্জে সে ভাড়া পেয়েছে।

মাঠের ওপারে যে হাইওয়ে সেটা ধরে আরো খানিকটা দক্ষিণে গেলে বিষুণগঞ্জ বাজার। ওখানকার এক কাঠগোলার মালিকের ছেলের আজ শাদি। বর এবং ছ'জন বরযাত্রী নিয়ে ভিরগুরামকে যেতে হবে আরো দু' মাইল দূরের এক দেহাতে। ভাড়া মিলবে পঁচিশ টাকা, সেই সঙ্গে ভরপেট উৎকৃষ্ট ভোজন এবং বয়েল দু'টোর জন্য চানা খোল আর ভুসি। এই দুঃসময়ে কেউ যখন তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না তখন এতগুলো টাকা ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। রোদে পুড়ে খাক হয়ে গেলেও গাড়ি নিয়ে তাদের বেরুতেই হয়।

জ্বলন্ত আকাশটা গলা কাঁসার রং ধরে আছে। যেদিকে যতদূর নজর যায়, আগুনের হলকার মতো গনগনে রোদ। মনে হয়, একসঙ্গে হাজারটা চুলা জ্বলছে চারপাশে। কোথাও একটা পাখি টাখি চোখে পড়ে না। অনেক দূরে কালো কালো ফুটকির মতো দু'চারটে ভৈসা কি বয়েল গাড়ি দেখা যায়। ক্বচিৎ এক-আধটা মানুষ। ভিরগুরামের গা বেয়ে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আলজিভ পর্যন্ত মুখের ভেতরটা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে যেন। তার বয়েল দু'টোর গালের কষ বেয়ে গাঁজলা বেরুতে শুরু করেছে, তাদের আরক্ত চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন। মনে হয়, যে কোনো মুহূর্তে জন্তু দু'টো মুখ থুবড়ে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে।

ভিরগুরাম বুঝতে পারে তার প্রাণী দু'টোর জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। তবু ভরসা দেবার জন্য গভীর স্নেহে বলে, 'চুন্নুয়া মুন্নুয়া, আজ বহোৎ ধুপ (রোদ), থোড়েসে তখলিফ কর। বিষুণগঞ্জে গিয়েই তোদের গলা পর্যন্ত দানা খাওয়াব। ঘাবড়াও মাত।'

দুনিয়ায় কেউ নেই ভিরগুরামের। দশ বছর আগে এখানে পর পর চার সাল ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। খরার সময় যেমন রোজগার বন্ধ, বানের সময়ও সেই একই হাল। মাল বা সওয়ারি বওয়ার জন্য ভিরগুরামের ডাক আসে না। সেবার বানের সময় তার ঘরবালী একটা কম বয়েসের ছোকরার সঙ্গে ধানবাদ পালিয়ে যায়। মানুষ কদ্দিন আর উপোস দিতে পারে!

থাকার মধ্যে কিষুণপুরার এক কোণে টুটো ফুটো টিনের চালের ছোট একটা ঘর রয়েছে ভিরগুরামের। আর সঙ্গী বলতে গাড়িটানা এই বয়েল দু'টো—চুন্নুয়া মুন্নুয়া।

ঘরবালী চলে যাবার পর মানুষের সঙ্গে বিশেষ মেশে টেশে না ভিরগুরাম। তার সুখ-দুঃখের

যাবতীয় কথা চুন্নুয়া মুন্নুয়ার সঙ্গে। ভিরগুরাম কিছু বললে ওরা কান লটপট করতে করতে শুনে যায়। তার প্রতিটি কথায় এবং কাজে প্রাণীদু'টোর নিঃশর্ত সায়।

এই যে ভিরগুরাম বলল, একটু কষ্ট করে মাঠ পেরিয়ে বিষুণগঞ্জ যেতে হবে, তা-ই শুনে চুন্নুয়া মুন্নুয়া আস্তে আস্তে তাদের ঝোলা কান নাড়ে। অর্থাৎ তারা রাজি।

ভিরগুরাম এবার বলে, 'ওরা বলেছে, তোদের বঢ়িয়া ভোজন করাবে। হুঁ হুঁ, শাদি বলে কথা! যত পারবি খেয়ে নিবি—সমঝ?'

চুন্নুয়া মুন্নুয়া কান লটরপটর করে শুনে যায়।

ভিরগুরাম থামেনি, 'ওরা যা খিলাবে পিলাবে তেমনি খানাপিনা তোদের কোন জন্মে করাতে পারব, জানি না। চানা ভুসি খোল কিচ্ছু ফেলবি না। মনে রাখবি, শাদির যে ভোজ খেয়ে আসবি তারপর হয়তো তিন চার রোজ কিছুই জুটবে না। সমঝা?'

একটি মানুষ এবং দু'টি জন্তুর মধ্যে যখন এ জাতীয় কথাবার্তা চলছে, সেই সময় দূর থেকে কারো চিৎকার ভেসে আসে, 'এই রুখো, রুখো, রুখো—'

প্রথমটা খেয়াল করেনি ভিরগুরাম। কিন্তু চিৎকারটা যখন কাছাকাছি এগিয়ে আসে, তাকে পেছন ফিরতেই হয়। গাড়ির চালির ভেতর দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে, ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে একটা মেয়েমানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছে। তার দিকে চোখ রেখেই সে চুন্নুয়া মুন্নুয়াকে বলে, 'থোড়া ঠহর্ যা বেটোয়া—'

বয়েল দু'টো দাঁড়িয়ে যায়।

একটু পরেই মেয়েমানুষটি হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে এসে পড়ে। তার চোখে মুখে ভয়, আতঙ্ক। সে বলে, 'আমাকে বাঁচাও—'

দূর থেকে ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। মেয়েমানুষটি কাছে এসে দাঁড়াতেই ভীষণ চমকে ওঠে ভিরগুরাম। তাকে ভালো করেই চেনে সে—কিষুণপুরার বড় জমিমালিক বিন্ধ্যাচলী চৌবের ছোট পুতহু অর্থাৎ পুত্রবধূ। নামটাও কার কাছে যেন শুনেছিল—কৌশল্যা। কৌশল্যার শাদিতে গোটা কিষুণপুরাকে ভোজ খাইয়েছিল চৌবেরা। ভিরগুরামের মতো তুচ্ছ গাড়িওলাও বাদ পড়েনি। তখন তো দেখেছেই, তা ছাড়া শাশুড়ির সঙ্গে শিউশঙ্করজির মন্দিরে পুজো চড়াতেও বার কয়েক তাকে দেখেছে সে।

কিন্তু উত্তপ্ত লু-বাতাস যখন সমস্ত চরাচরকে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে তখন এই ফাঁকা মাঠের মাঝখানে অত বড় ঘরের বহু এভাবে দৌড়ে আসবে, নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকে।

কৌশল্যার পরনে ভালো দামি শাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু পায়ে কিছু নেই। বাঁজা মাঠের বালি এবং কাঁকরের ওপর দিয়ে ছুটে আসার কারণে পায়ের তলা ফেটে রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। জামাকাপড় এলোমেলো। জোরে জোরে শ্বাস পড়ার কারণে বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। ফর্সা মুখ এখন টকটকে লাল, চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। গলগল করে ঘামছে সে।

কৌশল্যা ভীত গলায় আবার বলে, 'আমাকে রক্ষা কর গাড়িবালা—'

এতক্ষণে ভিরগুরাম বলতে পারে, 'কা হুয়া মা'জি?'

কৌশল্যা জানায়, তার খুব বিপদ। শ্বশুরবাড়ি থেকে সে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু শ্বশুর বিন্ধ্যাচলী চৌবে তার পোষা পহেলবানদের লেলিয়ে দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে শিকারি কুত্তার মতো ওই লোকগুলো এসে তাকে টেনে হেঁচড়ে ফের শ্বশুরের কোঠিতে নিয়ে ঢোকাবে।

ভিরগুরাম ভয় পেয়ে যায়। বিন্ধ্যাচলী চৌবের মতো বিপুল শক্তিমান জামিমালিক এবং

তার পহেলবানদের হাত থেকে কৌশল্যাকে রক্ষা করার ক্ষমতা বা সাহস তার কোনোটাই নেই। কাঁপা গলায় সে আবার জিগ্যেস করে, 'কা হুয়া মা'জি?'

'পরে শুনো। শুধু এটুকু জেনে রাখো, ওরা যদি আমাকে ধরতে পারে, একেবারে শেষ করে ফেলবে।' বলতে বলতেই আচমকা পেছন ফিরে তাকিয়েই ভয়ার্ত চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওই যে ওরা আসছে।'

দ্রুত কিষুণপুরা টাউনের দিকে তাকায় ভিরগুরাম। অনেক দূরে যেখানে আগুনের হল্‌কা থিরথির করে কাঁপছে সেখানে কালো কালো ক'টা মানুষের চেহারা ফুটে ওঠে। বোঝা যায়, তারা এদিকেই ছুটে আসছে।

আতঙ্কে মুখ থেকে সব রক্ত নেমে যায় কৌশল্যার। ঝাপসা গলায় সে বলে, 'আর দেরি কোরো না গাড়িবালা, কিছু একটা কর। তুমি কি চাও, আমি খুন হয়ে যাই?'

ভিরগুরাম ভালো করেই জানে, কৌশল্যাকে সাহায্য করলে তাকে চড়া দাম দিতে হবে। বিন্ধ্যাচলীর পহেলবানেরা নির্ঘাত তাকে এই মাঠে পুঁতে রেখে যাবে। তবু তার মধ্যে কী এক প্রতিক্রিয়া যেন ঘটে যায়। ভিরগুরাম টের পায়, তার দুর্বল ভঙ্গুর শরীরে বিজলি চমকের মতো কিছু খেলে যাচ্ছে। সে বলে, 'তুরন্ত গাড়িতে উঠে পড়ুন।'

কী কারণে কৌশল্যা পালিয়ে এসেছে, কেন তার পেছনে পহেলবান লাগানো হয়েছে, কিছুই ভিরগুরামের কাছে স্পষ্ট নয়। তবু এই মেয়েটা যে অত্যন্ত বিপন্ন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাকে বাঁচাবার জন্য ভিরগুরামের মস্তিষ্কে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একটা পরিকল্পনা এসে যায়। কৌশল্যা গাড়িতে উঠে পড়লে সে বলে, 'মা'জি, চালির তলায় ক'টা পুরনো গান্ধা কাপড়া উপড়া আছে. ওগুলো গায়ে জড়িয়ে ঘুঙ্ঘট গলা পর্যন্ত টেনে বসে থাকুন। ওইসব কাপড়া গায়ে চড়ালে আপনার তখলিফ হবে। লেকিন এছাড়া উপায় নেই।'

'আমার কষ্ট হবে না।' কৌশল্যা ভিরগুরামের কথামতো নোংরা কাপড় জড়িয়ে, ঘোমটা টেনে চালির তলায় জড়সড় হয়ে বসে থাকে।

ভিরগুরাম বলে, 'আপনাকে কি কোথাও পৌঁছে দেব?'

'হাঁ। আমার বাপের কোঠি বইহারি গাঁয়ে। সেখানে যদি পৌঁছে দাও—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না ভিরগুরাম। হাইওয়েতে উঠে দক্ষিণ দিকে মাইল খানেক গেলে বিষুণগঞ্জ বাজার। কিন্তু বইহারি একেবারে উলটো দিকে। হাইওয়ে থেকে উত্তরে মাইল চারেকের পথ হল বইহারি। সেখানে কৌশল্যাকে পৌঁছে দিয়ে বিষুণগঞ্জে যেতে যেতে সন্ধে নেমে যাবে। বর আর বরযাত্রীর দল কি তার জন্য ততক্ষণ বসে থাকবে? কিন্তু কৌশল্যাকে গাড়িতে তোলার পর এসব কথা ভাবার মানে হয় না। সামনের দিকে ঘুরে বসে ভিরগুরাম বলে, 'চল রে চুন্নুয়া মুন্নুয়া। এই ধুলোর ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে কী আর হবে! মা'জি'কে জবান দেওয়া হয়ে গেছে, বইহারি পৌঁছে দেব। দিতেই হবে, না কী বলিস?'

ঝোলা কান নাড়তে নাড়তে বয়েল দু'টো আবার চলতে শুরু করে।

ভিরগুরাম বলতে থাকে, 'মা'জি'কে বইহারিতে নামিয়ে আন্ধেরা নামার আগে কি বিষুণগঞ্জে যেতে পারবি? পারবি না মনে হচ্ছে।'

প্রাণী দু'টো আগের মতোই কান নাড়ে।

ভিরগুরাম বলতে থাকে, 'তোদের আজ বহুত কষ্ট হবে। লেকেন কা করে! মা'জি'র যে বড় বিপদ!'

রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে বয়েল গাড়ি ধু ধু দিগন্তের দিকে এগিয়ে যায়।

কিষুণপুরা টাউন থেকে ভিরগুরামেরা যখন বেরিয়েছিল, সূর্য তখন সরাসরি মাথার ওপরে। এখনও একই জায়গায় সেটা অনড় দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, উত্তর বিহারের এই আদিগন্ত প্রান্তরে পৃথিবীর আহ্নিক গতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

খানিকটা যাওয়ার পর সামনের দিকে চোখ রেখেই ভয়ে ভয়ে ভিরগুরাম জিগ্যেস করে, 'একগো বাত পুছেগা মা'জি?'

কৌশল্যা দুই হাঁটুর ফাঁকে চিবুক রেখে চুপচাপ বসে ছিল। বলে, 'কী?'

'আপনি এত বড় ঘরের বহু। এভাবে চলে এলেন কেন?'

'দহেজ (পণ), স্রেফ দহেজের জন্যে।'

'দহেজ!'

'হাঁ। আমার বাপুজিকে ওরা চুষে খেয়েছে।' বলতে বলতে চমকে ওঠে কৌশল্যা। খানিকটা দূরে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় ফিসফিস করে ভীরু গলায় এবার সে বলে, 'ওই যে ওরা এসে গেল। হুঁশিয়ার—'

পলকে ঘাড় ফেরায় ভিরগুরাম। অর্ধগোলাকার চালির তলায় এখন ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে আছে কৌশল্যা। তার মাথার ওপর দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে হট্টাকট্টা চেহারার পাঁচ ছ'টা তাগড়া জোয়ান বয়েল গাড়িটার কাছে চলে এসেছে। তাদের গালে চওড়া জুলপি এবং ঠোঁটের ওপর পাকানো গোঁফ। হাতে পেতলের পটি-বসানো মজবুত লাঠি।

ওদের সবাইকেই চেনে ভিরগুরাম। চৌবেদের এই পোষা পহেলবানেরা হিংস্র জানোয়ারদের চেয়েও মারাত্মক। খুন জখম থেকে শুরু করে ঘরে আগুন লাগানো পর্যন্ত এমন কোনো কুকর্ম নেই যা বিন্ধ্যাচলী চৌবেরা ওদের দিয়ে করায় না। পহেলবানদের দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা আড়ষ্ট হয়ে যায় ভিরগুরামের। পরক্ষণেই অলৌকিক কোনো নিয়মে দুর্জয় শক্তি যেন তার ওপর ভর করে। দ্রুত সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বয়েল দু'টোর লেজ আস্তে করে মুলতে মুলতে বলে, 'চুন্নুয়া মুন্নুয়া, বহোত বিপদ। বিলকুল ডানাবালা ঘোড়া বনে যা, মা'জি'কে উড়িয়ে নিয়ে চল। উরর-র-র—উর—'

ইঙ্গিতটা যেন বুঝতে পারে বয়েল দু'টো। রোদের অসহ্য উত্তাপ এবং নিজেদের শারীরিক অক্ষমতা অগ্রাহ্য করে তারা আচমকা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে থাকে।

পেছন থেকে একটা পহেলবান বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হো গাড়িবালা, রুখ যা, রুখ যা—' বলতে বলতে সে সামনে এসে পড়ে. তার পেছন পেছন বাকি সবাই।

অগত্যা ভিরগুরাম বয়েল দু'টোকে বলে, 'আরে চুন্নুয়া মুন্নুয়া, থোড়েসে ঠহর যা। উরর-র-র-র—' তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে সে। গাড়ির গতি কমে এলে, সর্তক ভঙ্গিতে বলে, 'কা পহেলবানজি, কুছ জরুরত হ্যায়?'

পহেলবানরাও ভিরগুরামকে চেনে। সেই পহেলবানটা, যে তাকে গাড়ি থামাতে হুকুম করেছিল, এবার কর্কশ গলায় জিগ্যেস করে, 'কোনো আওরতকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছিস?'

ভিরগুরাম টের পায়, তার বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে থেকে তা বুঝবার উপায় নেই। কোনোরকমে ঢোক গিলে সে বলে, 'নেহী—'

'ভালো করে ভেবে দ্যাখ। খুবসুরত জেনানা, গায়ে জগমগ জগমগ কাপড়া, গলায় সোনার হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে করণফুল—'

'নেহী—'

আর কোনো প্রশ্ন না করে নিজেদের মধ্যে চাপা নিচু গলায় খানিকক্ষণ কী পরামর্শ করে নেয় পহেলবানেরা। একজন ভিরগুরামকে বলে, 'ঠিক হ্যায়, যা—'

'চুন্নু মুন্নু, চল বেটোয়া—' ভিরগুরামের মুখ থেকে এই কথাগুলো বেরুতে না বেরুতেই পহেলবানটার নজর এসে পড়ে চালির তলায়। তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কয়েক পা এগিয়ে এসে সে শুধোয়, 'এ কৌন হ্যায়?'

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায় ভিরগুরামের। ওরা যদি বুঝতে পারে চালির ভেতরকার আওরতটি আর কেউ নয়, বিন্ধ্যাচলী চৌবের ছোট পুতহু তা হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে কী মারাত্মক ব্যাপার ঘটে যাবে সেটা যেন চোখের সামনে দেখতে পায় ভিরগুরাম। সাঁতার না-জানা মানুষ যেমন মরিয়া হয়ে অগাধ জলে ঝাঁপ দেয় সেইভাবে রুদ্ধগলায় সে বলে, 'আমার জেনানা—'

পহেলবানটার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলে, 'শালে ভুচ্চরকা ছৌয়া, তোর জেনানা না চার সাল আগে ভেগে গেছে!' বলে চোখ কুঁচকে পলকহীন নোংরা কাপড়ে মোড়া কৌশল্যাকে দেখতে থাকে।

ভিরগুরাম ভাবে কৌশল্যার ব্যাপারে যতদূর সে এগিয়েছে তাতে আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন সামান্য একটু ভুলচুক হয়ে গেলে তার জান চলে যাবে। সে বলে, 'কাল রাত্তিরে আবার ফিরে এসেছে পহেলবানজি—'

ভিরগুরামের চোখেমুখে এমন সারল্য রয়েছে যে তাকে হুট করে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। তাছাড়া কিষুণপুরায় সৎ ভালোমানুষ হিসেবে তার কিঞ্চিৎ সুনামও রয়েছে। পহেলবান এবার বলে, 'ঠিক বলছিস?'

'হাঁ, পহেলবানজি—' বলেই ভিরগুরাম টের পায়, তার বুকের ভেতরটা ভয়ে উথলপাথল হয়ে যাচ্ছে। আগে আর কখনও এমন বিরাট ঝুঁকি নিয়ে এ জাতীয় মিথ্যে বলেনি সে।

পহেলবানটা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে যা বলে তা এইরকম। নিজের যে জরুকে এক লুচ্চা বদমাশ ভাগিয়ে নিয়ে চেটেপুটে খেয়েছে, সেই এঁটো পাতেই কিনা মুখ নামিয়ে দিল ভিরগুরাম! ঘেন্না বলে তার মধ্যে কি কিছুই নেই! জানবর কাঁহিকা!

ভিরগুরাম আকাশের দিকে দু' হাত তুলে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'কা করে, ভগোয়ানকা মর্জি।'

এবার পহেলবানেরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় জরুরি কিছু আলোচনা সেরে নেয়। তারপর ভিরগুরামকে 'যা শালে, ভুচ্চরকে ছৌয়া' বলে মাঠের ওপর দিয়ে ঝলসানো দিগন্তের দিকে ছুটে যায়।

এত সহজে বিপদ কেটে যাবে, ভাবা যায়নি। ভিরগুরাম গলার ভেতর বিড় বিড় করে, 'হো শিউশঙ্করজি, তেরে কিরপা।' তারপর বয়েল দু'টোর লেজ মুচড়ে বলে, 'চল বেটোয়া—' ফের গাড়ি চলতে শুরু করলে পেছন ফিরে চালির দিকে তাকায়। হাতজোড় করে, অপরাধীর মতো মুখ করে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলে, 'মা'জি, আমার কসুর মাপ করবেন। আপনার সম্বন্ধে যা বলেছি, সিধা নরকে চলে যাব। লেকেন ঝুট বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আপনি নারাজ হননি তো?'

কৌশল্যা বলে, 'না না। ঝুট না বললে আমি ধরা পড়ে যেতাম।'

বুকের ভেতর একটা নিদারুণ পাপবোধ পাষাণভারের মতো চেপে বসে ছিল। সেটা এবার নেমে যায়। বেশ হালকা বোধ করে ভিরগুরাম।

সূর্যের অসহ্য তাপে পুড়তে পুড়তে গাড়ি এগিয়ে চলে। আকাশের কোথাও একটুকরো মেঘ বা একটা পাখির চিহ্নমাত্র নেই।

তিন চারটে ভৈসা গাড়ি পেছন থেকে এসে ভিরগুরামের পাশ দিয়ে চলে যায়। এইসব গাড়ির মোষ রীতিমতো তাগড়া, তাদের শরীরে প্রচুর শক্তি।

ভিরগুরাম জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে দুঃখিতভাবে বলে, 'চুন্নুয়া মুন্নুয়া, ওরা সব আমাদের পিছে ফেলে চলে গেল। তোদের যদি পেট ভরে দানাপানি খাওয়াতে পারতাম, কী করে হারিয়ে দেয়—দেখতাম!'

চুন্নুয়া মুন্নয়ার লম্বা কান শুধু লটর পটর করতে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে ভিরগুরাম আস্তে করে ডাকে, 'মা'জি —'

কৌশল্যা অন্যমনস্কর মতো সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

ভয়ে ভয়ে ভিরগুরাম বলে, 'একটা কথা বলব?'

'কী কথা?'

'এভাবে সসুরাল থেকে চলে এলেন কেন?'

এই প্রশ্নটা আগেও একবার করেছিল ভিরগুরাম কিন্তু তখন ভালো করে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলে না কৌশল্যা। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে সে জানায়, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে না এসে তার উপায় ছিল না। বিন্ধ্যাচলী চৌবের ঘরে ছ ছ'টা সিন্দুক বোঝাই সোনাদানা, হীরেমোতি। স্বনামে এবং বেনামে হাজার একর জমি। কিষুণপুরা টাউনের বিশাল বাড়িটা ছাড়াও পাটনায় ঝরিয়ায় এবং দ্বারভাঙায় তাদের আরো বারোটা বাড়ি রয়েছে। তবু চৌবেদের জমি এবং পয়সার খাঁই মেটে না। এক একটা ছেলের তারা বিয়ে দেয়, তারপর দহেজের জন্য পুতহুদের ওপর ক্রমাগত চাপ দেওয়া চলতে থাকে। প্রথম প্রথম চাপ, তারপর নির্যাতন। ওই দহেজের কারণে চৌবেদের বাড়ির দু দু'টো বউকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয়েছিল, যদিও এই মৃত্যুকে চৌবেরা আত্মহত্যা বলে চালিয়েছে।

কৌশল্যার ওপর অনবরত চাপ দিয়ে তার বাবার কাছ থেকেও অজস্র সোনাচাঁদির গয়না এবং জমি আদায় করেছে বিন্ধ্যাচলী। বাবার দেবার মতো আর কিছু নেই। তাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে বিন্ধ্যাচলী, প্রায় পথের ভিখিরি করে ছেড়েছে। তবু তার খাঁই মেটেনি। আরো টাকা, আরো সোনাদানার জন্য ইদানীং কৌশল্যাকে শাসানো তো হচ্ছেই, মাঝে মাঝে মারধরও করা হচ্ছে। তাকে বলা হয়েছে, একমাসের ভেতর বাপের বাড়ি থেকে আরো দশ হাজার টাকা না আনতে পারলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক।

কৌশল্যা বিয়ের কিছুদিন পরে শুনেছে, চৌবেরা দহেজের জন্য তিন তিনটে বউকে পুড়িয়ে মেরেছে। বউ পোড়ানোটা ওদের কাছে মশা মারার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। দু' বছর চৌবেদের বাড়িতে থাকার পর কৌশল্যা বুঝে নিয়েছে, ওদের অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

এদিকে দশ হাজার কেন, দশটা টাকা দেবার মতো সামর্থ্যও কৌশল্যার বাবার নেই। এর পরিণতি কী হতে পারে সেটা আন্দাজ করেই সে আজ বাড়ির পেছন দিকের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছে। মা-বাবার কাছে যেতে পারলে প্রাণটা অন্তত বাঁচবে।

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলার পর চুপ করে যায় কৌশল্যা।

বিষণ্ণ মুখে ফিস ফিস করে ভিরগুরাম বলে, 'বড়ে আদমিকা বড়ে লালচ।'

কৌশল্যা উত্তর দেয় না।

এরপর তেলহীন চাকার কর্কশ আওয়াজ তুলে বয়েল গাড়িটা মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায়। আকাশ থেকে আগুন ঝরতেই থাকে, গরম বাতাস দিগন্তের ওপর দিয়ে হু হু করে ছুটে যায়।

পেছন থেকে এসে আরো কয়েকটা ভৈসা এবং বয়েল গাড়ি ভিরগুরামদের পাশ দিয়ে হাইওয়ের দিকে চলে গেল।

এ পর্যন্ত কতগুলো গাড়ি তাদের পেছনে ফেলে চলে গেছে, সব গুনে রেখেছে ভিরগুরাম। সে তার বয়েল দু'টোকে বলে, 'দেখলি তো চুন্নুয়া মুন্নুয়া, পন্দ্রগো (পনেরটা) গাড়িয়া আমাদের পেছনে ফেলে চলে গেল। তোদের গায়ে তাকত থাকলে পারত?'

চুন্নুয়া মুন্নুয়া যথারীতি কান নাড়তে থাকে।

একসময় গনগনে বিশাল বাঁজা মাঠ যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছে এবং খানিকটা দূরে হাইওয়ে দেখা যাচ্ছে, সেই সময় কৌশল্যা হঠাৎ ছইয়ের তলা থেকে বলে ওঠে, 'আমার সৌভাগ যে তোমার মতো লোককে পেয়ে গেছি। নইলে কী যে হত, ভাবতে পারি না।'

ভিরগুরাম বলে, 'মা'জি, সব শিউশঙ্করজির কিরপা।'

কৌশল্যা আধফোটা গলায় কী বলে, বোঝা যায় না।

আরো খানিকটা যাবার পর দেখা যায়, বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে রাস্তা ভেঙে চুরে বড় গর্ত হয়ে আছে। গর্ত থেকে গাড়ি টেনে তুলতে জিভ বেরিয়ে যায় চুন্নুয়া মুন্নুয়ার, তাদের চোখ ফেটে যেন রক্ত ছুটবে। কিন্তু গাড়ি একচুলও নড়ে না। অথচ বয়েল দু'টো যদি নিয়মিত ভরপেট দানাপানি পেত, আরেকটু শক্তি যদি থাকত তাদের শরীরে, এক হ্যাঁচকায় ওপরে তুলে ফেলতে পারত। অগত্যা নিচে নেমে, বয়েল দু'টোর সঙ্গে কাঁধ লাগিয়ে, টেনে হেঁচড়ে গর্ত থেকে গাড়িটা ওপরে তোলে ভিরগুরাম।

তারপর আবার চলার শুরু।

হাইওয়েতে এসে চমকে যায় ভিরগুরাম। চৌবেদের সেই পহেলবানেরা ওখানে একটা ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড কড়াইয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঠ পেরিয়ে যে সব বয়েল বা ভৈসা গাড়ি হাইওয়েতে গিয়ে উঠছে, তারা প্রত্যেকটার আগাপাশতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে।

চাপা ভীরু গলায় ভিরগুরাম বলে, 'মা'জি, সত্যনাশ হো গিয়া। পহলবানেরা পাক্কীতে দাঁড়িয়ে আছে।'

কৌশল্যা বলে, 'আমাদের গাড়িও দেখবে নাকি?'

'একবার তো দেখেছে, আর দেখবে বলে মনে হয় না। তবু ভূচ্চরদের বিশোয়াস নেই।'

কৌশল্যা উত্তর দেয় না।

ভিরগুরাম একটু চিন্তা করে এবার যা বলে তা এইরকম। হাইওয়েতে গিয়ে তারা আপাতত ডাইনে বইহারির দিকে যাবে না। তা হলে পাহেলবানদের সন্দেহ হতে পারে। তারা প্রথমে বিষুণগঞ্জের দিকে যাবে, তারপর অন্য রাস্তা দিয়ে অনেকটা ঘুরে কৌশল্যাকে বইহারিতে পৌঁছে দেবে।

কৌশল্যা বলে, 'সেই ভালো।'

হাইওয়েতে উঠে পহেলবানদের পাশ দিয়ে বিষুণগঞ্জর দিকে যেতে গিয়ে বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে থাকে ভিরগুরামের। 'হো রামজি, হো শিউশঙ্করজি, মা'জি'কো রক্ষা কর'—বিড় বিড় করতে করতে গাড়ি নিয়ে সে এগুতে থাকে।

পহেলবানদের পেছনে ফেলে কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিল ভিরগুরাম কিন্তু শেষরক্ষা আর হয় না। হঠাৎ কী ভেবে পহেলবানরা দৌড়ে আসে। 'রুখ যা, ভিরগুয়া, রুখ যা—'

গাড়িটা থেমে যায়। সেই পহেলবানটা যে মাঠের মাঝখানে ভিরগুরামের ঘরবালীকে নিয়ে কুৎসিত রসিকতা করছিল, বলে, 'তোর জেনানা তো মুখে কাপড়া দিয়ে বসে আছে। এত্তে রোজ বাদ ফিরে এল, তার মুখটা একবার দেখি। আসলী না নকলী কাকে ফেরত পেলি, বড় জানতে ইচ্ছে করছে।'

ভিরগুরাম হাতজোড় করে করুণ গলায় বলে, 'আওরতটা এমনিতেই লজ্জায় মরে আছে। তাকে আর দুখ দিও না পহেলবানজি।'

পহেলবানের চোখ জ্বলতে থাকে। চিৎকার করে সে বলে, 'তোর জরু কাপড়া সরাবে কিনা বল, নইলে আমরাই সরিয়ে মুখ দেখব—'

'তোমাদের পায়ে পড়ি, অ্যায়সা মাত কর—'

কিন্তু ভিরগুরামের কথা শেষ হতে না হতেই সেই পহেলবানটা লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের ভীরু, গরিবের চেয়ে গরিব, দুর্বল, অসহায় ভিরগুরামের মাথার ভেতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়। অপার্থিব কোনো শক্তি যেন তার ওপর ভর করে। গলার শির ছিঁড়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হোঁশিয়ার—' পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে চালির মাথায় গোঁজা একটা লাঠি টেনে নেয় সে কিন্তু সেটা পহেলবানের ঘাড়ে বসাবার আগেই অন্য এক পহেলবানের লাঠি তার মাথায় এসে পড়ে। মুহূর্তে চারপাশের ঝলসানো পৃথিবী চোখের সামনে অন্ধকারে ডুবে যায়। ঘাড় গুঁজে গাড়ি থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে সে শুধু নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত একটি চিৎকার শুনতে পায়।

ভিরগুরামের জ্ঞান যখন ফেরে, চরাচর জুড়ে সন্ধে নামতে শুরু করেছে। রাস্তায় এখন গাড়ি এবং মানুষজন বেশ কম। শুধু বহুকালের দুই বিশ্বস্ত সঙ্গী চুন্নুয়া মুন্নুয়া বিমর্ষ মুখে একধারে দাঁড়িয়ে আছে।

ভিরগুরাম লক্ষ করল, মাটিতে অনেকটা রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। তার নিজেরই রক্ত। মাথায় হাত দিয়ে বুঝল, এক আঙুলের মতো জায়গা ফেটে হাঁ হয়ে আছে।

গাড়ির চালির এককোণে একটা ছেঁড়া ধুতি আর জামা কাগজে মোড়া রয়েছে। ধুতিটা বার করে মাথার ফাটা জায়গাটায় ফেট্টি বেঁধে নিল ভিরগুরাম।

কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, তার গাড়ি হাইওয়ের ওপর দিয়ে বিষুণগঞ্জের দিকে চলেছে। ভিরগুরাম বয়েল দু'টোকে বলে, 'চৌবেজির পুতহুকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। লেকেন পারলাম না। কা করে?'

চুন্নুয়া মন্নুয়া কান নেড়ে হয়তো সায় দেয়।

ভিরগুরাম এবার বলে, 'বিষুণগঞ্জে গিয়ে আগে অসপাতাল যাব। পহেলবান ভূচ্চরটা আমার মাথাটাকে বিলকুল ছেঁচে দিয়েছে। তারপর যাব বিয়ে বাড়ি। লেকেন ওরা কি আমাদের জন্যে এতক্ষণ আর বসে থাকবে? যদি থাকে আমাদের জন্যে বহুত বঢ়িয়া ভোজন (উৎকৃষ্ট খাওয়া দাওয়া), নইলে ভুখাই থাকতে হবে। কা করে! ভুখা থাকা তো আমাদের কাছে নতুন কিছু না—কী বলিস?'

চুন্নুয়া মুন্নুয়া যথারীতি কান নাড়তে থাকে।

মলির জন্য

কাল শোওয়ার আগে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল ললিতা। বহুকালের বিশ্বস্ত ঘড়িটা ঠিক সময়েই ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালতে চোখে পড়ে এখন কাঁটায় কাঁটায় চারটে।

শীতের এই শেষ রাতে কাচের জানালার বাইরে কলকাতা মেট্রোপলিস গাঢ় অন্ধকার আর কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে আছে। তারই মধ্যে রাস্তার টিউব লাইটগুলোকে ঝাপসা, রহস্যময় সংকেতের মতো মনে হয়।

সূর্যোদয় হতে এখনও এক, দেড় ঘন্টা বাকি। সাড়ে ছ'টায় ললিতাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি আসবে। তার আগেই তৈরি হয়ে নিতে হবে।

ললিতা একজন এয়ার হোস্টেস। আজ তার অফ-ডে। তবু যে তাকে ডিউটিতে যেতে হচ্ছে, কারণ তার ওপর তার এয়ার লাইনসের অগাধ আস্থা। সকাল আটটা দশে একটা স্পেশাল ফ্লাইটে কয়েকজন ভি. আই. পি লক্ষ্ণৌ যাবেন। তাঁদের যত্ন এবং পরিচর্যার জন্য ললিতার মতো একজন অভিজ্ঞ, তৎপর বিমানসেবিকা থাকাটা ভীষণ জরুরি।

সাউথ ক্যালকাটায় ললিতার এই দু'কামরার মাঝারি ফ্ল্যাটটা খুবই ছিমছাম। দু'টো বেডরুম ছাড়া রয়েছে ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল, কিচেন, দু'টো টয়লেট, ব্যালকনি ইত্যাদি। তার নিজস্ব শোওয়ার ঘরখানা চমৎকার সাজানো। মাঝখানে দু'টো সিঙ্গল বেড জোড়া দিয়ে বিছানা। একধারে ওয়ার্ডরোব এবং ফ্যাশনেবল ড্রেসিং টেবল, কুশন। আরেক ধারে ছোট টেবল-চেয়ারে মলির পড়ার ব্যবস্থা। একটা দুর্দান্ত চেহারার ক্যাবিনেটে বাছাই করা কিছু বাংলা আর ইংরেজি বই। এক দেওয়ালে ওভাল শেপের ফরেন ইলেকট্রনিক ওয়াল ক্লক, আরেক দেওয়ালে তাদের এয়ার লাইনসের দুর্দান্ত একখানা ক্যালেন্ডার। অন্য একটি দেওয়ালে তার আর মলির এনলার্জ-করা বিশাল বাঁধানো ফোটো। তাতে তারা দু'জনেই হাসছে—ঝলমলে, প্রাণবন্ত হাসি।

গা থেকে লেপ সরিয়ে ললিতা নামতে যাবে, হঠাৎ তার চোখে পড়ে পাশে মলি নেই। কোথায় যেতে পারে সে? টয়লেটে কি? কিন্তু রাত্তিরে উঠলে মলি তাকে ডাকবেই। আজ তো তাকে ডাকে নি।

প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে ললিতার চোখ টয়লেটের দিকে চলে যায়। দরজা বন্ধ রয়েছে, তাই বোঝা যাচ্ছে না ওটার ভেতরে কেউ আছে কিনা। ললিতা ডাকে, 'মলি—মলি—'

কোনো সাড়া নেই।

তবু দরজাটা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বালে ললিতা। টয়লেট ফাঁকা। তা হলে কোথায় যেতে পারে মলি? এধারে ওধারে তাকাতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে বেডরুমের দরজাটা খোলা। পরিষ্কার মনে আছে, কাল শোওয়ার আগে পাল্লা টেনে ওটা 'লক' করে দিয়েছিল। তবে কি মলি দরজা খুলে পাশের ঘরে আরতির কাছে গেছে?

আরতি তাদের কাছে বছর তিনেক আছে: কাজের লোক বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা নয়। বছর চল্লিশের মতো বয়স। রীতিমতো ভদ্রঘরের মেয়ে, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। বিধবা হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দেয়। বাপের বাড়িতেও প্রচণ্ড অসম্মানের মধ্যে দিন কাটছিল তার। ললিতার এক এয়ার হোস্টেস বন্ধু সুজয়া একদিন আরতিকে তার কাছে নিয়ে এসেছিল, সেই থেকে এখানেই আছে। আসলে ওকে পেয়ে বেঁচে গেছে ললিতা।

সে যখন ডিউটিতে বেরোয় তখন মলিকে কে দেখবে এই নিয়ে ছিল তার মারাত্মক দুশ্চিন্তা। মাঝে মধ্যে দু'-চার দিনের জন্য দিল্লি বম্বেতে গিয়েও সেই সময় তাকে থাকতে হত। সমস্যা দেখা দিত তখনই। এখনও তাকে কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকতে যে হয় না তা নয়, কিন্তু আরতি আছে বলে সে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।

আরতির দায়িত্ববোধ প্রবল। তা ছাড়া মলিকে সে খুবই ভালোবাসে। আরতি যখন এসেছিল তখন মলির বয়স তিন, গেল জুলাইতে সে আটে পড়েছে। মায়ের যত্নে এবং আদরে আরতি তাকে মানুষ করে তুলছে।

ক'টা রাত আর ললিতার কাছে শোয় মলি! বেশির ভাগ দিনই সে পাশের ঘরে আরতির সঙ্গে ঘুমোয়। আরতি ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না মেয়েটার।

ললিতা তার বেডরুম থেকে বাইরের ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল-এ চলে এল। ডান পাশে আরতির ঘর। তার দরজায় টোকা দিয়ে ডাকতে থাকে, 'আরতিদি—আরতিদি—'

আরতির ঘুম ভীষণ পাতলা। ধড়মড় করে উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়ায় সে, সংকোচের গলায় বলে, 'বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্যিস তুমি ডাকলে। এক্ষুনি চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি।'

ভোরের ফ্লাইটে ডিউটি থাকলে আগের দিনই আরতিকে জানিয়ে দেয় ললিতা। সে ওঠার আগেই আরতি উঠে কিছু খাবার তৈরি করে চা বসিয়ে দেয়। খালি মুখে কোনোদিনই সে ললিতাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না।

আরতি শশব্যস্তে ওধারে বেসিনের দিকে যাচ্ছিল। চোখে মুখে জল দিয়ে সে কিচেনে ঢুকবে।

ললিতা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয়। বলে, 'মলি কি রাত্তিরে তোমার কাছে উঠে এসেছে?'

আরতি অবাক হয়ে বলে, 'কই, না! সে তো কাল তোমার সঙ্গে শুল।'

'ঘুম ভাঙার পর মলিকে দেখতে পাচ্ছি না। ভাবলাম তোমার কাছে যদি এসে থাকে—'

'কিন্তু ও কোথায় যেতে পারে?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এরপর দু'জনে সাড়ে আটশো স্কোয়ারফিটের এই মাঝারি ফ্ল্যাটটা তোলপাড় করে ফেলে। কিন্তু দু'টো বেডরুম, দু'টো টয়লেট, কিচেন, ব্যালকনি, ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল—কোথাও মলিকে পাওয়া যায় না। খোঁজাখুঁজি করতে করতে একসময় আরতির চোখে পড়ে ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল-এর যে জায়গাটায় বসার জন্য সোফা টোফা সাজানো রয়েছে তার গা ঘেঁষে বাইরে বেরুবার দরজাটা ফাঁক হয়ে আছে। সে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'দিদি, ওই দেখ—'বলে দরজাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

ললিতা চমকে উঠে। একরকম দৌড়ে দরজার কাছে এসে পুরোটা খুলে ফেলে। তাদের এই ফ্ল্যাট দোতলায়। বাইরে বেরুলেই নিচে নামার সিঁড়ি।

আলো জ্বেলে দ্রুত কিছু একটা ভেবে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো একতলায় চলে আসে ললিতা। তার পেছনে পেছনে আরতিও আসে। ললিতা যা ভেবেছিল তা-ই, রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢোকার বিশাল মজবুত দরজাটা হাট করে খোলা। সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাস্তায় যেদিকে যতদূর চোখ যায়, কেউ কোথাও নেই। গাঢ় হিম আর অন্ধকারে সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শীতের এই শেষ রাতে চারিদিক যখন স্তব্ধ, মহানগর যখন ঘুমের আরকে

ডুবে রয়েছে, সেই সময় একা কোথায় যেতে পারে মলি! সে তো তাকে না জানিয়ে কিছু করে না। তা ছাড়া মলি ভীরু স্বভাবের মেয়ে। হঠাৎ এমন দুঃসাহস তার হল কী করে? শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে ললিতা। তারপর অবসন্নের মতো সিঁড়ি ভেঙে ফের দোতলায় উঠতে থাকে। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে আরতি।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে প্রথমটা ললিতা বুঝে উঠতে পারে না, এখন তার কী করা উচিত। এই অসহ্য শীতের ভোরেও ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় তার সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। শিরদাঁড়ার ভেতর দিকে আগুনের হলকার মতো কী যেন দ্রুত ওঠানামা করছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা সোফায় বসে পড়ে ললিতা। মলিকে সে এর মধ্যে বকাবকি করেছে কি? গায়ে হাত তুলেছে? মনে করতে পারল না। আসলে মেয়েটা এত ভালো আর এত বাধ্য যে তার ওপর রাগ করার সুযোগই পাওয়া যায় না। তা হলে কী এমন ঘটল যাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে এভাবে এই নির্জন কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাতে বেরিয়ে পড়ল?

আরতি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে, 'কিছু একটা কর দিদি। এভাবে বসে পড়লে চলবে না। মলিকে খুঁজে বার করতেই হবে।' তার গলা ভীষণ কাঁপছিল।

আরতির কথাগুলো ললিতার মস্তিষ্কে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। মুখ থেকে হাত নামিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সে। ভেঙে পড়লে এখন চলবে না। আপাতত যেটা আগে দরকার তা হল ডিউটি অফিসার মেনন সাহেবকে একটা ফোন করা।

ড্রইং রুমের একধারে ছোট টেবিলে টেলিফোনটা রয়েছে। সেটা তুলে ডায়াল করতে একবারেই মেনন সাহেবকে পাওয়া যায়। মলির ব্যাপারটা জানিয়ে ললিতা বলে, 'স্যর, এই অবস্থায় কী করব বুঝতে পারছি না।'

মেনন সাহেব মানুষটি হৃদয়বান। নিছক কাঠখোট্টা অফিসার নন। ললিতার মনোভাব বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় না। সহানুভূতির সুরে বলেন, 'ডোন্ট ওরি ললিতা। লক্ষ্ণৌ ফ্লাইটে তোমাকে যেতে হবে না। তোমার জায়গায় অন্য কাউকে ডিউটি দিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুনি থানায় কনট্যাক্ট করে সব জানাও। যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয়, আমাকে ফোন করবে। ডোন্ট হেজিটেট। আরেকটা কথা—'

'কী স্যর?'

'মিস্টার চ্যাটার্জিকে মেয়ের খবরটা দিয়েছ?'

মিস্টার চ্যাটার্জি অর্থাৎ অরিন্দম, তার প্রাক্তন স্বামী। ললিতা হকচকিয়ে যায়। অরিন্দমের কথাটা তার মাথায় আসে নি এই মুহূর্তে। মেনন সাহেবের কথার কী উত্তর দেবে, সে ভেবে পায় না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মেনন সাহেবের কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়, 'তুমি কি লাইন কেটে দিলে?'

চাপা গলায় ললিতা বলে, 'না স্যর—'

'এই সময় পুরনো তিক্ততা মনে রাখতে নেই। আফটার অল চ্যাটার্জি মলির বাবা। ওঁকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। আচ্ছা, এখন রাখছি, পরে কথা হবে।'

আস্তে আস্তে ফোন নামিয়ে রাখে ললিতা। মেনন সাহেব ঠিকই বলেছেন, অরিন্দমকে খবরটা দেওয়া খুবই জরুরি। মলি যেমন তার মেয়ে, তেমনি অরিন্দমেরও।

থানায় ফোন তো করতেই হবে কিন্তু পুলিশ আজকাল কোনো ব্যাপারেই তেমন গুরুত্ব দেয় না। একমাত্র মন্ত্রী, এম. এল. এ বা এম. পি-রা তাড়া দিলে আলাদা কথা। নেহাতই

দায়সারাভাবে তারা তাদের ডিউটি করে যায়। ওদের ওপর ভরসা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু এই কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের শেষ রাতে তার মতো একটি মেয়ের পক্ষে কলকাতার জনশূন্য, নিঝুম রাস্তায় রাস্তায় কোথায় মলিকে খুঁজে বেড়াবে সে? এই শহর ইদানীং মেয়েদের পক্ষে তেমন নিরাপদও নয়।

আরতি ডাকে, 'দিদি—' পরস্পরকে তারা এই বলেই ডাকে।

ললিতা চমকে ওঠে, 'কিছু বললে?'

'হ্যাঁ। তোমার অফিসের সাহেব কী বললেন?' মেনন সাহেবকে চেনে আরতি, অনেক বার এই ফ্ল্যাটে এসেছেন তিনি। ললিতা যে তাঁর সঙ্গেই একটু আগে কথা বলছিল সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

ললিতা বলে, 'থানায় ফোন করতে বললেন।' ইচ্ছা করেই অরিন্দমের কথাটা আর জানায় না সে।

'তা হলে চুপ করে বসে আছ কেন?' আরতির গলায় ব্যাকুলতা ফুটে বেরোয়।

ললিতা উত্তর দেয় না। ফের ফোনটা তুলে নিয়ে দূরমনস্কর মতো খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। চার বছরের ভেতর একবারও অরিন্দমকে ফোন করেছে কিনা, সে মনে করতে পারে না। অরিন্দমও তাকে ফোন করে নি। তবে প্রতি সপ্তাহে তিন বার অরিন্দম মলিকে দেখতে আসে, কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতর ঢোকে না। একতলায় কলিং বেল আছে। সেটা বাজালে আরতি মলিকে নিচে নিয়ে যায়। মেয়ের সঙ্গে কথা বলে, কিংবা নতুন জামাটামা বা কমিকস-এর বই, রঙের বাক্স তাকে দিয়ে চলে যায়। অরিন্দম সোম বুধ এবং শুক্রবার আসে। ওই দিন তিনটে পারতপক্ষে বাড়িতে থাকে না ললিতা। তবু ক্বচিৎ কখনও থেকে গেলে অরিন্দমের সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যায় কিন্তু কেউ কথা বলে না। মলির ব্যাপারে জরুরি কিছু জানাবার থাকলে আরতিকে দিয়ে ফোন করায়।

একসময় ধীরে ধীরে ডায়াল ঘোরায় ললিতা। ওধারে টেলিফোন বেজে ওঠে, বাজতেই থাকে।

ললিতা জানে অরিন্দমদের ফোনটা থাকে দোতলায় চওড়া প্যাসেজের এক ধারে, একটা উঁচু টুলের ওপর।

বেশ কিছুক্ষণ পর লাইনের ওধার থেকে একটা ঘুমন্ত গলা ভেসে আসে, 'হ্যালো, কাকে চাইছেন?'

এতদিন বাদেও কণ্ঠস্বরটা চিনতে অসুবিধা হয় না। অরিন্দমের ছোট ভাই দেবেশ। নিচু গলায় ললিতা বলে, 'আমি ললিতা। তোমার দাদাকে একটু ডেকে দেবে?'

দেবেশ বলে, 'ও হ্যাঁ, ডাকছি—'

গলা শুনে বোঝা যায়, ঘুম ছুটে গেছে দেবেশের। বহুকাল বাদে শীতের ভোরে দাদার প্রাক্তন স্ত্রীর ফোন আসবে, এটা ছিল তার পক্ষে অভাবনীয়।

মিনিট খানেকও কাটে না, ওধার থেকে অরিন্দমের উদ্বিগ্ন স্বর ভেসে আসে, 'কী হয়েছে ললি?'

কত দিন বাদে ওই ডাকটা শুনল ললিতা। একদা, কোনো এক পূর্বজন্মে আদর করে ললি বলে ডাকত অরিন্দম। আড়ষ্ট, কাঁপা সুরে সে বলে, 'মলিকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

অরিন্দম যে ভয়ে আঁতকে উঠেছে সেটা তার গলা শুনে বোঝা যায়, 'সে কী! কখন থেকে?'

গোটা ব্যাপারটা জানায় ললিতা। এমনকি মেনন সাহেবের সঙ্গে ফোনে তার যা যা কথা হয়েছে তা-ও বাদ দেয় না। সব বলার পর অবরুদ্ধ গলায় জিগ্যেস করে, 'আমার মলিকে কি ফিরে পাব না?'

ললিতার বলার মধ্যে এমন একটা চাপা ভয় আর কাতরতা ছিল যা অরিন্দমকে প্রবল নাড়া দিতে থাকে। আর্দ্র, কোমল স্বরে সে বলে, 'অত ভেঙে পোড়ো না। নিশ্চয়ই মলিকে পাওয়া যাবে। একা একা এখন বেরিয়ো না। আমি আসছি—'

ওধারে লাইন কেটে দেবার শব্দ হয়। ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রেখে ফের দু'হাতে মুখ ঢাকে ললিতা।

আরতি এখনও কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে, 'দাদার সঙ্গে কথা বললে?' অরিন্দমকে সে দাদা বলে ডাকে।

আস্তে মাথা নাড়ে ললিতা।

খানিকটা আন্দাজের ওপর এবার আরতি জিগ্যেস করে, 'দাদা কি আসছেন?'

ললিতা মুখ থেকে হাত সরায় না। আগের মতোই মাথা নেড়ে জানায়—আসছে।

আরতি আর দাঁড়ায় না, নিঃশব্দে সামনে থেকে চলে যায়।

আশ্চর্য, যে মলির জন্য অসহ্য কষ্টে বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেচুরে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে দশ বছর আগের একটা দিন অদৃশ্য কোনো টিভি স্ক্রিনে ফুটে উঠতে থাকে।

সেবার কলকাতা থেকে বম্বের ফ্লাইটে ললিতা প্রথম অরিন্দমকে দেখে। বিশাল এয়ার বাসের দু'শোর বেশি প্যাসেঞ্জারের ভেতর কেউ আলাদাভাবে চোখে পড়ার কথা নয়। পড়েছিল এই কারণে, পৃথিবী নামের এই গ্রহটি থেকে পঁচিশ তিরিশ হাজার ফিট উচ্চতায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে অরিন্দম। তখন অবশ্য তার নাম জানত না ললিতা। সে সময় কত আর বয়স অরিন্দমের? খুব বেশি হলে সাতাশ আটাশ। আর ললিতার চব্বিশ। শান্ত, সুপুরুষ চেহারার তরুণ যাত্রীটিকে শুশ্রূষা করতে হয়েছিল তাকেই।

মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস ছিল না অরিন্দমের। একটি দারুণ সুন্দর তরুণীর পরিচর্যায় সে যতটা আড়ষ্ট হয়েছিল, ঠিক ততটাই খুশি। সুস্থ হয়ে সসংকোচে অরিন্দম ধন্যবাদ দিয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি না থাকলে আমার কী যে হত, ভাবতে পারি না। আই অ্যাম ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু য়ু।'

যাত্রীটি যে সামান্য নার্ভাস ধরনের, অন্তত তখন তাই ছিল, বুঝতে অসুবিধা হয় নি ললিতার। মধুর হেসে বলেছে, কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। সে না থাকলেও অন্য বিমানসেবিকা এভাবেই অরিন্দমের সেবা করত। কেননা, এয়ারক্রাফটের ভেতর কোনো যাত্রী থাকলে তার ভালো মন্দের সমস্ত দায়িত্ব এয়ারলাইনস কর্মীদের। এটা তাদের ডিউটি।

এরপর সামান্য দু-চারটি কথা হয়েছে। তার মধ্যে অরিন্দমের নাম তো জানা গেছেই, ললিতা আরও জানতে পেরেছে অরিন্দম ইতিহাসের অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। সেদিনের ফ্লাইটে সে প্রথম বম্বেতে যাচ্ছে। ওখানে বম্বে ইউনিভার্সিটিতে সেবার অল ইন্ডিয়া হিস্টোরিক্যাল কংগ্রেসের কনফারেন্স হচ্ছে। সেই কনফারেন্সে তাকে একটা পেপার পড়তে হবে।

ললিতাও তার নামটাম বলেছিল। সে বাঙালি জেনে আরও খুশি হয়েছে অরিন্দম।

সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামার সময় অরিন্দম বলেছিল, 'আচ্ছা চলি।'

ললিতা বলেছে, 'আশা করি এইরকম কোনো ফ্লাইটে আবার দেখা হবে।'

'আশা করি।'

সত্যিই ফের দেখা হয়ে গিয়েছিল। একবার নয়, বহু বার। কখনও আগরতলার ফ্লাইটে, কখনও লক্ষ্ণৌর ফ্লাইটে, কখনও দিল্লি, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোরগামী প্লেনে। তরুণ ঐতিহাসিক হিসেবে তখন অরিন্দমের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার ডাক আসত। প্রতি মাসেই হয় সেমিনার, নইলে কনফারেন্স কিংবা মিটিং।

ললিতা হেসে হেসে বলত, 'আপনি দেখছি আমাদের এয়ারলাইনসের প্রায় ডেইলি প্যাসেঞ্জার হয়ে উঠলেন।'

অরিন্দমও হাসত। মজার গলায় বলত, 'ভাগ্যিস সেমিনারওলারা প্লেনের টিকেট দেয়। তাই—' কথা শেষ না করেই চুপ করে যেত। তারপর ঠোঁট টিপে, চোখেব কোণ দিয়ে ললিতাকে লক্ষ করতে থাকত।

ললিতা জিগ্যেস করত, 'তাই কী?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়। যদি সাহস দেন, একটা কথা বলি—'

'কী?'

'প্লেনে উঠেই খোঁজ করি, আপনি আছেন কিনা। না থাকলে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকত ললিতা। মুখ নামিয়ে একসময় চাপা গলায় বলত, 'আমারও। ফ্লাইটে ডিউটি পেলেই মনে মনে ভাবি, আপনাকে দেখতে পাব কিনা।'

এরপর কবে যে তারা খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল, নিজেরাই বুঝতে পারে নি। ততদিনে পরস্পরের ঠিকানা আর ফোন নম্বর ওদের জানা হয়ে গেছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফিট উঁচুতেই শুধু নয়, ডিউটি না থাকলে ললিতা অরিন্দমদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে ফোন করত। সে তখন থাকত হিন্দুস্থান পার্কে, তার দাদার কাছে। অরিন্দমও সেখানে তাকে ফোনে ধরে ফেলত।

শুধু কি দূরভাষ যন্ত্রেই কথা বলা, প্রায়ই তাদের দেখা হতে লাগল। মাঝে মাঝে কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেতে যেত তারা, কখনও বা ভোরে গাড়ি নিয়ে কাছাকাছি কোথাও বেড়িয়ে সন্ধেবেলায় ফিরে আসত।

অরিন্দম মানুষটা খুবই খোলামেলা, সাদাসিধে, তার মধ্যে লুকোচুরির ব্যাপার নেই। বেশ কয়েকবার সে ললিতাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেছে।

অরিন্দমদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। ওর বাবা নেই। তবে কাকা, কাকিমা, বিধবা মা, খুড়তুতো এবং নিজের ভাইবোনদের নিয়ে তাদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িটা সারাদিন সরগরম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে একান্নবর্তী পরিবারগুলো বিশাল বিশাল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো লুপ্ত হয়ে গেছে। কিউরিও শপে যেমন দুষ্প্রাপ্য জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়, সেইভাবেই যেন কলকাতা শহর জয়েন্ট ফ্যামিলির একটি নমুনা একক প্রদর্শনী হিসেবে অরিন্দমদের বাড়িতে এখনও রেখে দিয়েছে।

অরিন্দমদের বাড়ির আবহাওয়া খুবই উদার। মা কাকা কাকিমা থেকে শুরু করে ছোট ভাই-বোনেরা পর্যন্ত সবাই প্রথম দিনটি থেকে ললিতার সঙ্গে অত্যন্ত আপনজনের মতো ব্যবহার করেছে। ওখানে গেলে এক ধরনের মধুর উষ্ণতা অনুভব করত সে।

আরো একটা ব্যাপার ললিতার চোখে পড়েছিল। উদারতা থাকলেও অরিন্দমদের লাইফ স্টাইলটা পুরনো ধাঁচের। বাড়িতে ডাইনিং টেবিলে খাওয়ার চল ছিল না, সবাই আসন পেতে মেঝেতে বসে খেত। যত রকম *পালপার্বণ* আছে, সব ওরা মেনে চলত। গরিব আত্মীয়দের

নিয়মিত সাহায্য করত অরিন্দমরা। মাসের গোড়ার দিকে কম করে কুড়ি বাইশটা মানি অর্ডারে নানা ঠিকানায় টাকা পাঠাত। পুরনো ভ্যালুজ, পুরনো পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। আগেকার যৌথ পরিবারগুলোতে যেমন একজনই হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, এখানেও তা-ই। অরিন্দমের বাবার মৃত্যুর পর কাকাই ছিলেন সর্বেসর্বা, তাঁর কথাই শেষ কথা। তাঁর মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারো ছিল না।

গোটা পরিবারটাই ছিল টিটোটেলার। কাউকে কোনোদিন ড্রিংক তো দূরের কথা, সিগারেট টিগারেটও খেতে দেখে নি ললিতা।

ওদের বাড়িতে ঢুকলে প্রথমেই যা চোখে পড়বে তা হল বই। একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত প্রতিটি ঘরেই একটা কি দু'টো বইয়ের আলমারি আছেই।

অরিন্দমদের বাড়িতে পড়াশোনাটা ছিল সব চেয়ে জরুরি ব্যাপার। ওর বাবা ছিলেন একটা বড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ভাইবোনদের বেশির ভাগই কলেজের অধ্যাপক। এক ভাই সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্টের একটা ইনস্টিটিউটে সায়েন্টিফিক অফিসার, সেখানে তরুণ গবেষকদের সে রিসার্চ গাইড। সবার ছোট দুই ভাইবোন তখন এম. এ পড়ছে। স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত সবার রেজাল্টের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অরিন্দমের কাকা অবশ্য এডুকেশন লাইনে নেই। তিনি হাইকোর্টের নাম-করা অ্যাডভোকেট, দুর্দান্ত পসার তাঁর।

ললিতাদের বাড়ির আবহাওয়া এবং চেহারা একেবারে উলটো। জয়েন্ট ফ্যামিলির কথা তারা ভাবতেই পারে না। কাকা-জেঠাদের সঙ্গে এক বাড়িতে তারা থাকত না। শুধু তাই নয়, আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় থাকে, সে খবরও তারা বিশেষ রাখত না।

বাবা-মা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। ললিতা, তার দাদা সঞ্জয়, বউদি সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে বিজয়া এবং তাদের একমাত্র ছেলে সানি—এই নিয়ে ছিল ওদের ছোট ফ্যামিলি।

বাড়িতে লেখাপড়ার চল বিশেষ নেই। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার কারণে ইংরেজিটা জলের মতো বলতে পারত দুই ভাইবোন। কোনোরকমে ঘষে ঘষে গ্র্যাজুয়েট হবার পর দাদা ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেসে কিভাবে যেন নেমে পড়েছিল। আর ঝকঝকে, স্মার্ট, তোড়ে ইংরেজি বলা ললিতা এয়ার হোস্টেসের চাকরিটা জুটিয়ে ফেলেছিল।

সঞ্জয়ের হিন্দুস্থান পার্কের ফ্ল্যাটটার সঙ্গে ভালো বই-টইয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। যা আসত তা হল হালকা 'পর্নো' ধরনের কেচ্ছার কাগজ, রঙিন ফিল্মি আব ফ্যাশনের ম্যাগাজিন। সেলারে সাজানো থাকত হুইস্কি রাম জিনের বোতল। ডিপ ফ্রিজে নানা ধরনের মাংস। চিকেন, মাটন, হ্যাম, পর্ক। আর ছিল দামি ফরেন টিভি, ভি সি আর এবং অগুনতি পপ মিউজিকের রেকর্ড।

সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন রাত্তিরে তাদেব বাড়িতে পার্টি দেওয়া হত। চড়া পপ মিউজিকের মধ্যে বয়ে যেত হুইস্কির স্রোত, প্রায় সমস্ত রাত ধরে চলত হুল্লোড়। সঞ্জয় বা ললিতার যে বন্ধুরা এই সব পার্টিতে আসত তারা গোটা কয়েক জিনিস ছাড়া আর কিছু বুঝত না। ড্রিংকস, দামি দামি ফ্যাশনেবল পোশাক, ফোরেন পারফিউম, ফোরেন কার, অজস্র টাকা, দু-চার মাস পর পর আমেরিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড কি ওয়েস্ট জার্মানি ঘুরে আসা, ইত্যাদি। তাদের কাছে এ সবের বাইরে জীবনের কোনো মানে নেই।

দুই বাড়ির লাইফ-স্টাইলের মধ্যে এত পার্থক্য, তবু প্রেম এমন এক ম্যাজিক যা সমস্ত অসঙ্গতি ভুলিয়ে দেয়। অন্তত কিছু দিনের জন্য। যা অনিবার্য তাই ঘটে, একদিন দু'জনের বিয়ে হয়ে যায়, হিন্দুস্থান পার্ক থেকে বালিগঞ্জ প্লেসে চলে আসে ললিতা।

বিয়ের পর একটা বছর স্বপ্নের মতো পাখা মেলে উড়ে যায়। তখন ঘোরের মধ্যে রয়েছে ললিতা। তারপর ধীরে ধীরে আচ্ছন্নতা যত কাটে ততই অসুবিধাগুলি ফুটে বেরুতে থাকে। প্রথমেই তার মনে হয় এ বাড়িতে বড় বেশি ভিড়। এখানে তার নিজস্ব বা আলাদা বলতে কিছু নেই। একটা প্রকাণ্ড সংসারের সে অংশমাত্র—অতি তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন।

এ বাড়িতে উদারতা আছে, গরিব আত্মীয়স্বজনদের জন্য মহানুভবতা আছে কিন্তু সেই সঙ্গে যা আছে তা হল এক ধরনের রক্ষণশীলতা। এরা বড় বেশি পিউরিটান, ভীষণ কনজারভেটিভ। এখানে জ্যাজ নেই, পপ মিউজিক এর ত্রিসীমানায় ঢোকে না। পার্টি, ড্রিংকস, রাতভর নাচানাচি, হুল্লোড়—এ সবের নামে এ বাড়ির লোকেরা ভিরমি খায়।

বালিগঞ্জ প্লেসে যে আনন্দ ছিল না তা নয়। তবে সেটা ওদের মতো। হিন্দুস্থান পার্কের আনন্দের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। ও বাড়িটায় বড় বেশি পড়াশোনার গন্ধ। দাদা তো মজা করে প্রায়ই বলত, 'শেষ পর্যন্ত বেছে বেছে একটা ক্লাসরুমে গিয়ে ঢুকলি।'

আরো একটা বছর কেটে যায়। এর মধ্যে মলি এসে গেছে। ওদিকে ললিতার মধ্যে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ এবং তিক্ততা তৈরি হচ্ছিল। এ বাড়িতে এসে সে যে পুরোপুরি সুখী হয় নি, সেটা যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিল।

বিয়ের পরও চাকরি ছাড়ে নি ললিতা, অবশ্য ছাড়ার কথা কেউ তাকে বলে নি। তবে শ্বশুরবাড়ির হালচাল মাথায় রেখে পারতপক্ষে কলিগদের কাউকে বাড়িতে ডাকত না। কেউ আসতে চাইলে বলত, দিনের বেলা সাদা চোখে, মুখে গন্ধ না নিয়ে, স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে। রাতের দিকে কোনোভাবেই না। কিন্তু বিয়ের তৃতীয় বছরে অরুণ সোন্ধি গোলমাল পাকিয়ে দিল। অরুণ দারুণ আমুদে আর হইচই-করা মানুষ, তবে ড্রিংকটা একটু বেশিই করে থাকে। এমনিতে খারাপ না, কিন্তু পেটে হুইস্কিটা পড়লে তার মাথার ভেতর গোলমাল হয়ে যায়। তখন সে যে কী করে বসবে তার ঠিক থাকে না।

অরুণ আগে ছিল দিল্লি অফিসে। তখন থেকেই ললিতা তাকে চিনত। সেই অরুণ একদিন কলকাতায় বদলি হয়ে এল। আর এসেই প্রতি রাতে আরক্ত চোখে, টলটলায়মান পায়ে এবং মুখে হুইস্কির প্রচুর গন্ধ নিয়ে একেক জন বন্ধুর বাড়ি হানা দিতে লাগল।

একদিন বেশ রাত করেই অরুণ বালিগঞ্জ প্লেসে এসে হাজির। ললিতা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনোরকমে সে তাকে গাড়িতে তুলে দেয়।

অরুণ চলে যাবার পর অরিন্দম থমথমে মুখে বলেছিল, 'মাতাল, স্কাউন্ড্রেল। তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এখানে এ সব চলবে না। আমাদের বাড়ির স্যাংটিটি নষ্ট হয়, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।'

অরুণ ওভাবে আসায় খুবই বিব্রত হয়েছিল ললিতা। কিন্তু অরিন্দম অমন রূঢ়ভাবে বলায় হঠাৎ মাথার ভেতর কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল তার। মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। চড়া গলায় বলেছে, 'ওয়ার্ল্ডে তোমাদের বাড়িটাই সবার মডেল হওয়া উচিত, এটা ভাবছ কেন? ড্রিংক করাটা তোমাদের কাছে মহাপাপ হতে পারে, সবার কাছে নয়। ব্যাপারটা এত খারাপ হলে পৃথিবী থেকে লিকার ব্যাপারটাই উঠে যেত।'

অরিন্দম এমনিতে খুবই ভদ্র, শান্ত এবং সংযত ধরনের মানুষ। কিন্তু সেদিন সে-ও প্রায় খেপে গিয়েছিল, 'যে কেউ যেখানে খুশি ড্রিংক করতে পারে কিন্তু আমাদের বাড়িতে ড্রাংকার্ডদের অ্যালাউ করব না।'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে ললিতা, 'আমার বন্ধুরা তা হলে এ বাড়িতে আসবে না?'

'তোমার বন্ধুদের যা নমুনা তাতে তারা এখানে না এলে বাধিত হব।'

অরুণের সেই ঘটনাটা দিয়ে যে বিস্ফোরণের শুরু, তারপর থেকে দু'জনের সম্পর্ক ক্রমশ আর খারাপ হতে থাকে। রোজই খিটিমিটি, অশান্তি। বাড়ির অন্য সবাই এ ব্যাপারটা পছন্দ করছিল না, তারা খুবই অখুশি। বালিগঞ্জ প্লেসের এতদিনের পারিবারিক প্যাটার্ন ললিতার জন্য চোখের সামনে ভেঙেচুরে যাচ্ছে, এটা কেউ মেনে নিতে পারছিল না।

ললিতারও অসহ্য লাগছিল। সে বলেছে, 'আমি এখানে আর থাকব না।'

অরিন্দম স্তম্ভিত। বলেছে, 'তার মানে?'

'এ বাড়িতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'তার মানে তুমি চাইছ আমি অন্য বাড়ি ভাড়া নিই?'

ললিতা উত্তর দেয় নি।

অরিন্দম এবার বলেছে, 'তুমি ভুল করেছ। য়ু আর ফ্রি টু গো এনিহোয়েয়ের য়ু লাইক। আমি নিজেদের বাড়ি ছেড়ে যাব না। এখানে থাকতে হলে তোমার চাকরি-বাকরি আর ওই টাইপের বন্ধুবান্ধব ছাড়তে হবে। আমাদের ফ্যামিলির অন্য সবার মতো হতে হবে।'

ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত ললিতা সেদিনই মলিকে নিয়ে হিন্দুস্থান পার্কে তার দাদার ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিল। অরিন্দম তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে নি। তার মা কাকা কাকিমা গোলমালটা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অরিন্দম এবং ললিতার, দু'জনেরই মাথায় অন্ধ জেদ তখন চেপে বসেছে। এমন একটা জায়গায় তারা পৌঁছে গিয়েছিল যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। এরপর কোর্ট, মামলা, ডিভোর্স। আদালত রায় দিয়েছিল, মলি আপাতত ললিতার কাছে থাকবে। অরিন্দম যখন ইচ্ছা, মেয়েকে দেখে আসতে পারবে।

হিন্দুস্থান রোডে বেশিদিন থাকে নি ললিতা। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির এই ফ্ল্যাট কিনে বছরখানেকের ভেতর উঠে আসে।

উত্তেজনা, রাগ, খ্যাপামি ইত্যাদি থিতিয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে ললিতার মনে হয়েছে, জেদের বশে ডিভোর্সটা করে বসা ঠিক হয় নি, অন্তত মলির ভবিষ্যতের কথা তার মাথায় রাখা উচিত ছিল। অরিন্দম এই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে কী ভেবেছে, সে জানে না।

ললিতার বয়স এখন চৌত্রিশ। যথেষ্ট সুন্দরী সে, চমৎকার স্বাস্থ্যের জন্য তাকে তরুণীই বলা যায়। এই বয়সের একটি যুবতীর পক্ষে কলকাতা শহরে ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটানো খুব সহজ নয়। অরুণ সোন্ধি তার মতোই ডিভোর্সি, সে আগে আগে প্রায়ই বিয়ের কথা বলত, ললিতা রাজি হয় নি। শুধু অরুণই না, কলিগদের মধ্যে আরো কেউ কেউ ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু কেন কে জানে, ললিতা তাদের এড়িয়ে গেছে। ইদানীং কয়েক মাস এ ব্যাপারে কেউ আর অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি বা জোরজার করে না। এই চাপটা থেকে সে আপাতত মুক্ত।

ললিতা জানে, অরিন্দমও বিয়ে করে নি। নিয়মিত সে মেয়েকে দেখে যায়। তবে তার সঙ্গে কথাবার্তা নেই। প্রায় চার বছর বাদে ললিতাকে নেহাত নিরুপায় হয়েই আজ ফোন করতে হল।

কতক্ষণ মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল, খেয়াল নেই ললিতার। একসময় কলিং বেল বেজে ওঠে। সে বুঝতে পারছিল অরিন্দম এসেছে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে তবু আরতিকে বলে, 'দেখ তো কে এল—'

আরতি কিচেনে কী করছিল, দৌড়ে ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমের ওধারে ব্যালকনিতে চলে যায়। নিচে মেইন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দম। সে গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়িটা রাস্তার ধার ঘেঁষে পার্ক করা।

অরিন্দম আসবে বলে মেইন দরজার মাথায় যে আলো রয়েছে, সেটা জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

আরতি শশব্যস্তে বলে, 'একটু দাঁড়ান দাদা, নিচে গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছি।'

অরিন্দম বলে, 'আমি আর ভেতরে যাব না। তোমার দিদিকে তাড়াতাড়ি আসতে বল।'

ওদের কথা শুনতে পেয়েছিল ললিতা। দ্রুত বেসিনের সামনে গিয়ে চোখেমুখে একটু জল দিয়ে, সামনে যে চটি পায় তাতে পা ঢুকিয়ে নেমে যায়। কাল রাতে যে শাড়িটাড়ি পরে শুয়েছিল তা বদলাবার কথা মনে থাকে না।

নিচে আসতেই নিঃশব্দে গাড়ির পেছন দিকের দরজা খুলে দিয়ে সামনে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে অরিন্দম। ললিতা উঠতেই সে স্টার্ট দেয়। এক মিনিটের ভেতর গাড়িটা রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে চলে আসে।

এখনও ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে কলকাতা মেট্রোপলিস। তবে অন্ধকার আগের মতো গাঢ় নেই, ফিকে হয়ে আসছে। এ বছর শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে, কনকনে উত্তুরে হাওয়া সাঁই সাঁই বয়ে যাচ্ছে ঝড়ের গতিতে।

দোতলা থেকে নিচে নামার সময় চাদর কি কার্ডিগান নেবার কথা মাথায় ছিল না ললিতার। এখন ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর যেন জমে যাচ্ছে। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কুঁকড়ে বসে থাকে সে।

রাস্তা একেবারে সুনসান। লোকজন চোখে পড়ে না। তবে খুব সম্ভব ফার্স্ট ট্রামটা বেরিয়েছে। ঘন্টি বাজাতে বাজাতে, কুয়াশা ফুঁড়ে কোনো অপার্থিব গ্রহের অলৌকিক যানের মতো সেটা সামনে দিয়ে চলে যায়। ক্বচিৎ কখনও দু-একটা লরি কি ট্যাক্সি চকিতে দেখা দিয়েই পলকে দূরে, আরো দূরে, গাঢ় কুয়াশায় অদৃশ্য হয়।

শীতভোরের নির্জন রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কুয়াশাতরল অন্ধকার, দু'ধারের ঝাপসা বাড়িঘর, কোনো কিছুই দেখছে না ললিতা, পলকহীন তাকিয়ে আছে অরিন্দমের দিকে।

একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, অরিন্দম তাকে ফ্রন্ট সিটে নিজের পাশে বসতে বলে নি। অবশ্য বলার কারণও নেই। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর তার সঙ্গে সম্পর্কই বা কী? তবু নিজের অজান্তে বুকের ভেতর চিনচিনে একটু কষ্টই যেন টের পায় ললিতা।

অরিন্দম তাকে নিয়ে কোন দিকে চলেছে বোঝা যাচ্ছে না। একসময় দ্বিধান্বিতভাবে ললিতা বলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

একটু যেন চকিত হয়ে ওঠে অরিন্দম। অন্যমনস্কর মতো উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে ছিল সে। স্পিড সামান্য কমিয়ে মুখ ফেরাতে গিয়ে হঠাৎ ডান দিকের আয়নায় ললিতাকে দেখতে পায়। হিমে একেবারে জড়সড় হয়ে আছে সে।

অরিন্দম বলে, 'আপাতত থানায় যাচ্ছি।' তার গায়ে সোয়েটারের ওপর একটা গরম শাল জড়ানো। এক হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে, আরেক হাতে শালটা খুলে প্রাক্তন স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এটা গায়ে দিয়ে নাও।'

সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় ললিতার। অরিন্দমের কাছ থেকে এতটা সে আশা করে নি, এটা ছিল তার সুদূর কল্পনারও বাইরে। শালটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে সে।

কিছুক্ষণ পর অরিন্দম ফের বলে, 'কী হল, গায়ে দিলে না?'

অরিন্দম যে গাড়ি চালাতে চালাতে পাশের মিররের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে, ললিতা টের পায় নি। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে শালটা গায়ে জড়িয়ে নেয় সে। কাশ্মিরি শালের কোমল উষ্ণতা তার শীতল, জমে-আসা শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে থাকে।

থানায় পৌঁছে দেখা যায়, বিশাল বাড়িটা একেবারে নিঝুম। কোলাপসিবল গেটের ওধারে খাটিয়ার ওপর দু'জন কনস্টেবল কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তাদের জাগিয়ে, গেট খুলিয়ে ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢোকে অরিন্দম। একটি ঝকঝকে তরুণ অফিসার রাতের ডিউটিতে ছিল। মানুষ হিসেবে সে খুবই সহানুভূতিপ্রবণ। মলির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা শুনে চটপট ডায়েরি লিখে নেয়। তারপর বলে, 'রোদ উঠলেই আমার ডিউটি শেষ। কোয়ার্টার্সে ফিরে যাবার কথা। তবে এখন যাচ্ছি না। এই কেসটা আমি নিজেই হ্যান্ডল করব। দেখি মেয়েটিকে খুঁজে বার করা যায় কিনা।' একটু ভেবে বলে, 'আমার কয়েকটা পয়েন্ট জানার আছে।'

অরিন্দম এবং ললিতা পাশাপাশি বসে উন্মুখ তাকিয়ে থাকে।

অফিসারটি ললিতাকে জিগ্যেস করে, 'অ্যালার্মের আওয়াজে ঘুম ভাঙার পর দেখলেন, আপনার মেয়ে মানে মলি আপনার পাশে নেই। তখন আপনারা দু'জনে সারা ফ্ল্যাট খুঁজে দেখলেন। কিন্তু—'

ললিতা এমন কথা বলে নি যে সে আর অরিন্দম মলিকে খুঁজেছে। অরিন্দমের ব্যাপারটা অফিসার ধরে নিয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আধফোটা গলায় ললিতা বলে, 'ও ছিল না। আমি আর আমাদের কাজের মেয়ে আরতিদি, দু'জনে মিলে খুঁজেছি।'

অফিসারটি একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করে, 'তা হলে ইনি কোথায় ছিলেন?'

রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়ে ললিতা। অফিসার যেভাবে জেরা শুরু করেছে, তার ফলে অরিন্দমের সঙ্গে তার এখনকার সম্পর্কটা বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সেটা খুবই অস্বস্তিকর। ললিতা কী উত্তর দেবে যখন ঠিক করে উঠতে পারছে না সেই সময় অরিন্দম তাকে বাঁচিয়ে দেয়। বলে, 'বালিগঞ্জ প্লেসে আমাদের একটা বাড়ি আছে। আমি কাল রাতে সেখানে ছিলাম।' ললিতাকে দেখিয়ে বলে, 'ভোরে ওর ফোন পেয়ে চলে এসেছি।'

অরিন্দমের স্টেটমেন্টের ভেতর এক ফোঁটা মিথ্যে নেই। অফিসার বলে, 'ও, আচ্ছা। ইনি আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই?'

একটু ইতস্তত করে অরিন্দম আস্তে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ তা-ই।

ললিতা বুঝতে পারে, অরিন্দম ইচ্ছা করেই তাদের ডিভোর্সের কথাটা বলে নি। তাতে জটিলতাই বাড়বে।

অফিসার অবশ্য এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না। সে বলে, 'মলি যে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে ওভাবে বেরিয়ে গেল, এর কারণ কী হতে পারে?'

ললিতা এবং অরিন্দম একসঙ্গে বলে ওঠে, 'বুঝতে পারছি না।'

'ওকে কি বকাবকি বা মারধর করা হয়েছিল?'

ললিতা বলে, 'না। মলি এত বাধ্য আর ভালো যে ওসবের দরকার হয় না।'

'অন্য কোনো কারণে কি ওর মনটন খারাপ হয়েছিল?'

'কী ধরনের কারণের কথা বলছেন?'

'এগ্‌জাক্টলি বলতে পারব না।' চোখ কুঁচকে একটু ভেবে অফিসার বলে, 'ধরুন, স্কুলে পড়া পারে নি বলে শাস্তি পেয়েছে কিংবা উইকলি টেস্টে রেজাল্ট খারাপ করেছে—'

ললিতা বলে, 'ইমপসিবল। আমি কালও ওর স্কুলের খাতাগুলো দেখেছি। সব সাবজেক্টেই ভেরি গুড পেয়েছে।'

'ঠিক আছে। ওর কোনো ফোটো এনেছেন?'

মলির একটা ছবি আনা উচিত ছিল। নইলে তাকে চেনা যাবে কী করে? কিন্তু এখানে আসার সময় দুশ্চিন্তায়, স্নায়বিক চাপে ললিতারা এতই বিপর্যস্ত ছিল যে ফোটোর কথাটা মাথায় আসে নি। ললিতা বলে, 'না, মানে—'

তরুণ অফিসারটি বলে, 'কিন্তু ওটা চাই-ই।'

'ঠিক আছে। পরে আমি দিয়ে যাব।'

'পরে না, এখনই দরকার। আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। ফোটোটা নিয়ে মলিকে খুঁজতে বেরুব।'

অফিসারটির কর্তব্যবোধে অভিভূত হয়ে যায় ললিতা এবং অরিন্দম। এতটা তারা আশা করে নি। ললিতা বলে, 'ধন্যবাদ। মলিকে পাওয়া যাবে তো?' বলতে বলতে তার গলা কাঁপতে থাকে।

অফিসারটি জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।' তারপর ফোন করে লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে মলির খবরটা জানিয়ে দিয়ে বলে, কলকাতার সব থানাকে যেন আলার্ট করে দেওয়া হয়। শহর থেকে বাইরে বেরুবার যত রাস্তা আছে, ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট যেন সব জায়গায় নজর রাখে। ললিতাদের কাছে মলির চেহারা, বয়স ইত্যাদি সম্পর্কে যা শুনেছিল তা-ও জানায় অফিসারটি। বলা যায় না, কোনোভাবে ছেলেমেয়ে পাচারকারীদের হাতে মলি পড়েছে কিনা। তারা যদি ওকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে তাই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

লাইনের ওধার থেকে খুব সম্ভব আরো কিছু জানতে চাওয়া হয়। তার উত্তরে অফিসারটি বলে, 'ওর ফোটো শিগ্‌গিরই পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তারপর ফোন নামিয়ে রেখে দু'জন কনস্টেবলকে ডেকে তৈরি হয়ে নিতে বলে।

মিনিট পাঁচেক বাদে দেখা যায় থানা থেকে বেরিয়ে অরিন্দমের গাড়িটা সামনে চলেছে, ব্যাক সিটে কিছুক্ষণ আগের মতোই চুপচাপ বসে আছে ললিতা। আর তাদের পেছন পেছন আসছে একটা জিপ। সেটা চালাচ্ছে সেই অফিসারটি। তার সঙ্গে রয়েছে দুই কনস্টেবল।

ললিতার ফ্ল্যাটের কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করায় অরিন্দম। ললিতা নেমে অফিসারকে বলে, 'ওপরে আসুন—'

অফিসারটি বলে, 'এখন একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন মেয়ের একটা ফোটো নিয়ে আসুন।' ললিতা চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে আবার বলে, 'একটা আর্জেন্ট ব্যাপার একদম ভুলে গেছি। আপনাদের ফোন নাম্বারটা লিখে নিয়ে আসবেন। তেমন দরকার হলে যোগাযোগ করতে সুবিধা হবে।'

একটু ইতস্তত করে অরিন্দম ললিতাকে বলে, 'বালিগঞ্জ প্লেসের ফোন নাম্বারটাও লিখে দিয়ো। কলকাতার ফোন তো, ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টেবল। একটা না পাওয়া গেলে আরেকটায় ট্রাই করা যেতে পারে।'

অফিসারের সামনে যে কৈফিয়তই দিক অরিন্দম, দু'টো ফোন নম্বর দেবার কারণ ললিতাই শুধু জানে। কয়েক পলক স্থির চোখে অরিন্দমকে লক্ষ করে সে, তারপর বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

আধ ঘন্টা আগে ললিতা যখন অরিন্দমের সঙ্গে থানায় যায় তখন থেকেই আরতি দোতলার ব্যালকনিতে বসে ছিল। গাড়ি দেখে দ্রুত নিচে নেমে দরজা খুলে একধারে দাঁড়িয়ে যায়। ললিতা দোতলা থেকে মলির দু-তিনটে ফোটো এনে অফিসারকে দেয়।

অফিসারটি বলে, 'আমরা তো খুঁজছিই। আপনারাও খোঁজ করুন। দেখুন আত্মীয়স্বজন বা ওর কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গেছে কিনা—'বলে জিপে স্টার্ট দিয়ে চলে যায়।

অরিন্দম তার গাড়ি থেকে নামে নি। সে বলে, 'অফিসারের সাজেসানটা ভালো। উঠে এস।'

নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মতো আবার ব্যাক সিটে উঠে বসে ললিতা।

অরিন্দম জিগ্যেস করে, 'মলির ক্লাসের বন্ধুদের সবাইকে চেনো?'

ললিতা বলে, 'মেয়ের স্বভাব তো জানো। মলি কি কারো সঙ্গে সহজে মেশে?'

'দু-চারজনের সঙ্গে তো মেশে। ও সেদিন বলছিল কাদের যেন নেমন্তন্ন করবে—' বলে মুখ ফিরিয়ে ললিতার দিকে তাকায় অরিন্দম।

খানিক চিন্তা করে ললিতা বলে, 'হ্যাঁ। তিন-চারজনকে প্রায়ই ফোন করে—জয়িতা, বনি, রিয়া আর সূর্য। ওরা মাঝে মাঝে আসেও।'

'ওদের বাড়ি চেনো?'

ললিতা জানায়, চেনে। এই বন্ধুদের জন্মদিনে মলিকে সে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। শুধু জন্মদিনের পার্টিতেই নয়, অন্য সময়ও কয়েকবার নিয়ে গেছে।

অরিন্দম গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জিগ্যেস করে, 'সবচেয়ে কাছে কারা থাকে?'

'জয়িতারা। চক্রবেড়ে রোড সাউথে—'

অরিন্দম গাড়ির মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দেয়। মলি ভোর রাতে উঠে বন্ধুদের বাড়ি যাবে, ললিতা এটা ভাবতে পারছিল না। তবে কিনা বাচ্চাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে ওঠা মুশকিল। ঝোঁকের বশে কখন যে তারা কী করে বসবে, আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। ললিতার মনে ক্ষীণ একটু দুরাশা দেখা দেয়, যদি মলি জয়িতা কি রিয়া-টিয়াদের বাড়ি গিয়ে থাকে।

এদিকে অন্ধকার আর কুয়াশা অনেকটা কেটে গেছে। আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। রাস্তা-টাস্তা এখন আর ফাঁকা নেই। দুধের গাড়ি, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, বাস-টাস শীতের বাতাস চিরে সাঁ সাঁ করে ছুটছে। আর চোখে পড়ে খবরের কাগজওলাদের। সাইকেলের পেছনে মর্নিং এডিশানের টাটকা কাগজের পাহাড় নিয়ে তারা ঝড়ের গতিতে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ব্যাক সিটে একা একা বসে দুশ্চিন্তায়, ভয়ে নিজের অজান্তেই কাঁপতে থাকে ললিতা। যদি মলি জয়িতাদের বাড়ি না গিয়ে থাকে? হঠাৎ বুকের ভেতর থেকে হু হু করে কান্না উঠে আসে।

উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে চোখ রেখে গাড়ি চালাচ্ছিল অরিন্দম। ফোঁপানির শব্দে চমকে পেছন ফিরে দেখে, ললিতার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সে, তারপর গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে পেছন দিকের দরজা খুলে নরম গলায় বলে, 'সামনে এস—'

নিঃশব্দে ফ্রন্ট সিটে এসে বসে ললিতা। তবে কাঁদতেই থাকে। অরিন্দম বলে, 'কেঁদো না ললি, কেঁদো না।' বলতে বলতে ললিতার কাঁধে একটা হাত রাখে, 'এত অস্থির হলে মলিকে খুঁজবে কী করে? ললি প্লিজ—' অরিন্দমের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে।

ললিতার কান্না কিন্তু থামে না। কতকাল বাদে অরিন্দম তাকে ছুঁল! পরিচিত এই স্পর্শ তার সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দেয়। দু'হাতে অরিন্দমের হাতটা আঁকড়ে ধরে সে। যে কান্নাটা এতক্ষণ ছিল চাপা, অনুচ্চ, এবার সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

ললিতার কান্না অদ্ভুত এক কষ্টকে অরিন্দমের মধ্যেও চারিয়ে দিচ্ছিল। সে কাঁপা গলায় বলে, 'প্লিজ ললি—প্লিজ—'

ললিতা ভাঙা ভাঙা, ঝাপসা স্বরে বলে, 'আমার মন বলছে, মলি বন্ধুদের কাছে যায় নি। গেলে নিশ্চয়ই ওদের বাড়ি থেকে ফোন করে জানিয়ে দিত।'

কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। একটা ছোট মেয়ে এভাবে শীতের রাতে একা চলে আসবে আর তার অভিভাবককে খবর দেওয়া হবে না, তা কখনও হতে পারে না। মলির বন্ধুদের মা-বাবাদের কাছ থেকে এটুকু দায়িত্ববোধ নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

ললিতা যা বলেছে তারপর হতাশা ছাড়া আর কিছু থাকে না। কিন্তু মলির ব্যাপারে সামান্য সম্ভাবনাও ছাড়তে রাজি নয় অরিন্দম। সে বলে, 'হয়তো ওরা ভেবেছে, সকালে মলিকে পৌঁছে দেবে।'

ললিতা বুঝতে পারে, চূড়ান্ত এক দুরাশাকে বুকের ভেতর প্রাণপণে জাগিয়ে রেখেছে অরিন্দম; কিছুতেই সেটাকে নিবে যেতে দিচ্ছে না। ললিতা আর কিছু বলে না।

চক্রবেড়ে রোড সাউথ-এ এসে জয়িতাদের ঘুম ভাঙিয়ে জানা যায় মলি এখানে আসে নি। আর যেটা ঘটে তা এইরকম।

জয়িতার মা-বাবা জানত ললিতা ডিভোর্সি। অরিন্দমকে তারা চিনত না, তবে তার পরিচয় জেনে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

গুরুসদয় রোডে থাকে রিয়ারা, ক্রিক রোতে সূর্যরা, নিউ আলিপুরে বনিরা। জয়িতাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিন জায়গাতেই যায় ললিতা এবং অরিন্দম। কিন্তু যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা-ই। মলি কোনো বন্ধুর বাড়ি যায় নি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে ললিতা আর অরিন্দম। মলি সম্বন্ধে তার বন্ধুদের মা-বাবারা যতটা উদ্বিগ্ন তার চেয়ে অনেক বেশি কৌতূহলী তাদের সম্পর্ক নিয়ে। জয়িতার মা-বাবার মতো এই সব মা-বাবারা অত্যন্ত উৎসুক চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

চারটে বাড়ি ঘুরতে বেশ বেলা হয়ে যায়। সবার শেষে ওরা গিয়েছিল নিউ আলিপুরে। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে সঞ্জয়ের কথা মনে পড়ে যায় অরিন্দমের। বলে, 'আচ্ছা, মলি ওর মামাবাড়ি যায়?'

ললিতা পাশ থেকে ঝাপসা গলায় বলে, 'যায় মাঝে মাঝে। কেন?'

'ওখানে একবার খোঁজ নিয়ে দেখা যাক।'

ললিতা উত্তর দেয় না, অবসন্নের মতো বসে থাকে। তার সব আশা যেন শেষ হয়ে গেছে।

হিন্দুস্থান পার্কে এসে নতুন খবর কিছুই পাওয়া যায় না। মলি সেখানেও যায় নি।

সঞ্জয় এবং তার স্ত্রী বিজয়া মানুষ খারাপ নয়। মলির কথা শুনে ওরা যতটা উৎকণ্ঠিত, ঠিক ততটাই খুশি বোনের সঙ্গে প্রাক্তন ভগ্নিপতিকে দেখে। তারা দু'জনকে চা খেয়ে যাবার জন্য বার বার বলতে থাকে।

অরিন্দম বলে, 'এখন না। পরে একদিন এসে খাব। আমাদের মানসিক অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

সঞ্জয় বলে, 'কথা দিলে কিন্তু।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'ললিকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।'

অরিন্দম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'ও যদি আমার সঙ্গে আসতে চায়, আসবে। এখন যাই। দেখি মলিকে কিভাবে খুঁজে বার করা যায়।'

সঞ্জয় সচকিত হয়ে বলে, 'লালবাজারে আমার দুই বন্ধু টপ পজিশনে আছে। আমিও ওদের কাছে যাচ্ছি। মলিকে খুঁজে পেতেই হবে।'

হিন্দুস্থান পার্ক থেকে ললিতার বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে অরিন্দম বলে, 'ঘোরাঘুরি করে খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছ। একটু রেস্ট নাও। বাড়ির সবাই মলির জন্যে চিন্তা করছে। যাই, ওদের খবরটা দিতে হবে।'

এক পলক অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয় ললিতা। নিচু গলায় বলে, 'ওপরে আসবে না? আমার ভীষণ ভয় করছে।' তার ঠোঁট এবং গলার কাছটা থির থির করে কাঁপছে।

ললিতাকে দেখতে দেখতে কী যেন ঘটে যায় অরিন্দমের মধ্যে। গভীর গলায় তার একটা হাত ধরে বলে, 'আচ্ছা, চল—'

ওপরে এসে প্রথমে বালিগঞ্জ প্লেসে ফোন করে অরিন্দম জানিয়ে দেয়, মলিকে এখনও পাওয়া যায় নি। তারপর থানায় ফোন করে। কিন্তু সেই অফিসারটি ফিরে আসে নি।

সেই ভোর রাত থেকে তারা ঘুরছে। কারো মুখটুখ পর্যন্ত ধোওয়া হয় নি। অরিন্দম যখন ফোন করছিল সেই সময় নতুন একটা ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে তার সামনে এনে রেখেছে ললিতা। সেই সঙ্গে একটা নতুন দামি তোয়ালেও। ওদিকে আরতি ক্ষিপ্র হাতে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে।

মুখটুখ ধোওয়ার পর চা ছাড়া আর কিছুই খায় না অরিন্দম।

ললিতা বলে, 'একটু কিছু খাও।'

অরিন্দম বলে, 'ভালো লাগছে না।'

ললিতারও কিছু খেতে ইচ্ছা করছিল না। সে-ও চায়ের কাপই শুধু তুলে নেয়।

চা খাওয়া হয়ে গেলে অরিন্দম অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ পায়চারি করে। তারপর বলে, 'আমি বরং একবার থানায় যাই।'

ললিতা বলে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'তোমার বাড়িতে থাকা দরকার। সঞ্জয়দা লালবাজারে যাবে বলল। যদি কোনো খবর থাকে, নিশ্চয়ই এখানে ফোন করবে। তোমাকে না পেলে অসুবিধা হবে।'

'ঠিক আছে।'

সেই যে অরিন্দম থানায় গেল, তারপর ঘন্টা দুই কেটে গেছে। এর ভেতর তার ফোন তো আসেই নি, সঞ্জয়ও কোনোরকম যোগাযোগ করে নি।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। মলির দুশ্চিন্তাটা চাক চাক বরফের মতো স্নায়ুর ওপর চেপে বসেছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে ললিতার। এই ফ্ল্যাট, নিচের রাস্তায় লোকজনের ভিড়, ব্যস্ততা, গাড়ি-টাড়ির অবিশ্রান্ত ছোটাছুটি, হইচই—সব অসহ্য লাগছে। মাথার ভেতরকার সব শিরা যেন ছিঁড়ে যাবে।

একসময় মরিয়া হয়েই সে ঠিক করে ফেলে, থানায় যাবে। পোশাক বদলে বেরুতে যাবে, সেই সময় কলিং বেলের আওয়াজে দরজা খুলে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে ললিতা। তার ঠিক সামনেই মলি আর অরিন্দম।

কয়েক সেকেন্ড পর হৃৎপিন্ডের ভেতরকার তুমুল এক আবেগ ললিতাকে ঠেলে নিয়ে যায় যেন। দু'হাতে মলিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ভেতরে আনতে আনতে সে সমানে কাঁদতে থাকে, 'কোথায় গিয়েছিলি মলি? কেন গিয়েছিলি? আমি তো তোকে কখনও বকি না, মারি না। তবু কেন গেলি সোনা?'

মলি চুপ করে থাকে।

অরিন্দম তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে এসেছিল। ললিতা ব্যাকুলভাবে তাকে জিগ্যেস করে, 'কোথায় পেলে ওকে?'

অরিন্দম জানায়, সে তাকে খুঁজে বার করতে পারে নি। সব কৃতিত্ব সেই তরুণ অফিসারটির। একটা পার্কে বসে কাঁদছিল মলি। তাকে ঘিরে ভিড় জমে গিয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতে সেখানে চলে যায় অফিসারটি। ছবি মিলিয়ে মলিকে চিনতে পারে। তারপর থানায় নিয়ে আসে।

ললিতা বলে, 'অফিসারকে আমাদের এখানে আসতে বল নি?'

'বলেছি। সন্ধের পর আসবে।'

'আমাদের গ্র্যাটিচুড জানিয়েছ?'

'সে কি আর তোমার বলার অপেক্ষা রাখে? ভদ্রলোক যা করেছে, সমস্ত জীবন মনে রাখব।'

'মলি কেন না বলে চলে গিয়েছিল, কিছু বলেছে?'

'বলেছে।'

'কী?'

'ওর কাছ থেকেই জেনে নাও না।'

মলিকে জিগ্যেস করলে সে ললিতার বুকে মুখ লুকিয়ে বলে, 'বাবার জন্যে মন খারাপ লাগছিল। তাই—' একটু থেমে বলে, 'কিন্তু অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

ললিতা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর বলে, 'বাবার কাছে যেতে চাও, আমাকে বল নি কেন?'

'তুমি যদি যেতে না দিতে?'

'বাবার কাছে যাবে, আর আমি যেতে দেব না!' বলে আবার কাঁদতে শুরু করে ললিতা।

অনেকক্ষণ পর আরতির জিম্মায় চলে গেছে মলি। মুখ ধুইয়ে, ফ্রক-ট্রক পালটে, চুল আঁচড়ে এখন পাশের ঘরে তাকে খাওয়াতে বসেছে সে।

আর বড় বেডরুমটায় পাশাপাশি বসে আছে ললিতা আর অরিন্দম।

অরিন্দম একসময় বলে, 'এবার আমি যাই।'

কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গিয়েছিল ললিতার। মুখ তুলে সে বলে, 'যাবে?'

'মেয়েকে তো ফিরে পেয়েছই। এখন আর আমার—' কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় অরিন্দম।

ললিতা কাঁপা গলায় বলে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আবার যদি ওভাবে মলি তোমার জন্যে না বলে-কয়ে বেরিয়ে পড়ে? একবার ফিরে পেয়েছি বলে আবার পাব তার কি ঠিক আছে? তখন কী হবে? মলিকে আমি হারাতে পারব না।'

বিমূঢ়ের মতো অরিন্দম বলে, 'কিন্তু—'

তার কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না ললিতা। বলে, 'আমাদের দু'জনের কাছে না থাকলে ও আবার না জানিয়ে বেরিয়ে পড়বে।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'স্পষ্ট করে না বললে কিছুই বুঝতে পার না তুমি!' বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকে ললিতা, 'আমরা কি নতুন করে আবার শুরু করতে পারি না? মলির জন্যে—মলির জন্যে—'

কয়েক পলক ললিতার দিকে তাকিয়ে থাকে অরিন্দম। তারপর ধীরে ধীরে অসীম মমতায় তাকে নিজের বুকের ভেতর জড়িয়ে নেয়। টের পায় তার জমা-টামা চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে।

পাওয়া

উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, কোনো বিস্ময় নেই। শুধু টিলা আর টিলা। চড়াই-এর পর উতরাই-এ মাটি এখানে তরঙ্গিত।

কবে যেন একদিন মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তরগুলিতে একখানা সমুদ্র অবিরাম দোল খেত আর শাসাত। কে এক জাদুকর মন্ত্র পড়ে চিরদিনের মতো তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। ফল হয়েছে এই, তার অস্থিরতা আর নেই। শাসানিও থেমে গেছে। মন্ত্রপড়া ঢেউগুলো শুধু মাথা তুলে দিনের পর দিন একইভাবে অনড় হয়ে আছে।

মাটির রং এখানে কালো। এত কালো, মনে হয় কৃষ্ণাঙ্গী এক আদিবাসিনী শরীর এলিয়ে দিয়ে এই প্রান্তরে শুয়ে আছে।

কৃষ্ণাঙ্গীই শুধু নয়, মহারাষ্ট্রের এই মাটি রুক্ষ, কর্কশ, আদিম। কোথাও তার এতটুকু কোমলতা নেই। গ্রানাইট পাথরের জড়তা মেশানো এই প্রান্তরগুলির কোনো প্রান্তেই প্রাণের সমারোহ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাঝে মাঝে কন্টিকারির ঝোপ, এক-আধ চাপড়া হলুদ রঙের আধ-মরা ঘাস, কদাচিৎ দু-চারটে রোগা চেহারার বাবলা। এর মধ্যেই জন্মের সমস্ত উদ্যম শেষ। পৃথিবী এখানে প্রসূতি নয়, বন্ধ্যা। বন্ধ্যা বললে বোধ হয় ঠিক হয় না, বলা উচিত মৃতবৎসা।

চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়াল জোহন। লোকটা পিদ্রু অর্থাৎ গোয়াঞ্চি ক্রিশ্চান। বয়েস চল্লিশোর্ধ্বে কিন্তু পঞ্চাশের অনেক নিচে। থ্যাবড়া নাক, গায়ের রং পোড়া তামাটে, মুখে বহুদিনের না-কামানো দাড়িগোঁফ। নেশা এবং আনুষঙ্গিক তাবত অত্যাচারের ছাপ শীলমোহরের মতো তার সর্বাঙ্গে মারা আছে।

জোহন-চরিত বুঝবার জন্য তার ভেতরে ঢোকার প্রয়োজন নেই। শরীরময় অসংখ্য ধ্বংসের স্মৃতি এবং ডান গালে, কপালে আর গলার কাছে লম্বা লম্বা কাটা দাগগুলো সেটা অনেকখানিই ব্যাখ্যা করে রেখেছে।

যাই হোক, ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকাল জোহন। বেলাটা আন্দাজ করে নিতে চাইল বোধ হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দু'টো ফিরিয়ে আনতে হল তাকে। কেননা ইতিমধ্যেই সূর্যটা কখন যেন আকাশের ঢাল বেয়ে মাথার ওপর উঠে এসেছে।

আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে একবার চারপাশ দেখে নিল জোহন। উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে—এই তিন দিকের সব পথেই তার জন্য কাঁটা ছড়ানো। পুবে গেলে ধেইহেল, উত্তরে রাজপিপলা আর দক্ষিণে গেলে নিপানি। যেখানেই সে যাক, ধরা পড়তেই হবে। সমস্ত মহারাষ্ট্র জুড়ে তার জন্য ফাঁদ পাতা রয়েছে। তিনটে হত্যা, নোট জাল, জালিয়াতি, স্ত্রীঘটিত ব্যাপার—পেনাল কোডের পৃষ্ঠাগুলিতে যত রকম অপরাধের তালিকা আছে তার কোনোটাই বাদ দেয়নি সে। একবার ধরা পড়লে ফাঁসি তার নিশ্চিত। কিন্তু ফাঁসির দড়িটা গলায় জড়াতে খুব উৎসাহ বোধ করে না জোহন।

অনেকদিন আগেই পুলিশ পিছু নিয়েছিল। জোহন অবশ্য তাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মাসতিনেক আগে রেসের মাঠে একজনকে ছুরি মারার পর থেকেই পুলিশ শিকারি কুকুরের মতো হন্যে হয়ে উঠেছে। কাজেই লুকোচুরির মাত্রাটা বাড়াতে হয়েছিল জোহনকে। আজ ঔরঙ্গাবাদ, কাল পিপলি, পরশু মানমদ—তাড়া খাওয়া একটা জন্তুর মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে জোহন। যেখানেই গেছে, তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় টের পেয়েছে, এখানে খুব বিপদ। তৎক্ষণাৎ আরেক ঠিকানায় পাড়ি জমিয়েছে সে। কিন্তু সমস্ত মহারাষ্ট্রে নিজের জন্য নিরাপদ একটু জায়গা কোথাও আবিষ্কার করতে পারেনি। ক্রমাগত তার মনে হচ্ছিল, একটা অদৃশ্য জাল অতি দ্রুত চারপাশ থেকে গুটিয়ে আসছে। যে কোনো মুহূর্তে সে ধরা পড়ে যাবে। ভয়ে আতঙ্কে জোহন যখন উদ্‌ভ্রান্ত ঠিক সেই সময় পশ্চিম দিকটার কথা মনে পড়েছে তার। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর অপেক্ষা করেনি। দিন তিনেক আগে রত্নগিরি থেকে হাঁটতে শুরু করেছিল। তিন দিন তিন রাত অবিরাম হেঁটে অবশেষে এই প্রান্তরে এসে পৌঁছেছে।

উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে—সবদিকের সব পথই তার বন্ধ। শুধু খোলা আছে পশ্চিমের দুয়ার। ভুরুর ওপর হাত রেখে সেদিকেই তাকাল জোহন। কিন্তু আর কতদূর?

টিলার সমুদ্রটা পশ্চিম দিগন্তে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তারপর সারি সারি ধোঁয়ার দৈত্য আকাশের দিকে মাথা তুলে রয়েছে। জোহন জানে ওগুলো সাতপুরা পাহাড়ের চুড়ো। তার গন্তব্য সেখানেই। সে শুনেছে সাতপুরার গায়ে ইতস্তত আদিবাসীদের গ্রাম ছড়িয়ে রয়েছে। তার একটাতে গিয়ে আপাতত আশ্রয় নেবে সে।

জোহনের ধারণা পৃথিবীর কোলাহল থেকে অত দূরে, প্রকৃতির সেই দুর্গম স্বদেশে পুলিশ তার খোঁজ না-ও পেতে পারে।

তিনদিন তিন রাত কিছুই খায়নি জোহন। এমনকি এই নির্দয় প্রান্তরে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পায়নি। জিভের ডগা থেকে বুক পর্যন্ত একরাশ ধারাল বালির মতো হয়ে আছে। মুখ থেকে লালা বার করে যে গলা ভিজিয়ে নেবে, তারও উপায় নেই। লালা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

টলতে টলতে আবার হাঁটতে শুরু করল জোহন। তারপর গ্রানাইট শিলার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। সজ্ঞানে নয়, বাঁচবার অদম্য এক ইচ্ছা ঘোরের মধ্যে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে যেন।

বিকেল পর্যন্ত একটানা হাঁটল জোহন। তারপরেই তার মনে হতে লাগল, শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। আকাশে এখনও দিনান্তের আলো ছড়ানো। তার মনে হল, সব অন্ধকার হয়ে আসছে। আর কানের কাছে ঝিঁঝিদের একটানা অবিশ্রান্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

জোহন হয়তো বেহুঁশই হয়ে পড়ত। ঠিক সেই সময় খানিকটা দূরে ইগ্রেঝার (গীর্জা) চুড়োটা চোখে পড়ে গেল। ধোঁয়ার দৈত্যগুলোও ততক্ষণে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাতপুরা তবে কি এসে গেছে?

এই প্রান্তরে গীর্জা! কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল জোহন। তারপর শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু দুই পায়ে সংগ্রহ করে গীর্জাটার দিকে একরকম দৌড়ই লাগাল। এই মুহূর্তে তার একটু জল চাই, তারপর কিছু খাদ্য, অবশেষে ঘুম।

গীর্জাটার ভেতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেল জোহন। সামনের দিকে পাথরের বিস্তৃত চত্বর। তার ওপর যে মিশনারি সন্ন্যাসিনীটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে কে ? একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জোহনের সমস্ত স্নায়ুর মধ্য দিয়ে দ্রুতবহ তরঙ্গ খেলে গেল। ঘন পালকে-ঘেরা সেই চোখ, সেই ঈষৎ টেপা ঠোঁট। সাদা পোশাকে সমস্ত শরীর আবৃত। মাথার চুল, হাত-পা—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু মনে হচ্ছে সে-ই। সাবন্তবাদীর সেই মেয়েটা, যার নাম রেবেলা। শুধু মনে হওয়া নয়, এ নিশ্চয়ই রেবেলা।

ওদিকে সন্ন্যাসিনীও স্থির, নিবদ্ধ দৃষ্টিতে জোহনের দিকে তাকিয়ে ছিল। এক সময় সম্মোহিত পশুর মতো পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে গেল জোহন। অর্ধস্ফুট চাপা গলায় বলল, 'রেবেলা না?'

সন্ন্যাসিনীর ঠোঁটদু'টো নড়ে উঠল। অনুচ্চ, শান্ত স্বরে সে বলল, 'আমার নাম তা-ই। আর পরিচয় হল সন্ন্যাসিনী। আমি খ্রিস্টের সেবিকা। কিন্তু তুমি সাবন্তবাদীর জোহন তো?'

আত্মবিস্মৃতের মতো জোহন উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি এখানে?'

আরেকটু হলে সত্যিটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত জোহনের। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'চিনালির দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তা ভুল করে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে রেবেলা তাকাল।

'আপনি' না 'তুমি'— কী দিয়ে সম্বোধন করবে, সেটা ঠিক করতে খানিক সময় লাগল জোহনের! শেষ পর্যন্ত মরিয়ার মতো বলে ফেলল, 'তুমি কবে সন্ন্যাসিনী হলে? এখানেই বা এলে কেমন করে?'

রেবেলার দৃষ্টি চকিতের জন্য একবার তীক্ষ্ণ হয়ে পরক্ষণেই স্নিগ্ধ হয়ে গেল। কী একটু ভেবে শান্ত সুরে সে বলল, 'সে সব কথা শুনে কী হবে? দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব ক্লান্ত। দিনকয়েক খাওয়া হয়নি। এস আমার সঙ্গে।'

এতক্ষণ খিদে তৃষ্ণার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছিল জোহন। সারা দেহে যে তিনদিনের অপরিসীম অবসাদ মাখা সে কথাও তার খেয়াল ছিল না। আবার সে সব মনে পড়ল। বলল, 'চল।'

সন্ন্যাসিনীর পিছু পিছু চলতে চলতে জোহন ভাবল, আশ্চর্য! সাতপুরার এই সুদূর পাহাড়ী এলাকায় রেবেলাকে যে এভাবে আবিষ্কার করবে, এ ছিল তার পক্ষে অকল্পনীয়। আরো আশ্চর্য, তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়নি রেবেলা। এমনকি তার শান্ত মুখে উদ্বেগের একটি রেখাও ফুটে বেরোয়নি। বরং অসংকোচে নির্ভয়ে তাকে ডাক দিয়েছে। সন্ন্যাসিনী রেবেলা একেবারেই ভয়লেশহীন, সাবলীল। কিন্তু সাবন্তবাদীর সেই মেয়েটা কেমন ছিল? চলতে চলতে জোহনের স্মৃতিতে দু'যুগ আগের দিনগুলো বিদ্যুৎচমকের মতো ফুটে উঠল।

সাবন্তবাদীতে জোহনদের প্রায় পাশাপাশি বাড়িতেই থাকত রেবেলারা। তারাও গোয়াঞ্চি ক্রিশ্চান। রেবেলা ছেলেবেলা থেকেই রূপসী। যৌবনে পৌঁছুবার আগেই তার রূপের খ্যাতি সারা সাবন্তবাদীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সে যাই হোক, মা-বাবা এবং রেবেলা নিজে—এই নিয়ে তাদের ছোট মাপের সংসার। রেবেলার বাবা আলমিডা ছিল মাল্লা। নিজের নৌকো অবশ্য ছিল না। পরের নৌকোয় ভাড়া খাটত। সারাদিনের পরিশ্রমের দাম ছিল তার আড়াই টাকা। কিন্তু ক'টা দিনই বা কাজে বেরুতে পারত আলমিডা! আজন্মের সহচর মারাত্মক হাঁপানিটি ছিল তার। প্রায় বারো মাসই সেটা তাকে বিছানায় ফেলে রাখত। ফল হত এই —তিনজনের ছোট্ট সংসারটা প্রায়ই অচল হয়ে থাকত।

আর জোহনের বাবার ছিল শুটকি মাছের কারবার। অবস্থা তাদের মাঝারি রকমের সচ্ছল। ছেলেবেলায় বাবা তাকে স্কুলে পাঠিয়েছিল। বছর দুয়েক মাত্র সেখানে যাতায়াত করেছিল জোহন। তারপর সে-পথ মাড়ানো ছেড়ে দিয়েছিল। পড়াশোনা ছেড়ে যে বাপের ব্যবসায় গিয়ে বসবে—তা-ও করেনি জোহন। কৈশোরের সীমানা পার হওয়ার আগেই সে মদ ধরেছিল। কথায় কথায় ছুরি চালাত। চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল সে, আর ছিল ভোগী। সাবন্তবাদীর সুরূপা মেয়েরা তার ভয়ে রাস্তায় বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছিল।

বিশেষ করে রেবেলার ওপর জোহনের আকর্ষণটা ছিল একটু বেশি মাত্রায়। প্রতিবেশীদের এই সুদেহিনী মেয়েটাকে আয়ত্ত করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিল সে। একটা লোভী জানোয়ারের মতো প্রায় রোজই রেবেলাদের বাড়ি হানা দিত জোহন। তার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনোরকম কপটতা ছিল না। একদিন সোজাসুজি বিয়ের কথাই পেড়ে বসেছিল সে। রেবেলার বাবা আলমিডা রাজি হয় নি। মাতাল গুণ্ডার হাতে কোন বাপই বা মেয়েকে স্বেচ্ছায় সঁপে দিতে পারে? রাজি না হওয়ার ফলাফল হয়েছিল মারাত্মক। প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিল জোহন। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছিল। আলমিডা বিশেষ কিছু বলেনি—শুধু বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল তাকে। যাবার সময় জোহন শাসিয়ে গিয়েছিল, সে দেখে নেবে। দেখে সে নিয়েও ছিল। দিন কয়েক পর রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার পথে ছুরির ঘা খেয়ে এসেছিল আলমিডা।

আলমিডা যতদিন বেঁচে ছিল দু'হাত দিয়ে মেয়েকে আগলে আগলে রেখেছে। সে মরবার পর আবার আসা-যাওয়া শুরু করেছিল জোহন। রেবেলের মা বারণ করেছে। জোহান শোনে নি। সাবন্তবাদীর পঞ্চায়েতে জোহনের নামে নালিশ জানিয়েও লাভ হয় নি। জোহনের ভয়ে পঞ্চায়েত নীরব থেকেছে। কাজেই তার রাহুগ্রাস থেকে বাঁচবার জন্যে রেবেলা আর তার মা পুণেতে এক আত্মীয়ের বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিল। রেবেলাকে পাওয়ার জন্য জোহন তখন উন্মত্ত। খুঁজে খুঁজে সেও পুণেতে এসেছিল।

পুণেতে বেশিদিন থাকা হয়নি রেবেলার। সেখান থেকে তারা গিয়েছিল রত্নগিরি। তারপর আজাগাঁও। আত্মীয়স্বজনের দুয়ারে দুয়ারে একটু আশ্রয়ের জন্য তারা করাঘাত হেনেছে। কোনো দুয়ার দু-চার দিনের জন্য খুলেছে। কোনোটা আবার খোলেই নি। যেখানেই তারা গেছে, অশুভ একটা ছায়ার মতো তাদের পিছু পিছু ফিরেছে জোহন। যে কোনো উপায়েই হোক, রেবেলাকে তার চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া তার হল না। আজগাঁও-এ এসে মা আর মেয়ে ভোজবাজির মতো কোথায় যে মিলিয়ে গিয়েছিল, হদিস পায় নি জোহন। একটা সুন্দরী সুদেহিনী মেয়ে নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাবে, এটা তার সহ্য হয় নি। দু-তিনটে বছর সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রায় তোলপাড় করে ফেলেছে সে। কিন্তু না, কোথাও রেবেলাকে খুঁজে পায় নি।

জোহন আর সাবন্তবাদী ফেরেনি। সোজা চলে গিয়েছিল ভুসাওয়াল। খুন-নেশা-স্ত্রীলোক

দিয়ে ঘেরা তার জীবনের নিজস্ব একটা কক্ষপথ ছিল। সেই অন্ধকার নিষিদ্ধ জগতে একটু একটু করে দিনে দিনে তলিয়ে গেছে সে।

কিন্তু রেবেলা—মাঝি আলমিডার সেই মেয়েটা আজ খ্রিস্টের সেবিকা, সন্ন্যাসিনী। আশ্চর্য!

গীর্জার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরখানায় এসে রেবেলা বলল, 'তুমি একটু জিরোও। আমি আসছি।'

ঘরের এক কোণে তক্তপোশে ধপধপে বিছানা পাতা। জোহন তার ওপর নিজেকে সঁপে দিল। আর রেবেলা বেরিয়ে উত্তর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাত্র কিছুটা সময়। তার পরেই একটা পায়জামা আর তোয়ালে নিয়ে ফিরে এল সে। বলল, 'বাঁ দিকের ঘরটা বাথরুম। তাড়াতাড়ি স্নান করে এস। আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

স্নান সেরে জোহন এসে দেখল, প্লেটে খাবার সাজিয়ে রেবেলা বসে আছে। খেতে খেতে সেই কথাটাই আবার মনে পড়ল জোহনের। সে জানে রেবেলা তাকে ঘৃণা করত। যত ঘৃণা তত ভয়। কিন্তু এই মুহূর্তে একলা ঘরে তাকে খাওয়াতে বসিয়েও এতটুকু শঙ্কা নেই মেয়েটার। এতখানি শক্তি কোথা থেকে সংগ্রহ করল সে? তাছাড়া আরো একটা কথা মনে পড়তেই অবাক হয়ে গেল জোহন। রেবেলাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছে সে। কিন্তু একটা স্নায়ুও উত্তেজিত হচ্ছে না, রক্তে ঝড় ভেঙে পড়ছে না। তবে কি এই পবিত্র ইগ্রেঝা (গীর্জা) তার সমস্ত অসংযমের উৎসটাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে?

নানা ভাবনার ভিড় ঠেলে সেই কৌতূহলটা আবার সামনে এসে দাঁড়াল। জোহন বলল, 'একটা কথা বড় জানতে ইচ্ছে করছে।'

'কী?' রেবেলা প্রশ্ন করল।

'তুমি 'নান' হলে কেমন করে?'

'তখনই তো বলেছি, সে কথা শুনে লাভ নেই।'

'লাভ লোকসানের কথা নয়। মানে—'

রেবেলা বুঝল, জোহনের কৌতূহলটা অদম্য হয়ে উঠেছে। একটু ভেবে নিস্পৃহ সুরে বলল, 'শুনবার যখন এতই ইচ্ছে তখন শোন। বাবা মারা যাবার পর সাবন্তবাদী থেকে মা আর আমি গেলাম পুণে, সেখান থেকে রত্নগিরি, তারপর আজাগাঁও। আত্মীয়দের বাড়ি দু-চার দিনের বেশি থাকতে পাই নি। আজাগাঁও-এ এসে নিরুপায় হয়ে চলে গেলাম ইগ্রেঝায়। সেখানে দু'জনে সন্ন্যাস নিলাম। মাসকয়েক ছিলাম আজাগাঁও-এ। তারপর আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেই থেকে এখানেই আছি।'

জোহনের জন্যই একদিন তাদের সাবন্তবাদী ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু সে কথা একবারও উল্লেখ করেনি রেবেলা। জোহন সম্বন্ধে কোনো ক্ষোভ অভিযোগ বা রাগ—কিছুই নেই তার।

নতচোখে কিছুক্ষণ খাবার নাড়াচাড়া করল জোহন। তারপর স্খলিত সুরে বলল, 'তোমার মা কোথায়?'

'নেই। ক'মাস আগে মারা গেছে।'

এরপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। হঠাৎ একসময় বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেবেলা। বলল, 'আমাকে এবার যেতে হবে। তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম কর।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়।

'কাজ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। সাতপুরার ওপাশে আদিবাসীদের কয়েকটা গ্রাম আছে। সেখানে কলেরা লেগেছে। রাত্রিবেলা ওখানে গিয়ে থাকতে হবে। চলি, কাল আবার দেখা হবে।'

জোহন চকিত হয়ে উঠল। ওই গ্রামগুলোতে আত্মগোপন করবার জন্যই তো সে এখানে এসেছে। অন্যমনস্কের মতো বলল, 'কলেরা লেগেছে?'

'হ্যাঁ। এশিয়াটিক কলেরা। পাঁচ দিনে দশখানা গ্রামের চল্লিশ জনের মতো মারা গেছে।'

'তা হলে তো ওদিকে যাওয়া বিপদ।'

'বিপদ বৈকি।'

কিছুক্ষণ ভেবে জোহন বলল, 'দেখ, আমি খুব ক্লান্ত। তোমাদের এখানে যদি দিন দুই তিন থাকি, আপত্তি আছে?'

রেবেলা বলল, 'না, আপত্তি কিসের। এখানকার বড় পাদ্রী ফাদার এড্রুজকে একবার শুধু জানাতে হবে। আচ্ছা আমি জানিয়ে দেব'খন।'

জোহন আসার পর একে একে তিনটে দিন পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে বার দুয়েক মাত্র দেখা হয়েছে রেবেলার সঙ্গে। আদিবাসী গ্রামে মহামারী নিয়ে সে খুব ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন। বসে কথা বলার অবকাশ হয় নি তার। দিনরাতই তার গ্রামে গ্রামে সেবা করে কেটে যায়। গীর্জায় ফিরে স্নান সেরে নাকে মুখে চাট্টি গুঁজেই দৌড় লাগায়।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা জোহনের ঘুম ভাঙিয়ে রেবেলা বলল, 'একটা সাহায্যের জন্যে তোমার কাছে এসেছি।'

'কী?' বিমূঢ়ের মতো জিগ্যেস করল জোহন।

'কলেরার দাপট ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এদিকে আমাদের লোকজনও তেমন নেই। এ গ্রাম সামলাতে সামলাতে ও গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। তাই বড় ফাদার বলছিলেন, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে ক'দিন গ্রামে যাও, বড় ভালো হয়। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। যাবার আগে তোমার যাতে না অসুখ হয় সে জন্যে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হবে।'

একটু ইতস্তত করে জোহন বলল, 'বেশ, যাব।'

সেই যে জোহন এসেছিল, তারপর একটা বছর পার হয়ে গেছে। এর ভেতর গীর্জা ছেড়ে আর যাওয়া সম্ভব হয় নি তার। কলেরার সেবা দিয়ে একটা বিচিত্র জীবন শুরু করেছিল সে। সমানে তার জের টেনে চলেছে। বিবেকহীন নিষ্ঠুর খুনী পশুটা ইদানীং রেবেলার সঙ্গে কোথাও মহামারীর খবর পেলে সেবা করতে ছোটে। দূরের গ্রামগুলিতে খ্রিস্ট-মাহাত্ম্য প্রচার করতে যায়। আর সারাদিনের কাজের শেষে গীর্জার চুড়োটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসে। কোনোদিন হয়তো রক্তের দাগ শুঁকে শুঁকে যেমন শ্বাপদ আসে তেমনিভাবেই তার খোঁজে পুলিশ আসবে। সে জন্য আজ আর বিচলিত নয় জোহন।

জোহন শুধু ভাবে, একদিন কি উন্মত্তের মতোই না রেবেলাকে পেতে চেয়েছিল সে। সেদিন পাওয়া হয় নি। কিন্তু আজ যখন রেবেলার সঙ্গে দূর গ্রামগুলোতে সে যায় তখন মনে হয়, সেদিনের না-পাওয়াটা আজ কত বড় পাওয়া হয়ে ফিরে এসেছে।

জোহন ভাবে, সেদিন রেবেলাকে পেলে কতটুকুই বা পেত! আর আজ? জগতে পাওয়ারও কত রকমফের।

রক্তকমল

ছোটো চাষার ছেলে—কোথায় সাতপুরুষের আবাদি জমিতে শক্ত থাবায় ধারালো লাঙলের ফলা চেপে চেপে ধরবে, কি ফসলের জন্য ঘাম-ঝরানো পরিশ্রমে বীজধান ছড়িয়ে আসবে চন্দনের মতো নরম মাটিতে, তা নয়, কোমল মুঠোয় কলম ধরে মোরগ-ডাকা সকাল থেকে সেই শিয়াল-ডাকা মধ্যরাত পর্যন্ত অবিরাম কী যে লেখে আজম, সে-ই জানে। সেদিন পাথরের মতো শক্ত মাটির চাঙড়ের ওপর দিয়ে লাঙল ঠেলতে ঠেলতে রায়েবালি অবশ্য বলেছিল, 'তোমার বড়ো পোলাটায় জবর গুণীন হইছে হে জিগিরালি চাচু, ভারি মিঠা মিঠা কবির গান বান্ধে। কথাখান শোনলাম নাপিত-বাড়ির কাত্তিকের মুখে।' আরো কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিল, 'ঠিক ঠিক। আমরাও শুনছি আজমের গান। চোমৎকার।'

জিগিরালির গলায় তীব্র বিরক্তির উত্তাপটা আর চাপা ছিল না। অনেক দিন ধরেই বুকের ভেতর আজম সম্পর্কে একটা ক্ষোভ টগবগ করছিল। বিকৃত একটা মুখভঙ্গি করে উঠেছে সে, 'আরে থুইয়া দ্যাও অমুন কবির গান! তোমারেই জিগাই সানকিতে ভাত আসে কুনখান থিকা? চাষার পোলা, ওই হগল সুখী ব্যারামে ধরলে খাইব কী? আমি আর কয়দিন বাচুম! আমারে গোরে যাইতে দ্যাও, তহন ঠেলাটা ট্যার পাইব। থুইয়া দ্যাও তোমার অমুন গুণীন সিন্দুকে ভইরা।'

গজগজ করতে করতে বাঁ-পাশের বলদটার ল্যাজে একটা নির্মম মোচড় দিয়েছিল জিগিরালি।

বৈশাখ মাসের দুপুর। রৌদ্রঝকিত দিগন্তের ওপর হলদে রঙের আগুন জ্বলছিল হা হা করে। জিগিরালির পোড়া তামাটে শরীরে অজস্র ধারায় ঘামের ফোয়ারা ফুটে বেরুচ্ছিল।

জিগিরালি বলেছিল, 'এইবার বাড়িমুখি চল রায়েবালি, প্যাটটা জ্বলতে আছে ক্ষুদায়। দেখ গিয়া তোমার গুণীনে অহন কবির গান বান্‌তে (বাঁধতে) আছে। ক্যান, এট্টু খ্যাতের কাম করলে সোম্মানটা কি খোয়া যায়? ইট্টু লাঙ্গলখান ধরলে আমার কতখানি কামের সুসার হয় কও তো রায়েবালি, তুমিই কও। চাষার পোলার যত নবাবি রোগ।'

নিঃশব্দে মাথাটা সামনে পিছনে একবার নেড়েছে রায়েবালি।

বৈশাখের ঝলসে-যাওয়া খেত যাকে নিয়ে এতক্ষণ নানা কথায় মুখর হয়েছিল, সে কিন্তু তখন পরম নির্বিকার। বাড়ির পেছনে ঘন গাছ-গাছালির ছায়ায় ঘুঘুর নরম ডাকে গ্রীষ্মের দুপুর আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আর সেখানে একটা ছেঁড়া পাটি বিছিয়ে আজম স্বপ্নাতুর দু'টো তন্ময় চোখ ছড়িয়ে দিয়েছে একখানা পুরনো মনসামঙ্গলের জীর্ণ পাতার ভেতর। আজ সন্ধেয় বরিসুরের কেরায়া মাঝিরা ভাসানের গান শুনতে চেয়েছে। তার জন্যই এই একাগ্র প্রস্তুতিপর্ব।

আর এমনি সময় তৃষ্ণার্ত বলদ দু'টোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে এনে সামনের মান্দার গাছটার গায়ে বাঁধল জিগিরালি। আজমের দিকে নজর পড়তেই চন করে রক্ত একেবারে ব্রহ্মতালুতে লাফিয়ে উঠল, 'নবাবের ছাও বইসা বইসা কিতাব পইড়া আর কাগজ লেইখা ভুর করলেই দিন যাইব? আমি আর কয় দিন? তহন ট্যার পাইবা কত ধানে কত চাউল। কয় দিন ঠোটের আগায় এই গান থাকে, দেখব গেরামের মাইন্‌ষে।'

যাকে লক্ষ্য করে একটার পর একটা এতগুলো চোখা চোখা তীর ছোড়া হল সে কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে মনসামঙ্গলের পাতায় ঝুঁকেই রয়েছে। কোনো দিকে একটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। আপাতত পেটের ভেতর খিদের ফণা আছড়ে আছড়ে পড়ছে জিগিরালির। ওধারের ঘরে ঢুকে মাথায় সামান্য একটু সরষের তেল চাপিয়ে গজগজ করতে করতে সোনারঙের খালের দিকে পা বাড়াল সে। ভারি আহাম্মকি করে ফেলেছে জিগিরালি, সারা জীবনভর একটা প্রচণ্ড ভুল হয়ে গিয়েছে আজমকে দস্তখত শেখাবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুলে পাঠিয়ে। চাষার ছেলে—দস্তখত করা আর চিঠি লেখার বিদ্যাকে ছাপিয়ে এতখানি উজিয়ে এসেছে যে দিনরাত বই-কাগজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সংসারের দিকে চোখ তুলবার ফুরসতটুকুও পায় না! স্কুলগুলো শুধু দস্তখত করতেই শেখায় না, আরো ভয়ঙ্কর কী যেন শেখায়, যাতে ছোট চাষার ছেলে সংসার-বিমুখ হয়ে কিনা কেতাবের মধ্যেই পড়ে থাকে অষ্টপ্রহর! মাস্টারেরা কি মন্ত্র যে কানের ভেতর ঢেলে দিয়েছে, আজমই জানে ভালো। আপাতত এই ভীষণ সত্যটা অবিষ্কার করতে করতে এলোমেলো পা ফেলে খালের দিকে এগিয়ে যায় জিগিরালি।

আজম বাপজানের দিকে এক পলক তাকিয়ে ফের মনসামঙ্গলের মধ্যে ডুবে যায়। আসলে তাকে প্রথম সেই বিচিত্র জগৎটার সন্ধান দিয়েছিল মনসুর। বরিসুরের কেরায়া নৌকোর ঘাট থেকে ফিরবার পথে অনেকদিন আগের একটা সন্ধে রক্তের মধ্যে যেন এখনও ঝমঝম করে বেজে ওঠে আজমের। পাশাপাশি আসতে আসতে স্বপ্নভরা গলায় মনসুর বলেছিল, 'আমাদের সাহিত্য পড় আজম। তুমি কবি, তুমি গুণী। আমাদের বাংলা ভাষা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে কত কাল ধরে এ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, কত কবি এসেছেন, কত কবি আসবেন, কত সাহিত্যিক কত নীরব সাধনায় একে উপচার দিয়ে গিয়েছেন। তুমি বুঝবে আজম, বাংলা শুধু হিন্দুদের ভাষা নয়, হিন্দু-মুসলমান দু'জনের রক্ত সমান লেগেছে এ ভাষা তৈরি করতে।'

পথের দু'পাশে হিজল আর আকন্দের মাথায় মাথায় আবছা অন্ধকার নামছিল সন্ধের। মনসুরের কথাগুলোর অর্থ পরিষ্কার বোঝেনি আজম কিন্তু চেতনার মধ্যে সেই ঝাপসা দিনান্তে একটা কেমন যেন নেশার সঞ্চার হয়েছিল সেদিন।

মনসুরের কণ্ঠস্বরে ক্রমশ আবেগ যেন ভর করছিল। 'কিন্তু যারা এই ভাষার গলা টিপতে চাইছে, হত্যা করতে চাইছে আমাদের আবহমানকালের এই পূর্বপুরুষের পবিত্র সাধনাকে তাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করব না। সেদিন যদি আমাদের প্রাণও দিতে হয় তার জন্যে প্রস্তুত থাকব। তুমি কবি, তুমি গুণী আজম, সেদিন যেন তোমরা পিছিয়ে থেকো না!'

মনসুরের শেষ কথাগুলো দুর্বোধ্য হয়ে এসেছিল আজমের কাছে। প্রাণ দিতে হবে কেন? কী একটা কুহেলি-ভরা বিপদের সংকেত যেন ছিল মনসুরের বিচিত্র কথাগুলোর মধ্যে।

মনসুর আলি জমিদার ফিরোজউদ্দিন আলি সাহেবের ছোট ভাই। মস্ত পণ্ডিত মানুষ। বরিসুরের খেয়া পেরিয়ে রোজ ঢাকায় চলে যায় পড়াশোনা করতে। স্কুলের পর কলেজ, কলেজের পর এখন কোথায় পড়াশোনা করছে, তা অবশ্য বলতে পারবে না আজম। অত বড় বিদ্বান মানুষটা তাকে বার বার গুণী বলছিল, কবি বলছিল, পাশাপাশি চলতে চলতে স্নায়ুগুলো কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল আজমের। আসলে গেঁয়ো কবির গানের আসরে আগে থেকেই নিজের বাঁধা গান গাইত আজম। যাত্রাপালায় কর্ণ, কৃষ্ণ কি অভিমন্যু সাজত। পালা গাইতে চলে যেত দূর দূর জেলায়। চাষাভুসো এবং সাধারণ মানুষের ভেতর তার বেশ নামও হয়েছিল। যেভাবেই হোক তার গানের খ্যাতি মনসুরের কানে পৌঁছেছিল।

মনসুরকে দেখলেই শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় আজমের।

এককালে অমূল্য ভুঁইমালীর শখের যাত্রার দলে কর্ণ সাজত আজম—একদিন সেই দলটা ভেঙে গেল। নোয়াখালির এক বারুই-বাড়ির উঠোনে তখন 'কর্ণবধ' পালা হচ্ছে, অর্জুনের পার্ট করছে স্বয়ং অমূল্য ভুঁইমালী। কর্ণবধের অনেক আগেই একটা শাণিত বল্লমের ফলা কোত্থেকে যেন অর্জুনের বুক বিদীর্ণ করে সমস্ত আসরটাকে রক্তস্নান করিয়ে দিয়েছে। একটা বীভৎস চিৎকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—'দাঙ্গা বান্ছে (বাঁধছে)।'

শ্রোতারা উঠোনে হোগলার ওপর বসে তন্ময় হয়ে পালা শুনছিল, জলধর বারুইর ছোট শালা ম্যাচবাতি (দেশলাই) জ্বেলে ইদ্রিস মিয়াঁর মুখের বিড়ি ধরিয়ে দিচ্ছিল, পাশাপাশি ঢুলছিল ফারুক আর রসময় নাপিত। দাঙ্গার কথায় সকলে উঠে পড়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কোথায় যেন ছিটকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বারুইদের ময়ূরমুখী টিনের চালে হিস হিস করে উঠল একটা লকলকে আগুনের ফণা। আর তারই আলোতে অনেকগুলো প্রেতমূর্তির মতো মানুষের মুঠোতে অসংখ্য বল্লমের ফলা ঝকমক করে উঠেছিল। 'কর্ণবধ'-এর আসরে রক্তাক্ত এক বিভীষিকার স্তব্ধ সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কর্ণবেশী আজম।

বিরাট আঘাত পেয়েছিল আজম, বুকের কোনো একটা কোমল অংশ ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গিয়েছিল তার। অমূল্য ভুঁইমালী তাকে দিয়েছিল গানের গলা, দিয়েছিল অভিনয়ের মাদকতা-ভরা শিল্প। তারপরই গ্রামে চলে এসেছিল সে।

নোয়াখালির বারুই-বাড়ির আগুন শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল জল-বাংলার অগুনতি গ্রামে-গঞ্জে আর শহরে। কিন্তু তাদের এই ছোট্ট নগণ্য বরিসুরকে দুই হাত মেলে আগলে রেখেছিল মনসুর। অন্য জায়গার রক্ত কি আগুনের ছোঁয়া এখানে লাগতে দেয়নি। দাঙ্গা তাই এই সামান্য গ্রাম এড়িয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে আছড়ে পড়েছে কুমারগঞ্জ, নবীপুর, বাসাইল, হাসাড়া, এমনি আরো কত জায়গায়। এতদিন দূর থেকে দেখেছে মনসুরকে, সেদিন কেরায়াঘাট থেকে ফেরার সময় প্রথম কথা হল। আড়ষ্ট গলাটা ফিসফিস করে সে বলেছিল, 'আমি যে লিখাপড়া তেমুন কিছুই জানি না।'

একটু আগের উত্তেজিত গলাটা একটা উদার কোমলতায় ভরে গিয়েছিল মনসুরের। মিষ্টি করে হেসে সে বলেছে, 'আমি শুনেছি তুমি গান বেঁধে আসরে আসরে গাও। দেশের কথা, মানুষের কথা মানুষের কাছে বলতে পার না? গানে বেঁধে বেঁধে তাদের না-খাওয়ার কথা, তাদের অভাবের কথা, খিদের জ্বালায় তাদের গলায় দড়ি দিয়ে মরার কথা লিখতে পার না? এই যারা দাঙ্গা বাধাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে গান বাঁধতে পার না?'

গান সে বাঁধে বই কি। পুরাণের ঢঙে সে গান লিখেছে। কিন্তু সে-সব চাষাভুসোদের জন্য। কিন্তু মনসুর যা বলছিল অর্থাৎ মানুষের দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগ, দাঙ্গা—এ-সব নিয়ে গান বাঁধার কথা কোনোদিন সে ভাবেনি। অবাক বিস্ময়ে সে শুধু তাকিয়ে থেকেছে।

মনসুর আবার বলেছিল, 'ওরা গরিব মানুষের হাত থেকে তো ভাত কেড়ে নিয়েছেই, এবার এতদিনের বাপ-দাদার ভাষাটাও কেড়ে নিতে চাইছে মুখ থেকে। কিন্তু শরীরে শেষ রক্তকণাটা থাকা পর্যন্ত তা আমরা হতে দেব না। আজম—তুমি কবি, তুমি গুণী। তোমরা পার না দেশের লোকগুলাকে জানিয়ে দিতে যে তাদের মুখের ভাষা, তাদের পরিচয় ছিঁড়ে নিতে চাইছে ইব্লিশেরা?' বলতে বলতে ক্ষোভে, ক্রোধে তার কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠেছিল। বলে আর দাঁড়ায়নি মনসুর, রাস্তার ডান দিকে ঘুরে চলে গিয়েছিল।

কথাগুলোর অর্থ সেদিন পরিষ্কার ছিল না আজমের কাছে। যে ইবলিশেরা তাদের পেটের ভাত, মুখের ভাষা ছিনিয়ে নিতে চাইছে তাদের পরিচয় জানত না সে। তবু সোনারঙের খালের

ওপাশে ছোট টিলাটার ওপর একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আজমের হৃৎপিণ্ডটা বিচিত্রভাবে নাড়া খেয়ে উঠেছিল। চারপাশের অন্ধকার ঘন কালির মতো ছড়িয়ে পড়েছে তখন।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা কালপেঁচার কর্কশ আওয়াজ কানে করাত চালিয়ে দিতেই চমকে উঠেছিল আজম। নাঃ, বেশ রাত হয়ে গেছে। এতক্ষণে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার পর গ্রামের শেষ প্রান্তে দীঘির পাড়ের তালগাছটার আড়াল থেকে নিশ্চয়ই রোশেনা চলে গেছে। সেদিন সন্ধের পর দেখা করার কথা ছিল যে। তা যাক। মনসুরের কথাগুলো শুনতে শুনতে আজমের মন নতুন উন্মাদনায় ভরে গিয়েছিল। সে কবি, সে গুণী—অত বড় একটা বিদ্বান মানুষের কাছ থেকে সেই প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিল সে। বাজানের বিরক্তিকর গজগজানিকে তারপর থেকে আর পরোয়া নেই আজমের। হ্যাঁ, সে গান লিখে যাবে, পালা বেঁধে যাবে।

সেদিন সন্ধের রহস্যময় পথটা ধীরে ধীরে একটা বিচিত্র জগতের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে আজমকে। আজ অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে মনসুরের সেই প্রায় দুর্বোধ্য কথাগুলো, মনসুরই তাকে পরে অনেক বই পড়তে দিয়েছে—পদ্মপুরাণ, চণ্ডীমঙ্গল, ময়মনসিংহ-গীতিকা, তারও পর মেঘনাদবধ, রৈবতক, পলাশীর যুদ্ধ। ধীরে ধীরে সেই রহস্যের কুয়াশাঘেরা জগৎটার দরজা খুলে গিয়েছে আজমের সামনে।

রঙিন কাচের মতো ঝকঝকে বৈশাখের বিকেল।

সারা দুপুর গান বাঁধার পর এখন সোনারঙের খাল বাঁয়ে রেখে ফসলশূন্য প্রান্তরের ওপর দিয়ে হনহন করে আজম এগিয়ে চলল। সে যাবে বরিসুরের কেরায়া ঘাটে। আজ সেখানে বেহুলার গান গাইবে সে। গান লিখতে লিখতে সুর করে নিয়েছিল মিষ্টি গলায়। বেহুলা-লখাইর কথা নিজের ভাষায় লিখতে ভাল লাগে তার, তন্ময় হয়ে যায় পদগুলো আবৃত্তি করতে। বিজয় গুপ্তের একখানা ছেঁড়া পুঁথি জোগাড় করেছে কোত্থেকে যেন—রোজ খানিকটা খানিকটা করে পড়ে। তার এই জলের দেশকে তারই প্রাণের ভাষা দিয়ে কী অপরূপভাবেই না সাজিয়ে রেখেছেন কবি। ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যায় আজম। তারই নকল করে গান লিখেছে সে।

সন্ধের আসরে কেরায়া মাঝিরা জমায়েত হল। নানা গাঁ থেকে ভাগচাষী, ছোট ছোট ব্যাপারী আর পথচলতি হাটুরে মানুষও ঘন হয়ে বসল পাশাপাশি। এত মানুষের ঘেরের ভেতর কেন্দ্রবিন্দুর মতো বসেছে আজম, মিষ্টি গলায় লহর তুলে এক সময় গান ধরল সে :

'এট্টুখানি ছিদ্র আছে লোহার বাসর ঘরে,
কালশঙ্খিনী সুতা হইয়া ভিত্‌রে পর্‌বেশ করে
পিরদীমের শইলতাখান মাথা কুইট্যা মরে
রে বিধির কী হইল!
পিরদীমের শইলতাখান থরথরাইয়া কাপে
বেউলা সতী কান্দে শোন বিষহরির শাপে
রাইত পোহাইলে লখাই শোবে ভেলার পালঙ্কেতে—
রে বিধির কী হইল!'

গান থামার পর একটা অদৃশ্য রেশ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত আসরের ওপর। কত কালের পুরনো কাহিনি, পুরনো ভাষা, বহু বার শোনা হয়েছে, তবু শ্রোতাদের চোখের তারা ভিজে ঝাপসা হয়ে গেল। কী ভাব আর কী অপূর্ব মধুর এই ভাষা, আর তাকেই কিনা রক্তাক্ত থাবা বসিয়ে হত্যা করতে চাইছে কারা যেন। মনসুরের সঙ্গে সেদিন সন্ধের পর আরো অনেকবার দেখা হয়েছে। যতবারই দেখা হয়, সে বলে, আজমকে ঢাকায় নিয়ে দেখিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে এ কাদের কারসাজি, কারা মুখের গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভাষাকেও ছিনিয়ে নিতে চাইছে!

আজম গান শেষ হলে আসরের মাঝখানে বসে মনসুরের কথাগুলো ভাবছিল। সে হঠাৎ চারপাশের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'ভাইরা, বাংলা ভাষায় আমাগো আর কথা কইতে দিব না অরা। এই গানও গাইতে দিব না!'

'কারা? হিন্দুরা?' অনেকগুলো গলা গর্জে উঠল সমস্বরে।

'না।' আস্তে মাথা নাড়ে আজম।

'তবে কারা? নাম কও। আমাগো বাপ-দাদার ভাষায় কথা কমু না তো কমু কুন ভাষায়?' একটা হিংস্র উত্তেজনায় ঝকমক করতে থাকে গোটা আসর, 'না খাইয়া থাকি একবেলা, তাও সয়। দুঃখুর কথাটা যদিন না কইতে পারি তো জীয়ন্তেই মইরা থাকুম। গায়ের লৌ (রক্ত) থাকতে এই অন্যায় সমু (সহ্য করব) না আজম ভাই। নামটা কও, কুন শালায় এমুন সব্বনাইশ্যা মশকরা করতে চায় আমাগো লগে—দেখি এক ফির।'

নামটা আজমও এখন পর্যন্ত জানে না। তাকে বলেনি মনসুর। শুধু একটা অনিবার্য ঝড়ের আভাস দিয়েছে মাত্র। এবার মনসুরের কথাগুলোর নির্ভুল প্রতিধ্বনি করল আজম, 'এর লেইগা দরকার হইলে জানও দিতে হইতে পারে ভাইরা। বাংলার বদলা কী একখান বিজাত ভাষা শিখতে লাগব নিকি!'

'না, না—বাজান-দাদার, চৌদ্দ পুরুষের জবান থুইয়া অন্য কিছুতে আমরা কথা কইতে পারুম না আজম ভাই। বুকের লৌ দিতে হয়—তাও সই। তোমার মুখের মনসার গান, ময়নামতীর গান, সখিসোনার গান না শুইন্যা পারুম না। কী অন্যায় কথা এইটা, কও দেখি।' বুড়ো মাঝি হাজিরদ্দি গর্জে ওঠে।

আসরের পেছন দিকের অন্ধকার থেকে আর একটা গলা ভেসে আসে, 'দ্যাশ ভাগ হইতে হিন্দু ভাইরা গেল গিয়া—বুকের বল হারাইলাম। আবার মুখের ভাষা হারাইয়া মরুম নিকি! এক্কেবারেই না।'

থম থম করতে লাগল নদীতীরের আসর। একটা অশুভ ঝড়ের সূচনা যেন দেখা দিয়েছে এখানকার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে।

সেদিন আসরে বেহুলা-লখিন্দরের পালা গেয়ে আসার পর কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

এখন সন্ধে নামতে শুরু করেছে। আজম নিজেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়।

সে কবি, সে গুণী। পৃথিবীর দাবিকে সে অস্বীকার করেনি, অস্বীকার করেনি মনসুরের আশ্চর্য উজ্জ্বল কথাগুলোকে। কিন্তু তার হৃদয়ের কাছে আর একজনেরও অনেক প্রত্যাশা আছে। সোনারঙের বেলাশেষে সে এসে অপেক্ষা করে মর্মরিত তালগাছের নিচে নিবিড় ছায়ায় দাঁড়িয়ে। রোশেনার সেই দাবিকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

আজম গলায় মিষ্টি সুর তুলে এগিয়ে চলল দীঘির পাড়ের তালবনের দিকে।

কী আশ্চর্য, যখনই রোশেনার দিকে একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন মন নিয়ে পা বাড়ায়, যখনই সন্ধের এই রহস্যময় পথটার ওপর দিয়ে চলতে চলতে রোশেনার ভূঁইচাঁপার মতো উন্মনা মুখখানা মনের আয়নায় ফুটে ওঠে, ঠিক তখনই দেখা হয়ে যায় মনসুরের সঙ্গে। আজও দেখা হল। ওপাশের উঁচু টিলাটা পেরিয়ে দ্রুত পায়ে সামনে চলে এল মনসুর। ব্যস্তভাবে বলতে থাকে, 'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। যাক, পথেই দেখা হয়ে গেল।'

বেশ অবাক হয়ে যায় আজম। আগে কোনোদিন মনসুর তাদের বাড়ি যায়নি। সে জিগ্যেস করে, 'আমাগো বাড়িত্ যাইতে আছিলেন ক্যান মনসুর ভাই? কুনো কাম আছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মনসুর। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলে, 'আজম ভাই, আর বুঝি পারব না। এবার তোমাদের নৌকোর বদলে বলতে হবে কিশ্‌তি, কুটুম্বের বদলে মেহমান, কর্তব্যের বদলে ফর্জ, ভব্যতার বদলে তমীজ, ক, খ, অ, আ-র বদলে আলে, বে, তে, সে, জিম, হে, খে মুখস্থ করতে হবে। ওই মনসামঙ্গল, ওই মেঘনাদবধ বুড়িগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে হবে, নয় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে ওরা ছারখার করে।'

অদ্ভুত করুণ হাসি ফুটে উঠল মনসুরের মুখে। পরক্ষণে প্রবল উত্তেজনায় গলার স্বর তীব্র হয়ে ওঠে, 'জোর করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছে সরকার। আমাদের পূর্বপুরুষের এতদিনের সাধনাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে। আজ ঢাকায় গুলিগোলা চালিয়েছে এই জন্যে। কিন্তু আমরাও দেখব ওদের গুলি ক'টা মাথা আমাদের গুঁড়িয়ে দিতে পারে।' বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজনা কেটে যায়। কোমল স্বরে এবার বলে, 'আজম তুমি কবি, তুমি গায়ক, একটা গান বাঁধতে পার তুমি? কাল আমরা ইউনিভার্সিটির সামনে মিটিং করব। ১৪৪ ধারা যদিও আছে, তা ভাঙতে হবে—তোমার গান দিয়েই আমরা সভা শুরু করব। পারবে?'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আজম। সবগুলো কথার অর্থ সে বোঝেনি। কিন্তু গান বাঁধার আবেদনটা সে পরিষ্কার বুঝেছে। মনসুরের কথাগুলো তার রক্তে অনেকখানি উন্মাদনা যেন চারিয়ে দেয়। সে কবি, সে গায়ক—আজ রাতেই সে গান লিখবে, যারা তাদের ভাষাকে বন্দুকের ঔদ্ধত্যে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, যারা তাদের আবহমান কালের সাধনাকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে, সেই সেব ইবলিশদের বিরুদ্ধে কলমের মুখ থেকে আগুন ঝরাবে আজম।

মনসুর বলল, 'কাল আমার সঙ্গে ঢাকায় যেতে হবে আজম। তোমার ভয় পেলে চলবে না ভাই। যেতেই হবে তোমাকে। কাল সকালে আমাদের বাড়ি চলে এস। একসঙ্গে লঞ্চে করে ঢাকায় চলে যাব। এখন চলি। রাত্তিরে অনেক কাজ সারতে হবে।' বলতে বলতে মনসুর উত্তর দিকে এগিয়ে যায়।

রোশেনার কাছে আজ আর যাওয়া হয় না আজমের। মনসুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এত দেরি হয়ে গেছে যে রোশেনাকে পাওয়ার আশা আর নেই। আজম ঠিক করে ফেলে ঢাকা থেকে ফিরে এসে রোশেনার সঙ্গে দেখা করবে। অনেক দিন হয়ে গেল। এবার শাদির ব্যাপারে একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু তার আগে গান বাঁধা এবং ঢাকায় যাওয়া।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরখানায় ঢুকে কুপি জ্বালিয়ে দোয়াত-কলম নামিয়ে বসল আজম। মনসুরের কথাগুলো একটা অদ্ভুত উত্তেজনার মতো রক্তকণাগুলোর ওপর ভেঙে ভেঙে পড়ছে—সে কবি, সে গায়ক। আগামী কাল তাকে ঢাকায় যেতে হবে, বুকের ভেতরকার ঝড়

আর উন্মাদনাকে সাতপুরুষের ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে আজ রাতেই। মন আমূল তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে তার।

সারাদিন ধানখেতে মই দিয়েছিল জিগিরালি। শরীর ভেঙে আসছে এখন। উঠানের এক কোণে বসে তামাক টানতে টানতে আজমের ঘরের দিকে চোখ পড়তে একেবারে খেপে উঠল, 'এই যে নবাবের ছাও ঘরে ফিরল! এইবার রাইতভর বাত্তি (আলো) জ্বালাইয়া গুষ্ঠীর মাথা লেখতে বইব। আমি জিগাই কেরাচিন আনতে পয়সা লাগে না, দোকানিরা আমার সুমুন্দি হয় নিকি যে মাগ্না দিব বুইনের জামাইরে!'

বিরক্ত হয়ে উঠল আজম। বলে, 'চুপ মার বাজান। এই রাইতে আমার চিল্লাচিল্লি ভাল লাগে না।'

'ভাল লাগে না! আমার বাদশাজাদা রে! যা, বাইর হ, আমার বাড়িতে তর আর ভাত নাই, অক্ষণই বাইর হইয়া যা।' একেবারে খেপে ওঠে জিগিরালি।

কোনো জবাব দিল না আজম। কাগজপত্র, দোয়াতকলম, বইপত্তর নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

আজমের মা ঘরের বারান্দা থেকে ককিয়ে উঠল, 'এই রাইতে যাস কই আজমা?'

'গোরে।'

আজমদের বাড়ির পর আগাছায়-ভরা ছোট মাঠ। তারপর বাড়োরি বাড়ি। সেখানে এসে মৃদু গলায় ডাকে আজম, 'ঠাইন দিদি, অ ঠাইন দিদি।'

'কে রে, আজমা নিকি? আয়, আয়।' একটা কুপি জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধা। তিনি ছাড়া এত বড় বাড়িটায় আর কেউ নেই। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সবাই কলকাতায় চলে গেছে। একা এত বড় ভিটে আগলে পড়ে আছেন এই বৃদ্ধা। দেশ ছেড়ে, স্বামী-শ্বশুরের ভদ্রাসন ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন? গোটা বাড়িটা যেন এক মহাশ্মশান।

আজম বলল, 'আপনগো পুব দিকের ঘরখান খুইলা দ্যান, আমি আইজ রাইতটা থাকুম এইখানে। আমারে একটা কুপি দিবেন ঠাইন দিদি।'

বৃদ্ধার সঙ্গে আজমের সম্পর্ক বড়ো মধুর। দেশভাগের পর আত্মীয়স্বজন সবাই যখন কলকাতায় চলে গেল, বৃদ্ধা যখন সম্পূর্ণ একা, সেই সময় প্রতিবেশী আজমরা ছাড়া তাঁর আর আছেই বা কে? আজম প্রায়ই এসে তাঁর খোঁজখবর নিয়ে যায়।

একপলক আজমের মুখের ওপর নজরটা স্থির রেখে বৃদ্ধা বলে উঠলেন, 'বাপের উপুর গোসা কইরা নি আইছস? ভাত খাস নাই তো বুঝতেই পারতে আছি। পুবের ঘরে ছিকল (শিকল) লাগাইনা আছে। তুই গিয়া খুইল্যা বয় (বোস)। ভাত তো নাই—আমি দু'গা চিড়ামুড়ি লইয়া আসি।' গান-পালা ইত্যাদি নিয়ে বাপজানের সঙ্গে আজমের সম্পর্কটা কত তিক্ত তা জানেন তিনি।

একটু পরেই একটা বেতের ডালায় কিছু চিড়েমুড়ি আর নারকেলের নাড়ু নিয়ে এলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'এগুলা খা। কয়দিন আসসই নাই। তর মুখে কর্ণবধের পালাটা এত মিঠা লাগে, অথচ তুই কতকাল শুনাইয়া যাস না!'

'আর ওই কর্ণবধ গাইতে দিব না, এইবার থিকা উর্দু শিখতে হইব হগলেরে। গরমেন্ট আইন বাইন্ধা দিব। বাংলা ভাষা ভুইলা যান।'

শঙ্কিত মুখে বৃদ্ধা বলেন, 'বাংলা ভাষা ভুলুম ক্যামনে, ও যে বুকের মইধ্যে মিশ্যা আছে। আমাগোর চৌদ্দ পুরুষের ভাষা। ক'স কি তুই আজমা যত সব্বনাইশা কথা!'

'যা কই সত্য। বন্দুকের গুল্লি দিয়া বুকখান ফুটা কইরা দিলেই ভুইলা যাইবেন ঠাইন দিদি।' বলে মজা করে হাসে আজম।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চিন্তাগ্রস্তের মতো একসময় বৃদ্ধা উঠে গেলেন। রাত বাড়তে থাকে। চিঁড়েমুড়ি খাওয়ার পর লিখতে বসে আজম। তার কলম হরফের পর হরফ সাজিয়ে কাগজ ভরিয়ে তুলতে থাকে। লিখতে লিখতে কখন যে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

আবার সেই মোরগ-ডাকা সকাল।

বিছানা থেকে উঠেই মনসুরদের বাড়ি চলে এল আজম। মনের ভেতর কাল রাতের লেখা গানখানা বিচিত্রভাবে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত ঝঙ্কার উঠছে কথাগুলোর।

ঘণ্টাখানেক পর সোনারঙের খাল পেরিয়ে, বরিসুরের কেরায়া নৌকাগুলো পেছনে রেখে নদীর পাড়ে লঞ্চঘাটে এসে পড়ল মনসুর আর আজম।

লঞ্চ দাঁড়িয়েই ছিল। আজমরা টিকেট কেটে উঠে পড়ে।

এখান থেকে ঢাকা আড়াই ঘণ্টার পথ। একসময় দু'জনে সেখানে পৌঁছে যায়।

সদরঘাটে নেমে, সবজিবাগান উজিয়ে, রমনা পেরিয়ে দু'জনে চলে এল বিদ্যার সেই পবিত্র ভূমিতে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি। এখানেই তবে পড়াশোনা করতে আসে মনসুর!

বিরাট দালান, সামনে ছোট ছোট করে ছাঁটা ঘাসের 'লন'। সেখানে মিলিটারি ভ্যান। সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গেছে পুলিশ-বন্দুক-লাঠির একটা মিলিত হিংস্রতায়। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত রাইফেল গর্জে উঠবে।

ইউনিভার্সিটির বাইরের রাস্তায় অনেক ছাত্র এবং যুবক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছাত্রীও রয়েছে ক'টি। সবগুলো ছেলেমেয়ের চোখে ঝকমক করছে কী এক শাণিত প্রতিজ্ঞা, কী এক অগ্নিগর্ভ শপথ। এদের কাছে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সীমারেখা নেই।

মনসুরকে দেখেই একটা গুঞ্জন উঠল। একটি তরুণী এগিয়ে এসে বলে, 'তোমার কাল রাতেই না আসার কথা ছিল?'

'আসতে পারিনি। এস, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই যে সেই ফোক পোয়েট, জনগণের কবি—এর কথা তোমাদের সেদিন বলেছিলাম। এর নাম আজম। এর গান দিয়েই আজকের মিটিং শুরু করব।'

আজম লাজুক মুখে সেলাম জানায়।

তরুণী এবং অন্য ছেলেমেয়েরা এগিয়ে এসে আজমকে ঘিরে ধরে। সেই তরুণীটি বলে, 'খুব খুশি হয়েছি কবি আপনাকে পেয়ে। মাতৃভাষার এই সংকটে আপনারা ঝাঁপিয়ে না পড়লে কী করে চলবে। আসুন আসুন, এদিকে আসুন।'

মেয়েটির সঙ্গে পায়ে পায়ে ইউনিভার্সিটির গেটটার দিকে এগিয়ে যায় আজম।

ইতিমধ্যে আরো অনেকগুলো ছেলে এসে ঘিরে ধরেছে মনসুরকে। বলে 'মনসুর ভাই, এখনই কি গেটটা ভেঙে ঢুকব আমরা? মিটিং করতেই হবে আজ। শুধু আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি সেই সকাল থেকে।'

'নিশ্চয়ই, মিটিং আমরা আজ করবই ইউনিভার্সিটির ভেতরে।'

কে যেন বলে, 'আজও গুলি চলবে মনে হচ্ছে। গভর্নমেন্ট এত বর্বর হয়ে উঠবে, পাকিস্তান হওয়ার আগে কে ভাবতে পেরেছিল!'

অনেকগুলো গলা বুড়িগঙ্গার বন্যার মতো গর্জে উঠল, 'দেশের মানুষকে না খাইয়ে মারছে, ইস্টবেঙ্গলকে ওরা শেষ করে দিচ্ছে। এখন হাত দিয়েছে মুখের ভাষার ওপর। এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। করুক গুলি, দেখব কত রাইফেল-বুলেট ওরা বানাতে পারে! দেখব কত বড় ফ্যাসিস্ট ওরা!'

মনসুর বলল, 'ভাই সব, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি বাকি সবাইকে নিয়ে আসছি, তারপর একসঙ্গে গেট দিয়ে ঢুকব।'

আজমের কাছে এসে মনসুর দাঁড়াল, পিঠের ওপর হাত রেখে বলল, 'ভয় পেয়েছ আজম ভাই?'

'জি।' আড়ষ্ট, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল আজমের।

এদিকে সেই মেয়েটি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। পিঠের ওপর একবেণী করা চুল। আজমের কাছে সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

মেয়েটি হঠাৎ তাড়া দিয়ে ওঠে, 'আর দেরি নয়। চল এবার। এগিয়ে চল। শিডিউল্ড টাইম মনে আছে মিটিং-এর? এগারোটা বাজে যে।'

সেই ছাত্র-জনতার উত্তাল প্রবাহ ইউনিভার্সিটি গেটটার দিকে এগিয়ে চলেছে। সবার সামনে সেনাপতির মতো পা ফেলছে মনসুর আর সেই মেয়েটি। তাদের পেছনে অসংখ্য মানুষের স্লোগান। মনে হয় এই শব্দ বুড়িগঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। স্লোগান শুনতে শুনতে আজমও এগুতে থাকে।

গেটের কাছাকাছি আসতেই ওধার থেকে অনেকগুলো রাইফেলের নল হিংস্র ভঙ্গিতে উদ্যত হয়ে উঠল। একটা নির্মম গলা ভেসে এল, 'হল্ট। ডোন্ট প্রসিড—'

একবার থমকে দাঁড়াল মনসুর। পেছন ফিরে তাকাতেই তার চোখের ওপর বৈশাখের আগুন-জ্বালা সূর্যের উত্তাপ যেন পেল আজম। ততক্ষণে মনসুরের গলায় ক্রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটল যেন, 'বন্ধুগণ, যাবা মরতে না চাও এখনও ঘরে ফিরে যেতে পার। ভয় যাদের বেশি তারা, ভয় যাদের নেই তাদের অগ্রগতিকে গণ্ডগোল করে জটিল করে তুলো না।'

কী আশ্চর্য, ওপাশের হাফপ্যান্ট-পরা, কাঁধের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি করে স্কুলের ব্যাগ-ঝোলানো ছেলেটাও এক পা সরে গেল না পেছন দিকে। কে যেন আকাশ বিদীর্ণ করে চিৎকার করে, 'বাংলা ভাষা—'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।' বাকি সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গর্জে ওঠে।

চমকে উঠল আজম। সেই মেয়েটি হঠাৎ মনসুরের হাতদু'টো আঁকড়ে ধরেছে। ব্যাকুল গলায় বলে ওঠে, 'ফিরে চল মনসুর। বুলেট তো তোমার বুকেই প্রথম লাগবে। না না, চল মনসুর।'

হাত ছাড়িয়ে মনসুর দৃঢ় স্বরে বলে ওঠে, 'ফার্স কোরো না রুবি।' তারপর অত্যন্ত অচেনা স্বরে বলে, 'ভুলে যেয়ো না রুবি সেই কথা ক'টা—স্কাই হাই দি সিগন্যাল ফ্রেম—'

এই কথাগুলোর অর্থ আজম বোঝে না, মনসুরের ওই কণ্ঠস্বরের পরিচয়ও এই প্রথম পেল। কিন্তু নির্ভুলভাবে সে বুঝেছে ওই কথাগুলো একটা নিশ্চিত ঝড়ের সওয়ার হয়ে কী এক অনিবার্য সংকেতকে টেনে নিয়ে আসছে এই মুহূর্তে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই অগ্নিগর্ভ পটভূমিতে।

এদিকে গেটের খুব কাছে চলে গেছে মনসুর। সঙ্গে সঙ্গে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। হাঁটুর ওপর এসে বিঁধেছে একটা গুলি। পা চেপে যন্ত্রণাবিকৃত মুখে বসে পড়ে মনসুর।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় মিছিলটা।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল আজম। সে চাষার ছেলে—না, না, সে কবি, সে গায়ক, সে সুরকার। বিপুল পৃথিবী তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সোনারঙের খালের পাড় দিয়ে মনসুরের পাশে পাশে চলা সন্ধের সেই রহস্যময় পথটা এতদূরে এই মহানগরী ঢাকার রাজপথে তাকে যেন টেনে এনেছে।

বাপজান তাকে ভাত দেবে না বলে শাসিয়েছে, না দিক। সন্ধের আবছা অন্ধকারে বাতাসে দোলা-লাগা মর্মরিত তালের বীথিটায় এসে অপেক্ষা করবে রোশেনা—করুক। বরিসুরের কেরায়া ঘাটে তার জন্য মনসার আসর জমাবে মাঝিরা, কিংবা বাড়োরি-বাড়ির বৃদ্ধাও শুনতে চেয়েছিল সখীসোনার গান, কর্ণবধ পালা—থাক ওরা। আজমের জায়গায় নতুন কেউ আসবে, আসবে নতুন কবি, নতুন সুরকার, নতুন শিল্পী। মহান বাংলা ভাষা দিয়ে বাঁধবে কত সুরম্য পদ। উত্তরসূরিদের জন্য নিরাপত্তা দিয়ে যাবে আজম। এই রক্তাক্ত মুহূর্তটা তার কাছে বড় পবিত্র। জীবনের সবচেয়ে বিরাট পরিচয় সে পেয়েছে : সে কবি, সে সুরকার, সে জনগণের শিল্পী। কথাগুলো এমন গুছিয়ে সে ভাবতে পারে না। তবে তার মনোভাবটা এইরকমই।

আচমকা নজরটা চলে গেল মনসুরের দিকে। তার সমস্ত শরীর রক্তকমলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। মনসুরের চোখের দিকে দৃষ্টিটা পড়তেই চমকে উঠল আজম। সে চোখে জ্বলন্ত সূর্যের জ্যোতির্ময় শিখা।

লহমায় দ্বিধাটা কেটে গেল আজমের। নিজের অজান্তে মিছিলের ভীত-চকিত গুঞ্জন ছাপিয়ে গলার ভেতর থেকে কাল রাতের লেখা সেই গানটা আপনা থেকেই বেরিয়ে এল :

'ওরে আমার বাংলা ভাষা—
তুমি আমার পরান-বন্দু, আমার বুকের লৌ,
মায়ের মুখের মিষ্ট কথা, সখীর মুখের মৌ।
কুন দানবে বান্ধিতে চায় তোমার হস্ত ধরি,
তোমার দুখে ধিকি ধিকি আমরা জ্বইল্যা মরি
হে সুন্দরী।

ওরে আমার বাংলা ভাষা—
কুনখানে কোন ভাইরা আছ বাঙ্গালী সুজন
বাংলা মায়ের চুল ধইরাছে দুষ্ট দুঃশাসন—
তোমার বুকে রক্ত নাই কি বাঙ্গালী সুজন?
দানব মাইর‍্যা মায়ের তুমি ঘুচাও বন্ধন।'

গাইতে গাইতেই গেটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আজম।

আর এক ঝলক আগুন ঝলসাল রাইফেলের হিংস্র ব্যারেলের মুখে, সঙ্গে সঙ্গেই বিদীর্ণ পাঁজর চেপে বসে পড়ল সে।

আর সেই মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা।

পেছনের সেই সহস্র পায়ের শব্দ এবারে বন্যার মতো গেট ভেঙে হু হু করে এসে পড়ল সেই ছোট ছোট করে ছাঁটা ঘাসের লন-এ। মিলিটারি পুলিশের সেই অবরুদ্ধ দুর্গ ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল। সব কিছু ছাপিয়ে, সব হইচই চিৎকারের ওপর দিয়ে ছাত্রজনতার পাঁজরের ভেতর থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার গর্জন উঠছে :

'বাংলা ভাষা...'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

দেখতে দেখতে চোখের ওপর কেমন যেন কালো পর্দা নেমে আসছে আজমের। দৃষ্টিটা স্তিমিত হয়ে আসে একটু একটু করে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের শেষ স্পন্দনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আজম নির্ভুল শুনতে লাগল :

'বাংলা ভাষা...'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

একসময় একেবারেই দৃষ্টিটা নিবে যায় তার। সে কবি, সে গায়ক, সে সুরকার, সে মৃত্তিকার শিল্পী। কোটি মানুষের দাবিকে সে অস্বীকার করেনি, করতে পারে না।

তারা তিনজন

ট্রেন ছাড়তে মিনিট দুই যখন বাকি, সেই সময় স্ত্রীকে নিয়ে অনুপম তাদের রিজার্ভ-করা কুপেতে এসে ঢুকল। তাদের পেছনে একটা কুলির মাথায় এবং হাতে প্রচুর লাগেজ। ঢাউস দু'টো সুটকেস, বাস্কেট, ওয়াটার বটল, হোল্ড অল, এমনি নানা লটবহর।

অনুপম এবং তার স্ত্রী জয়া প্রচুর ঘামছিল। মে মাসের প্রচণ্ড গরমে এই সন্ধেবেলাতে তাদেব মনে হচ্ছিল, সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। তা ছাড়া স্টেশনে পৌঁছুবার আগে প্রায় ঘণ্টাখানেক মারাত্মক টেনশনে কেটেছে। কেননা হাওড়া ব্রিজে আজ এমনই জ্যাম যে শেষ পর্যন্ত ট্রেনটা ধরা যাবে কিনা সে ব্যাপারে দারুণ অস্বস্তিতে ছিল অনুপমেরা। অল্পস্বল্প লাগেজ থাকলে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হেঁটেই তারা স্টেশনে চলে আসত কিন্তু এত সুটকেস টুটকেস বয়ে আনা অসম্ভব। টেনশনে আর গরমে যখন তারা ট্যাক্সিব ভেতর প্রায় সেদ্ধ হচ্ছে, হঠাৎ জট ছেড়ে গিয়ে গাড়ি টাড়ি চলতে শুরু করেছিল। জ্যাম না থাকলে অনেক আগেই তারা স্টেশনে এসে ধীরেসুস্থে ট্রেনে উঠতে পারত।

কুলি মালপত্র নামিয়ে তাড়া লাগায়, 'জলদি পাইসা দিজিয়ে। আভি টিরেন খুল দেঙ্গে।'

পকেট থেকে ব্যাগ বার করে দ্রুত ভাড়া মিটিয়ে দিল অনুপম। কুলিটা নেমে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। বিশাল এক সরীসৃপ ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে।

ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের এই কুপেতে সবসুদ্ধু চারটে সিট। একদিকে দু'জনের বসার ব্যবস্থা, মুখোমুখি অন্য দু'জনের। রাতে শোওয়ার জন্য ওপরে বাঙ্ক আছে। একজনকে ওপরে শুতে হবে, একজনকে নিচে। উলটো দিকের সিটে যারা থাকবে, তাদের শোওয়ার জন্যও একই রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট।

অনুপম খুবই ব্যস্তবাগীশ। হোল্ড-অল খুলে গদিমোড়া আরামদায়ক সিটের ওপর নকশা-করা চাদর বিছিয়ে প্রথমে স্ত্রীকে বসায়। তারপর সুটকেস বাস্কেট সিটের তলায় গোছগাছ করে রেখে, ওয়াটার বটলটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে বসে পড়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'আর একটু দেরি হলে ট্রেনটা ডেফিনিটলি মিস করতাম।'

জয়া মাথাটা একদিকে হেলিয়ে বলে, 'হুঁ।'

'কলকাতায় আজকাল চলাফেরা করা ইমপসিবল। কোথাও যদি চারটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা থাকে, বারোটায় বেরুতে হবে। তবুও ইউ আর নট সিওর, ঠিক চারটেতেই পৌঁছুতে পারবে কিনা। সকাল থেকে শুধু জ্যাম, জ্যাম আর জ্যাম। সিম্পলি ডিসগাস্টিং।'

'যা বলেছ! ট্রেনটা আজ মিস করলে কী খারাপ যে লাগত! কত দিন ধরে আশা করে আছি, বম্বে পুণে আর গোয়াটা ঘুরে আসব।'

অনুপম একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির মাঝারি মাপের এক্সজিকিউটিভ। বছরে একবার করে সস্ত্রীক বেড়াবার জন্য ট্রাভেল অ্যালাওয়েন্স পায় সে।

অনুপমের বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশ। ঝকঝকে চেহারা, কথাবার্তায় তুখোড়। সে একজন পাস কোর্সের বি. এ। তাও একবারে পাস করতে পারে নি, বার দুই ঠেকে কোনোরকমে টায়টোয় উতরে গেছে। তার যা কোয়ালিফেকেশন তাতে ওই ধরনের একটা দামি চাকরি পাওয়া অভাবনীয়। সম্ভব হয়েছে জয়ার বাবার কারণে। তিনি একজন নাম-করা রাজনৈতিক নেতা। তাঁকে খুশি রাখতে পারলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেসম্যানদের অনেক দিক থেকেই প্রচুর লাভ এবং সুবিধা।

জয়ার বয়স আটাশ উনত্রিশ। দুর্দান্ত সুন্দরী নয় কিন্তু চেহারাটি চটকদার। আরামে এবং সুখে থাকার কারণে তার সর্বাঙ্গে আলাদা একটা পালিশ রয়েছে যা চোখকে টানে। ওদের একটি ছেলে—সোনা। বছর পাঁচেক বয়স। কোথাও বেড়াতে টেড়াতে গেলে তাকে নিজের মায়ের কাছে রেখে আসে জয়া।

মুখ থেকে আস্তে আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অনুপম বলে, 'যাক, ট্রেনটা যে ধরতে পারা গেছে, তাই যথেষ্ট। কী টেনশনটাই না গেল!' তার মুখচোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, মানসিক চাপটা কেটে যাওয়ায় বেশ আরামই বোধ করছে।

জয়া কী একটু ভেবে এবার বলে, 'আসার সময় সোনাটা বড্ড কান্নাকাটি করছিল। ভীষণ মন খারাপ লাগছে।'

'হ্যাঁ। নেক্‌স্ট ইয়ার থেকে ওকে সঙ্গে নিয়েই বেরুব। আর—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় অনুপম। এতক্ষণ তাড়াহুড়োয় এবং মালপত্র গোছগাছ করতে করতে সে লক্ষ করে নি, উলটোদিকের সিটে আরো দু'জন যাত্রী বসে আছে। তাদের একজন বৃদ্ধ শিখ। চুল-দাড়ি ধবধবে। যথেষ্ট বয়স হলেও স্বাস্থ্য বেশ ভালোই। দ্বিতীয় যাত্রীটি মহিলা। বয়স তিরিশের নিচে। টান টান, সতেজ চেহারা। তাকে তরুণীই বলা যায়। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা মেয়েটিকে আলাদা এক ধরনের ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। তার দিকে চোখ পড়তেই থমকে গিয়েছিল অনুপম।

মেয়েটি স্থির চোখে, প্রায় পলকহীন অনুপমের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব সম্ভব জয়াকে নিয়ে অনুপম যখন এই কুপেতে ঢোকে তখন থেকেই ঠিক এভাবে সে তাকে লক্ষ করছে। মেয়েটির কোলে খোলা একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন। কী ম্যাগাজিন, দূর থেকে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। সে সম্বন্ধে আগ্রহও নেই অনুপমের।

এই বম্বে মেলে দশ বছর পর হঠাৎ ভারতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল! ভয়ানক নার্ভাস বোধ করতে থাকে অনুপম। প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপে মনে হয়, মাথার ভেতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বিন বিন করে ঘাম বেরিয়ে এসে তার জামা ভিজিয়ে দেয়। হাত এত কাঁপছে যে আঙুলের ফাঁক দিয়ে সিগারেট নিচে পড়ে যায়।

কুপেতে ঢুকেই যদি ভারতীকে দেখতে পেত, কোনো অছিলা খাড়া করে তক্ষুনি নেমে যেত অনুপম। কিন্তু চলন্ত ট্রেন থেকে এই মুহূর্তে নামার কোনো উপায় নেই। কুপের ভেতর সে যেন একটা মারাত্মক ফাঁদে আটকে গেছে।

ভারতী তাকিয়েই আছে। অনুপমের মনে হয়, নিষ্ঠুর এক যাদুকরী তাকে দ্রুত সম্মোহিত করে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে বেরুবার কোনো পথ নেই। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা এক কুপেতে ভারতীর সঙ্গে কাটাতে হবে, এটা ভাবতেই অনুপমের দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

জয়া সঙ্গে না থাকলে এতটা দুশ্চিন্তা ছিল না। দরকার মতো সে ভারতীর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিত। কিন্তু জয়ার সামনে তা করা যায় না। অজানা ভীতি এবং শঙ্কা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরতে থাকে।

জয়া স্বামীর প্রতিক্রিয়া আবছাভাবে লক্ষ করছিল। সে বলে, 'কী হল, চুপ করে গেলে যে—'

চমকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল অনুপম, তার আগে আচমকা ওধার থেকে ভারতী বলে, 'আমাকে চিনতে পারছ অনুপম?' তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

হৃৎপিন্ডের ধকধকানি হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায় অনুপমের। নির্জীব গলায় বলে, 'না, মানে আমি ঠিক—' কথা শেষ না করে সে থেমে যায়।

'চিনতে পারছ না, এই তো?' ভারতী অনুপমের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলতে থাকে, 'অনেক দিন পর যারা আমাকে দেখেছে তারা বলে আমার চেহারা একটুও বদলায় নি। বছরখানেক আগে শুধু চশমা নিতে হয়েছে। তবু তুমি আমাকে চিনতে পারলে না! স্ট্রেঞ্জ! তোমার স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল হয়ে গেছে?'

অনুপমের ভয়টা অনেকখানি বেড়ে যায়। কিছু বলতে চেষ্টা করে সে, গলায় স্বর ফোটে না।

ভারতী এবার বলে, 'চিনতে যখন এত অসুবিধে, পরিচয়টা দিতেই হচ্ছে। আমি কিশোরপুরের ভারতী। আশা করি এবার চিনতে পারবে।' তার বলার ভঙ্গিতে চাপা বিদ্রূপ মেশানো।

অনুপম ভাবে, হয় তাকে স্বীকার করে নিতে হবে, নইলে প্রবলভাবে অস্বীকার করতে হবে। মাঝামাঝি কিছু নেই। সে যদি মিনমিনে গলায় জানায়—চেনে না, তা হলে জয়া সন্দেহ করবে। আব অস্বীকার করলেই যে পার পেয়ে যাবে তেমন সম্ভাবনাও নেই। ভারতী তাকে কি সহজে ছেড়ে দেবে?

অনুপম মনস্থির করে ফেলে। একরকম মরিয়া হয়েই বলে, 'আরে তুমি! অনেক বছর পর দেখা তো। তাই—'

ভারতী অদ্ভুত হেসে বলে, 'শেষ পর্যন্ত যে চিনতে পারলে তাতে খুশি হলাম।' জয়ার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই?'

অনুপম টের পায়, কপালের দু-পাশের রগদু'টো সমানে দপদপ করছে। কণ্ঠনলীতে শক্ত লোহার বলের মতো কিছু আটকে আছে। বহু কষ্টে সেটাকে সরিয়ে আবছা একটা স্বর বার করে আনে, 'হ্যাঁ।'

'আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে না?' সামনের দিকে অল্প একটু ঝুঁকে জিগ্যেস করে ভারতী।

অনুপম বলে, 'এ হল জয়া।' জয়াকে বলে, 'আর ও ভারতী। আমাদের কিশোরপুরের মেয়ে।'

ভারতী বলে, 'ব্যস, এটুকুই? আমরা তোমাদের পাড়ায় থাকতাম। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি। এক কলেজে পড়েছি। এসব বল। নইলে অত শর্ট ইনট্রোডাকশানে বুঝবে কী করে যে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন ছিল?'

নতুন করে আবার ঘামতে শুরু করে অনুপম। সে কিছু বলার আগেই ভারতী এবার জয়াকে বলে, 'যদি তুমি করে বলি, আপত্তি নেই তো?'

জয়া স্মার্ট শহুরে মেয়ে। তা ছাড়া তার বাবা একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা। এসব সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনোরকম কমপ্লেক্স নেই, বরং এক ধরনের সারল্যই রয়েছে। তার কথাবার্তা এবং ব্যবহারে একটা আপন-করা ব্যাপার আছে যা মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। ভারতী সম্পর্কে এই মুহূর্তে তার দারুণ কৌতূহল। বলে, 'একেবারেই না। আমারও ওই সব 'আপনি' 'আজ্ঞে' ভালো লাগে না।'

ভারতী বলে, 'অনুপম আমার সম্বন্ধে তোমাকে কখনও কিছু বলে নি?'

জয়া আস্তে মাথা নাড়ে, 'না।'

'বলেছে। তুমি হয়ত ভুলে গেছ।' ভারতী চোখ সামান্য কুঁচকে একটু হাসে।

চোখের কোণ দিয়ে স্বামীকে এক পলক দেখে নিয়ে জয়া বলে, 'আমার স্মৃতিশক্তি অত দুর্বল নয়। ও কিচ্ছু বলে নি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।' একটু থেমে ফের বলে, 'ওকেই জিগ্যেস করে দেখ না।'

'জিগ্যেস করার দরকার নেই। হয়ত—'

'কী?'

'আমার কথা বললে যদি তুমি সন্দেহ কর, তাই বোধ হয় বলে নি।'

ভারতীর বলার মধ্যে আগের সেই গাম্ভীর্য বা বিদ্রূপ নেই। তার বদলে হালকা মজার ভাব ফুটে উঠেছে।

জয়া হেসে হেসে বলে, 'সেই রকমই মনে হচ্ছে।'

'আসলে মেয়েরা ভীষণ সন্দেহপরায়ণ কমিউনিটি তো।'

'এ কথাটা পুরোপুরি মানছি না ভারতী। ওয়ার্ল্ডে পুরুষদের এত সব কুকীর্তির নমুনা রয়েছে যে তাদের সন্দেহ না করে উপায় কী?'

দেড় ফুট দূরত্বে বসে এসব কথা শুনতে শুনতে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল অনুপম।

ভারতী হঠাৎ বলে ওঠে, 'আশা করি, তুমি একজন একনিষ্ঠ স্বামী পেয়েছ।'

কথাটা মজা হিসেবে ধরে নিয়ে মাথা সামান্য হেলিয়ে অনুপমের দিকে তাকায় জয়া। বলে, 'কি গো, ভারতী কী বলছে, শুনেছ?'

অনুপম উত্তর দেয় না। তার মুখে ফ্যাকাসে একটু হাসি ফোটে শুধু।

জয়া ফের বলে, 'তুমি একনিষ্ঠ হাজব্যান্ড তো? ভারতীকে ভালো করে জানিয়ে দাও।'

অনুপমের তুখোড় স্বভাব এবং আত্মবিশ্বাস ভারতীকে দেখার পর থেকে দ্রুত চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে জয়ার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটা ভেবে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে চেষ্টা করে সে। অনুপম বুঝতে পারে জয়াকে মাঝখানে রেখে ভারতী তাকে শেষ করে দিতে চাইছে। এই অদৃশ্য যুদ্ধটা তাকে জিততেই হবে। সেজন্য ধৈর্য এবং সূক্ষ্ম রণকৌশল দরকার। নইলে তার ভবিষ্যৎ একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

অনুপম কোনোরকমে জয়াকে বলে, 'স্বামী একনিষ্ঠ কিনা সেটা স্ত্রীরাই শুধু বলতে পারে। এর উত্তর তোমারই দেবার কথা।'

জয়া ঠোঁট টিপে হাসে, তবে কিছু বলে না।

ভারতী অনুপমের উদ্দেশে বলে, 'কথাবার্তায় স্মার্টনেস তো আগের মতোই রয়েছে দেখছি। তা হলে কাঠ হয়ে এতক্ষণ বসে ছিলে কেন?'

অনুপম তার বুকের ভেতরকার ধুকপুকুনি শুনতে শুনতে বলে, 'কাঠ হয়ে বসে থাকব কেন? তোমরা কথা বলছিলে। আমি শুনছিলাম।'

এদিকে জয়া অধৈর্য হয়ে ওঠে। উত্তর বাংলার এক ছোট মফঃস্বল শহরে অনুপম আর ভারতী কাছাকাছি থাকত, ছেলেবেলা থেকে দু'জনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, একই কলেজে পড়েছে—এর বেশি আর কিছু জানা যায় নি। ভারতী সম্পর্কে তার কৌতূহল না মেটা পর্যন্ত এক ধরনের অস্থিরতাই বোধ করতে থাকে সে। জয়া বলে, 'আমার স্বামীর যে এরকম একজন গার্লফ্রেন্ড আছে, আজ দেখা না হলে কোনোদিন জানতেও পারতাম না। সে যাক, তুমি কতদূর যাচ্ছ?'

ভারতী বলে, 'বম্বে।'

'বেড়াতে?'

'না। আমি ওখানেই থাকি। একটা কলেজে পড়াই। মা অসুস্থ, খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। এখন অনেকটা ভালো আছেন। আজ ফিরে যাচ্ছি।'

'মা কার কাছে থাকেন?'

'কখনও আমার কাছে বম্বেতে, কখনও কলকাতায় ভাইয়ের কাছে। ভাই ব্যাঙ্কের অফিসার।'

একটা কথা জানার জন্য উসখুস করতে থাকে জয়া। প্রশ্নটা তার মুখে প্রায় এসেও গিয়েছিল, কী ভেবে সামলে নেয়।

তার মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না ভারতীর। সে বলে, 'আমি বিয়ে করেছি কিনা জানতে চাইছ তো?'

জয়া হাসে। বলে, 'হ্যাঁ।'

ভারতী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর অন্যমনস্কর মতো বলে, 'কম বয়সে বিয়ে টাইপের একটা ব্যাপার ঘটেছিল। কিন্তু একদিনের মধ্যেই ওটা শেষ হয়ে যায়।'

এমন একটা উত্তর আশা করে নি জয়া। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে। লক্ষ করে, ভারতীর মুখচোখের চেহারা ক্রমশ পালটে যাচ্ছে। একসময় বিব্রতভাবে বলে, 'বুঝতে পারলাম না। বিয়ের মতো ব্যাপার মানে?'

'ও নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো।' বলতে বলতে ভারতী জানালার বাইরে তাকায়।

হাওড়া স্টেশন পেছনে ফেলে বম্বে মেল অনেক দূর চলে এসেছে। দু'ধারে ঝাপসা অন্ধকারে ফাঁকা মাঠ, টেলিগ্রাফের অস্পষ্ট পোস্ট, দূরে দূরে আলোর কয়েকটা বিন্দু ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

জয়া কী বলবে ভেবে পায় না। সে চুপচাপ বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে ভারতী বলে, 'সেই বিয়ে বিয়ে খেলাটার পর রিসেন্টলি একটা ব্যাপার ঘটেছে। বম্বেতে যে কলেজটায় পড়াই সেখানে মেয়ে স্টুডেন্টদের জন্যে হস্টেল আছে। আমি সেখানে থাকি। আর—'

'আর কী?'

'আমার এক পুরুষ কলিগ আমার সম্বন্ধে একটু বেশিমাত্রায় ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছেন।'

'কলিগটি কি বাঙালি?'

'না, মারাঠি ব্রাহ্মণ।'

'কী বলছেন ভদ্রলোক?'

'উনি আর কী বলবেন? তাঁর একটাই কথা। আমি রাজি হলে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে কিংবা রেজিস্ট্রি করে শুভ কাজটা সেরে ফেলতে চান।'

কেউ যেন জয়ার ভেতরকার মেয়েলি কৌতূহলকে উসকে দেয়। সে বলে, 'মানুষটি কেমন?'

'ভালো। ভদ্র, ডিসেন্ট। তাঁর বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু নেই।'

'ফ্যামিলি?'

'চমৎকার। ওঁর বাবা হাইকোর্টের জজ। দাদাবা ভেরি ওয়েল-প্লেসড। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা খুবই শিক্ষিত। কেউ অধ্যাপিকা, কেউ বড় অফিসার, কেউ আর্কিটেক্ট।'

'তবে রাজি হচ্ছ না কেন?'

'এই বেশ আছি। একা থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে গেছে। নতুন করে প্রবলেম জুটিয়ে কী লাভ?'

জয়া এবং ভারতী দু'জনে প্রায় সমবয়সী। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে, এমন মেয়েদের বয়স হঠাৎ যেন বেড়ে যায়। অভিজ্ঞ বয়স্ক মহিলাদের মতো ভারিক্কি চালে জয়া ভারতীকে একটি জরুরি পরামর্শ দেয়, 'সারা জীবন একা একা কাটানো যায় না। অন্তত শেষ বয়েসের জন্যে একজন কম্পেনিয়ন দরকার।'

যে রকম অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে দু'জনে কথা বলছে, কে বলবে বম্বে মেলের এই কুপে'তে আজই তাদের প্রথম দেখা এবং এক ঘণ্টা আগেও তারা কেউ কাউকে চিনত না।

ভারতী হেসে হেসে বলে, 'থ্যাঙ্কস ফব ইওর ভ্যালুয়েবল অ্যাডভাইস। কিন্তু বিয়ে সম্পর্কে আমার ভীষণ ভয়—'

'কেন?' জয়া বেশ অবাকই হয়ে যায়।

'ওই যে কম বয়েসে একটা বিয়ে বিয়ে ব্যাপারের কথা বলেছি না, তার পর থেকেই এ সম্পর্কে আমার ইন্টারেস্ট নেই। কতদিন বাঁচব বল? ষাট কি সত্তর বছর। একটা তো লাইফ, একা কেটে যাবে।'

'বিয়ে বিয়ে ব্যাপারটা কী? বল না, শুনতে ইচ্ছা করছে।'

অনুপম মাঝখানে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছিল। জয়ার প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবার আগের সেই ভয়টা ফিরে এসে তার স্নায়ুর ওপর চাক চাক বরফের মতো চেপে বসে। এই মুহূর্তে সে যেন কিছুই শুনতে বা দেখতে পাচ্ছে না। শুধু টের পাচ্ছে এক অনিবার্য নিয়তি এক টানে তাকে আজ বম্বে মেলের এই কুপে'তে টেনে নিয়ে এসেছে। হাওড়া ব্রিজের জ্যামটা আর কিছুক্ষণ থাকলে সে বেঁচে যেত। একটা প্রবল বিস্ফোরণের অপেক্ষায় সে শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে থাকে।

অনুপমের স্বভাবটাই এরকম যে পেছন ফিরে তাকাতে চায় না। কিন্তু এখন অদৃশ্য শক্তিমান কেউ ধাক্কা দিতে দিতে তাকে কয়েক বছর আগে উত্তর বাংলার সেই শহরটিতে টেনে নিয়ে যায়।

কিশোরপুর ছোট শহর। খুবই শান্ত এবং নিরিবিলি। দেশভাগের পর সব জায়গায় যখন পপুলেশন এক্সপ্লোসন বা জন-বিস্ফোরণ ঘটেছে তখনও ওখানে মানুষজন তেমন একটা বাড়ে নি। হাজার পঞ্চাশেক বাসিন্দা, কয়েকটা পিচের রাস্তা, অগুনতি খোয়া-ঢালা গলি, একটা কলেজ, একটা মেয়েদের আরেকটা ছেলেদের হাই-স্কুল, আট-দশটা প্রাইমারি স্কুল, ব্যায়ামাগার, নাটকের স্টেজ, ছোটখাটো একটা মিউনিসিপ্যালিটি, হাসপাতাল ইত্যাদি নিয়ে কিশোরপুর টাউন। অবশ্য সেই সঙ্গে থানা এবং আদালতও রয়েছে।

অনুপমের বাবা রাজমোহন ছিলেন কিশোরপুর থানার ওসি। ছোট জায়গায় থানার বড় বাবুদের প্রচণ্ড দাপট থাকে, রাজমোহনেরও ছিল। ওঁরা থাকতেন থানার কমপাউন্ডে, বেশ বড় একতলা লাল রঙের একটা বাড়িতে। ওটাই তাঁর সরকারি কোয়ার্টার।

রাজমোহনের তিন ছেলে এক মেয়ে। সবার ছোট অনুপম। আঠারো বছর আগে অনুপমের বয়স তখন চোদ্দ কি পনেরো। সে হাইস্কুলে পড়ত, তার বড়দা কলেজের থার্ড ইয়ারে আর ছোটদা ক্লাস টেনে। দিদি পড়ত সেকেন্ড ইয়ারে। লেখাপড়ায় অন্য ভাইবোনেরা মাঝারি ধবনের, চোখধাঁধানো রেজাল্ট করতে না পারলেও পাসটা ঠিক করে যেত। কিন্তু অনুপম একেবারে উলটো, পড়াশোনায় মোটেও মন ছিল না। ফি বছর হেড মাস্টারকে ধরাধরি করে রাজমোহন তার প্রোমোশনের ব্যবস্থা করতেন। ফুটবল সাঁতার ক্লাব নাটক—এই সব দিকেই ছিল তার প্রচণ্ড ঝোঁক।

আঠারো বছর আগের সেই সময়টায় ভারতীয় সাব-কন্টিনেন্ট ইতিহাসের এক নতুন বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাতচল্লিশে দেশভাগের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে গোলমাল। একাত্তরে ওপার বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই শুরু করে দেয় পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনীর সঙ্গে। এই যুদ্ধটি না বাধলে ভারতীর সঙ্গে অনুপমের দেখা কোনোদিনই হত না।

সেই সময় যে এক কোটি শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসে তাদের মধ্যে ভারতীরাও ছিল। তার বাবা হরনাথ ফরিদপুরের এক আদালতে মুহুরিগিরি করতেন। এপারে এসে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ওঁরা এসে ঠেকেছিলেন কিশোরপুরে। একটা কাজের আশায় একে তাকে ধরে যখন কিছুই হচ্ছিল না তখন রাজমোহন এখানকার কোর্টে এক পসারওলা মোক্তারের কাছে মুহুরির কাজ জুটিয়ে দেন। তখন ভারতীর বয়স দশ আর তার ভাই মানসের আট।

এই কাজটা হরনাথকে বাঁচিয়ে দেয়, নইলে ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁকে না খেয়ে মরতে হত। এজন্য রাজমোহনের কাছে সপরিবারে তাঁদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রায়ই ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে করে রাজমোহনের কাছে আসতেন হরনাথ।

নিয়মিত যাওয়া-আসার কারণে ভারতীকে অনেক বার দেখেছে অনুপম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা মেয়েটির দিকে ভালো করে তখন তাকাতও না সে।

এদিকে কাজ পাওয়ার পর কিশোরপুর থানার কাছাকাছি একটা ছোট টিনের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন হরনাথ। ছেলেমেয়েকে ওখানকার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ভারতী এবং মানস লেখাপড়ায় দারুণ ভালো। মানস ছেলেবেলা থেকেই মুখচোরা, লাজুক। কিন্তু ভারতী খুব স্মার্ট, কম বয়স থেকে তার মধ্যে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। তা ছাড়া আবৃত্তি অভিনয় এবং গানেও চৌখস। এসব কেউ তাকে শেখায় নি, নিজে নিজেই শিখেছে।

কিশোরপুর ছোট জায়গা। তিন চার বছরের ভেতরেই ভারতীর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। পূর্ব বাংলার গেঁয়ো ভাবটা তার মধ্যে আর ছিল না, শহর মেজে ঘষে তাকে ঝকঝকে করে দিচ্ছিল।

এদিকে স্বাভাবিক নিয়মেই যৌবনে পৌঁছে গিয়েছিল অনুপম। তাকে দেখতে ভালো, কথাবার্তা চমৎকার। বার দুই ফেল করার পর হায়ার সেকেন্ডারির গণ্ডি কোনোরকমে পেরিয়ে তখন সে কলেজে ভর্তি হয়েছে। খেলাধুলো নাটক ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তো ছিলই, এবার তার নজর এসে পড়েছিল মেয়েদের দিকে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মুগ্ধ করার দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল অনুপমের। ম্যাজিসিয়ানের মতো মেয়েদের সে টানতে পারত। আর মেয়েরা প্রায় আচ্ছন্নের মতো তার দিকে ছুটে যেত।

কিশোরপুর এতই ছোট শহর যে এখানে কোনো বড় মাপের ঘটনা ঘটে না। ম্যাড়মেড়ে একঘেয়ে জীবন ঢিমে চালে বয়ে যায়। কিন্তু অনুপমের সঙ্গে নানা মেয়েকে জড়িয়ে প্রচুর কানাঘুষো শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে দুর্নামও।

ঠিক এইসময় ভারতী অনুপমের কুড়ি বছরের টগবগে হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ যেন ঝড় বইয়ে দেয়। ভারতীকে এতকাল অন্যমনস্কর মতো দেখে এসেছে সে। তার দিকে ভালো করে তাকাবার মতো যেন কিছুই খুঁজে পায় নি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সেই গেঁয়ো মেয়েটা কখন যে তার অজান্তে এক অলৌকিক পরী হয়ে উঠেছে, অনুপম লক্ষ করে নি। এটা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছিল, ভারতী ছাড়া পৃথিবীতে কাম্য বস্তু আর কিছু নেই।

এত বছর তারা পাশাপাশি আছে, অথচ কোনোদিন অনুপম ভারতীদের বাড়ি যায় নি। তখন থেকে সকালে বিকেলে যখন তখন যেতে শুরু করল। ভারতী সেবার স্কুল ফাইনাল দেবে।

অনুপম সম্পর্কে অনেক গুঞ্জন, অজস্র দুর্নাম কানে এসেছে ভারতীর। কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা ম্যাজিক ছিল যাতে প্রায় ভেসেই গিয়েছিল ভারতী। মা-বাবার দিক থেকেও দু'জনের মেলামেশায় কিছু প্রশ্রয় ছিল। কিংবা যে রাজমোহন কাজ জুটিয়ে দিয়ে তাঁদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাঁর ছেলেকে বাধা দেবার শক্তি ছিল না হরনাথের।

এরপর ঘোরের ভেতর দু-আড়াইটা বছর কেটে গেছে। ততদিনে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল ভারতী। বি. এ ফার্স্ট ইয়ার। ইংরেজিতে অনার্স ছিল তার। আর পাস কোর্সে বার দুই ফেল করে কলেজেই থেকে গেছে অনুপম।

অনুপম কলেজে ক্লাস ট্লাস তেমন করত না কিন্তু ওই ব্যাপারটায় একেবারেই ফাঁকি ছিল না ভারতীর। ক্লাসটা সে নিয়মিত করত, বাড়িতে পড়াশোনাও। বাকি সময়টা উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনুপমের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। কখনও চলে যেত কাছাকাছি নদীর ধারে, কখনও দশ মাইল দূরে শিলিগুড়ি টাউনে সিনেমা দেখতে।

কিশোরপুর তো কলকাতা নয় যে কেউ কারুর খবর রাখবে না। এখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষের এক লাখ চোখ সর্বক্ষণ অনুপম আর ভারতীর দিকে তাকিয়ে আছে। চায়ের দোকানে, রাস্তার মোড়ে, নানা বাড়ির বৈঠকখানায়, রোয়াকে এই নিয়ে মুখরোচক গুলতানি।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে একদিন অনেক রাতে সমস্ত শহর ঘুমিয়ে পড়লে রাজমোহন ভারতীদের বাড়ি আসেন এবং হরনাথকে জানিয়ে দিয়ে যান, তিনি হরনাথের শুভকাঙ্ক্ষী ঠিকই, তাই বলে একটি মুহুরির মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলবেন, এটা কখনই হতে পারে না। ভারতীকে যেন সামলাতে চেষ্টা করেন হরনাথ।

রাজমোহন বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা সামাজিক দিক থেকে আলাদা স্তরের মানুষ। তিনি উঁচু লেভেলে দাঁড়িয়ে হরনাথদের করুণা করতে পারেন কিন্তু কোনোভাবেই তাঁদের নিজের লেভেলে তুলে আনবেন না।

রাজমোহন চলে যাবার পর মেয়েকে অনেক বুঝিয়েছেন হরনাথ কিন্তু ভারতী তখন এতই আচ্ছন্ন যে বাবার কথা তার কানে ঢোকে নি।

এরপর আরো দু-তিনবার এসেছেন রাজমোহন। কড়া ভঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতী যা করে চলেছে তার পরিণাম ভালো হবে না। কিন্তু ভারতীকে নতুন করে বুঝিয়ে এবং রাগারাগি করেও কিছু হয় নি।

প্রথম প্রথম রাজমোহন হরনাথের সঙ্গেই কথা বলে যেতেন। প্রচণ্ড দাপট সত্ত্বেও শালীনতাবোধ ছিল তাঁর। তিনি হরনাথদের ক্ষতি করতে চান নি। যা অভিযোগ হরনাথকেই জানিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একদিন এসে সোজাসুজি ভারতীকে শাসিয়েছিলেন। সে যদি অনুপমের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ না করে এ শহর থেকে তাদের চলে যেতে বাধ্য করা হবে।

পরের দিন অনুপমকে তার বাবার শাসানির কথা জানাতেই সে বলেছিল, 'ভেবো না, কালকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার করব যে বাবা আর কোনোদিন তোমাদের শাসাতে যাবে না।'

ভয়ে ভয়ে ভারতী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করতে চাইছ?'

'কাল জানতে পারবে।'

পরদিন এমন এক কাণ্ড অনুপম করেছিল তা যেমন দুঃসাহসিক তেমনি বিপজ্জনক। ভারতীকে নিয়ে সোজা শিলিগুড়ির এক কালী মন্দিরে চলে গিয়েছিল সে। সেখানে তার কপালে এবং সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে বলেছিল, 'মা কালী উইটনেস রইল। এখন থেকে আমরা হাজব্যান্ড-ওয়াইফ। আজ সারাদিন তুমি আর আমি যেখানে ইচ্ছা ঘুরে, যা ইচ্ছা করে রাতটা একটা হোটেলে কাটিয়ে, কাল মা-বাবার কাছে গিয়ে বলব, আমরা বিয়ে করেছি।'

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে এমন ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ জড়িয়ে ছিল যে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ভারতী। তবু এর মধ্যে তীব্র নেশার মতো কিছু একটা ছিল। ভারতীর মনে হয়েছে, অনুপমের কথামতো একটা রাত হোটেলে কাটিয়ে পরদিন কিশোরপুরে ফিরে গেলে রাজমোহন এ বিয়ে নিশ্চয়ই মেনে নেবেন, কোনোভাবেই তাকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

সারাটা দিন ঘোরের ভেতর প্রায় উড়েই বেড়িয়েছে ভারতী আর অনুপম। তারপর সন্ধেবেলায় এক হোটেলে সবে তারা পা দিয়েছে, চোখে পড়েছিল, কয়েকজন আর্মড কনস্টেবল নিয়ে বসে আছেন রাজমোহন। দু'জনকে জিপে তুলে নিয়ে সেই রাত্তিরেই কিশোরপুর ফিরে এসেছিলেন তিনি।

রাস্তায় ভুরু কুঁচকে ভয়ঙ্কর চোখে ভারতীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক পলক দেখে নিয়েছিলেন রাজমোহন, দেখতে দেখতে তাঁর চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে কর্কশ গলায় বলেছিলেন, 'কপালে সিঁদুর চড়িয়েছ দেখছি। বিয়েটা করেই ফেললে কিন্তু ওই সিঁদুরটা যে তুলে ফেলতে হবে।'

ভারতী উত্তর দেয় নি, প্রচণ্ড ভয়ে মুখ নিচু করে সে তখন কাঁপছিল।

মিনমিনে গলায় অনুপম বলেছে, 'কিন্তু বাবা—'

গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন রাজমোহন, 'শাট আপ রাসকেল।'

অনুপম একেবারে চুপ করে গিয়েছিল, সারাটা রাস্তায় আর একটাও কথা বলে নি।

কিশোরপুরে ফিরে অনুপমকে তাঁদের কোয়ার্টারে নামিয়ে ভারতীকে সঙ্গে করে সোজা তাদের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন রাজমোহন।

ভারতীর বাবা হরনাথের সঙ্গে রাজমোহনের কী কথা হয়েছিল অনুপম জানে না। তবে আন্দাজ করতে পেরেছিল। দিন পাঁচেক বাদে মধ্যরাতে কিশোরপুর যখন গাঢ় ঘুমে অসাড়, সেই সময় সবার অজান্তে লরিতে মালপত্র চাপিয়ে নিঃশব্দে এ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল ভারতীরা।

এই পাঁচ দিন ভারতীকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হয় নি। সে যাতে অনুপমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে সেজন্য তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় দু'টো আর্মড গার্ড পোস্ট করে দিয়েছিলেন রাজমোহন। চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে তারা পাহারা দিয়ে গেছে।

অনুপমও ভারতীর সঙ্গে দেখা করে নি। যেমনই হোক একটা বিয়ে তাদের হয়েছিল। শিলিগুড়ির হোটেলে গিয়ে যার সঙ্গে ফুলশয্যা করতে চেয়েছিল তাকে যে সামাজিক মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন এটা একবারও সে ভেবে দেখে নি। তেমন সাহস বা দৃঢ়তা কোনোটাই তার ছিল না। ভারতীর জন্য দু-একদিন অনুপমের মন খারাপ হয়ে থাকবে। তারপরই তার চিন্তা মাথা থেকে বার করে দিয়েছিল। আসলে অনুপমের স্বভাবটাই ছিল জঘন্য। অল্প বয়স থেকে সে মেয়েদের নিয়ে খেলে এসেছে। মেয়েদের বিশ্বাস এবং সারল্যের সুযোগ নিয়ে সে তাদের ক্ষতিই করে গেছে।

কিশোরপুর থেকে ভারতীরা চলে যাবার পর তাদের খবর রাখত না অনুপম। ভারতী সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহও অবশিষ্ট ছিল না। তবে কার কাছে যেন শুনেছিল, ভারতীরা কিশোরপুর থেকে সোজা কলকাতায় গেছে এবং সেখানে যাবার মাস ছয়েক পর হরনাথের মৃত্যু হয়েছে।

বছর তিনেক বাদে রাজমোহন ট্রান্সফার নিয়ে কিশোরপুরের পালা চুকিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। এখানে আসার পর ইচ্ছা করলে ভারতীদের খুঁজে বার করতে পারত অনুপম কিন্তু ভারতীর কথা তার মনেই পড়ে নি।

কলকাতায় এসে বি. এ'টা কোনোরকমে পাস করতে না করতেই জয়ার সঙ্গে তার আলাপ। চুটিয়ে কিছুদিন প্রেম। তারপর বিয়ে এবং জয়ার পোলিটিক্যাল লিডার বাবার দৌলতে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে দামি চাকরি, সুখী ফ্যামিলি লাইফ, ছেলের জন্ম, চমৎকার ফ্ল্যাট, ইত্যাদি।

রবার দিয়ে পেন্সিলের দাগ তুলে দেবার মতো ভারতীকে স্মৃতির ভেতর থেকে মুছে দিয়েছিল অনুপম। কিন্তু কে জানত, এতকাল বাদে বম্বে মেলের এই কুপে'তে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে।

বাবার মৃত্যুর পর কিভাবে ভারতীদের দিন কেটেছে, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে অনুপম। নিশ্চয়ই প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটা গেছে ওদের ওপর দিয়ে। ভারতী ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ায় ভালো, স্কুলে পড়ার সময় থেকেই দুর্দান্ত রেজাল্ট করে এসেছে। বোঝা যায় প্রচুর কষ্ট টষ্ট করে সে লেখাপড়া চালিয়ে গেছে। প্রোফেসর যখন, এম. এ'টা অন্তত পাস করতে হয়েছে। ভাই ব্যাঙ্ক অফিসার, তাকেও সে দাঁড় করিয়েছে।

এসবই অনুপমের অনুমান। অনুমান হলেও এটাই স্বাভাবিক। তার ধারণা জিগ্যেস করলে ভারতীর কাছ থেকে এ জাতীয় উত্তরই পাওয়া যাবে। কিন্তু নিজের থেকে কোনো প্রশ্ন করতে তার সাহস হয় না।

হাওড়া ছাড়ার পর ঘণ্টা দুই কেটে গেছে। মাঝখানে ট্রেন একটা স্টেশনে থেমেছিল, তারপর আবার উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগিয়েছে।

কুপে'র জানালা খোলা রয়েছে। হু হু করে আরামদায়ক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে ভেতরে। বাইরে আকাশের মাঝখানে গোল চাঁদটা যেন বিশাল রুপোর থালা। দুধের মতো ধবধবে জ্যোৎস্নায় চরাচর ভেসে যাচ্ছে।

বয়স্ক শিখ সহযাত্রীটি রাতের খাওয়া চুকিয়ে ওপরের বাঙ্কে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু নিচে ভারতী আর জয়া সমানে কথা বলে যাচ্ছে। পরস্পরের সম্পর্কে দু'জনেরই তীব্র কৌতূহল। বাল্য বান্ধবীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল সেটা যেন বুঝে নিতে চায় জয়া। আর অনুপমের মতো মানুষের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন কিভাবে কাটাচ্ছে সেটাই হয়ত জানতে চাইছে ভারতী।

জয়া বলছে, 'বিয়ের মতো ব্যাপারটা কিন্তু এখনও বলনি।'

ভারতী বলে, 'কী হবে সে সব শুনে?'

'ধর সিম্পল কিউরিওসিটি—'

চোখের কোণ দিয়ে অনুপমকে লক্ষ করে ভারতী। অনুপম একেবারে কাঠের মূর্তি হয়ে গেছে। করুণাই হয় ভারতীর। এতদিন বাদে ফুটন্ত রাগ ক্ষোভ এবং প্রতিহিংসার ইচ্ছা অনেকখানি জুড়িয়ে এসেছে। ঘৃণা বা বিদ্বেষের তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'খুবই মামুলি ঘটনা। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমাদের সোসাইটিতে পাজি বদ ডিবচের অভাব নেই। এদেব অনেকেই মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কোনো মন্দিরে টন্দিরে তাদের নিয়ে গিয়ে গলায় মালা. কপালে সিঁদুর দিয়ে বলে, 'এই আমাদের বিয়ে হল।' তারপর একদিন চরম বিশ্বাসঘাতকতাটি করে বসে। ধরে নাও সেইরকম একটা ইনসিডেন্ট আমার জীবনেও ঘটেছিল।'

সামনের দিকে ঝুঁকে জয়া জিগ্যেস করে, 'ছেলেটা কে?'

হঠাৎ একটু মজা করার ইচ্ছা হয় ভারতীর। সে স্থির চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওটা জানতেই হবে?'

জয়া বলে, 'বলই না—'

ভারতী ঠোঁট টিপে কিছু ভেবে নেয়। তার পর বলে, 'ঠিক আছে, বলব। তবে এখন নয়। দেড় দিনের মতো একসঙ্গে তো থাকছি। নামাব সময় জানিয়ে দেব।' অনুপমের দিকে না তাকিয়েও ভারতী টের পায় তার হৃৎপিণ্ড জমাট বেঁধে গেছে।

একটু চুপচাপ।

তারপর ভারতীই ফের শুরু করে, 'বম্বেতে নিশ্চয়ই তোমরা দু-চার দিন থাকছ?'

জয়া বলে, 'সেই রকমই ইচ্ছে।'

'তা হলে আমার হস্টেলে একদিন এস।'

জয়া উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই শশব্যস্তে অনুপম বলে ওঠে, 'না না, আমরা বম্বেতে নেমেই গোয়া চলে যাব। ফেরার পথে হয়ত এক আধদিন থাকতে পারি।'

অনুপমের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না ভারতীর। কোনোরকমে এই কুপে'র ভেতর চোখকান বুজে ছত্রিশটা ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে সে বেঁচে যায়। বম্বেতে নামার পর ভারতীর ধারেকাছে ঘেঁষার ইচ্ছা নেই। জীবনে তার সঙ্গে আবার দেখা হোক, এটা আদপেই চায় না অনুপম।

ভারতী চোখ সামান্য ছোট করে অনুপমকে দেখতে থাকে। একটা ফাঁদে-পড়া ভীরু সন্ত্রস্ত জন্তুর মতো মনে হচ্ছে তাকে।

এদিকে জয়া বেশ অবাক হয়েই অনুপমের দিকে মুখ ফেরায়। বলে, 'সে কি, আমরা তো প্রোগ্রাম করে রেখেছি, আগে বম্বে দেখে তারপর গোয়া যাব।'

অনুপম ক্ষীণ গলায় বলে, 'ভেবে দেখলাম, আগে গোয়ায় চলে যাওয়াই ভালো।' তার ইচ্ছা, গোয়ায় একবার যেতে পারলে ওখান থেকে আর বম্বে ফিরবে না। কোনো এক অছিলায় ত্রিবান্দ্রাম কি বাঙ্গালোর চলে যাবে। সেখান থেকে কলকাতা।

ভারতী তক্ষুনি সায় দিয়ে বলে, 'সেটা মন্দ না। আগে গোয়া টোয়া দেখে, বম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরতে পার। বম্বেতে এসে কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করবে।' বলল বটে, তবু নিশ্চিতভাবেই সে জানে, এই ট্রেন থেকে নেমে একবার চোখের আড়ালে যেতে পারলে জীবনে আর কখনও অনুপমের সঙ্গে দেখা হবে না।

শ্বাস টানার মতো আওয়াজ করে অনুপম বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

ভারতী আর কিছু বলে না। তার ঠোঁটে এবং চোখের কোণে আধফোটা একটু হাসি দেখা দিয়েই দ্রুত মিলিয়ে যায়।

আরো খানিকক্ষণ বাদে ওরা রাতের খাওয়া সেরে নেয়। ভারতী এবং জয়ারা টিফিন ক্যারিয়ারে নিজেদের খাবার নিয়ে এসেছিল। ভারতী নেবে না, জয়া একরকম জোর করেই তার প্লেটে একটা বড় সন্দেশ আর মুগের লাড্ডু তুলে দেয়। ভারতীও ওদের দেয় মাছের চপ।

খাওয়ার পর শোওয়ার পালা। নিচে দু'টো বার্থে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে ভারতী এবং জয়া। জয়ার ওপরের বার্থে অনুপম।

জয়া ভীষণ ঘুমকাতুরে। কিন্তু আজ তার কিছু হয়ে থাকবে। সে জেগেই থাকে এবং ভারতীর সঙ্গে এলোমেলো গল্প করে যায়।

ওপরের বার্থে কাত হয়ে, দম বন্ধ করে পলকহীন ভারতীর দিকে তাকিয়ে থাকে অনুপম। কখন, কোন কথায় ভারতী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেবে, কে জানে।

ভারতীরা অনেক গল্প করে কিন্তু দশ বছর আগের সেই বিয়ের প্রসঙ্গটা আর ওঠে না। একসময় কথা বলতে বলতে নিচের বার্থে ওরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু চোখ টান করে তার পরও অনেকক্ষণ জেগে থাকে অনুপম।

একটা রাত কেটে যায়। এখনও পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা রয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর ওপরের বার্থ থেকে নিচে নামতে নামতে অনুপম সারাদিনের কর্মসূচি ঠিক করে নেয়। যতক্ষণ ট্রেনে থাকবে তাকে চোখকান খোলা রাখতে হবে। সব রকম সতর্কতা সত্ত্বেও বিপর্যয় ঠেকানো যাবে কিনা এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই কঠিন।

রাতে যতক্ষণ অনুপম ঘুমিয়ে ছিল, মোটামুটি কেটে গেছে। কিন্তু আজ সকাল থেকে টের পায়, স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। সে জানে এই চাপটা কাল ভোরে দাদার স্টেশনে না নামা পর্যন্ত থেকেই যাবে।

ভারতী এবং জয়াও সবে ঘুম থেকে উঠেছে। মুখোমুখি বসে তারা কথা বলছিল।

অনুপম নিচে নামতেই ভারতী বলে, 'গুড মর্নিং।'

অনুপম 'গুড মর্নিং' বলে জয়ার পাশে বসে।

ভারতী জিগ্যেস করে, 'কাল ঘুম কেমন হল?'

প্রশ্নটার ভেতর কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে কি ? একটু চমকে ওঠে অনুপম। স্মার্ট হবার ভঙ্গি করে বলে, 'ফাইন ঘুমিয়েছি।' বলেই জয়ার দিকে ফেরে, 'বাসি মুখে বসে আছ। যাও, মুখ ধুয়ে এস।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি।' ব্যাগ থেকে অনুপমের এবং নিজের ব্রাশ পেস্ট তোয়ালে ইত্যাদি বার করে জয়া। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে, এক হাতে তোয়ালে, ইস্তিরি-করা শাড়ি, জামা টামা ঝুলিয়ে কুপে থেকে বেরিয়ে যায় সে।

তারপর এক মুহূর্ত দেরি করে না অনুপম। ক্ষিপ্র হাতে নিজের ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে, তোয়ালে পায়জামা টায়জামা নিয়ে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে কুপে'র বাইরে চলে যায়।

এই কম্পার্টমেন্টের দুই মাথায় দু'টো টয়লেট ছাড়াও রয়েছে মুখ ধোওয়ার আলাদা বেসিন। জয়া গেছে ডান দিকের টয়লেটে, অনুপম যায় বাঁ দিকে।

তাড়ার কিছু ছিল না, ধীরে সুস্থে টয়লেটে যেতে পারত অনুপম। কিন্তু একা ভারতীর সামনে থাকতে চায় না সে। তার পক্ষে সেটা খুবই অস্বস্তিকর এবং বিপজ্জনকও। আবার জয়া একা একা ভারতীর সঙ্গে কথা বলুক, সেটাও কম মারাত্মক নয়। তখন ভারতী তাকে সেই বিয়ের ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে পারে। ফলে তাদের সুখী বিবাহিত জীবন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। জয়ার বাবা একটা ফোন করে দিলে তাদের মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি তাকে সোজা দরজা দেখিয়ে দেবে।

অবশ্য অনুপম সামনে থাকলেই যে ভারতী বিয়ের কথা বলবে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু ভারতীর কাছে দু'জনের অর্থাৎ তার এবং জয়ার একসঙ্গে থাকাটা কম বিপজ্জনক মনে হয় তার, যদিও এর কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

অনুপমের তাড়াহুড়ো দেখে নিঃশব্দে হাসে ভারতী। তার মনোভাব টের পেতে অসুবিধা হয় নি ভারতীর।

কোনোরকমে মুখটুখ ধুয়ে রাতের বাসি পোশাক পালটে জয়ার টয়লেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে অনুপম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে জয়া বেরুলে তাকে সঙ্গে করে কুপে'তে ফিরে আসে।

অনুপমের এ জাতীয় আচরণের জন্য অবাকই হয় জয়া, তবে কোনো প্রশ্ন করে না।

এরপর জয়া কোনো কারণে বাইরে বেরুলে অনুপমও বেরিয়ে পড়ে। বড় স্টেশনে বম্বে মেল দাঁড়ালে, জয়াকে নিয়ে খানিকক্ষণ প্ল্যাটফর্মে ঘুরে আসে। এর ফাঁকে ফাঁকে ভারতীর সঙ্গে গল্প করতে করতে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার। গল্পটা অবশ্য জয়া আর ভারতীই করে যায়। আর তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে শুনে যায় অনুপম। কচিৎ কখনও দু-একটি কথা বলে।

এভাবেই একটা আস্ত দিন এবং গোটা একটি রাত কেটে যায়।

পরদিন ভোরে দাদার স্টেশনে ট্রেন থামলে তিন জনই নেমে পড়ে। অনুপম ঠিক করে রেখেছে, এক বেলার জন্য একটা হোটেলে উঠে গোয়া যাবার ব্যবস্থা করে ফেলবে।

জয়া সেই কথাটা ভোলে নি। সে বলে, 'কার সঙ্গে তোমার বিয়ের খেলাটা হয়েছিল, বল নি কিন্তু—'

দ্রুত কিছু ভেবে নেয় ভারতী। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'তোমরা তো গোয়া থেকে ফিরে আমার ওখানে আসছই। তখন শুনো।' বলে চোখের কোণ দিয়ে অনুপমকে লক্ষ করতে থাকে।

অনুপম সাঁতার-না-জানা মানুষের মতো অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছিল যেন। তার শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার আস্তে আস্তে বুকের আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে আসতে থাকে।

একটু পর দুই কুলির মাথায় তিনজনের মালপত্র চাপিয়ে ওরা স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে চলে আসে। ভারতীও এখান থেকে ট্যাক্সি ধরবে।

কুলি এবং জয়াকে অপেক্ষা করতে বলে ট্যাক্সি ধরতে ছোটে অনুপম।

ভারতী জয়াকে বলে, 'তুমি আমার কুলিটাকে একটু দেখো। আমারও একটা ট্যাক্সি দরকার।'

লাইন দিয়ে এখানে ট্যাক্সি ধরতে হয়। স্ট্যান্ডে এসে অনুপমের পাশে দাঁড়ায় ভারতী।

অনুপমের শিরদাঁড়া বেঁকে দুমড়ে যায় যেন। নিচু গলায় প্রায় হাতজোড় করে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি ভারতী। আমাকে ক্ষমা কর।' একটু থেমে বলে, 'ইচ্ছা করলে আমার জীবন নষ্ট করে দিতে পারতে, কর নি। তোমাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাই—'

হাত তুলে অনুপমকে থামিয়ে দেয় ভারতী, 'কৃতজ্ঞতার দরকার নেই। তোমাকে শেষ করে দেবার মতো অস্ত্রটা আমার হাতে থেকেই গেল। কিন্তু ওটা কাজে লাগাতে হলে তোমার স্তরে নামতে হয়। এত নিচে নামার মতো রুচি আমার নেই। তোমার সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই ভালো।'

ওরা দু'জন

একটা সিনেমা ম্যাগাজিনে কালকের মধ্যেই গল্প লিখে দিতে হবে। 'দিচ্ছি, দেব' করে সম্পাদককে অনেক দিন ঘুরিয়েছেন দেবকুমার। এখন আর না দিলেই নয়।

গল্পটা আগাগোড়া ভাবাই আছে। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর প্যাড আর কলম নিয়ে বসেও গেছেন দেবকুমার। শুরু করতে যাবেন, পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ফোনটা বাজতে থাকুক, তার আগে দেবকুমার সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া যাক।

দেবকুমার, পুরো নাম দেবকুমার সেন, একজন নাম-করা লেখক। বয়স, বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ। এরই মধ্যে তিরিশ-বত্রিশখানা উপন্যাস লিখেছেন, গল্পগ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়, দশ-বারোটার মতো। সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা। দেবকুমার যথেষ্ট জনপ্রিয়ও। তাঁর নতুন লেখার জন্য পাঠক উৎসুক হয়ে থাকে।

চাকরি বাকরি করেন না। লেখা থেকেই দেবকুমারের প্রচুর আয়। তা ছাড়া কিছুদিন ধরে সিনেমার জন্য তাঁর গল্প বিক্রিও হচ্ছে। সে সব গল্পের চিত্ররূপ বেশ ভালোই চলেছে। ফলে সিনেমাওলাদের কাছে দেবকুমারেব লেখার চাহিদা বেড়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে তিনিও সিনেমা সম্বন্ধে ইদানীং আকর্ষণ বোধ করছেন।

কোনো বাজে নেশা নেই দেবকুমারের, মাঝে মধ্যে এক-আধটা সিগারেট খান অবশ্য। তবে দু' ঘণ্টা পর পর চা না হলে চলে না।

দেবকুমার বিবাহিত। স্ত্রী জয়তীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। গোলগাল আদুরে ধরনের মেয়ে। ছেলেপুলে হয় নি, তাই ঝঞ্ঝাটও নেই। রান্নাবান্না আর ঘরের নানা কাজকর্মের জন্য দু'টি লোক আছে। অতএব জয়তীর হাতে প্রচুর সময়। সময় কাটাবার জন্য প্রায়ই সে সিনেমায় যায়।

দাম্পত্য জীবন ওঁদের বেশ সুখের, অন্তত দেবকুমারের তাই ধারণা। বছর সাত-আট আগে ভালোবেসে ওঁদের বিয়ে হয়েছে। তাঁর একটা লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে জয়তী ফোন করেছিল। সেই সূত্রেই আলাপ, ক্রমশ প্রেম, অবশেষে বিয়ে। দেবকুমার মনে করেন, তাঁদের বিবাহপূর্ব ভালোবাসা এখনও অটুট আছে। প্রায়ই স্ত্রীকে বলেন, 'আমার মতো একনিষ্ঠ স্বামী তুমি আর একটিও দেখাতে পারবে না। তুমি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাই না পর্যন্ত।'

শুনে সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি করে জয়তী, চোখ কুঁচকে ঠোঁট টিপে বলে, 'তাই নাকি! সবে তো বেয়াল্লিশ পার হল। ফাঁদে পড়বার মতো এখনও যথেষ্ট সময় আছে।'

জয়তীর গালে আলতো করে টোকা দিয়ে দেবকুমার বলেন, 'আমাকে আটকাবার মতো ফাঁদ এখনও তৈরি হয় নি। তোমা বই আর কিছু জানি নে সখি।'

জয়তী হেসে হেসে বলে, 'দেখা যাক।'

এবার পাশের ঘরের ফোনটার দিকে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। সেটা বেজেই যাচ্ছে।

জয়তী বাড়ি নেই যে ফোনটা ধরবে। খেয়েদেয়েই পাড়ার একগাদা মেয়ে জুটিয়ে সে সিনেমা না কোথায় যেন গিয়েছে।

লেখায় বাধা পড়ায় দেবকুমার বিরক্ত, তবু উঠতে হল। পাশের ঘরে এসে ফোনটা তুলে বললেন, 'হ্যালো—'

ওধার থেকে একটা মেয়ে-গলা ভেসে এল, 'এটা কি দেবকুমার সেনের বাড়ি?'

দেবকুমার বললেন, 'হ্যাঁ, কী দরকার বলুন—'

মেয়ে না মহিলা কে জানে, কণ্ঠস্বর শুনে তো বয়স বুঝবার উপায় নেই, জানালো, দেবকুমারের সঙ্গে সে কথা বলতে চায়।

দেবকুমার বললেন, 'আমিই দেবকুমার—'

মেয়েটি এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'আপনিই! কী সৌভাগ্য! আমার নাম মণিকা, আমি আপনার একজন ভক্ত পাঠিকা।'

প্রথমে লক্ষ করেন নি দেবকুমার, এবার মনে হল, মহিলার স্বরটা ধরা ধরা। হয়তো গলায় ঠাণ্ডা টাণ্ডা লেগেছে। যাই হোক, দেবকুমারের খুব ভালো লাগল। প্রায়ই তিনি পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি পান। কচিৎ কখনও দু-একজন তাঁকে ফোনও করে। তবে জয়তী ছাড়া আর কোনো মেয়ে তাঁকে ফোন করেছে কিনা মনে করতে পারলেন না। দেবকুমার আগ্রহের সুরে বললেন, 'ভক্ত-টক্ত বললে বিব্রত হব। আমার লেখা আপনার ভালো লাগে জেনে খুব আনন্দ হল।'

দেবকুমারের কোন কোন ছোটগল্প এবং উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়েছে তার লম্বা একটা তালিকা দিল মণিকা।

শুনে দেবকুমার বললেন, 'আপনি যে এত যত্ন করে আমার লেখা পড়েছেন সেজন্যে ধন্যবাদ।'

মণিকা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যদি রাগ না করেন, এবার একটা কথা বলব।'

দেবকুমার বললেন, 'রাগ করব কেন, আপনি বলুন—'

মণিকা বলল, 'আপনার আগের লেখা আমাকে যেভাবে নাড়া দিত, এখনকার লেখাগুলো সেভাবে ধাক্কা দেয় না। দু'বছর ধরে আপনি কিন্তু ভীষণ ফাঁকি দিচ্ছেন।'

দেবকুমারের মনে পড়ে গেল, একটু আগে মণিকা তাঁর যে সব লেখার কথা বলছিল সে তালিকায় এখনকার কোনো গল্প উপন্যাসের নাম ছিল না। বিমূঢ়ের মতো তিনি বললেন, 'ফাঁকি দিচ্ছি!'

মণিকা বলল, 'আমার তো তাই মনে হয়। আগে আপনার লেখায় সামাজিক সমস্যা দেখা যেত, আজকের জীবনের নানারকম জটিলতা লক্ষ করতাম, কিন্তু আপনার গল্প সিনেমা টিনেমা হবার পর সেসব কিছুই দেখা যাচ্ছে না।' চিত্রজগতের নাম-করা নায়ক-নায়িকাদের নাম করে সে বলল, 'আজকাল আপনি ওদের মুখ ভেবে গল্প লেখেন । যেমন যেমন চরিত্রে ওদের মানায় তেমন তেমন চরিত্র তৈরি করে দেন।'

দেবকুমার চমকে উঠলেন। ভেতরে ভেতরে খানিকটা অসন্তুষ্টও। নীরস গলায় বললেন, 'আপনি ভুল করেছেন। আমার এখনকার লেখাগুলো হয়তো ভালো করে পড়েন নি।'

মণিকা হেসে ফেলল, 'বলেছিলেন রাগ করবেন না, কিন্তু করেছেন। আপনার লেখা আমি যত্ন করেই পড়ি। সে যাক, আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আবার আগের মতো লিখুন। সিনেমার জন্য ছক-কাটা গল্প না, আপনার লেখায় জীবনের ছবি ফুটুক। আচ্ছা নমস্কার।'

টেলিফোনটা নামিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন দেবকুমার। মণিকা যা বলল তা কি ঠিক? আজকাল ফিল্ম স্টারদের চেহারা ভেবেই কি তিনি লিখছেন? আচমকা মনে পড়ল, দু-একটা পত্রপত্রিকাতেও তাঁর সম্বন্ধে এইরকম কী সব লিখেছে। খবর পেয়েছেন তরুণ লেখকরা তাঁর সাম্প্রতিক লেখাগুলো পড়ে নাকি খুশি নয়। তবে এখন পর্যন্ত কোনো পাঠক বা পাঠিকা মণিকার মতো এরকম সরাসরি অভিযোগ করে নি। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি তাঁর লেখার চরিত্রগুলোর সঙ্গে চিত্রতারকাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, দেবকুমার কী করতে পারেন? যুক্তিটা নিজের কাছেই খুব জোরালো মনে হল না। লেখক হিসাবে তিনি কি ফুরিয়ে যাচ্ছেন? একটা ঘুণপোকা তাঁর বুকের ভেতর কুর কুর করে শিরা কাটতে লাগল।

দিন পনেরো বাদে আবার ফোন করল মণিকা। সে বলল, 'সেদিন আপনাকে কী সব বলেছি, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।'

মণিকার স্বর আজও ধরা। হয়তো গলার কোনো দোষ আছে। এতদিন ঠাণ্ডা লেগে থাকার কথা নয়। দেবকুমার বললেন, 'ধৃষ্টতা কিছুই করেন নি। আমার লেখা পড়ে আপনার যা মনে হয়েছে তাই বলেছেন। ভালোমন্দ মন্তব্য করার অধিকার পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয়ই আছে।'

মণিকা এবার বলল, 'একটা কথা বলতে চাই—'

দেবকুমার বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

মণিকা বলল, 'এটা তো জানুয়ারি মাস। আশা করি এখন থেকে বৈশাখ সংখ্যাগুলোর জন্যে লেখা শুরু করে দিয়েছেন। আপনার মতো জনপ্রিয় লেখককে তো প্রচুর লিখতে হয়।'

দেবকুমার বললেন, 'শুরু করি নি। তবে করব করব ভাবছি।'

মণিকা বলল, 'আমার ইচ্ছা, একটা অন্তত চমকে দেবার মতো লেখা লিখুন—'

দেবকুমার বললেন, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

এবার বৈশাখের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে তিনটে উপন্যাস আর চারটে গল্প লিখবেন বলে কথা দিয়েছেন দেবকুমার। কিন্তু লিখতে বসে মনে হতে লাগল, যে লেখাটাই মাথায় আসছে সেটাই সিনেমার গল্পের মতো ছক-কাটা আর সাজানো। অনুভব করলেন, অদৃশ্য কোথাও বসে একটি পাঠিকা অনিমেষে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। দেবকুমারের লেখক জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি। তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন।

জানুয়ারি মাস গেল, ফেব্রুয়ারিও গেল, কিন্তু কাগজে একটি আঁচড়ও কাটতে পারলেন না দেবকুমার। পত্রিকাগুলো থেকে তাগাদার পর তাগাদা আসছে। শেষ পর্যন্ত মার্চের মাঝামাঝি

একটি মাত্র ছোট উপন্যাসই লিখতে পারলেন তিনি। লেখাটা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে গেল। তরুণ লেখকদের কেউ কেউ এসে বলে গেল, 'দারুণ লিখেছেন দাদা।' দু-একটা পত্রিকায় লিখল, লেখাটা জীবনের গভীর থেকে উঠে এসেছে, অনেক দিন পর দেবকুমার সেন ভালো লিখলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি—

কিন্তু যার মন্তব্যের জন্য দেবকুমার উন্মুখ হয়ে আছেন সে ফোন করল না। মণিকার ফোন নাম্বার বা ঠিকানাও জানেন না যে যোগাযোগ করবেন।

শেষ পর্যন্ত লেখাটা বেরুবার প্রায় মাসখানেক বাদে মণিকার ফোন এল। জয়তী বাড়ি নেই। চার-পাঁচ দিন আগে যোধপুর পার্কে বাপের বাড়ি গিয়েছে।

মণিকা বলল, 'আমার অভিনন্দন নিন।' বৈশাখ মাসের লেখাটার উল্লেখ করে বলল, 'এতদিন পর আসল দেবকুমার সেনকে আমরা ফিরে পেলাম।'

কৃতজ্ঞ সুরে দেবকুমার বললেন, 'এ লেখা আপনার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, আপনি প্রেরণা না দিলে কিছুতেই আমি এ উপন্যাস লিখতে পারতাম না।'

মণিকা বলল, 'কী যে বলেন, আমি সামান্য এক পাঠিকা—'

দেবকুমার বললেন, 'সামান্য কি অসামান্য, সে আমি জানি। যদি সাহস দেন একটা কথা বলি—'

মণিকা বলল, 'সাহস দিলাম—'

দেবকুমার বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া কি সম্ভব?'

মণিকা বলল, 'নিশ্চয়ই সম্ভব। কবে?'

দেবকুমার সাগ্রহে বলেন, 'আপনার তেমন কোনো কাজ না থাকলে আজই।'

মণিকা বলল, 'আমার কোনো কাজ নেই।'

চৌরঙ্গির একটা রেস্তোরাঁর নাম করে দেবকুমার বললেন, 'ওখানে আসুন না, বিকেল পাঁচটার সময়। ঢুকেই বাঁ ধারে যে কেবিনটা, সেখানে থাকবেন।' এই রেস্তোরাঁটা দেবকুমারের খুবই প্রিয়।

মণিকা বলল, 'আচ্ছা—'

পাঁচটার সময় নির্দিষ্ট কেবিনে পা দিয়েই চমকে উঠলেন দেবকুমার, জয়তী বসে আছে। তাঁকে দেখেই হেসে হেসে জয়তী বলল, 'আসুন দেবকুমার বাবু, আসুন। কী সৌভাগ্য, আপনার দেখা পেলাম—'

অবাক বিস্ময়ে দেবকুমার বললেন, 'তুমি! তুমি এখানে!'

জয়তী বলল, 'বা রে, তুমিই তো ফোনে আমাকে এখানে আসতে বললে।'

দেবকুমার হকচকিয়ে গেলেন। স্বামীর মুখটা দেখতে দেখতে চাপা গলায় জয়তী বলল, 'আমিই মণিকা।'

বিমূঢ়ের মতো দেবকুমার বললেন, 'তুমিই মণিকা!'

মণিকা বলল, 'খুব হতাশ হলে তো?'

অনেকখানি ঝুঁকে দেবকুমার বললেন, 'তুমিই মণিকার নাম করে ফোন করতে!'

জয়তী বলল, 'ইয়েস স্যার। দেখছিলাম তোমার দৌড় কতদূর। অন্য মেয়ের নাম শুনতেই কেমন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সুড় সুড় করে এখানে হাজির হয়েছ। তবে যে বলেছিলে আমাকে ছাড়া আর কিছুই জানো না!'

বিব্রতভাবে দেবকুমার বললেন, 'বিশ্বাস কর, আমি শুধু কৃতজ্ঞতাই জানাতে এসেছিলাম। আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।' একটু থেমে গাঢ় গলায় আবার বললেন, 'তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ জয়তী, টাকা পয়সা আর সিনেমার মোহ আমার লেখা নষ্ট করে দিচ্ছিল। তুমি আমাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনেছ।'

দেবকুমারের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল জয়তী। তারপর বলল, 'খুব হয়েছে। এখন বয়টাকে ডেকে কিছু আনতে বল। দারুণ খিদে পেয়েছে।' বলতে বলতে আস্তে করে স্বামীর নাকটা টিপে দিল।

কার্তিকের ঝড়, বন্যা এবং চুনাও

ধারাউনি টাউনের গিরধরলাল দুবের বিশাল বাড়িটা ক'দিন ধরেই সারাক্ষণ সরগরম। কেননা, ঠিক দু'মাস এগারো দিন পর বিধান মণ্ডলের চুনাও বা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে দুবেজি একজন প্রার্থী।

গত পনেরো বছর ধরে গিরধরলাল এ অঞ্চলের পুরনো এম. এল. এ। বাড়িতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তিনি তিন তিনটে চুনাওতে জিতে এসেছেন। কারণ ছোট্ট ধারাউনি টাউনের পঞ্চাশ ষাট মাইলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বড় জমিমালিক। স্বনামে এবং বেনামে কম করে হাজার একর জমি তাঁর দখলে। আর আছে ডজনখানেক বন্দুক এবং পঞ্চাশটি পোষা পহেলবান।

ধারাউনি টাউনের মাইল দেড়েক চৌহদ্দির পর থেকে শুরু হয়েছে আদিগন্ত ফসলের মাঠ এবং কাঁকুরে পড়তি জমি। তার ফাঁকে ফাঁকে হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাত বা অজ গাঁ। এইসব গ্রামগুলো মান্ধাতার বাপের আমলে যেন ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। এখানে না আছে বিজলি, না স্কুল, না শিক্ষাদীক্ষা। এইসব গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষই অচ্ছুৎ, আনপড় এবং ভীরুর চাইতেও ভীরু। এর আগে চুনাও এলেই গিরধরলাল বন্দুক হাতে দিয়ে পহেলবানদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা বার বার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে এসেছে, সবাই যেন দুবেজির নির্বাচনী প্রতীকে মোহর মারে, নইলে গাঁকে গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। এতেই কাজ হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ভেড়ার পালের মতো লম্বা লাইন দিয়ে দুবেজির প্রতীকের পাশে ছাপ মেরে এসেছে। আর গিরধরলাল গুলাবের পাপড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সোজা পাটনার বিধানসভায় চলে গেছেন।

কিন্তু এবার ব্যাপারটা অত সহজ নয়। দু'মাস এগারো দিন পর যে চুনাও আসছে তাতে দুবেজির প্রতিদ্বন্দ্বী রামধনী। তার বয়েস বেশি নয়, বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। হট্টাকট্টা চেহারার এই ছোকরা জাতে কোয়েরি অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুৎ।

কোয়েরি রামধনী দুবেজির রাতের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে। আগের তিন বারের মতো বাড়ি বসে থেকে, শুধুমাত্র বন্দুক এবং পহেলবান পাঠিয়ে এবার আর চুনাওতে জেতা যাবে না বলেই মনে হচ্ছে।

বিহারের ওই সৃষ্টিছাড়া গাঁগুলোতে ভীরু পশুর মতো যে অচ্ছুতেরা আবহমান মুখ বুজে পড়ে আছে তাদের সঙ্গে রামধনীর কিছুই মেলে না--না কথাবার্তায়, না চালচলনে। সে প্রচণ্ড তেজী, একগুঁয়ে এবং বেপরোয়া, মারাত্মক গোঁ তার।

ছেলেবেলায় কিভাবে যেন মিশনারিদের পাল্লায় পড়ে রাঁচী চলে গিয়েছিল রামধনী। সেখান থেকে মাথার ভেতর কিছু জেদ আর পেটে কিছু কালির অক্ষর পুরে বছরখানেক আগে ফিরে এসেছে। এই দেহাতীগুলোর মধ্যে সে-ই একমাত্র মান্যগণ্য 'লিখিপড়ী আদমি'। ভগোয়ানের 'মূরত'কে উঁচু বেদীতে বসিয়ে লোকে যেমন পুজো চড়ায় তেমন একটি জায়গায় মনে মনে তাকে বসিয়ে রেখেছে অচ্ছুতেরা। এবারকাব চুনাওতে ওদের ভোটগুলো যে রামধনীই পেতে চলেছে, এরকম একটা গুজব হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

গিরধরলাল খবর পেয়েছেন, রামধনী রাঁচী থেকে ফিরে আসার পর থেকেই অচ্ছুৎদের চোখ ফুটতে শুরু করেছে। ভয়ে আগের মতো অতটা জুজু হয়ে থাকছে না তারা।

আজকাল অনেক জায়গা থেকে হাওয়ার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নানারকম বিপজ্জনক খবর আসে। ভোজপুর, মোতিহারি আর পালামৌর দিকে নাকি অচ্ছুৎ আর আদিবাসীরা জমিমালিকদের সঙ্গে লড়াই করেছে। কোথায় নাকি বামুনদের গাঁয়ে চামাররা চড়াও হয়েছিল।

এসব সত্ত্বেও লাঠি বন্দুক এবং পহেলবানদের ওপর এখনও অগাধ আস্থা দুবেজির। তবে তাঁর ঠাণ্ডা মাথার দূরদর্শী শুভাকাঙ্ক্ষীরা একটু বুঝে সুঝে চলতে পরামর্শ দিয়েছেন। কথায় কথায় বন্দুকবাজি কোনো কাজের কথা নয়।

গত তিনটে নির্বাচনে যা করেননি, এবার তা-ই করতে হয়েছে গিরধরলালকে। এর মধ্যেই বার চারেক অচ্ছুৎদের গাঁগুলোতে ভিখমাঙোয়াদের মতো ভোট চেয়ে এসেছেন। এতে কাজ যে কিছুটা হয়নি তা নয়। গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁর নাগরার ধুলো পড়ায় বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বুড়োবুড়ি থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চাটা পর্যন্ত তাঁকে সম্মান জানিয়েছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না গিরধরলাল। ভূচ্চরের ছৌয়াগুলো পেটের ভেতর কী মতলব নিয়ে বসে আছে, কে জানে।

আজ বিকেলে দুবেজির বাড়িতে আসন্ন নির্বাচনের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা হচ্ছিল।

একতলার বসবার ঘরে দেড় ফুট উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপর ধবধবে ফরাস পাতা। ফরাসের চারধারে পুরনো আমলের বিশাল বিশাল সোফা।

কিন্তু সোফা টোফা খুব একটা পছন্দ করেন না গিরধরলাল। এই মুহূর্তে তিনি এবং তাঁর চারজন বিশেষ পরামর্শদাতা ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন। এই চারজনের একজন হলেন দুঁদে উকিল, একজন বড় কন্ট্রাক্টর, একজন রিটায়ার্ড হেডমাস্টার এবং চতুর্থ ব্যক্তিটি ধারাউনির সবচেয়ে বড় বিজনেসম্যান। এঁদের নিয়েই গিরধরলালের নিজস্ব গোপন ক্যাবিনেট বা পলিটিক্যাল 'সেল'। ঠিক কী ধরনের পরিকল্পনা করলে তাঁর রাজনৈতিক 'ভাবমূরত' বা ইমেজ ক্রমশ আরো উজ্জ্বল হবে এবং তিনি আমৃত্যু এম. এল. এ থাকতে পারবেন--সেসব এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই স্থির করা হয়।

ক'দিন আগে দেওয়ালি গেছে। অন্যান্য বছর এই সময়টায় আবহাওয়া থাকে চমৎকার। শুষ্ক হালকা জলকণাহীন বাতাস বয়ে যায় ধারাউনির ওপর দিয়ে। ঝকঝকে নীলাকাশে মেঘের একটি টুকরোও খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও সকালে এবং সন্ধেয় সামান্য হিম পড়ে কিন্তু তা খুবই আরামদায়ক।

কিন্তু এবছর সবই উলটো। ক'দিন জোরালো বাতাসের তাড়া খেয়ে এলোমেলো কালচে মেঘ ভেসে আসছিল। আজ পাথরের চাংড়ার মতো সেগুলো জমাট বেঁধে আকাশটাকে যেন ধারাউনির মাথার ওপর অনেকখানি নামিয়ে এনেছে। উলটোপালটা ঝড়ো বাতাস সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আকাশটাকে আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে।

মেঘের গর্জন, বাতাসের অনবরত শাসানি এবং বিজলি চমক—এসব দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর আদিম ভয়ঙ্কর দুর্যোগ যেন ধারাউনিতে ফিরে আসছে।

বাইরের ঘরের জানালা দিয়ে আকাশের চেহারা একবার দেখে নিয়ে গিরধরলাল বলেন, 'আজকের দিনটা বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল। এই ঘটা (মেঘ) আর বিজরি মাথায় নিয়ে বাইরে বেরুনো যাবে না।' তাঁকে ভীষণ হতাশ এবং চিন্তাগ্রস্ত দেখায়।

উকিল সীয়াশরণজি বলেন, 'আকাশের যা হাল তাতে ক'দিন হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে, কে জানে।'

আসলে আজ তিন তিনটে গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল। দুর্যোগের জন্য বেরুনো যাচ্ছে না, হতাশাটা সেই কারণে।

হেডমাস্টার রামনরেশজি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাইরে জিপের আওয়াজ শোনা যায়। একটু পরেই ধারাউনি থানার দারোগা হংসনাথ তেওয়ারি ঘরে এসে ঢোকে। লোকটার বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। বিপুল গোলাকার চেহারা। দেড়শো কেজির মতো ওজন। শরীরের বেশিটাই চর্বি।

ঘাড় ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে অত্যন্ত বশংবদ ভঙ্গিতে হংসনাথ বলে, 'নমস্তে দুবেজি—' গিরধরলালের স্পেশাল সেলের অন্য মেম্বারদেরও সে নমস্কার জানায়।

গিরধরলালের প্রতি তার আনুগত্যে এতটুকু ভেজাল বা ফাঁকি নেই। কারণ তিনিই তাকে পুলিশের চাকরিটা করে দিয়েছেন, এবং নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রোমোশনেরও ব্যবস্থা করেছেন। তাই যখন তখন সে এ বাড়িতে আসে। ধারাউনিতে কে কী করছে, কে কী ভাবছে, সব খবরই সে গিরধরলালকে জানিয়ে যায়। এসব খবর সে আবার জোগাড় করে ইনফরমারদের কাছ থেকে।

গিরধরলাল বলেন, 'বোসো হংসনাথ।' দারোগা কুণ্ঠিতভাবে ফরাসের এক কোণে বসলে জিগ্যেস করেন, 'ক্যা সমাচার? তোমার কাজকর্ম ভালো চলছে?'

'জি, আপনার আশীর্বাদে।'

'তারপর এই ঝড়তুফান মাথায় নিয়ে এলে যে?'

'একটা জরুরি খবর আছে দুবেজি।'

হংসনাথ যখন কোনো খবর আনে তখন সেটা জরুরিই হয়ে থাকে। শিরদাঁড়া টান টান করে উঠে বসেন দুবেজি। বলেন, 'কী খবর?'

হংসনাথ যা জানায় তা এইরকম। বঙ্গোপসাগরের ওধারে কোথায় যেন আচমকা ডিপ্রেসন হয়েছে, তার ফলে অসময়ে আকাশে এত মেঘ। তাছাড়া হিমালয়ে হঠাৎ নাকি বেশি করে বরফও গলতে শুরু করেছে, তার ফলে ধারাউনি থেকে দু মাইল দূরে বরখা নদীতে প্রচণ্ড বান আসছে, নদীর দু'ধারের সব গাঁ এবং ফসল এতে একেবারে ভেসে যাবে। ওপর থেকে হংসনাথের কাছে নির্দেশ এসেছে আজই, বরখা নদীর পাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসতে হবে। ফসল হয়তো বাঁচানো যাবে না, তবে প্রাণহানিটা যাতে না ঘটে, সেজন্য গ্রামের মানুষজন যেন নিরাপদ জায়গায় চলে যায়।

ঠিকাদার বিষ্ণুকান্ত সিং এই সময় বলে ওঠেন, 'হাঁ হাঁ, ঝড় তুফানের কথা রেডিওতে বলছে বটে।'

প্রাক্তন হেডমাস্টার রামনরেশজি এবং উকিল সীয়াশরণজিও জানান, তাঁরাও রেডিওতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্কতামূলক ঘোষণা শুনেছেন।

গিরধরলাল রেডিও টেডিও শোনার সময় পান না। শুনলে এ খবরটা তিন দিন আগেই পেয়ে যেতেন। যাই হোক, তুফান এবং বরখা নদীতে প্রচণ্ড বন্যার সম্ভাবনা আছে—এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় দ্রুত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটতে থাকে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় তাঁর।

গিরধরলাল জিগ্যেস করেন, 'দশ সাল আগে বরখা নদীতে আর একবার খতরনাক বাড় হয়েছিল না?'

সেবারের বন্যার কথা ভুলেই গেছেন রামনরেশজিরা। দশ ফুট উঁচু প্রবল জলস্রোতে অচ্ছুৎদের ক'টা গাঁ ভেসে গিয়েছিল। প্রচুর মানুষ এবং গরু-মোষ-বকরি মরে ফৌত—এসব অপ্রয়োজনীয় বাজে খবর কে আর মনে করে রাখে ! গিরধরলালের প্রশ্নে তাঁদের দুর্বল স্মৃতির ওপর থেকে কয়েকটা পর্দা সরে যায়; দশ বছর আগের এক ভয়াবহ বন্যার ছবি নতুন করে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। প্রায় একই সঙ্গে সবাই বলে ওঠেন, 'হাঁ হাঁ, হয়েছিল।'

'কত লোক মরেছিল, মনে আছে?'

রামনরেশ বা সীয়াশরণ মৃতের সঠিক সংখ্যাটি দিতে পারেন না। শুধু বিষ্ণুকান্ত বলেন, 'হোগা লগভগ দশ পন্দ্র।'

গিরধরলাল শুধরে দিয়ে বলেন, 'নেহী, তিশ আদমি। আর গাই-ভৈস-বকরি?' অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে কত পশু মরেছিল সেটাও তিনি জানতে চান।

এ ঘরের কারুর স্মৃতিশক্তি এতটা সতেজ নয় যাতে দশ বছর আগের বন্যায় অচ্ছুৎদের ক'টা গরু, ক'টা মোষ, ক'টা ছাগল মরেছিল--এসব মনে করে রাখতে পারে। তাঁরা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে কাঁচুমাচু মুখে নিজেদের অক্ষমতা জানান এবং মনে মনে কমজোর স্মৃতিশক্তির জন্য নিজেদের হয়তো ধিক্কারই দেন। তবে একটা ব্যাপারে তাঁরা খুবই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। দশ বছর আগের বন্যায় মৃত ক'টা অচ্ছুৎ আর তাদের গাই-বকরি নিয়ে হঠাৎ এত খেপে উঠলেন কেন গিরধরলাল--এটাই বুঝে উঠতে পারছেন না।

গিরধরলাল বলেন, 'মনে নেই তো? ঠিক আছে, আমিই বলে দিচ্ছি। দো'শো গাই, একশ বিশ ভৈস আর দো'শো চাল্লিশ বকরি।' বলে দারোগার দিকে তাকান, 'এস. ডি. ও'র অফিসে এর রেকর্ড আছে, ইচ্ছে হলে দেখে নেবেন।'

একটু চুপচাপ। তারপর গিরধরলাল বলতে থাকেন, 'আপনারা হয়তো ভাবছেন, দশ বছর আগের কথা মনে করে রেখেছি কেন?'

সবাই গিরধরলালের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকেন। কেননা এই প্রশ্নটা তাঁদেরও।

গিরধরলাল বলেন, 'পলিটিসিয়ানকে অনেক কিছু মনে করে রাখতে হয়। কবে কী ঘটেছে, কে কী করেছে বা বলেছে—এসব সময়মতো কাজে লাগাতে না পারলে সে গেল। স্মৃতিশক্তি জোরদার না হলে পলিটিকসে এক কদম এগুনো যায় না।'

সবাই যদিও মাথা নেড়ে সায় দেন কিন্তু দশ বছর আগে কয়েকটা অচ্ছুৎ এবং কয়েক শো পশুর মৃত্যুর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কতটা, তা বুঝে উঠতে ঘাম ছুটে যায় তাঁদের।

গিরধরলাল এবার দারোগা হংসনাথের দিকে ফিরে বলেন, 'সেবার বাড়ের পর সরকারি রিলিফ এসেছিল না?'

হংসনাথ বলে, 'হাঁ হাঁ, লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল বরখা নদীর পাড়ের গাঁগুলোতে। অচ্ছুতিয়াদের তাম্বু, টাকাপয়সা. কিছু গাই-বকরিও দেওয়া হয়েছিল।'

'বহুত আচ্ছা।' জ্বলজ্বলে চোখে দারোগাকে দেখতে দেখতে গিরধরলাল বলেন, 'এবারও যদি শেষ পর্যন্ত ভগোয়ান শিউশঙ্করের কৃপায় বাড়টা হয়েই যায়, সরকারি রিলিফ আসবে নিশ্চয়ই। গরিব বেসাহারা মানুষের দুখ তো ঘোচাতেই হবে।'

'হাঁ হাঁ, জরুর।' হংসনাথ জানাতে থাকে, দুর্যোগে ফসল বাড়িঘর ধ্বংস হলে এবং মানুষ মরলে সরকারি ত্রাণ আসবেই। এটা একটা চালু নিয়ম।

তাকে থামিয়ে দিয়ে গিরধরলাল বলেন, 'আমি জানি।' বলে পিঠের পেশী নরম করে আবার তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসেন। একটু চিন্তা করে ফের বলেন, 'এবার বাড় হলে গভর্নমেন্টের রিলিফটা আমরাই বিলি করব। সরকারি কর্মচারিদের খেটে খেটে মুখে খুন তোলার জরুরত নেই।'

গিরধরলালের কথায় সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর নিজস্ব গোপন 'ক্যাবিনেট'-এর মেম্বাররা তা ধরে ফেলেন। বরখা নদীর এপারের অচ্ছুৎ গ্রামগুলো গিরধরলালের কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যেই পড়ে। সেখানে বন্যার পর তিনি যদি রিলিফের জিনিস বিলি করতে পারেন, তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। সরকার টাকা দেবে, গিরধরলাল ক্ষীর খাবেন। সবাইকে এতক্ষণে বেশ চনমনে দেখায়।

এদিকে ঢোক গিলে হংসনাথ বলে, 'লেকেন—'

গিরধরলাল জিগ্যেস করেন, 'কিছু বলবে?'

'জি, হাঁ।'

'বলে ফেল।'

'রিলিফ এলে তো ডি. এম আর এস. ডি. ও'র সামনে বিলি করা হয়। এটা সরকারি কানুন—'

গিরধরলাল রেগে ওঠেন না। অপার সহিষ্ণুতা তাঁর। এই গুণটি ছাড়া সফল পলিটিসিয়ান হওয়া অসম্ভব। তিনি বলেন, 'তোমার বয়েস কত হল?'

'জি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।' হংসনাথ বলে।

'এখনও বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই হল না। আমি হলাম এম. এল. এ। জনতাকা প্রতিনিধি। মানুষ আমার হাত থেকেই রিলিফ নিতে বেশি পছন্দ করবে। সমঝা?'

উত্তর না দিয়ে ঘাড় চুলকোতে থাকে দারোগা। তার মনে একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে।

গিরধরলাল বলেন, 'চিন্তা না করনা। আমি ডি. এম আর এস. ডি. ও'র সঙ্গে কথা বলে নেব।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দারোগা উঠে পড়ে। বলে, 'আকাশের হাল আরো খারাপ হয়ে গেছে। বরখা নদীর পাড়ের দেহাতগুলোতে হোঁশিয়ারি দিয়ে তুরন্ত থানায় ফিরে আসতে হবে।'

গিরধরলাল প্রায় চমকেই ওঠেন। শশব্যস্তে বলেন, 'না না, তোমাকে আর কষ্ট করে ওখানে যেতে হবে না। যা করার আমিই করব।'

'ঠিক হ্যায়। নমস্তে দুবেজি।' বিনীত, অনুগত ভঙ্গিতে নমস্কার জানিয়ে হংসনাথ বেরিয়ে যায়। একটু পর বাইরে থেকে জিপের আওয়াজ ভেসে আসে।

এবার ঘরের ভেতর গিরধরলালরা ঘন হয়ে বসেন। শিউশঙ্করজির কৃপায় দুর্যোগটা যখন আসছেই, সেটাকে কাজে লাগানো যে বুদ্ধিমানের কাজ—সে বিষয়ে সবাই একমত হয়ে যান।

এক ঘণ্টার মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঠিক করে ফেলা হয়। তারপর গম্ভীর চালে হেসে গিরধরলাল বলেন, 'পলিটিসিয়ানের সবসময় চোখ-কান খুলে রাখা বহুৎ জরুরি। ঝড়তুফান, খরা, যা-ই হোক না, তা থেকে ফায়দা উঠিয়ে নিতে হয়।'

গিরধরলালের বাঞ্ছিত বিপর্যয়টি শেষ পর্যন্ত ঘটেই যায়। তিন দিন একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ঝড় চলতে থাকে। বরখা নদীর জল বারো ফুট উঁচু হয়ে দু'ধারের ঘরবাড়ি, প্রচুর মানুষ আর গরু মোষ ভাসিয়ে নেয়। মাইলের পর মাইল খেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

কেউ এসে আগেভাগে ওখানে হুঁশিয়ারি দিয়ে যায়নি, দিলে মানুষ এবং পশুগুলো অন্তত বেঁচে যেত। সেদিন দারোগাকে বরখার পারের গাঁগুলোতে যেতে দেননি গিরধরলাল, নিজে গিয়েও কাউকে সতর্ক করে আসেননি। এর পেছনে তাঁর সুদূরপ্রসারী একটি পরিকল্পনা ছিল।

যাই হোক, এর মধ্যে ফোনে এস. ডি. ও এবং ডি. এমের সঙ্গে বানভাসি দেহাতগুলোতে রিলিফের ব্যাপারে গিরধরলালের কিছু কথা হয়ে গেছে।

তিনদিন পর তুফান এবং বন্যার দাপট কমে এলে বরখা নদীর পাড়ের গ্রামগুলোতে রিলিফ ক্যাম্প বা ত্রাণ শিবির খোলা হল। ডি. এম যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে শিবিরের উদ্বোধন করলেন, ছোটাছুটি করে আসল তদারকটা করতে থাকেন গিরধরলাল এবং তাঁর লোকজনেরা।

এখনও গ্রামগুলো দু-আড়াই হাত জলের তলায়। জল ঠেলে কাদা মাড়িয়ে খালি পায়ে গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়ান গিরধরলাল। যারা এখনও বেঁচে আছে তাদের ত্রাণ শিবিরে নিয়ে আসা হয়।

সবগুলো গ্রামেই এখন শুধু কান্না, বিলাপ আর আর্তনাদ। কারুর ভাই মরেছে, কারুর বাপ, কারুর স্বামী, কারুর ছেলে। বুক চাপড়ে তারা চিৎকার করে চলেছে।

গিরধরলাল প্রতিটি শোকার্ত অচ্ছুতের পিঠে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

এদিকে প্রথম দিন ত্রাণশিবির খুলে দিয়ে ডি. এম, এস. ডি. ও এবং অন্য সব অফিসাররা সেই যে চলে গেছেন আর তাঁদের বরখার পাড়ে দেখা যায়নি। রিলিফের যাবতীয় কাজ এখন করছেন গিরধরলাল এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ।

হাওয়ায় হাওয়ায় কিভাবে যেন রটে যায়, গিরধরলালই বানে-ডোবা গ্রামগুলোকে খাবার-দাবার, আশ্রয় এবং ওষুধ দিয়ে আবার বাঁচিয়ে তুলছেন। শোনা যায়, বড়ে সরকার দুবেজি স্বয়ং ভগোয়ান। তাঁর 'কিরপা'য় এবার তারা রক্ষা পেল, রামজি কি কিষুণজির মতো তিনি দয়ালু, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামধনীরা এই রিলিফের ব্যাপারে প্রচুর হইচই করল। তাদের অভিযোগ, সরকারি রিলিফ নিজের বলে চালাচ্ছেন দুবেজি। কিন্তু সে কথা কেউ কানেও তুলল না।

আরো দু'মাস পর বিধানসভার যে নির্বাচনটা হল তাতে বরখা পাড়ের গ্রামগুলো থেকে অচ্ছুৎরা লাইন দিয়ে ভোটের কাগজে গিরধরলালের প্রতীকে মোহর মেরে আসে। অসময়ের তুফান এবং বন্যা আরো পাঁচ বছরের জন্য দুবেজিকে এম. এল. এ বানিয়ে দেয়।

এক রমণীর গল্প

১৯৮৫

বড় রাস্তায় বাস থেকে নামতেই ঝপ করে অন্ধকার নেমে গেল। ইদানীং লোডশেডিংটা ভীষণ বেড়েছে। অনেক দূরের পাওয়ার স্টেশনগুলোতে কী সব গোলমাল হয়েছে, তার ধাক্কায় কলকাতা মেট্রোপলিসে যখন তখন আলো চলে যাচ্ছে, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে না। একবার আলো টালো গেল তো দু-তিন ঘন্টার ভেতর জ্বলার নাম নেই।

কিছুদিন আগে একটা বই পড়েছিলাম—'জিওগ্রাফি অফ ডার্কনেস'। খুব সম্ভব রাত্তিরের কলকাতার লোডশেডিং মাথায় রেখে বইটা লেখা হয়েছিল।

এদিকের পথঘাট আমার এত চেনা যে অন্ধকারে হাঁটতে অসুবিধা হয় না ; শুধু ক্যালকাটা টেলিফোন, সি. এম. ডি. এ বা কর্পোরেশন যে সব গর্তটর্ত খুঁড়ে রেখেছে, সেগুলোর দিকে একটু নজর রাখতে হয়।

বাস স্টপ থেকে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে মিনিট খানেক হাঁটলে মণিময়দাদের মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং। কো-অপারেটিভ করে ওঁরা এই আটতলা বাড়িটা করেছেন। একসময় সেখানে পৌঁছে গেলাম।

মণিময়দাদের ফ্ল্যাটটা তেতলায়। লিফট ছাড়াও সেখানে উঠতে খুব একটা কষ্ট হয় না। ফ্ল্যাটটা আট তলায় হলেও সিঁড়ি ভেঙে এখন উঠতে হত, কেননা নীলিমা বউদি আমার জন্য সেই বিকেল থেকে অপেক্ষা করতে করতে এতক্ষণে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে পড়েছেন; ধরেই নিয়েছেন আজ আর আমি আসছি না।

বিকেল চারটেয় আমার এখানে পৌঁছুনোর কথা। এখন পৌনে আটটা। অফিস থেকে বেরুতে বেরুতেই সাড়ে ছ'টা হয়ে গেল। তারপর কোনওরকমে একটা বাসে ঝুলতে ঝুলতে এসে মৌলালির মুখে জ্যামে পড়ে গেলাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সেখানে আটকে থাকতে হল। কলকাতার রাস্তাঘাট আর বাস-ট্রামের যা হাল, কোথাও ঠিক সময়ে পৌঁছুনো অসম্ভব ব্যাপার।

অন্ধকারে চল্লিশটা সিঁড়ি ভেঙে মণিময়দার ফ্ল্যাটের সামনে এসে টের পেলাম, হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে যেন হাজারটা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে। দু'দিন আগে যখন মণিময়দার পেটের বায়োপ্সি করা হয় তখন থেকেই বুকের ভেতর চাপা উৎকণ্ঠা টের পাচ্ছিলাম। আজ বিকেলে বায়োপ্সির রিপোর্টটা নীলিমা বউদির নিয়ে আসার কথা। ওটা পাওয়া গেলে মণিময়দার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে পরামর্শের জন্য নীলিমা বউদি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

রিপোর্টে কী থাকতে পারে, ডাক্তার মনোজ সেন পরিষ্কার একটা আভাস আমাকে আগেই দিয়েছেন। সেটা অবশ্য নীলিমা বউদিকে জানাই নি।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, দু'দিন আগের সেই উদ্বেগটা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে টোকা দিতে থাকি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক হাতে কাচের লণ্ঠন নিয়ে দরজা খুলে দেন নীলিমা বউদি। ওঁর দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠি। দু'দিন আগে শেষ দেখা হয়েছিল নার্সিং হোমে। এর মধ্যে তাঁর বয়স আচমকা যেন অনেক বেড়ে গেছে। পঞ্চাশ এখনও পেরোন নি, কিন্তু চুল অর্ধেক সাদা। চোখের তলায় কালির পুরু ছোপ। কণ্ঠার হাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। গায়ের রং একসময়

ছিল পাকা ধানের মতো, এখন তার ওপর কালচে আবরণ পড়েছে। মসৃণ ত্বক কুঁচকে কত যে সরু সরু দাগ ফুটে বেরিয়েছে, হিসেব নেই।

নীলিমা বউদি এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর নির্জীব গলায় বলেন, 'আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকে যাই। নীলিমা বউদি দরজা বন্ধ করে দেন।

এই ফ্ল্যাটে কম করে দু'আড়াইশ বার এসেছি। এখানকার নক্‌শা আমার মুখস্থ। মোট তিনখানা বেড রুম, কিচেন, স্টোর, তিন ঘরে তিনটে অ্যাটাচড বাথ, ডাইনিং-কাম-ড্রইং হল ইত্যাদি। এ ছাড়া রাস্তার দিকের ঘর দু'টোর গায়ে দু'টো মাঝারি ব্যালকনি। বছর পনেরো আগে কলকাতার মানুষ ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকাটা যখন বিশেষ পছন্দ করত না, বিল্ডিং মেটিরিয়ালের দাম ছিল যথেষ্ট কম, সেই সময় এই কো-অপারেটিভের ফ্ল্যাটটা বেশ সস্তায় কিনেছিলেন মণিময়দা।

লক্ষ করলাম, দেরি করে আসার জন্য কিছুই বললেন না নীলিমা বউদি। অথচ আগে হলে হাজারটা কৈফিয়ৎ দিতে হত।

সোজা ওঁদের শোওয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। নীলিমা বউদি নিচু গলায় বলেন, 'আগে আমার সঙ্গে এ ঘরে আসুন।'

ডান পাশের ঘর থেকে মণিময়দার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'কে এল? সুধীশ?'

আমি সাড়া দিই, 'হ্যাঁ, মণিময়দা--'

'এখানে এস।'

'আসছি একটু পরে।'

বাঁ দিকের একটা ঘরে আমাকে নিয়ে আসেন নীলিমা বউদি। লণ্ঠনটা নিচু সেন্টার টেবলে রেখে আমরা মুখোমুখি বসি।

আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ দু' হাতে মুখ ঢেকে একেবারে ভেঙে পড়েন নীলিমা বউদি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঝাপসা গলায় বলেন, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেল সুধীশ ঠাকুরপো।'

বুঝতে পারছিলাম, বায়োপ্সি পরীক্ষার ফলাফল জেনে গেছেন নীলিমা বউদি। তাঁর কান্না এবং অসহায়তা আমার মধ্যেও যেন চারিয়ে যাচ্ছিল। তবু বললাম, 'বউদি, কাঁদবেন না। এসময় অস্থির হয়ে পড়লে মণিময়দাকে কে সাহস দেবে?'

নীলিমা বউদি উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ কাঁদার পর খানিকটা শান্ত হলেন।

এবার জিগ্যেস করলাম, 'মণিময়দার ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে ডাক্তার সেন কী বললেন?'

'খুব তাড়াতাড়ি আপনার দাদাকে ভর্তি করতে বললেন। পারলে দু' একদিনের ভেতর। অপারেশান করবেন উনি নিজে। কী বলব ঠিক করে উঠতে পারিনি। নার্সিং হোম থেকে ফিরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'অপারেশান করলে সেরে যাবার চান্স কতটা?'

'এ সম্বন্ধে আমি কিছু জিগ্যেস করিনি। তবে অপারেশানের ওপর উনি খুব জোর দিচ্ছেন।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'ওঁর মতো এতবড় একজন ডাক্তার যখন বলছেন তখন ওটা করে ফেলাই ভালো। মণিময়দাকে অপারেশানের কথা বলেছেন?'

নীলিমা বউদি বলেন, 'বলেছি।'

'উনি কী বললেন?'

'ওঁর আপত্তি নেই।'

'তা হলে কালই নার্সিং হোমে ভর্তি করে দেওয়া যাক। আমি সকালে এসে আপনাদের দু'জনকে নিয়ে যাব। যা কষ্ট পাচ্ছেন মণিময়দা, চোখে দেখা যায় না। অপারেশানটা হয়ে গেলে নিশ্চয়ই উনি ভালো হয়ে উঠবেন।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেন নীলিমা বউদি। অনেকক্ষণ পর দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'কিন্তু—'

বুঝতে পারছি, অপারেশানের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন নীলিমা বউদি। বললাম, 'কিন্তু কী?'

'অপারেশানের আগে তো বন্ডে সই করতে হবে।'

'হ্যাঁ। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে লিখিত কনসেন্ট দিতে হয়। আপনিও দেবেন।'

'আমি তা পারব না সুধীশ ঠাকুরপো।'

'মনে জোর আনুন বউদি। অপারেশানটা খুব জরুরি।'

'জানি, কিন্তু বন্ডে সই দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'কেন?'

কথা বলছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার চোখ নীলিমা বউদির মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। অদম্য কোনো আবেগে তাঁর ঠোঁট ভীষণ কাঁপছিল, চোখ কুঁচকে যাচ্ছিল। ভেতরে দারুণ কোনো ভাঙচুর চলছে, সেটাই তাঁর তাকানোর মধ্যে ফুটে উঠছিল।

নীলিমা বউদি একসময় বলেন, 'সই দেওয়ার অধিকার আমার নেই সুধীশ ঠাকুরপো।'

প্রথমটা অবিশ্বাস্য মনে হল। পরক্ষণে আমার সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু একটা ঘটে যায়। বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'কী বলছেন! আপনি ওঁর স্ত্রী। আপনার ছাড়া কার এ অধিকার আছে?'

ঝাপসা গলায় নীলিমা বউদি বলেন, 'আমি ওঁর স্ত্রী নই।'

আমার মাথার ভেতর এবার বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকি। তারপর বলি, 'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছেন?'

আমার মনোভাব ধরতে পারছিলেন নীলিমা বউদি। স্পষ্ট গলায় বলেন, 'আমার মাথা ঠিকই আছে সুধীশ ঠাকুরপো। যা বললাম তার ভেতর এতটুকু মিথ্যে নেই।'

আমার বিমূঢ়তা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। জিগ্যেস করি, 'তা হলে আপনার সঙ্গে মণিময়দার সম্পর্কটা কী?'

'সব বলব, তার আগে আমাকে একটা কথা দিতে হবে।' বলতে বলতে ব্যাকুলভাবে আমার হাত জড়িয়ে ধরেন নীলিমা বউদি।

বললাম, 'কী?'

'আপনাকে একবার পাটনায় যেতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে যাই। বলি, 'সেখানে যাব কেন?'

এবার নীলিমা বউদি যা বলেন তা এইরকম। পাটনার কদমকুঁয়াতে মণিময়দাদের বাড়ি। তিন জেনারেশান ধরে ওঁরা ওই শহরের বাসিন্দা। সেখানে মণিময়দার মা এবং ভাইরা থাকেন। তাঁদের কাছে আছেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী কণিকা। মণিময়দার এই শেষ সময়ে তাঁর আইনসঙ্গত আত্মীয়স্বজন এবং স্ত্রীর কাছে থাকা দরকার। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন, অপারেশানটা করবেন কিনা। করলে কণিকাকেই বন্ডে সই দিতে হবে।

আমার হাত ধরেই রেখেছিলেন নীলিমা বউদি। বলেন, 'ওদের আপনাকে নিয়ে আসতেই হবে।'

মণিময়দা এবং নীলিমা বউদির সঙ্গে আমার কোনওরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। মণিময়দা আর আমি একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করি। উনি যে ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জ, আমি সেখানকার টাইপিস্ট-কাম-স্টেনোগ্রাফার।

সতেরো বছর আগে কলেজ থেকে বেরিয়ে এই চাকরিটায় ঢুকেছিলাম। তারও ক'বছর আগে থেকে মণিময়দা এই কোম্পানিতে কাজ করছেন।

মণিময়দা আমার অফিস বস। কিন্তু কখনও তা বুঝতে দেননি। শুধু আমার সঙ্গেই না, ডিপার্টমেন্টের সবার সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার চমৎকার। মাঝখানে দেওয়াল তুলে নিজেকে তিনি নাগালের বাইরে সরিয়ে রাখেননি। আমুদে, হাসিখুশি, হৃদয়বান এই মানুষটি চাকরিতে জয়েন করার দিন থেকেই আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

কবে যে মণিময়দা প্রথম আমাকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, মনে পড়ে না। তখন ওঁরা ওল্ড বালিগঞ্জে একটা ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে থাকতেন। তারপর কো-আপারেটিভ করে ওঁদের নিজস্ব ফ্ল্যাট হল।

প্রথম আলাপের দিনটি থেকেই স্নেহে মাধুর্যে আন্তরিকতায় আমাকে অভিভূত করে রেখেছেন নীলিমা বউদি। মনেই হয় না, ওঁদের কাছে আমি একজন বাইরের উটকো লোক। সতেরো বছর ধরে সুখেদুঃখে ওঁদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছি।

একটা ব্যাপার বার বার আমার চোখে পড়েছে। এমন সুখী আদর্শ দম্পতি আর হয় না। কার কাছে যেন শুনেছিলাম বিবাহিত জীবন নাকি গোলাপ বাগান নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় একটা অঘোষিত যুদ্ধ লেগেই আছে। কিন্তু সতেরো বছরে একদিনের জন্য দেখিনি কোনও কারণে মণিময়দা আর নীলিমা বউদির ভেতর খিটিমিটি হয়েছে বা দু'জনে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন কিংবা নীলিমা বউদি রাগ-টাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। সর্বক্ষণ হাসি, রগড়, মজা এবং হাজার রকমের খুনসুটি। সমস্ত দিন নিজেদের মধ্যে তাঁরা মগ্ন হয়ে আছেন। এমন পরিতৃপ্ত নারী এবং পুরুষ ক্বচিৎ দেখা যায়।

কিন্তু এই সতেরো বছরে কোনো ঘটনায় বা দু'জনের কোনো আচরণে এক মুহূর্তের জন্যও আমার সংশয় হয়নি যে মণিময়দার আইনসঙ্গত বিবাহিত একটি স্ত্রী আছেন। কণিকা নামের সেই মহিলাটি যদি থেকেই থাকেন, নীলিমা বউদি তবে কে? আমার স্নায়ুতে তীব্র ধাক্কা লাগে। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'তা হলে?'

আমার প্রশ্নটার মধ্যে যা রয়েছে তা ধরে ফেলতে অসুবিধা হয় না নীলিমা বউদির। তিনি বলেন, 'আমি কে, আপনার দাদার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, পাটনায় গেলেই সব জানতে পারবেন। সুধীশ ঠাকুরপো, দয়া করে কাল আপনি ওখানে চলে যান।'

'আপনি যে আমাকে পাটনায় পাঠাতে চাইছেন, মণিময়দা জানেন?'

'না।'

'বউদি, একটা কথা বলব?'

মুখ তুলে পরিপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকান নীলিমা বউদি, 'আপনি যা বলবেন, আমি তা জানি। তবু বলুন।'

বললাম, 'মণিময়দার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্কটা সতেরো বছর ধরে জেনেছি তার বাইরে আর কিছু জানার ইচ্ছা আমার নেই। বৌদি, আপনিও আমাকে একটা ব্যাপারে দয়া করুন।'

নীলিমা বউদি তাকিয়েই ছিলেন। আবছা গলায় বলেন, 'কী ব্যাপারে?'

'আমাকে পাটনায় যেতে অনুরোধ করবেন না।'

নীলিমা বউদি হকচকিয়ে যান। কিছু বলতে চেষ্টা করেন কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না, ঠোঁট দু'টো শুধু কাঁপতে থাকে।

আমি আবার বলি, 'জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে গেল। এই শেষ বয়েসে জটিলতা তৈরি করে কী লাভ?'

'লাভ-লোকসানের কথা ভাবছি না।' নীলিমা বউদি এবার বলতে থাকেন, 'জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন চুলচেরা হিসেব করে অনেক কিছু মিটিয়ে দিতে হয়। ধরুন, আমি সেইরকম কিছু একটা করতে চাইছি।'

বুঝতে পারি যৌবনের উন্মাদনায় একদিন গর্হিত কিছু করে ফেলেছিলেন নীলিমা বউদি এবং মণিময়দা। এই মুহূর্তে মণিময়দার আয়ু যখন নিশ্চিতভাবেই ফুরিয়ে আসছে, তীব্র গ্লানি এবং পাপবোধে আক্রান্ত মহিলাটি বিপুল ঝুঁকি নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। কিন্তু এর জন্য কতটা দাম দিতে হবে, খুব সম্ভব সে সম্পর্কে আদৌ তিনি ভেবে দেখেননি। বললাম, 'বউদি, আপনাদের অতীত সম্বন্ধে আমার এতটুকু কৌতূহল নেই। যা অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, তাকে কবর থেকে তুলে এনে কেন নিজের ক্ষতি করতে চাইছেন?'

একগুঁয়ে একটা জেদ নীলিমা বউদির ওপর ভর করে। তিনি বলেন, 'সব কিছুই শেষ হয়ে যায় না সুধীশ ঠাকুরপো। আমার ওপর এই অনুগ্রহটুকু শুধু করুন—পাটনায় গিয়ে ওঁদের নিয়ে আসুন।'

'কিন্তু বউদি, ওঁরা এলে কী হবে ভাবতে পারেন?'

'পারি। আমাকে এই ফ্ল্যাট থেকে চলে যেতে হবে। অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি আর এল. আই. সি পলিসিতে আপনার মণিময়দা আমাকে নামিনি করেছেন। সেগুলো খোয়াতে হবে। কিন্তু আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। কাউকে এ জন্যে কোর্টে যেতে হবে না। আমি নিজেই লিখিতভাবে সব স্বত্ব ছেড়ে দেব।'

আমি চমকে উঠি, 'কিন্তু এ ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবেন কোথায়?'

নীলিমা বউদি বলেন, 'তা এখনও ঠিক করিনি। একসময় স্কুল মাস্টারি করতাম। আমার নিজস্ব কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে। আর আছে বি. এ'র একটা ডিগ্রি। কোথাও না কোথাও একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'এতদিন এসব ভাবেননি কেন?' বলেই মনে হল, এ প্রশ্নটা না করলে ভালো হত। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে যেন এটা বেরিয়ে এসেছে। পরক্ষণে সংকোচে মাথা নিচু হয়ে গেল। বললাম, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে বউদি। কিছু মনে করবেন না।'

নীলিমা বউদির কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বললেন, 'আপনার বিব্রত হবার কারণ নেই। এ কথা জিজ্ঞেস করতেই পারেন।' একটু থেমে বিষণ্ণ, ভারী গলায় ফের বলেন, 'এতকাল আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতাম না।'

বুঝতে পারছি, নীলিমা বউদি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলেছেন। তাঁকে কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। তবু মরিয়া হয়েই বললাম, 'এখন আপনি চলে গেলে আর মণিময়দার স্ত্রী যদি এখানে আসেন, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। তখন মণিময়দার সামাজিক মর্যাদা কোথায় নেমে যাবে, ভাবতে পারেন?'

'সেদিকটাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু আমার আর ফেরার রাস্তা নেই। জীবনের কঠিন সত্যকে বহুকাল এড়িয়ে চলেছি, এবার ঘাড় ধরে সে আমাকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।' নীলিমা বউদি একটানা বলে যান, 'ডাক্তার সেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি জানিয়ে

দিয়েছেন, অপারেশান হলেও আপনার দাদার বাঁচার আশা খুব কম। তিনি থাকতে থাকতেই আমাকে সব কিছু করে ফেলতে হবে।'

একটু চিন্তা করে বলি, 'মণিময়দাকে এ কথা জানিয়েছেন?'

'না। পরে জানিয়ে দেব।'

এইসময় সুধা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। সে মণিময়দাদের কাজের মেয়ে। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ।

সুধা বলে, 'দাদাবাবু আপনাদের ডাকছেন।'

নীলিমা বউদি বলেন, 'তুই যা। আমরা এক্ষুনি আসছি।'

সুধা চলে যায়।

'চলুন, ও ঘরে যাওয়া যাক। দেরি করলে, ফের আপনার দাদা সুধাকে পাঠাবে।' উঠে পড়তে পড়তে নীলিমা বউদি বলেন, 'কাল আপনার পাটনায় না গেলেই নয়। ওদের নিয়ে ফিরে এলে তবেই অপারেশানের ব্যবস্থা হবে। আর—'

'আর কী?' আমি জিগ্যেস করি।

'হাওড়ায় নেমেই আমাকে একটা ফোন করবেন।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

নীলিমা বউদির উদ্দেশ্যটা কী, বুঝতে পারি না। তবে এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না।

আজ লোড শেডিংটা বেশিক্ষণ ভোগাল না। পাশের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আলো এসে গেল।

মণিময়দা বিশাল জোড়া জানালার পাশে একটা খাটে শুয়ে আছেন।

এক বছর আগেও চমৎকার পেটানো স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। মুখে সারাক্ষণ ঝলমলে সরল একটি হাসি লেগে থাকত। ওই হাসিটা দেখলে বোঝা যেত, এই মানুষটির মধ্যে নোংরা কোনো ব্যাপার থাকতে পারে না। ভরাট মুখে শৌখিন একটু গোঁফ ছিল।

এখন আর এক বছর আগের মানুষটাকে চেনা যায় না। গায়ের রং পুড়ে ঝামার মতো। চোখের তলায় গাঢ় কালির পোঁচ। শরীর বিছানায় লেগে গেছে। চামড়া ঢলঢলে রবারের মতো, কোনোরকমে হাড়ের ওপর আটকে আছে যেন। সারা দেহে শাঁস বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মণিময়দার সেই উজ্জ্বল হাসিটা আমার স্মৃতির মধ্যেই রয়েছে। তার বদলে ওঁর সারা মুখ জুড়ে এখন শুধু নিদারুণ কষ্টের একটা ছাপ। মণিময়দাকে দেখামাত্র টের পাওয়া যায় তাঁর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে এসেছে, খুব বেশিদিন আর বাঁচবেন না। ক্যানসার তাঁর আয়ু দ্রুত কমিয়ে দিচ্ছে।

মণিময়দা ক্ষীণ গলায় বলেন, 'বোসো সুধীশ।'

খাটের পাশে একটা বেতের মোড়ায় বসে পড়ি। নীলিমা বউদি একধারে দাঁড়িয়ে থাকেন।

মণিময়দা বলেন, 'আজ তোমার আসতে অনেক দেরি হয়েছে। তোমার বউদি আর আমি খুব চিন্তা করছিলাম।'

দেরি হওয়ার কারণটা মণিময়দাকেও জানাতে হয়। তিনি এবার বলেন, 'তোমার বউদি বায়োপ্সির রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই শুনেছ?'

ধরা গলায় বলি, 'হ্যাঁ।'

'অপারেশানের কথাও শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা করিয়েই ফেলতে হবে সুধীশ। এত যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মণিময়দা তাঁর শীর্ণ হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে বলেন, 'সুধীশ, নার্সিং হোম থেকে আমি খুব সম্ভব আর ফিরব না।'

চমকে উঠে বলি, 'এ আপনি কী বলছেন দাদা! নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন, আমরা গিয়ে আপনাকে বাড়ি নিয়ে আসব।'

একদিন পর পাটনায় পৌঁছে মণিময়দাদের বাড়িটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয় না। ওঁরা ওখানে তিন জেনারেশান ধরে আছেন। কদমকুঁয়ায় এসে মণিময়দার বাবার নাম করতেই রাস্তার একটি লোক ওঁদের বাড়ি দেখিয়ে দিলেন।

চওড়া চওড়া পিলারের ওপর পুরনো আমলের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি মণিময়দাদের। সামনের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা। তার একধারে গ্যারেজে একটা পুরনো ফোর্ড গাড়ি, আরেকটা ঝকঝকে নতুন অ্যামবাসাডর। গেটে প্রকাণ্ড পাগড়ি মাথায় এক অতি বৃদ্ধ দারোয়ান।

এখন এই সকালবেলায় সবে বাড়ির লোকজনের ঘুম ভেঙেছে।

নীলিমা বউদির কাছ থেকে জেনে এসেছিলাম, মণিময়দার তিন দাদা, তিন বউদি, মা এবং দাদাদের ছেলেমেয়েরা এখানে থাকে।

প্রাচীন কালের ডাইনোসরদের মতো সারা দেশের যৌথ পরিবারগুলি যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই সময় মণিময়দারা এখনও একসঙ্গেই আছেন।

নীলিমা বউদি জানিয়ে দিয়েছিলেন, মণিময়দাদের বাড়ির সবাই ল'ইয়ার। ওঁর বাবা ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের জবরদস্ত অ্যাডভোকেট। তিন দাদাও ওখানে প্র্যাকটিশ করেন। শুধু মণিময়দাই এই ঘরানার বাইরে।

দারোয়ানকে জানালাম, মণিময়দার ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দারোয়ান একতলার ড্রইং রুমে আমাকে বসিয়ে ভেতরে খবর দিতে গেল। বড় বড় দুই ব্লেডওলা ত্রিশ বত্রিশ সালের মডেলের ফ্যান, বিশাল বিশাল সোফা, একধারে গির্দা বালিশে সাজানো ফরাস, কারুকাজ-করা সেন্টার টেবল, ইত্যাদি দেখে টের পাওয়া যায় এ বাড়িতে সাবেক চাল অনেকটাই বজায় আছে।

কিছুক্ষণ বাদে তিনজন ভারী চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোক ড্রইং রুমে এসে ঢুকলেন। তাঁদের মুখ চোখের আদল দেখেই টের পাওয়া গেল, এঁরা মণিময়দার তিন দাদা।

আমি কোত্থেকে কী উদ্দেশ্যে এসেছি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে তিন ভাই ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। আমি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

একসময় স্তব্ধতা ভেঙে বড় ভাই কান্তিময় কর্কশ গলায় জিগ্যেস করেন, 'সেই মেয়েমানুষটা এখন কোথায়? মণির কাছেই আছে?' একটু থেমে বলেন, 'বদ, নষ্ট মেয়েমানুষ!'

মেয়েমানুষটি কে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। নীলিমা বউদি সম্পর্কে মণিময়দাদের বাড়িতে কী নিদারুণ ঘৃণা এবং ক্রোধ জমা হয়ে আছে তা ওঁর কথায় টের পেয়ে যাই। একবার ভাবি অমন একজন অসাধারণ ভদ্র এবং মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সম্বন্ধে কান্তিময় যে নোংরা মন্তব্য

করলেন তার প্রতিবাদ করি। পরক্ষণেই মনে হয়, তাতে অযথা খানিকটা তিক্ততাই সৃষ্টি হবে। নিজেকে যতখানি সম্ভব সংযত রেখে বলি, 'হ্যাঁ, উনি ওখানেই আছেন।'

কান্তিময় বলেন, 'আমরা কণিকাকে নিয়ে কলকাতায় যাব। অ্যাণ্ড উই উড অ্যাসার্ট আওয়ার রাইটস।'

মণিময়ের মেজদা প্রভাময় বলেন, 'কলকাতায় গিয়েই ঘাড় ধরে মেয়েমানুষটাকে বার করে দেব।'

এবারও দাঁতে দাঁত চেপে মুখ বুজে থাকি। মণিময়দার ছোটদা আনন্দময় হঠাৎ আমার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠেন। বলেন, 'আপনি কোথায় উঠেছেন?'

একটা ছোট হোটেলের নাম করে বললাম, 'ওখানে।'

'গাড়ি বার করে দিচ্ছি। আপনার মালপত্র এখানে নিয়ে আসুন। রাতের দিকে কলকাতার একটা ট্রেন আছে। এখান থেকে আমরা একসঙ্গে চলে যাব।'

এ বাড়িতে ওঠার ইচ্ছা একেবারেই নেই। নীলিমা বউদি সম্পর্কে এঁদের মনোভাব আমার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। এখানে এক-একটা মিনিট আমার পক্ষে কী কষ্টদায়ক বোঝাতে পারব না। বললাম, 'আমি ওখানেই ঠিক আছি। কয়েক ঘন্টার জন্যে মালপত্র টানা হ্যাঁচড়া করে লাভ নেই। ট্রেন ক'টায়?'

আনন্দময় বলেন, 'আটটা নাগাদ।'

'আমি সাতটায় স্টেশনে পৌঁছে যাব। আপনারাও চলে যাবেন। স্টেশনে দেখা হবে। আচ্ছা চলি।' বলতে বলতে উঠে পড়ি।

এবার মণিময়দার ভাইরা বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েন। তাঁদের খেয়াল হয়, কলকাতা থেকে যে লোকটা এত কষ্ট করে এতদূর ছুটে এসেছে তার সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করা হয় নি। নীলিমা বউদি সম্পর্কে তাঁদের বিতৃষ্ণা বা ক্রোধ থাকতে পারে, কিন্তু আমার অপরাধ কী? অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য এবার তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিন ভাই সমস্বরে বলে ওঠেন, 'উঠবেন না, উঠবেন না। অন্তত চা-টা খেয়ে যান।'

'ক্ষমা করবেন।' মণিময়দার ভাইদের নতুন করে আর কোনো অনুরোধ করার সুযোগ না দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি।

সাতটায় স্টেশনে মণিময়দার ভাইদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওঁদের সঙ্গে রোগা ফর্সা বিষণ্ণ চেহারার মধ্যবয়সী একটি মহিলাও রয়েছেন। তাঁর চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনার ছাপ।

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন প্রভাময়। বলেন, 'এ হল কণিকা, মণির স্ত্রী।'

ঠিক হয়, সব ভাই আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবেন না। বড় ভাই কান্তিময় আর কণিকাই শুধু যাবেন। আটটায় ট্রেন এলে আমরা উঠে পড়ি। সারাটা পথ আমাদের মধ্যে একটি কথাও হয় না।

পরদিন হাওড়ায় পৌঁছেই কথামতো স্টেশন থেকে নীলিমা বউদিকে ফোন করি, 'আমি কি ওঁদের নিয়ে সোজা ফ্ল্যাটে আসব?'

নীলিমা বউদি বলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

আমি হকচকিয়ে যাই। বলি, 'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নেই। আপনি অবশ্যই ওঁদের নিয়ে আসুন।'

আমাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিলেন নীলিমা বউদি।

গভীর উদ্বেগ নিয়ে কান্তিময় এবং কণিকাকে সঙ্গে করে যখন মণিময়দার ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাই, নীলিমা বউদিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এরপর কান্তিময়রা মণিময়দার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালে বিহ্বলের মতো তিনি তাকিয়ে থাকেন শুধু।

পাটনা থেকে কণিকাদের নিয়ে আসার তিন দিন পর মণিময়দার অপারেশান হল। শুরু হয়েছিল সকাল ন'টায়। শেষ হল একটায়। আমি কণিকাদের সঙ্গে উদ্বিগ্ন মুখে নার্সিং হোমের করিডরে অপেক্ষা করছিলাম। ডাক্তার সেন অপারেশান থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলে জিগ্যেস করলাম, 'কেমন বুঝলেন?'

ডাক্তার সেন মৃদু হাসেন। বলেন, 'আমাদের হতাশ হতে নেই। দেখা যাক।'

একসময় কণিকারা চলে যান। আমি অন্যমনস্কর মতো নার্সিং হোমের বাইরে আসি। রাস্তা পেরুতে যাব, হঠাৎ ডাকটা কানে ভেসে আসে, 'সুধীশ ঠাকুরপো—'

চমকে মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ে, ফুটপাথের একধারে দাঁড়িয়ে আছেন নীলিমা বউদি। মুহূর্তের জন্য আমার শ্বাসক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে যায়। কান্তিময়রা আসার পর একটা চিঠিতে এ বাড়ির মালিকানা, মণিময়দার গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি স্বত্ব ছাড়ার কথা লিখে দিয়ে তিনি যে কোথায় চলে গিয়েছিলেন, কে জানে। তারপর এই দেখা হল। একটা ঘোরের মধ্যে যেন তাঁর কাছে দৌড়ে চলে যাই। বলি, 'বউদি আপনি!'

নীলিমা বউদি বিষণ্ণ হাসেন, 'হ্যাঁ, আমিই। রোজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকি। আপনারা চলে যাবার পর নার্সিং হোমে গিয়ে আপনার দাদার খবর নিই। আজ তো অপারেশান হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার সেন অপারেশানের পর কী বললেন?'

আসল কথাটা জানাই না। শুধু বলি, 'সাকসেসফুল অপারেশান।'

সোজা আমার চোখের দিকে তাকান নীলিমা বউদি। অদ্ভুত একটু হাসেন শুধু।

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জিগ্যেস করি, 'আপনি এখন কোথায় আছেন বউদি?'

নীলিমা বউদি বলেন, 'সেটা জানাবার মতো কোনো জায়গা নয়।'

বুঝতে পারি, তাঁর ঠিকানা কিছুতেই দেবেন না নীলিমা বউদি। একটু চিন্তা করে বলি, 'একটা কথা বলব?'

'বলুন না—'

'আপনাকে অন্য কোথাও থাকতে হবে না। আমাদের কাছে চলুন। আমরা মোটে তিনটে মানুষ—শুভা, আমি আর আমার ছেলে বিনু। ঠাকুরদার আমলের বাড়িটাও কত বড়। আপনার এতটুকু অসুবিধা হবে না।'

নীলিমা বউদি বলেন, 'আপনার দাদা ছাড়া এভাবে কেউ আমাকে বলেনি। আমার মন ভরে গেছে সুধীশ ঠাকুরপো। কিন্তু—'

'কী?'

'নতুন করে আমি আর কোথাও জড়াতে চাই না।'

এরপর আমার আর কিছু বলার থাকে না।

নীলিমা বউদি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলেন, 'আপনাকে আমার কিছু জানাবার আছে।'

'কী?'

'আমি মানুষটা কে। আপনার দাদা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনে কেমন করে এলাম, এসব সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার কৌতূহল আছে। কণিকারা আপনাকে কি কিছু জানায় নি?'

'না। আপনি আমার বউদি, এর বেশি আর কিছু জানার ইচ্ছে নেই।'

'তবু আমাকে বলতেই হবে। যাকে এতদিন বউদি বলে সম্মান করে এসেছেন সে যে কত বড় পাপিষ্ঠা তা আপনার জানা দরকার।'

হাতজোড় করে বলি, 'আমাকে এসব বলবেন না বউদি।'

নীলিমা বউদি কিন্তু আমার কথা শোনেন না। তাঁর ওপর অপার্থিব কিছু যেন চেপে বসে। দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে যা বলে যান তা এইরকম।

নীলিমা বউদি মণিময়দাদের দূর সম্পর্কে আত্মীয়। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর, দু'বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসেন। এই বিপর্যয়ের পর প্রথম প্রথম সহানুভূতি বোধ করতেন মণিময়দা। তারপর কবে যে সেটা গভীর ভালোবাসায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, টের পাননি।

জানাজানি হয়ে যাওয়ায় দুই পরিবারে চরম অশান্তি হয়েছিল। ছেলেকে শোধরাবার জন্য মণিময়দার বাবা একরকম জোর করেই তাঁর সঙ্গে কণিকার বিয়ে দেন। কিন্তু সে বিয়ে মেনে নেন নি মণিময়দা। গোপনে নীলিমা বউদির সঙ্গে যোগাযোগটা রেখেই যাচ্ছিলেন। তারপর একদিন তাঁকে নিয়ে যৌবনের অসীম দুঃসাহসে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। এখানে আসার পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।

কথা শেষ করে আচমকা একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়েন নীলিমা বউদি। আমি যে কিছু উত্তর দেব তার সুযোগ পাওয়া যায় না।

এরপর নার্সিং হোমে রোজই মণিময়দার খবর নিতে যাই আর ফুটপাথের দূর প্রান্তে নীলিমা বউদিকে চোখে পড়ে। কণিকাদের এড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলি।

অপারেশানের পরও মণিময়দা সুস্থ হচ্ছেন না, দিন দিন তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে জন্য আমাদের সবার চেয়ে, এমনকি কণিকার চেয়ের বেশি উৎকণ্ঠিত নীলিমা বউদি। দেখেই বোঝা যায়, নিয়মিত খান না, রাতের পর রাত হয়তো না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন।

চেহারা আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তাঁর দিকে তাকানো যায় না। ভেঙেচুরে দ্রুত তিনি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন।

দশদিন পর নার্সিং হোমেই মারা গেলেন মণিময়দা। সেদিনও নীলিমা বউদিকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। চোখ থেকে অবিরাম জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে আর ঠোঁটদু'টো সমানে কাঁপছে।

শেষ বার নীলিমা বউদিকে দেখতে পাই শ্মশানে। একধারে নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

মণিময়দার নশ্বর শরীর আগুনে শেষ হয়ে যাবার পর নীলিমা বউদিকে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি তিনি কখন যেন চলে গেছেন। এরপর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এই বিশাল পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে তিনি চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছেন।

জুহু বিচের সেই মেয়েটা

জুহু বিচের বাদামি বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন অবনীশ। পৃথিবীর এই 'লঙ্গেস্ট বিচ' অর্থাৎ দীর্ঘতম বেলাভূমি চার পাঁচ মাইল দূরে ভারসোবা পর্যন্ত চলে গেছে। কোথাও একটু না থেমে অবনীশ সোজা ভারসোবা পর্যন্তই যাবেন। সেখানে আধ ঘন্টা জিরিয়ে আবার বিচের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসবেন।

অবনীশ কলকাতার একটা বিরাট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ফিনান্স ডিরেক্টর। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। টান টান সমুন্নত চেহারা, নাক-মুখ ধারাল, গায়ের রং টকটকে। জুলপি এবং ঘাড়ের কাছে কয়েকটা চুলকে রুপোর তার করে দেওয়া ছাড়া সময় তাঁর ওপর আর কোনো আঁচড় কাটতে পারে নি। হঠাৎ দেখলে তাঁকে যুবক বলে মনে হতে পারে।

অবনীশ অবিবাহিত। তিনি সিগারেট খান না, মদ টদ স্পর্শ করেন না। পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগের ন্যায়-নীতি ব্যক্তিগত জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। সেদিক থেকে তাঁকে পুরনো আমলের চরিত্রবান মানুষ বলা যেতে পারে।

কোম্পানির নানা দরকারে অবনীশকে প্রায় ফি মাসেই বম্বে আসতে হয়। বম্বে এসে তিনি আর কোথাও ওঠেন না। জুহুতে তাঁর একটি প্রিয় হোটেল আছে, এয়ারপোর্ট থেকে সোজা সেখানে চলে আসেন। তাঁর কাজকর্ম কিন্তু সবই এখান থেকে পনেরো ষোল মাইল দূরে প্রপার বম্বে সিটিতে। তবু যে তিনি এত দূরে জুহুতে এসে থাকেন তার একমাত্র কারণ এখানকার বিচ। বাদামি বালির এই আশ্চর্য সুন্দর বেলাভূমি দুরন্ত আকর্ষণ তাঁকে জুহুতে টেনে আনে।

যে ক'দিন অবনীশ এখানে থাকেন সূর্যোদয় হবার আগেই বিচে চলে আসেন। খানিকক্ষণ বেড়িয়ে টেড়িয়ে হোটেলে ফিরে যান। তারপর স্নানটান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে সোজা প্রপার বম্বেতে। সারাদিন নানারকম কাজ আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চুকিয়ে সন্ধের আগে হোটেলে ফিরেই আবার বিচ।

খুব জোরেও না, আবার আস্তেও না, মাঝারি গতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন অবনীশ। বিচটার একদিকে আরব সাগর। আরেক দিকে অগুনতি নারকেল গাছ কোস্ট লাইন ধরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে বিরাট বিরাট এক একটা হোটেল—'হলিডে ইন', 'কিংস', 'হরাইজন', 'সান অ্যান্ড স্যান্ড' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বিচের ওপর সারি সারি ইডলি-দোসা, ভেলপুরি, নারিয়েল পানি, আইসক্রিম এবং অজস্র রকমের ভাজিয়া-ভুজিয়ার স্টল।

আরব সাগরে এখন সন্ধে নামতে শুরু করেছে। সন্ধে নামলেও অন্ধকার গাঢ় হয়নি, দিনের আলোর শেষ আভাটুকু এখনও আকাশে এবং সমুদ্রে আবছাভাবে লেগে রয়েছে। সামনের দিকে তাকালে মনে হয়, আরব সাগর যেন সারা গায়ে একটা উলঙ্গ বাহার শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে।

বিচে এখন প্রচুর ভিড়। সমুদ্রতীরের বাতাস থেকে টাটকা 'ওজোন' ফুসফুসে টেনে নেবার জন্য হাজার হাজার মানুষ এখানে চলে এসেছে। আর আছে স্প্যানিশ চেক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান আমেরিকান এবং ফার-ইস্ট মিডল-ইস্টের অগুনতি বিদেশি টুরিস্ট।

ভিড় পেছনে ফেলে, বড় বড় হোটেলগুলো ডাইনে রেখে অবনীশ ফাঁকামতো একটা

জায়গায় এসে পড়লেন। কিছুটা অন্যমনস্কের মতোই তিনি হাঁটছিলেন। হঠাৎ মনে হল, পাশ থেকে কেউ যেন ফিসফিসিয়ে উঠল।

সমুদ্র থেকে ঝড়ের মতো হাওয়া উঠে এসে এধারের নারকেল বনে ভেঙে পড়ছিল। অবনীশ ভাবলেন, ওটা হয়তো বাতাসেরই শব্দ। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ভুলটা ভাঙল। গলার স্বর এবার আরেকটু স্পষ্ট, 'প্লিজ একটা কথা শুনবেন—'

কোনো মেয়ের গলা। একটু চমকই লাগল অবনীশের। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি এবং বাঁ দিকে ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলেন, একটু দূরে তেইশ চব্বিশ বছরের একটি যুবতী দাঁড়িয়ে আছে।

পেছন দিকের একটা বিরাট কুড়ি-বাইশ তলা হোটেল থেকে খানিকটা আলো এখানে এসে পড়েছিল। সে জন্য মেয়েটাকে মোটামুটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার গায়ের রং বেশ ফর্সা, মুখ ডিমের মতো লম্বাটে, লালচে চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, চোখদুটো ঘন পালকে-ঘেরা এবং ভাসা ভাসা। তবে স্বাস্থ্য ভালো নয়, বেশ রোগা সে। এই বয়সেই তার শরীর ভেঙে যেতে শুরু করেছে। তাকে দেখলে প্রথমে যে কথাটা মনে পড়ে তা হল 'জীবনযুদ্ধ'।'

মেয়েটার পরনে খেলো কাপড়ের স্কার্ট আর ব্লাউজ। ঠোঁটে গালে নখে সস্তা দামের রং, পায়ে আধপুরনো স্লিপার। গলায় বীডের হার ছাড়া সারা গায়ে আর কোনো গয়না-টয়না নেই। তাকালেই টের পাওয়া যায় মেয়েটা গোয়াঞ্চি পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার ক্রিশ্চান।

তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত এক পলক দেখে নিয়ে রুক্ষ গলায় অবনীশ জিগ্যেস করলেন, 'কী চাই?' ইংরেজিতেই বললেন তিনি, কেননা মেয়েটা ওই ভাষাতেই কথা বলেছে।

মেয়েটা উত্তর দিলে না। ঘাড় নিচু করে ভীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, আর স্লিপারের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে বিচের বালি আঁচড়াতে লাগল।

গলার স্বর আরো রুক্ষ করে এবার ধমকে উঠলেন অবনীশ, 'কী হল, চুপ করে রইলে যে?'

মেয়েটা চমকে উঠল যেন। তারপর ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার পঞ্চাশটা টাকা চাই।'

ভুরু কুঁচকে চোখের দৃষ্টি মেয়েটাব ওপর স্থির করলেন অবনীশ। আগের স্বরেই বললেন, 'তোমাকে টাকা দেব কেন?'

মেয়েটা ভালো ইংরেজি জানে না। তার প্রতিটি কথায় গণ্ডা গণ্ডা ভুল। তবু সে যা বলতে চায় মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। মেয়েটা এবার বলল, 'টাকাটা আমার খুব দরকার।'

'তোমার দরকার বলে আমাকে দিতে হবে?'

'টাকাটা একেবারে খালি হাতে আমি নেব না। তার বদলে আমিও কিছু দিতে পারি।'

'কী দেবে তুমি?'

মেয়েটা অবনীশের দিকে তাকাতে পারছিল না। নিজের পায়ের কাছে চোখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'একটু আনন্দ।'

অবনীশ ঝাপসাভাবে কিসের একটা সংকেত পাচ্ছিলেন। বললেন, 'তার মানে?'

মেয়েটা বলল, 'আমার এই শরীরটা রয়েছে। এটা—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল।

এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটা অবনীশের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাঁর শিরদাঁড়াব মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কিছু একটা নেমে গেল যেন। তিনি শুনেছেন জুহু বিচে অগুনতি কল গার্ল বা এই জাতীয় মেয়েরা জীবাণুর মতো থিকথিক করতে থাকে। তবে বছরে দশ বার করে গত দশ বছরে কম করে একশো বার তিনি এই বিচে এসেছেন কিন্তু এরকম কোনো মেয়েকে আগে আর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেন নি।

এদের সম্পর্কে অবনীশ যা শুনেছেন তার সঙ্গে এই মেয়েটির প্রায় কিছুই মেলে না। মেয়েটা খুব নম্র আর ভিতু। খুব সম্ভব লাইনে নতুন এসেছে। অবনীশ চাপা গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে পুলিশে হ্যান্ড ওভার করব।'

মেয়েটা শিউরে উঠল যেন। তারপর বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করছি। নিশ্চয়ই আপনি পুলিশ ডাকতে পারেন। কিন্তু—'

সন্ধেবেলার বেড়ানোতে বাধা পড়ায় অবনীশ বিরক্ত হচ্ছিলেন, অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন এবং খুবই রেগে যাচ্ছিলেন। তবু মেয়েটাকে এক ধরনের নোংরা পোকার মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। বললেন, 'কিন্তু কী?'

মেয়েটি বলল, 'আমার কথা শুনলে আপনার দয়াই হবে। তখন আর পুলিশে দিতে ইচ্ছে করবে না।'

কিছুক্ষণ কী ভাবলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'এই প্রফেশনে কদ্দিন এসেছ?'

'আজই।'

'ও। আমিই তোমার প্রথম শিকার বুঝি?'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

হঠাৎ কী হয়ে গেল অবনীশের, এত দিনের নীতিবোধ-টোধের কথা আর মনে থাকল না। দারুণ এক কৌতূহল আচমকা তাঁকে পেয়ে বসল যেন। বললেন, 'এস আমার সঙ্গে, আমি তোমার কথা শুনব।'

মেয়েটি ভীত সুরে বলল, 'কোথায় যাব?'

'গেলেই বুঝতে পারবে।'

'আপনি কি আমাকে সত্যি সত্যি পুলিশের হাতে দেবেন?'

'সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

একরকম জোর করেই চরিত্রবান এবং দুর্দান্ত নীতিবাগীশ অবনীশ জুহু বিচের একটা বাজে মেয়েকে নিয়ে সোজা তাঁর ফাইভ-স্টার হোটেল চলে এলেন।

রিসেপশানিস্ট থেকে শুরু করে হোটেলের স্টুয়ার্ড-বয় বেয়ারা অবনীশের সঙ্গে একটা মেয়েকে দেখে চমকে উঠল। দশ বছর এই হোটেলে তিনি নিয়মিত আসছেন কিন্তু কোনোদিন তাঁর সঙ্গে কোনো মেয়েকে দেখা যায়নি। সবাই জানে, এসব ব্যাপারে তিনি ভয়ানক পিউরিটান।

অবনীশ কোনো দিকে তাকালেন না, মেয়েটাকে নিয়ে সোজা লিফট বক্সে ঢুকে পড়লেন। একটু পর থারটিনথ ফ্লোরে তাঁর স্যুইটে।

মেয়েটা ভীষণ কাঁপছিল। বোঝা যাচ্ছে এরকম 'পশ' হোটেলে আসার অভ্যাস নেই তার।

একটা ডিভান দেখিয়ে অবনীশ বললেন, 'বোসো—'

ডিভানটা কাচের জানালার ধার ঘেঁষে। তার পাশেই সোফা টোফা সাজানো রয়েছে। মেয়েটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ডিভানের ওপর জড়সড় হয়ে বসল। আর অবনীশ তার মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন।

এখান থেকে দূরে ঝাপসাভাবে রাতের আরব সাগর দেখা যাচ্ছে। আর জানালার নিচের দিকে তাকালে হোটেলের সুইমিং পুল চোখে পড়বে।

অবনীশ সমুদ্র বা সুইমিং পুল কোনো দিকেই তাকালেন না। স্থির নিষ্পলকে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটা বলল, 'জুনি।'

'তখন তুমি বললে আজই এই প্রফেশনে নেমেছ—'

'হ্যাঁ।'

'এই ডার্টি জঘন্য প্রফেশনে এলে কেন?'

'না এসে উপায় ছিল না।'

'বাজে কথা। যে যে-কাজ করে, তা যত খারাপই হোক, তার একটা যুক্তি ঠিক খাড়া করে রাখে।'

মেয়েটা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'আপনার কি ধারণা, আমি শখ করে এই নোংরা কাজ বেছে নিয়েছি?'

মেয়েটার কথার ভেতর কোথাও একটা খোঁচা ছিল, অবনীশের চোখ কুঁচকে গেল। বললেন, 'এ ছাড়া অন্য কিছু করা যেত না?'

'হয়তো অনেক কিছুই করা যেত। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'কেন?'

'আমি টু-থ্রি স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত পড়েছি। ওই কোয়ালিফিকেশনে ভদ্র কোনো চাকরি হয় না।'

অবনীশের মতো অত বড় কোম্পানির একজন ফিনান্স ডিরেক্টর এভাবে একটা বাজে টাইপের প্রস্টিটিউটের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলেন না। কিন্তু তাঁর কেমন যেন জেদ চেপে গিয়েছিল। বললেন, 'কেন তুমি এ লাইনে এলে সেটা আমি জানতে চাই।'

জুনি এবার বলল, 'তাতে আপনার কী লাভ? আপনাকে বিরক্ত করেছি, সেজন্য ক্ষমা চাইছি। দয়া করে আমাকে যেতে দিন। যেমন করে হোক কিছু টাকা আমাকে জোগাড় করতেই হবে। এখনও বিচে গিয়ে চেষ্টা করলে ওটা হয়তো পেয়ে যাব।'

'যতক্ষণ না বলছ, আমি ছাড়ব না। যদি আমাকে বোঝাতে পার নিরুপায় হয়েই এ লাইনে এসেছ, টাকাটা আমিই তোমাকে দেব।'

জুনি দ্বিধান্বিতের মতো এ:টুক্ষণ বসে থাকল, তারপর বলল, 'আমার ছেলে ডেথ বেডে, বাঁচবার আশা খুব কম। এদিকে আমার হাতে একটাও পয়সা নেই। তাই ওকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা—' বলতে বলতে তার গলা ধরে এ।।

অবনীশ জিগ্যেস করলেন, 'তুমি ম্যা:েড?'

'হ্যাঁ—' জুনি আস্তে করে মাথা নাড়ল।

'তোমার হাজব্যান্ড বেঁচে নেই?'

'জানি না।'

'তার মানে?'

জুনি এবার যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। গোয়ার ক্যাপিটাল পাঞ্জিম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা গ্রামে তাদের বাড়ি। ওখানকারই এক বড়লোকের ছেলে—পাঞ্জিমে তাদের বিরাট 'শেল'-এর (শঙ্খ, কড়ি, টার্বো, ট্রোকাস ইত্যাদি) ব্যবসা—ফুসলে তাকে বম্বেতে নিয়ে আসে। রেজিস্ট্রি করে বা চার্চে গিয়ে তারা বিয়েটিয়ে করেনি। তবে স্বামী-স্ত্রীর মতো বছর দুয়েক থেকেছে। ফুর্তিটুর্তির পর নেশা ছুটে গেলে ছোকরা তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। জুনির ফেরার উপায় ছিল না, কেননা ততদিনে তার একটা বাচ্চা হয়ে গেছে।

বাচ্চাটাকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত একটা ঝোপড়পট্টিতে এসে ঠেকেছে জুনি। হাতে দু-চারটে যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে আর যেটুকু গয়না-টয়না ছিল তা বেচে এত দিন চালিয়েছে। এখন আর কিচ্ছু নেই। তার ওপর ক'দিন ধরে ছেলেটা মৃত্যুশয্যায়। তাই কোনো রাস্তা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সেই আদিম অন্ধকার ব্যবসাতেই নামতে চেয়েছে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করল জুনি।

অবনীশ বললেন, 'বানানো গল্প, আমি বিশ্বাস করি না।'

জুনি বলল, 'আমি মিথ্যে বলি না।'

'তুমি যে সত্যি বলছ তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ পেতে হলে আমি যে নরকে থাকি সেখানে আপনাকে যেতে হয়।'

অবনীশ বললেন, 'নরক টরক বলে আমাকে ঠেকাতে পারবে না। আমি যাব। কোথায় থাকো তুমি?'

জুনি বলল, 'কিংস সার্কল স্টেশনের দিকে যেতে রেল লাইনের গায়ে যে ঝোপড়পট্টি রয়েছে সেখানে।'

'ঠিকানা ঠিক তো?'

'আপনাকে আগেই বলেছি, আমি মিথ্যে বলি না।'

'যুধিষ্ঠির!' বলে একটু থামলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'তোমার ছেলে তো বললে ডেথ বেডে?'

'হ্যাঁ।' জুনি মাথা নাড়ল।

'তাকে কোথায় রেখে এসেছ?'

'ঝোপড়পট্টিতে এক মাদারি খেলোয়াড় আছে, তাঁর বউ-এর কাছে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জুনি, 'রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি আর থাকতে পারব না।'

দু-তিন সেকেন্ড কী ভাবলেন অবনীশ। তারপর উঠতে উঠতে বললেন, 'একটু দাঁড়াও—' বলেই ভেতরের অন্য একটা ঘর থেকে পঞ্চাশটা টাকা এনে জুনিকে দিলেন।

টাকাটা যে সত্যি সত্যি পাওয়া যাবে, জুনি ভাবেনি। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর মাথা নুইয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনি টাকাটা দিলেন, বদলে আমারও আপনাকে কিছু দেবার আছে। যদি তাড়াতাড়ি—'

অবনীশের রক্তের ভেতর দিয়ে জোরাল বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'গেট আউট বিচ, গেট আউট—'

জুনি ভয় পেয়ে প্রায় দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে অবনীশ আরেক বার চেঁচালেন, 'মনে রেখো, তোমাদের ঝোপড়পট্টিতে আমি যাবই। যদি দেখি মিথ্যে বলেছ, তোমাকে ছাড়ব না।'

পরদিন সকালে জুহু বিচে অভ্যাসমতো ঘন্টাখানেক বেড়িয়ে ফিরে এলেন অবনীশ। তারপর স্নানটান সেরে ব্রেকফাস্ট যখন শেষ করে এনেছেন সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ক্রেডল থেকে ফোনটা তুলে কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলতেই রিসেপশানের সিন্ধি মেয়েটার গলা ভেসে এল, 'স্যার, একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

অবনীশ বললেন, 'আমার স্যুইটে পাঠিয়ে দাও—'

'কিন্তু স্যার, লোকটাকে মনে হচ্ছে খুব বাজে টাইপের—শ্যাবিলি ড্রেসড—পাঠাব কি?'

এক মুহূর্ত কী চিন্তা করে নিলেন অবনীশ। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, ওখানেই ওকে অপেক্ষা করতে বল। আমি আসছি।'

কিছুক্ষণ পর নিচে আসতেই রিশেপশানিস্ট মেয়েটি লোকটাকে দেখিয়ে দিল।

একধারে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বয়স ষাট-বাষট্টির মতো হবে। কালো, কুঁজো,

হতচ্ছাড়া চেহারা। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি পিনের মতো ফুটে আছে। পরনে তালি-মারা পাজামা আর ঢলঢলে জোব্বা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে টায়ার-কাটা চপ্পল।

এরকম চেহারার একটা লোক তাঁর নাম কী করে জানল, কেনই বা তাঁর কাছে এসেছে, অবনীশ ভেবে পেলেন না। কপাল কুঁচকে রুক্ষ গলায় তাকে বললেন, 'কী চাই?'

লোকটা আরো খানিকটা কুঁজো হয়ে গেল যেন। দুই হাত জোড় করে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বলল, 'আমি বোস সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করব।'

'আমিই বোস সাহেব—বল।'

'জুনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।'

জুনি অর্থাৎ কালকের সেই মেয়েটা! লোকটাকে ভালো করে একবার দেখে নিয়ে অবনীশ জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কে?'

লোকটা বলল, 'আমি একজন মাদারি খেলোয়াড়। জুনি যে ঝোপড়পট্টিতে থাকে আমিও সেখানে থাকি।'

অবনীশের মনে পড়ল, কাল জুনি তাঁকে এক মাদারি খেলোয়াড়ের কথা বলেছিল। এ-ই তা হলে সে। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'জুনি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে কেন?'

'আপনি নাকি বলেছিলেন আমাদের ঝোপড়পট্টিতে যাবেন—'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'মেহেরবানি করে হুজুর যদি আমার সঙ্গে যান—'

লোকটার ধৃষ্টতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন অবনীশ। একটা থার্ড ক্লাস মাদারি খেলোয়াড় তাঁকে কিনা তার সঙ্গে বস্তিতে যেতে বলছে! কী উত্তর দেবেন অবনীশ ভেবে পেলেন না। শুধু বললেন, 'তোমার সঙ্গে ঝোপড়পট্টিতে যাব!'

লোকটা ঘাড় কাত করল, 'জি। নইলে জুনির সঙ্গে আর দেখা হবে না। ও এখান থেকে চলে যাবে আর আপনি যা জানতে চান জানতে পারবেন না।'

হঠাৎ তীব্র এক কৌতূহল বোধ করলেন অবনীশ। লোকটাকে বললেন, 'চল।'

কিংস সার্কেল স্টেশনের কাছাকাছি রেল লাইনের গায়ে যে ঝোপড়পট্টি রয়েছে, কিছুক্ষণ পর সেই লোকটার পিছু পিছু অবনীশ সেখানে এলেন।

জুনি বলেছিল নরক। এই ঝোপড়পট্টিগুলো তার চাইতেও বোধহয় জঘন্য। দু'ধারে পিচবোর্ড টিন চট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সারি সারি সুড়ঙ্গের মতো ঘর। মাঝখান দিয়ে সাপের মতো আঁকাবাঁকা অন্ধকার রাস্তা। এই রাস্তা যুগপৎ পায়ে চলার পথ এবং নর্দমা। পানের পিক, থুতু, কফ এবং কাচ্চাবাচ্চাদের যাবতীয় প্রাকৃত কর্মের চিহ্ন সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। রাস্তাটা থেকে কুৎসিত দুর্গন্ধ উঠে আসছিল।

নাকে রুমাল চেপে লোকটার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন অবনীশ। এখানে ছোটখাটো ভিড় জমে আছে। দেখেই বোঝা যায় এরা বস্তিরই লোকজন।

অবনীশের মতো সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন লোককে দেখে ভিড়টা দু ভাগ হয়ে পথ করে দিল। আর তখনই সামনের দিকে চোখ পড়ল অবনীশের, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চমকে উঠলেন তিনি।

ঘরের সামনে ছোট্ট বারান্দায় জুনি মূর্তির মতো বসে ছিল। তার সামনে একটা মৃত শিশুর দেহ শোয়ানো রয়েছে। নিশ্চয়ই জুনির ছেলে।

সেই লোকটা একটু এগিয়ে গিয়ে জুনিকে বলল, 'সাহেব এসেছেন—'

জুনি অবনীশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম। এ ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না।' বলে একটু থামল সে। তারপর মৃত বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল, 'কাল বলেছিলাম আমার ছেলে ডেথ বেডে। রাত্তিরে ফিরে এসে দেখি সে আমাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেছে। এতক্ষণে ওকে গোরস্থানে নিয়ে যাবার কথা, কিন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নিজের চোখেই দেখুন, আমি মিথ্যে বলিনি, আপনাকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা আদায় করতে চাই নি।'

অবনীশ কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। গলার কাছে অসহ্য এক যন্ত্রণা ডেলার মতো পাকিয়ে যেতে লাগল।

জুনি হঠাৎ উঠে পড়ল। ঘর থেকে কালকের সেই পঞ্চাশটা টাকা এনে অবনীশকে বলল, 'আপনার টাকাটা নিন—'

অবনীশ ভাঙা গলায় বললেন, 'টাকাটা ফেরত নেবার জন্যে তো দিইনি।'

'যে জন্যে দিয়েছিলেন সে কাজে লাগল না, অকারণে আপনার কাছে ধার রাখব কেন?' একরকম জোর করেই টাকাটা অবনীশকে ফিরিয়ে দিল জুনি।

অবনীশ বললেন, 'এবার তুমি কী করবে?'

'ভাবি নি।' বলে একটু থামল জুনি। পরক্ষণে আবার বলল, 'আশা করি আপনি যে প্রমাণ চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেছেন। আমাকে নিশ্চয়ই আর ধাপ্পাবাজ ভাবছেন না।'

অবনীশ উত্তর দিতে পারলেন না।

জুনি আবার বলল, 'এই নরকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট করবেন না, দয়া করে চলে যান।'

মুখ নামিয়ে আচ্ছন্নের মতো অন্ধকার সরু গলিটা দিয়ে এগুতে লাগলেন অবনীশ।

নাগমতী

সোনাইবিবির বিল। জনপদ থেকে অনেক দূরে, ভূগোলের কোলাহলের বাইরে নির্জন ভূখণ্ড। এই শীতের দিনগুলোতে তার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্রজল ডোবা। অসুরমুণ্ডের মতো রাশি রাশি মাটির ঢিবি। আর যতদূর নজর ছড়ানো যায়, শুধু হোগলাবন, শরঝোপ আর বিন্নাঘাসের উদ্দাম জঙ্গল। এর মধ্যে বিছিয়ে আছে নিবিড় ছায়াখণ্ড। সোনাইবিবির বিলের শান্তি নিরুদ্বেগ। তার জলজঙ্গলের ঘুম একান্তই নির্বিঘ্ন। অথচ বর্ষায় এই বিলের কিনারা থাকে না, চিহ্ন পাওয়া যায় না দিক্‌চক্রের। নিশ্চিহ্ন দিগন্ত পর্যন্ত শুধু কাজল জলের বন্যা ফুলতে থাকে। উত্তাল মেঘনা ভৈরব আক্রোশে নিজেকে প্রসারিত করে দেয় সোনাইবিবির বিলে। তারপর শুষ্ক হেমন্তদিনে এর দেহ থেকে মুছে যায় বর্ষার যৌবন। জলের কোন অতলান্ত থেকে একটু একটু করে মাথা তোলে কুমারী মাটি।

হেমন্ত পেরিয়ে শীত। আকাশের কোন নিরুদ্দেশ থেকে উড়ে আসে মরশুমি পাখপাখালি। কটোরা, ইমলি, জলপিপি। নানা নামের, নানা রঙের। রঙে রঙে ইন্দ্রধনু হয়ে ওঠে সোনাইবিবির বিল। আর আসে বেদেরা। মরশুমি পাখি আর শীতের যাযাবর। তাদের কলশব্দে ধুক ধুক করে বেজে ওঠে এই নির্জন ভূখণ্ডের ধমনী। সোনাইবিবির বিলের হৃৎপিণ্ডে দোলন লাগে, মাতন জাগে থরথর।

এবারও এসেছে যাযাবরেরা। রাশি রাশি তাঁবু স্থলপদ্মের মতো ফুটে উঠেছে সোনাইবিবির বিলে। আর ফুটেছে কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলি নয়, নাগমতী বেদের মেয়ে। তাদের তনুদেহে ধাঁধানো রঙের ঘাঘ্‌রা। আলগা খোঁপা থেকে কাঞ্চনফুল উড়ে উড়ে যেতে চায়। তাদের অলস চোখের মণিতে আচমকা উদয়নাগের ফণা নেচে ওঠে। গলায় ইমলি পাখির হাড়ের মালা, মণিবন্ধে কুঁচিলা সাপের হাড়ের বলয়। কানে শঙ্খনাগের কণ্ঠাস্থি দুল হয়ে দোদুল দুল দুলছে। তাদের পাশে পাথরপেশী বেদে। সুরারসের প্রভাবে দৃষ্টি রক্তপদ্ম। কালো ঠোঁটে নির্বোধ হাসির রেখা। পিঙ্গল চুলের রাশি চক্রচূড়ের অস্ত্র দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

শীতের রোদে প্রচুর আরাম ছড়ানো। সেদিকে পিঠ দিয়ে ডালা-কুলো বুনতে বসেছে নাগকন্যারা। চারপাশে বেত-বাঁশ স্তূপাকার সাজানো। পুরুষেরা কেউ কেউ পাশে এসে বসেছে। বেত চাঁছছে, বাঁশে তোলন দিচ্ছে ছেন্‌দা দিয়ে। কেউ কেউ চলে গেছে দূরের কোনও গঞ্জে। কারো পদপাত হয়েছে রবিফসলের প্রান্তরে। বিলের ওপারে আচক্রবাল ফসলের মাঠ। তিল, সরষে, কাউন ; খেতের ঝাঁপি ভরে আছে। কৃষাণের অলক্ষ্যে মাঠের অকৃপণ ভাণ্ডার থেকে যদি একমুঠো হাতিয়ে আনা যায়, তারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে কেউ। কেউ বা গেছে বালিহাঁসের তল্লাসে। কঠিন মুঠিতে তীক্ষ্ণধার কোঁচের ফলা। শীতের এই মধুর রোদে-ভরা দিনগুলিতে গৃহী পৃথিবীর আস্বাদ নিচ্ছে যাযাবরেরা।

প্রত্যেক বছর শীতের ঋতুতে সোনাইবিবির বিলে এসে নোঙর ফেলে বেদেরা। এই দিনগুলি তাদের জীবনে আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম। ভাসমান জীবন ছায়াতরুর নিচে এসে গৃহস্থালি রচনা করে। মাত্র কয়েক দিনের পরমায়ু। তারপর, শীতের শেষে দক্ষিণ দিগন্ত থেকে যখন মিঠে সমুদ্রবাতাস বয়ে আসে, তখনও তাদের নৌকোর বাদামে দূরযাত্রার সংবাদ আসে না। শীতের পর চৈত-ফাগুনের দিন। তারও পর খরসান গ্রীষ্ম। তার পরেই আসে বর্ষার আমন্ত্রণ। আকাশের কজ্জলিত মেঘে মেঘে নিরুদ্দেশ অভিসারের বার্তা পৌঁছে যায়। বৈঠার ফলায় মোচড় লাগে, পালে ঝড়ো বাতাস বাজে. মাল্লার মুঠিতে গুণ টানার দড়ি টান টান হয়ে ওঠে। কয়েক দিনের গৃহী জীবন একটা অবাস্তব স্বপ্নের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সোনাইবিবির বিলের অতল তলে। ভৈরব গর্জনে ছুটে আসে মেঘনা। বিন্নাবন, কাশঝোপ কোথায় মুছে যায়! চিহ্নহীন দিগন্ত পর্যন্ত শুধু জল আর জল। কালীয়নাগের মত রং। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার মল্লিকা। মেঘনা ফুলতে থাকে, ফুঁসতে থাকে, দুলতে থাকে। তার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখির মতো বেদেদের বহর গিয়ে নামে মেঘনায়, মেঘনা থেকে পদ্মায়, পদ্মা থেকে কালাবদরে। তারপর কোন সাগরের নিরুদ্দেশে উধাও হবে সে খবর জানা নেই। মেঘনার জলে জলে, পদ্মার ঢেউয়ে ঢেউয়ে শুধু জড়িয়ে থাকবে একটি তীক্ষ্ণমিষ্টি বেদেনীকণ্ঠ ঃ বিষপাথর মা, খাঁটি বিষপাথর। জড়িবুটি নিবা মা, সব বিষ বিষহরির দোয়ায় উইঠ্যা আসব। দুধরাজ-চক্রচূড়-আলাদ গোক্ষুর—

যতদিন সেই বর্ষা না আসে, ততদিন এই নীড় মোহ ঘনাতে থাকবে কামনায়, রক্তের কণায় কণায়। এই নীড় শিরায় শিরায় যাযাবর-রক্তে আফিম ফুলের মতো ঘুমের ছায়া ছড়াতে থাকবে। আর অপরূপ এক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে বেবাজিয়ারা।

বেলা চনচন করে বেড়ে উঠছে। শীতের রোদ আরো মধুর, আরো অলস আমেজ ছড়াচ্ছে। নিপুণ হাতে ডালা-কুলো বুনে চলেছে বেদেনীরা। আগামী হাটে কমলাঘাটের গঞ্জে বিক্রি করতে যাবে পুরুষেরা। একটু পরেই কাঁধে জড়িবুটি আর বিষপাথরের ডালা বেঁধে, মাথার ওপর থরে থরে সাপের ঝাঁপি সাজিয়ে দূরের জনপদে যেতে হবে। তাই দ্রুত তালে হাত চালাচ্ছে

নাগকন্যারা। চক্রচূড়ের নাচ দেখিয়ে, জড়িবুটি আর বিষপাথরের বিনিময়ে একমুঠো রুপালি পুলক নিয়ে ফিরতে হবে।

নানা কণ্ঠের কলশব্দে, তীক্ষ্ণ হাসির চমকে চকিত হয়ে উঠছে সোনাইবিবির বিল। মূলি বাঁশে তোলন দিতে দিতে মহব্বৎ বলল, 'কী লো পালঙ্কী, শঙ্খিনী কই? তারে যে দেখি না! দলের আম্মা হইয়া একেবারে আসমানের তারা হইয়া গেল নিকি?'

শঙ্খিনী এই বেদের দলের নায়িকা। তার সম্বন্ধে এই মন্তব্য রীতিমতো বে-আইনি। তা ছাড়া দলের নেত্রীকে 'আম্মা' নামে ডাকাটাই একমাত্র রেওয়াজ। এর ব্যতিক্রম ভয়াল কিছুকে ডেকে আনতে পারে। কারণ, শঙ্খিনীর একটি নির্দেশে এই বেবাজিয়া দলের যে কোনো মানুষের হৃৎপিণ্ড এক হাত একটা সড়কির ফলায় চৌফালা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মহব্বৎ বড় বেপরোয়া, ভয়ঙ্কর।

এই যাযাবর জীবনে আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম পালঙ্ক। উন্মনা একটি ভুঁইচাপার মতো মেয়ে। ভীরু ভীরু দু'টি চোখ থেকে ভ্রমর উড়ে যেতে চায়। নিজের চারপাশে একটি শান্ত স্নিগ্ধতার আলো ছড়িয়ে রাখে পালঙ্ক। দুরু দুরু বুকের কোন নিভৃত থেকে মৃগনাভি-মন সৌরভ ছড়ায়। সে সৌরভ স্নায়ুকে প্রসন্ন করে। পালঙ্কের দিকে তাকালে দৃষ্টি স্নিগ্ধ মায়ায় ভরে যায়।

একবার মহব্বতের মুখের দিকে তাকিয়ে ভীরু চোখ দু'টো নামিয়ে নিল পালঙ্ক। কোনো জবাব নেই তার মুখে। নিরুত্তর বসে বসে সাজির গ্রন্থিগুলো আরো নিবিড় করে পাক দিতে লাগল। আর চমকে উঠল অন্য বেদেনীরা।

এক পাশে বসে ছিল আতরজান। সুঠাম দেহ কিন্তু মুখখানা কবে যেন ঝলসে বিকৃত আর বীভৎস হয়ে গেছে। শুধু সেই ভয়াল মুখ থেকে একটি খরসান হাসি খলখল করে বেজে উঠল। সোনাইবিবির বিলের ধমনী সেই কর্কশ হাসিতে শিউরে উঠে। একসময় হাসি থামল। তারপর প্রেতকণ্ঠে আতরজান বলল, 'আরে মহব্বইত্যা— বান্দীর পুত, শঙ্খিনীর যে ঘরের বউ সাজনের ভাবন লাগছে! আরশির সামনে খাড়াইয়্যা, শাড়ি পইর‍্যা, কপালে সিন্দুর দিয়া ঘরের বউ সাজতে আছে। দ্যাখ গিয়া। হিঃ—হিঃ—হিঃ।' আবারও সেই হাসি শুরু হল আতরজানের ; তারপর তার দৃষ্টিটা চক্রাকারে এসে পড়ল পালঙ্কের ওপর, 'কী লো পালঙ্কী, তোরও তো শখ আছে বউ সাজনের, সোয়ামী পাওনের। যা যা, বউ সাজ গিয়া। যা যা পেত্নী। হিঃ—হিঃ—হিঃ—'

ওপাশের স্বল্পজল খালে পাঁচখানা হাজারমণী নৌকো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। বেদেদের বহর। বর্ষার দিনের ভাসমান গৃহস্থালি। সেখান থেকে তীক্ষ্ণতম একটি কণ্ঠ বল্লমের ফলার মতো সাঁ করে ছুটে এল। গর্জন করে উঠেছে শঙ্খিনী, 'কে? কে? খাড়, আইতে আছি। এই মহব্বইত্যা, এই জিন, এই আতর, এই বান্দী, মুরগীর বদলা আইজ তোগো জবাই করুম।'

মাতলা ঝড়ের মতো সাঁ সাঁ করে ছুটে এল শঙ্খিনী। সিঁথিতে দাউ দাউ জ্বলছে রক্ত সিঁদুরের লেখা। বিজুরি চমকের মতো তনুদেহ। কোত্থেকে যেন একখানা চেলি জোগাড় করে এনেছিল শঙ্খিনী। কামনা-লাল শাড়িটা দাবাগ্নির মতো ঘিরে রেখেছে দেহখানাকে। অপূর্ব দু'টি বক্ষকুম্ভ। দ্রুত লয়ে উঠছে, নামছে। দু'টি দূরায়ত চোখ আলাদ গোখুরের জিভের মতো ঝক ঝক করছে।

বেপরোয়া মহব্বৎ এই মুহূর্তে একেবারে নিবে গেছে। আতঙ্কে চোখ বুজে এসেছে আতরজানের। ভয়াল কিছু একটা ঘটে যাবে এখনই, পলকপাতের মধ্যে। নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেছে বেবাজিয়াদের। শুধু এক পাশে বসে তৃষিত চোখে পালঙ্ক দেখতে লাগল শঙ্খিনীকে। টকটকে লাল চেলি, সিঁদুর। নাগমতী বেদের মেয়ে কল্যাণী বধূ সাজার পাঠ নিয়েছে। দেখতে দেখতে চোখ দু'টো যেন জ্বালা করে উঠল পালঙ্কের। উন্মনা ভুঁইচাপার মতো মেয়ে। তার

মৃগনাভি মন। সেই মনে কোন দূর কৃষাণগ্রাম থেকে ভেসে এল সৌরভ। নিরুদ্বেগ গৃহী জীবন, স্বামী নামে একটি প্রেমিক পুরুষ, তার বুকে আনন্দিত আত্মসমর্পণ, একটি নিভৃত লজ্জার মতো সেই পুরুষটিরই সন্তানকে বুকের অমৃতকলস থেকে সুধাদান, কিছু প্রিয়মুখ পরিজন, একটি শ্রীময় গৃহাঙ্গন, ঘরের চালে চালে ছেয়ে-যাওয়া সোনার-রেণু-ছিটানো সিমের লতা, চারপাশে আম আর লেবুগাছের ঘন ছায়ায় ঘুঘুর মেদুর সঙ্গীত—এই নিয়ে মধুর এক স্বপ্ন।

পদ্মা-মেঘনা-ইলশা—বেহুলা-লখিন্দরেব জলবাসরের দেশে বিষপাথর আর জড়িবুটি বিক্রি করে, দুধরাজ-শঙ্খনাগ-গোক্ষুরের নাচ দেখাতে দেখাতে পালঙ্ক দেখেছে কৃষাণী জনপদের প্রেম। সেই থেকে তার মুগ্ধ চোখে, উদ্দাম বেদেনী রক্তে রক্তে ছায়া ফেলেছে একটি নোঙর-ফেলার কামনা। হয়তো সেই স্বপ্নই দেখেছে শঙ্খিনী। এই মুহূর্তে শঙ্খিনীর চেলি-সিঁদুর দেখতে দেখতে পালঙ্কের মন উধাও হল। কোথায়, কোন ছায়াতরুর নিচে পলাতক হয়ে রয়েছে সেই ঘরের হাতছানি, সেই গৃহাঙ্গনের ভালোবাসা। এক-এক সময় এই যাযাবর বহর থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় পালঙ্কের! কিন্তু শঙ্খিনীর নির্দেশে অজস্র জোড়া চোখ তাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। অহরহ পালঙ্ক দৃষ্টিবন্দী।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যেতে পারত। এখনও বুক খরতালে উঠছে, নামছে শঙ্খিনীর। দৃষ্টি থেকে এখনও আলাদ গোক্ষুরের জিভ মিলিয়ে যায় নি। কিন্তু কিছু ঘটার আগেই ঘটে গেল আর একটা দুর্ঘটনা। সহসা সামনের কাশবন দলিত করে হু হু তুফান ছুটে এল। তুফান নয়, সেকেন্দর। —'আম্মা—আম্মা—সব্বনাশ হইয়া গেছে।'

মুখখানা অমানবিক হয়ে উঠল শঙ্খিনীর। ভ্রূ দুটো কাঁকড়া বিছার মতো কুঁচকে এল, 'কিসের সব্বনাশ! শিগ্‌গির ক' বান্দীর পুত।'

সেকেন্দর বলল, 'বিলের ওই পারে আর-একটা বহর আইছে। আমাগো লাখান বেবাজিয়াগো বহর। এই মাত্তর আমি দেইখ্যা আইলাম।'

কেয়াবনের বাঘিনীর দৃষ্টির মতো শঙ্খিনীর পিঙ্গল চোখ দু'টো জ্বলতে লাগল। বাজ ডাকল গলায়, 'জুলফিকার —'

অনেকটা দূরে, কষাড় জঙ্গলটার পাশে নির্বিকার বসে বসে দেশি মদের আকণ্ঠ সাধনা করছিল জুলফিকার। একটা কালপুরুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে। পাহাড়ের মতো কর্কশ কালো দেহ। শঙ্খিনীর গর্জনে ঠক করে তার হাত থেকে শূন্য বোতল ঝরে পড়ল। ওই গর্জনে একটা অনিবার্য আভাস আছে। শঙ্খিনীর দিকে ভ্রূহীন রক্তাভ চোখে তাকাল জুলফিকার। সমস্ত দেহের স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তার। এই বেবাজিয়াদের সেনাপতি সে। সমস্ত যুদ্ধের নায়ক। তার কণ্ঠে চাপা গজরানি শোনা গেল, 'গর্—র্—র্—র্—' আসন্ন যুদ্ধের মুহূর্তে সমস্ত কথা হারিয়ে যায় জুলফিকারের জিভ থেকে। শুধু ওই হিংস্র শব্দটা বেরিয়ে আসতে থাকে।

বেতের ডালা-চিনাই বুনতে বুনতে উৎকর্ণ হয়ে বসল যাযাবরেরা। তাদের শিরায় শিরায় বহমান রক্ত একটা নিশ্চিত ইঙ্গিত পেয়ে গেছে। শঙ্খিনীর পিঙ্গল চোখ, শঙ্খিনীর গর্জন একখণ্ড করাল মেঘকে টেনে এনেছে শীতের সোনালি সকালে।

শঙ্খিনী ফের গর্জে উঠল, 'উরা আসলো, আমরা ইখানে আছি। উরা আসলো জাইন্যা-শুইন্যা। একেবারে জানে খাইয়্যা ফেলামু না!'

এই জল-বাংলায় একটা প্রথা আছে বেদেদের মধ্যে। কে যে এ রীতির প্রচলন করে গিয়েছে, আজ তার নাম এক অবলুপ্ত ইতিহাসে হারিয়ে গেছে। একটি দল যখন কোথাও 'পারা' গাঁথে, তখন অন্য একটি দল সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে না। তাতে কাজকর্মের দিক থেকে

দু দলেরই নানা অসুবিধা। তাই এই রীতিটিকে বেদেরা বরণ করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। অথচ আজ সেই প্রচলিত প্রথাটি অগ্রাহ্য করে এখানে এসে নোঙর ফেলেছে আর-একটি বেদে-বহর। অতএব সেকেন্দরের উত্তেজনা, শঙ্খিনীর গর্জন আর পিঙ্গল চোখে দাবাগ্নি দাউদাউ করে ওঠার নেপথ্যে পর্যাপ্ত কারণ আছে বই কি।

ইতিমধ্যে পাহাড়ের মতো বিশাল দেহখানা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জুলফিকার। উঠে দাঁড়িয়েছে মহব্বৎ আর অজস্র জোয়ান যাযাবর। উত্তেজনায় বেদেনীরাও নাগিনী হয়ে উঠেছে। একসময় সকলে সড়কি-বল্লমের সন্ধানে বহরের দিকে চলে গেল। শীতের সোনা-ঝরা সকালের ওপর করাল মেঘের ডানা এসে পড়ল রাশি রাশি। শঙ্খিনী ভুলে গিয়েছে একটু আগে মহব্বৎ আর আতরজানের মুণ্ডু দু'টো উপড়ে নিতেই ছুটে এসেছিল সে। এই মুহূর্তটা ভুলিয়ে দিয়েছে শঙ্খিনীর সেই প্রতিজ্ঞা।

সকলেই চলে গেছে, শুধু বেতবাঁশের পাহাড়প্রমাণ স্তূপের মধ্যে নিথর হয়ে বসে রয়েছে পালঙ্ক। এই খণ্ডযুদ্ধের মুহূর্তগুলো তার চেতনায় কী এক হিমছায়া ঘনিয়ে আনে। ভীরু জলপিপির মতো বুক দুরুদুরু কেঁপে ওঠে। রক্ত ছলকাতে থাকে। আচমকা একটা সম্মিলিত শোরগোলে চমকে উঠল পালঙ্ক।

সামনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কালপুরুষের মতো এগিয়ে চলেছে জুলফিকার। হাতের মুঠিতে একটা অতিকায় বল্লমের ফলা। তার পেছনে শঙ্খিনী, আতরজান, ডহরবিবি, ময়না থেকে শুরু করে বহরের আল্পবয়সি মাল্লাটি পর্যন্ত লম্বা লম্বা পা ফেলছে। সকলের হাতেই মারণাস্ত্র। রামদা, বল্লম, সড়কি আর কোঁচের ফলায় ফলায় অনিবার্য মৃত্যু ঝিলিক দিচ্ছে। আসন্ন যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা যাযাবরদের দৃষ্টিতে অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলছে। একসময় জুলফিকারেরা ঘন কাশবনের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত। সোনাইবিবির বিলটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নতুন বহরটার দিকে এগিয়ে এল জুলফিকার। তার পেছন পেছন শঙ্খিনীর পদাতিকেরাও এসে পড়েছে।

নতুন দলটা কয়েক দিন আগে এখানে এসেছে। এখনও সোনাইবিবির বিলে তারা জাঁকিয়ে বসতে পারে নি। বাঁশ, খুঁটি আর তাঁবু তৈরির সব আয়োজন ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। জুলফিকার আকাশ কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'এই সুমুন্দির পুতেরা, আব্বা-আম্মার শাদি দেখতে এখানে আইছস? কলিজা ফাইড়্যা ফেলামু—'

চমকে নতুন বহরের মানুষগুলো জুলফিকারের দিকে তাকাল। বিরাট মাথাটা তার আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। কালো পাষাণে খোদাই-করা নির্মম চেহারা। কঠিন পেশী থরে থরে তরঙ্গিত হয়ে উঠে গিয়েছে সমস্ত শরীরে। হাতে একহাত লম্বা বল্লমের ফলাটা রক্তদর্শনের উত্তেজনায় ঝকমক করছে। আকাশের কোনও অলক্ষ্য থেকে নেমে এসেছে যেন মহাকাল। তার করাল পদপাতে সোনাইবিবির বিলের হৃৎপিণ্ড থরথর কাঁপছে। গলার মধ্যে সেই ক্রূর শব্দ ধ্বনিত হল : 'গর—র—র—র—র—'

সামনেই সাতখানা নৌকার বহর 'পারা' পুঁতেছে স্বল্পজল খালে। নতুন বেবাজিয়াদের কয়েকজন আতঙ্কে সেদিকে উধাও হল। যারা দুঃসাহসী, তারা বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল কৃষ্ণাঙ্গ দানবটার দিকে।

ইতিমধ্যে শঙ্খিনী বিলভূমি কাঁপিয়ে আবাব হুঙ্কার ছাড়ল, 'আমরা ইখানে শীতকালে আসি। বান্দীর পুতেগো আক্কল নাই! বাইর হ একবার। এক্কেবারে ফাইড়া ফেলামু।'

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। ও পক্ষও সমান করিৎকর্মা। চোখের পলকে তারাও সড়কি বার করে এনেছে। মাঝখানে খানিকটা ফারাক রেখে দু'টি দল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। দু পক্ষের পাঁয়তারা আর ঘন ঘন গর্জনে সোনাইবিবির বিল কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল না। বিলের মাটি মাথা-ফাটা রক্তে চিহ্নিতও হতে পারত, বল্লমের তীক্ষ্ণ ফলাগুলো হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে রক্তের তৃষ্ণাও মেটাত। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। বহর থেকে বিকট চিৎকার করতে করতে দু'দলের মাঝখানে বিশাল দু'খানা হাত আকাশের দিকে তুলে এসে দাঁড়াল একটি মানুষ। পুরো সাড়ে চার হাত দীর্ঘ চেহারা। মাথার চুলগুলো থরে থরে কাঁধের সীমানায় নেমে এসেছে। সুগৌর দেহ। টানা টানা ভ্রূরেখার নিচে দূরায়ত চোখ। শিলা-ফলকের মতো বিশাল একখানা বুকে যেন অফুরন্ত শক্তি আর সাহস জমা হয়ে আছে। দৈবপ্রেরিত বলে মনে হল মানুষটিকে।

দু'টো দলই থমকে গেল। মানুষটি বলল, 'কাজিয়া ক্যান? আপসে মিটমাট কইর‍্যা নেওয়া যায় না?'

কেউ কিছু বলার আগেই জুলফিকারের পাশ থেকে উল্কার মতো ছুটে এল শঙ্খিনী। দশ দশটা বছর, অজস্র গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত পাড়ি দেবার পরও চিনতে এতটুকু অসুবিধা হয় নি তার। বিস্মিত গলায় শঙ্খিনী বলল, 'রাজাসাহেব!'

'কে?' শঙ্খিনীর দিকে চকিত নজর ফেলল মানুষটি।

'আমি শঙ্খিনী। চিনতে পারস না রাজাসাহেব!'

'তুই শঙ্খিনী! এইটা তুর দল!' এবার বিস্ময়ের পালা রাজাসাহেবের।

'হ।'—রাজাসাহেবের পেশীতরঙ্গের ওপর ভাসতে ভাসতে শঙ্খিনীর মুগ্ধ দৃষ্টি কী যেন সন্ধান করতে লাগল।

'কী তাজ্জবের কথা। এইটা তুর দল! আর তুর দলের লগে আমার দলের কাজিয়া! সড়কি-বল্লম নামাও হে মরদেরা। খুব হইছে—' মধুর হাসিতে মুখখানা ভরে গেল রাজাসাহেবের, 'উই সব কাজিয়া ভালো না।'

শঙ্খিনীর দু'টি চোখে অপার বিস্ময়। সেই বিস্ময় রাজাসাহেবের সারাদেহে ছড়িয়ে দিচ্ছিল সে। আর তার মনটা স্মরণের বায়ুতরঙ্গ আশ্রয় করে ফিরে গেল অনেক— অনেক বছরের নেপথ্যে। তাদের প্রথম যৌবনের দিনগুলোতে। সেই রাজাসাহেব! আজ কত বদলে গেছে! অথচ সেদিন! সেদিন সে ছিল জঙ্গলের বাঘের মত হিংস্র। বল্লম ফুঁড়ে মেছো কুমির তুলে আনত নদী থেকে। বিলান দেশে চিতাবাঘ কোপাতে যেত। কাজিয়ার ইঙ্গিতে রক্তের খরধারায় গুরু গুরু বাজ চমকাত তা। সে কাহিনি যেন আজ ইতিহাস। গল্পকথার মতো অসত্য মনে হয়। অথচ, সেদিন কী আশ্চর্যভাবেই না সত্য ছিল সেসব। আর আজ? এমন একটা মারদাঙ্গার সুযোগ মুঠির মধ্যে পেয়েও দু'দলকে থামিয়ে দিল রাজাসাহেব। সত্যি, অবাক হবার মতো ঘটনা। তবে সেদিনের পেশীতে পেশীতে কালনাগের যে ফণারা নেচে উঠত, কোন সাপুড়ের বাঁশিতে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে? কোন পাশাবতীর কুহকে জন্মান্তর হল রাজাসাহেবের? দিশা হারিয়ে ফেলে নাগমতী বেদেব মেয়ে। একই বহরে পাশাপাশি তারা ছেলেবেলা থেকে যৌবনে পৌঁছেছে। শঙ্খিনী আর রাজাসাহেব। সেই আসমানীর বহরের কথা মনে পড়ল শঙ্খিনীর। মনের মধ্যে যখন গুনগুনিয়ে উঠেছিল নতুন বয়সের মৌমাছি, কথারা ফুটেছিল কৃষ্ণকলি হয়ে, রাজাসাহেবের বাঘের মতো চোখ দু'টোতে কী এক মাদক ছায়া নেমেছিল আর তার সারাটা দেহ একটি নিবেদনের মতো কোমল হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই

তাদের মাঝখানে বিশাল একখানা পাহাড় উঠে দাঁড়াল। দৌলতপুরের ঝড়ে তাদের সেই বহর রাক্ষুসে নদীর অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল। স্রোতের টানে কুটোর মতো দলের কে যে কোথায় ভেসে গিয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে রাজাসাহেবকে। প্রথম যৌবনের সেই মনোরম দিনগুলি তার সাহচর্যে কুসুমিত হয়ে উঠেছিল। তাকে আজও ভুলতে পারে নি শঙ্খিনী।

রাজাসাহেব বলল, 'দ্যাখ শঙ্খিনী, তুরা এই বিলে আগে আসছস। আমরা চইল্যা যাই। কাইল সকালে রওনা হমু। এইবার চরসোহাগীতে গিয়া 'পারা' গাথুম। খুশি তো?'

চমকে উঠল শঙ্খিনী। তার কণ্ঠে আর্তনাদ চকিত হল, 'না না, রাজাসাহেব—তুই যাইস না। কতদিন পরে তুরে দেখলাম। তুরে কী আমি ছাড়তে পারি?'

'কিন্তুক দুইটা দল একলগে! বেফয়দা কাজিয়া আমার ভালো লাগে না। সেই দিন আর নাই আমার।'

'আমি আমার দলের আম্মা। আমি যা কমু তাই হইব।' পিঙ্গল চোখ দু'টো ঝলসে উঠল শঙ্খিনীর, 'আর কাজিয়া বাধাইলে তো কাজিয়া হইব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার বলল শঙ্খিনী, 'আইচ্ছা, একটা কথা জিগামু?'

'কী কথা?'

'কাজিয়ার কথায় এমুন ডরাস ক্যান? আগে তো এমন আছিলি না। এই কয়টা বছরে হইল কী তুর?' তৃষিত চোখে তাকাল শঙ্খিনী।

রাজাসাহেবের মুখে বিবর্ণ হাসি, 'আগেই তো কইছি, কাজিয়া আমার ভালো লাগে না। এই বেবাজিয়া জনমটা বিষের মতো লাগে। আইজ এইখানে, কাইল সেইখানে— মনে হয়, কুনোখানে পলাইয়া গিয়া ঘর বান্ধি। চাষ করি, আবাদ করি। এমুন দুনিয়া জুইড়া ঘুরাঘুরি আর ভালো লাগে না শঙ্খিনী। যেই গেরামেই যাই, চৌকিদার লাঠি লইয়্যা আসে, ভুইয়া আইসা শাসাইয়া যায়। বিষপাথর আর সাপের নাচ দ্যাখাইয়া প্যাট ভরে না। চুরি করলে জলপুলিশে ফাটকে লইয়্যা যায়। এইর থিকা চাষীগো লাখান ঘর বান্ধন অনেক ভালো।'

শিউরে উঠল শঙ্খিনী। চমকে উঠল দু'দলের বেবাজিয়ারা। বলে কী রাজাসাহেব! এ কী অশুভ সংকেত! বেবাজিয়ার খরস্রোত জীবনে এ কোন অভিশপ্ত নোঙর ফেলার স্বপ্ন! আল্লা-বিষহরির কাছে এ কোন ভয়ঙ্কর গুনাহ্? আল্লা আর বিষহরির ক্রোধাগ্নিতে ছারখার হয়ে যাবে সারা পৃথিবীর ভাসমান বেদে-সংসার! এ বিশ্বাস বেদেদের আবহমান কালের।

শঙ্খিনী চমকে ওঠে, 'এমুন কথা কইতে নাই রে রাজসাহেব। বিষহরির গুনাহ্ আইস্যা পড়বো। আমরা বেবাজিয়া, ঘরের বান্ধন আমাগো লেইগ্যা না। আর এমুন কথা কইস না। মা বিষহরি যদি একখান শঙ্খচূড় চালান করে তো জান নিয়া নিব। জয় মা বিষহরি!' আশঙ্কায় উদ্বেগে তার গলা কাঁপতে থাকে।

চারপাশে বেদেদের কপালে যুক্তকর উঠে এল, 'জয় মা বিষহরি।'

রাজাসাহেবের পাণ্ডুর হাসি ম্লানতর হল, 'কী করুম ক'! বেবাকই বুঝি শঙ্খিনী। কিন্তুক এই ভাইস্যা বেড়াইতে আর মন লাগে না। সাচা কথাখান কইলাম।'

আর-একবার চমকে উঠল বেবাজিয়ারা। তারপর চারপাশ থেকে অখণ্ড নীরবতা পাথরের মতো ঘনিয়ে আসতে লাগল।

একসময় শঙ্খিনী বলল, 'তুর কী হইছে ক' দেখি রাজাসাহেব! শরীলের সেই ত্যাজ নাই, ঘর বানতে চাইস্। আমার কাছে মনের কথাখান সাফা কইর‍্যা ক'।'

রাজাসাহেব বলল, 'তুই যে রাজাসাহেবরে জানতি, সে কবে মইর‍্যা গেছে। আমি অন্য মানুষ।'

আচমক খিল খিল করে হেসে উঠল যাযাবরী, 'আইচ্ছা, আইচ্ছা—তোর বেবাক রোগ আমি সারাইয়া দিমু।'

'ক্যামনে?'

'ফুসমন্তর শিখছি। ধূলপড়া শিখছি ভৈরবীর মশানে বইস্যা। বেবাজিয়া জুয়ানরে বশকরণের মন্তর। মনের উপুর একমুঠ ধূলপড়া ফিক্যা (ছুঁড়ে) দিমু।'—খিল খিল হাসি গমকে গমকে, ঠমকে ঠমকে বেজে উঠল শঙ্খিনীর, 'আইজ বিকালে আমার বহরে তুর দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) রাজাসাহেব। যাবি তো? তুর লেইগ্যা দশ বছরের কথা জইম্যা আছে বুকে। তুর লেইগ্যা দশ বছরের বেদনা উথালপাথাল করে কলিজায়।'

চোখ তুলে ধীরে ধীরে মাথা দোলাল রাজাসাহেব। একটু পরেই দামঘাসের জঙ্গলটা বিধ্বস্ত করে উধাও হল জুলফিকাবরা। পায়ের নিচে নধর দূর্বার গালিচা। চলতে চলতে শঙ্খিনী পুরনো দিনগুলোয় ফিরে গেল।

আসমানীর সেই বহর ডুবির পর কতগুলো বছর পার হয়ে গেছে। ওলট পালট হয়ে গেছে রাজাসাহেবের জীবন। সেদিন শাহাবাজপুরের এক ভুঁইয়ার নির্দেশে এক রাত্তিরে বারোটা লোককে বল্লমের ফলায় লাস বানিয়ে কালীদীঘির ঘাসবনের নিচে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। ভোর রাত্রে পোহাতি তারা মাথায় নিয়ে বহরে ফিরেছিল রাজাসাহেব। কোমরের গোপন গ্রন্থিতে ভরে এনেছিল একশোটা কাঁচা টাকা। সেদিনের সেই ভয়াল মানুষটা আজকের রাজাসাহেবের প্রতিটি দেহকোষ থেকে জলেব লেখার মতো মুছে গিয়েছে। আশ্চর্য! আজ সামান্য একটা কাজিয়ার ইঙ্গিতেও শিউরে ওঠে রাজাসাহেব। নানা এলোমেলো ভাবনা জটলা করছে শঙ্খিনীর মস্তিষ্কে। নানা গ্রন্থিহীন ভাবনা। আশ্চর্য! দশ বছর আগে রাজাসাহেবের দেহমন ঘিরে মৌচাক বাঁধতে চেয়েছিল শঙ্খিনী। অথচ আজ দু'জনেই আলাদা দল করেছে। আর দু'জনের দলই সড়কি-বল্লম নিয়ে পরস্পরের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। আশ্চর্য এই সময়, আশ্চর্য তার রহস্য! ভাবতে ভাবতে বিমনা হয়ে যায় নাগমতী বেদেনী। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমকে উঠল সে। রাজাসাহেবের যাযাবর-রক্তে এ কোন ঘরের স্বপ্ন ছোবল মারল! এ বিষের মন্তর জানে না যাযাবরী। ঘরেব নেশা তো তাব রক্তকেও আচ্ছন্ন করে। একখানা চেলি আর সিঁদুর সেও তো সংগ্রহ কবেছে। সেও তো বউ সাজে। কিন্তু চিরকালেব বেদে বহরকে নির্বাসন দিয়ে যে গৃহাঙ্গনের আমন্ত্রণ, তার জন্য তেমন কোনও মোহই নেই শঙ্খিনীর। ঘরের সেই কুহক থেকে যাযাবর-জীবনের খরধাবায় আবার ফিরিয়ে আনতে হবে রাজাসাহেবকে—যেমন করে হোক, শঙ্খিনী তাকে ফেরাবে।

রাজাসাহেব আসবে। বুকের মধ্যে কোথায় যেন মৌমাছির গুনগুনানি শুনছে শঙ্খিনী। স্নায়ুগুলোর ওপর দিয়ে মধুর আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে আফিমের মৌতাতের মতো। দেহমন তরঙ্গিত করে সুখ-শিহরন উঠছে—ছলাৎ ছল। হাজারমণী নৌকোর পাতাল থেকে জানালার মধ্য দিয়ে খুশি খুশি চোখ দু'টো বাইরে ছড়িয়ে দিল শঙ্খিনী। এখন গোধূলি। সোনাইবিবির বিলের ওপর বেলাশেষের আলো আবীর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ বড় ভালো লাগছে দূরের কাশবন, কষাড় জঙ্গল। ভালো লাগছে অর্জুনের শাখায় ওই পান্নারঙের মাছরাঙাটাকে। ভালো লাগছে নিজের সুধাস্বাদ তনুদেহ। মুগ্ধ কণ্ঠ থেকে গানের বৃষ্টি ঝরছে ঝর ঝর :

'সাপের বিষে যেমন তেমুন, প্রেমের বিষে দু'গুণ ধায়—
গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হইয়া দংশিয়াছে আমার গায়।
বিষের জ্বালা যেমুন জ্বালা প্রেমের জ্বালায় আগুন ধায়।
গহীন গাঙে নামলে পরে এই জ্বালা না জুড়ান যায়।'

শঙ্খিনীর চেতনায় এই বিল, এই গোধূলি, এই পৃথিবী অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে।

একসময় খাল থেকে সাজিমাটি দিয়ে মুখ মেজে এল শঙ্খিনী। রাশি রাশি চুলের মেঘে ছড়িয়ে দিল সুরভিত তেল। কপালের মধ্যবিন্দুতে কাচপোকার সবুজ টিপ আঁকল। এই দেহের প্রতিটি কণাকে সুধায় ভরিয়ে রাখতে হবে। মনের অতলে গুন গুন গুঞ্জন জাগছে। রাজাসাহেব আসবে।

একটু পরে সোহাগী গলায় শঙ্খিনী ডাকল, 'পালঙ্কী, ওলো পালঙ্কী, এই নৌকায় আয় লো আহ্লাদী।'

পাশের একটা নৌকো থেকে শঙ্খিনীর নৌকার পাটাতনে এসে বসল পালঙ্ক। তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে অজস্র প্রসাধনের জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে।

শঙ্খিনী বলল, 'আমার চুলটা এট্টু বাইন্ধ্যা দে লো সোহাগী।'

কাঠের চিরুনি দিয়ে শঙ্খিনীর চুল আঁচড়ে পরিপাটি খোঁপা করে দিল পালঙ্ক। সামনে একখানা হাত-আরশি নিয়ে চোখের কোলে সুর্মার নিপুণ রেখা আঁকল শঙ্খিনী। বিন্দু বিন্দু শ্বেতচন্দনের আলপনা টানল কপালে। প্রকাণ্ড খোঁপার ফাঁকে ফাঁকে রক্তমান্দারের ফুল সাজাল একটি একটি করে। তারও পর সবুজ রেশমের কাঁচুলি দিয়ে ভরাট বুক দু'টি সাজাল। কোমর থেকে জাফরানী ঘাগরা দুলিয়ে দিল। শঙ্খমণি সাপের রাশি রাশি হীরকদাঁত দিয়ে মালা গেঁথেছিল। গলায় সাজিয়েছিল সেই হার। নাকে পোখরাজের বেশর। কানে রক্তপাথরের কানফুল। মণিবন্ধে গোছায় গোছায় আয়না-চুড়ি। কোমরে কুঁচিলা সাপের হাড়ের গোট। পায়ে ঝুমঝুম কাঁসার মল। শঙ্খিনীর সারা শরীর বিদ্যুৎ চমকের মতো যেন ঝলকাতে লাগল।

অপলকে শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে ছিল পালঙ্ক। শঙ্খিনীর সারাদেহ থেকে নাগমতী মুছে গিয়েছে। একটু একটু করে সে দেহে জন্ম নিয়েছে কে এক অপরূপ রূপকন্যা। কে এক তিলোত্তমা। পালঙ্কের মনে হল, এ শঙ্খিনীকে সে চেনে না। পলক পড়লেই অসত্য একটা স্বপ্নের কুয়াশায় সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শঙ্খিনী হাসল, 'কী লো, আমারে পছন্দ হয়?'

একেবারে সম্মোহিত হয়ে গেছে পালঙ্ক। মাথা নাড়ল সে, 'হুঁ।'

'আ লো শালিক পঙ্খী, তোর পছন্দ হয়! আমারে শাদি করবি?' প্রগলভ গলায় হেসে উঠল শঙ্খিনী, 'আমারে শাদি কইর‍্যা আর কী হইব! আমি তো এট্টা মাগী।'

নিরুত্তর বসে রইল পালঙ্ক। একবার ভীরু চোখ তুলে তাকাল ভুঁইচাপা মেয়ে। বেদিশা হয়ে যাচ্ছে সে। কী জবাব দিতে হবে, তার জানা নেই।

শঙ্খিনী বলল, 'তুর তো বউ সাজতে সাধ হয়, ঘর বানতে মন লয়। তাই না লো শালিক?'

'হুঁ।' অস্ফুট একটি শব্দ বেরিয়ে এল পালঙ্কের ঠোঁট থেকে।

অন্য কোনো সময় হলে হয়তো গর্জন করে উঠত শঙ্খিনী। হয়তো কোনো বিপর্যয় ঘনিয়ে আনত। কিন্তু এই গোধূলির রং আলাদা। শুধু খিল খিল করে সারেঙ্গির বাজনার মতো হেসে উঠল শঙ্খিনী।

খানিকটা সময়ের বিরতি। তারপর শঙ্খিনী বলল, 'হা কইর‍্যা আমারে যে গিলতে আছস, শ্যাষে ভাতের খিদা থাকব তো! শোন, বউ সাজলে আমার থিকা তুরে অনেক সোন্দর দেখায়। এক-এক সময় মনে হয়, তুরেই শাদি কইর‍্যা ফেলাই। শোন লো শালিক পাখ্খি, আইজ আমার নাগর আসব। তার দিকে নজর দিবি না লো শালিক। সাবধান!' শেষের কথাগুলো বলেই চমকে উঠল শঙ্খিনী। জিভের ওপর তক্ষকের ছোবল এসে পড়েছে যেন সহসা। গম্ভীর হল শঙ্খিনী। কঠিন হল কণ্ঠ। নাঃ, অনেকটা প্রগলভ হয়ে পড়েছিল সে। শঙ্খিনী বলল, 'যা, ভাগ পালঙ্কী।'

একবার ভীরু চোখে শঙ্খিনীর মুখের দিকে তাকায় পালঙ্ক। সে মুখে কোনো প্রশ্রয়ই নেই।

শীতের বেলাশেষ সোনার হরিণ হয়ে পলাতক হল দিগন্তে। এখন প্রাক্‌সন্ধ্যা। সোনাইবিবির বিলে যেন রাশি রাশি ধূসর পাখা ছড়িয়ে দিয়েছে একঝাঁক সিন্ধুশকুন। চারিদিকে ধূপছায়া রং।

বিলের পারে আগুনের কুণ্ড তৈরি করেছে বেদের দল। আর সেই আকাশ-ছোঁয়া শিখার মধ্যে হিংস্র আনন্দে বেবাজিয়ারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে অজস্র আহত পাখি। বিলের আর এক তেপান্তরে দামঘাসের নিরীহ পাখিদের রাজ্যে বেদেরা গিয়েছিল গোধূলিবেলায়। নিথর জলের আয়নায় খুশি খুশি মুখ দেখছিল পাখিরা। অজস্র পাখি। জলপিপি, বখারি, ডাহুক, বালিহাঁস। নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো তারা হত্যা করে এনেছে রাশি রাশি পাখি। দামঘাসের নিরীহ রাজ্যে হাহাকার তুলে এসেছিল বেদেরা। রাজাসাহেব আসবে। তাই এই মৃত্যুর উৎসব। শঙ্খিনীর নির্দেশ, তাই এই হত্যার পার্বণ। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড উল্লাসে চিৎকার করে উঠছে বেবাজিয়ারা, 'হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা-লা। হুই ধিনাক্‌ ধিনা, হুই ধিনাক্‌ ধিন।' কেউ কেউ আবার ঢোলক আর বাঁশি নিয়ে আগুনের চারপাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। এক কিনারে দু'টি সতর্ক বাহুর আড়ালে গোটাকয়েক দেশি মদের বোতল পাহারা দিচ্ছে জুলফিকার। চারিদিকে অগুনতি শূন্য বোতল গড়াগড়ি দিচ্ছে। সুরারসে সকলের দৃষ্টি আরক্ত। আর সেই রক্তিম দৃষ্টিগুলো লোলুপ হয়ে আগুনের কুণ্ডটায় এসে পড়েছে। পাখির মাংস ঝলসানো পর্যন্ত তর সইছে না। তার আগেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে। শিকারি থাবা শানাচ্ছে সকলে। রাজাসাহেব আসবে, শঙ্খিনী তাই এই খুশির ভোজ দিয়েছে। ঢোলকের বাজনা উঠছে কুরু কুরু। মাতাল সুর বাজছে বাঁশিতে। প্রেমিক কণ্ঠ উদাস হয়ে উঠছে কারুর, 'কেমন কইর‍্যা থাকি লো সই শ্যামের বিহনে!' মদের একটা আধ্যাত্মিক প্রভাবও আছে। কেউ কেউ আগুনের কুণ্ডটা থেকে অনেক দূরে যোগাসন করে বসেছে। নিরাবরণ আকাশ। শীতের বাতাসে কামটের দাঁত বেরিয়েছে। কোনো দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। পৃথিবী সম্বন্ধে একেবারেই নির্লিপ্ত তারা। মাঝে মাঝে শুধু উচ্ছৃঙ্খল চিৎকার উঠছে, 'হা-লা-লা-লা হা-লা-লা-লা-লা—'

সন্ধ্যা পার হল। নিবিড় রাত্রি নামল। শঙ্খিনীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ। এতক্ষণে রাজাসাহেব এসেছে। তার পদধ্বনির আশায় ভীরু খরগোশের মতো উৎকর্ণ হয়ে বসে ছিল শঙ্খিনী, সেই বিকেল থেকে। বিলের পারে আগুনের কুণ্ডটার চারপাশ থেকে তুমুল শোরগোল উঠল। সেই আওয়াজে কুণ্ডলিত হয়ে উঠে গেল আকাশে। রাজাসাহেব আসছে, রাজাসাহেব আসছে।

নৌকার পাটাতনে চকিত হয়ে উঠল শঙ্খিনী। নিজের অঙ্গসজ্জার দিকে তাকিয়ে অপরূপ লজ্জায় দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল তার। সমস্ত দেহমনে সুখ যেন তরল স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কয়েকটি বিবশ মুহূর্ত। তারপর ত্রস্ত পদক্ষেপে নৌকোর পাটাতন থেকে বিলের মাটিতে নামল শঙ্খিনী। রাজাসাহেবের কাছাকাছি এসে ব্যগ্র মুঠির মধ্যে বিশাল হাত দু'খানা তুলে নিল তার।

বাইরে শীতের রাত খরধার হয়ে উঠছে। তার কামড় দেহের অনাবৃত চামড়ায় জ্বালা ছড়াচ্ছে। মদির গলায় শঙ্খিনী বলল, 'নৌকায় আয় রাজাসাহেব। বাইরে বেজায় শীত।'

বিলের মাটি থেকে হাজারমণী নৌকোর উষ্ণ, আরামদায়ক অভ্যন্তর। পাটাতনের একধারে হেরিকেন জ্বলছে। লালাভ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। একটা রেশমি গালিচা বিছিয়ে দিল শঙ্খিনী। তারপর রাজাসাহেবের পাশে নিবিড় হয়ে বসল।

অভিমানী গলায় শঙ্খিনী বলল, 'তুর লেইগা সেই বিকাল থিকা পথের দিকে চাইয়্যা বইস্যা রইছি। তুর দেখাই নাই। আমার লেইগা তুর মনে কুনো দরদ নাই জানি। বুঝছি, আর কুনো শয়তানী তুরে মন্তর করছে। ধূলপড়া দিছে তুর মনে। আমিও বিষ-বাইদ্যার মাইয়া। বেবাক মন্তর কাটান কইর‍্যা দিমু। তুই আইজ রাইতে আমার কাছে থাকবি।'

শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রক্তে রক্তে আদিম যাযাবর যেন কথা কয়ে উঠল। রাজাসাহেবের মাতাল দৃষ্টির ওপর একটা মাকড়সা যেন জাল বুনতে শুরু করেছে। বাইরে শীতার্ত বিল, হু-হু বাতাসের হাহাকার। আর এই নির্জন নৌকার পাটাতনে অপরূপা এক বেদের মেয়ে। তার জাফরানী ঘাঘরায়, রেশমি কাঁচুলিতে, সুর্মা-টানা চোখে শীতের রাত আশ্চর্য এক রহস্য মাখিয়ে দিয়েছে। রমণীয় এক লাস্য জড়িয়ে দিয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ভেতর হাজারটা ঢাক দ্রুততালে বেজে উঠল রাজাসাহেবের। শঙ্খিনীর বুকের কাছে ঘন হয়ে এল সে।

শঙ্খিনী বলল, 'আমারে পছন্দ হয় তুর? আসমানীর বহরে থাকলে এতদিন আমাগো শাদি হইয়া যাইত। দশটা বচ্ছর দুইজনে চোখের ফারাকে থাকতাম না।' শঙ্খিনীর ফিসফিস কণ্ঠ একসময় গাঢ় হল। তারপর নীরবতা।

কিছু একটা জবাব দিত রাজাসাহেব। তার আগেই নৌকোর ভেতরে এল পালঙ্ক। তার পেছনে আতরজান, গহর আর ডহরবিবি। অনেকগুলো দেশি মদের বোতল এনেছে তারা। মাটির সানকিতে এনেছে নানা স্বাদের, নানা রঙের মাংস। জলপিপি ঝলসে এনেছে। মাংসের পিণ্ডটা কদমফুলের আকার নিয়েছে। কুঁচিলা সাপের কাবাব। ইমলি পাখির ছালুন। খাসির মাংস দিয়ে কোর্মা বানিয়েছে। মদের বোতল আর মাটির সানকিগুলো পরিপাটি করে সাজিয়ে দিল ডহর বিবি।

চারিদিকে একবার তাকাল রাজাসাহেব। পাটাতনের এক পাশে কাঁথাকানির পাহাড়। জড়িবুটির ডালা। শঙ্খনাগ চক্রচূড়ের অজস্র ঝাঁপি। নিরবধি কাল থেকে বেদে-নৌকার সেই এক স্থির চিত্র, সেই অক্ষয় শিল্প। রাজাসাহেবের দৃষ্টিটা চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে খেতে আচমকা পালঙ্কের ওপর এসে পড়ল। উন্মনা ভুঁইচাঁপার মতো একটি মেয়ে। রাঙা ডুরে শাড়ি পরেছে পালঙ্ক। ছিমছাম খোঁপায় কিছু হিজল ফুল। ভীরু চোখে শান্ত গৃহাঙ্গনের ছায়া। রাজাসাহেবের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হল। পালঙ্কের দিকে তৃষিত চোখে তাকিয়ে রইল সে, নির্নিমেষে। মনে হল, ওই শান্ত চোখের ছায়ায় তার কামনা চরিতার্থ হবে। তার ঘরের স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে।

একই গালিচার ওপর দু'টি নারী। শঙ্খিনী আর পালঙ্ক। শঙ্খিনীর দিকে তাকালে দৃষ্টিতে নেশা লাগে। চেতনায় ঘোর ঘোর মাতন জাগে। স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মতো উত্তেজিত হয়। আর পালঙ্ক ছায়া দেয়, দৃষ্টিকে প্রসন্ন করে, স্নিগ্ধ মায়ায় দু'চোখ ভরে দেয়। শঙ্খিনী থির বিজুরি, পালঙ্ক ভুঁইচাঁপা।

এখনও পালঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে রাজাসাহেব। আচমকা বাঘের মতো গর্জে উঠল শঙ্খিনী, 'এই পালঙ্কী, এই নটী মাগী। ভাগ ইখান থিকা।'

চমকে উঠল পালঙ্ক। কখন যেন শান্ত চোখ দু'টি রাজাসাহেবের দৃষ্টিতে সমর্পণ করেছিল সে, খেয়াল ছিল না। রাজাসাহেবের মুগ্ধ চোখে অপরূপ ইঙ্গিত বুঝে নিয়েছে সে। শঙ্খিনীর গর্জনে চকিত হল পালঙ্ক। ত্রস্ত চোখ দু'টো সরিয়ে নিল অন্য দিকে, তারপর উঠে দাঁড়াল। শঙ্খিনীর নির্দেশ, নৌকার বাইরে যেতে হবে।

আচমকা ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে পালঙ্কের আঁচল ধরে ফেলল রাজাসাহেব, 'যাও কই নাগরী? বসো, বসো। এত সব বানাইয়া আনলা, খাইবা না?'

শঙ্খিনী বলল, 'উরে ছাইড়্যা দে রাজাসাহেব। উ মদ খায় না, মাংসও ছাড়ান দিছে। একেবারে বৈষ্টমী। হি-হি-হি!' খিলখিল হাসির তুফান তুলল শঙ্খিনী।

রাজাসাহেব বলল, 'আমিও তো মদ খাওন ছাইড়্যা দিছি।'

কান দু'টো বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো! বলে কী রাজাসাহেব! কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল শঙ্খিনী। তারপরেই প্রবল হাসিতে ভেঙে পড়ল, 'তবে তো তুর লগে উই শালিক পঙ্খীর ভালো মানাইব।'

বলতে বলতে জিভের ওপর আলাদ গোক্ষুরের ছোবল পড়ল যেন। চমকে থেমে গেল শঙ্খিনী। আর চারটে চোখ চকিতে মিলিত হল আবার। তারপরেই অর্থময় দৃষ্টি সরিয়ে নিল পালঙ্ক আর রাজাসাহেব।

খানিক পর নৌকোর 'ছই' থেকে বেরিয়ে গেল পালঙ্ক। তার পেছনে পেছনে বাইরের নিশ্ছেদ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ডহরবিবি, গহর আর আতরজান।

বাইরে শীতের রাত্রি আরো ঘন হয়েছে। আরো নিবিড় হয়েছে। প্রেতিনীর কান্নার মতো বাতাস বেজে চলেছে সাঁইঘাসের মধ্য দিয়ে। বিলের পারে আগুনের কুণ্ডটার চারপাশে যাযাবরেরা আরো নিবিড় হয়ে বসেছে। শীতার্ত রাত্রি তাদের উৎসাহ স্তিমিত করে দিয়েছে। এখন আর উল্লসিত চিৎকার সোনাইবিবির বিল কাঁপিয়ে তুলছে না।

এদিকে শঙ্খিনীর নৌকোয় পাটাতনের ওপর হেরিকেনের আলোটা স্থির হয়ে রয়েছে। রাজাসাহেবের আরো কাছে অন্তরঙ্গ হয়ে এল শঙ্খিনী। মাদকতা-ভরা গলায় বলল, 'তুরে ছাড়া আমি থাকতে পারুম না রাজাসাহেব।'

'সাচা কথা?'

'সাচা। যে কসম খাইতে কইস, সেই কসম খামু। তুই আমার হ রাজাসাহেব।' নিবিড় আকুলতা ফুটে বেরুল নাগিনীকন্যার কণ্ঠে।

'তাই যদি হয়, তবে চল আমরা ঘর বান্দি। ছানাপোনা হইব। যাবি শঙ্খিনী?' দু'টি ব্যগ্র বাহুর বৃত্তে শঙ্খিনীকে বন্দি করে ফেলল রাজাসাহেব, 'গেরামে গেরামে চাষীগো দেখছস তো, কী বাহারের সোয়ামী আর বউয়ের পিরিত! তুর মনে ধরে না সেই হগল? ভালো লাগে না?'

'লাগে তো, কিন্তুক এই বহর আরো ভালো লাগে। এই ভাইস্যা ভাইস্যা বেড়াইতে, সাপ নাচাইতে, বিষ নামাইতে কী ভালো যে লাগে! আমাগো বাজান আছিল বাইদ্যা, দাদা-নানা আছিল বাইদ্যা। তাগো রক্ত শরীলে রইছে। বেবজিয়া বহর ছাইড়া কেমনে ঘর বান্ধুম! না না রাজাসাহেব, এই মতলব ছাড়। বিষহরির গুনাহ্ লাগলে বেবাক ছারখার হইয়্যা যাইব। তুই আবার আগের মতো হ।'

'আমি উই বিষহরি মানি না।' অত্যন্ত নির্মম শোনাল রাজাসাহেবের কণ্ঠ, 'অনেক দিন ধইর্যা বহর ছাইড়্যা যাওনের ইচ্ছা আছিল। নানা ঝামেলায় পারি নাই। এইবার যাইতেই হইব।'

রাজাসাহেবের আলিঙ্গনের মধ্যে একেবারে পাথর হয়ে গেছে শঙ্খিনী। পুরোপুরি নিষ্প্রাণ। মেরুদণ্ড বেয়ে হিমধারা নামতে শুরু করেছে তার। রক্তের প্রতিটি কণায় কণায়, দেহের প্রতিটি কোষে কোষে সে বিষকন্যা। এই জল-বাংলার খালে বিলে নদীতে ভেসে ভেসে লখিন্দরদের পাহারা দেয় সে। তার বিশ্বাস, আজন্ম বেদেরা বিষহরির আদেশে ভেসে বেড়াচ্ছে এ-ঘাট থেকে সে-ঘাটে। এক বন্দর থেকে আর-এক গঞ্জে। এক জনপদ থেকে দূরতম কোনো গাঁয়ে। ভাসমান বহর থেকে তাদের কোনো দিনই মুক্তি নেই। নীড়ের প্রেম তাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে আসে। এই বেবাজিয়া জীবন শতবাহু দিয়ে বেঁধে রেখেছে তাদের। এখান থেকে পালিয়ে গেলে আর নিস্তার নেই।

একসময় রাজাসাহেবের বাহু শিথিল হল। সে বলল, 'আমি এইবার যাই শঙ্খিনী।'

আর্তনাদ করে উঠল শঙ্খিনী, 'তুই তো কিছুই খাইলি না?'

'খিদা নাই একেবারে।'

'তুই চইল্যা যাবি রাজাসাহেব! একটা রাইতও তোরে পামু না নিজের মতো কইর‍্যা!' বিষকন্যার দু'চোখে বিন্দু বিন্দু বাষ্প জমল। শিশিরের মতো অশ্রু।

রাজাসাহেব হাসল, 'তুই তো আমারে চাস না।'

'ক্যামনে তুরে পামু ক'?'

'এই বহর ছাইড়্যা আমার লগে যাইতে হইব। পারবি? বাইদ্যানী আছিলি, হবি কিষানের বউ। পারবি?' হো-হো করে হেসে উঠল রাজাসাহেব।

এক দিকে রাজাসাহেব, আর-এক দিকে যাযাবর জীবন। বিষবেদের মেয়ে সে। বিষহরির আদেশ অমান্য করে কেমন করে? কেমন করে ভেঙেচুরে দেয় জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার? একদিকে জীবনের প্রথম পুরুষের উষ্ণ প্রেম, আর-একদিকে যাযাবর জীবনের উর্ণনাভ-নেশা। দিশাহারা হয়ে গেল শঙ্খিনী। এলোমেলো গলায় বলল, 'আমারে ইট্টু ভাবনের সময় দে রাজাসাহেব। ভাইব্যা লই। তুই আবার আসবি তো?'

'আসুম, নিশ্চয় আসুম। তুর বহরের আর-এক পিরিতে পড়ছি আমি। আইতে তো হইবই। না আইলে মনটা ফাকুর-ফাকুর করব।' রহস্যময় গলায় হেসে উঠল রাজাসাহেব।

অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল শঙ্খিনী। রাজাসাহেবের হাসির ইঙ্গিতটা বার বার ধরতে গিয়েও ধরা যাচ্ছে না। আচমকা চোখ দু'টো তুলে দেখল, রাজাসাহেব কখন যেন চলে গেছে। এই শূন্য নৌকো, এই শূন্য মন, গালিচার ওপর পরিপাটি সাজানো অসংখ্য সুখাদ্যের সানকি—সব মিলিয়ে চেতনাটা যেন জ্বালা করে উঠল। এক রাশ গলিত পিণ্ডের আকারে একটি নাম গলা বেয়ে উঠে আসতে চাইল শঙ্খিনীর। সে নাম সম্ভবত পালঙ্কের। অসহ্য এক জ্বালাকে কয়েকটা ঢোক গিলে ঠেকাতে চেষ্টা করল শঙ্খিনী। প্রচণ্ড আক্রোশে মনটা ফুলতে লাগল, ফুঁসতে লাগল, দুলতে লাগল।

দামঘাসের ঘন জঙ্গলে ঝিঁঝিদের বাজনা বাজছে। পাল্লা দিয়ে ঐকতান শুরু করেছে ব্যাঙেরা। বনহিজলের পাতায় পাতায় সবুজ পান্নার মতো জ্বলছে শত শত জোনাকি। আর সোনাইবিবির বিলে গাঢ় হয়ে নামছে অন্ধকার। ঘনতম হয়ে ঝরছে শীতের রাত্রি। সবুজ ঘাসের পথ—আঁকাবাঁকা, এবড়োখেবড়ো। একটু অসতর্ক হলেই একেবারে মাধ্যাকর্ষণ। সতর্ক পা ফেলে ফেলে এগোতে লাগল রাজাসাহেব। তিনটে কষাড় ঝাড় পার হয়ে এসেছে সে। পেছনে ফেলে এসেছে ক্ষুদ্রজল খালের পাঁচটা বাঁক। চলতে চলতে একবার ফিরে তাকাল সে। এখান

থেকে শঙ্খিনীর বহরটা নজরে আসে না। দূরের কষাড় জঙ্গলটার আড়ালে বেদেদের অগ্নিকুণ্ডটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

শীতার্ত বাতাস অনাবৃত চামড়ার ওপর চাবুকের মতো কেটে কেটে বসছে। অসহ্য ঠান্ডায় কুঁকড়ে আসছে পেশীগুলো। আঙুলের ডগাগুলো ঝি ঝি করছে। রাজাসাহেবের মনে হল, চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। দ্রুত পা চালিয়ে দিল সে। অনেকটা পথ এখনও তাকে পেরিয়ে যেতে হবে। তার পর উষ্ণ বিছানার আশ্বাস।

সামনে একটা পিয়াল গাছের নিচে এসে থমকে দাঁড়াল রাজাসাহেব। হঠাৎ একটি স্নিগ্ধ আহ্বান শুনতে পেল সে, 'রাজাসাহেব—'

চমকে উঠল রাজাসাহেবের কণ্ঠ, 'কে?'

'আমি পালঙ্ক।' পিয়ালের আড়াল থেকে রাজাসাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল পালঙ্ক। নরম গলায সে বলল, 'সেই কখন থিকা তুমার লেইগ্যা খাড়াইয়্যা আছি।'

অস্পষ্ট একটা ছায়াচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে পালঙ্ক। ঘন অন্ধকারে পরিষ্কার তাকে দেখতে পাচ্ছে না রাজাসাহেব। তবু তার মনে হল, পালঙ্কের ভীরু ভীরু দু'টি চোখ প্রদীপ হয়ে জ্বলছে। কোমল সৌরভে পিয়ালের ছায়াতলকে যেন ভরে দিয়েছে মেয়েটা। রাজাসাহেব বলল, 'আমি জানতাম, তুমার দেখা আবার পামু।'

থর থর গলায় পালঙ্ক বলল, 'শঙ্খিনীরে তুমি যা কইছ, আমি বেবাক শুনছি আড়ি পাইত্যা। আমি ওই ঘর চাই। বহরে আর ভাসতে ভালো লাগে না। তুমি আমারে লইয়্যা যাইবা কুনোখানে? গৃহস্থি পাতুম আমরা। কিষানগো লাখান সংসারী হমু। নিবা আমারে?'

'যাইবা তুমি আমার লগে?' ব্যাকুল আগ্রহে পালঙ্কের কাছাকাছি এগিয়ে এল রাজাসাহেব। সহসা কী ঘটে গেল যেন রক্তের ভেতর। বুকের ভেতর টেনে নিল সে পালঙ্ককে।

একসময় গাঢ় গলায় রাজাসাহেব বলল, 'এইবার যাই। রাইত অনেক হইল পালঙ্ক।'

'আবার আসবা তো ? আবার কবে দেখা পামু তুমার?' আকুল শোনাল পালঙ্কের কণ্ঠ।

'রোজ। রোজ আমি আসুম তুমার বহরে।'

'উঁহু, বহরে না। বহরে শঙ্খিনী আছে। কাইল সাজো বেলায় আবার এইখানে আইসো রাজাসাহেব। আমার মাথার কিরা রইল। তুমি না আইলে গলায় রশি দিমু নিঘ্‌ঘাৎ।' উন্মনা ভুঁইচাঁপার মতো মেয়ে পালঙ্ক। বেদেনী হয়েও তার রক্তে রক্তে নাগিনীর বিষনিশ্বাস ছড়িয়ে যায় নি। তার মন আজ প্রথম পুরুষ স্পর্শে সুরভিত হল। মুখরিত হল।

'তাই আসুম। তুমি যখন চাও, তাই হইব। এইখানেই তুমার লগে মিলতি হমু।'

একসময় রাজাসাহেব চলে গেল। আর একটা পারাবতের মতো উড়তে উড়তে ঘাস-বিছানো পথের ওপর দিয়ে ফিরে যেতে লাগল পালঙ্ক।

পরদিন সোনালি বেলাশেষে আবার এল রাজাসাহেব। আর এল পালঙ্ক। পিয়ালের ছায়াতল আর শীতের গোধূলি মদির হল। শ্রান্ত যাযাবর আর বিষকন্যা দু'জনেই শুনেছে গৃহী সাপুড়ের বাঁশি। তার পরের দিনও এল দু'জনে। তার পরের দিনও। তারপর দিনের পর দিন। প্রতিটি বেলাশেষ মনোরম মাধুর্যে ভরে যেতে লাগল।

নিবিড় গলায় রাজাসাহেব বলল, 'আরো কাছে আসো বাইদ্যানী।'

ঘনপক্ষ্ম দু'টি ভীরু ভীরু চোখ তুলে পালঙ্ক বলল, 'বাইদ্যানী না, বউ কও।'

মধুর কণ্ঠে রাজাসাহেব বলল, 'বউ, বুকে আসো।'

বউ! শব্দটির মধ্যে কত মধু! কত অমৃতের স্বাদ! মন ইমলি পাখির পাখনা হয়ে উড়তে চায়। মুগ্ধ গলায় পালঙ্ক বলল, 'আমি তো তোমার বুকেই রাজাসাহেব।'

'বুকে না, মনের ভিতরে আসো বউ।'

রাজাসাহেবের বুকের ওপর রমণীয় এক শিহরনে দু'টি ভীরু চোখ বুজে এল পালঙ্কের। আচ্ছন্ন হয়ে রইল দু'জনে। পিয়ালের ছায়াতলে দু'টি হৃৎপিণ্ড পাশাপাশি দুলতে দুলতে অনেক কথা বলল, অনেক অনুরাগের সৌরভে ভরে গেল।

একসময় রাজাসাহেব বলল, 'তুমারে শাদি কইর‍্যা নিয়া যামু বউ।'

'কবে?'

'বর্ষার দিনটা আসুক।'

'কোথায় নিবা?'

'চরবেহুলায়। সেইখানে কিষানেরা নয়া গেরাম বসাইতে আছে। আমরাও গিয়া ঘর বান্ধুম।'

'তুমার বহরের কী হইব?'

'শঙ্খিনীরে দিয়া যামু। আমার লেইগ্যা তার মনে বড় পিরিত। কী করুম, ও তো বহর ছাইড়া অন্য কুনোখানে গিয়া ঘর বান্‌তে চায় না। বহরই ওর কাছে বড়।' একটা গাঢ় বেদনার ছায়া নামল রাজাসাহেবের কণ্ঠে, 'তা ছাড়া, আমি তার বহর থিকা তুমারে নিমু। তুমার দাম দিতে হইব তো। বহরটা শঙ্খিনীরেই দিয়া যামু।'

অনেকক্ষণ নীরবতা। একসময় পালঙ্ক বলল, 'তা ঠিক। রোজই যখন বহর থিকা পলাইয়্যা আসি, তখন দেখি তুমার লেইগ্যা সাইজ্যা-গুইজ্যা বইস্যা রইছে শঙ্খিনী। আমারে চাইর দিক থিকা পাহারা দেয়। কত কষ্ট কইর‍্যা যে আইতে হয়, খোদ বিষহরিই জানে! তুমার কাছে আসি জানতে পারলে একেবারে জানে খাইয়্যা ফেলাইব শঙ্খিনী।'

'ক্যান?'

'ক্যান আবার? উর ভোগের জিনিস আমি কাইড়্যা নিলাম তো ও আমারে ছাইড়্যা দিব! আমি হইলে দিতাম?' অপরূপ চোখে রাজাসাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল পালঙ্ক। একেবারেই নিষ্পলক।

আরো একটা বেলাশেষ এল। এল শীতের নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাত নিয়ে, আচমকা একটা দুর্ঘটনা নিয়ে।

পিয়ালের ছায়াতলে আজও এসেছে রাজাসাহেব। এসেছে পালঙ্ক। চারপাশে আদিগন্ত বিল প্রসারিত হয়ে রয়েছে। মাথার ওপরে অনাবরণ আকাশ। বাধাবন্ধহীন প্রকৃতির মতোই প্রেম এখানে উদ্দাম, বেপরোয়া। পিয়ালের ছায়াতলে দু'টি মন, দু'টি কামনা, দু'টি দেহ এক হয়ে মিলে গিয়েছে।

ফিসফিস গলায় পালঙ্ক বলল, 'আর তো একা থাকতে পারি না রাজাসাহেব। রাইতে আতরজানের পাশে শুইয়্যা ঘুম আসে না। খালি উসপাস করি। মনটা পঙ্খী হইয়্যা উড়াল দিতে চায় তুমার কাছে।'

রাজাসাহেবের কণ্ঠে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি, 'আর কয়টা দিন পালঙ্ক। বর্ষার আগে তো যাওন যাইব না। আর কয়টা দিন ধৈয্য ধর বউ।'

'আর যে পারি না।' রাজাসাহেবের বুকের ওপর বৃষ্টির মতো ঝুরঝুর করে যেন ঝরতে লাগল পালঙ্ক।

'আর পারি না! হারামজাদী নটী মাগী! ঢোড়া সাপ হইয়্যা আমার বুকে ছোবল মারতে চাও!' সামনের লাটাবনটার পাশে কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছিল শঙ্খিনী। একটা মধুর স্বপ্নের আবেশে ডুবতে ডুবতে খেয়াল ছিল না কারো। রাজাসাহেবেরও নয়, পালঙ্কেরও নয়। শঙ্খিনীর ক্রুদ্ধ চোখে খরিশ সাপের ফণা দেখতে পেল পালঙ্ক। তার বুকে উত্তাল ঢেউ ভাঙছে। দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে বুকটা ওঠানামা করছে।

পাথর হয়ে গিয়েছে দু'জনে — রাজাসাহেব আর পালঙ্ক। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তারা।

প্রখর গলায় চেঁচিয়ে উঠল শঙ্খিনী, 'জুলফিকার—'

লাটাবনের আড়াল থেকে একটি হিংস্র শব্দ ফুটে বেরুল, 'গর্‌র্‌-র্‌-র্‌।' সঙ্গে সঙ্গে কালপুরুষের আবির্ভাব। দু'টি রক্তাভ চোখে নিশ্চিত মৃত্যু ঝিলিক দিল জুলফিকারের। পাহাড়ের মতো বিশাল দেহখানা উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে। হাতের ব্যগ্র আঙুলগুলো বার বার মুঠি পাকিয়ে কী যেন গুঁড়ো গুঁড়ো করবার মহড়া নিচ্ছে।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল পালঙ্ক, 'ও বাজান—' তারপরেই রাজাসাহেবের বুকের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে ফেলল। শরাহত শালিকের মতো থরথর কাঁপছে সে।

'বাজান! বাজানের শাদি দেখামু না তোর। রোজ আমি সাইজ্যা-গুইজ্যা বইস্যা থাকি রাজাসাহেবের লেইগা, আর হারামজাদী কালনাগ আমার পুরুষেরে ইখানে আইস্যা ভোগ করে! একেবারে জানে খাইয়্যা ফেলামু না? আমার কলিজার উপুর ছোবল দিছস, তোরে আমি শকুন দিয়া খাওয়ামু।' গর্জে গর্জে উঠতে লাগল শঙ্খিনী। তার দু'টি চোখে পিঙ্গল আগুন জ্বলে জ্বলে উঠেছে।— 'জুলফিকার! কালনাগিনীরে বহরে লইয়্যা যা। উঃ, তোর মনে এত বিষ! ঢোড়াসাপ একেবারে শঙ্খনাগ হইয়া বসছ! বিষদাত জম্মের মতো কামাইয়া দিমু তোমার।'

অতিকায় একটা বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল জুলফিকার। বিশাল একখানা থাবায় পালঙ্ককে ছিনিয়ে নিল সে। সামনের লাটাবন চুরমার করে পালঙ্ককে শূন্যে তুলে মিলিয়ে গেল জুলফিকার। একপিণ্ড দলিত সবুজ ছত্রখান হয়ে পড়ে রইল লাটাবনে।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল রাজাসাহেব। জুলফিকারকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে পারে নি সে, পারলও না। দেহমন কেমন যেন বিবশ হয়ে গেছে তার।

একসময় শঙ্খিনীর দৃষ্টি থেকে খরিশের ফণা মুছে গেল। বুক থেকে উত্তাল ঢেউ সরে গেল। জাফরানী ঘাগরায়, রেশমি কাঁচুলিতে, দুরায়ত চোখে মদিরতা মাখিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল শঙ্খিনী। আশ্চর্য মধুর গলায় ডাকল সে, 'রাজাসাহেব—'

এতক্ষণে হতভম্ব ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে রাজাসাহেবের চেতনা থেকে। সে বলল, 'কী?'

'আইচ্ছা, আমার থিকা কি পালঙ্কী বেশি সোন্দর?'

'না।'

'তবে উরে তোর মন দিলি ক্যান? তুই আমার হ রাজাসাহেব।' আকুল আবেদনের মতো শোনাল শঙ্খিনীর গলা। রাজাসাহেবের নিশ্বাসের সীমানায় ঘন হয়ে এল সে।

'আমি তোর হইতে পারি, তুই তবে আমার হ। আমার লগে উই চরবেহুলায় চল।'

লাস্যময় দেহ কেমন পাণ্ডুর হয়ে এল শঙ্খিনীর। বিবর্ণ গলায় সে বলল, 'কিন্তুক এই বহর, বিষহরি—ইয়াগো যদি গুনাহ্‌ লাগে?'

রাজাসাহেব বলল, আশ্চর্য নিস্পৃহ দেখাল তাকে, 'তুই সোন্দর, তুই ভালো শঙ্খিনী।

কিন্তুক তুই বিষবাইদ্যানী, তুই তো ঘরের বউ হইতে পারবি না। এই বহবও ছাইড়্যা যাইতে পারবি না কুনোদিন। কি লো, পারবি?'

'কয়দিন ভাইব্যা লই।'

'তুই ঘরের বউ হইতে পারবি না। তা হইতে পারে পালঙ্ক। পালঙ্কেরে তুই আমারে দে শঙ্খিনী।' শঙ্খিনীর হাত দু'খানা নিজের মুঠিতে তুলে নিল রাজাসাহেব।

আচমকা খানিকটা বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন শঙ্খিনীর শিরায় শিরায়। প্রচণ্ড এক ঝটকায় রাজাসাহেবের মুঠি থেকে নিজের হাত দু'খানা ছিনিয়ে আনল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে লাটাবনের ওপর দিয়ে উধাও হল। আর বিমূঢ়ের মতো নাগমতী বেদেনীর পলায়নের বিজুরিরেখা দেখতে লাগল রাজাসাহেব।

আরো কয়েকটা দিন পার হল। শীতের সকাল রোদের তুলি টানল সোনাইবিবির বিলে। তারপর দুপুরে সেই রোদের তেজ বাড়ল। তারও পর বেলাশেষ পেরিয়ে পাণ্ডুর রাত্রি ঝরল। সকাল দুপুর বিকেলের পুনরভিনয় চলল এই ক'টা দিন।

সেদিন পিয়ালের ছায়াতল থেকে পালিয়ে এসে হাজারমণী নৌকোর পাটাতনে আছড়ে পড়েছিল শঙ্খিনী। সারা দেহ ফুলে ফুলে উঠেছিল, হৃৎপিণ্ডটা দুলে দুলে উঠেছিল, আর হু হু ধারায় দু'চোখে অবিরল ধারা নেমেছিল বিষকন্যার। একটা তীক্ষ্ণ পরাজয়ের অপমানে তার ফুসফুসটা যেন ফেটে শতফালা হয়ে যাবে, মনে হল। পালঙ্ক, উন্মনা ভুঁইচাঁপার মতো একটা মেয়ে। শালিক পাখি বলে তাকে সোহাগ করে শঙ্খিনী। সেই ভীরু চোখের শান্ত মেয়েই আজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী! তার একান্ত পুরুষের ওপর প্রখর থাবা বসিয়েছে। রাজাসাহেবের রক্তে রক্তে নীড়ের প্রেম আরো নিবিড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে, আরো গহন করে মিশিয়ে দিয়েছে গৃহী পৃথিবীর বিষ। এ বিষ তোলার মন্ত্র শঙ্খিনীর অজানা। এ সাপের ছোবল বিষকন্যাকেও বিষে জর জর করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ পর আরক্ত চোখে উঠে বসেছিল শঙ্খিনী। চোখ দু'টো তার অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে। জোরে জোরে শ্বাস টানছে সে। হ্যাঁ, জুলফিকারকে একটি ইঙ্গিত করলে, এই মুহূর্তে পালঙ্কের মুণ্ডুটা উপড়ে আনতে পারে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে পারাবতের মত লঘু দেহটা। দ্রোণফুলের পাপড়ির মতো এই সোনাইবিবির বিলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে পারে পালঙ্কের ছিন্ন শরীরের প্রতিটি অংশ। কিন্তু কিছুই করল না শঙ্খিনী।

প্রতিশোধ! অসহ্য জ্বালায় রক্তের প্রতিটি কণিকা প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। তিল তিল অত্যাচারে। আঘাতে আঘাতে পালঙ্ককে ক্ষয়িত করবে সে। ভুঁইচাঁপা মেয়ে জানে না কী নিষ্ঠুর দাবাগ্নির দিকে, কী নির্মম দুঃস্বপ্নের দিকে হাত বাড়িয়েছে সে। 'পান্‌হা ঘর'-এর পাশের একটা ডোরার মধ্যে পালঙ্ককে বন্দি করে রেখে দিল শঙ্খিনী।

শীতের রাত এখন আরো গভীর, আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। আকাশে ফুটে বেরিয়েছে সপ্তর্ষি। বাইরের পাটাতনে এসে তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল শঙ্খিনী, 'জুলফিকার!'

একটু পরেই কালপুরুষের আবির্ভাব হল। এক হাতের মুঠিতে বিশাল একটা লোহার শিক। সেটার এক মাথা টকটকে লাল। আগুনে পুড়িয়ে এনেছে জুলফিকার। তার আর-এক হাতে ভাতের সানকি। 'গর্‌-র্‌-র্‌-র্‌—' একটা প্রেতায়িত শব্দ তরঙ্গিত হয়ে উঠল আকাশতলে। তারপর 'পান্‌হা ঘর'-এর পাশের কামরার তালা খুলল শঙ্খিনী।

পাটাতনের ওপর একটা নিবু-নিবু কুপি জ্বলছে। তার পাশে ধনুকের মতো বেঁকে রয়েছে পালঙ্কের দেহটা। সে দেহ অনাবৃত, শীতার্ত।

শঙ্খিনী হিস হিস করে উঠল, 'এই কালনাগ, ওঠ—'

শীতের রাত্রি স্নায়ুতে স্নায়ুতে তন্দ্রা ছড়িয়ে দিয়েছিল পালঙ্কের। শঙ্খিনীর হিসহিসানিতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। তারপর অমানুষিক গলায় আকাশ-ফাটানো চিৎকার করে উঠল। কেননা পালঙ্ক ওঠার আগেই জুলফিকার তার কপালে জ্বলন্ত শিকটা দিয়ে একটা তিলক এঁকে দিয়েছে।

খল খল উদ্দাম হাসিতে ভেঙে পড়ল শঙ্খিনী, 'কী লো কালনাগ, আমার নাগরেরে আর কাইড়্যা নিবি! এই জনমেব লেইগা ওই ঘর, ওই সোয়ামী শিকায় তুইল্যা রাখ লো নটী মাগী।' হাসতে হাসতে পালঙ্কের কাছে অন্তরঙ্গ হয়ে বসে পড়ল শঙ্খিনী, 'তোর কপালে বৈষ্টমীগো লাখান সাতটা তিলক দিছি। কাইল একখান আরশি দিয়া যামু, দেখিস। কী লো, রাজাসাহেবের উপুর অখনও তোর টান আছে?'

'অখন ক্যান? সারা জনম থাকব। পিরিতের জোরে তো মনের মানুষরে ধইর‍্যা রাগতে পার না। আমার উপুর তার শোধ লও।' আশ্চর্য জলভরা চোখে তাকিয়ে রইল পালঙ্ক।

'ও, ত্যাজ অখনও আছে দেখি কালনাগের! আইচ্ছা, আর কয়দিন থাকে আমিও দেখুম। আমিও বিষ-বাইদ্যানী। আর বিষ, ছার বিষ, পার বিষ, বেবাক তুলনের মন্তর আমার জানা আছে।'

ভাতের সানকিটা পাটাতনের ওপর রেখে বাইরে বেরিয়ে এল জুলফিকার। তার পেছনে শঙ্খিনী। তালাটা বন্ধ করে আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল। সে কিছুতেই ধরতে পারছে না, কোন শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে এত তেজ সংগ্রহ করেছে পালঙ্ক! কণায় কণায় শক্তি আহরণ করে নিজেকে দুর্জয় করে তুলেছে!

দিনের শেষে সপ্তর্ষি-জাগা রাতে একবার আসে শঙ্খিনী আর জুলফিকার। এক সানকি ভাত, আর কপালের ওপর গনগনে শিকের একটি দহনরেখা এঁকে চলে যায়। আজকের মতো তার পর্ব শেষ হল।

নিজের নৌকায় আসতে আসতে একটা নিষিদ্ধ ভাবনায় মনটা ভরে গেল শঙ্খিনীর। যে নীড়ের প্রেরণা পালঙ্ককে কণায় কণায় উত্তাপ দিয়ে, শক্তি দিয়ে দুর্বার করে তুলছে, রাজাসাহেবের যে প্রেমের আশ্বাসে দুর্জয় হয়ে উঠেছে পালঙ্ক, সেই নীড়, সেই প্রেমের আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করলে কেমন হয়? কেমন হয় এই যাযাবর-বহর থেকে পালিয়ে গিয়ে রাজাসাহেবের স্নিগ্ধ কামনার হাত ধরে কোনো বনস্পতির নিভৃত ছায়ায় কল্যাণী বধূ সাজলে? মধুর একটি গৃহাঙ্গন রচনা করলে?

পরের দিন সকালে তিনটে লোক এল সোনাইবিবির বিলে। বাজিতপুরের বারুই মহাজন পাঠিয়েছে। তার বাড়ির উঠোনে কাল রাতে সাপে কেটেছে এক ভাগকৃষাণকে। এই মুহূর্তে হু-হু তুফানের মতো ছুটে যেতে হবে সেখানে। বিষহরির নির্দেশ, সাপে কাটার খবর এলেই তাদের ছুটতে হয়। কাঁধে বিষপাথর, মেটে সরার ডালা, আর মাথায় জড়িবুটির ঝাঁপি সাজিয়ে নিল শঙ্খিনী। ইরানি নৌকোর বাদামের মতো নানা রঙের একটা ঘাগরা দুলিয়ে দিল কোমর থেকে। তারপর 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে চলে এল। সঙ্গে যাবে ডহরবিবি।

'পান্‌হা ঘর'। এই ঘরের মধ্যে কোনো বেদে এমন কিছু করে না যা অপবিত্র। মনের সমস্ত অশুচিতা, সমস্ত কুশ্রী ভীষণতা চৌকাঠের ও-পাশে নির্বাসন দিয়ে এ ঘরে ঢোকে তারা, মনকে একাগ্র করে নেয়। শুচিস্নান করিয়ে নেয়।

সামনে শ্বেতপাথরের ফলকের ওপর বিষহরির মূর্তি। মাটি দিয়ে নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে বেবাজিয়ারা। সপ্তনাগের চূড়াচক্রে দেবীর অধিষ্ঠান। মাথার ওপর বরুণছত্র ধরেছে কালীয় নাগ। গজমোতি হয়েছে উদয়নাগ। মণিবন্ধে বলয় হয়েছে খৈজাতি। দেবীর সুডৌল বক্ষকুম্ভ কাঁচুলি হয়ে ঢেকেছে চক্রচূড় আর শঙ্খনাগ। তক্ষক আর লউডগা, খরিস আর কালজাতি বুনে বুনে ঘাগরা রচনা করা হয়েছে। কটিতট থেকে সেই ঘাগরা দুলিয়ে দিয়েছেন দেবী। আঙুলে আঙুলে অঙ্গুরি হয়েছে সুতোশঙ্খ। পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে মল হয়েছে দাঁড়াস। কর্ণভূষণ হয়ে দোদুল-দুল দুলছে সাদাচিতির ফণা।

সামনের ধূপাধার থেকে ধোঁয়ার রেখা উঠে এসে 'পান্‌হা ঘর'কে সুরভিত করে তুলেছে। একবার দেবীমূর্তির দিকে তাকাল শঙ্খিনী। সে মূর্তি ভীষণা, অহিভূষণা। মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল যাযাবরী। আটটি অঙ্গ নিবেদন করে প্রণাম করল সে। প্রসাদ চাই। নাগমতীর চোখে প্রার্থনা, একটু কৃপাকণা চাই। সাপে-কাটা রোগী দেখতে যাবে সে, দেবীর করুণা থাকলে লখিন্দরের মৃত্যুবিষও সে নামিয়ে দিতে পারে। তাই বাজিতপুর রওনা হবার আগে বিষহরির করুণা ভিক্ষা করতে এসেছে বিষবেদেনী। বিষহরির দৃষ্টিতে কী অপরূপ স্নিগ্ধতা!

হঠাৎ চমকে উঠল যাযাবরী। একটি ভয়াল ভাবনায়, একটি নিষিদ্ধ চিন্তায় সমস্ত স্নায়ুগুলো থরথর কেঁপে উঠল। রাজাসাহেব! পালঙ্ক! সে যখন জড়িবুটির ঝাঁপি নিয়ে গৃহস্থের বাড়ি যাবে সেই সময় যদি রাজাসাহেব বহরে আসে? মনের সমস্ত শুচিতার ওপর একখানা কালো পর্দা নেমে এল শঙ্খিনীর। শিউরে উঠল বেদেনী। একবার দেবীমূর্তির দিকে তাকাল সে। দেবীর দৃষ্টি থেকে একটু আগের প্রসন্নতা সরে গেছে। প্রতিটি অঙ্গ থেকে ক্রুদ্ধ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে চক্রচূড় শঙ্খনাগ তক্ষক খৈজাতি। প্রলয়ের গর্জন শুনতে পেল শঙ্খিনী। সে গর্জন তার কলুষিত মনকে শাসন করার জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চেতনাটা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসছে যাযাবরীর। রক্তের কণাগুলো ঝিমঝিম করছে। মূর্ছিত হয়ে লুটিয়েই পড়ত সে। বাইরে থেকে ডহরবিবির কণ্ঠ ভেসে এল, 'আম্মা, অনেক বেইল হইয়্যা গেল। তরাতরি কর।'

চোখ দু'টো বুজে 'পান্‌হা ঘর' থেকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে বেরিয়ে এল শঙ্খিনী। বিগ্রহের দিকে আর একবারও তাকতে পারে নি সে। তার মনে হল, বিষহরির মূর্তি থেকে উল্কার মতো ছুটে আসবে নাগিনীরা।

সারা শরীর বেয়ে ঘাম ছুটেছে শঙ্খিনীর। ফুসফুস ভরে জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগল সে। সমস্ত স্নায়ুগুলো আর্তনাদ করে উঠল তার। সে বাজিতপুর যাবে না। 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে এইমাত্র সে যে অপরাধ করে এসেছে তার প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্যন্ত মনসার কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার সেই তার।

বাজিতপুরের মানুষ তিনটি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চল বাইদানী, অনেকটা পথ যাইতে হইব।'

কী আশ্চর্য, মনের আর্তনাদ কণ্ঠ চিরে মুক্তি পেল না শঙ্খিনীর। বিষকন্যা সে। সাপে-কাটার খবর এলেই ছুটে যেতে হয় তাদের। এই পৃথিবীর সব জায়গায় মনসার আটন। তার সর্বত্রগামী দৃষ্টি থেকে মুক্তি নেই। যেতেই হয় তাদের। নইলে সমস্ত গুণ, সমস্ত মন্ত্র নিষ্ফল হয়ে যাবে। বিষহরির ক্রোধ এসে পড়বে। ময়াল সাপের মতো বাজিতপুর তাকে আকর্ষণ করছে। আর 'পান্‌হা ঘর' পেছন থেকে ক্রুদ্ধ তর্জনী তুলে শাসন করছে। আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠল শঙ্খিনী।

একসময় সম্মোহিতের মতো লোক তিনটির সঙ্গে এগিয়ে চলল শঙ্খিনী। তার পাশে ডহরবিবি।

লাটাবন পেরিয়ে, শরজঙ্গল উজিয়ে, বেতঝোপ পাশে ফেলে সেই পিয়ালের ছায়াতলে একটা প্রেতলোকে এসে পড়ল যেন শঙ্খিনী। অনেক দিন পর আবার রাজাসাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হল হঠাৎ। পথ চলতে চলতে মনটাকে একাগ্র করার, পবিত্র করাব প্রতিজ্ঞা ছিল যাযাবরীব। রাজাসাহেব সে মনটাকে আবার দিশেহারা করে দিয়েছে। পিয়ালের ছায়াতলে একটি দুর্ঘটনা দাঁড়িয়ে আছে। সে দুর্ঘটনাব নাম রাজাসাহেব। সেই মুহূর্তে রাজাসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবে নি সে।

রাজাসাহেব বলল, 'অনেক দিন পালঙ্কেরে দেখি না শঙ্খিনী, উ গেল কুনখানে?'

যে চিন্তাটাকে প্রবল পেষণে ধ্বংস করতে চেয়েছিল শঙ্খিনী, রন্ধ্রমুখ পেয়ে দুর্বার বেগে সেটা বেরিয়ে এল। মশালের শিখা এসে চেতনাকে ছুঁয়ে গেল। গর্জে উঠল শঙ্খিনী, 'পালঙ্কী কবরে গেছে। শোন বাজাসাহেব, এই বিলে তোরা আর থাকতে পারবি না। দুই দল একলগে থাকন যায় না। আমি বাজিতপুর যাইতে আছি। আইস্যা যেন দেখি, তোরা চইল্যা গেছস।' রাজাসাহেবের নির্বাক দৃষ্টির সামনে থেকে হন হন পা চালিয়ে চলে গেল শঙ্খিনী। মনের মধ্যে নিষ্ঠুর একটা প্রশ্ন, নির্মম একটা জ্বালা নিয়ে গেল সে। সত্যিই কী সে চায় সোনাইবিবির বিল থেকে রাজাসাহেব তার বহর নিয়ে অন্য কোনো দিগন্তে উধাও হোক? চলে যাক তার দৃষ্টির বাইরে তার কামনা থেকে অনেক দূরে কোনো অধরা নিরুদ্দেশে? তবে সেদিন তাকে সে এখানেই 'পাবা' গাঁথার প্রার্থনা জানিয়েছিল কেন? কেন?

দু'দিন পর বাজিতপুর থেকে ফিরে এল শঙ্খিনী। শরীরে অসহ্য উত্তাপ, রক্তলাল চোখ, এলোমেলো চুল। ঘাগরা আর কাঁচুলি শিথিল। অলৌকিক কিছু যেন শঙ্খিনীর দেহমনে ভর করেছে। কোনো দিকে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তার। উদ্‌ভ্রান্তের মতো 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে চলে এল সে। তারপর বিষহরির বিগ্রহের সামনে নিজের দেহটিকে ছুড়ে দিল।

দুপুরের আকাশে আকাশে অভ্ররঙের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। বেবাজিয়ারা সোনাইবিবির বিলে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। একসময় সকলে ভীরু ভীরু পায়ে 'পান্‌হা ঘর'-এর সামনে এসে জড়ো হল। সকলের দৃষ্টি শঙ্কায় ভরে গেছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একই নিরুপায় জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করতে লাগল বেবাজিয়ারা। শুধু বিলের পারে একটা শিলামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল ডহরবিবি। শঙ্খিনীর সঙ্গে বাজিতপুরে গিয়েছিল সে। খানিকটা পর বেদেরা 'পান্‌হা ঘর'-এর দরজা থেকে সরে এল। তারপর ডহরবিবির চারপাশে বৃত্তের মতো নিবিড় হয়ে দাঁড়াল। অজানা এক আতঙ্কে হাসিখুশি বেদেরা একেবারেই নিবে গিয়েছে।

মহব্বতের ভয়াতুর কণ্ঠটা ফিসফিস শোনাল, 'কি লো ডহর, তুই তো গেছিলি উর লগে বাজিতপুর। ব্যাপারখান কী? কিছুই তো বুঝতে পারি না।'

চনমনে দৃষ্টিটা একবার 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে ছড়িয়ে দিল ডহরবিবি। দুর্বোধ্য রহস্যের মতো থর থর করে কাঁপছে শঙ্খিনী। পিঙ্গল দু'টি চোখের মণি থেকে ক্ষরিত হচ্ছে লবণাক্ত অশ্রুর বন্যা। সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে এনেছে সে। উচ্ছ্বসিত কান্না দিয়ে নিজেকে শোধন করছে নাগকন্যা, প্রায়শ্চিত্ত করছে।

ডহরবিবি বলল, 'বিষহরির গুনাহ্ লাগছে উর। কাটা-ঘা'র রুগী ঝাড়তে বইস্যা কী জানি খালি ভাবতে লাগল। মন্তর আইল না মুখে। সাপে-কাটা মানুষটা নীলবন্ন হইয়্যা মইর‍্যা গেল। চোখের সামনে মানুষটা মরল আর উ বইস্যা বইস্যা দেখল। এতটুকু ঝাড়ফুক করল না। একেবারে বোবা হইয়া গেল যান।' শঙ্কিত দৃষ্টিটা সকলের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে গেল ডহরবিবি। অবর্ণনীয় ভয়ে বেবাজিয়াদের মুখচোখ পাণ্ডুর হয়ে গেছে। মনে হল, চোখের

তারাগুলো ছিটকে বেরিয়ে আসবে তাদের। ডহরবিবি আবারও বলল, 'কাইল রাইতে উ বিষহরির খোয়াব দেখছে। তারপর বাকি রাইতটুক দাপাদাপি করছে আর কানছে। বিহানে উইঠ্যা দেখি, উর গা আগুনের লাখান। চৌখ লাল। মাতালের লাখান দৌড়াইতে দৌড়াইতে উ আইস্যা পড়ল এইখানে। আমিও আইলাম পিছে পিছে।'

দুপুর থেকে সন্ধ্যা। এই সময়টা বিষহরির বিগ্রহের সামনে নিথর পড়ে রইল শঙ্খিনী। তার দেহে এতটুকু স্পন্দন নেই। তার শরীরে জীবনের চিহ্ন অনুপস্থিত।

সন্ধ্যা পেরিয়ে আকাশ থেকে রাত্রি নামল সোনাইবিবির বিলে। এতক্ষণে উঠে বসল শঙ্খিনী। দৃষ্টি থেকে ঘোর ঘোর ভাবটা সরে গেছে। সারা দেহ থেকে অলৌকিক সত্তাটা মুছে গেছে। শ্রান্ত দেহটি গোছগাছ করল সে। মন এখন নিরাসক্ত হয়ে গেছে। রাজাসাহেব নামে একটি মরীচিকার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে ব্রতচ্যুত হয়েছিল বিষবেদেনী। এই মাত্র তার প্রায়শ্চিত্ত হল। কড়ায় ক্রান্তিতে বিষহরি তার মূল্য আদায় করে নিয়েছে নাগমতীর দেহ-মন থেকে। সাপে-কাটা মানুষ সামনে ফেলে দিয়ে তার ঠোঁট থেকে সমস্ত মন্ত্র শুষে নিয়েছিল। ধ্রুবতারার মতো একটি অকলুষ কর্তব্যে সজাগ করে দিয়েছে বিষবেদেনীর মন। রাজাসাহেব নামে একটি দুর্বিপাক ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর এক প্রহর পার হয়েছে। শীতাতুর রাতকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শিয়ালের হল্লা শুরু হল শরবনে। 'পান্‌হা ঘর'-এর পাটাতনে এসে বসেছে ময়না, ডহরবিবি আর আতরজান। মাঝখানে বিজুরিরেখার মতো বিবসনা শঙ্খিনী। সারা দেহ থেকে ঘাগরা খুলেছে, কাঁচুলি সরিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি অঙ্গভূষণ স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে দরজার সামনে। দু'হাতে বিশাল ধূপাধার নিয়ে উঠে দাঁড়াল শঙ্খিনী। আরতি শুরু হল। এই আরতি দিয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট করতে হবে। নীড় বাঁধার শেষতম রিপুকে, রাজাসাহেব নামে একটি তীব্র প্রলোভনকে দেহ-মনের কামনা থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এই আরতি, বরাঙ্গী বেদেনীর এই বিবসনা নাচ বেদে-সমাজের চলিত প্রথা। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় 'পান্‌হা ঘর' ভরে গেল। তৃতীয় প্রহরের শেষে নাচ থামল। মূর্ছিতের মতো বিগ্রহের সামনে আছড়ে পড়ল শঙ্খিনী। মাটির ধূপাধার ভেঙে শতখান হল। রাশি রাশি জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়িয়ে পড়ল যাযাবরীর অনাবরণ দেহে।

মনটা এখন অপরূপ প্রশান্তিতে ভরে আছে শঙ্খিনীর। এ ক'দিনের প্রায়শ্চিত্তে আবার বিষহরির কৃপা ফিরে পেয়েছে সে। শীতের হিম-ভরা সকালে যাযাবরী প্রসন্ন মনে গুন গুন করে উঠল :

'তাহার দোয়ায় সূর্য্যু ওঠে পুবের আকাশে,
পরান পাইয়্যা ভেলায় বইস্যা লখাই হাসে,
হায়, বিষহরির দোয়া!'

রক্তপলাশ সকাল একসময় সোনালি হল। শিশু দিন এখন কিশোর। সামনের লাটাবন দলিত করে এল রাজাসাহেব। খালের জলে স্নান সেরে রাশি রাশি মেঘের মতো চুল রোদের দিকে ছড়িয়ে বসে ছিল শঙ্খিনী। রাজাসাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হল। রক্তটা সহসা কেমন যেন ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল তার। মাত্র একটা অসতর্ক মুহূর্ত, তার পরেই আশ্চর্য সংযমে নিজেকে নিস্পৃহ করে নিল।

রাজাসাহেব সামনে এসে দাঁড়াল, 'আমরা চইল্যাই যাইতাম শঙ্খিনী। খালি এট্টা কথার লাইগ্যা রইয়্যা গেলাম। আমার কথাখান শুনবি?'

'তোর কথা আমি জানি। পালঙ্কীরে চাস তো?'

'হ। তুই আমারে পালঙ্কেরে দে। আমি তোরে ঠিক ঠিক দাম দিমু। আমার বহরটাই তোরে দিমু।'

'দাম দিতে হইব না। পালঙ্কীরে নিয়া তুই আমারে বাচা। পালঙ্কী থাকলেও তোর কথা মনে পড়ব। তোব কথা মনে পড়লে বিষহরির গোসা আইস্যা পড়ব আমাব উপুর। তুই শাদি কর উরে। তারপব কুনোখানে যাইস গিয়া। আর আমার সামনে আসিস না।' আশ্চর্য নির্লিপ্ত শোনাল শঙ্খিনীব কণ্ঠ।

'সাচা কইস? আমার গা ছুঁইয়্যা ক দেখি!' বিস্ময়ে, উত্তেজনায় আবো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল রাজাসাহেব।

'যা যা, দুরে সর। তোর গায়ে বড় ঘরের গোন্ধ। বড় গুনাহ্। বিষবাইদ্যানী মিছা কয় না। যা কইলাম, তাই হইব। পরশু দিন তুগো শাদি। আমি তুগো সাদি দিমু।'

কিছুক্ষণ শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে রইল রাজাসাহেব। এই ক'দিনের মধ্যে একটা জন্মান্তর ঘটে গেছে নাকি যাযাবরীর! সমস্ত কামনাকে, যৌবনের একান্ত প্রত্যাশাকে কোথায় নির্বাসন দিল শঙ্খিনী? মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তার পরেই হালকা একটা পাখির মতো উড়তে উড়তে লাটাবনের আড়ালে মিলিয়ে গেল রাজাসাহেব।

আর পাটাতনের ওপর বসে ফুসফুসটা যেন স্তব্ধ হয়ে যেতে চাইল শঙ্খিনীর। কিন্তু না, বুকের মধ্যে যে উত্তাল সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে তাকে এতটুকু প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। তা হলে বিষহরির ক্রোধ সহস্রফণা দাবাগ্নির মতো তাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। শিউরে উঠল নাগকন্যা।

'পান্হা ঘর'-এর দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে শঙ্খিনী। বিলের পারে মাটি কেটে ছোট পুকুর বানিয়েছিল বেবাজিয়ারা। পুকুরের দু' পাশে রাজাসাহেব আর পালঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে একখানা মুগার চাদর ঝুলিয়ে দিয়েছে হোমরা বেদে। তাদের চারিদিকে বৃত্তের আকারে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই বহরের অজস্র যাযাবর আর নাগকন্যারা।

লাল টকটকে ঘাঘরা পরেছে পালঙ্ক। কপালে রক্তচন্দনের আলপনা। গলায় শ্বেতপদ্মের মালা। আর সারা দেহে ঝলমল করছে অপরূপ খুশির গয়না। রেশমি লুঙ্গি পরেছে রাজাসাহেব। কাঁধের সীমানায় নেমে-আসা থরে থরে চুলগুলো গুছিয়ে গুঁজে দিয়েছে ধনেশপাখির পালক। আজ রাজাসাহেব আর পালঙ্কের শাদি। বেলাশেষের আলো এক রঙিন স্বপ্ন আঁকছে দু'জনের মুখের উপর।

দেখতে দেখতে চোখ দু'টো জ্বালা করে উঠল শঙ্খিনীর। প্রচণ্ড শব্দ করে জানালার পাল্লা দু'টো বন্ধ করে দিল সে। বিলের পারে ওই ছবি তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা বিপর্যয়ের মতো ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে।

ভাতারমারীর বিল থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে হোমরা বেদেকে। হোমরা বেদে বেবাজিয়াদের শাদিতে পুরোহিত। বেদে আর বেদেনীর মধ্যে সেতুবন্ধ। তার চুলের রং ধূসর, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। তার কোমরে ধনুক, খসখসে দেহ থেকে খই উড়ছে। হোমরা বলল, 'শা'নজর (শুভদৃষ্টি) হইব এইবার। দুল্হা রাজি। দুল্হন রাজি?'

মাথা দুলিয়ে স্বীকৃতি জানাল রাজাসাহেব আর পালঙ্ক। মুগার চাদরখানা চকিতে তুলে নিল হোমরা। আর ছোট পুকুরের বুকে ঝকঝকে জলের আয়নায় শুভদৃষ্টি হল দু'টি মুগ্ধ মানব-মানবীর।

'শাদি শ্যাষ হইল।' ঘোষণা করল হোমরা বেদে।

সোনাইবিবির বিলকে মুখরিত করে, শীতের বেলাশেষকে মধুর করে কলধ্বনি উঠল বেবাজিয়াদের। আর সেই আনন্দিত কলরব বিস্ফোরণের মতো 'পান্‌হা ঘর'-এর মধ্যে ফেটে পড়ল। কানের ওপর হাত চাপা দিল শঙ্খিনী। বিষহরির মুখের দিকে তাকাল সে। আশ্রয় খুঁজল, নির্ভরতা খুঁজল।

বিলের পারে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে উৎসব শুরু হয়েছে বেবাজিয়াদের। গণ্ডা গণ্ডা মদের বোতল শূন্য হয়ে পড়ে আছে চারপাশে। উত্তাল হয়ে উঠছে ঢোলকের বাজনা। মাতাল হয়ে উঠছে বাঁশির সুর। গুরু গুরু দুলে উঠছে সোনাইবিবির বিলের হৃৎপিণ্ড।

বিশাল একখানা ঘাসি নৌকোয় এসে বসেছে রাজাসাহেব আর পালঙ্ক। তাদের চারপাশে ঘন হয়ে বসেছে বেদেনীরা। নানা রঙের ঘাঘরা আর কাঁচুলি, ছুরির মতো ঝকমকে হাসি, বিদ্যুৎচমকের মতো কটাক্ষ একটা রঙিন অলৌকিক স্বপ্ন ঘনিয়ে এনেছে।

'পান্‌হা ঘর' থেকে একসময় শঙ্খিনী এল। মোহময়ী পালঙ্ক! রাজাসাহেবকে যেন চিনতে পারা যাচ্ছে না। হেরিকেনের রহস্যময় আলোতে, অগুনতি নাগকন্যার মধ্যবিন্দুতে একটি হীরকপদ্ম হয়ে জ্বলছে সে। এই রাজাসাহেবকে কোনোদিন দেখে নি শঙ্খিনী। এ রাজাসাহেব যেন অসত্য, অবাস্তব। অপলকে তাকিয়ে রইল নাগমতী বেদের মেয়ে।

রক্তে রক্তে কী এক নিষিদ্ধ কামনা আবার কথা কয়ে উঠল। জলের লেখার মতো চেতনা থেকে মুছে গেল বিষহরির শাসন। ফিসফিস গলায় সে ডাকল, 'পালঙ্কী, শোন। ইট্টু বাইরে আয়।'

বিলের পারে এসে দাঁড়াল শঙ্খিনী আর পালঙ্ক। শঙ্খিনীর নিশ্বাস দ্রুতলয়ে পড়ছে। চোখ দু'টো দু টুকরো মণির মতো জ্বলছে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে সরীসৃপ চলে বেড়াচ্ছে তার। ভয়াতুর গলায় পালঙ্ক বলল, 'কী কইবা আম্মা?'

'তোরে আমি বেবাক দিমু। এই বহর, সোনাদানা বেবাক। তুই আমারে রাজাসাহেবেরে দে।'

আর্তনাদ করে উঠল পালঙ্ক, 'না না, উ আমি পারুম না।' ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘাসি নৌকার দিকে পালিয়ে গেল সে।

'আইচ্ছা, কেমনে তুই আমার পুরুষেরে ভোগ করস, দেখুম।' সমস্ত দেহটা দাবানলের মতো জ্বলতে লাগল শঙ্খিনীর। কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই লাটাবনের ঘন অরণ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হল শঙ্খিনী। এখনই তার প্রয়োজন, তার একান্ত প্রয়োজন একটা—

জলবাংলায় বেদেদের মধ্যে একটি রীতি আছে। বাসরশয্যায় যাবার আগে দুল্‌হা আর দুল্‌হন সাপের মালাবদল করে। নাগিনীর সাক্ষ্যে তাদের বাসর সিদ্ধ হয়।

রাজাসাহেব আর পালঙ্কের চারপাশ থেকে নাগকন্যারা মৌমাছির মতো চাক ভেঙে উঠে পড়েছে। রাতের পরমায়ু এখন দু প্রহর। ডহরবিবি বলল, 'থাক লো রাইক্ষসী, তোর পুরুষ লইয়্যা। দেখিস পয়লা রাইতেই একেবারে গিল্যা ফেলিস না।'

খরধার হাসির রোল উঠল বিল কাঁপিয়ে।

আতরজান বলল, 'সাপের ঝাপি কই লো, মালাবদলটা কইর‍্যা দিয়া যাই।'

'এই যে আমি লইয়্যা আইছি।' বাইরে থেকে ঘাসি নৌকার পাটাতনে চলে এল শঙ্খিনী। তার দু কাঁখে দু'টি সাপের ঝাঁপি। তার দু'চোখের মণি দু'টো শিখা হয়ে জ্বলছে। তার হাসিতে তীব্র এক নিষ্ঠুরতা।

ইতিমধ্যে নাগকন্যাদের হাসি থেমেছে। শঙ্খিনী আরো একটু এগিয়ে এল। রাজাসাহেবের হাতে একটি ঝাঁপি আর অন্যটা পালঙ্কের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'নে রাজাসাহেব, নে লো শালিকপঙ্খী, মালাবদল কর।'

সন্দিগ্ধ চোখে শঙ্খিনীর দিকে একবাব তাকাল পালঙ্ক। তারপর দু'জনেই ঝাঁপি টেনে নিল। রাজাসাহেব আর পালঙ্ক।

রাজাসাহেব ঝাঁপির ঢাকনা সরাবার সঙ্গে সঙ্গে উল্কার মতো একটা কালচিতির ফণা বেরিয়ে এল। পলকপাতের মধ্যে রাজাসাহেবের কপালে সেই ফণাটা চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল। তারপর পাটাতনে নেমে নৌকোর জানালা দিয়ে বাইরের বিলে অদৃশ্য হল।

'উঃ, এ কী করলি শঙ্খিনী!' মাতালের মতো টলতে টলতে পড়ে গেল রাজাসাহেব। কপালের ওপর চুনির মতো দু'টি রক্তবিন্দু ফুটে বেরিয়েছে তার। শিরায় শিরায় মৃত্যুহিম বইতে শুরু করেছে। একসময় হেরিকেনের আলোয় রাজাসাহেবের দেহটা নীল হয়ে আসতে লাগল।

স্তব্ধ হয়ে গেছে বেদেনীরা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পালঙ্ক।

তীব্র তীক্ষ্ণ হাসিতে বিশাল নৌকোটাকে শিউরে তুলল শঙ্খিনী, 'কি লো শালিকপঙ্খী, আমার পুরুষেরে না ভোগ কবতে চাইছিলি? নে, ভোগ কর! হি—হি—হি—

তাবপরেই আর্তনাদ করে রাজাসাহেবের বুকে আছড়ে পড়ল শঙ্খিনী। তার শরীর ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। শঙ্খিনীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সাবা বিল কেঁপে ওঠে, 'এই আমি কী করলাম রাজাসাহেব! কী করলাম!'

শঙ্খিনী ভাবল, কালচিতির বিষ তো এত তাড়াতাড়ি ক্রিয়া করে না। তবে, এইমাত্র সোনাইবিবির বিল থেকে যে কালচিতিটাকে সে ধরে এনেছিল তার জিভের নিচে এমন ভয়াল মৃত্যু কোথায় লুকিয়ে ছিল? তবে কি নিজের দেহমনেব যে জ্বালা বিষ হয়ে উঠেছিল, সেটাই সে সাপটার দাঁতে গুঁজে দিয়েছিল? না, কালচিতির ফণা হয়ে সে-ই ছোবল দিয়েছে রাজাসাহেবকে? ভাবতে ভাবতে নিথব হয়ে গেল নাগমতী বেদের মেয়ে।

চোর

আবীর-গোলা বিকেলটা রক্তকমলের মতো ফুটে উঠেই আবার ঝরে পড়েছে। দিগন্তবিসারী আকাশের কোণে এক টুকরো নিরীহ মেঘ উঁকি দিয়েছিল। তারপর কখন একসময় দূরের গাছগাছালির অস্পষ্ট রেখার মাথায় সন্ধে নেমে এসেছিল ধীরে পায়ে।

মেঘনার আকাশে এক টুকরো মেঘ। দেখতে দেখতে সেই মেঘের টুকরোটা সাপের চোখের মণির মতো হিংস্র ক্রূরতায় ছেয়ে ফেলে চারিদিক। উথলপাথল জল হঠাৎ খেপে উঠতে থাকে। যতদূর চোখ যায়, উলটোপালটা ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি। মেঘনার ঢেউ ফুঁড়ে ফুঁড়ে বাতাস উঠে আসছে হু হু করে, উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে মেঘনাপাড়ের হিজল আর বউন্যার জঙ্গলে, কৃষাণ গ্রামের একচালা দোচালা ঘরগুলোর ঝুঁটি ধরে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে।

একসময় ঝড়ের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

কালি-ঢালা নিঃসীম অন্ধকারে একটা দোচালা ঘরের ভেতর বয়রা বাঁশের মাচায় ক্লান্ত শরীর ঢেলে শুয়ে ছিল আকলিমা। রজিবুল ঘরে নেই, সেই দুপুরে উত্তরপাড়ায় গেছে কিতাব্দী শেখের মেয়ের শাদির দেনমোহর পাকা করতে। এ বাবদে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। এ অঞ্চলের মক্তবে কী সব করে সে। তা ছাড়া শাদি-টাদির ব্যাপারে সব বাড়িতেই তার ডাক পড়ে। তাকে বাদ দিয়ে এখানে বিয়ে শাদির কথা ভাবা যায় না। সে যা সাব্যস্ত করে দেবে, মেয়ে এবং ছেলে দুই পক্ষই তা মেনে নেয়। এই কারণে সে ভালো রকমের মজুরি নিয়ে থাকে।

মেঘনার বেপরোয়া বাতাসের দাপাদাপি আর প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে ঘরের আড়া মচ মচ করে ওঠে। মনে হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল। মেঘের ডাক, আকাশটাকে চিরে আড়াআড়ি বিদ্যুতের চমক আর ঘন ঘন বাজের গজরানিতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় আকলিমার। দারুণ ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে সে। বাখারির জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় বাইরের গাঢ় অন্ধকারে। পৃথিবী এখানে নিরাবরণ, আকাশ চিহ্নহীন দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো। কিন্তু এই অনাবৃত আকাশের নিচে এমন বৃষ্টিঝরা রাতগুলো বড়ই দুঃসহ আর ভয়াবহ মনে হয় আকলিমার। সে জানে আজও বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে গেছে রজিবুল। এটা অনিবার্য নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কোথাও বেরুলেই আকলিমাকে ঘরে রেখে তালা লাগিয়ে যায় সে।

আকলিমা জানে, এতদিন ঘর করার পরও তাকে আদৌ বিশ্বাস করে না রজিবুল চৌধুরী।

একসময় পশ্চিমের আকাশ পুরোপুরি ফেঁড়ে দিয়ে নতুন করে বিদ্যুৎ চমকায়। ওধারের মাঠে তালগাছের মাথা ঝলসে দিয়ে বাজ পড়ে। অন্ধকারে ঝড়ের ঝাপটায় ডানাভাঙা পাখিদের মরণ-চিৎকার ভেসে আসে।

এমন বৃষ্টি-ঝরা রাতগুলোকে একদিন কী ভালো যে লাগত আকলিমার! নারকেল আর হিজল বনের ফাঁক দিয়ে বয়ে-যাওয়া বাতাসকে গানের সুরের মতো মোহময় মনে হত। এমন সব রাতে একা থাকলে স্মৃতিতে অন্য এক জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। মনে হয় সেটা যেন পূর্ব জন্মের কথা। সঙ্গে সঙ্গে এভাবে এই বন্দি হয়ে থাকা জীবনটাকে অসহ্য লাগে।

আকলিমা জানে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ডাকাত পড়ার মতো আবির্ভাব ঘটবে রজিবুলের। তার শরীর ডলে পিষে ধামসে চুরমার করে দিতে থাকবে লোকটা। রজিবুলের কথা ভাবতেই বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায় আকলিমার। এই কুৎসিত জীবন থেকে কত বার যে সে পালিয়ে যেতে চেয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু মুক্তির কোনো সম্ভাবনা তার বহুদূর কল্পনাতেও ফুটে ওঠে না।

বাইরে সিসার লক্ষ কোটি ফলার মতো একটানা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আকলিমা ফিরে যায় তার আঠারো বছরের যৌবনে, যখন প্রথম পুরুষের ভালোবাসার উষ্ণ স্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু ভাবনাটা বেশি দূর এগোয় না। হঠাৎ জানালার পাশ থেকে একনাগাড়ে অস্বস্তিকর একটা শব্দ হতে থাকে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝমঝমানি ছাপিয়ে মাটির চাঙড় খস'র শব্দ। আকলিমা চমকে ওঠে। স্নায়ুগুলো টান টান করে শব্দটা কোত্থেকে আসছে বুঝতে চেষ্টা করে। প্রথমে মনে হয়, কোনো বুনো খটাশ কিংবা শিয়াল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ঘরের ভেতর নিরাপদ আশ্রয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। কিন্তু একটু পরেই পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায়। তার কান এই আওয়াজের মধ্যে অনিবার্য একটা আভাস পেয়েছে। আসলে ঘরের ভিতে সিঁধকাঠি চলছে।

ভয়ে অসাড় হয়ে বসে থাকে আকলিমা।

গ্রামের শেষ মাথায় আকলিমাদের এই পলকা দোচালা ঘর, তার পর একটা ভাঙা মসজিদ পেরিয়ে ভাতারমারী খাল। খাল পেরিয়ে বেশ খানিকটা গেলে গ্রামের অন্য সব বাড়িঘর। এখান

থেকে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচালেও এই দুর্যোগের রাতে যখন মেঘের ডাকে, বাজের গজরানিতে আর প্রবল বর্ষণে সমস্ত চরাচরকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে, সেই সময় তার চিৎকার গ্রামের কেউ শুনতে পাবে না। অপবিসীম আতঙ্কে তার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসতে থাকে।

একসময় ঘরের বাঁশেব খুঁটিতে ঠক করে সিঁধকাঠির ঘা শোনা গেল। এবার মনস্থির করে ফেলে আকলিমা। এভাবে সিঁটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ক'দিন আগে রজিবুল তাকে এক ছড়া রুপোর হার, চার গাছা রুপোর চুড়ি আর সোনার কানফুল কিনে এনে দিয়েছিল। সেগুলো গায়েই রয়েছে। তবু একবার অন্ধকারে হাত বুলিয়ে গয়নাগুলো ছুঁয়ে নেয় আকলিমা।

পদ্মা মেঘনার দেশেব মেয়ে সে। শানানো সড়কি হাতে কত বার সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিংস্র ভাম কিংবা লাঠি নিয়ে জাতি সাপের ওপর। একবার ছেন্ দা দিয়ে সন্ধের অন্ধকারে একটা বদ লোকের হাত কাঁধ থেকে এক কোপে নামিয়ে দিয়েছিল। যার এত সাহস, আজ কেন তার এত ভয়, এমন আতঙ্ক?

এই দোচালা ঘরের আড়াতেই রয়েছে একটা মারাত্মক বল্লম, সাপের জিভের মতো লিকলিকে হিংস্র সেটার আধ হাত লম্বা ফলা। বল্লমটা নামিয়ে এনে যে সিঁধ কাটছে সে মাথা তুললেই তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে। কিন্তু কিছুই করে না আকলিমা। কয়েক বছর আগের স্মৃতিই কি তাকে দুর্বল করে ফেলেছে?

গাঢ় অন্ধকারেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাঁশের মাচার পাশ দিয়ে একটা লোক কবর ফুঁড়ে যেন জিনের মতো মাথা তুলল। আর তখনই প্রবল ধাক্কায় তার স্নায়ু থেকে আতঙ্ক ঝরে যায়। লাফিয়ে উঠে আড়া থেকে বল্লমটা টেনে বার করার আগেই সিঁধ কাটা গর্তের ভেতর থেকে শিকারি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে, মসৃণ পায়ে ঘরের মধ্যে চলে আসে লোকটা।

নিজের মধ্যে আকস্মিকভাবে কী ঘটে যায়, বুঝতে পারে না আকলিমা। এখন আর উঠে দাঁড়িয়ে দূরে চালার বাতা থেকে বল্লমটা পেড়ে আনার সময় নেই। আচমকা লোকটাব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরে আকলিমা, তারপর প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে, 'চোর— চোর— চোর—'

আকলিমার নির্মম জাপটানোর মধ্যে চমকে ওঠে লোকটা। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে সিঁধ কাঠি নিয়ে বেরুবার সময় কে ভাবতে পেরেছিল তাব জন্য এমন একটা দুর্ঘটনা ওত পেতে রয়েছে! তার ধারণা ছিল, পৃথিবী যখন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে তখন এই গ্রহের কেউ আর জেগে নেই, আর সেই সুযোগে সে তার কাজ গুছিয়ে নিশ্চিন্তে সরে পড়তে পাববে কিন্তু তার সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যায়।

হাতের সিঁধকাঠিটা তুলে আকলিমার মাথায় বসিয়ে দিতে পারত লোকটা কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। হঠাৎ তার মনে হয়, যে মেয়েমানুষটা তাকে জড়িয়ে ধরেছে তার স্পর্শ এবং আলিঙ্গন বড়ই চেনা।

এদিকে আকলিমাও সেই একই কথা ভাবছিল। তবু সে টের পায় লোকটার বৃষ্টিভেজা শরীর থেকে গরম ভাপ উঠে আসছে। তার কঠোর বেষ্টনীর মধ্যে থর থর কাঁপছে লোকটা। নিশ্চয়ই তার জ্বর হয়েছে।

হঠাৎ অন্ধকারে লোকটা তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'বউ, তুই!' তার কণ্ঠস্বরে জগতের সবটুকু বিস্ময় যেন মাখানো।

'কে তুমি!' আকলিমার স্বরও কেঁপে ওঠে। পরক্ষণে তার দুই হাত আলগা হয়ে লোকটার গা থেকে খসে পড়ে।

'আমি খলিল।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে আকলিমা। তারপর বলে, 'তুমি এইখানে!'

গোঙানির মতো আওয়াজ করে খলিল বলতে থাকে, 'কী করুম, তিন দিন প্যাটে ভাত নাই। চুকা (টক) কাউ ফল খাইয়া আছি। আইজ খিদার জ্বালায় ঠিক করলাম চুরি করুম। যেমুন কইরা পারি প্যাট ভইরা খাইতেই হইব। ডাকাইতা পাড়ার রহমতের কাছ থিকা সিদকাঠিখান চাইয়া আইনা ম্যাঘনা পাড়ি দিয়া এই পারে আইলাম। তর (তোর) ঘরেই যে সিদ দিছি, ভাবতেও পারি নাই। তাজ্জবের ব্যাপার।'

'তুমার তো সাই জ্বর আইছে। গাও বেজায় গরম, ধান দিলে অখনই খই ফুটব।'

অন্ধকারে করুণ হাসে খলিল। বলে, 'হ, জ্বর আইছে। প্যাটে ভাত পড়লে জ্বর ছুইটা যাইব গিয়া।' তার হাসির শব্দ আর্তনাদেরর মতো শোনায়।

দোচালা ঘরখানায় বৃষ্টির ঝমঝমানির মধ্যে বিষাদ ঘন হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একেবারে বেসুরো গলায় আকলিমা বলে, 'অখন চৌকিদার ডাইকা যদিন তুমারে ধরাইয়া দেই?'

খলিল কিন্তু আদৌ ভয় পায় না। আগের মতোই ম্লান হেসে বলতে থাকে, 'ভালোই তো, চৌকিদারের কিল আর গুতা পিঠে খাওনের পর প্যাটে তো এক সানকি ভাত পড়ব। কিন্তুক মুশকিল তো অগো লেইগা (জন্য)।'

'কাগো লেইগা?'

খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে খলিল। আকলিমার প্রশ্নটা সে সাবধানে এড়িয়ে যায়, 'না না, ও কিছু না।'

খলিলের কথাগুলো বুঝিবা শুনতে পায় না আকলিমা। বৃষ্টিপাতের একটানা আওয়াজ যেন এই পৃথিবী থেকে একেবারেই মুছে যায়। নিরাকার হয়ে যায় এই দোচালা ঘর, মামুদপুর গাঁ এবং দুর্যোগের এই রাত। কোনো এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তার মন উধাও হয়ে যায় মেঘনার ওপারে, বেশ কয়েক বছর আগে তার আঠারো বছরের যৌবনের দিনগুলোতে।

বুকের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা এই মানুষটা অর্থাৎ কিনা খলিল, যে পেটের খিদেয় আজ তার ঘর সিঁধ দিয়েছে, একদিন তাকেই জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বসেছিল আকলিমা। তার যৌবনের সে-ই ছিল বাদশা।

আশ্চর্য সেই সব দিন!

তখন গান-বাজনা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকত খলিল। সেদিন তার হাতে সিঁধকাঠি ছিল না, থাকত একটা পুরনো সারিন্দা। সারিন্দার তারে মিঠে সুর তুলে সে দিনরাত গান গাইত। গানে মাধুর্যের রং ধরেছিল আকলিমার উষ্ণ ঘন সান্নিধ্য পেয়ে।

মল বাজিয়ে গৃহস্থালির কাজ করত আকলিমা। এই ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখছে, পরক্ষণে চঞ্চল পায়ে পাখির মতো উড়ে এসে উঠোনে ধান মেলে দিচ্ছে, তারপরেই হয়তো ছুটে গিয়ে আখার আগুনে শুকনো কাঠ গুঁজে দিয়ে মাটির হাঁড়িতে ভাত বসাচ্ছে। মেঘনার ঢেউ-এর মতো তার পিঠময় ছড়ানো কালো চুলে আর সিঞ্জিনা লতার মতো শ্যামল সতেজ দেহটি ঘিরে রাঙা ডুরে শাড়িটায় তাকে কী অপরূপই না দেখাত!

গানবাজনা তো ছিলই, পেটের জন্য পদ্মা-মেঘনা উথলপাথল করে সেসব দিনে ইলশা ডিঙি বাইত খলিল। নদীর অতল থেকে তুলে আনত রুপোলি ফসল। ইনামগঞ্জের বাজারে সে সব বেচে কিনে আনত চাল ডাল তেল মরিচ আর আকলিমার জন্য সুগন্ধি ফুলেল তেল, চুলের কাঁটা, হাড়ের কাকুই। কোনো কোনো দিন বা তাঁতের রঙচঙে ডুরে শাড়ি।

তবে বেশির ভাগ দিনই বেরুতে ইচ্ছা করত না। আকলিমা কি যেন যাদু করেছিল তাকে। পদ্মা-মেঘনা দাপিয়ে বেড়াত যে, সেই খলিল ছোট্ট দোচালা ঘরটায় যেন আটকা পড়ে

গিয়েছিল। আকলিমা ছোটাছুটি করে ঘরের কাজ করত। তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে সে গেয়ে উঠত :

ময়ূরপাঙ্খি নাও ভিড়াইয়া আইলাম
তোমার খালে,
সোতের কোলে ঢেউয়ের দোলে
পরান কেমুন করে।
মেঘববণ চুল কইন্যা, তুমার
টানা টানা ভুরু,
রাঙ্গা ডুইরা শাড়ি দিমু
আয়না চুড়ি সরু।
তুমার লেইগা আনুম কইন্যা
আসমানেরই তারা—
পৈছা খাড়ু আনুম কইন্যা
রাঙ্গা চান্দের পারা।
ময়ূরপঙ্খি নাও ভিড়াইয়া-য়া-য়া—

সুরেলা গলার সঙ্গে সারিন্দার সুর একাকার হয়ে স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলত আকলিমার। গাইতে গাইতে আর বাজাতে বাজাতে পলকহীন তাকিয়ে থাকত খলিল আর পাখির মতো ঘাড় বাঁকিয়ে মিষ্টি করে হেসে উঠত আকলিমা। বলত, 'আমুন ড্যাব ড্যাব কইরা আমারে যে গিলতে লাগলা, শ্যাষে ভাতের খিদা থাকব তো?'

ঘোরের ভেতর থেকে খলিল জবাব দিত, 'না থাউক, প্যাট আমার এমনেই ভরা আছে।'

আব কিছু না বলে, স্বামীকে কটাক্ষে বিদ্ধ করে, রুপোব মল ঝমঝমিয়ে এনামেলের ক'টা এঁটো সানকি নিয়ে সামনের আয়নামতীর খালের দিকে দৌড়ে যেত আকলিমা।

'বউ, বউ—আ গো পরানের বিবি—' আকলিমার পেছন পেছন মেঘনার কাইতানের মতো ছুটে আসত খলিল। সেদিন বুকটা ছিল কপাটের শক্ত পাল্লার মতো বিশাল, কবজিতে ছিল বাঘের তাকত। অথৈ নদীতে ইলশা জাল ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ টেনে তুলত সে, পাড় থেকে মেঘনার বিশ হাত ফারাকে ছুড়ে দিত খ্যাপলা জাল। (কিন্তু সেদিনের সেই শক্তিমান তেজী খলিল আর নেই। কিছুক্ষণ আগে আকলিমা যখন তাকে জাপটে ধরে তখনই টের পেয়েছিল, খলিলের শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে সে। হাড়ের কাঠামোর ওপর জিলজিলে ঢিলে চামড়ার খোলস কোনোরকম আটকে আছে।)

আয়নামতীর খালের দিকে যেতে যেতে লাজুক হেসে আকলিমা বলত, 'যাও। কেউ আবার দেইখা ফেলব।' তার হাসিতে লজ্জা মেশানো থাকলেও অনেকটাই ছিল গর্ব—একটি পুরুষকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করার দেমাক।

খলিল বলত, 'দেখুক।'

'তুমি বড় আদেখিলা। আমার গোন্ধ পাইলে এক্কেবারে ছোক ছোক কর বিড়ালের লাখান (মতো)। যাও, নাও আর জাল লইয়া গাঙ্গে (নদীতে) যাও। পুরুষ মাইন্‌ষে ঘরে বিবির আচলের তলে বইসা থাকলে মাইন্‌ষে মোন্দ কয়।'

'কউক। কারোর নিন্দামোন্দরে আমি পারোয়া করি না। আমার বিবির গোন্ধ আমি শুকি। কারোর জরুরে ধইরা তো টান দেই না।'

ফিক করে একমুখ হাসি নরম আলোর মতো ছড়িয়ে দিত আকলিমা। বলত, 'না গো, না। কেউ কিছু কয়ও না, নিন্দামোন্দও করে না। যা কওনের আমিই কই। তুমি দেখাইলা বটে।' একটু থেমে বলত, 'একখান কথা জিগামু?'

'কী?'

'বউ কি আর কারোর হয়না?'

'হইব না ক্যান? তবে আমার লাখান (মতো) না।'

এমন বাধ্য, মুগ্ধ স্বামী কপাল না করলে মেলে না। নিজের সৌভাগ্যে আপ্লুত হয়ে যেত আকলিমা। মনে মনে বলত, খলিল সারা দিনরাত তার গায়ে জড়িয়ে থাক। মুখে বলত, 'যাও, ঘরে বইসা থাইকো না। গাঙ্গে যাও। ওই দেখ, ইত্তিমালির ছোট বইনটা আমাগো দেখতে আছে।'

চকিত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত খলিল, কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। বলত, 'কী ব্যাপার লো বউ?'

ততক্ষণে মেঘনার ঢেউ-এর মতো উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়েছে আকলিমা।

এবার খেলাটা ধরা পড়ে যেত। চোখ কুঁচকে খলিল বলত, 'বুঝছি, তুই আমারে ফাকি দ্যাস।'

তারপরেই দু'জনে একসঙ্গে হাসির তুফান তুলত।

শাদির পর কয়েকটা মাস সারিন্দার মিষ্টি সুরের মতো মসৃণ ছাঁদে কেটে যায়। আজকের মতো এমন বর্ষার রাতগুলোকে নেশার মতো মনে হত। সেই সময় দূরের মেঘনা যখন ফুলে ফুলে গর্জাচ্ছে, বিদ্যুতের আলোয় কাছের আয়নামতীর খালটাকে বাঁকানো খাঁড়ার মতো দেখাচ্ছে, ঢেউটিনের চালে যখন অবিরত বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে তখন খলিলের বুকের ভেতর নিজেকে সঁপে দিয়ে আরামে সুখে তৃপ্তিতে চোখ বুজে থাকত আকলিমা।

আচ্ছন্ন, কাঁপা গলায় ডাকত খলিল, 'বউ—অ বউ—'

আবছা গলায় ঘোরের মধ্যে থেকে সাড়া দিত আকলিমা, 'উঁ---'

'কই তুই?'

'তুমার কাছে।'

'আরো কাছে আয়।'

'তুমার বুকের মইধ্যেই তো রইছি।'

'বুকে না, পরানটার মইধ্যে আয়।'

আকলিমার মুঠো মুঠো নলখুড়ি ফুলের মতো কোমল দেহটাকে বলিষ্ঠ বুকের ভেতর মিশিয়ে দিত খলিল। শরীরের প্রতিটি রক্তকণায় তখন বিদ্যুৎ চমকে চমকে যেত যেন আকলিমার। বাইরে অবিরাম ধারাপতন, ব্যাঙেদের গলা ফুলিয়ে ডাকাডাকি আর কাঞ্চন কি সোনাল ফুলের বুনো গন্ধ—সব মিলিয়ে স্নায়ুর মধ্যে কী এক মাতন তুলে দিয়ে যেত যেন।

এ তো গেল বর্ষার কথা। তারপর একদিন সাদা সাদা ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে মাঠঘাটের জল নেমে যেত মেঘনার দিকে। শরতে সাদা কাশফুলে চারিদিক ছেয়ে যেত। তারপর আসত সোনালি ধানের হেমন্ত।

সেবার অঘ্রাণ মাসের উজ্জ্বল সকালে আকাশের কোন প্রান্তে যেন অদৃশ্য মেঘ জমতে শুরু করেছিল। খলিল বা আকলিমা কেউ টের পায় নি, কানা রজিবুল আয়নামতীর খালের ওপার থেকে একটি মাত্র চোখে শকুনের নজর দিয়ে আকলিমাকে বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছে। নবীপুরে তখন জমি কেনাবেচার দালালি টালালি কী সব করত সে। তার সারা মুখে ছিল গুটি

বসন্তের দাগ। কালো খসখসে চামড়া, ছুঁচলো থুতনি, গোল চোখ, পুরু ঠোঁট, বেজায় ঢ্যাঙা চেহারা—সব মিলিয়ে একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানের আকৃতি। সে সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে ছিল।

একদিন সন্ধেবেলায় জেলে ডিঙি নিয়ে মেঘনায় গেছে খলিল, ফিরতে ফিরতে পরদিন দুপুর হয়ে যাবে। ঘরে একাই থাকবে আকলিমা। সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের দরজায় খিল তুলে যখন খলিলের কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময় ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া কেটে কারা যেন তার বিছানার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভারি ঠুনকো ঘুম আকলিমার। অন্ধকারে ক'টা মূর্তিকে দেখে চিৎকার করতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই একটা শক্ত কর্কশ হাত তার মুখে কাপড় ঠেসে দিয়ে বেঁধে ফেলে। অবরুদ্ধ গোঙানির মতো আওয়াজ তার মুখের ভেতর পাক খেতে থাকে, বেরিয়ে আসার পথ পায় না।

শুধু মুখই না, মোটা কাছি দিয়ে হাত-পা বেঁধে খালের ঘাটে বড় ঘাসি নৌকোয় লোকগুলো আকলিমাকে এনে তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা ছেড়ে দিয়েছিল।

আয়নামতীর খাল সিকি মাইল দূরে মেঘনায় গিয়ে পড়েছে। ঘাসি নৌকোটা নদীতে যেতেই একটা পরিচিত গলা আকলিমার কানে করাত চালিয়ে দিচ্ছিল, 'এট্টু কষ্ট কইরা পইড়া থাকো সোনা। মইধ্য গাঙে গিয়া হাত পাও আর মুখের বান্ধন খুইলা দিমু। ত্যাখন যত পার চিল্লাইও।' বলে খ্যা খ্যা করে কর্কশ আওয়াজ তুলে যে হেসে উঠেছিল সে রজিবুল।

এদিকে তার পরের দিন দুপুরে গ্রামে ফিরে এসেছিল খলিল। পুরো একটা রাত আকলিমার উষ্ণ মধুর সান্নিধ্য সে পায় নি।

গোটা রাত মেঘনায় মাছ মেরে সেই মাছ ইনামগঞ্জে বেচে গোটা পাঁচেক কাঁচা টাকা পেয়েছিল খলিল। তার থেকে একটা ভাঙিয়ে সুগন্ধি সাবান আর সস্তা দামের গন্ধতেল কিনে এনেছিল আকলিমার জন্য। বাকি টাকা আর খুচরো কোমরের গেঁজেতে ঝন ঝন করে বাজছিল।

লম্বা লম্বা পায়ে ফসলের জমির আঁকাবাঁকা আলপথগুলোর ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল, কতক্ষণে সে আকলিমার কাছে পৌঁছুবে। তার মন বাতাসের আগে আগে পাখির মতো ডানা মেলে যেন উড়ে যাচ্ছিল। নিজের অজান্তেই তার গলায় গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠেছে।

কালনাগিনী কইন্যা তুমি
আমার বুকের জ্বালা,
তুমার গলায় দিমু কইন্যা
সোনাল ফুলের মালা।
চিকন চুমা আইক্যা (এঁকে) দিমু
তুমার রাঙ্গা মুখে,
আমার মনের মধু দিমু
তুমার গহীন বুকে।
কালনাগিনী কইন্যা তুমি-ই-ই-ই—

ধান-কাটা ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে উলটো দিক থেকে আসছিল ফারুক। সে এ অঞ্চলের বড় ভুঁইয়াদের জমিতে পেটভাতায় আর দেড় টাকা রোজে কিষাণি করে।

ফারুক বলেছিল, 'পরানে ফুর্তির বান ডাকাইয়া বড় যে গান গাও। উই দিকে ঘরে কী হইচে, খপর রাখো?'

ফারুকের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে খলিল। প্রবল ধাক্কা খেয়ে তার গলায় সুরটা কেটে যায়। দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠায় তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে। ভয়-পাওয়া গলায় সে বলেছে, 'কী হইচে ফারুক ভাই?'

'তুমার বিবিরে কাইল রাইতে কারা য্যান জোর কইরা উঠাইয়া লইয়া গেছে।'

খলিলের হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসে। তার চোখের সামনে গোটা পৃথিবী একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। হাতের মুঠি থেকে গন্ধতেলের শিশি আর সাবান কখন যে জমিতে পড়ে যায়, সে টেরই পায়নি।

দু-একদিনের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা তার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল। আকলিমার সঙ্গে সঙ্গে রজিবুল চৌধুরিও গ্রাম থেকে উধাও হয়েছে।

আকলিমাকে সারা দুনিয়া তোলপাড় করে অনেক খুঁজেছে খলিল কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তারপর একে একে কত বিনিদ্র রাত কেটেছে খলিলের। পুবের আকাশে কত বার সূর্যোদয় হয়েছে, পশ্চিম দিগন্তে কত বার যে সূর্য ডুবে গেছে তার হিসেব নেই। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর পেরিয়ে গেছে।

ওদিকে রজিবুল চৌধুরি আকলিমাকে মেঘনার এপারে এই মামুদপুরে এনে তুলেছে। গ্রামের মাঝখানে তারা থাকে না। মামুদপুরের শেষ মাথায় গাছপালায় ঢাকা নির্জন জঙ্গলের ভেতর একটা দোচালা ঘর তুলে নিয়েছে। রজিবুলের মনে সারাক্ষণ সন্দেহ, এই বুঝি আকলিমা পালায়। কাজেকর্মে কোথাও বেরুতে হলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভয়ঙ্কর গলায় শাসিয়ে যায়, 'পলানের মতলব করবি না। যেইখানেই যাস আমারে ফাকি দিতে পারবি না। ধরতে পারলে এক্কেবারে শ্যাষ কইরা ফেলামু।'

ক'বছর আগের সেই অভিশপ্ত রাতটা থেকে অসহ্য বন্দিজীবন মেনে নিতে হয়েছে আকলিমাকে। অভ্যস্ত হতে হয়েছে এই ভয়াবহ পরিবেশের সঙ্গে। কিন্তু এমনি বৃষ্টিঝরা উদ্দাম সব রাতে বয়রা বাঁশের মাচার ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে স্মৃতির ভেতর কয়েক বছর আগের জীবনটা প্রবল নাড়া দিয়ে যায়। বড় সরল, বড়ই মুগ্ধ একটি মানুষের স্মৃতি তাকে অস্থির করে তোলে। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিতে ইচ্ছা করে।

সেই মানুষটা এখন দাঁড়িয়ে আছে আকলিমার মুখোমুখি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। রাতটা পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের দিনে ফিরে গেছে যেন।

কতক্ষণ তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। একসময় সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙেচুরে দিয়ে আকুল স্বরে আকলিমা বলে, 'আমি আর পারি না। শয়তানটা আমারে শ্যাষ কইরা দিছে। আমারে তুমার লগে লইয়া যাইবা?'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড আচমকা লাফিয়ে উঠেই থেমে যায় যেন খলিলের। কাঁপা গলায় সে বলে, 'কিন্তুক—'

'না না, কুনো কিন্তুক না। আমারে নিতেই হইব তুমার লগে। অখনই পলাইয়া যাওনের সুবিধা। খাটাশটা আইসা পড়লে উপায় থাকব না। চল যাই—' খলিলের একটা হাত আঁকড়ে ধরে আকলিমা।

তার ব্যাকুলতা প্রথমটা ভয়ানক বিচলিত করে তোলে খলিলকে। বুকের ভেতর অশান্ত ঝড় বয়ে যেতে থাকে যেন। খানিক পর নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়ে সে বলে, 'কিন্তুক তোরে

নিয়া রাখুম কই? খাওয়ামু কী? তিনদিন না খাইয়া আছি। না না, তুই এইখানেই থাক। আর যাই হউক, খাইয়া তো বাচবি।'

আস্তে আস্তে হাতের মুঠি আলগা হয়ে যায় আকলিমার। সে যেন বুঝতে পারে, যেখানে আজ সে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে তার আর খলিলের কাছে ফিরে যাবার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে আকলিমা। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়তে বলে, 'আইচ্ছা, তুমার সেই সারিন্দাখান অখনও আছে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে খলিল। করুণ গলায় বলে, 'না। তুই যেই দিন নিখোজ হলি সেইদিনই ম্যাঘনার পানিতে ফালাইয়া দিছি।'

আবার অস্থির হয়ে ওঠে আকলিমা। ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'আমি আর এক মুহূত্তও থাকুম না এইখানে। আমারে এই জঙ্গলের মইধ্যে তালা দিয়া রাখে বখিলটায়। না খাইয়া মরি তবু তুমার কাছে থাকুম। তুমি আমার সোয়ামী।'

খলিল টের পায় জ্বরটা আচমকা আরো চড়তে শুরু করেছে। ঝাপসা গলায় বলে, 'কিন্তুক অরা যে আছে—' কথাটা আর শেষ করতে পারে না। ঘাড় ভেঙে তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে যেন।

'অরা কারা?' ভয়ে ভয়ে, বুকের ভেতর গভীর আশঙ্কা নিয়ে জিগ্যেস করে আকলিমা।

বাইরে প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়ে নারকেল আর বউন্যা গাছগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে থাকে। আকাশটাকে চৌচির করে কোথায় যেন বাজ পড়ে।

খলিল উত্তর দেয় না।

আকলিমা এবার চিৎকার করে ওঠে, 'অরা কারা?'

খলিল ঘাড় নুইয়ে শিথিল গলায় বলে, 'অনেক দিন তোরে তালাশ করছি। ম্যাঘনার দুই পারে গেরামে গেরামে ঘুরছি তোর লেইগা। সগলে কইতে লাগল তুই আর এই দ্যাশে নাই। কিন্তুক হাত পুড়াইয়া কয়দিন আর খাইতে পারে পুরুষ মাইনষে! আমারে তো পয়সার লেইগা ম্যাঘনায় যাইতে হয় রোজ রাইতে। দুফারে য্যাখন ঘরে ফিরি শরীলে আর কিছু থাকে না। কত দিন যে আলস্যিতে রান্ধি নাই! শ্যাষে উপায় না দেইখা নিকাহ্ করতে হইল। পোলপানও হইছে।' বলতে বলতে তীব্র অপরাধবোধে যেন গলা বুজে আসে তার।

ঘরের ভেতর এবার অদৃশ্য একটা বাজ পড়ে যেন।

আকলিমা চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি নিকাহ্ করছ।'

ঝাপসা গলায় খলিল উত্তর দেয়, 'হ।'

বাইরের অশ্রান্ত বৃষ্টিপাত ছাড়া অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর আর কোনো শব্দ নেই। দু'টি নরনারীর হৃৎপিণ্ডও বুঝি থমকে গেছে।

একসময় ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গলায় খলিল বলে, 'আর খাড়ইতে পারি না। জ্বরে শরীল ভাইঙ্গা আইতে আছে। যাই গা। কিছু না লইয়া গেলে ওই গুষ্টি শুটকি দিব। দেখি অন্য কুনোখানে যদি কিছু পাই।' একটু থেমে ফের বলে, 'তুই ভাইবা দ্যাখ, ওই দোজখে গিয়া থাকনের থেইকা তোর এইখানে থাকনই ভালো।'

গভীর বিষাদে মন ভরে যায় আকলিমার। অনেকটা সময় ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। তারপর অন্ধকারে গা থেকে রুপোর গোট, বেসর, নাকফুল—সব খুলে ফেলে জড়ানো গলায় বলে, 'এই গয়নাগুলান ধর। আমি তোমার লগে যামু না। রজিবুল ইবলিশটায় তুমার ঘর এক ফির ভাইঙ্গা দিছে। আমি গিয়া তুমার নয়া ঘর ভাঙ্গুম না। ঘর যেমুন ভাঙছে তার দাম আমি দিয়া দিমু। তুমার নয়া ঘর আর য্যান না ভাঙ্গে। আবার আইসো, আবার দাম লইয়া যাইও।'

হাতের মুঠোয় গয়নাগুলো চেপে ধরে ঘোরের ভেতর থেকে খলিল বলে ওঠে, 'আবার আসুম?'

'হ, আসবা। একবার না, দুই বার না, অনেক বার। রজিবুলরে আমি শ্যাষ কইরা দিমু।' বলে একটু থামে আকলিমা, তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'আর পারলে একখান নয়া সারিন্দা কিন্যা লইও।' নতুন করে বুকের ভেতর থেকে কান্নার বেগ উথলে বেরিয়ে আসতে থাকে তার।

হঠাৎ বাইরে তালা খোলার আওয়াজ শোনা যায়। সেই সঙ্গে রজিবুলের কর্কশ গলা ভেসে আসে, 'কি লো হুমুন্দির ঝি, বাদশাজাদীর লাখান পইড়া পইড়া ঘুমাও। শরীলে জব্বর ত্যাল হইছে তুমার। ঘরে একখান বাত্তি জ্বালাইয়া রাখতে পার নাই? ওঠ্, উইঠা বাত্তি জ্বাল—'

এদিকে ব্যগ্র হাতে ঠেলতে ঠেলতে খলিলকে সিঁধ কাটা গর্তের দিকে নিয়ে যায় আকলিমা, 'তরাতরি যাও গা। রজিবুলটা কিস্তুক ডাকু, মানুষ খুন করতে পারে।'

শরীরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে দ্রুত সিঁধের গর্তে ঢুকে যায় খলিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে রজিবুল ঘরে ঢোকে। খোলা দরজা দিয়ে তীরের মতো বৃষ্টির ফলাগুলো ঘরের ভেতর ঢুকতে থাকে।

রজিবুল আর কিছু বলার আগেই তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আকলিমা, 'তুমি আমারে একা ফেলাইয়া যাও এই জঙ্গলে। এই দ্যাখো সিদ কাইটা চোরে আমার গয়নাগাটি কাইড়া লইয়া গেছে। একা আছি, ডরে চিল্লাইতে পারি নাই।'

বাইরের আকাশ থেকে মেঘনায় আরেক বার বাজ পড়ে।

শবরী

সকালের রোদে স্নান করে ট্রেনটা এসে পৌঁছুল।

ছোট্ট স্টেশন। অ্যাসবেস্টসের সংক্ষিপ্ত ছাউনির তলায় একদিকে টিকেট-ঘর, গৌরবে যাকে স্টেশন মাস্টারের চেম্বারও বলা যেতে পারে। মান খুইয়ে রাত্তির বেলা সেটাই আবার একমেব পোর্টার ধনিরামের শোবার ঘর। আর একদিকে একটি দীন চেহারার চায়ের স্টলকে ঘিরে ইতস্তত খানকয়েক বেঞ্চি ছড়ানো। সামনের দিকে প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্ম আর কী! এক ফালি লম্বা উঁচু জমির ওপর সামান্য কিছু সুরকি বিছানো, যার মাথার ওপর আচ্ছাদন বলতে সাঁওতাল পরগনার আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই।

মোট কথা, কুলে-শীলে এবং বংশ-পরিচয়ে স্টেশনটা কুলীন নয়, নিতান্ত হরিজনদের দলে সেটা ভিড় বাড়িয়েছে।

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের গেটে টিকেট জমা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টো যেন মুগ্ধ হয়ে গেল।

সামনের দিকে যতদূর তাকানো যায়, সাঁওতাল পরগনার অপূর্ব বনশ্রী। বেশির ভাগই এখানে শালের গাছ। মাঝে মাঝে ইতস্তত দু-চারটে খেজুর তাল আর শিশু।

টিলায় টিলায় পৃথিবী এখানে তরঙ্গিত। চড়াই-এর পেছনে এখানে উতরাই, উতরাই-এর পিছু পিছু আবার চড়াই।

যতদূর দৃষ্টি যায়, একেবারে সেই দিগন্ত পর্যন্ত, মাটির রং হলুদ। মনে হয়, এক গৌরাঙ্গী আদিবাসিনী এই সাঁওতাল পরগনায় অলস শিথিল দেহ এলিয়ে রেখেছে।

বেশিক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকা গেল না। এখনও মাইল চারেক রাস্তা আমাকে যেতে হবে। তবেই সেই ছোট্ট শহরটায় পৌঁছুতে পারব।

কলকাতা থেকে আসার সময় বন্ধু দেবেশ বলে দিয়েছিল, স্টেশন থেকেই টাঙ্গা পাওয়া যায়।

লক্ষ করলাম, স্টেশনের ডান পাশ ঘেঁষে তিন চারখানা ঘোড়ায়-টানা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। একটা টাঙ্গা ঠিক করে মালপত্র চাপিয়ে নিজে উঠে বসলাম। মালপত্র আর কি, ফাইবারের মাঝারি একটা সুটকেস আর একটা হোল্ড-অল।

ওঠা মাত্রই গাড়িটা চলতে শুরু করল।

এ সময় কেউ সাঁওতাল পরগনায় আসে না। টুরিস্ট আসার এটা মরশুম নয়। এ সময় অর্থাৎ বর্ষায়। টুরিস্ট আসবে সেই আশ্বিনে। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত তাদের যাওয়া-আসা চলবে। আজকের দিনটা অবশ্য ব্যতিক্রম। সোনার টোপর মাথায় দিয়ে রোদ উঠেছে। আকাশ জুড়ে মেঘেদেরও আনাগোনা নেই। তবে আমি জানি আজকের এত রোদ, এত আলোর ঝলক কাল আর থাকবে না। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে যাবে।

এই বর্ষায় যখন কেউ আসে না তখন আমিই বা সাঁওতাল পরগনায় পাড়ি জমিয়েছি কেন? এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে গেলে বলতে হয়, আমি মানুষটা খানিকটা সৃষ্টিছাড়া। আমার রক্তের ভেতর বোধহয় একটা যাযাবরের আস্তানা আছে। দু'টো দিনও সেটা আমাকে স্থির থাকতে দেয় না। কড়া পাওনাদারের মতো অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব—আমার ওপর যাঁদের টান-ভালবাসা কিঞ্চিৎ বেশি, অনুগ্রহ করে আমার নামের আদিতে কিছু কিছু অলঙ্কার জুড়ে দিয়েছেন। কেউ বলেন, ছন্নছাড়া অমুকটা। কেউ বলেন, বাউণ্ডুলে অমুকটা। এতে আমার নামের মানহানি ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং বিনা কষ্টে বিনা ব্যয়ে উৎকৃষ্ট ক'টি বিশেষণ লাভ করে চিত্ত পুলকিত হয়েছে।

দু-চারদিন খাচ্ছি দাচ্ছি আর জীবনধারণ নামে একটা জন্তুর তাড়া খেয়ে টাকার পেছনে ঘুরে মরছি। তারপরেই হয় কি, পায়ের তলা চুলবুলিয়ে ওঠে। রক্তের মধ্যেকার সেই বেদেটা ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে একেবারে বাংলাদেশের দেউড়ি পার করে দেয়। আর আমিও কাঁধে একটা গাঁটরিয়া ফেলে পুরোপুরি মুসাফির বনে কখনও পাড়ি জমাই শিবালিকে, কখনও কাঞ্চীতে, কখনও উজ্জয়িনী আবার কখনও বা অমরকন্টকে!

সেই বেদেটার দিনক্ষণ নেই, তার পাঁজিপুথিতে অশ্লেষা-মঘা-ত্র্যহস্পর্শের দেখা মেলে না। অযাত্রাতেই তার বোধহয় জয়যাত্রা। তার তাড়া খেয়ে এই বর্ষায় আমি এসেছি সাঁওতাল পরগনায়। বে-মরশুম জেনেও না এসে পারিনি।

আসার সময় টাঙ্গার খবরটাই শুধু দেয়নি দেবেশ, চার মাইল দূরে এই ছোট শহরের কোন ঠিকানায় উঠলে আমার সব চাইতে স্বাচ্ছন্দ্য বেশি হবে তারও সন্ধান দিয়েছে।

দেবেশ জানিয়েছিল, শহরের দক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ি আছে। অবশ্য হোটেল তাকে ঠিক বলা যায় না। এক বাঙালি ভদ্রমহিলা এবং তাঁর মেয়ে ওই বাড়ির মালিক। টুরিস্ট আসার মরশুমে কিছু কিছু বোর্ডার তাঁরা রাখেন। রান্নাবান্না থেকে পরিবেশন নিজেরাই সব কিছু করে থাকেন। অতিথিদের কিসে আরাম, কিসে সুবিধে—সব দিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি। এখানে এসে নিজের বাড়িতে থাকার স্বাচ্ছন্দ্যই পাওয়া যাবে।

দেবেশ বলেছিল, 'তা ছাড়া—'

আমি জিগ্যেস করেছিলাম, 'কী?'

'ভদ্রমহিলার মেয়েটি টেরিফিক দেখতে। তাকালে চোখের তারা একেবারে ফিক্সড হয়ে যাবে।' বলে ঠোটের কোণে বিচিত্র হেসেছিল দেবেশ।

আমি জানতাম, বছর তিন চারেক আগে সাঁওতাল পরগনার এই শহরে এসেছিল দেবেশ। সম্ভবত ওই ভদ্রমহিলার বাড়িতেই ছিল। বাড়িউলির 'টেরিফিক দেখতে' মেয়ের কথায় আমিও হেসেছিলাম।

দেবেশ আবার বলেছিল, 'তার ওপর মেয়েটা আবার—'

'কী?' আমি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম।

'ভারি রঙ্গিলা টাইপের।'

'তাই নাকি!'

'হুঁ। নামটিও চমৎকার।'

'কিরকম?'

'নাম অর্পিতা। গেলেই বুঝতে পারবি সে সমর্পিতা হয়েই আছে।' বলে ঠোটের কোণে আবার হেসে উঠেছিল দেবেশ।

কৌতুকটা উপভোগ্যই। অতএব আমিও হেসেছিলাম।

দেবেশ আবার বলেছিল, 'যাচ্ছিস ভালো সময়েই। এখন অফ সিজন। ওখানে বোর্ডার তেমন একটা থাকবে না। একেবারে নিরিবিলিতে দু'জনে মুখোমুখি, গভীর সুখে সুখী, বাহিরে জল ঝরে অনিবার। জগতে কেহ যেন নাহি আর। ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে না।' বলেই ঠোটের প্রান্তের সেই নিঃশব্দ হাসিটাতে সশব্দ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে কিঞ্চিৎ ওলট পালট করে দিয়েছিল দেবেশ। গভীর সুখে সুখী নয়, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'গভীর দুখে দুখি'। একবার ভেবেছিলাম, ভুলটা সংশোধন করে দিই। পরক্ষণেই খেয়াল হয়েছিল, ইচ্ছা করেই ভুলটুকু করেছে দেবেশ। উদ্দেশ্য মহৎ। আমার পেছনে লাগা। অগত্যা কিছু না বলে হেসেছিলাম।

দেবেশ আবার বলেছিল, 'ওখান থেকে ফিরে এসে বলবি, দিনগুলো কেমন কাটল।' বলে চোখের কোণ দিয়ে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ইঙ্গিতটা দুর্বোধ্য নয়। নিতান্তই সহজ এবং সরল। হেসে বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই বলব।'

চার মাইল চড়াই-উতরাই ভেঙে একসময় টাঙ্গাটা শহরে পৌঁছুল।

জায়গাটাকে বোধহয় শহর বলা উচিত নয়। বললে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। আসলে অতখানি গৌরব তার প্রাপ্য নয়।

ইলেকট্রিসিটির দাক্ষিণ্য অবশ্য আছে। তবে রাস্তাগুলো এখনও কাঁচা। পথে ক্বচিৎ এক আধটা মানুষ চোখে পড়ে। মানুষের তুলনায় নির্জনতা এখানে বেশি। বাড়িঘর যে খুব একটা আছে, তা-ও নয়। অনেকখানি ফাঁকা জায়গার পর একটা করে বাড়ি। মনে হল জীবনস্রোতহীন এক নিস্তব্ধ জনপদে এসে পড়েছি।

দেবেশ যে ঠিকানা দিয়েছিল সেটা খুঁজে বার করতে খুব সময় লাগল না।

সাঁওতাল পরগনার এই নগণ্য শহরে ছবির মতো দোতলা বাড়িটা সত্যিই বিস্ময়। বাড়িটা

যেখানে সেটাই শহরের দক্ষিণ সীমান্ত। তারপর আর মানুষের বসতি নেই। চড়াই-উতরাইতে দোল খেয়ে সারা গায়ে শালের বন সাজিয়ে নিচু পাহাড়ের রেঞ্জ দূর দিগন্তের দিকে ছুটে গেছে।

টাঙ্গা থেকে নেমে একটুক্ষণ ইতস্তত করলাম। তারপর ভাড়া মিটিয়ে হোল্ড-অল আর সুটকেস নিয়ে পায়ে পায়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ডাকতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে দোতলার বারান্দায় একটি বর্ষীয়সীকে দেখতে পেলাম। মহিলা বিধবা, পরনে ধবধবে থান এবং সাদা ব্লাউজ।

মহিলা যে একদা বেশ সুরূপা ছিলেন তার কিছু স্মৃতি শরীরময় এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি শ্যামাঙ্গী। চোখ দু'টি আয়ত। চিবুকের খাঁজ মনোরম, পানপাতার মতো মুখের গড়ন। সব চাইতে বড় কথা, তাঁর সমস্ত দেহের ওপর বিচিত্র এক আভিজাত্য জড়ানো। সেটা ছোঁয়া যা দেখা যায় না, নিতান্তই তা অনুভবের ব্যাপার।

ইনিই যে দেবেশ-বর্ণিত মধ্যবয়সী মহিলা এবং এ বাড়ির স্বত্বাধিকারিণী, দেখামাত্রই বুঝতে পারলাম। দোতলার বারান্দা থেকে তিনি বললেন, 'কাকে খুঁজছেন?'

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'এটাই কি সুনন্দা লজ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কলকাতা থেকে আসছি। এখানে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই মহিলা বললেন, 'আপনি একটু দাঁড়ান। আমি আসছি।'

অপেক্ষা করতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলা নিচে নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

একটু আগে যে কথা বলা হয়নি, এবার তা-ই বললাম। জানালাম, কলকাতা থেকে এই সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে এসেছি। দিন পনেরো কুড়ি থাকব। এই ক'টা দিন তাঁর বাড়িতেই আমার থাকার ইচ্ছা।

তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন মহিলা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনি আমাদের বাড়ির খোঁজ পেলেন কার কাছে?'

'যারা এখানে এসে আপনাদের বাড়িতে থেকে গেছে, তাদের কাছেই পেয়েছি।'

এ সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন না করে মহিলা বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

'এ সময়, মানে এই বর্ষাকালে কেউ তো এখানে আসে না। তা আপনি হঠাৎ—' বলতে বলতে মহিলা থেমে গেলেন।

তাঁর না-বলা কথার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল। সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না। বর্ষায় সাঁওতাল পরগনায় হানা দেবার কৈফিয়ৎ হিসেবে নিজের যাযাবর-বৃত্তির কথা বলতে যাচ্ছিলাম। সেটা নিতান্ত কৌতুকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে ভাবতেই জবাবদিহিটাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দিলাম। বললাম, 'এই বর্ষাকালটা ছাড়া অফিস থেকে আমার ছুটি পাওয়ার অসুবিধে। তাই—'

আর কিছু জিগ্যেস করলেন না মহিলা। সম্ভবত আমার জবাবদিহি তাঁর সন্তোষজনকই মনে হয়েছে। ঘুরে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকতে লাগলেন, 'অর্পি—অর্পি, ধোকনাকে নিয়ে একবার আয় তো।'

অর্পি! শব্দটা 'অর্পিতা'রই সংক্ষিপ্ত রূপ বোধ হয়। আমি উন্মুখ হলাম।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। খানিক পরেই বাড়িটার ভেতর থেকে একটি তরুণী মধ্যবয়সী একজন সাঁওতালকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

দেবেশ যে বর্ণনা দিয়েছিল, সেটা মিথ্যে নয়, তার মধ্যে বাড়াবাড়ি ছিল না। মেয়েটি অর্থাৎ অর্পিতা সত্যিই চমৎকার। গায়ের রং টকটকে, টানা চোখ, ডিম্বাকৃতি ভরাট মুখ, সুডোল চিবুক। তার সঙ্গে যে প্রৌঢ় সাঁওতালটি এসেছে সে যে ওবাড়ির চাকর শ্রেণীর মানুষ, দেখামাত্রই বোঝা গেল।

সাঁওতালটি অর্থাৎ ধোকনার দিকে তাকিয়ে বর্ষীয়সী বললেন, 'বাবুর মালপত্র দোতলার তিন নম্বর ঘরে নিয়ে যা।'

ধোকনা প্রায় ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে সুটকেস আর হোল্ড-অলটা নিয়ে চলে গেল। বাড়ির ভেতর সে অদৃশ্য হলে মহিলা এবার তরুণীটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'এ আমার মেয়ে অর্পিতা।' অর্পিতার দিকে ফিরে বললেন, 'আর ইনি কলকাতা থেকে আসছেন। দিন পনেরো কুড়ি আমাদের বাড়ি থাকবেন।'

অর্পিতা দু' হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করল। প্রতি-নমস্কারের জন্য আমিও হাত তুললাম।

নমস্কার পর্বের পরই প্রগলভ হয়ে উঠল অর্পিতা। বলল, 'আপনি কলকাতা থেকে আসছেন?' তার দু'চোখে আলো নেচে উঠল যেন।

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ালাম।

অর্পিতা বলতে লাগল, 'কলকাতার লোক এলে আমার কী ভালো যে লাগে। মনে হয়—'

সবটা আর বলা হয় না অর্পিতার। তার আগেই পাশ থেকে বর্ষীয়সী বলে উঠলেন, 'এখন বক বক না করে ভদ্রলোককে ভেতরে নিয়ে যা। সারা রাত জেগে এসেছেন। স্নান সেরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। তারপর যত ইচ্ছা কথা বলিস।'

অর্পিতা ঈষৎ লজ্জা পেল বোধ হয়। ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন—'

যেতে যেতে লজ্জার কথাটা কিন্তু একেবারেই ভুলে গেল সে। বলল, 'জানেন, এই বর্ষাকালটা আমার ভারি খারাপ লাগে।'

'কেন?' পাশাপাশি চলতে চলতে অর্পিতার দিকে তাকালাম।

অর্পিতা বলল, 'এ সময় আমাদের এখানে কোনো বোর্ডার আসে না। এত বড় বাড়িতে মা ধোকনা আর আমি পড়ে থাকি। সকাল-বিকেল-রাত্রি-সন্ধে তিনজনে তিনজনের মুখ দেখি শুধু। অবশ্য—'

'কী?'

'সারা শহরটাই এ সময় নিঝুম হয়ে যায়। পথে বেরুলে কখনও সখনও দু-একটা লোক চোখে পড়ে। তবে—'

'কী?'

'কোনোরকমে বর্ষাকালটা একবার পার করতে পারলেই সেই বৈশাখ পর্যন্ত আমাদের এই শহর একেবারে সরগরম। এই সময়টা ইন্ডিয়ার নানা জায়গা থেকে টুরিস্ট আসে। বেশির ভাগ অবশ্য কলকাতার। লোকজন হইচই চেঁচামেচি—টুরিস্ট আসার মরশুমটা আমাদের এই জায়গাটাকে মাতিয়ে দিয়ে যায়।'

এবার আর কিছু বললাম না। দেবেশ যে বলেছিল, মেয়েটি রঙ্গিলা ধরনের—সেটা খুব সম্ভব পুরোপুরি সত্যি নয়। অর্পিতার প্রগল্‌ভতা হয়তো তার স্বভাবেরই খেলা।

অর্পিতা আবার বলে উঠল, 'এই বর্ষায় আপনি এসেছেন। তবু একটা নতুন মুখ দেখা গেল। যে ক'টা দিন থাকবেন, কথা বলে বাঁচব।'

কথায় কথায় আমরা দোতলার তিন নম্বর ঘরে এসে পড়লাম। ঘরখানি খুব বড় নয়। মাঝারি মাপের। সেই তুলনায় জানালাগুলি প্রকাণ্ড। এখান থেকে দক্ষিণ আর পুবের সীমাহীন প্রান্তর চোখে পড়ে। দৃষ্টিকে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত অবাধে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

লক্ষ করলাম, ঘরখানিতে আসবারের বাহুল্য নেই। একটি সিঙ্গেল-বেড খাট, একটি টিপয় টেবল, সুদৃশ্য একটি ড্রেসিং টেবল আর একখানা ইজি চেয়ার—যা যা আছে সবই সুন্দর এবং চমৎকার সাজানো।

আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। ইতিমধ্যেই ধোকনা আমার হোল্ড-অল খুলে খাটের ওপর বিছানা পেতে ফেলেছে। অবশ্য এই মুহূর্তে ধোকনাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমরা আসার আগেই আমার সুটকেস এ ঘরে রেখে এবং বিছানা পেতে দিয়ে সে চলে গেছে।

অর্পিতা বলল, 'এখন আপনার সঙ্গে আর গল্প করব না। গল্প করছি দেখলে মা আমায় মেরে ফেলবে। আপনি স্নান করবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'গরম জল লাগবে?'

'না।'

'তা হলে একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনার স্নানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলে আর অপেক্ষা করল না অর্পিতা, দ্রুত পা ফেলে চলে গেল।

স্নান সারতে না সারতেই ধোকনা এসে হাজির। লোকটা পরিষ্কার বাংলা বলে। বলল, 'আসন পাতা হয়ে গেছে। মা আপনাকে খেতে ডাকছে।'

'চল।' আমি উঠে পড়লাম।

রান্নাঘর এবং খাওয়াব জায়গা একতলায়। রান্নাঘরের লাগোয়া বিস্তৃত বারান্দা। সেখানে টেবিল-চেয়ার পেতে বিলিতি দস্তুর অনুযায়ী খাওয়ার ব্যবস্থা। অবশ্য মেঝেতে আসন পেতে দিশি প্রথায় আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছে।

খেতে বসে লক্ষ করলাম সেই বর্ষীয়সী মহিলা অর্থাৎ অর্পিতার মা আমাকে পরিবেশন করছেন। আশেপাশে অর্পিতাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রথম পরিচয়েই প্রাণবন্ত প্রগল্‌ভ মেয়েটা আমার প্রাণে কিছু দোলা দিয়েছিল। এই মুহূর্তে খেতে বসে তাকে কাছে পেলে খুশিই হতাম।

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে খেয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু কতক্ষণই বা চুপচাপ থাকা যায়! মহিলা একসময় প্রশ্ন করলেন, 'কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন?'

বললাম, 'ভবানীপুরে।'

এরপর স্ত্রীলোকসুলভ কৌতূহলে আমি কোথায় চাকরি করি, বিয়ে করেছি কিনা, বাবা-মা আছেন না নেই, আমরা ক'জন ভাইবোন—ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেনে নিলেন।

দূরমনস্কের মতো ভদ্রমহিলার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার সমস্ত চেতনা নিজের অজ্ঞাতসারে সেই মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, যার নাম অর্পিতা।

প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে ফস করে একসময় বলে বসলাম, 'আচ্ছা, অর্পিতা দেবীকে দেখছি না তো?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আর বোলো না বাবা—' বলেই হঠাৎ জিভ কেটে ফেললেন, 'ওই দেখুন, আপনাকে 'তুমি' বলে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না যেন।'

বিব্রত মুখে বললাম, 'একবার 'তুমি' বলে আবার যদি 'আপনি' 'আজ্ঞে' শুরু করেন, তা হলে কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগবে। আমি আপনার ছেলের বয়েসী। 'তুমি'ই বলবেন আমাকে।'

কুণ্ঠিত সুরে ভদ্রমহিলা বলেন, 'কিন্তু—'

'না—কোনো কিন্তু নয়।' জোরে জোরে আদুরে জেদি ছেলের মতো আমি মাথা নাড়তে লাগলাম।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না মহিলা। অনেকক্ষণ পর দ্বিধান্বিত সুরে বললেন, 'বেশ, 'তুমি'ই বলব।' একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম—অর্পির কথা জিগ্যেস করছিলে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওই দেখ—' বলে আঙুল বাড়িয়ে দোতলা আর একতলার মাঝামাঝি সিঁড়ির বাঁকের কাছে সংক্ষিপ্ত যে করিডর আছে—সেদিকটা দেখিয়ে দিলেন মহিলা।

সবিস্ময়ে দেখলাম, সত্যিই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে অর্পিতা। করিডরটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা জানালা। তার বাইরে সাঁওতাল পরগনার সীমাহীন উন্মুক্ত আকাশ। শুধু দাঁড়িয়েই নেই অর্পিতা, বাইরের আকাশে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

আশ্চর্য, আমি যখন দোতলা থেকে খোকনার সঙ্গে নিচে খেতে নামি তখন অর্পিতাকে লক্ষ করিনি।

মহিলা আবার বলে উঠলেন, 'মাঝে মাঝে কী যে হয় মেয়েটার! এই হয়তো ঘুরছে ফিরছে হাসছে ছুটছে, তারপরেই হঠাৎ সব কিছু থামিয়ে মুখ কালো করে কোনো একদিকে তাকিয়ে উদাসীন হয়ে বসে রইল। তুমি যখন এলে অর্পি কেমন হাসিখুশি। এখন ওর দিকে তাকালে সে কথা মনে হবে? ওকে নিয়ে কী যে করি।'

ভদ্রমহিলার ওপর বোধ হয় আত্মবিস্মৃতির ঘোর ভর করে বসেছে। আমার সঙ্গে আজকেই যে প্রথম পরিচয়, সে কথা সম্ভবত তাঁর খেয়াল নেই। থাকলে অন্তত মেয়ের সম্বন্ধে নিজের দুশ্চিন্তাকে এমনভাবে খুলে বলতেন না।

ভদ্রমহিলার কথায় আমার খুব যে একটা মনোযোগ ছিল তা নয়। খাওয়া এবং তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার চোখ দু'টি বারে বারে অর্পিতার দিকে ফিরে যাচ্ছিল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে দোতলায় নিজের ঘরে যাবার সময় একবার অর্পিতার পেছনে এসে দাঁড়ালাম। এত কাছাকাছি আমি দাঁড়িয়ে আছি তা যেন অনুভবই করতে পারছে না অর্পিতা। আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালও না সে। উঁকি দিয়ে তার মুখটা দেখতে চেষ্টা করলাম। সে মুখ গাঢ় এবং নিবিড় বিষাদে আচ্ছন্ন। একটু আগে যে প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসময়ী মেয়েটিকে আমি দেখেছিলাম, এ যেন সে নয়।

বিষাদ আর উচ্ছ্বাস—এই দুই রূপের খেলা অর্পিতার মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে ছিল, প্রথম দেখার মুহূর্তে বুঝতে পারিনি।

একবার ইচ্ছা হল অর্পিতাকে ডাকি। পরক্ষণেই নিজের অস্তিত্বের গহনে কার যেন ধমক খেলাম। একদিনের আলাপে এভাবে ডাকা সমীচীন নয়।

বিকেল বেলা আমাকে আবার অবাক করে দিল অর্পিতা। চারিদিকে যেন ঢেউ তুলেই সে আমার ঘরে হাজির হল। হালকা সুরে বলল, 'যাক, ঘুম তা হলে ভেঙেছে!'

আমি কিছু বললাম না। স্থির, নিবদ্ধ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলাম।

আমার খাটের দূর প্রান্তে বসতে বসতে অর্পিতা আবার বলল, 'বাবা রে, বাবা! কি ঘুমটাই না ঘুমোতে পারেন! এর আগে আরো তিন বার উঁকি দিয়ে গেছি। যত বার এসেছি তত বারই দেখেছি আপনার নাক ডাকছে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কাল রাতে ট্রেনে এত ভিড় ছিল যাতে দু'চোখ মুহূর্তের জন্য বুজতে পারিনি। আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সেই জেগে থাকাটা সুদে আসলে পুষিয়ে নিয়েছি। ঘন্টা চারেক প্রায় বেহুঁশের মতো ঘুমিয়েছি।

ঘুমের জন্য কোনোরকম কৈফিয়ৎ যে দেব তা আমার খেয়াল রইল না। সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। খেয়ে দোতলায় আসার সময় অর্পিতার মুখে যে বিচিত্র বিষাদ লক্ষ করেছিলাম, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। উচ্ছ্বাসের স্রোতে তার চোখমুখ এখন ভাসো ভাসো।

অর্পিতা বলতে লাগল, 'কী, এখনও ঘুমের জের কাটে নি? আরেক দফা ঘুমোবার মতলব নাকি?'

অন্যমনস্কর মতো উত্তর দিলাম, 'না, আর ঘুমবো না।'

'তা হলে এক কাজ করুন।'

'কী?'

'চটপট জামাকাপড় বদলে ফেলুন। আমিও শাড়িটা পালটে আসি।'

'কেন?'

'কেন আবার, বেড়াতে যাব।' অর্পিতা বলতে লাগল, 'এই বর্ষাকালে আজকের মতো রোদ এখানে কোনোদিন থাকে না। এমন চমৎকার বিকেলটা ঘরে বসে মাটি করার কোনো মানে হয় না। নিন, তাড়াতাড়ি যা বললাম, করে ফেলুন।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে।

আর আমার বিস্ময়টা প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। প্রথম দিনের আলাপেই যে তরুণী অসংকোচে তার বেড়াবার সঙ্গী হতে ডাক দেয় তার সম্বন্ধে কিছু সংশয়ান্বিত হতে হয় বৈকি। দেবেশ বলেছিল, মেয়েটা রঙ্গিলা ধরনের। রঙ্গিলাই কি? তার চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় অংশে সন্দেহজনক কিছু নেই তো?

সাঁওতাল পরগনার এই বাড়িটিতে আসার পর থেকে অর্পিতা যত কথা বলেছে, যেভাবে তাকিয়েছে, যেভাবে হেসেছে—সব, সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। একবার মনে হল, মেয়েটা আশ্চর্য সাবলীলা। পর মুহূর্তে মনে হল তা নয়। তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেই কিছুটা যেন সন্দিহান হয়ে পড়লাম। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটাও বাতিল করে দিতে হল। আমার চেতনার অতল থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, মেয়েটা ভালো না, ভালো না।

অর্পিতার ভাবনায় নিজেকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারলাম না। একটু পরেই বেশ সেজেটেজে ঘরে এসে ঢুকল সে। কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে কিছুটা বিরক্তি মিশিয়ে বলল, 'এখনও চুপ করে বসে আছেন! উঠুন—শিগ্‌গির উঠে পড়ুন।'

একরকম জোর করেই সে আমাকে বিছানা থেকে তুলে ফেলল। অগত্যা জামাকাপড় বদলে অর্পিতার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

বর্ষার এই মেঘশূন্য ঝলমলে দিনটিতে একটি সুদর্শনা তরুণীর সঙ্গে সাঁওতাল পরগনার চড়াই-উতরাইতে হাঁটতে খুব খারাপ লাগার কথা নয়। আমার লাগছেও না।

সূর্যটা এখনও আকাশের পট থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। পশ্চিম দিকটা লালে লাল। যে ভবঘুরে মেঘের টুকরোগুলো ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে, এই মুহূর্তে সেগুলো রক্তাক্ত। মনে হয়, কোনো তিরন্দাজ তাদের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করে রেখেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সমানে কথা বলছে অর্পিতা। এই শহরে কোথায় কী দেখার আছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে। এখানে নাকি বহুকাল আগে আদিবাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহীদের একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ শহরের পশ্চিমে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। অর্পিতা জানাল, একদিন সেখানে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

মাইল সাতেক হাঁটতে পারলে এ শহরের দক্ষিণে একটা পাহাড়ী নদীর উৎসে নাকি পৌঁছুনো যায়। সেখানে হাজার হাজার হরিয়াল এবং মুনিয়া পাখি, আর হরিণ দেখতে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া আছে চিতল আর রাশি রাশি বনমুরগি। অবশ্য মাঝে মাঝে দু-চারটে দাঁতাল শুয়োরও হানা দেয়। সাহসে যদি কুলোয় জায়গাটা আমি গিয়ে দেখে আসতে পারি।

আরো একটা দর্শনীয় জায়গা হচ্ছে এখানকার ইংরেজ কুঠি। কুঠিটা একজন সাহেব বানিয়েছিলেন। তাঁর নেশা ছিল এ অঞ্চলের আদিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, প্রাচীন পুঁথি, লোকসঙ্গীত—ইত্যাদি ইত্যাদি সংগ্রহ করা। সমস্ত জোগাড় করে ছোটখাটো মিউজিয়াম তৈরি করে ফেলেছেন তিনি।

ইংরেজ ভদ্রলোক অনেক দিন হল মারা গেছেন। জাতীয় সরকার তাঁর মিউজিয়ামটির দায়িত্ব নিয়ে জনসাধারণের জন্য তার দরজা খুলে দিয়েছে।

অর্পিতা সমানে বলে যাচ্ছিল। মুখখানা তার উদ্ভাসিত, গলার স্বরে বিচিত্র দোলা। মনে হয়, এই শহরের গৌরবে তারও একটা অংশ রয়েছে।

আমি কিন্তু অর্পিতার সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিংবা পেলেও সেগুলো আমার ভাবনায় রেখাপাত করতে পারছে না। ক্ষণে উচ্ছ্বসিত, ক্ষণে বিষাদময়ী মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে আমি শুধু বিভ্রান্তই বোধ করছি।

আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে, এবারের বর্ষায় রোদ মাথায় নিয়ে সাঁওতাল পরগনায় এসেছিলাম। দেখতে দেখতে তিনটি দিন কেটে গেল। আশ্চর্য, এখনও বৃষ্টি টৃষ্টি নামেনি।

দিনগুলো শুকনো, ঝকঝকে, রমণীয়। অবিরাম বর্ষণে চারিদিক যখন ভেসে যায় সেই সময় এই তিনটে দিন যেন তিনটি সোনার দ্বীপ।

এই তিন দিনে অর্পিতা আর অর্পিতার মাকে নিবিড়ভাবে চেনার সুযোগ পেয়েছি।

প্রথমে অর্পিতার মায়ের কথাই ধরা যাক। ভদ্রমহিলার স্বভাবের মধ্যে কোথাও কোনো লুকোচুরি নেই। তাঁর সব দিকের সব দুয়ারই খোলা। সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে একটু সময় পেলেই তিনি আমার কাছে এসে বসেছেন এবং নানারকম গল্প করেছেন।

তাঁর গল্পের অধিকাংশই নিজের জীবন-সম্পর্কিত। সংসারে অর্পিতা ছাড়া মহিলার আর কেউ নেই। বছর ছয়েক হল স্বামী মারা গেছেন।

স্বামী মানুষটা মার্চেন্ট অফিসে বিরাট চাকুরে ছিলেন। মাইনে পেতেন সাত হাজার টাকার ওপর। কিন্তু খরচ করতেন তার চাইতে অনেক বেশি। কেউ তাঁর কাছে হাত পাতলে বিমুখ হত না। সুতরাং এই হাত-পাতার দল দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল।

ভদ্রলোক চিরদিন খরচই করে গেছেন। ফলে জমার ঘর শূন্যই থেকে গেছে।

ভদ্রলোক জগতের আর সবার কথাই ভেবেছেন। শুধু অর্পিতা আর অর্পিতার মা সম্বন্ধে ছিলেন চূড়ান্ত উদাসীন। ফলে বছর ছয়েক আগে হঠাৎ তিনি যখন হৃৎযন্ত্র বিকল হয়ে চোখ বুজলেন, দেখা গেল স্ত্রী আর মেয়ের জন্য কোনো ব্যবস্থাই করে যাননি। মেয়েকে নিয়ে সেদিন অর্পিতার মা অথই সমুদ্রে এসে পড়েছিলেন।

স্বামী ভদ্রলোকের প্রাণে কিছু শখ ছিল। সাঁওতাল পরগনার এই ছোট্ট নগণ্য শহরে এই বাড়িখানা তৈরি করিয়েছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে আসতেন। সঞ্চয়ের মধ্যে এই বাড়িখানাই যা ছিল।

একদা যা ছিল নিতান্ত শখের, জীবন ধারণের তাগিদে সেটাকেই অর্পিতার মা পেশার জিনিস করে তুলেছেন। না তুলে উপায়ই বা কী? সাঁওতাল পরগনার এই বাড়িটাতে মরশুমি ট্যুরিস্টদের জন্য তিনি হোটেল খুলেছেন।

আজকাল আর খাওয়া-পরা সম্পর্কে কোনো সমস্যা নেই। তবে অন্য দুশ্চিন্তা আছে অর্পিতার মায়ের। তাঁর দুর্ভাবনার কেন্দ্রে যে বসে আছে সে অর্পিতা।

মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তার বিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কলকাতা থেকে এতদূরে এই শহরে বসে কিভাবে যে পাত্রের সন্ধান করবেন তা ভেবেই তিনি দিশেহারা। অবশ্য বাংলাদেশে আত্মীয়স্বজনের কাছে ক্রমাগত চিঠি লিখে যাচ্ছেন কিন্তু তারা খুব উৎসাহ দেখায় না। এখানে যে সব টুরিস্ট আসে, মহিলা তাদেরও ধরেন। যে ক'দিন তারা এখানে থাকে, মৌখিক সহানুভূতি খুবই দেখায় এবং কলকাতায় ফিরেই রাজপুত্রের খোঁজ পাঠাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পরগনার প্রতিশ্রুতি তারা বেমালুম ভুলে যায়।

বিয়ের চিন্তাই শুধু নয়, মেয়েকে ঘিরে মহিলার দুশ্চিন্তা আরো একটি কারণে। তা এইরকম।

চিরদিনই অর্পিতা নাকি উচ্ছ্বাসময়ী। হইচই করতে ভালবাসে, সবার সঙ্গে অসংকোচে মেশে। লোকে তার অন্য মানে করে অনেক সময়, কিন্তু ভদ্রমহিলা জানেন তাঁর মেয়ে জলের হাঁসের মতো, সংসারের কোনো মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সর্বক্ষণই সে হাসছে, ছুটছে, নিতান্ত অকারণেই মেতে উঠছে।

কিন্তু বছর চারেক কী যে হয়েছে মেয়েটার! এই হয়তো সে উচ্ছ্বসিত, পর মুহূর্তেই বিষাদের গাঢ় যবনিকা তার ওপর নেমে আসে। নিতান্ত উদাসীনের মতো তখন চুপচাপ কোনো একদিকে তাকিয়ে বসে থাকে সে। কেন যে মেয়ের এই রূপান্তর, কিছুতেই ভেবে পান না বলে বিচিত্র আশঙ্কায় তাঁর বুক কাঁপতে থাকে।

এই তিনদিনে অর্পিতাকে কিন্তু একেবারেই বঝতে পারিনি। শুধু মনে হয়েছে, তার চারপাশে অনেকগুলো পর্দা ফেলা আছে। সেই পর্দাগুলির একটি তুলেও যে ভেতরে উঁকি দেব, সাধ্য কী।

প্রথম দিন অর্পিতাকে যে রূপে দেখেছি সেই একই রূপে বার বার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে হুল্লোড়প্রবণ, পরক্ষণেই বিষাদময়ী—এই দুই খেলার বাইরে আর কোনোভাবেই সে আমার কাছে ধরা দেয়নি।

এই তিন দিনের প্রতিটি বিকেল অর্পিতা আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। একদিন সে আমাকে 'ইংরেজ কুঠি'র মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়েছিল। আরেক দিন গিয়েছিল শহরের দক্ষিণে একটি নদীর দিকে।

লক্ষ করেছি, দু'দিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে উচ্ছল সুরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে অর্পিতা। তারপর পেছন ফিরে হনহনিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তার পিছু পিছু এসে দেখেছি, ছাদে অথবা সিঁড়িঘরে অনুভূতিশূন্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

আমার অনুমান, অর্পিতার জীবনে এমন একটা অনাবিষ্কৃত দুঃখের দিক আছে যা তার সমস্ত প্রগল্‌ভতা এবং উচ্ছ্বাসের স্রোতকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেয় এবং বিমর্ষতার একটি আবরণে তাকে ঢেকে ফেলে।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এখানে যে ক'দিন আছি তার মধ্যে যদি সম্ভব হয় অর্পিতার জীবনের অজ্ঞাত দিকটাকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করব।

অর্পিতার জীবনের অজানা অংশটাকে জানার সুযোগ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই হাতে এসে গেল।

এখানে আসার পর প্রথম তিনটে দিন বেশ রোদ পেয়েছিলাম। তারপরেই বর্ষাকালটা তার আপন স্বভাবের মধ্যে ফিরে গেছে। এখন দিনরাতই বৃষ্টি পড়ছে। অতএব সাঁওতাল পরগনার এই বাড়িটাতে আমরা ক'টি মানুষ সর্বক্ষণই বন্দি হয়ে আছি।

অর্পিতার উচ্ছ্বাস আর বিষাদের খেলাটা যথারীতি চলছিলই। এতদিন আমি ছিলাম দর্শক। একটি আগন্তুকের পক্ষে দেখা ছাড়া আর কী-ই বা সম্ভব?

সেদিন নিজের সত্তার গভীরে কী বিপর্যয় ঘটে গেল, জানি না। সময়টা ছিল বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থমকানো। প্রকৃতির এই স্বদেশে অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছিল। বৃষ্টির চিকের ওপাশে বাইরের আকাশ ছিল একেবারেই ঝাপসা।

আমার ঘরে নিজের খাটটিতে বসে ছিলাম। একটা চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসে ছিল অর্পিতা। দু'জনে গল্প করছিলাম।

অবশ্য গল্পের মধ্যে আমার অংশ খুবই সামান্য। অর্পিতা সমানে কথা বলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু চারটে 'হুঁ' 'হাঁ' জুগিয়ে গল্পের গতিটাকে আমি অব্যাহত রাখছিলাম। মোটামুটি বলা যায়, সেদিন আমার ভূমিকা ছিল শ্রোতার।

বিষয়ের কী অভাব ছিল অর্পিতার? সাঁওতাল পরগনার কথা, কতদিন কলকাতায় যাওয়া হয়নি তার কথা, এখানকার অবিরাম বৃষ্টির কথা—বিভিন্ন বিষয়ে সমানে বকে যাচ্ছিল।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সেই অস্বাভাবিকতাটা ভর করেছিল অর্পিতার ওপর। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন আমার মধ্যে কী যে ঘটে গিয়েছিল, নিজের কাছেই তার স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। আমিও উঠে পড়েছিলাম। তারপর অর্পিতার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেছি।

দোতলা আর একতলার মাঝামাঝি সেই করিডরটার প্রান্তে চলে গিয়েছিল অর্পিতা। সেখানে জানালার গরাদ ধরে বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল সে। প্রগল্‌ভ মেয়েটা সেই মুহূর্তে আশ্চর্য করুণ আর অন্যমনস্ক।

পায়ে পায়ে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার ওপর কী যেন একটা ভর করেছিল। আত্মবিস্মৃত এক ঘোরের মধ্যে হাত বাড়িয়ে অর্পিতার একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে আধফোটা গলায় ডেকেছিলাম, 'অর্পিতা—'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছিল অর্পিতা। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে বলেছিল, 'না-না-না—' বলেই নিজের হাতটা আমার মুঠো থেকে মুক্ত করে নিয়েছিল।

আচ্ছন্নের মতো বলেছিলাম, 'কী হল?'

অর্পিতা আবার চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'না-না-না—'

'কী না?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আরো একবার চেঁচিয়ে উঠেছে অর্পিতা। তারপর একরকম আমাকে ধাক্কা দিয়েই ছুটে একতলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আর বিভ্রান্তের মতো আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেদিন আর অর্পিতাকে দেখতে পাইনি। দোতলা বাড়িটার কোথায় যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, সে-ই জানে।

পর দিন সকালে অর্পিতা যখন আবার আমার ঘরে এসেছিল তখন সে আশ্চর্য স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর বলেছিল, 'আমার ওপর খুব রাগ করে রয়েছেন, তাই না?'

বলেছিলাম, 'রাগ করব কেন?'

'কালকের ব্যবহারের জন্যে।'

রাগ ঠিক করিনি। তবে অবাক এবং বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম ঠিকই। সে কথা আর তাকে বললাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অর্পিতা আবার বলেছিল, 'কেন কাল ওরকম করেছিলাম জানেন?'

আমি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম, 'কেন?'

'আপনি আমার হাত ধরে কী বলতেন, আমি জানতাম।'

'কী বলতাম!'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অর্পিতা বলেছিল, 'চার বছর আগে ওই জানালাটার পাশে দাঁড়িয়ে আর একজন আমার হাত ধরেছিল। সেদিন নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারিনি।'

রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কি, একদিন পূর্ণিমার রাতে আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে আমরা বিয়ে করেছিলাম।'

অর্পিতা তা হলে বিবাহিত! শুনতে শুনতে আমি শিউরে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, 'লোকটি কে?'

'আপনারই মতো একজন টুরিস্ট।'

'কী নাম?'

আমার কথাটা যেন শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গিতে অর্পিতা বলেছিল, 'আচ্ছা, আপনি তো কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নেড়েছিলাম।

'কলকাতার কোথায় থাকেন?'

'ভবানীপুরে।'

'ভবানীপুরে!' চোখ দু'টি যেন জ্বলে উঠেছিল অর্পিতার। বলেছিল, 'আপনাদের ওই এরিয়ার একটা ঠিকানা দেব। দয়া করে সেখানে একটি লোকের খোঁজ করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব। ঠিকানাটা দিন আর লোকটির নাম বলুন—'

ঠিকানা আর নাম লিখে দিয়েছিল অর্পিতা।—নং গঙ্গাপ্রসাদ চ্যাটার্জি রোড। নাম, দেবেশ সেন। দেখে চমকে উঠেছিলাম।

ওটা আমার বন্ধু দেবেশের নাম এবং ঠিকানা। কাঁপা শিথিল সুরে বলেছিলাম, 'দেবেশ সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

'চার বছর আগে এই ভদ্রলোকই আপনার মতো আমার হাত ধরেছিল আর পূর্ণিমার চাঁদ সাক্ষী রেখে কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করেছিল।'

'এখানে বেড়াতে এসে আপনাদের বাড়িতে বুঝি উঠেছিল দেবেশ সেন?'

'হ্যাঁ। বিয়ের পর কলকাতায় যাবার সময় সে বলেছিল, দিনকয়েক পরে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আর আসেনি। ওই ঠিকানায় চিঠির পর চিঠি দিয়েছি। কোনো উত্তর পাইনি।'

শুনতে শুনতে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম। একটা ঠাণ্ডা হিমাক্ত স্রোত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে দুরন্ত বেগে ওঠা-নামা করতে শুরু করেছিল। সেটা অকারণে নয়। কেননা, দেবেশ আগেই বিবাহিত। দু'টি ছেলেমেয়েও আছে তার। সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে এসে এ কী করে গেছে সে!

অর্পিতা আবার বলেছিল, 'যদি তার খোঁজ পান, দয়া করে একবার পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন আমি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।'

আমি উত্তর দিইনি। কী উত্তরই বা দিতে পারতাম!

অর্পিতা থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছিল সে, 'জানেন, ছেলেবেলা থেকেই আমি খুব হাসিখুশি। আনন্দে মেতে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার কথা মনে পড়ে, আমার নিশ্বাস যেন আটকে আসে।'

আমি নিশ্চুপ। ক্ষণে উচ্ছলা, ক্ষণে বিষণ্ণ মেয়েটার রহস্য সেদিন যেন কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে দেবেশকে ধরলাম। বললাম, 'এ কী করেছিস স্কাউড্রেল! একটা মেয়ের এমন সর্বনাশ করলি কেন?'

প্রথমটা বুঝতে পারে নি দেবেশ। বলল, 'কিসের সর্বনাশ?'

সাঁওতাল পরগনায় তার বিয়ের কথাটা মনে করিয়ে দিতে হো হো করে প্রবল শব্দ করে হেসে উঠল দেবেশ। বলল, 'তুইও যেমন! হোটেলউলির মেয়েকে ঘরে আনতে আমার বয়ে গেছে। তাছাড়া আনবই বা কী করে? ঘরে বউ রয়েছে না? বিয়ের একটা অভিনয় করে ক'টা দিন ছুঁড়িটার সঙ্গে একটু আনন্দ ফুর্তি—বুঝলি কি না!' বলে চোখের প্রান্ত কুঁচকে একটা ইঙ্গিত দিল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। আমি আর কিছু বললাম না। এই মুহূর্তে সাঁওতাল পরগনার সেই মেয়েটির মুখ বার বার মনে পড়তে লাগল। একটি লম্পটের জন্য সারা জীবন শবরীর মতো সে প্রতীক্ষা করবে।

সিপি

নাম ডিগলিপুর।

এই জায়গাটা উত্তর আন্দামানে। শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একশো মাইলের ওপর দূর। পোর্ট ব্লেয়ারের 'মেরিন' থেকে 'চলুঙ্গা' জাহাজে উঠলে একরাত্রি লং আইল্যান্ড, আর এক রাত্রি মায়া বন্দরে, পুরো দু রাত্রি কাটিয়ে তৃতীয় দিন সকালে জাহাজ এখানে নোঙর গাঁথে।

এদিকে স্যাডল পিকের চুড়ো। পাহাড়ের টিলায় টিলায়, উপত্যকায়, মালভূমিতে চুগলুম দিদু প্যাডক গাছের জটিল অরণ্য।

ওদিকে ছোট দ্বীপ—পোর্ট কর্নওয়ালিস।

পোর্ট কর্নওয়ালিসের পৌনে দু'শো বছরের একটা পুরনো ইতিহাস আছে। লর্ড কর্নওয়ালিস—ইতিহাসের সেই স্মরণীয় নায়কের নাম এই দ্বীপের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

পোর্ট কর্নওয়ালিসের ইতিহাস অন্য। তার সঙ্গে এই কাহিনির যোগসূত্র নেই।

দেড়শো বছরেরও ওপর পোর্ট কর্নওয়ালিস পরিত্যক্ত, অবজ্ঞাত। তার গৌরব নেই, মহিমা নেই। নির্জন দ্বীপের ভয়াল অরণ্য তার সমস্ত অতীত গ্রাস করেছে। পোর্ট কর্নওয়ালিসের ক্ষয়িত শিলাতটে বিপুল আক্রোশে সমুদ্র অবিরাম আছাড় খায়। তার জটিল অরণ্যে সামুদ্রিক বাতাস হাহাশ্বাসের মত বাজে।

এদিকে স্যাডল পিক, ওদিকে পোর্ট কর্নওয়ালিস। মাঝখানে ঘোড়ার খুরের আকাবে নীল জলের উপসাগর—নাম এরিয়াল বে।

এরিয়াল বে থেকে মাইলখানেক দূরে সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে। মালাবারী এবং পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের ট্রানজিট ক্যাম্প, ক্যাম্পেব পর কলোনি, কলোনির পর স্থায়ী জনপদের পত্তন হচ্ছে।

উত্তর আন্দামানের আদিম অরণ্য সংহার করে মানুষ তার অধিকারের সীমানা, জীবনের সীমানা বাড়িয়ে চলেছে।

এখন দুপুর।

নিচে উপসাগর ঝকঝক করে। ওপরে স্যাডল পিকের মাথা থেকে এক ঝাঁক সিন্ধুশকুন ছোট ডানায় বিরাট আকাশ মাপতে মাপতে পোর্ট কর্নওয়ালিসের দিকে পাড়ি জমিয়েছে।

উপসাগর আজ বড় শান্ত। নিস্তরঙ্গ নীল জলে ছোট একটা ঢেউও জাগে না। দরিয়ায় যতদূর নজর চলে, কোথাও চাঞ্চল্য নেই, মাতন নেই। দূরে নিঃসীম বঙ্গোপসাগর দুর্জ্ঞেয় বিস্ময়ের মতো স্থির হয়ে রয়েছে।

উপসাগরের খাড়ি থেকে যে খালটা বাঁক ঘুরে ঘুরে সিধে ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টের দিকে গেছে, তার মুখে ছোট একটা মোটর বোট দেখা যায়। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, এটা কোনো শেল কালেক্টরদের বোট।

অথই সমুদ্র থেকে উপসাগরের অগভীর জলে শঙ্খ, প্রবাল, ট্রোকাস, টার্বো, নটিলাস—নানা নামের নানা রূপের সামুদ্রিক কড়ি আসে। এগুলোকে বলে শেল। শেল কালেক্টররা বলে সিপি। তারা উপসাগরের জলে ডুবে ডুবে সিপি তোলে। আন্দামান সমুদ্রের সিপি জাহাজে করে

বিদেশের বন্দরে বন্দরে চালান যায়। এখানকার টার্বো ট্রোকাস শৌখিন বিদেশির চোখ ধাঁধায়। বিলাসী বিদেশির শখ মেটায়।

মোটর বোটটার নাম 'নটিলাস'।

উপসাগরের নিস্তরঙ্গ জলে মৃদু ঢেউ জাগিয়ে 'নটিলাস' অতি সন্তর্পণে এগোয়। সামান্য শব্দেই টার্বো, ট্রোকাস, শঙ্খ, কড়ি—অগভীর উপসাগর থেকে অথই দরিয়ায় পালিয়ে যাবে।

'নটিলাস' বোটের সামনের দিকে একজন ডাইভার বসে আছে। নাম লা তে; জাতে বর্মী। বর্মী হলেও লা তে কোনোকালে বর্মা মুলুক যায়নি। বাপের মুখে শুনেছে, তাদের পূর্বপুরুষের দেশ নাকি বর্মার মৌলমিন জেলায়।

লা তে'র বাপ কোতল করে আন্দামানে এসেছিল। দশ বছর দ্বীপান্তরের সাজা ভোগ করে সরকারি টিকেট পেয়ে একটা কারেন মেয়ে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে মাইল কয়েক দূরে গারাচারামা গাঁওয়ে খেতিবাড়ি করেছে।

বাপ-মা থাকে পোর্ট ব্লেয়ারে। লা তে-ও সেখানেই থাকে। শুধু সিপি তোলার মরশুমে শেল কালেক্টরদের বোটে কাজ নিয়ে উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান কি নিকোবরে চলে যায়। মরশুম ফুরোলেই পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে যায়।

কাচের মত স্বচ্ছ জল। জলতলের বালুকণা, ক্ষয়িত পাথর, সামুদ্রিক শ্যাওলা— সব পরিষ্কার দেখা যায়।

মোটর বোটটার মাঝখানে অর্ধ গোলাকার শেড। তার ওপাশে ফিস ফিস, টুকরো টুকরো দু'চারটে কথা শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।

তবু লা তে উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

'নটিলাস' বোট উপকূল ঘেঁষে নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে এগোয়।

দুপুরের ধারাল রোদ এসে পড়েছে উপসাগরের জলে।

কান দু'টো সজাগ রেখে উবু হয়ে বসে লা তে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উপসাগরের জল ফুঁড়ে নিচে নেমে যায়। ভারি সন্ধানী চোখ তার। দরিয়ার অথই অতলে, কোথায় কী আছে, চোখ বুজে নির্ভুল বলে দিতে পারে সে।

বারো বছর বয়সে সিপি তোলার কাজ নিয়েছিল লা তে। এখন তার বয়স সাতাশ। পনেরো বছরে আন্দামান সমুদ্রের সব অন্ধিসন্ধিই তার জানা হয়ে গেছে। কোন উপকূলে হাঙরের উপদ্রব, কোন উপসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো আসে, কোথায় ট্রোকাস আর স্পাইডারের আস্তানা, কোন খাড়িতে টাইগার কড়ি বেশি মেলে, কোন জাতের সিপির কোন ধাতের গতিবিধি—সব, সব তার মুখস্থ। সমুদ্রের সঙ্গে তার সমস্ত জীবনের সম্পর্ক, তার গভীর বন্ধুত্ব।

হঠাৎ চোখে পড়ে, জলতলের ক্ষয়িত শিলার খাঁজে একটা টার্বো আস্তে আস্তে বুকে হাঁটছে। গোটা দুই ছোট হাঙর টার্বোটার পাশে পাশে চলেছে।

লা তে'র ছোট ছোট চাপা চোখ দু'টো চক চক করে উঠল। কোমরের লম্বা ছোরার ফলাটায় হাত রাখল সে।

উপসাগরে ঝাঁপিয়েই পড়ত লা তে। বাচ্চা হাঙর দু'টোর পেটে ছোরার ফলা ঢুকিয়ে ছোঁ মেরে টার্বোটা তুলে আনতে কয়েক সেকেন্ড হয়ত লাগত।

কিন্তু তার আগেই শেডের ওপাশের ফিসফিস কথাগুলো স্পষ্ট হল। পানিকরের গলা শোনা গেল, 'তুই আমার পেয়ারী বাতাসী। তুকে আমার চাই।'

'না—না—'

নিস্তব্ধ উপসাগরটাকে ভয়ানকভাবে চমকে দিয়ে একটা প্রাণফাটা চিৎকার উঠল। বাতাসীই চেঁচিয়ে উঠেছে। হরিপদ সানার ধর্ম-মেয়ে বাতাসী।

উপসাগরে আর ঝাঁপাল না লা তে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল। তার কুতকুতে চাপা চোখে, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে, খাড়া দু'টি চোয়ালে ভীষণ একটা ভঙ্গি ফুটে বেরিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর শেডের ওপাশে আর কোনো শব্দ নেই। লা তে চেয়ে চেয়ে দেখল, বাচ্চা হাঙর দু'টো তাড়িয়ে তাড়িয়ে টার্বোটাকে গভীর দরিয়ার দিকে নিয়ে চলেছে।

অন্যদিন হলে কখন টার্বোটা বোটে উঠে আসত। কিন্তু এই মুহূর্তে ওটার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই লা তে'র।

অথচ লা তে'র মতো চৌখস সিপি-শিকারি সমস্ত আন্দামানে আর একটাও মিলবে না। সিপি চোখে পড়ামাত্র লা তে দরিয়ায় ডুব দেবেই। হাঙর, অক্টোপাস, কামট, রেমোরা মাছ—হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীবা যতই পাহারা দিক, সিপি তুলবেই লা তে। ডাইভ দিলে শূন্য হাতে সে উঠে আসে না। দরিয়ার অতল থেকে কিছু খাজনা আদায় করে সে আনবেই।

সিপি তুলতে তুলতে নেশা ধরে যায় লা তে'র। সিপি দেখলেই শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অন্য ডাইভাররা যখন দশটা সিপি তোলে, সেই সময়ে লা তে তোলে বিশটা। সিপি তোলাব মরশুমের অনেক আগেই শেল কালেক্টররা আগাম টাকা দিয়ে তাকে ভাড়া করে। এবছরের জন্য তাকে ভাড়া করেছে পানিকর।

এই মুহূর্তে উত্তেজনা, রোষ এবং রাগ-মেশা এক বিচিত্র অনুভূতিতে সমস্ত দেহের বোধগুলো টান টান হয়ে গেছে লা তে'র।

একসময় চোখের সামনে দিয়ে টার্বোটা আর বাচ্চা হাঙর দু'টো গভীর সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই উপসাগর আর উপকূলের ম্যানগ্রোভ বন, সব আশ্চর্য রকম নিঝুম। শেডের ওপাশের ফিসফিসানির শব্দও থেমে গেছে।

টার্বো, বাচ্চা হাঙর দু'টো, উপসাগর কিংবা দূরের স্যাডল পিক, কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই লা তে'র। সে ভাবছিল।

ঠিক দু'মাস আগে এ বছরের সিপি তোলার মরশুম শুরু হয়েছে। আর তখনই ডিগলিপুরে চলে এসেছিল লা তে।

ডিগলিপুরে তার চেনাজানা কেউ নেই। এ দিকটায় সবেমাত্র নতুন সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে। হাজার হাজার বছরের অরণ্য সংহার হচ্ছে। জমি জরিপ হচ্ছে, চাষের উপযোগী করে খেত বানানো হচ্ছে। টিলার মাথায় মাথায় বেতপাতার ছাউনি আর বাঁশের বেড়া দিয়ে মাথা গোঁজার জন্য ঝুপড়ি তোলা হচ্ছে। উত্তর আন্দামানের মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে জনপদ মাথা তুলছে।

লা তে'র ভাবনায় ছেদ পড়ল।

আকুল গলায় এবার বাতাসী শেডের ওধারে বলছে, 'সাহেব বাবা, আমারে ছাইড়া দ্যান। আমি বাড়িত্ যামু।'

পানিকর কিছু বলল না। খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল।

কান খাড়া করে রইল লা তে। কিন্তু না, শেডের ওপাশটা ফের নিঝুম হয়ে যায়। পানিকরের নোংরা, কর্কশ হাসি, বাতাসীর ব্যাকুল গলা আর শোনা যায় না।

চোখদু'টো উপসাগরের অতল জলে স্থির রেখে ঝিম মেরে বসে থাকে লা তে। 'নটিলাস' বোট ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে এগোয়। এরিয়াল বে'র স্থির জলে ঢেউ ওঠে কি ওঠে না।

জলের নিচে লাল নীল অসংখ্য পাথর ঝিকমিক করে। দুপুরের ধারাল রোদে জলতলের বালুকণাগুলো যেন জ্বলতে থাকে। রঙিন পাথর এবং বালির বিছানায় হঠাৎ সবুজ রঙের একটা আলোর পিণ্ড দেখা যায়। সেটা স্থির হয়ে রয়েছে, রোদ লেগে তার গা থেকে উজ্জ্বল দ্যুতি ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে।

অভ্যাসবশে চাপা চাপা কুতকুতে চোখদু'টো চকচক করে লা তে'র। কোমরের খাঁজে লম্বা ছোরার ফলাটায় হাত রাখে সে।

একবার দেখেই বুঝতে পারে লা তে। ওটা একটা ক্লাম। বিরাট বিরাট গোলাকার দু'টো পাল্লা খুলে ভেতরের সবুজ আলোকপিণ্ড মেলে ধরেছে।

কুতকুতে চোখদু'টো চকচকই করল, ছোরার বাঁটে হাতও রাখল লা তে। এতবড় ক্লাম এই মরশুমে একটাও নজরে পড়েনি। তবু, তবু ডাইভ দিয়ে উপসাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো কোনো উৎসাহই দেখাল না সে।

'নটিলাস' বোট ক্লামটাকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেল।

এবার দু'টো খাড়া হাঁটুর ফাঁকে থ্যাবড়া থুতনিটা গুঁজে বসল লা তে। সামনে দুর্বোধ্য রহস্যের মতো নীল জলের উপসাগর, আরো দূরে বিপুল সমুদ্র।

বোট নিয়ে সেই সকালে বেরিয়েছে লা তে'রা। অন্যদিন দুপুরের মধ্যে সিপিতে সিপিতে বোট আধাআধি ভরে যায়। কিন্তু আজ ছোট একটা ফ্রগশেলও তোলেনি সে।

উপসাগরের নিচে বালির বিছানায় অসংখ্য আঁকাবাঁকা দাগ। ওগুলো সিপি চলার চিহ্ন। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে লা তে ভাবতে লাগল।

দু'মাস আগে ডিগলিপুরে এসেছিল তারা। পানিকরই হরিপদ সানার বাড়িতে তার খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। হরিপদ সানা 'নটিলাস' বোটের আর একজন শেল ডাইভার। এরিয়াল বে থেকে মাইল ছয়েক দূরে রিফিউজি সেটেলমেন্টের আবাদ আর বসতের জমি পেয়ে ঘর তুলেছে সে।

ক'বছর ধরেই দেখছে লা তে, পূর্ব বাংলার রিফিউজিরা আন্দামানে আসছে। দক্ষিণ আন্দামানে, হ্যাভলক দ্বীপে, মধ্য আন্দামানে জঙ্গল সাফ করে বসতি গড়ে উঠছে। এবার সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে উত্তর আন্দামানে। কালারা, টুগাপুর, ডিগলিপুর, পাগলিপুরে।

হরিপদ সানার মুখেই শুনেছে, বছরখানেক আগে তারা ডিগলিপুরে এসেছে। সেটেলমেন্টে সাত একর জমিও পেয়েছে।

হরিপদ জবর কাজের মানুষ। আবাদের মরশুমে খেত চষে মসলি ধান বোনে। সিপি তোলার কায়দাকানুন শিখে এই পয়লা বছর পানিকরের বোটে কাজ নিয়েছে।

হরিপদ সানা রিফিউজি। তারই ধর্ম-মেয়ে বাতাসী।

শেডের ওপাশে সেই বাতাসীর গলা আবার ফুটে উঠল, 'আমারে ছাইড়া দ্যান বাবা। আপনের পায়ে ধরি।'

পানিকর বলে, 'ডরাচ্ছিস কেন বাতাসী? তুকে পুট বিলাস (পোর্ট ব্লেয়ার) লিয়ে যাব। শাড়ি দিব, গয়না দিব, হার দিব। আর কী লিবি বল?'

আন্দামানে নানা জাতির বাস। কারেন, মোপলা, বাঙালি, শিখ, পাঠান, বর্মী—ছত্রিশ ভাষার মধ্যে হিন্দি ও উর্দু মিশে এক বিচিত্র ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সবাই এই ভাষা বোঝে। প্রাণের দায়ে

বুঝতে হয়। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক, অনেক দূরে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালায় একের কথা অন্যের না বুঝে উপায় নেই।

বাতাসীও পানিকরের কথা বুঝল।

বাতাসী কাঁদে। বলে, 'না না, আমি বাড়িত্ যামু।'

পানিকর বলে, 'পুট বিলাস (পোর্ট ব্লেয়ার) চল। তোর বহুত সুখ হবে। না হলে ডিগলিপুরের জঙ্গলে পড়ে থেকে মরবি।'

বাতাসীর গলা ফেঁড়ে ফিনকির মতো তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরোয়, 'না না, পুট বিলাস যামু না। বাপের কাছে যামু।'

পানিকর আর কিছু বলল না।

শেডের এধারে হাঁটুর ফাঁকে থ্যাবড়া থুতনিটা কঠিন হয়ে উঠল লা তে'র।

'নটিলাস' বোট এগিয়েই চলে।

শেডের পাশে অনেকক্ষণ আর আওয়াজ নেই। একবার মুখ তুলল লা তে। এ পাশ থেকে বাতাসী কি পানিকর, কাউকেই দেখা গেল না।

পশ্চিম দিকের দরিয়ায় সূর্যটা সামান্য ঢলেছে। এরিয়াল বে'র নীল জল চকমক করে।

লা তে আবার ভাবতে লাগল।

গত দিন সাতেক ধরে লা তে একাই সিপি তুলছে। হরিপদ সানা আর সিপি তুলতে আসে না। লা তে জানে. আর কোনোদিনই হরিপদ উপসাগরে সিপি তুলতে আসবে না। অদ্ভুত এক আক্রোশে সাতাশ বছরের মজবুত দেহের শিরাস্নায়ুগুলো ফেটে পড়তে চায়। উত্তেজনায় বর্মী লা তে'র কপালের দু'পাশে দু'টো বগ সমানে লাফায়। গলার ভেতর একরাশ ধারাল বালি যেন খরখর করে।

সারা জীবন সমুদ্রের ..ঙ্গ পাল্লা দিয়ে লড়াই করেছে লা তে। হাঙর কামটের মুখ থেকে সিপি তুলে এনেছে। হিংস্র রোমোরা মাছের পাঁজরে ছোরার ফলা ঢুকিয়ে রক্তে রক্তে উপসাগরের নীল জল লাল করে আ..মোদ পেয়েছে। সমুদ্র অনেক সময় ফাঁদ পাতে। ওপরে স্তব্ধ শান্ত জল কিন্তু নিচে চোরা ঘূর্ণি পাক খায়। তারও নিচে টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস—এমনই অসংখ্য সিপি সাজিয়ে রেখে দরিয়া চুপচাপ মজা দেখে। ওপর থেকে বুঝবার জো নেই, একবার ডাইভ দিলে চোরা ঘূর্ণির টানে টার্বো ট্রোকাসের কাছে পৌঁছুবার আগেই অতল সমুদ্রে চলে যাবে লা তে। সমুদ্রের সব তামাশাই তার জানা।

পনেরো পছর সিপি তুলছে সে। টার্বো, ট্রোকাস, টাইগার কড়ি, স্পাইডার, ফ্রগ শেল—সিপি আর সমুদ্রের মধ্যেই তার অন্তরঙ্গ দুনিয়া।

দরিয়ায় ডুবে ডুবে সিপি তোলা ছাড়া জীবনের আরো কিছু মহিমা যে আছে, এই মরশুমে ডিগলিপুর এসে প্রথম বুঝতে শিখেছে লা তে।

সিপি তুলে, কামট হাঙরের পেটে ছোরার ফলা ঢুকিয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিয়েছে সে। দুনিয়ার অন্য কোনো দিকে নজর দেবার ফুরসতই ছিল না। দরিয়ার সঙ্গে যুঝে যুঝে মনটা বন্য, উদ্দাম হয়েই ছিল লা তে'র। তার মনে সূক্ষ্ম অনুভূতি সাড়া জাগাত না।

এই মরশুমে ডিগলিপুরে এসে এতকালের ভাবনাচিন্তার ধরনটাই বদলে যেতে শুরু করেছে।

দু'মাস আগে বাতাসীকে প্রথম দেখেছিল লা তে।

মরশুমের প্রথম দিন উপসাগরের জলে ডুবে ডুবে সিপি তুলেছিল সে আর হরিপদ। সন্ধ্যার অল্প আগে ছ'মাইল টিলা জঙ্গল পেরিয়ে হরিপদর সঙ্গে তার বাড়ি গিয়েছিল।

যেতে যেতে বেশ রাত হয়েছিল।

পানিকরই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সিপির মরশুমে সমস্ত দিন উপকূলে উপকূলে হানা দিয়ে সিপি তুলবে। সন্ধ্যায় হরিপদর বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া সারবে। রাতটা ওখানেই কাটিয়ে সকালে উঠে আবার এরিয়াল বে'তে আসবে। 'নটিলাস' বোট তাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করবে।

প্রথম দিন ভারি দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল লা তে'র।

হরিপদ সানার ঘরে বেতপাতার ছাউনি, বাঁশের বেড়া, বাঁশের পাটাতন। টিলার মাথায় ঘর। পাশ দিয়ে ছোট একটা পাহাড়ী নদী বাঁক ঘুরে ঘুরে বয়ে গিয়েছে। নাম কিলপং। চারিদিকে জঙ্গল। চুগলুম পেমা টমকিঙ গাছের জটিল জটলা। রাত্রির অরণ্য দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছিল তখন।

সামনে কুপি জ্বলছিল। কিলপং নদী থেকে হাত মুখ ধুয়ে পাশাপাশি খেতে বসেছিল হরিপদ আর লা তে। বাতাসী ভাত-তরকারি-মাছ দিচ্ছিল তাদের।

লা তে চোখ তুলে একবার দেখেছিল, ভাত টাত দেওয়া হলে কাপড়খানা সারা দেহে ভালো করে জড়িয়ে এক কিনারে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে বাতাসী।

বাতাসীর চোখ নিচের দিকে নামানো। প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিল লা তে, মেয়েটার বড় লজ্জা।

লা তে ভাত নাড়াচাড়া করছিল। সারাদিন সমুদ্রের জলে ডুবে সিপি তুলেছে। তারপর ছ'মাইল টিলা জঙ্গল পেরিয়ে এসেছে। ক্লান্তিতে খাওয়ার ইচ্ছাটা তেমন ছিল না।

হরিপদ বড় বড় গরাস তুলছিল মুখে আর বলছিল, 'খা লা তে। শরম করিস না। ওরে শরম কি? ও আমার ধরম মাইয়া বাতাসী।'

লা তে জবাব দেয়নি। ঘাড় গুঁজে ভাতের সঙ্গে লাল ভেটকির সুরুয়া মাখছিল।

আর কুপির আলো পড়েছিল বাতাসীর মুখে। সোনার মতো গায়ের রং বাতাসীর। সেই রঙে লজ্জা আর আলো মিশে লা তে'র দু'চোখে ধাঁধা লাগিয়েছিল। পোর্ট ব্লেয়ারে বর্মী কারেন, স্বজাতের বহু রূপসী যুবতী দেখেছে লা তে। কোনো মেয়ের এত লজ্জা কখনও দেখেনি।

ছোট ছোট পাথরে আঘাত খেয়ে কিলপং নদী অবিরাম বেজে যাচ্ছিল। নদীর বাজনা, চারপাশের দুর্জ্ঞেয় অরণ্য, আবছা অন্ধকার, অস্পষ্ট টিলা পাহাড়, তারই মধ্যে প্রথম দেখা বাতাসীকে বড় দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল লা তে'র। সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল, সিপি আর দরিয়ার বাইরে দুনিয়ায় আরো কিছু আছে, যার স্বাদ এই সাতাশ বছরের জীবনে অজানাই ছিল তার।

প্রথম দিনটির পর আরো কতবার সে দেখেছে বাতাসীকে। দুর্বোধ্য বাতাসী দিনে দিনে আরো দুর্বোধ্য হয়েছে। সমুদ্রের অতল থেকে একান্ত অবলীলায় সিপি তুলে আনে লা তে। কিন্তু বাতাসী যেন দুর্জ্ঞেয় দরিয়া; এই দরিয়ার কোনো অন্ধিসন্ধিই জানা নেই তার। কোন টার্বোর কঠিন আবরণের মধ্যে মনটাকে পুরে রেখেছে বাতাসী তার হদিশই পায় নি লা তে।

রাত্রে এক ঘরে থাকে হরিপদ, হরিপদর বউ আর বাতাসী। পাশের ঘরের মাচানে শোয় লা তে। শুয়ে শুয়ে তার ঘুম আসে না।

গভীর রাতে উত্তর আন্দামানের সেই সেটেলমেন্টটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ঘন ধোঁয়ার মতো ভারী কুয়াশা চড়াই উতরাই, টিলা, অরণ্য ঢেকে ফেলে। কোথাও জীবনের এতটুকু লক্ষণ থাকে

না। তবু ঘুম আসে না লা তে'র। অদ্ভুত এক উত্তেজনা দিবারাত্রি তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যেতে থাকে।

প্রথম রাত্রির সেই লজ্জাবতী বাতাসী ধীরে ধীরে বদলাতে লাগল। তার কথা পুরোপুরি বোঝে না লা তে। তবুও বড় ভালো লাগে। এই আজব বাঙালি মেয়েটা তার বুকে দরিয়ার তুফান তুলেছে।

ভাত দিতে দিতে একদিন বাতাসী বলেছিল, 'বর্মা ভাইয়ের খাইতে জুত হয় না। পচা 'নাপ্পি' (নাপ্পি বর্মীদের প্রিয় খাদ্য, শুঁটকি মাছ থেকে পাকানো হয়।) তো নাই।'

বর্মী থেকে বর্মা। বাতাসী লা তে'কে বর্মা ভাই বলে।

লা তে জবাব দেয় না।

বাতাসী মুখে কাপড় গুঁজে খিল খিল করে হাসে। বলে, 'বর্মা ভাই, পচা নাপ্পির গোন্ধে নাকি প্যাটের নাড়িভুড়ি উলটাইয়া আসে। তোমরা খাও কেমনে?'

বাতাসীর রকম দেখে লা তে'ও ঘাড় গুঁজে হাসে।

আর একদিন শরমবালী বলেছিল, 'চুপচাপ মনমরা হইয়া থাকো ক্যান বর্মা ভাই? পুট বিলাসে বউ রাইখা আইছ বুঝি? তার লাইগা মনটা কেমুন জানি করে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে লা তে বলেছিল, 'বউ নেই।'

বিস্ময়ে চোখের তারা কপালে উঠেছিল বাতাসীর। তীক্ষ্ণ, অদ্ভুত স্বরে বলেছিল, 'আ গো পুরুষ, অখনও বিয়াই কর নাই! সারা জনম তা হইলে করলা কি?'

বলেই খিল খিল হাসির তুফান তুলেছিল বাতাসী। তার দীঘল সুঠাম দেহটি বেঁকে দুমড়ে দলা পাকিয়ে যাচ্ছিল। আর বাতাসীর হাসির তুফান বেজেছিল লা তে'র বুকে। সারারাত্রি বাঁশের মাচানে ছটফট করেছিল সে। অদ্ভুত এক আক্ষেপ, বিচিত্র এক যন্ত্রণা চোখা ছুঁচের মতো বুকের মধ্যে বিঁধছিল। সারা জীবন দরিয়া থেকে সিপিই তুলল সে, আর কিছুই করতে পারল না।

তামাশাবালী আর একদি অদ্ভুত কথা বলেছিল।

সেদিন একা একা, একটু আগেই ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে ফিরে এসেছিল লা তে। বিকেলের রাঙা রোদ দীর্ঘ গর্জন গাছের মাথা পেরিয়ে কিলপং নদীতে এসে পড়েছে। নরম আলোয় দূর থেকে ছোট পাহাড়ী নদীটিকে সোনার পাতের মতো দেখাচ্ছিল।

টিলা আর জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশ আর বেতপাতার ছোট ছোট ঘর। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লা তে'র। মনটা তার সেদিন বেশ খুশি খুশি। সিপি এবং দরিয়ার বাইরে আর একটা দুনিয়ার চাবিকাঠি তার হাতে এসে গেছে।

সেদিন সিপি তোলেনি লা তে। সকালে ফরেস্টের বোটে মায়াবন্দর গিয়েছিল; সেখান থেকে বাতাসীর জন্য একখানা বাহারি শাড়ি কিনে সোজা সেটেলমেন্টে ফিরেছিল।

উঁচু একটা টিলার মাথায় উঠেই চোখে পড়েছিল বাতাসী জল নিতে এসেছে কিলপং নদীতে। তার সঙ্গে কপিলা। কপিলা বাতাসীর সই—চন্দ্র জয়ধরের মেয়ে। দু'মাস সেটেলমেন্টে যাতায়াতের ফলে সকলের সঙ্গে চেনা-পরিচয় হয়েছিল লা তে'র।

তর তর করে টিলা বেয়ে নিচে নামতে নামতে লা তে ডেকেছিল, 'বাতাসী—'

কপিলা বাতাসী, দু'জনেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বাতাসী বলেছিল, 'আ গো পুরুষ, তুমি! আমি ভাবলাম, না জানি কে? ভর বিকালে নিশিতে ডাকে নাকি!' আগের মতো সে আর তখন বর্মা ভাই বলত না।

বুকের মধ্যে উথলপাথল ঢেউ উঠেছিল লা তে'র। কিন্তু নদীর পাড়ে বাতাসীর কাছাকাছি এসে সব কথা উধাও হয়েছিল তার মুখ থেকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বাতাসীর দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

হঠাৎ তামাশাবালী বলেছিল, 'আ গো পুরুষ, দেখ কি—বিয়া করবা?'

ছোট ছোট, চাপা চোখদু'টো চকচক করে উঠেছিল লা তে'র।

বাতাসী আবার বলেছিল, 'দেখ দেখি, আমার সইরে মনে ধরে কিনা! অজাত বিজাত মানুম না। বর্মাই হও আর যাই হও, তোমার হাতেই সইয়ের জাইত দিমু।'

খিল খিল করে কিলপং নদীর স্রোতের শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুই সই হেসে হেসে ভেঙে পড়েছিল।

বেশিক্ষণ দাঁড়ায় নি লা তে। তামাশার রকমটা খানিক বুঝে, খানিক না বুঝে সামনের উঁচু টিলাটা বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এরিয়াল বে'র দিকে যেতে যেতে ভেবেছিল, বাতাসী নামে দুর্জ্ঞেয় দরিয়া থেকে তার মনের সিপিটা বুঝি কোনোকালেই তুলে আনা যাবে না।.....

এই দুপুর বেলায় পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘোর লেগেছিল লা তে'র। চোখের সামনে উপসাগর, দূরে স্যাডল পিক, ম্যানগ্রোভের বন, ক্ষয়িত শিলাতট—অথচ কিছুই সে যেন দেখছিল না।

'নটিলাস' বোটটা হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। লা তে চমকে উঠল। ভাবনার ঘোরটা ছিঁড়ে গেল তার।

শেডের ওপাশ থেকে পানিকর ডাকল, 'লা তে—'

লা তে জবাব দিল, 'জি—'

'সিপি তুলছিস না যে?'

লা তে'র জবাব দেওয়া আর হল না। তার আগেই তার চোখের ঈষৎ পিঙ্গল তারা দু'টো নেচে উঠল। উপসাগরের নিচে একটা বড় আকারের সান ডায়াল গুটি গুটি এগোচ্ছে। আর বিরাট এক হাঙর সেটার চারপাশে ঘুরছে। মাঝে মাঝে হাঙরটা হাঁ করে। সারি সারি হিংস্র দাঁতগুলো জলের নিচে ঝকঝক করে ওঠে। বিচিত্র উল্লাসে জন্তুটা ডিগবাজি খায়।

দেখতে দেখতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল লা তে'র। সান ডায়াল তার বড় প্রিয় সিপি, অ্যাসিড দিয়ে সাফ করে নিলে হীরের মতো ঝকমক করে। কোমরের খাঁজে ছোরার বাঁটে হাত রাখল সে।

পানিকর আবার বলল, 'সিপি তুলছিস না যে লা তে?'

ফিস ফিস করে লা তে বলল, 'বহুত বড় একটা হাঙর—'

শেডের ওপাশ থেকে পানিকরের গলা ভেসে এল, 'তোর আবার হাঙরের ভয়! হাঙরই তো তোকে ডরায়।'

'হাঁ ডরায়!' অদ্ভুত স্বর ফুটল লা তে'র গলায়।

পানিকর আবার বলল, 'কী সিপি রে?'

'সান ডায়াল—'

'হাঙর মেরে সান ডায়ালটা তোল।'

'থোড়েসে সবুর—'

হাঁটু দু'টোর মধ্যে থ্যাবড়া থুতনি ঢুকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল লা তে। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, বিরাট হাঙরটা চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে সান ডায়ালটাকে ঠুকরে ঠুকরে আদর করছে।

উপসাগরের স্তব্ধ জলে 'নটিলাস' বোট স্থির হয়ে রয়েছে। জলের নিচে সানডায়াল, হাঙর—সব যেন চোখের সামনে থেকে মুছে গেল লা তে'র।

হাঙর। হ্যাঁ, বিরাট এক হাঙর।

হঠাৎ কয়েকটা টুকরো টুকরো পুরনো কথা আর ঘটনা দলা পাকিয়ে ভিড় করে এল তার মনে।

এই মরশুমে দু'টো মাস হরিপদ সানার বাড়িতে খেয়েছে, শুয়েছে লা তে। মাত্র দিন দশেক আগে প্রথম টের পেয়েছে, শুধু সে-ই নয়, পানিকরও ফাঁক বুঝে ছ'মাইল টিলা জঙ্গল পেরিয়ে সেটেলমেন্টে আসে। সরাসরি হরিপদর ঘরে ওঠে।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বোঝেনি লা তে। যখন বুঝল আক্রোশে, উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে উঠল।

কিলপং নদীর কিনারে এক নির্জন সন্ধ্যায় বাতাসীকে পেয়ে গিয়েছিল লা তে। অস্থির গলায় জিগ্যেস করেছিল, 'পানিকর আসে কেন?'

তীক্ষ্ণ শব্দ করে রহস্যময় ভঙ্গিতে হেসেছিল বাতাসী। অদ্ভুত গলায় বলেছিল, 'তুমি আসো ক্যান পুরুষ?'

সেদিন জবাব দিতে পারে নি লা তে। নিজের কাছেই জবাবটা স্পষ্ট ছিল না।

আর-একটা কথা মনে পড়ল। সেটা তিন দিন আগের ঘটনা।

'নটিলাস' বোটটা উপকূল ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। বেলা তখন ফুরিয়ে আসছে, একটা ধূসর রঙের আবরণ উপসাগরটাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। অনন্ত রহস্যের মতো যে দরিয়া দূরে পড়ে ছিল, তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। সাগরপাখিগুলো উপকূলের দিকে উড়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে।

'নটিলাস' বোটের সামনের দিকে বসে ছিল লা তে আর হরিপদ। শেডের ওপাশে পানিকর। সারাদিন সমুদ্রের জলে ডুবে ডুবে সিপি তুলেছে দু'জনে। দরিয়ার নোনা জল শুকিয়ে সমস্ত গায়ে কণা কণা নুন হয়ে ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ শেডের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি মেরে ওপাশে গিয়েছিল হরিপদ। এধারে একা একা চুপচাপ বসে ছিল লা তে।

একটু পর ওধার থেকে ফিসফিস, চাপা গলার আওয়াজ কানে এসেছে।

পানিকর বলছিল, 'হাজার টাকা দেব। তোমাকে আর সিপির কাজ করতে হবে না।'

হরিপদ বলেছিল, 'দুই হাজার দ্যান বাবা, ধরম মাইয়ারে আপনের হাতেই দিমু।'

'হাজার অনেক দাম। অন্য মেয়ে তার পাঁচশোতেই মেলে। আচ্ছা দু হাজারই দেব। মঙ্গলবার বাতাসীকে এরিয়াল বে'তে দিয়ে যাবে। টাকা খেয়ে শয়তানী করবে না তো?'

তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক করে শব্দ করেছিল হরিপদ। বলেছিল, 'আমি নিমকহারামি করি না বাবু।'

শেডের এপাশে অসহ্য যন্ত্রণায় শিরাস্নায়ুগুলো যেন ছিঁড়ে পড়ছিল লা তে'র।

সেদিনই হরিপদকে একা পেয়ে লা তে অনেক বুঝিয়েছে, 'পানিকরকে আমি চিনি, পয়লা নম্বরের হারামী। ওর কাছে মেয়ে বেচো না হরিপদ। ও হারামী মাদ্রাজে মেয়ে চালান দেয়। সচ বলছি, ফায়া কসম।'

হরিপদ খেঁকিয়ে উঠেছে, 'আমার মাইয়ারে বেচি কিনি কাটি মারি, তর কী রে সুমুন্দির পুত বর্মা?'

শুনতে শুনতে দু'চোখ ধক ধক করে উঠেছে লা তে'র। হরিপদর কথার জবাব দেয় নি সে। কেন জানি তার মনে হয়েছিল, ভীষণ এক দরিয়ায় সান ডায়ালের চেয়ে অনেক প্রিয় এক সিপির চারপাশে এক বিচিত্র ধরনের হাঙর হিংস্র দাঁত মেলে পাহারা দিচ্ছে।.....

'আজ সেই মঙ্গলবার।

ঘুম ভাঙার পর থেকে লা তে সব লক্ষ করে চলেছে। সকালে সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসীকে এরিয়াল বে'তে দিয়ে গেছে হরিপদ। হাজার টাকা বাতাসীর দাম বাবদ আগাম নিয়েছিল। বাকি টাকা চুকিয়ে বাতাসীকে 'নটিলাস' বোটে তুলেছে পানিকর।

সেই সকাল থেকে বাতাসীকে নিয়ে ঘুরছে বোটটা।

অভ্যাসবশে উপসাগরের নিচে আবার চোখ চলে যায় লা তে'র। সান ডায়ালটার চারপাশে বিরাট হাঙরটা খুশিতে মেতে আছে। ডিগবাজি খাচ্ছে, উলটে পালটে কত ধরনের কসরতই না দেখাচ্ছে! মুখ ভরে জল নিয়ে হুস করে ছুড়ে দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে চোখদু'টো জ্বালা করে উঠল লা তে'র।

আচমকা শেডের ওপাশ থেকে পানিকরের গলা ফের ভেসে এল, 'কাল 'চলুঙ্গা' জাহাজ আসবে। কালই তোকে পুট বিলাস নিয়ে যাব।'

'না না, আমি পুট বিলাস যামু না। আমারে ছাইড়া দ্যান।' বাতাসী আলুথালু হয়ে চেঁচায়। 'নটিলাস' বোট দুলে দুলে ওঠে।

বাতাসীর চেঁচানি গ্রাহ্যই করে না পানিকর। বলে, 'কিছুক্ষণ পর আমরা এখান থেকে মায়াবন্দর যাব। সেখান থেকে কাল পুট বিলাস।'

'না না।' বিকট চিৎকারে উপসাগরেব স্তব্ধতা খান খান করে হঠাৎ জলে লাফ দেয় বাতাসী। ঝপাং করে শব্দ ওঠে। নোনা জল ছিটকে এসে লাগে 'নটিলাস'-এর গায়ে।

পানিকর দাঁড়িয়ে ওঠে, সমানে চিল্লায়। মাথার চুল দু'হাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'আমার দু হাজার টাকার মাল বরবাদ হয়ে গেল। বাতাসী, বাতাসী--'

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল লা তে। চোখের তারা নড়ছে না। শিরাস্নায়ুগুলো অবশ হয়ে গেছে যেন। নিজের ওপর নিজের কোনো ইচ্ছাই যেন ক্রিয়া করছে না।

স্তব্ধ চোখে লা তে দেখছে, উপসাগরে হাবুড়ুবু খেতে খেতে বাতাসী ডুবে যাচ্ছে। তবুও নড়ল না সে, নড়তে পারল না।

একবার জলের ওপর ভেসে উঠল বাতাসী। করুণ, কাতর চিৎকার করে বলল, 'বাচাও, আমারে বাচাও—'

লা তে দেখল, সান ডায়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে বিরাট হাঙরটা বাতাসীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার মস্ত শরীর জলের নিচে স্থির হয়ে রয়েছে। আন্দামান উপসাগরের বুভুক্ষু হাঙর এমন লোভনীয় শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওত পেতেছে।

বাতাসীর মাথা আবার ভেসে উঠল। ফের সে চেঁচাল, 'বাচাও, বাচাও— মরলাম— মরলাম—' তার চিৎকার উপকূলের ম্যানগ্রোভ বনে সমানে ঘা খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগল।

এবার তীব্র একটা ঝাঁকানি লেগে লা তে'র সব আড়ষ্টতা খসে গেল যেন। কোমরেব খাঁজ থেকে ছোরার ফলাটা সাঁ করে বার করল সে। তারপর উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হাঙরটা একটু ঘুরে দাঁড়াল। হিংস্র ভীষণ চোখে দেখতে লাগল, আরো একটা শিকার একেবারে মুখের সামনে এসে পড়েছে। স্বচ্ছ জলের নিচে তার চোখদু'টো ঝকঝক করছে।'

বাঁ হাত দিয়ে বাতাসীর শরীরটা জলের ওপর ভাসিয়ে রাখল লা তে। ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে ধরা।

হাঙরটা তীব্র গতিতে ছুটে এল। বাতাসীকে ভাসিয়ে রেখে একটু সরে গেল লা তে। হাঙরটা ওপাশে বেরিয়ে গেল। দাঁত বার করেই সঙ্গে সঙ্গে আবার তেড়ে এল। দরিয়ার সব গোপন তথ্য, হাঙরের স্বভাব, সবই লা তে'র জানা। চোখের পলকে একপাশে সরে গিয়ে হাঙরটার ঘাড়ের কাছে ছোরাটা বসিয়ে দিল সে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে উপসাগরের জলে মিশতে লাগল।

ছোরার খোঁচা খেয়ে হাঙরটা ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

'নটিলাস' বোটের মাথায় সমানে চিল্লাচ্ছে পানিকর, 'হাঙরটাকে মার লা তে। একশো টাকা দেব। আমার দু হাজারের মাল বরবাদ হয়ে গেল। বাতাসীকে তুলে দে লা তে, বকশিশ দেব।'

একটু দূরে গিয়ে ক্রূর চোখে চেয়ে আছে হাঙরটা। শিকারটাকে যত সহজে বাগানো যাবে ভেবেছিল, আদপেই ব্যাপারটা তত সহজ নয়।

বাঁ হাত দিয়ে বাতাসীর পুরো দেহের ভার উপরের দিকে ঠেলে রেখেছে লা তে। যন্ত্রণায় হাতটা ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

দম ছাড়ার জন্য একবার ভুস করে ভেসে উঠেছিল লা তে। সেই সুযোগে হাঙরটা দাঁতের ধারাল কামড় বসিয়ে লা তে'র উরু থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

হাঙরের ঘাড় থেকে রক্ত ঝরছে, লা তে'র উরু থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। মানুষ আর হাঙরের রক্তে উপসাগরের জল লাল হয়ে উঠেছে।

লোনা জল লেগে উরুর ক্ষতটা ভীষণ জ্বলছিল। কিন্তু লা তে'র লক্ষ্য নেই সেদিকে। এখন একটু অসাবধান হলে সর্বনাশ। হাঙরের ধারাল দাঁত তাকে আর বাতাসীকে চিরে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে।

আবার ডুব দিল লা তে। তার জানা আছে, জখমী হাঙর বড় মারাত্মক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জন্তুটার গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল সে।

এর মধ্যে আর এক বিপত্তি ঘটল। জল খেয়ে খেয়ে আর ভয়ে বাতাসী জ্ঞান হারিয়েছে, তার অসাড় দেহটা বাঁ হাতে আর ঠেলে রাখতে পারছে না লা তে।

হঠাৎ মাথায় একটা মতলব খেলে গেল তার।

শ' দুই হাত দূরে উপকূল। সেখানে ক্ষয়িত শিলা আর ম্যানগ্রোভ বন। পাড়ে উঠতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে।

ডুব দিয়ে বাতাসীর অসাড় দেহটা ভাসিয়ে রেখে রেখে পাড়ের দিকে সরতে লাগল লা তে।

হাঙরটা লা তে'র মতলব বুঝল। তীরবেগে তাদের দিকে ছুটে এল। ছোরার ডগা দিয়ে পেটের কাছটা চিরে দিল লা তে। উপসাগর আরো লাল হয়ে উঠল। হাঙরটা পিছিয়ে গেল। হয়তো বুঝল, শিকারটি সাঙ্ঘাতিক। আদতে ওটা শিকারই নয়, ভয়ঙ্কর এক প্রতিপক্ষ।

দরিয়া আর হাঙরের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে পাড়ের অনেক কাছে এসে পড়ল লা তে। এখানে জল অনেক কম, বুক-সমান। কিন্তু নিচের ভাঙা ভাঙা পাথরে হাজার বছরের শ্যাওলা জমে রয়েছে। সেখানে পা রাখা যায় না, পিছলে যায়।

জখমী হাঙরটাও সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে এসেছে। শ্যাওলা-জমা পাথরে পা রাখতে গিয়ে পিছলে গিয়েছিল লা তে। সেই ফাঁকে পায়ের গোছ থেকে এক খণ্ড মাংস কেটে নিয়ে গেল হাঙরটা।

সামনে বিরাট হাঙর, বাঁ হাতে এক অসাড় যুবতীর দেহ, পায়ের নিচে পিছল পাথর—এমন মারাত্মক অবস্থায় জীবনে পড়ে নি লা তে। পা থেকে, উরু থেকে রক্ত ঝরছে। লোনা জলে ক্ষতগুলো জ্বালা করছে। ভীষণ এক যন্ত্রণা সমস্ত শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে, শরীরটাকে অবশ করে দিচ্ছে। কিন্তু না, অত সহজে হার মানলে চলবে না। সমুদ্রের অতল থেকে, হিংস্র জলচর জানোয়ারের মুখ থেকে সিপি কুড়োয় লা তে। কোনোকালে দরিয়ার লড়াইয়ে সে হার মানে নি। আজও মানবে না। লা তে মরিয়া হয়ে উঠল।

পাড়ের দিকে আরো অনেকটা সরে এসেছে লা তে। জল এখানে কোমর সমান। একটা শ্যাওলাহীন বড় পাথর মিলল। বাঁ হাতে বাতাসীকে জড়িয়ে ধরে, ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে রাখল সে।

'নটিলাস' বোট থেকে পানিকর সমানে উৎসাহ দেয়, 'দুশো টাকা বকশিশ দেব লা তে, ওপরে উঠে যা—'

হিংস্র আহত হাঙরটা সঙ্গ ছাড়ে নি। কিছুক্ষণ প্রতিপক্ষের মতিগতি সে ঠাওর করে দেখল। তারপর হিংস্র দাঁত মেলে নতুন উদ্যমে ছুটে এল।

পায়ের নিচে শক্ত পাথরের আশ্রয়। পিছলে যাবার বিপদ নেই। একপাশে একটু কাত হয়ে ছোরাটা পুরোপুরি হাঙরের পেটে ঢুকিয়ে টেনে দিল লা তে। অন্তিম আক্রোশে লক্ষ্যহীন গতিতে খানিকটা ছুটে গেল হাঙরটা। জলের মধ্যে উলটে পালটে কিছুক্ষণ আছাড়ি পিছাড়ি খেল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

বোটের পাটাতনে দাঁড়িয়ে পানিকর চিৎকার করতে ভুলে গেল যেন। হঠাৎ বিচিত্র এক ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে। শেষ পর্যন্ত দুর্ধর্ষ হাঙরটাকে শেষই করে ফেলল লা তে! পানিকরের বুকে মরা হাঙর, রক্তমাখা উপসাগর, লা তে'র ছোরা, সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া ঘনিয়ে তুলল যেন।

এদিকে টলতে টলতে, ধুঁকতে ধুঁকতে বাতাসীকে নিয়ে অতি সন্তর্পণে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে ম্যানগ্রোভ বনে উঠে গেল লা তে। অবসাদে উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার।

পানিকর ফিস ফিস গলায় বলল, 'দাঁড়া লা তে, আমি আসছি।'

'নটিলাস' বোটটা সামনে এগিয়ে এনে হাঁটুখানেক জল ভেঙে ম্যানগ্রোভ বনে এল পানিকর। দেখল, লা তে'র বুকের ওপর বেহুঁশ হয়ে রয়েছে বাতাসী। আব লা তে'র ছোরার ফলায় এখনও হাঙরের তাজা রক্ত লেগে রয়েছে। টপ টপ করে সেই রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে। একবার লা তে'র চোখের দিকে তাকাল পানিকর। সে চোখে কী দেখল, সে-ই জানে। আর একটি কথাও বলল না। হাঁটু সমান জল ভেঙে ফিরে গিয়ে 'নটিলাস' বোটে উঠল।

একটু পর উপসাগরের শান্ত জলে বড় বড় ঢেউ জাগিয়ে ভট ভট শব্দ তুলে বোটটা খোলা দরিয়ায় পালিয়ে গেল।

এবার বুকের ওপর মূর্ছিত বাতাসীর দিকে তাকাল লা তে। কেন যেন মনে হল, আন্দামানের দরিয়া থেকে বা হাঙরের মুখ থেকে এমন দুর্লভ, দামি সিপি তার সাতাশ বছরের জীবনে আর কোনোদিনই তুলে আনতে পারে নি।

জনক

শীতের দুপুরে সূর্য যখন সোজা মাথাব ওপর উঠে আসে সেই সময় দোতলার পশ্চিম দিকের লম্বা বারান্দায় লাল গালিচার ওপর বিছানা পেতে তার এক পাশে চশমার খাপ, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী আর দু'খানা বাংলা খবরের কাগজ যত্ন করে সাজিয়ে রেখে আসে শোভনা। ততক্ষণে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে যায় শেখরনাথেব। আঁচিয়ে, তোয়ালেতে মুখ মুছে আশি বছরের জীর্ণ, নড়বড়ে শরীর টানতে টানতে বারান্দায় চলে যান তিনি। শোভনা তাঁর পুত্রবধূ।

দুপুরে ধর্মগ্রন্থ আর খবরের কাগজ পড়াটা শেখরনাথের বহুকালের প্রিয় অভ্যাস। কিন্তু ইদানীং ক'বছর আর্থারাইটিসে ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছেন। দুই কাঁধে এবং কোমরে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। তখন মনে হয়, কেউ যেন তাতানো লোহার ফলা শরীরের ওই অংশগুলোতে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কড়া ডোজের ওষুধ আর ফিজিও-থেরাপিতেও বিশেষ কাজ হচ্ছে না। আজকাল পেটে দুপুরের ভাতটি পড়লেই দু'চোখ জড়িয়ে আসে। বই বা কাগজ টাগজ আর পড়া হয়ে ওঠে না, ওগুলো নাড়াচাড়া করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েন।

দোতলাব এই বারান্দাটা এমনভাবে টানা যে প্রথম দিকে দুপুরের রোদ একটু কোনাকুনি শেখরনাথের পায়ের ওপর স্থির হয়ে থাকে। আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্য যত পশ্চিমে নামে, রোদ ক্রমশ তাঁর সারা গায়ে ছড়িয়ে যায়। রোদের টনিকটা তাঁর খুব দরকার।

অন্য দিনের মতো আজও শোওয়াব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শেখরনাথ। যখন জেগে উঠলেন, বিকেল হয়ে গেছে। পশ্চিমের উঁচু উঁচু বাড়ি আর গাছপালার আড়ালে সূর্য ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

ঘুম ভাঙলেও শুয়েই রইলেন শেখরনাথ। মখমলের খাপ থেকে বাই-ফোকাল লেন্সের গোল চশমাটা বার করে চোখে পরে নিলেন। তাঁর সমস্ত শরীর এখন বেলাশেষের অনুজ্জ্বল সোনালি রোদের আরকে ডুবে আছে। শেখরনাথ জানেন কিছুক্ষণের মধ্যেই শোভনা স্যাকারিন-দেওয়া এক কাপ চা নিয়ে আসবে, সেটি শেষ হতে না হতেই দিনের শেষ আলোটুকু আর থাকবে না। হালকা পায়ে নেমে আসবে শীতের সন্ধে, তাপমাত্রা ঝপ করে নেমে যাবে কয়েক ডিগ্রি। তখন আর এক মুহূর্তও এই খোলা বারান্দায় শ্বশুরকে থাকতে দেবে না শোভনা; তাড়া দিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে যাবে। তার জন্যই অপেক্ষা করছেন শেখরনাথ।

আজ রবিবার।

বারান্দার ও-মাথায় একঝাঁক শালিক চঞ্চল পায়ে নাচানাচি করছে আর মাঝে মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ খুশিতে কিচিরমিচির করে উঠছে। একতলায় চলছে তুমুল হইচই। তার মানে সন্দীপ, শোভনা, রাজা আর রুকু টেবল টেনিস কি ক্যারম নিয়ে মেতে উঠেছে।

সন্দীপ শেখরনাথের একমাত্র ছেলে, একটা নাম-করা বড় কোম্পানির অ্যাকাউন্টস অফিসার। রাজা আর রুকু তাঁর নাতি-নাতনি। রাজা সেন্ট জেভিয়ার্সে ইংলিশ অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। রুকুর এবার ক্লাস ইলেভেন, সে পড়ে ক্যালকাটা গার্লসে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে সন্দীপ আর শোভনার সম্পর্ক বন্ধুর মতো। কোথাও যাবার না থাকলে ছুটির দিনগুলো আড্ডা দিয়ে, ভিসিআর-এ ভালো ছবি দেখে কি ক্যারম-ট্যারম খেলে ওরা কাটিয়ে দেয়। শালিকদের চেঁচামেচি কি নিচের তলার চিৎকার ছাড়া এখন আর কোথাও কোনো শব্দ নেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে তিরিশ ফুট চওড়া অভয় হালদার রোড সোজা ট্রাম রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। তার ওধারে একটা মাঝারি পার্ক। শেখরনাথদের এদিকটায় বেশির ভাগ বাড়িই একতলা কি দোতলা, ক্বচিৎ দু-চারটে তেতলা। কিন্তু পার্কের ওধারে হাই-রাইজের ছড়াছড়ি।

অভয় হালদার রোডে লোকজন বিশেষ নেই। বড় রাস্তায় দু-একটা ট্রাম, মিনি বাস কি ট্রাক গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের যেন কোথাও যাবার তাড়া নেই—সব কিছুই গন্তব্যহীন, ঢিলেঢালা, আলস্য মাখানো। দূরের পার্কটায় নানা রঙের পোশাক-পরা অসংখ্য বাচ্চা ছোটাছুটি করছে, ওদের সঙ্গে রয়েছে মা কিংবা আয়ার দল। ইস্টম্যান কালারে তোলা নির্বাক সিনেমার একটি দৃশ্য যেন।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় উঠে বসেন শেখরনাথ। গা থেকে কম্বলটা খসে পড়ে, আস্তে আস্তে সেটা তুলে যখন ফের ভালো করে জড়িয়ে নিচ্ছেন সেই সময় চোখে পড়ে ট্রামরাস্তার মুখে এসে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল আর তার ভেতর থেকে মধ্যবয়সী একটি মহিলা নেমে রাস্তার লোকজনকে কিছু জিগ্যেস করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভব কারুর ঠিকানা খুঁজছে। ট্যাক্সিটা কিন্তু মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েই থাকে। আশি বছরের নির্জীব চোখেও শেখরনাথ আবছাভাবে দেখতে পান, ড্রাইভার ছাড়া ট্যাক্সিটায় আরো একজন বসে আছে।

মহিলাটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত চেহারা। চিবুকের তলায়, গালে এবং কোমরে বেশ মেদ জমেছে কিন্তু সৌন্দর্যের শেষ রশ্মিগুলি এখনও তাঁর চোখমুখ থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি। পরনে কাঁথা স্টিচের দামি শাড়ি, চোখে ফ্যাশনেবল চশমা, ডান কাঁধ থেকে চমৎকার লেডিজ ব্যাগ ঝুলছে, বাঁ হাতে বড় একটা সুটকেস।

কৌতূহলশূন্য চোখে লক্ষ করছিলেন শেখরনাথ। মহিলাটি বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে যখন তাঁদের 'শান্তিনিবাস'-এর সামনে এসে দাঁড়ায় তখন চমকে ওঠেন। শরীর ভারী হয়ে গেলেও তিরিশ বছর আগের এক মেদহীন প্রাণবন্ত তরুণীর আদল যেন মহিলার সর্বাঙ্গে বসানো। সেই ডিম্বাকৃতি নিষ্পাপ মুখ, ঘন পালকে ঘেরা উজ্জ্বল চোখ, তেমনই চিবুকের খাঁজ, মসৃণ ভাঁজহীন গলা। মনে মনে বিড় বিড় করেন শেখরনাথ, 'হে ঈশ্বর, এ যেন সে না হয়।'

দোতলার বারান্দার ঠিক তলায় সদর দরজা। মহিলা সেখানে গেলে ওপর থেকে তাকে আর দেখা যায় না। তবে সে যে কলিং বেল টিপেছে তার সুরেলা আওয়াজ গোটা বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার শব্দ শুনতে পান শেখরনাথ। টের পাওয়া যায়, সন্দীপরা সবাই হুড়মুড় করে আগন্তুককে দেখার জন্য দৌড়ে গেছে।

শেখরনাথ স্নায়ুমণ্ডলীকে টান টান করে বসে থাকেন। একসময় মহিলার গলা আবছাভাবে শোনা যায়, 'এটা কি শেখরনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি?'

কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন শেখরনাথ। তিরিশ বছর আগে ছিল সেতারের ঝঙ্কারের মতো সতেজ ; এতকাল বাদে কিছুটা মোটা আর খসখসে হয়ে গেলেও আগের রেশ অনেকটাই এখনও থেকে গেছে।

সন্দীপ বলে, 'হ্যাঁ। আপনি কাকে চাইছেন?'

'আমি—আমি ঢাকা থেকে আসছি। বসে কথা বলা যেতে পারে কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আসুন।'

এরপর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আগন্তুক বলছিল ঢাকা থেকে আসছে। তার মানে সে—নিশ্চয়ই সে। এই শীতের বিকেলে অঢেল বাতাস চারিদিকে, তবু মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শেখরনাথের; ফুসফুস যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ওদিকে হইচই মাতামাতি থেমে গিয়ে নিচের তলাটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে।

কী করবেন, প্রথমটা স্থির করতে পারলেন না শেখরনাথ। ব্যাকুল, বিহ্বল দৃষ্টিতে শীতের এই মলিন বেলাশেষে ম্রিয়মাণ রাস্তাঘাট আর বাড়িঘরের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলেন। একটু পরে শোভনা কি সন্দীপ, কিংবা দু'জনেই দোতলায় ছুটে আসবে কিন্তু ঢাকা থেকে এইমাত্র যে এসেছে তিনি তার মুখ দেখতে চান না। এতকাল তাঁদের ধাবণা ছিল সে মৃত। কিন্তু না, এখনও বেঁচে আছে, অথচ বছরের পর বছর তার মৃত্যুকামনা করতে করতে কবে যেন তাকে ভুলে গিয়েছিলেন শেখরনাথ। কী প্রয়োজন ছিল তিরিশ বছর পর কলকাতায় এসে তাঁর বুকের গভীরে লুকনো একটি ক্ষতকে ঘা দিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত করে তোলার?

বিকল শরীরটাকে এক টানে টেনে তোলেন শেখরনাথ। যন্ত্রণার একটি প্রবাহ কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত তীব্র গতিতে নেমে যায়। অন্য সময় হলে তাঁর গলা দিয়ে কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসত। এখন কিন্তু তেমন কোনো অনুভূতিই হল না।

বারান্দার বাঁ পাশে তাঁর নিজস্ব ঘর। সেটায় দু'টো দরজা। একটা দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যায়, আরেকটা এই বারান্দায় যাতায়াতের জন্য। ধড়ফড় করে ঘরে ঢুকে দু'টো দরজাই বন্ধ করে দিলেন শেখরনাথ।

এখানে আসবাব বলতে খুব সামান্যই। এক ধারে দেওয়াল ঘেঁষে পুরনো আমলের খাটে পুরু জাজিমের ওপর ধবধবে বিছানা। আরেক পাশে কাঠের ছোট সিংহাসনে কালী থেকে গণেশ পর্যন্ত নানা দেবদেবীর মূর্তি। এ ছাড়া আছে আলনা, আলমারি, দু-একটা সেকেলে লোহার ট্রাঙ্ক। এক দেওয়ালে লক্ষ্মীর ছবিওলা বাংলা ক্যালেণ্ডার এবং তার ওপর ফ্রেমে-বাঁধানো পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের এক মধ্যবয়সিনীর ফোটো। হাস্যোজ্জ্বল, সুন্দর এই মানুষটি হেমলতা—শেখরনাথের স্ত্রী। তেষট্টিতে যেবার তিনি মীরপুরে পুড়ে মারা যান সে বছরই ছবিটা তোলা হয়েছিল। এটাই হেমলতার শেষ ছবি।

দুই দরজায় খিল তুলতেই কেউ যেন ধাক্কা দিতে দিতে শেখরনাথকে বিছানায় তুলে দেয়। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে তিনি স্ত্রীর ফোটোর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকেন।

বহুবার শেখরনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, পেছন ফিরে তাকাবেন না। তিরিশ বছর আগে যা ঘটেছে, তার জন্য ভেতরে বাইরে ভেঙেচুরে তিনি শতখান হয়ে গেছেন। হৃৎপিণ্ডে কত যে রক্তক্ষরণ হয়েছে তার খবর কে রাখে? সন্দীপ তখন পনেরো বছরের কিশোর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শোক, দুঃখ, কাতরতা ভুলতে চেষ্টা করেছেন শেখরনাথ।

সময়ের হাতে এমন এক ম্যাজিক থাকে যা সমস্ত কিছুর তীব্রতা কমিয়ে দেয়; দিয়েও ছিল। শেখরনাথের মনে হয়েছিল সব ভুলে গেছেন কিন্তু তিরিশ বছরের পলির স্তর সরিয়ে উঠে আসছে সেই দিনগুলো—ভীতিকর, আতঙ্কজনক, দুঃস্বপ্নে-ভরা। বিস্মৃতিতে যা লুপ্ত হয়ে গেছে মনে হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তার কিছুই হারায় নি; স্মৃতির কালাধারে অবিকল সংরক্ষিত আছে।

মনে পড়ে, দেশভাগের পর সেই আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন শরণার্থীর ঢল নামল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বা আসামের দিকে, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হেমলতা। শেখরনাথকে

বলেছিলেন, 'চল, বাড়ি বেচে কলকাতায় চলে যাই।' সে সময় ইস্ট পাকিস্তানে জমিজমা বাড়িঘর বিক্রির তেমন সমস্যা ছিল না।

শেখরনাথ তখন ম্যাকেঞ্জি ব্রাদার্সের জুট মিলে জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। ঢাকা থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে ধলেশ্বরীর পারে মীরপুরে ছিল চটকলটা। দেড়শো বছর ধরে শেখরনাথরা ওই শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। বংশ-লতিকার দিক থেকে তাঁদের সপ্তম প্রজন্ম চলছিল। এর মধ্যে তাঁদের কেউ কোনোদিন অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবেন নি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের শিকড় এই পুরনো শহরটির মাটির তলায় বহুদূর ছড়িয়ে গেছে। এক কথায় তা উপড়ে ফেলা সহজ ছিল না। শেখরনাথ বলেছেন, 'কলকাতায় যাব কেন? আমরা কি কোনো অপরাধ করেছি? এটা আমার দেশ, এখানেই থাকব।'

'কিন্তু দেখছ না, রোজ কত লোক চলে যাচ্ছে—'

'যাক, আমরা যাচ্ছি না।'

হেমলতা উদ্বিগ্ন মুখে বলেছেন, 'আমার মন বলছে, শেষ পর্যন্ত এদেশে থাকতে পারব না।'

শেখরনাথ ছিলেন প্রচণ্ড গোঁড়া, ব্রাহ্মণত্বের যাবতীয় সংস্কারকে তিনি প্রায় ধর্মপালনের মতো আগলে আগলে রাখতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্য একটি দিক ছিল, প্রতিবেশীদের তিনি বিশ্বাস করতেন, তাদের ওপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলেছেন, 'এই শহরের সবাই আমাদের চেনে। তারা থাকতে কেউ আমাদের গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না।'

হেমলতা উত্তর দেন নি।

শেখরনাথ ফের বলেছেন, 'মীরপুরে কম রায়ট হয় নি কিন্তু আমাদের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? লোকজন বিপদের সময় আমাদের পাশে ছুটে এসে দাঁড়ায় নি?'

তাঁদের প্রতিবেশীরা ছিল সহৃদয়, সহানুভূতিশীল। ঘোর দুঃসময়ে তারা চিরকাল পাশে পাশে। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় যখন অখণ্ড ভারত জুড়ে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তখনও তারা শেখরনাথের গায়ে কাউকে একটা আঙুল ঠেকাতে দেয়নি। সবই ঠিক, তবু স্বামীর মতো মানুষের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না হেমলতা। দেশভাগের পর তাঁর বিশ্বাসের ভিতটাই আলগা হয়ে গিয়েছিল। তিনি অবশ্য শহরের মানুষ সম্পর্কে নিজের সংশয়ের কথাটা পরিষ্কার করে সেদিন কিছু বলেন নি। শুধু শঙ্কাতুর সুরে জিগ্যেস করেছেন, 'কিন্তু খুকু? তার ভবিষ্যৎ কী?' তখন তাঁদের একটি সন্তানেরই শুধু জন্ম হয়েছে যার আদরের নাম খুকু। অন্য একটি নামও রাখা হয়েছিল—মণিকা, যা পরে স্কুল-কলেজে ব্যবহার করা হবে। তখন খুকুর বয়স ছিল পাঁচ।

হেমলতার প্রশ্নের ভেতর পরিষ্কার একটা ইঙ্গিত ছিল যা বুঝতে অসুবিধে হয় নি শেখরনাথের। তাঁর স্ত্রীটি তাঁদের মতোই বরিশালের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে, বাপের বাড়ির যাবতীয় প্রাচীন সংস্কার এবং রক্ষণশীলতা অস্থিমজ্জায় পুরে তিনি শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের গোঁড়ামি। হেমলতার ভাবনাচিন্তা ধ্যানধারণা সব কিছুই শক্ত লোহার ফ্রেমে আটকানো, এই ফ্রেমটির বাইরে একটি পা ফেলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মনে মনে কিন্তু একটু কৌতুকই বোধ করেছিলেন শেখরনাথ। বলেছেন, 'পাঁচ বছরের একটা ছোট্ট মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে ফেলছ!'

'ভাবতাম না, যদি দেশটা আগের দেশ থাকত। তা ছাড়া খুকুর বয়েস চিরদিন পাঁচ বছর থাকবে না।'

'তোমার কি ধারণা এখানকার সবাই অমানুষ হয়ে গেছে?'

'হয়তো হয়নি। কিন্তু খুকুর—'

'বিয়ের কথা বলতে চাইছ তো?'

কিছু না বলে সোজা স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন হেমলতা।

শেখরনাথ বলেছেন, 'দেশে ভাঙন ধরলেও সবাই বাড়িঘর ফেলে ওপারে চলে যাবে না। যারা থাকবে তাদের ভেতর থেকে খুকুর জন্যে তোমার মনের মতো একটি ছেলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।'

.....হঠাৎ ভেতর দিকের বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা পড়ে, সেই সঙ্গে শোভনার চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'বাবা—বাবা—'

স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে আসেন শেখরনাথ। কিন্তু সাড়া দিতে গিয়েও থমকে যান। শোভনা কেন এসেছে, তিনি জানেন।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে শোভনা চলে যায়। একটু পরেই অন্য একজোড়া চেনা পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ব্যস্তভাবে দরজার সামনে এসে থামে। সন্দীপ, যার ডাকনাম লালু --এবার সে এসেছে।

সন্দীপ ডাকে, 'বাবা, দরজা খোল---' তার গলা উত্তেজনা এবং অস্থিরতায় কাঁপছে।

শেখরনাথ চুপ, আচ্ছন্নের মতো বসে থাকেন।

সন্দীপ একটানা বলে যায়, 'দরজা খোল---দরজা খোল। ঢাকা থেকে দিদি এসেছে।'

শেখরনাথের হৃৎপিণ্ড পলকের জন্য থেমে এমন প্রবল গতিতে লাফাতে থাকে যে তার উত্থানপতনের শব্দ তিনি নিজেই যেন শুনতে পান। মনে হয়, বুকের ভেতর কেউ এলোপাথাড়ি হাজারটা ঢাক পিটিয়ে চলেছে।

ব্যাকুলভাবে সন্দীপ এবার বলতে থাকে, 'বাবা, তুমি কি দিদির সঙ্গে দেখা করবে না? ও কি চলে যাবে?'

শেখরনাথ বসেই থাকেন। হতাশ, ব্যর্থ, বিপর্যস্ত সন্দীপ ডেকে ডেকে একসময় নিচে নেমে যায়।

স্বয়ংক্রিয় কোনো নিয়মে ধলেশ্বরী পারের সেই সব দিন আবার স্মৃতিতে হানা দেয় শেখরনাথের।

......সেই যে খুকুকে নিয়ে হেমলতার সঙ্গে কথা হয়েছিল তারপর মীরপুরের আবহাওয়া দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ওপার থেকে জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো শরণার্থীরা যেমন ইণ্ডিয়ায় চলে এসেছিল তেমনি বিহার উত্তরপ্রদেশ থেকেও অজস্র মানুষ উৎখাত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম কি খুলনার মতো বড় বড় শহর ভরে যাবার পর তাদের অনেকেই চলে এসেছিল মীরপুরে। পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের মতো এদের মনেও ছিল সর্বস্ব হারানোর জন্য ক্রোধ, হতাশা আর তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা। মীরপুরের নতুন আগন্তুকদের শক্ত চোয়ালে সবসময় নিষ্ঠুরতা ফুটে থাকত, দু'চোখে আগুন জ্বলত।

দ্বিজাতি তত্ত্বের মধ্যে যে প্রচণ্ড ঘৃণা আর অবিশ্বাস ছিল, দেশভাগের পরও তার বিষ এতটুকু কমেনি, বরং ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। ভারত আর পাকিস্তানের সম্পর্ক এমনই জটিল আর স্পর্শকাতর যে কোথাও পান থেকে সামান্য চুনটুকু খসলে সীমান্তের দু'ধারেই তুলকালাম ঘটে যেত। বাতাসে তখন বিদ্বেষের বারুদ, একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে পড়ার শুধু অপেক্ষা।

যত দিন যাচ্ছিল, মীরপুরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝে ছোটখাটো দাঙ্গাও হচ্ছিল। তবে আগের মতোই প্রতিবেশীরা শেখরনাথদের আগলে আগলে রেখেছে।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে ম্যাকেঞ্জি ব্রাদার্সের ব্রিটিশ মালিক ঢাকার এক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কাছে চটকল বেচে দিয়ে দেশে চলে গেলেন। কারখানার পরিবেশও আগের মতো রইল না। শেখরনাথ বুঝতে পারছিলেন এখানে তিনি অবাঞ্ছিত। হেমলতার সঙ্গে এ নিয়ে বহু আলোচনাও হয়েছে। এদিকে খুকু বড় হচ্ছিল। তাঁদের আরো দু'টি ছেলেও হয়েছে—সন্দীপ আর সঞ্জয়।

শুধু কারখানাতেই নয়, যে প্রতিবেশীরা ছিল তাঁদের আশাভরসা তাদের কারো কারো আচরণ, চোখমুখের চেহারা বদলে যাচ্ছিল। দেশভাগের পরও মানুষের প্রতি শেখরনাথের যে অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন তাতে চিড় ধরতে শুরু করেছে। একবার ভাবছিলেন কলকাতায় চলে যাবেন, পরক্ষণে মনে হচ্ছিল দেখাই যাক না আর ক'টা দিন। আসলে কলকাতা ছিল তাঁর কাছে প্রায় অচেনা। সেখানে গিয়ে কী করবেন, কোথায় থাকবেন, ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে কিভাবে বাঁচাবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না। ঘোর অনিশ্চয়তা তাঁকে স্থির কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত আচমকা আবার দাঙ্গা বাধল মীরপুরে। পুরনো প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা শুভাকাঙ্খী ছিল তারা দৌড়ে আসার আগেই বাড়িতে আগুন লাগানো হল, পুড়ে মারা গেলেন হেমলতা, লুট হয়ে গেল খুকু। সন্দীপ আর সঞ্জয় তখন স্কুলে, শেখরনাথ তাঁর জুট মিলে, তাই তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেলেন।

এরপর শেখরনাথ ঠিক করে ফেললেন, এদেশে আর থাকবেন না। হিতাকাঙ্খীরা বললেন, 'কলকাতায় চলে যান। এখানকার যা হাল, না থাকাই ভালো।' তারাই বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করে দিল। যা দাম হওয়া উচিত তার আট ভাগের একভাগ মাত্র পাওয়া গেল।

কলকাতায় আসার পর এপারের আত্মীয়স্বজনরা, যারা পার্টিশানের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়েছিল—অভয় হালদার রোডের এই বাড়িটা কিনে দেয়। ভালো একটি স্কুলে ভর্তি হল সন্দীপ আর সঞ্জয়। শেখরনাথ এখানকার এক মার্কেন্টাইল ফার্মে ছোটখাটো কাজও জোগাড় করলেন। সঞ্জয় কিন্তু বেশিদিন বাঁচে নি, কলকাতায় আসার বছরখানেকের মধ্যে ভুল চিকিৎসায় মারা যায়।

সর্বস্ব খোয়াবার পর সন্দীপকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন শেখরনাথ। এই ছেলেই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সন্দীপও খুব শান্ত, বাধ্য, বাবা ছাড়া কিছুই জানত না। ছাত্র হিসেবেও আসাধারণ, মেধাবী। এম. কম-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপে ডিগ্রি নেবার পর অ্যাকাউন্টস অফিসারের চাকরি পেল। তারপর ওর বিয়ে দিলেন শেখরনাথ।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বুকের ভেতর দু'টো দগদগে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে শেখরনাথ কলকাতায় এসেছিলেন—হেমলতা আর খুকু। হেমলতা তো খুনই হয়েছেন। কিন্তু খুকু? প্রতিদিন তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, খুকুরও যেন মৃত্যু হয়। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শোনেন নি।

কখন সন্ধে নেমে গিয়েছিল, শেখরনাথ জানেন না। শীতের অন্ধকার আর হিমে বাইরের রাস্তায় কার্পোরেশনের আলোগুলোর তলায় কুয়াশার ছোট ছোট বৃত্ত চোখে পড়ে।

শেখরনাথ বিছানা থেকে নেমে যে ঘরের আলোটা জ্বালবেন, তেমন কোনো ইচ্ছাই নিজের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া যে খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে, সেদিকেও তাঁর খেয়াল নেই। আচ্ছন্নের মতো, অনুভূতিশূন্যের মতো তিনি বসেই থাকেন।

কতক্ষণ পর মনে নেই, আবার সিঁড়িতে পরিচিত চার জোড়া পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। এবার আর সন্দীপ বা শোভনা আলাদা আলাদা আসে নি। রাজা আর রুকুও ওদের সঙ্গে এসেছে।

ফের দরজায় ধাক্কা পড়ে। ওরা একসঙ্গে ডাকতে থাকে, 'বাবা—বাবা—দাদু— '

কিছুক্ষণ আগের মতোই সাড়া না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন শেখরনাথ।

এবার অন্য সবার গলা ছাপিয়ে সন্দীপের কণ্ঠস্বর কানে আসে, 'তোমার ভয় নেই, দিদি চলে গেছে। ওর মুখ তোমাকে দেখতে হবে না। দরজা খোল—' তার গলায় ক্ষোভ, দুঃখ, হয়তো বা কিছুটা অধীরতাও মেশানো।

আশ্চর্য! যাকে তিনি দেখতে চাননি, যার জন্য তিরিশ বছর তাঁর কাছে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু কাম্য ছিল না, সে চলে গেছে শুনে অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা বোধ করতে থাকেন শেখরনাথ। নিজেকে টেনে-হেঁচড়ে খাট থেকে নামিয়ে আনেন, আলো জ্বেলে দরজা খুলে দেন।

কিছুক্ষণ স্থির চোখে শেখরনাথকে লক্ষ করে সন্দীপরা। তারপর একসঙ্গে সবাই ঘরে ঢোকে।

শেখরনাথের পরনে ধুতি এবং হাফ-হাতা খদ্দরের জামা ছাড়া আর কিছু নেই। রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে হু হু করে উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে হিম ঢুকছে। ঠাণ্ডায় তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে কিন্তু তিনি বুঝি টের পাচ্ছেন না। শোভনা ছুটে ঘরের এক কোণের আলনা থেকে শাল এনে শ্বশুরের গায়ে ঘন করে জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে ধরে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেয়।

সন্দীপ রুকু আর রাজা শেখরনাথের কাছে এগিয়ে এসেছিল, তবে তারা বসে না।

সন্দীপ বলে, 'এ তুমি কী করলে বাবা! দিদিরা কত বছর ধরে আমাদের খোঁজ করেছে। শেষ পর্যন্ত ঢাকার ইন্ডিয়ান হাই কমিশন এ বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পেরেছে; আর সেটা পেয়েই ওরা ছুটে এসেছিল, কিন্তু তুমি দরজায় খিল দিয়ে বসে রইলে, একবারও দিদিকে কাছে ডেকে নিলে না! দিদি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আর কোনোদিনই সে আসবে না।' একটু থেমে আবার বলে, 'হারুণদা কী ভাবল বল তো?'

রুদ্ধস্বরে শেখরনাথ জিগ্যেস করেন, 'কে হারুণদা?'

'দিদির স্বামী।'

সন্দীপের কথা শেষ হতে না হতেই শেখরনাথের মুখচোখের চেহারা একেবারে বদলে যায়। তাঁকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখায়। মনে হয় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। হারুণ নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বের প্রাচীন সংস্কারগুলি শেখরনাথকে বিপর্যস্ত করে তুলতে থাকে। ভাঙা, আবছা আবছা গলায় তিনি বিড়বিড় করেন, 'স্বামী—খুকুর স্বামী!'

সন্দীপ বাবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। বরাবরই সে ধীর, স্থির, ধৈর্যশীল। কিন্তু এখন তাকে কিছুটা উত্তেজিত দেখায়, 'জানো, হারুণদা দিদির জন্য কী করেছেন! তিনি হাত না বাড়িয়ে দিলে দিদি আজ কোথায় তলিয়ে যেত!' এরপর একটানা সে যা বলে তা এইরকম। তেষট্টিতে মীরপুরের সেই রায়টের পর দাঙ্গাবাজরা যখন খুকুকে লুট করে নিয়ে যায় সেই সময় ওই অঞ্চলের সাব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন হারুণ। তিনিই কয়েক মাস বাদে খুকুকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যান। তারপর তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য শেখরনাথদের খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু ততদিনে তাঁরা কলকাতায় চলে এসেছেন।

বছরখানেক চেষ্টার পরও যখন শেখরনাথদের সন্ধান পাওয়া যায় না তখন লাঞ্ছিতা একটি মেয়েকে সামাজিক মর্যাদা দেবার জন্য বিয়ে করেন। তাঁর মা-বাবার দিক থেকে কোনোরকম বাধা আসেনি, বরং তাঁরা পরম উদারতায় খুকুকে গ্রহণ করেছিলেন।

সেদিনের সেই তরুণ অফিসার হারুণ এখন ঢাকায় এডুকেশন মিনিস্ট্রির জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওঁদের এক ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলে ডাক্তার, মেয়েরা কলেজে পড়ছে।

সন্দীপ বলে, 'ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল বাবা, দিদি আর কোনোদিন আমাদের এখানে আসবে না।'

শেখরনাথ চুপ করে থাকেন।

সন্দীপ এবার বলে, 'হারুণদাও এসেছিলেন। মেয়ে বাপের বাড়িতে কিরকম অভ্যর্থনা পায় সেটা বুঝে বাড়িতে ঢুকতেন। তা আর হল না।'

ছেলের কথায় শ্লেষ ছিল। সেদিকে লক্ষ্য নেই শেখরনাথের। জোরে শ্বাসটানার মতো শব্দ করে বলেন, 'এসেছিল!'

'হ্যাঁ। ট্রাম রাস্তায় ট্যাক্সিতে বসে ছিলেন।'

শেখরনাথের মনে পড়ে, বিকেলে খুকু যে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল তার ভেতর একজনকে বসে থাকতে দেখেছেন। সে-ই তা হলে হারুণ!

আরো খানিকক্ষণ বাদে সন্দীপরা চলে যায়। সাড়ে আটটা বাজলে শোভনা শেখরনাথের জন্য রাতের খাবার নিয়ে আসে—দু'খানা সুজির রুটি, আলু-কপির তরকারি, এক বাটি দুধ আর একটি সন্দেশ। শ্বশুরকে খাইয়ে, বিছানা করে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে, চারপাশে নেটের মশারি গুঁজে চলে যায়।

অন্যদিন শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে আসে কিন্তু আজ ঘুম আসছে না। বার বার খুকুর মুখটা শেখরনাথের চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর মশারি সরিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অস্থির পায়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। টের পান, বুকের ভেতর অনবরত কিসের ভাঙচুর চলছে।

সারারাত নিদ্রাহীন কাটিয়ে ভোরবেলায় শেখরনাথ মনস্থির করে ফেলেন। তাঁর ঘরের সঙ্গে যে বাথরুমটি রয়েছে সেখানে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে দোতলার শেষ মাথায় রাজার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পর ঘুম ভাঙে রাজার। দরজা খুলে অবাক হয়ে যায় সে। বলে, 'দাদু তুমি! কী হয়েছে?'

শেখরনাথ বলেন, 'কিছু না। তোর পিসি কলকাতায় কোথায় উঠেছে রে?'

'পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলে।'

'তুই আমাকে এখনই সেখানে নিয়ে যেতে পারবি?'

নিজের কানে শোনার পরও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না রাজার। বিভ্রান্তের মতো সে বলে, 'তুমি যাবে!'

শেখরনাথ আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু গেলে তো দেখা হবে না।'

'কেন?'

'আজ সকালের ফ্লাইটে ওরা ঢাকায় যাচ্ছে। আমরা যেতে যেতে পিসিরা বেরিয়ে পড়বে।'

একটু ভেবে শেখরনাথ বলেন, 'তা হলে তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে। আমরা এয়ারপোর্টেই যাব। কাউকে এখন এ কথা বলার দরকার নেই।'

নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্রুত পোশাক পালটে নেন শেখরনাথ। এক ধারে ছোট একটা

লোহার সিন্দুক আছে, সেটা খুলে তার ভেতর থেকে মাঝারি একটা চামড়ার ব্যাগ বার করে সিন্দুকটা ফের বন্ধ করে দেন।

আরো কিছুক্ষণ পর রাজাকে সঙ্গে নিয়ে শেখরনাথ যখন চুপিসারে বেরিয়ে পড়েন তখনও এ বাড়ির অন্য কারো ঘুম ভাঙে নি।

শীতের এই ভোরে চারপাশের বাড়িঘর, ট্রামরাস্তা, দূরের পার্ক—সব কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে। কর্পোরেশনের বাতিগুলো এখনও কেউ নিবিয়ে দিয়ে যায় নি, মরা মাছের চোখের মতো সেগুলো জ্যোতিহীন। রোদ উঠতে এখনও অনেক দেরি।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে শেখরনাথরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখেন খুকুরা আগেই এসে গেছে।

দূর থেকে খুকু অর্থাৎ মণিকা শেখরনাথদের দেখতে পেয়েছিল। হারুণ আর সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ওদিকে রাজা আর শেখরনাথও থেমে গিয়েছিলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। লক্ষ করছিলেন, খুকুর ঠোঁট দু'টো থরথর করছে। তার মুখে কষ্ট আনন্দ অভিমান অভিযোগ—কত রকমের অভিব্যক্তি যে খেলে যায়!

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, পায়ে পায়ে মেয়ের কাছে চলে এসেছিলেন শেখরনাথ। হঠাৎ পঞ্চাশ বছরের মধ্যবয়সী খুকু বালিকার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তার হাত-পায়ের জোড় যেন বিচিত্র আবেগে আলগা হয়ে যাচ্ছিল, হুড়মুড় করে সে বাবার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কিন্তু তাঁকে ছোঁয় না।

নিচু হয়ে মেয়েকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে দু'হাতে অনেকক্ষণ জড়িয়ে রাখেন। শেখরনাথ টের পান তাঁর বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন হারুণ। অত্যন্ত সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল চোখমুখ। একসময় তাঁকে কাছে ডাকেন শেখরনাথ। এগিয়ে এসে হারুণ তাঁর পা ছুঁতেই তাঁকেও বুকে জড়িয়ে নেন তিনি।

অডিও সিস্টেম ঘোষণা করা হয়, ঢাকা ফ্লাইটের যাত্রীরা যেন এয়ারক্রাফটে গিয়ে উঠে পড়েন, উড়ানের আর দেরি নেই।

ধীরে ধীরে হারুণ আর খুকুকে বুকের ভেতর থেকে মুক্ত করে সেই চামড়ার ব্যাগটা থেকে সোনার হার, একজোড়া রুলি আর একটা হীরের আংটি বার করেন। মেয়েকে সেই গয়নাগুলো দিয়ে বলেন, 'তোকে তো কিছুই দেওয়া হয়নি। তোর বিয়ের জন্যে তোর মা এগুলো বানিয়ে রেখেছিল।' হীরের আংটিটা হারুণকে দিয়ে বলেন, 'এটা পোরো। মাপ ঠিক হবে কিনা জানি না। যদি না হয় সোনার দোকানে নিয়ে গিয়ে ঠিক করে নিয়ো।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

অডিও সিস্টেমে আরেক বার ঘোষণা হতেই হারুণ বলেন, 'এবার আমাদের যেতে হবে।'

আস্তে মাথা নাড়েন শেখরনাথ।

হারুণ ফের বলেন, 'একবার ঢাকায় আসুন। যাবার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

শেখরনাথ বলে, 'তার আগে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তোমরা এস।'

'আসব।'

হারুণরা সিকিউরিটি এনক্লোজারের দিকে এগিয়ে যান। সেদিকে তাকিয়ে শেখরনাথ মনে মনে বলেন, 'বেশ ছেলেটি।' রক্তের ভেতর জমানো বহুকালের সংস্কারগুলির কথা এই মুহূর্তে তাঁর মনে থাকে না।

ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী

হেকমপুরা টৌন বা টাউনকে শহর বললে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। পনেরো কুড়িটা খোয়ার রাস্তা বাদ দিলে বাকিগুলো সবই মাটির, এখানে যাকে বলে 'কাচ্চী' অর্থাৎ কাঁচা সড়ক।

সেই উনিশশো ছেচল্লিশে হেকমপুরায় পাকা বাড়ি আর ক'টা! বড় জোর তিরিশ কি চল্লিশ। এর ভেতর একটাই শুধু তেতলা, যার মালিক গৈবীনাথ মিশ্র। শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ গৈবীনাথ এই তল্লাটের সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার। তার বাড়ির মাথা ছাপিয়েও শহরের দুই প্রান্তে দু'টো মন্দির দাঁড়িয়ে আছে — একটা শিবের, অন্যটা রামসীতার। এছাড়া বাকি বাড়িগুলোর মাথায় টিন বা টালির চাল, দেওয়াল মাটি কিংবা ইটের।

বছরের বেশির ভাগ সময় রাস্তাগুলোতে এত ধুলো জমে থাকে যে হাঁটতে গেলে পায়ের পাতা ডুবে যায়। বর্ষায় এই সব রাস্তা একেবারে নদী বনে যায়; দু'পাশের কাঁচা দুর্গন্ধওলা নর্দমার সঙ্গে তখন সেগুলো একাকার।

হেকমপুরার দক্ষিণ দিকটায় থাকে উঁচু জাতের লোকেরা—ব্রাহ্মণ, কায়াথ এবং কিছু রাজপুত ক্ষত্রিয়। উত্তরে থাকে দোসাদ, গাঙ্গোতা, তাতমা, ধাঙড় আর কোয়েরিরা। তাদের বেশির ভাগই ছুঁয়াছুতের বিচারে জলচল নয়; সোজা কথায় অচ্ছুৎ। উত্তর-পশ্চিম কোণে থাকে গরিবের চেয়েও গরিব বিশ পঁচিশ ঘর মুসলমান।

শহরটাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে চওড়া একটা নহর বা খাল; সেটার ওপর কাঠের পুল।

হেকমপুরায় সেই ছেচল্লিশে মোটর ছিল সবসুদ্ধ পাঁচ খানা। গৈবীনাথ মিশ্রর দু'খানা। বড় জমিমালিক অবোধ নারায়ণ সিং, সরযূপ্রসাদ সহায় আর লালনাথ দাসের একটা করে। এছাড়া বাদবাকি সবই ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা আর গৈয়া বা গরুর গাড়ি। ক্বচিৎ দু-চারটে সাইকেল।

তখনও বিজলি বাতি আসেনি হেকমপুরায়। গৈবীনাথ এবং অন্য হাতে-গোনা ক'জন পয়সাওলা বড়লোকের বাড়িতে ডাইনেমো চালিয়ে রাতে আলো জ্বালা হত। অন্য সকলের ঘরে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন।

পৃথিবীর হট্টগোল থেকে বহুদূরে, তুচ্ছ হেকমপুরা টাউনটা জুড়ে অগাধ শান্তি। হইচই নেই, হাঙ্গামা নেই, নেই তোলপাড়-করা উত্তেজক কোনো ঘটনা। এখানকার বাসিন্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মোটামুটি ভালোই। ঢিমে চালে শহরের জীবনধারা বয়ে যেত।

শামুক যেমন শক্ত খোলের ভেতর নিজেকে লুকিয়ে রাখে, হেকমপুরাও তেমনি দুনিয়ার সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবহমান কালের শান্তি অটুট রাখা সম্ভব হল ন।

হাওয়ায় হাওয়ায় খবরটা ভেসে আসছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। অনেক দূরে কোথায় কলকাতা, কোথায় বোম্বাই, দিল্লি, পাঞ্জাব আর কোথায়ই বা লাহোর—এই সব জায়গায় নাকি দাঙ্গা শুরু হয়েছে। রোজ কত মানুষ যে খুন হচ্ছে, কত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কত যুবতী মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে, তার নাকি লেখাজোখা নেই। কলকাতা বোম্বাই লাহোরের ট্রেনগুলো লাশের পাহাড় নিয়ে কোথায় কোন দরিয়ায় নাকি ফেলে আসছে। আরো শোনা যাচ্ছিল, দেশটা নাকি দু টুকরো হয়ে যাবে। এক ভাগ হবে হিন্দুর, আর এক ভাগ মুসলমানের। এই সব খবর

হেকমপুরার শান্ত, নিরুদ্বেগ ধমনীতেও হঠাৎ খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। পড়শি নিরীহ মুসলমানদের পাড়াটার দিকে অনেকেই সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল। সারা দেশের আবহাওয়া যখন বিষবাষ্পে ছেয়ে গেছে তখন নগণ্য এই হেকমপুরা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে কী করে?

এখানকার মানুষজনের কাছে কলকাতা বোম্বাই লাহোর তো বহুদূরের ভিন্ন কোনো গ্রহের অজানা শহর। কিন্তু হেকমপুরা থেকে মাত্র বারো মাইল তফাতে বড় টাউন বারহৌলিতে যখন খুনখারাপি শুরু হল এই অঞ্চলের উত্তেজনা এক লাফে একশো গুণ চড়ে গেল।

এই সবে সকাল হয়েছে। বর্ষাকাল শেষ হয়ে এলেও আকাশে বেশ কিছু ভবঘুরে মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। রোদ উঠেছে ঠিকই, তবে মেঘের জন্য তার জেল্লা নেই; কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে আর নিবু নিবু।

হেকমপুরা টাউনের উত্তর দিকে অচ্ছুৎটুলির মাঝামাঝি জায়গায় ধুন্নিলালের টিনের চালের দু কামরাওলা বাড়ি। সামনের দিকে মাটির চবুতর। তার একধারে পাতকুয়ো, নাহানা বা স্নান করার জন্য খানিকটা বাঁধানো চাতাল। আর একধারে রসুইঘর, সেটার পাশে ধুন্নিলালের ঘোড়ার জন্য আস্তাবল, যার চারখানা নড়বড়ে খুঁটির মাথায় খড়ের ছাউনি কিন্তু দেওয়াল বলতে কিছু নেই, সব দিক খোলা। পুরো বাড়ির চৌহদ্দি কোমর সমান কাঁটা গাছ দিয়ে ঘেরা; যাতায়াতের জন্য খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে।

বাঁ দিকের ঘর থেকে হাই তুলতে তুলতে বাইরের বারান্দায় এসে বসল ধুন্নিলাল। তার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এই বয়সেও স্বাস্থ্য বেশ মজবুত। গায়ের রং তামাটে, চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে আধময়লা চাপা পায়জামা আর হাফ-হাতা গেঞ্জি।

ধুন্নিলালের চোখদু'টো এই মুহূর্তে টকটকে লাল। কাল সারারাত সে ঘুমোতে পারে নি। দূর দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল। 'কালী মাঈকি জয়', 'জয় বজরঙ্গবালী কি' কিংবা 'আল্লা হো আকবর'। শুধু কি কালই, ক'দিন ধরেই রাতের দিকে এসব শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু কাল রাতে তার মাত্রাটা ছিল অনেক বেশি উত্তেজক।

ধুন্নিলাল এবার তার ডান পাশের ঘরটার দিকে তাকায়। ওটায় থাকে তার মেয়ে মুনিয়া। ওর বয়স সতেরো আঠারো; এখনও বিয়ে হয়নি। মুনিয়া ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই তার। স্ত্রী বুধনি বছর তিনেক আগে খুব খারাপ ধরনের চেচকে (বসন্তে) মারা গেছে। জৈবিক বন্ধন বলতে ধুন্নিলালের ওই একটাই মেয়ে। এছাড়া আছে দু'টি প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী — একটা বন্দুক আর একটা ঘোড়া।

ধুন্নিলাল লক্ষ করল, মুনিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ, অর্থাৎ এখনও মেয়েটার ঘুম ভাঙেনি। কাল রাতভর হল্লা শুনে সে ছটফট করছিল; হয়তো ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধুন্নিলাল মেয়েকে আর ডাকাডাকি করল না, বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে গেল। আর তখনই বাঁ ধারের খড়ের ছাউনির তলা থেকে ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাকটা ভেসে এল।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধুন্নিলাল, মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে বাদামি রঙের স্বাস্থ্যবান প্রাণীটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘোড়াটা ডাকাডাকি তো করছেই, সেই সঙ্গে মাটিতে সমানে পা ঠুকে যাচ্ছে। এটা তার আনন্দের প্রকাশ। সকালবেলা ধুন্নিলাল তার ঘরে থেকে বেরুলেই ঘোড়াটা অস্থির হয়ে ওঠে।

ধুন্নিলাল হাত তুলে বলল, 'সবুর কর থোড়েসে। আমি মুখ ধুয়ে আসছি।' বলে উঠোনের শেষ মাথায় কুয়োটার দিকে চলে গেল।

চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে এসে ধুন্নিলাল দেখতে পায়, ঘোড়াটা এখনও সমানে পা ঠুকে যাচ্ছে। সঙ্গে সেই চিহি চিহি আওয়াজটা তো আছেই। ধুন্নিলাল দাঁড়ায় না, সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে কিছু শুকনো চানা এনে ঘোড়াটার সামনে একটা পুরনো, কালচে সিলভারের গামলায় ঢেলে দেয়। ঘোড়াটা তক্ষুনি খাওয়া শুরু করে না, গলাটা উঁচু করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। তার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না ধুন্নিলালের। সে আদর চাইছে।

ধুন্নিলাল ঘোড়াটার গলায় গালে আলতো চাপড় মেরে, মাথায় এবং পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে একনাগাড়ে বলে যায়, 'মেরে মুন্না, মেরে চুন্না—'

মেয়ে মুনিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে ঘোড়াটার সে নাম দিয়েছে মুন্না। প্রাণীটা কথাই শুধু বলতে পারে না; তবে মানুষের, বিশেষ করে ধুন্নিলালের ভাষা বোঝে। চিহি চিহি'র সঙ্গে তার গলা থেকে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকে, আরামে চোখ বুজে আসে। রোজ সকাল বেলায় এই আদরটুকু না পেলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় মুন্নার।

ঘোড়ার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আকাশের দিকে নজর চলে যায় ধুন্নিলালের। ছন্নছাড়া কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে। সূর্যটাকে ঢেকে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, সেগুলোর ফাঁক দিয়ে ভাদ্রের চড়া রোদ মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসছে। বেশ বেলা যে হয়েছে তা টের পাওয়া যায়।

হঠাৎ ধুন্নিলালের মনে পড়ে গেল, আজ দশটার মধ্যে হেকমপুরার সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার গৈবীনাথ মিশ্রর বাড়ির সামনের বড় মাঠে বিরাট 'মিটিন' হবে। পাটনা থেকে বড়ে বড়ে আদমিরা এসে কী সব বলবেন। ক'দিন ধরে মুখে চোঙা লাগিয়ে গৈবীনাথের ভলান্টিয়াররা হেকমপুরার টৌলিতে টৌলিতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আজ সবাইকে 'মিটিন'-এ হাজিরা দিতে হবে। যার যত কাজই থাক, সব ফেলে ওখানে না গেলে চলবে না। এই 'মিটিন'-এর সঙ্গে হেকমপুরা এবং তার চারপাশের তাবত গাঁ-গঞ্জের যত হিন্দু আছে তাদের বাঁচা-মরার সওয়াল নাকি জড়িয়ে আছে।

গৈবীনাথ এই এলাকার সব চেয়ে বড় ব্যবসাদার তো বটেই, হিন্দুদের সব থেকে জবরদস্ত নেতা। তাঁর হুকুমনামা অমান্য করার মতো বুকের পাটা কারুর নেই। বিশেষ করে ধুন্নিলালের। সে খানিকটা লেখাপড়া জানে। তার জোরে গৈবীনাথের আড়তগুলোতে হিসেব রাখার কাজ করে। অন্য সবার আগে তারই 'মিটিন'-এ পৌঁছনো দরকার।

ধুন্নিলাল ঘোড়াটাকে বলল, 'মুন্না, এখন আর তোর গায়ে হাত বুলোবার সময় নেই। বেরুতে হবে। তুই চানা খা—'

ঘোড়াটা যথেষ্ট বিবেচক, মাথাটা কয়েক বার ঝাঁকিয়ে গামলায় মুখ নামিয়ে দিল।

ধুন্নিলাল ফের তার ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং একটা সেকেলে বন্দুক, পুরনো কাপড়ের টুকরো আর তেল বার করে এনে বারান্দায় থেবড়ে বসে পড়ে। বন্দুকটা বে-আইনি নয়, দস্তুরমতো এটার লাইসেন্স আছে। গৈবীনাথ ক'দিন ধরেই ধুন্নিলালকে বলছেন, বন্দুকটা যেন ঘষে মেজে প্রস্তুত রাখে। খুব খারাপ দিন এসে গেছে। ধুন্নিলালের মারণাস্ত্রটার ভীষণ প্রয়োজন।

বন্দুকটার গায়ে দু-এক জায়গায় সামান্য মরচে ধরেছে। কাপড়ের ফালিটা ভাঁজ করে সামান্য জলে ভিজিয়ে ঘষতে থাকে ধুন্নিলাল। মরচে তোলার পর ওটার গায়ে ভালো করে কড়ুয়া তেল লাগাতে হবে। বন্দুকের যে অংশটা কাঠের তৈরি সেখানে ময়লা জমে কালচে হয়ে আছে। ময়লা তুলে দোকান থেকে বার্নিস এনে লাগতে হবে। তাছাড়া লম্বা নলের ভেতর কিছু ধুলো টুলো ঢুকে গেছে; সে সবও সাফ করতে হবে। আসলে বহুদিন এটা ব্যবহার করা হয়নি; যে চৌপায়ায় ধুন্নিলালের বিছানা তার তলায় ফেলে রাখা

এই ঘোড়া আর বন্দুকটা একসময় ছিল ফালমন সাহেবের। ফালমন অর্থাৎ ফারমোর। ফ্রান্সিস ফারমোর ছিলেন এই অঞ্চলের জবরদস্ত পুলিশ অফিসার। তখন তো হেকমপুরায় আজকালকার মতো এত চার চাকাওলা মোটর ছিল না। কোথাও যেতে হলে ঘোড়াই ছিল ফালমন সাহেবের একমাত্র ভরসা। সেই ঘোড়াটার দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ধুন্নিলালকে। বাদামি রঙের এই প্রাণীটাকে যথেষ্ট যত্ন করত সে। স্নান করানো, সময়মতো দানা খাওয়ানো, ডলাই মলাই করা—কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না।

তাছাড়া যে বন্দুকটার গা থেকে ধুন্নিলাল এই মুহূর্তে ধুলোময়লা সাফ করছে, ফারমোর সাহেব সেটাও তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। একটি না-মানুষ প্রাণী এবং একটা আগ্নেয়াস্ত্রের পরিচর্যা যেভাবে সে করত তাতে ফারমোর খুব খুশি ছিলেন। তিনি ধুন্নিলালকে নিজের হাতে বন্দুক চালাতে শিখিয়েছিলেন। তার নামে একটা লাইসেন্সও করে দিয়েছিলেন। ফারমোর সাহেবকে না জানিয়ে ঘোড়া চালোনোটা সে নিজেই শিখে নিয়েছিল।

হেকমপুরা বা তার আশেপাশে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট খুব কমই হত। সময় নির্বিঘ্নেই কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে কখনও ডাকাতি, রাহাজানি বা খুনখারাপির মতো ঘটনা ঘটলে এই বন্দুকটা হাতে নিয়ে ওই ঘোড়াটায় চেপে বেরিয়ে পড়তেন ফারমোর সাহেব। তার পেছন পেছন ঘোড়সওয়ার পুলিশের দলও যেত। ওদের ঘোড়াগুলোর দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল অন্য সহিসের, ধুন্নিলালের নয়।

ধুন্নিলাল বেশ বেশি বয়সেই ফারমোর সাহেবের কাছে কাজ নিয়েছিল। তিন চার বছর কাটার পর তার কানে কিছু কিছু খবর আসছিল, আংরেজদের সঙ্গে কাদের নাকি ভারী লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তবে জিনিসপত্রের দাম আচমকা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাওয়া ছাড়া সেই যুদ্ধের আঁচ এখানকার গায়ে তেমন লাগে নি।

বড় লড়াই যখন চলছে, সেই সময় হঠাৎ তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। গান্ধিবাবার নামটা জানা ছিল ধুন্নিলালের। তিনি নাকি কোথায় হুকুম জারি করেছেন, হিন্দুস্থানে আংরেজদের থাকা চলবে না। দেশে স্বরাজ আনতে হবে।

গান্ধি বাবার নাম যেমন সে শুনেছিল তেমনি কংগ্রেসের নামটাও তার অজানা ছিল না। কংগ্রেসওলারা তখন সারা দেশ জুড়ে 'মিটিন' করে বেড়াচ্ছে। এমনকি বারহৌলিতেও গান্ধিবাবা এসে 'মিটিন' করেছেন। তাঁর কথা জানার জন্য হাজার হাজার মানুষ ভেঙে পড়েছিল সেখানে

সেটা উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল। হেকমপুরায় তেমনভাবে টের না পাওয়া গেলেও, বারহৌলি টাউন একেবারে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। গান্ধিবাবা চলে যাবার পর সেই বেয়াল্লিশে দিনরাত বারহৌলিতে আকাশ ফাটানো স্লোগান শোনা যেত, 'আংরেজ ভারত ছোড়ো'—শুধু তাই না, কংগ্রেসের লোকেরা রেল লাইন উপড়ে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, পোস্ট অফিস আর থানায় আগুন লাগিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে পুলিশ অফিসার ফারমোর সাহেব একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বরাজওলা গান্ধিবাবা আর তাঁর চেলাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ লোকটার। ওই ঘোড়া অর্থাৎ মুন্নার পিঠে চড়ে যে বন্দুকটা ধুন্নিলাল এখন সাফ করছে সেটা বাগিয়ে ধরে গোটা বারহৌলি শহর তিনি একেবারে চষে বেড়াতেন। আর কুৎসিত আংরেজি গালিতে স্বরাজওলা কংগ্রেসীদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে যেতেন। ফলে কত যে সোনার টুকরো ছেলে তাঁর হাতে খুন হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। চোখের সামনে এই সব হত্যাকাণ্ড দেখতে দেখতে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যেত ধুন্নিলালের। কিন্তু তার মতো একজন ছোটখাটো ঘোড়ার সহিসের মুখ বুজে দেখা ছাড়া আর করারই বা কী ছিল?

ফারমোর সাহেব মানুষটা ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের, যাকে পছন্দ করতেন দেদার বকশিশ দিতেন। ধুন্নিলাল তাঁর কাছ থেকে প্রচুর টাকা, দামি দামি খাবার, নতুন প্যান্ট-জামা উপহার হিসেবে পেয়েছে।

সবই ভালো লোকটাব কিন্তু ভারতের স্বরাজ, গান্ধিবাবা আর কংগ্রেসীদের নাম শুনলে তাঁর শরীরের সব রক্ত মাথায় গিয়ে চড়ত। এমন একটা খ্যাপামি তাঁর ওপর ভর করত যেন হাতের কাছে গান্ধিবাবা বা তাঁর সহযোদ্ধাদের পেলে একেবারে ছিঁড়ে ফেলবেন।

বেয়াল্লিশে দেশের আজাদির সেই আন্দোলন একদিন থেমে যায়। তার দু'বছর বাদে ফারমোর সাহেব ইণ্ডিয়া ছেড়ে বিলেতে ফিরে যান। যাবার সময় তাঁর নিজস্ব ঘোড়া আর বন্দুকটা ধুন্নিলালকে দিয়ে গেছেন। তারপর থেকে গৈবীনাথের আড়তে কাজ নিয়েছে সে। একমাত্র মেয়ে মুনিয়া, ঘোড়া আর বন্দুক—এই নিয়ে তার সংসার।

বন্দুকটার মাজা ঘষা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় পাশের ঘরের দরজা খুলে মুনিয়া বেরিয়ে এল। বয়েস সতেরো আঠারো হলেও তেমন বাড় নেই মেয়েটার। রোগাটে পাতলা চেহারা। গায়ের রং তামাটে। তবে মুখখানা বেশ ভরাট। ভাসা ভাসা, টানা চোখ দু'টিতে নিষ্পাপ সারল্য যেন মাখানো। পরনে রঙিন ঘাগরা আর ঢোলা জামার ওপর ওড়না।

মুনিয়ার চোখে মুখে এখনও ঘুম জড়িয়ে আছে। ধুন্নিলালের দিকে তাকাতে তাকাতে আঙিনায় নেমে গেল সে। এক কোণে কুয়োর ধার ঘেঁষে খানিকটা ঘেরা জায়গায় স্নানের ব্যবস্থা। কুয়ো থেকে দু বালতি জল তুলে সেখানে ঢুকে গেল মেয়েটা। শীতগ্রীষ্ম বার মাস ঘুম থেকে উঠে স্নান করাটা তার অনেক দিনের অভ্যাস। সকালে 'নাহানা' করতে না পারলে সারাদিন তার শরীর নাকি খারাপ লাগে।

আচমকা দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল।

'কালী মাঈকি—'

'জয়—'

'বজরঙ্গবালী কি—'

'জয়—'

'হর হর মহাদেও—'

কাল মাঝরাত পর্যন্ত এগুলো একটানা শোনা গেছে। তারপর থেমে গিয়েছিল। এখন ফের নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে।

বন্দুকের নল থেকে ঘষে ঘষে মরচে ছাড়াতে ছাড়াতে একটু চমকে উঠল ধুন্নিলাল। কান খাড়া করে আন্দাজ করে নিল, আওয়াজটা গৈবীনাথ মিশ্রর বাড়ির দিকে থেকেই আসছে। অর্থাৎ 'মিটিন'-এর জন্য লোক জমতে শুরু করেছে।

এখন বাড়িতে বসে থাকা ঠিক হবে না। ধুন্নিলাল মনে মনে ঠিক করে ফেলল, আজ রাতের দিকে বন্দুকটা পুরো সাফ করে প্রস্তুত করে রাখবে। আর দেরি করলে গৈবীনাথজি খেপে যাবেন।

বন্দুকটা নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় বালিশের তলায় রেখে একটা ঢোলা ফুল প্যান্ট আর শার্ট পরে বাইরে বেরিয়ে আসে ধুন্নিলাল। বারান্দার একধারে মোটা চামড়ার একজোড়া ভারী বুট রয়েছে। সেটা পায়ে গলিয়ে যখন সে ফিতে বাঁধছে সেই সময় 'নাহানা' সেরে আঙিনা পার হয়ে ঘরের দিকে আসছে মুনিয়া। ধুন্নিলাল বলল, 'আমি বেরুচ্ছি রে মুনিয়া।'

গৈবীনাথের বাড়ির সামনে যে জমায়েত হবে তার খবরটা মুনিয়া আগেই জেনেছে। বলল, 'তুমি কি 'মিটিন'-এ যাচ্ছ?'

'হাঁ।'

'কখন ফিরবে?'

'ঠিক নেই। 'মিটিন' কতক্ষণ চলবে, তারপর গৈবীনাথজি কী করতে বলবেন, কিছুই জানি না। এমনও হতে পারে সাম তক আটকে রাখলেন।'

মুনিয়া বলল, 'তুমি কিছুক্ষণ বসে যাও। আমি চা-পানি আর চাপাটি বানিয়ে দিচ্ছি।'

ধুন্নিলাল বলল, 'এখন 'টেইম' নেই।' ফারমোর সাহেবের কাছে কয়েক বছর কাটানোর কারণে তার কথায় মাঝে মাঝে দু-চারটে আংরেজি বুলি ঢুকে যায়।

মুনিয়া বারান্দায় উঠে এসেছিল। সে বলে, 'তা হলে হালুইকরের দুকানে কিছু খেয়ে নিও।'

'হাঁ।'

বারান্দা থেকে আঙিনায় নামার জন্য আলগা ইট পেতে সিঁড়ি বানিয়ে নিয়েছে ধুন্নিলাল। নিচে নামতে নামতে হঠাৎ তার খেয়াল হয়, মেয়েটা সারাদিন একা একা বাড়িতে থাকবে। অন্য সময় হলে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু এখন শহর খুব গরম। কখন কী ঘটে যাবে, কেউ জানে না। আপাতত হেকমপুরায় কিছু না ঘটলেও সারা দেশ জুড়ে যে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আর মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে, এ সব খবর তো মিথ্যে নয়।

ধুন্নিলাল বলল, 'হোঁশিয়ার থাকবি। জানিস তো টৌনের হাল খুব খারাপ।'

মুনিয়া বলল, 'জানি তো। আমার জন্যে ভেবো না।'

ধুন্নিলাল বলল, 'যদি দেখিস কেউ ঝামেলা করতে আসছে, শিউনাথদের বাড়ি চলে যাস।'

'ঠিক হ্যায়—'মাথাটা ডান দিকে হেলিয়ে দেয় মুনিয়া।

ধুন্নিলালদের বাড়ির গা ঘেঁষে শিউনাথের বাড়ি। সম্পর্কে সে তার চাচেরা ভাই। মুনিয়াকে বলেই ধুন্নিলাল নিশ্চিন্ত থাকল না। উঠোনের ডান দিকের শেষ মাথায় গিয়ে গলা উঁচুতে তুলে ডাকতে লাগল, 'এ শিউ—শিউ—'

একটু পরেই বাড়ির সীমানার ওপারে শিউনাথকে দেখা গেল। ধুন্নিলালেরই প্রায় সমবয়সী হবে, তবে তার মতো মজবুত স্বাস্থ্য নয়। শিউনাথের দোহারা চেহারা, সে হেকমপুরায় টাঙ্গা চালায়। ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে।

শিউনাথের চোখদু'টো লাল, চুল উস্কখুস্ক। জ্বরে সে প্রায় ধুঁকছে। তাকে লক্ষ করতে করতে ধুন্নিলাল বলল, 'আমি গৈবীনাথজির 'মিটিন'-এ যাচ্ছি। তুই তো যেতে পারবি না?'

শিউনাথ দুর্বল গলায় বলে, 'কী করে যাব! আমার হাল তো দেখতেই পাচ্ছিস!'

'না না, বুখার নিয়ে তোকে যেতে হবে না। এক কাজ করিস—'

'কী?'

ধুন্নিলাল বলল, 'তোর ঘর থেকে আমাদের বাড়ির ভেতরটা দেখা যায়। মুনিয়ার ওপর নজর রাখিস। টৌন বহুত গরম হয়ে আছে।'

শিউলাল তাকে নিশ্চিন্ত করে বলে, 'ঠিক আছে, ভাবিস না। আমি আছি, মুনিয়ার চাচী আছে। তেমন বুঝলে ওকে আমাদের কাছে নিয়ে আসব। তুই যা। 'মিটিন'-এ কী হল, ফিরে এসে বলিস—'

'বলব—'

ধুন্নিলাল আর দাঁড়াল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে হেকমপুরার সব চেয়ে বড় সড়কটায় চলে এল। খোয়া-ফেলা এই সড়কটা শহরের মেরুদণ্ডের মতো উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। গৈবীনাথ মিশ্রদের বিশাল বাড়িটা ওদিকেই।

খোয়ার রাস্তায় লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে ধুন্নিলালের চোখে পড়ল, আরো অনেকেই গৈবীনাথের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। লক্ষ করল, সবার চোখেমুখে উত্তেজনা। এই ছোট টাউনে সকলেই সকলের পরিচিত। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগল ধুন্নিলাল। তারা শুনেছে পাটনা আর কলকাতা থেকে বড় বড় নেতারা আজকের 'মিটিন'-এ এসে বুঝিয়ে দেবেন, হেকমপুরা টাউনের বাসিন্দাদের দেশের এই সংকটে কী করতে হবে। তাই নিয়েই ওদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলছিল।

ধুন্নিলাল কথা বলছিল ঠিকই, তবে বার বার তার নজর চলে যাচ্ছিল সড়কের দু'ধারে। গোটা শহর ভীষণ থমথমে মনে হচ্ছে। হেকমপুরা মারাত্মক কোনো ঘটনার জন্য যেন শ্বাসরুদ্ধের মতো অপেক্ষা করছে।

কথায় কথায় ধুন্নিলালরা শহরের মাঝামাঝি জায়গায় সেই চওড়া নহরটার কাছাকাছি এসে পড়ল। আর তখনই বাঁ দিকে কোনাকুনি সে মুসলমানদের পাড়াটা দেখতে পেল। মানুষজন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। চারিদিক সুনসান। এখানে দু-একটা ছাড়া পাকা বাড়ি নেই বললেই হয়। সবই টিনের বা টালির ঘর। সব ঘরেরই দরজা জানালা বন্ধ। দেখে মনে হচ্ছে, মুসলমান টৌলির বাসিন্দারা বাড়িঘর ফেলে পালিয়ে গেছে।

নহরের ওপর যে পুলটা রয়েছে সেটা পেরিয়ে আরো খানিকটা হাঁটার পর প্রবল হইচই শোনা যায়। অর্থাৎ গৈবীনাথজির বাড়ির সামনের মাঠে নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রচুর লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। তাদের মিলিত কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসছে।

ধুন্নিলাল পথের সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই, কিন্তু তার চোখ ছিল মুসলমান পাড়াটার দিকে। আজন্মের পরিচিত ওখানকার বাসিন্দারা হেকমপুরা ছেড়ে চলে গেছে, ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ওরা বড়ই গরিব আর নিরীহ। চারিদিকে যে খুনখারাপি রক্তারক্তি চলছে তার সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। দু টুকরো রুটির জন্য তারা দিনভর খেটে যায়। অন্য কোনো দিকে নজর দেবার সময় তাদের নেই।

চলতে চলতে হঠাৎ ধুন্নিলালের চোখে পড়ে, মুসলমান টৌলার একটা ঘরের জানালার পাল্লা খোলা রয়েছে। সেখানে বুড়ো জমিরুদ্দিনকে দেখা গেল। আতঙ্কগ্রস্তের মতো সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ বুকের ভেতর কী একটা প্রতিক্রিয়া যেন ঘটে যায় ধুন্নিলালের। মুসলমান টৌলির নিরীহ বাসিন্দাদের মধ্যে জমিরুদ্দিন আরো বেশি নিরীহ। লোকটার নসিব বেজায় খারাপ। গত দু বছরের মধ্যে তার একমাত্র ছেলে, ছেলের বউ আর নিজের বিবি মারা গেছে। সংসারে একমাত্র নাতনি আসমা ছাড়া আর কেউ নেই। ওদের মতো মানুষের ঘরে অঢেল সোনাদানা টাকাপয়সা জমানো থাকে না যে পায়ের ওপর পা তুলে বসে বসে খাবে। এই বয়সেও আসমা আর তার নিজের পেট চালাবার জন্য সারা দিন 'গতরচুরণ' খেটে কাজ করতে হয়।

জমিরুদ্দিনের আতঙ্কের কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ধুন্নিলালের। সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সঙ্গীদের বলে, 'তোমরা 'মিটিন'-এ চলে যাও। আমি আসছি।'

সঙ্গীরা চলে যায়। রাস্তা থেকে বাঁ দিকের ঢালে নেমে জমিরুদ্দিনের কাছে চলে আসে ধুন্নিলাল। জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে চাচা? তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?'

জমিরুদ্দিন বলে, 'আজ গৈবীনাথজির হাভেলির সামনের মাঠে 'মিটিন' হবে। আমার বহোত ডর লাগছে রে ধুন্নি—'

'কিসের ডর?'

'তুই ভেতরে আয়। বলছি—'

একই শহরের মানুষ। ধুন্নিলালকে জন্মাতে দেখেছে জমিরুদ্দিন। তাছাড়া ধুন্নিলাল তার মৃত ছেলে রাশেদের বন্ধু। সেই সুবাদে তাকে তুই করে বলে।

ধুন্নিলাল বাড়ির ভেতর চলে আসে। রাশেদের বন্ধু হিসেবে ছেলেবেলা থেকে এ বাড়িতে তার যাতায়াত। জমিরুদ্দিন তাকে ছেলের মতোই মনে করে। তা ছাড়া, পর্দার অত কড়াকড়ি নেই এখানে।

বাড়ির ভেতর দিকের বারান্দায় একটা দড়ির চৌপায়া রয়েছে। ধুন্নিলালকে সেখানে বসিয়ে তার গা ঘেঁষে বসল জমিরুদ্দিন। বারান্দার আরেক ধারে জড়সড় হয়ে বসে আছে আসমা। তার বয়স সতেরো আঠারো। গায়ের রং শ্যামলা হলেও বেশ সুন্দরী; পরনে রঙচঙে ছিটের সালোয়ার-কামিজ, মাথায় ওড়না। এমনিতে মেয়েটা খুবই প্রাণবন্ত, হাসিখুশি। আগে যখনই ধুন্নিলাল এ বাড়িতে এসেছে, হইচই করে মাতিয়ে দিত আসমা। কিন্তু আজ একবারে কুঁকড়ে আছে। তার চোখেমুখে নিদারুণ ভয় আর দুশ্চিন্তা ফুটে বেরিয়েছে।

জমিরুদ্দিন ধুন্নিলালের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'বহোত বিপদে পড়ে গেছি বেটা। কী করব বুঝতে পারছি না।'

ধুন্নিলাল আসমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কিসের বিপদ চাচা?'

'চারদিকের খবর তো সবই জানিস। এই---' বলতে বলতে চুপ করে যায় জমিরুদ্দিন।

নিচু গলায় ধুন্নিলাল বলে 'হাঁ—'

'আমাদের টৌলির বেশির ভাগ মানুষ পালিয়ে গেছে। যারা আছে জানালা বন্ধ করে ভেতরে বসে আছে। লেকেন দুনিয়ায় আমার এমন কোনো রিস্তেদার নেই যেখানে যেতে পারি।'

নিরাপত্তার কারণে মুসলমান মহল্লা ছেড়ে বেশির ভাগ মানুষ যখন চলে গেছে তখন নিরুপায় হয়েই জমিরুদ্দিনকে হেকমপুরায় পড়ে থাকতে হয়েছে। ধুন্নিলাল কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

জমিরুদ্দিন এবার ব্যাকুলভাবে বলে, 'আমি একা হলে যা হবার হত। আমার তিন কাল গেছে, গোরের দিকে পা বাড়িয়ে আছি। লেকেন ওই লেড়কিটা---'আসমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে একটানা বলে যায়, 'ওর কথা ভাবলে আমার কলিজা ফেটে যায়।'

শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট টের পেতে থাকে ধুন্নিলাল। জমিরুদ্দিনের মতো তারও একই দুর্ভাবনা। তার মৃত্যু হলে মুনিয়াকেও দেখার কেউ নেই। এদিক থেকে জমিরুদ্দিন আর সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

জমিরুদ্দিন থামে নি, 'গৈবীনাথজির হাভেলির সামনে আজ 'মিটিন' হবার পর আমাদের টৌনে কী ঘটবে জানি না। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভেবে ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। এই সময় তোকে রাস্তায় দেখতে পেলাম। ভাবলাম ডাকি। ডরে ডাকলাম না, পাছে অন্য কেউ শুনতে পায়। লেকেন তুই আমাকে দেখতে পেয়ে চলে এলি। ধুন্নি, তুই আমার বেটা য্যায়সা। বলে দে, এখন আমি কী করব?' কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ধুন্নিলালের দুই হাত আঁকড়ে ধরে জমিরুদ্দিন।

বাতাস যখন পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আর আক্রোশের বিষে ভারাক্রান্ত সেই সময় জমিরুদ্দিন তার পরামর্শ চাইছে। যেন ধুন্নিলাল ছাড়া বিশ্বাস বা ভরসা করার মতো আর কেউ নেই এই পৃথিবীতে।

জমিরুদ্দিন বলতে লাগল, 'লেড়কিটার মা-বাপ মরে গিয়ে আমার ওপর সব দায় চাপিয়ে

দিয়ে গেছে। দুনিয়ায় আমিই ওর একমাত্র জিম্মেদার। ওর ইজ্জৎ বাঁচাতে না পারলে মরেও শান্তি পাব না ধুন্নি—'

ধুন্নিলাল বলল, 'তুমি এত চিন্তা কোরো না চাচা। হেকমপুরায় তোমরা আমরা একসঙ্গে কত কাল ধরে আছি। কখনও কোনো গোলমাল হয়নি। এবারও হবে না।'

'সময়টা আর আগের মতো নেই রে ধুন্নি। থাকলে কি পরোয়া করতাম? টের পাচ্ছি হাল বহোত খারাপ। আমার মন বলছে হেকমপুরায় আগুন জ্বলবে।' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়তে লাগল জমিরুদ্দিন।

এই বৃদ্ধ মানুষটা যা বলছে, ধুন্নিলালের ধারণা সেটা শতকরা একশো ভাগ ঠিক। মিটিংটা হয়ে যাবার পর হেকমপুরা আর আগের হেকমপুরা থাকবে না। এখানেও কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাইয়ের মতো রক্তস্রোত বয়ে যাবে। ধুন্নিলাল বলল, 'জমির চাচা, তুমি জানো গৈবীনাথজির আড়তে আমি নৌকরি করি।'

জমিরুদ্দিন বেশ একটু অবাক হয়। ধুন্নিলাল কেন গৈবীনাথের কথা তুলল, বুঝতে পারে না। আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'হাঁ, জানি—'

'গৈবীনাথজির হুকুমে আমাকে 'মিটিন'-এ যেতে হচ্ছে।'

জমিরুদ্দিন উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে। ধুন্নিলাল কী বোঝাতে চাইছে? নিরুপায় হয়েই কি সে মিটিংয়ে চলেছে? তার নিজের তেমন ইচ্ছা ছিল না?

ধুন্নিলাল এবার বলে, 'যদি এর ভেতর দেখ, কোনো ঝামেলা হচ্ছে, আসমাকে নিয়ে সোজা আমাদের কোঠিতে চলে যেয়ো। ঘরে মুনিয়া আছে। তাকে বোলো আমি তোমাদের যেতে বলেছি।' একটু চিন্তা করে বলল, 'বড় সড়ক দিয়ে যাবে না, কারুর নজরে পড়ে যাবে। কেন ওদিক দিয়ে যেতে বারণ করছি জরুর বুঝতে পারছ।'

অবশ্যই বুঝেছে জমিরুদ্দিন। মানুষের মতিগতি এখন ঠিক নেই। উত্তেজনা বা আক্রোশের বশে কে কী করে বসবে, কেউ জানে না। তাই কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। সে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ, লেকেন—'

'কী?'

'কোন দিক দিয়ে তা হলে যাব?'

মুসলমানদের এলাকার পেছন দিক থেকে শুরু হয়েছে ধানখেত। এই আগস্ট মাসে মাইলের পর মাইল জুড়ে, ধু ধু দিগন্ত পর্যন্ত শুধু ধান আর ধান। বর্ষার গোড়ায় যেসব চারা রোয়া হয়েছিল, এখন সেগুলো বুক সমান বড় হয়ে উঠেছে। যে নহরটা হেকমপুরাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সেটা আধখানা বৃত্তের আকারে বেঁকে ধানখেতের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছে।

ধানবন ঠেলে পশ্চিমে খানিকটা গেলে নহরের ওপর একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো পাওয়া যাবে। ওটা পেরিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে ধুন্নিলালের বাড়ি।

ধানখেতের দিকটা একেবারে নির্জন। ধুন্নিলাল বলল, নিরাপত্তার কারণে ঘুরপথে সাঁকো পেরিয়ে ওধার দিয়ে যেন জমিরুদ্দিনরা তার বাড়ি চলে যায়।

জমিরুদ্দিন বলল, 'ঠিক হ্যায়—'

ধুন্নিলাল আর বসল না, জমিরুদ্দিনদের সতর্কভাবে থাকতে বলে চলে গেল।

গৈবীনাথ মিশ্রর তিন-মহল বিরাট হাভেলির সামনের বড় মাঠে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় মিটিং শুরু হয়ে গেল।

একধারে লাল শালু দিয়ে মোড়া উঁচু মঞ্চ। সেখানে পাটনা থেকে আসা বড় বড় নেতারা বসে আছেন। তা ছাড়া রয়েছেন স্বয়ং গৈবীনাথ মিশ্র এবং হেকমপুরা টাউনের গণ্যমান্য লোকজনেরা।

মঞ্চের সামনে বিশাল জনতা। শুধু হেকমপুরা নয়, চারিদিকের গ্রামগঞ্জ থেকে হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে।

নেতারা একের পর এক উঠে যা বলতে লাগলেন সংক্ষেপে তা হল, কলকাতা নোয়াখালি লাহোরের বদলা নিতে হবে। দাঁতের বদলে দাঁত, খুনের বদলে খুন চাই। তাঁদের বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ যেন শ্রোতাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল।

উত্তেজিত জনতা মুহুর্মুহু চিৎকারে আকাশ চৌচির করে ফেলতে লাগল।

'কালী মাঈকি—'

'জয়—'

'বজরঙ্গবলীকি—'

'জয়—'

'খুনকা বদলা খুন—'

মঞ্চের কাছাকাছি একধারে দাঁড়িয়ে জনতাকে লক্ষ করছিল ধুন্নিলাল। প্রতিটি শ্রোতার চোখেমুখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠছে। তাদের মারমুখী, ভয়ঙ্কর চেহারার দিকে তাকিয়ে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোত ওঠানামা করতে থাকে। সে যেন দেখতে পাচ্ছিল, চিরকালের শান্ত নিরুত্তেজ হেকমপুরা আজ একেবারে তোলপাড় হয়ে যাবে, শহর জুড়ে রক্তের বান ডাকবে।

আচমকা ধুন্নিলালের চোখের সামনে বুড়ো জমিরুদ্দিন আর আসমার মুখ দু'টো ফুটে ওঠে। সে দ্রুত ভেবে নিল, মিটিং শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান পাড়ায় গিয়ে আসমাদের নিয়ে নিজের কোঠিতে চলে যাবে. কিন্তু যাওয়া আর হল না। সভা শেষ হলে নেতারা বড় মোটর গাড়ি চড়ে চলে গেলেন। আর গৈবীনাথ মিশ্র ধুন্নিলাল এবং তার মতো বাছা বাছা আরো কয়েকজনকে নিয়ে নিজের হাভেলিতে চলে এলেন। ধুন্নিলালকে জিগ্যেস করলেন, 'তোর বন্দুক কোথায়?'

ধুন্নিলাল বলল, 'ঘরে আছে হুজৌর—'

অন্যদের বন্দুক না থাকলেও রয়েছে নানা ধরনের মারণাস্ত্র। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন সবার হাতিয়ারই তৈরি আছে। এবার হেকমপুরা এবং এই শহরের চারপাশের গ্রামগুলোতে যে শত্রুপক্ষের লোকেরা আছে তাদের ধ্বংস করার জন্য ধুন্নিলালদের সবাইকে আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিলেন। প্রত্যেকে পঞ্চাশ ষাট জন করে দাঙ্গাবাজ জুটিয়ে এক একটা গ্রামে হানা দেবে।

এদিকে যে শ্রোতারা চারপাশ থেকে জড়ো হয়েছিল তারা উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে ছড়িয়ে পড়েছে।

আক্রমণের পদ্ধতি স্থির হবার পর গৈবীনাথজির হাভেলি থেকে বেরুতে বেরুতে দুপুর পেরিয়ে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধুন্নিলাল দেখতে পেল, সূর্যটা পশ্চিম দিকে খানিকটা নেমে গেছে। অল্প স্বল্প মেঘ এধারে ওধারে ভেসে বেড়াচ্ছে ঠিকই, তবে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

সেই সকাল বেলা সামান্য কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ধুন্নিলাল। এখন পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। কিন্তু খিদের অনুভূতি ছাপিয়ে বার বার আতঙ্কগ্রস্ত জমিরুদ্দিন আর আসমাকে মনে পড়ে যাচ্ছে। সে ঠিক করে ফেলল, ওদের সঙ্গে নিয়ে ধানবনের ভেতর দিয়ে ঘুরে বাড়ি

যাবে। মিটিংয়ের পর এখন শহরের যা হাল তাতে কোনোভাবেই জমিরুদ্দিনদের মুসলমান টৌলিতে পড়ে থাকা নিরাপদ নয়।

খোয়ায়-ঢাকা বড় সড়কটা ধরে বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ প্রচণ্ড হই চই, উল্লাস আর আর্ত চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। চকিত হয়ে ওঠে ধুন্নিলাল। এধারে তাকাতেই চোখে পড়ে মুসলমান মহল্লাটা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। হই-হল্লা ওখান থেকেই ভেসে আসছে।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধুন্নিলাল। জমিরুদ্দিনদের পাড়ায় যে আগুন ধরানো হয়েছে, সেটা এখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

কালো, গাঢ় ধোঁয়া ক্রমশ ওদিকের আকাশ ছেয়ে ফেলছে। ধুন্নিলাল হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে শুরু করল। মিটিংয়ে আসার আগে জোর করে জমিরুদ্দিনদের তার কোঠিতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। গৈবীনাথজি আক্রমণের পদ্ধতি ঠিক করে দেওয়ার আগেই যে জনতা এমন ভয়াবহ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে, কে ভাবতে পেরেছিল! জমিরুদ্দিনরা বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে বলবে!

আর দাঁড়ায় না ধুন্নিলাল। দৌড় শুরু করে। আর দৌড়ুতে দৌড়ুতে টের পায় শ্বাস যেন আটকে আসছে। যদি গিয়ে দেখে জমিরুদ্দিন আর আসমার কোনো ক্ষতি হয়েছে, আপশোশের সীমা থাকবে না। তার একটা ভুলের জন্য দু'টো নিরীহ, নির্দোষ মানুষের জীবন যদি বরবাদ হয়ে থাকে, এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা আর কী হতে পারে?

আকাশটা কালো হয়ে ছিলই, কিন্তু আরো খানিকটা যাওয়ার পর যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার জন্য মন একেবারেই তৈরি ছিল না ধুন্নিলালের। ঘন্টা চারেক আগে যে মুসলমান পাড়াটা দেখে গিয়েছিল সেটা এখন একেবারে ধ্বংসস্তূপ। এখানকার একটা বাড়িও আস্ত নেই। চালার টালি বা টিন ভাঙাচোরা আর দোমড়ানো অবস্থায় ছত্রখান হয়ে আছে। বাঁশ বা কাঠের খুঁটি, জামাকাপড়, বিছানা, বালিশ, সব জ্বলছে। তারই গাঢ়, কালো ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন। বাসনকোসন, অর্থাৎ হাঁড়ি, বালতি, সোরাই—সব আছড়ে চুরমার করা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, মিটিং থেকে বেরিয়ে ক্ষিপ্ত জনতা খানিক আগে এখানে তাণ্ডব চালিয়ে গেছে।

এখন কেউ কোথাও নেই। না ঘাতকবাহিনী, না এই মহল্লার মানুষজন। বিমূঢ়ের মতো এধারে ওধারে তাকাতে লাগল ধুন্নিলাল। এবার তার চোখে পড়ল, মহল্লার অন্য সব বাড়ির মতো জমিরুদ্দিনের বাড়িটাও জ্বলছে। কিন্তু বুড়ো আর তার নাতনি গেল কোথায়?

ঢাল বেয়ে রাস্তা থেকে নিচে নেমে জমিরুদ্দিনদের পাড়ায় চলে এল ধুন্নিলাল। প্রথমে চাপা গলায়, তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'জমির চাচা—আসমা— আসমা—কোথায় তোমরা?'

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

শুধু জমিরুদ্দিনরাই না, এই মহল্লার কাকে না চেনে ধুন্নিলাল? এবার তাদেরও নাম ধরে ডাকতে থাকে, 'বজলুর—ফকিরা—হান্নান—ফরিদ—'

গোটা পাড়া নিস্তব্ধ। কেউ উত্তর দিল না।

মহল্লার ভেতর ঢুকে পড়ল ধুন্নিলাল। আতিপাতি করে চারিদিকে জমিরুদ্দিনদের খোঁজ করল কিন্তু তাদের পাওয়া গেল না। তবে তিন চারটে লাশ দেখা গেল। ওরা হল ফরিদ, আমজাদ, মইনুল আর আসাদ। মৃতদেহগুলোর শরীর থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

দু-তিনদিন আগেও এদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ধুন্নিলালের। আজ তারা সবাই লাশ হয়ে

গেছে। হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ আসাদদের দেখল ধুন্নিলাল। তারপর প্রায় টলতে টলতে উঁচু সড়কে উঠে এল।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে ধুন্নিলালের চোখে পড়ে, বড় সড়কের নানা জায়গায় থোকায় থোকায় লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রায় সবার হাতেই লাঠি, দা এবং নানা ধরনের হাতিয়ার। উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে ওরা কী যেন বলাবলি করছে। এদের সকলকেই চেনে ধুন্নিলাল। এমনিতে এরা সাদাসিধে ভালোমানুষ, নিরীহ এবং ভীরু। কারুর গায়ে একটা আঙুল ঠেকানোর সাহস ওদের নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকগুলোর দিকে তাকালে সে কথা কে বলবে! চিরকালের শান্তিপ্রিয় আর গরিব হেকমপুরার এই মানুষগুলোর ভেতর থেকে মারাত্মক এক একটি হত্যাকারী যেন বেরিয়ে এসেছে।

ধুন্নিলালকে দেখে প্রতিটি জটলা থেকে কেউ না কেউ বলে উঠছে, 'শুনা ধুন্নি ভাইয়া, আজ ক্যা হুয়া?'

কোন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে ওরা প্রশ্ন করছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না ধুন্নিলালের। সে অস্পষ্টভাবে কিছু একটা উত্তর দেয়।

লোকগুলো প্রবল উৎসাহে জানায়, হেকমপুরার সব দুশমন ভেগে গেছে। দু চারটে যা ছিল, খতম করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন দিনরাত হাতিয়ার নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা চারিদিকে শত্রুপক্ষের লোকেরা আছে, তারা যে কোনো মুহূর্তে এই টাউনে হানা দিতে পারে।

ধুন্নিলাল জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল।

বাড়িতে এসে সে দেখতে পায়, বারান্দায় বসে আছে মুনিয়া। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড অস্থিরতার ছাপ। ধুন্নিলালকে দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। চাপা গলায় বলে, 'বাপু, তুরন্ত ভেতরে এস।'

ধুন্নিলাল মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আঁচ করে নেয়, কিছু একটা ঘটেছে। জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে রে?'

উত্তর না দিয়ে ধুন্নিলালকে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে যায় মুনিয়া। বলে, 'ওই দেখ----'

এ ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। বাইরের আলো ভেতরে আসতে পারে নি। আবছা অন্ধকারেও ধুন্নিলাল দেখতে পায় মুনিয়ার চৌপায়ার ওপর দু'টি মানুষ বসে আছে। একটু চকিত হয়ে জিগ্যেস করে, 'কৌন?' পরক্ষণে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এলে বুঝতে পারে, ওরা জমিরুদ্দিন আর আসমা। ওরা যে বেঁচে আছে এবং তার বাড়িতে এসেই আশ্রয় নিয়েছে, নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

ধুন্নিলাল এবার কিছু বলার আগে তার দু টো হাত জড়িয়ে ধরে জমিরুদ্দিন। সন্ত্রস্ত গলায় বলে, 'আমরা পালিয়ে এসেছি ধুন্নি----'

ধুন্নিলাল টের পাচ্ছিল, জমিরুদ্দিন ভীষণ কাঁপছে। তাকে সাহস দিয়ে বলে, 'ডরো মাত চাচা। আমার কোঠিতে যখন এসেছ, কেউ তোমাদের গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না।'

জমিরুদ্দিন উত্তর দিল না। ধুন্নিলাল বলল, 'মিটিন'-এর পর আমি তোমাদের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। পুরা মহল্লা তখন জ্বলছে। তোমাদের দেখতে না পেয়ে মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কী বলব!' একটু থেমে ফের বলে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর কী হয়েছিল বল তো?'

জমিরুদ্দিন বলে, ধুন্নিলাল চলে গেলে সে আর আসমা প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে ঘরের ভেতর বসে ছিল। কেননা, মিটিং ভাঙার পর কী হতে পারে, তারা ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না।

সকাল থেকে আজ তাদের মুখে এক ফোঁটা জলও পড়ে নি। রান্নাবান্না চড়ানো যে দরকার সেটা কারুর মাথাতেই আসে নি। আসলে ভয়ে, দুর্ভাবনায় খিদে এবং তেষ্টার বোধটাই তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কতক্ষণ দমবন্ধ করে ঘরের ভেতর বসে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ বহু মানুষের হল্লায় তারা চমকে ওঠে। জানালা দিয়ে দেখে উত্তেজিত জনতা লাঠি বল্লম নিয়ে তাদের মহল্লার দিকে ছুটে আসছে। ওদের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। মহল্লায় যে ক'জন তখনও পড়ে ছিল, প্রাণভয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যে যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। সেও ধুন্নিলালের কথামতো বাড়িঘর ফেলে আসমার একটা হাত ধরে পেছন দিকের জমিতে নেমে যায়। তারপর ধানবনের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে ঘুরপথে সাঁকোর কাছে গিয়ে দেখতে পায়, তাদের মহল্লায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কোনোরকমে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যায় জমিরুদ্দিনরা। কিন্তু রাস্তায় ওঠে না। সড়কের ধার ঘেঁষে নানা ধরনের ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গল। সেগুলোর আড়াল দিয়ে দিয়ে ধুন্নিলালের বাড়ি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুনিয়াকে জানায়, ধুন্নিলাল তাদের এখানে আসতে বলেছে। মুনিয়া বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে তক্ষুনি দু'জনকে তার ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। শহরের হালচালের কথা তার খুব ভালো করেই জানা আছে। তাদের বাড়িতে জমিরুদ্দিনদের কেউ দেখে ফেললে তার ফলাফল যে মারাত্মক হবে সে তা জানে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাই তাদের এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছে যাতে বাইরের কেউ দেখতে না পায়।

ধুন্নিলাল জিগ্যেস করে, 'ধান-জমিনের ভেতর দিয়ে যে এলে, কারুর নজরে পড়ে যাও নি তো?'

জমিরুদ্দিন বলে, 'মনে হয় না। খুনিরা দেখে ফেললে এখানে কি পৌঁছুতে পারতাম? স্রিফ লাশ হয়ে যেতাম।'

কথাটা ষোল আনা সত্যি। হানাদারদের সামনে পড়লে জমিরুদ্দিনদের চরম সর্বনাশ হয়ে যেত। ধুন্নিলাল এবার মেয়েকে জিগ্যেস করল, 'জমির চাচাদের খবরটা কি শিউনাথরা পেয়েছে?'

মুনিয়া বলল, 'নেহী। শিউচাচাদের কেউ তখন এদিকে ছিল না।'

শিউনাথ এবং তার ঘরবালীকে খুবই বিশ্বাস করে ধুন্নিলাল। লোক হিসেবেও ওরা ভালো। কিন্তু অনেক সময় মানুষের মুখ দিয়ে অজান্তে অনেক গোপন কথা বেরিয়ে যায়। জমিরুদ্দিনদের আসার খবরটা কোনোভাবে জানাজানি হোক, এটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

ধুন্নিলাল বলল, 'শিউনাথদের এখন ওদের কথা বলিস না।'

'ঠিক হ্যায়।'

'তোর চাচি টাচী এলে তোর ঘরে যেতে দিস না।'

'ঠিক হ্যায়।'

'জমির চাচা আর আসমাকে কিছু খেতে দিয়েছিস?'

'খাওয়ার কথা বলেছিলাম। খায় নি।'

ধুন্নিলাল জিগ্যেস করে, 'খানা পাকানো হয়েছে?'

মুনিয়া মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ। চাপাটি, সবজি আর ডাল।'

'আসমাদের জন্যে নিয়ে আয়।'

খাবার নিয়ে আসে মুনিয়া। পাশে বসিয়ে তাদের খাওয়ায় ধুন্নিলাল। তারপর ঘরের বাইরে আসে।

সে যখন ফিরে আসে ডান ধারের চালাটার তলায় ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে পা ঠুকছিল। আর সমানে চিঁহিঁহি চিঁহিঁহি করে ডেকে যাচ্ছিল। তখন ওর দিকে তাকানোর মতো মনের অবস্থা ছিল না। এবার বারান্দা থেকে নিচে নেমে গিয়ে গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে খানিকক্ষণ তাকে আদর করে।

ঘোড়াটাকে খুশি করার পর স্নান করে খেয়ে নেয় ধুন্নিলাল। তারপর জমিরুদ্দিনদের জিরিয়ে নিতে বলে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আজ সকাল থেকে হেকমপুরায় যে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলো তার স্নায়ুগুলিকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। দু-আড়াই শো বছরের এই পুরনো, নগণ্য শহরে আগে এমন খুনখারাপি, আগুন কেউ কখনও দেখে নি। ধুন্নিলালের কপালের দু'পাশের রগদু'টো সমানে দপ দপ করছে। মনে হয় ছিঁড়ে পড়বে।

কিন্তু হত্যা, রক্তপাত—এসবের কথা এই মুহূর্তে ভাবছে না ধুন্নিলাল। আসমা আর জমিরুদ্দিনকে কিভাবে বাঁচাবে, এখন সেটাই তার একমাত্র চিন্তা। সর্বক্ষণ তো ওদের ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া দুর্ভাবনার কারণ আরো আছে। তাকে রোজই গৈবীনাথজির আড়তে যেতে হয়। তার ওপর আজ মারাত্মক একটা দায়িত্বও তাকে দেওয়া হয়েছে। দলবল জুটিয়ে হেকমপুরার কাছাকাছি দুশমনদের একটা গাঁয়ে হানা দিতে হবে। তাদের বাড়িতে প্রচুর লোকজন আসে। সে যখন থাকবে না সেই সময় কেউ যদি এসে পড়ে এবং জমিরুদ্দিনদের দেখে ফেলে, ওরা তো বিপদে পড়বেই, তাদের ওপরও হেকমপুরার লোকজন খেপে উঠবে। বিশেষ করে গৈবীনাথজির কানে খবরটা উঠলে তার পরিণতি কী হবে, ভাবতেও সাহস হয় না ধুন্নিলালের।

গৈবীনাথজি পরিকল্পনা ছকে দিয়েছিলেন, চারপাশের গাঁগুলোতে গিয়ে শত্রুপক্ষের মহল্লায় মহল্লায় কিভাবে তাণ্ডব চালাতে হবে। আজ বিকেলে ধুন্নিলালের কাছাকাছি একটা গ্রাম বিজুরিতে সশস্ত্র লোকজন জুটিয়ে যাবার কথা আছে। কিন্তু সে স্থির করে ফেলল, যাবে না। তার বাড়িতে থাকা দরকার। মুনিয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হলেও বয়সটা তো কম। লোকজন এসে গেলে সামলে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। কেননা এ জাতীয় সমস্যার মুখে মেয়েটা তো আগে পড়ে নি। ঘাবড়ে গিয়ে বেফাঁস কিছু বলে ফেলতে পারে।

গৈবীনাথজি ছক কষে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন নি। ঠিকমতো কাজ হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে খবরও রাখছেন।

সন্ধের ঠিক আগে আগে গৈবীনাথজি ধুন্নিলালের কাছে লোক পাঠালেন। তিনি জানতে পেরেছেন, ধুন্নিলাল বিজুরিতে যায় নি।

যাকে পাঠানো হয়েছিল তার নাম ধনপত। সে গৈবীনাথজির পোষা অত্যন্ত বিশ্বস্ত এক পহেলবান। দুশমনের মতো চেহারা তার, পাকানো গোঁফ, চৌকো মুখ, চোখে বাঘের দৃষ্টি, হাতে লোহার মুঠওলা লম্বা লাঠি। লোকটাকে দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, খুন করাটা এর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। ধনপত বলল, 'গৈবীনাথজি জানতে চাইলেন, তুমি বিজুরিতে যাও নি কেন?'

ধুন্নিলাল ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। হাজার হোক গৈবীনাথজি তার মনিব। ফারমোর সাহেব চলে যাবার পর তাঁর আড়তে নৌকরি পেয়েছে বলে নিজের আর মেয়ের পেট চলে যাচ্ছে। মালিকের হুকুম অমান্য করার মতো বুকের পাটা তার থাকার কথা নয়। তবু যে করেছে সেটা জমিরুদ্দিন আর আসমার জন্য। দু'টো নিরীহ মানুষ যারা দুনিয়ার কারুর

কোনো ক্ষতি করে নি, চোখের সামনে উত্তেজিত জনতার আক্রোশের শিকার হয়ে যাবে, এটা তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আবার গৈবীনাথজিকেও চটানো যায় না।

ধুন্নিলাল ধনপতের মুখের দিকে তাকিয়ে কাতর সুরে বলে, 'তবিয়ত বহোত খারাপ ধনপত ভেইয়া। মাথায় খুব দর্দ হচ্ছে। তাই বেরুতে পারিনি।'

সে যে অসুস্থ সেটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই বোঝাতে পেরেছে ধুন্নিলাল। ধনপত বলল, 'তবিয়ত যখন আচ্ছা নেই তখন আজ আর বেরুতে হবে না। তুমি শুয়ে থাকো গিয়ে—'

ধুন্নিলাল ধনপতের একটা হাত ধরে আগের সুরেই বলল, 'তুমি তো আমাকে দেখে গেলে। গৈবীনাথজিকে বুঝিয়ে বোলো, কেমন?'

'হাঁ হাঁ, বলব।'

'মালিক যেন আমার ওপর গুস্সা না করেন।'

'চিন্তা মাত করনা। মালিক আচ্ছা আদমি, সব শুনলে গুস্সা করবেন না।'

ধনপত চলে গেল।

একটা দিনই শুধু না, পর পর তিনটে দিন শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুল না ধুন্নিলাল।

এদিকে ধনপতকে রোজই পাঠাচ্ছেন গৈবীনাথজি। তাঁর ব্যাপক পরিকল্পনায় ধুন্নিলালের জন্য খুঁত থেকে যাচ্ছে। বিজুরি গ্রামে শত্রুপক্ষের প্রচুর লোকজন। সেখানে লাঠিসোঁটার ওপর ভরসা করে হানা দিতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। তার জন্য দরকার গুলি বন্দুক। আর হেকমপুরায় যে দু-চারটে লোক বন্দুক চালাতে পারে তাদের একজন হল ধুন্নিলাল। বলা যায় সে এই শহরের সব চেয়ে সেরা বন্দুকবাজ।

ধনপতই না, হেকমপুরার আরো অনেকেই তার শরীর খারাপের খবর পেয়ে দেখা করতে এল। অসুস্থতা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য দাড়ি কামায় নি ধুন্নিলাল। স্নান করে নি, চুলে তেল লাগায় নি। উস্কখুস্ক দাড়ি এবং চুল দেখলে মনে হয় সত্যিই সে রোগাক্রান্ত।

যারা বাড়িতে আসে তাদের কাছেই খবর পাওয়া গেল, হেকমপুরার চারপাশের গাঁগুলোতে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। নির্বিচারে মানুষ খুন হচ্ছে, অগুনতি বাড়িতে আগুন ধরানো হয়েছে।

এই ভয়ঙ্কর সময়ে মানুষ যখন আর মানুষ নেই, হত্যার নেশায় তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে, তখন ছোট্ট একটা সুখবর পাওয়া গেল। এতদিন পুলিশ চোখ বুজে ছিল। কিন্তু এবার তারা নাকি নড়েচড়ে বসেছে। বারহৌলিতে একটা ত্রাণ শিবির অর্থাৎ রিলিফ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। দাঙ্গার মধ্যে যারা প্রাণে বেঁচে গেছে তাদের সেখানে আপাতত আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া পুলিশ কিংবা মিলিটারির একটা বড় দলও নাকি দু-একদিনের ভেতর হেকমপুরায় আসবে। তাদের নাকি খুনখারাপি বন্ধ করার জন্য পাঠানো হচ্ছে।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আর চাপা রইল না। জমিরুদ্দিন আর আসমা যে তাদের বাড়িতে আছে, কিভাবে যেন সেটা হাওয়ায় হাওয়ায় চারিদিকে রটে গেল। কে ওদের দেখে খবরটা চাউর করে দিয়েছে তা অবশ্য জানা যায় নি।

জমিরুদ্দিনরা আসার পাঁচ দিনের মাথায় বিকেলবেলা ঘরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল ধুন্নিলাল, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে শিউনাথ এসে হাজির। ক'দিন জ্বরে ভুগে আজই সে টাঙ্গা নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পায়, একদল লোক লাঠিডাণ্ডা উঁচিয়ে এদিকে

আসছে। ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারে, জমিরুদ্দিন আর আসমার খোঁজে ওরা ধুন্নিলালের বাড়িতে হানা দেবে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ুতে শুরু করে।

শিউনাথ ক'দিনের জ্বরে কমজোর হয়ে গেছে। এতটা রাস্তা ছুটে আসার কারণে ভীষণ হাঁপাচ্ছিল। চাপা, শ্বাসটানা গলায় বলল, 'টৌনে একটা খবর শুনে বহোত ডর লাগছে।'

চায়ের গেলাস নামিয়ে রেখে ধুন্নিলাল জিগ্যেস করে, 'কী খবর রে?'

'তুই কি জমিরুদ্দিন চাচা আর আসমাকে বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিস?'

ধুন্নিলাল চকিত হয়ে ওঠে, 'হাঁ। নইলে ওরা খুন হয়ে যেত।'

'ওদের ভাগিয়ে দে।'

'কী বলছিস শিউ! হত্যারাদের মুখে জমিরচাচাদের ঠেলে দেব! কভ্‌ভি নেহী—'

'লেকেন—'

শিউনাথের কথা শেষ হওয়ার আগেই দূর থেকে শোরগোল ভেসে এল।

ধুন্নিলাল বলল, 'কী হয়েছে? কারা হল্লা করছে?'

আতঙ্কগ্রস্তের মতো শিউনাথ জানায়, রাস্তায় খানিক আগে যে উত্তেজিত, মারমুখী জনতাকে দেখেছিল তারাই ধুন্নিলালের বাড়ির দিকে আসছে।

এক মুহূর্ত হতবুদ্ধির মতো বসে থাকে ধুন্নিলাল। পরক্ষণে তার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায় যেন। মনে মনে সে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জমিরুদ্দিন আর আসমাকে তাদের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আসে। রান্নাঘরে কী করছিল মুনিয়া, তাকেও ডেকে আনে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে কিছু টাকা আর তার সেই বন্দুকটা এনে টিনের চালা থেকে ঘোড়াটাকে বার করে নিয়ে আসে। ঘোড়া আর বন্দুক, তার এই দুই সঙ্গীই এখন পারে জমিরুদ্দিনদের বাঁচাতে।

জমিরুদ্দিন আর আসমা তো বটেই, সেই সঙ্গে মুনিয়াকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ে। মুনিয়াকে সঙ্গে নেবার কারণ, জমিরুদ্দিন আসমা বা তাকে না পেলে হত্যাকারীদের সমস্ত আক্রোশ এসে পড়বে মেয়েটার ওপর। তাকেও তো বাঁচানো চাই। আপাতত তারা যাবে বারহৌলির ত্রাণ শিবিরে। সেখানে জমিরুদ্দিন এবং আসমাকে পৌঁছে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবে, পরে ঠিক করা যাবে।

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে ছিল শিউনাথ। জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস ধুন্নি?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধুন্নিলাল বলে, 'যদ্দিন না ফিরছি, আমার বাড়ি তোর জিম্মায় রইল শিউ।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, হেকমপুরার বড় সড়কের ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে ধুন্নিলালের ঘোড়া। উলটো দিক থেকে সশস্ত্র জনতা উত্তেজিত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছিল। তারা চিৎকার করে বলে, 'রুখ যা ধুন্নি—রুখ যা—'

বন্দুক উঁচিয়ে গলার শির ছিঁড়ে ধুন্নিলাল চেঁচায়, 'হোঁশিয়ার, গোলি মারকে সিনা ফোঁড় দুঙ্গা—'

সন্ত্রস্ত দাঙ্গাবাজ জনতা পথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার দু ধারে সরে যায়। ধুন্নিলালের ঘোড়া একই গতিতে ছুটতে থাকে। একসময় অশ্বক্ষুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়।

দুর্বোধ্য

মাধুরী যখন তাদের মাল্টি-স্টোরিড বাড়ির চারতলার ফ্ল্যাটটায় ফিরে এল, দশটা বাজতে বেশি দেরি নেই।

ডোর-বেল টিপতেই কাজের লোক নগেন দরজা খুলে দিয়েছিল। বারোশো স্কোয়ার ফিটের এই ফ্ল্যাটটায় ঢুকলেই বিরাট ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম। তার ওধারে পর পর তিনটে শোওয়ার ঘর, কিচেন, স্টোর ইত্যাদি। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ এসে দু-চারদিন থাকলে তাদের জন্য একটা মাঝারি মাপের গেস্ট রুমও আছে এক কোণে।

ড্রইং রুমে পা দিয়েই চমকে উঠল মাধুরী। সুরজিৎ ডিভানে কাত হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। ভঙ্গিটা আলস্য-মাখানো, যেন কোথাও যাওয়ার তাড়া বা ব্যস্ততা নেই। অথচ আজ ছুটির দিন নয়।

অন্যদিন ন'টা বাজতে না-বাজতেই স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে তাদের নিজস্ব মেরুন রঙের নতুন মারুতি-ওমনিটা ড্রাইভ করে অফিসে চলে যায় সুরজিৎ। সে একটা নাম-করা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। বয়স বাহান্ন তিপ্পান্ন, মাঝারি হাইট, বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। চোখে পুরু লেন্সের বাই-ফোকাল চশমা। পরনে ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি।

মাধুরীর বয়স আটচল্লিশ। পাতলা, মেদহীন শরীর। গায়ের রং একটু চাপা হলেও সৌন্দর্যের শেষ রশ্মিগুলো এখনও পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায় নি।

কাল সমস্ত রাত ঘুমোতে পারে নি মাধুরী। চোখ জ্বালা জ্বালা করেছে। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে। কপালের দু'পাশের রগদু'টো সমানে লাফাচ্ছে। সে ঠিক করে রেখেছিল, বাড়ি ফিরে স্নান চুকিয়ে শুয়ে পড়বে। একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমের একান্ত প্রয়োজন তার। কিন্তু কে জানত, সুরজিৎ আজ অফিসে যাবে না। তাকে দেখতে দেখতে শারীরিক কষ্ট বা অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারগুলো আর মনে রইল না মাধুরীর। অদ্ভুত এক দুশ্চিন্তা, নাকি প্রবল ভয় তার স্নায়ুমণ্ডলীর ভেতর দ্রুত চারিয়ে যেতে লাগল।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে কয়েক পলক মাধুরীর দিকে তাকিয়ে থাকে সুরজিৎ। তারপর বলে, 'তোমাকে কিরকম যেন দেখাচ্ছে! শরীর খারাপ নাকি?'

'না, আমি ঠিকই আছি।' কোনোরকমে উত্তরটা দিয়ে রুদ্ধস্বরে মাধুরী জিগ্যেস করল, 'তুমি আজ অফিসে গেলে না?'

'না। প্রচুর ছুটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, একটা দিন না হয় না-ই গেলাম। কী, ঠিক করি নি?' সুরজিৎ একদৃষ্টে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে রইল।

আবছা গলায় কিছু একটা বলল মাধুরী, বোঝা গেল না।

সুরজিৎ এবার বলল, 'মনে হচ্ছে, সারা রাত তোমার ঘুম হয় নি। সোজা বাথরুমে চলে যাও। স্নান করে এক কাপ কড়া চা খাও, শরীর ঝরঝরে লাগবে।'

মাধুরী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। যান্ত্রিকভাবে মাথাটা হেলিয়ে দিল শুধু।

সুরজিৎ বলল, 'তোমার মা এখন কেমন আছেন?'

অনিবার্যভাবেই যে এই প্রশ্নটা উঠবে, মাধুরী তা জানত। মা খুব অসুস্থ, এইরকম একটা অজুহাত তৈরি করে কাল ভবানীপুরে মেজদার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল সে। মা ওখানেই থাকেন।

ভবানীপুরে অবশ্য ঘণ্টাখানেকের বেশি থাকে নি মাধুরী। ওখান থেকে সোজা চলে গেছে লেক টাউনে। রাতটা সেখানে কাটিয়ে বাড়ি এসেছে।

মাধুরী বলল, 'অনেকটা ভালো।' বলেই মুখ নিচু করে, এলোমেলো পা ফেলে, নিঃশব্দে নিজেদের শোওয়ার ঘরে গিয়ে অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

লেক টাউনে কোনোরকমে চোখমুখে জল ছিটিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মাধুরী। দাঁত ব্রাশ করা হয় নি। এখন বেসিনের সামনে বিরাট আয়নায় নিজের রাত-জাগা, বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগাতে গিয়ে থমকে গেল সে। আয়নার প্রতিচ্ছবিটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল যেন। মাধুরী অনুভব করল অদৃশ্য কোনো টাইম মেশিন তাকে অতীতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাল সকালে মায়ের অসুস্থতার যে কারণটা খাড়া করে মাধুরী ভবানীপুরে গিয়েছিল সেটা খুব জোরালো নয়। এমনিতেই কিছুদিন ধরে মায়ের শ্বাসকষ্ট চলছে। কখনও বাড়ে, কখনও একটু কমে। কাল কিছুটা বেড়েছিল, তবে সেটা এমন বাড়াবাড়ি কিছু নয় যে তক্ষুনি ছুটতে হবে। আসলে মা নয়, বিনির জন্য তাকে কাল যেতে হয়েছে। রাতে লেক টাউন থেকে ফেরাও সম্ভব হয় নি। কিন্তু বিনি বা লেক টাউনের কথা সুরজিৎকে বললে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটা বুঝতে পারছিল না বলেই মায়ের শ্বাসকষ্টের অছিলাটা খাড়া করতে হয়েছে। কিন্তু বিনিকে সরিয়ে যার মুখটা এই মুহূর্তে চোখের সামনে কোনো অদৃশ্য টিভির পর্দায় ফুটে উঠছে সে নিরুপম। ভালোবেসেই একদিন তাকে বিয়ে করেছিল মাধুরী। সুপুরুষ, শিক্ষিত এবং অভিজাত বংশের ছেলে নিরুপমের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার মনে হয়েছিল ওর সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাতে না পারলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

বিয়ের পর রঙিন স্বপ্নটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বছর তিনেকের মধ্যেই সব আচ্ছন্নতা কেটে গিয়েছিল।

মাধুরীর জন্ম বনেদি বংশে হয় নি। নিরুপমদের মতো অর্থবানও তারা নয়। উচ্চ মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় ওরা তা-ই। তবে পরিবারের সবাই খুব শিক্ষিত।

দু'জনের সম্পর্কটা যে ক্রমশ তিক্ত হতে শুরু করেছিল তার কারণ আভিজাত্য নয়। বনেদিয়ানা নিয়ে আজকাল কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। তফাতটা ছিল রুচির, এবং জীবনযাপন সম্বন্ধে ধ্যানধারণার।

নিরুপম ড্রিংক করত। মদ্যপানটা ইদানীং জলভাতের মতো ব্যাপার। যদিও মাধুরী বিশেষ পছন্দ করত না, তবে মেনে নিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে নিরুপম লম্পট ছিল না। নারীঘটিত কোনো স্ক্যান্ডালে তাকে কখনও জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় নি। তবে তার চরিত্রের যে দিকটা মাধুরীকে সবচেয়ে কষ্ট দিয়েছে বা ক্রুদ্ধ করে তুলেছে সেটা এইরকম।

নিরুপম চাকরি টাকরি করত না। ওর ছিল খুব বড় আকারের বিজনেস। রেলওয়ে থেকে শুরু করে নানা সরকারি ডিপার্টমেন্ট, ফাইভ-স্টার হোটেল থেকে বিরাট বিরাট প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে লক্ষ লক্ষ টাকার মেটিরিয়াল সাপ্লাই করত। আর এই সাপ্লাইয়ের অর্ডার বার করার জন্য যতদূর নিচে নামা সম্ভব, নামত। মোটা টাকার ঘুষ, বড় বড় হোটেলে রাতভর পার্টি, এসব তো সামান্য ব্যাপার। এমনকি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আনন্দদানের জন্য হোটেলের কামরা 'বুক' করে মেয়েদের পাঠিয়ে দিত। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল টাকা আর টাকা। অর্থের ব্যাপারটা তার মাথায় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ভর করে ছিল। সেটাই তাকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে সততা এবং নৈতিকতা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা মাপকাঠি থাকে। নিরুপমের সঙ্গে বিয়ের পরও সেটাকে কোনোভাবেই বিসর্জন দিতে পারে নি মাধুরী। ওটা

উত্তরাধিকার সূত্রেই তার পাওয়া। টাকা, বিদেশি পারফিউম, কালার টিভি, ফ্রিজ, মিউজিক সিস্টেম—এসব তো কাজ বাগানোর জন্য আকছার দিতে হয়। কিন্তু তাই বলে মেয়েমানুষ ঘুষ? এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না মাধুরী। এই নিয়ে শুরু হয়েছিল অশান্তি, তিক্ততা। একদা যে নিরুপমকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে মনে হয়েছিল, এখন থেকে চিন্তা শুরু হল এরকম একটা নোংরা, জঘন্য লোকের সঙ্গে বাকি দিনগুলো কাটাবে কী করে?

চোখকান বুজে থাকলে কোনোরকম সমস্যাই হত না। কিন্তু মাধুরীর মধ্যে ছিল এক ধরনের একগুঁয়েমি, নাকি শুচিবাই? সে কিছুতেই নিরুপমকে সহ্য করতে পারছিল না। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হল না। বিয়ের চার বছরের মাথায় ডিভোর্স নিয়ে ভবানীপুরে বাপের বাড়ি ফিরে এল সে।

বাবা তখনও জীবিত। তা ছাড়া তিন দাদা আছেন। তাঁরা অবশ্য প্রথম দিকে মাধুরীকে মিটমাট করে নেবার জন্য অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু কারুর কথা শোনে নি সে। পরে বিবাহ বিচ্ছেদটা যখন অনিবার্য হয়ে উঠল তখন আর কেউ বাধা দেন নি।

মাত্র কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনটাকে নিশ্চিহ্ন করেই দিতে চেয়েছিল মাধুরী কিন্তু সেটা পারা যায় নি। বিয়ের পরের বছরই তার মেয়ে বিনির জন্ম। কিন্তু বিনিকে পায় নি সে। কোর্টের রায়ে সে নিরুপমের কাছে থেকে গিয়েছিল। তবে যখনই ইচ্ছা হবে, মাধুরী লেক টাউনে নিরুপমদের বাড়ি গিয়ে মেয়েকে দেখে আসতে পারবে। সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবনের ওই একটাই পিছুটান থেকে গিয়েছিল।

বাপের বাড়ি ফিরে আসার বছর দেড়েক পর বাবা মারা গেলেন। দাদারা ভবানীপুরের পুরনো বাড়ি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিয়ে হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা করে ফ্ল্যাট পেলেন। মা পেলেন নগদ দু লাখ টাকা। পিতৃসম্পত্তিতে মেয়েদের আইনসম্মত অধিকার আছে। তাই মাধুরীও বেশ কিছু টাকা পেয়ে গেল।

মাধুরীর প্রতি দাদা বউদিদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। কেউ কখনও তার অনাদর করে নি। কিন্তু সময় কাটানোই হয়ে উঠেছিল বড় রকমের সমস্যা। দিনগুলো তখন মাধুরীর কাছে বড় বেশি দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর। একঘেয়েমি কাটানোর জন্য একটা চাকরি নিয়েছিল সে।

বড়দা আর ছোটদার বদলির চাকরি। নিজের নিজের ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে তাঁদের একজন চলে গেলেন দিল্লিতে, একজন বাঙ্গালোরে। মাধুরী মেজদার কাছে থেকে গেল। মা বছরে দু'মাস করে দিল্লি আর বাঙ্গালোরে দুই ছেলের কাছে থেকে আসেন; বাকি সময়টা ভবানীপুরে।

এদিকে চাকরি বাকরি করলেও জীবনটা কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল মাধুরীর। যেন সামনে কোনো লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। একটা দিন হুবহু আরেকটা দিনের ফোটো কপি। এইভাবেই যখন সময় কাটছিল সেই সময় হঠাৎ দূর সম্পর্কের এক মাসিমা একটা সম্বন্ধ নিয়ে এলো। ছেলেটি অর্থাৎ সুরজিৎ তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়—সচ্চরিত্র, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, কোনোরকম বদ খেয়াল নেই। তবে সামান্য একটা খুঁত আছে। সুরজিতেরও আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রী বাঁচে নি, বিয়ের আড়াই বছরের মধ্যে মারা যায়। ছেলেমেয়ে নেই। মাধুরী ডিভোর্সি না হলে এমন একটা সম্বন্ধ আনতে সাহস করতেন না মাসিমা।

সব শোনার পর মনে হয়েছিল ছেলেটা বেশ ভালোই। মেজদা, মেজ বউদি এবং মা বুঝিয়েছিলেন, অযাচিতভাবে এমন একটা সম্বন্ধ যখন এসেছে তখন না বলা উচিত হবে না। বড়দা এবং ছোটদাকে চিঠি লিখলে তাঁরাও জানিয়েছিলেন, মাধুরী যেন এ বিয়েতে রাজি হয়।

মাসিমাই একদিন সুরজিৎকে সঙ্গে করে ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিলেন। তার সঙ্গে আলাপ করে বাড়ির আর সবার মতো মাধুরীরও ভালো লেগেছিল।

সেই যে সুরজিৎ এসেছিল, তার তিন মাসের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যায়। তারপর বাইশ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময় কাছাকাছি থেকে সুরজিৎকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে মাধুরীর। মানুষটার একটা দিক খুব খোলামেলা। কখনও কখনও মনে হয় সে খুবই হৃদয়বান, সহানুভূতিশীল এবং সত্যিকারের প্রেমিক। কিন্তু তার আরেকটা দিক দুর্বোধ্য। সেখানে সে খুব চাপা, উদাসীন, হয়তো কিছুটা শীতল। সব মিলিয়ে যেমনই হোক, মাধুরীকে কখনও অসম্মান করে নি সে। তার আচরণে এতটুকু ত্রুটি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ড্রিংক করে না, পার্টিতে যাওয়ার অভ্যাস নেই। অফিসের কাজে বাইরে না গেলে ঠিক ছ'টার ভেতর বাড়ি ফিরে আসে।

বিয়ের পরই সুরজিতের জন্য চাকরিতে রেজিগনেশন দিতে হয়েছিল মাধুরীকে। তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু খুব ঠাণ্ডা গলায় সুরজিৎ বলেছিল, 'চাকরির প্রয়োজন নেই তোমার। আমি যা স্যালারি আর পার্কস পাই তাতে আমাদের মতো পাঁচটা ফ্যামিলির রাজার হালে চলে যাবে।'

সুরজেতের শান্ত কণ্ঠস্বরে এমন এক দৃঢ়তা ছিল যে আপত্তি করতে সাহস হয় নি মাধুরীর। তার মনে হয়েছে সুরজিৎ কি প্রাচীনপন্থী? স্ত্রী চাকরি করুক, এটা কি সে চায় না? পরে কখনও কখনও ভেবে দেখেছে, হয়তো প্রচণ্ড অধিকার বোধ থেকেই এটা করে থাকবে সে। বুঝিবা সুরজিৎ বোঝাতে চেয়েছে, মাধুরীর সম্বন্ধে সে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই শেষ কথা। এই নিয়ে মাধুরী আপত্তি করতে পারত কিন্তু করে নি। একটা সম্পর্ক তার নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টা শেষ হয়ে যাক, তা সে চায় নি।

একটা ব্যাপার মাধুরী লক্ষ করেছে, নিজের মৃত প্রাক্তন স্ত্রী বা তাকে নিয়ে স্বল্পকালের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কোনো দিন নিজের থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি সুরজিৎ। একদিন কৌতূহলের বশে মাধুরী জানতে চাইলে সে বলেছিল, 'আমি পেছন দিকে তাকাতে পছন্দ করি না। যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কী লাভ?'

শুধু নিজের ব্যাপারেই না; নিরুপম, বিনি এবং মাধুরীর আগেকার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে মাসিমার কাছে সবই শুনেছিল সুরজিৎ কিন্তু বিয়ের পর এ বিষয়ে কখনও আগ্রহ দেখায় নি। অতীত অতীতের মধ্যে বিলীন হয়ে থাক, এটাই হয়তো সে চায়।

সুরজিতের সঙ্গে বিয়ের আগে মাঝে মাঝে লেকটাউনে গিয়ে বিনিকে দেখে আসত মাধুরী। কিন্তু বিয়ের পর যেতে সাহস হত না। সুরজিৎ বেরিয়ে গেলে ফোন করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলত। এইভাবেই এতগুলো বছর বিনির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছে সে। কাল সেই বিনির বিয়ে হয়েছে। নিরুপম ফোনে হাতজোড় করে বলেছিল, 'তোমাকে আসতেই হবে।'

বিনিও বার বার বলেছে, 'তুমি না এলে হবে না মা।'

মেয়েটা চিরকালের মতো পরের ঘরে চলে যাবে। লেক টাউনে না গিয়ে পারে নি মাধুরী। কিন্তু সুরজিৎকে তা জানাতে ভরসা হয় নি। মায়ের অসুস্থতার নাম করে চাতুরিটুকু করতে হয়েছিল তাকে।

বিনির বিয়ের লগ্ন ছিল মাঝরাতে। সন্ধের দিকে থাকলে কাল রাতেই ফিরে আসতে পারত মাধুরী। বিয়ে শেষ হতে হতেই ভোর হয়ে গেল। কাল তাই আর ফেরা সম্ভব ছিল না।.....

স্নান সেরে, পোশাক পালটে, চুল টুল আঁচড়ে ড্রইং রুমে চলে এল মাধুরী। এখন নিজেকে অনেকখানি তাজা মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেতরকার সংশয় এবং ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। সে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ অফিসে না গিয়ে সুরজিৎ বাড়িতে থেকে গেল কেন?

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায় সুরজিৎ। বলে, 'এস। বোসো এখানে।' কিচেনে কাজের মেয়ে মমতা রান্না করছিল, তাকে বলল, 'দু কাপ কড়া চা করে দাও দিদি।'

একটু পরে চা খেতে খেতে সুরজিৎ জিগ্যেস করে, 'বিনির বিয়ে ভালোভাবে মিটেছে তো?'

হতচকিত মাধুরী শুধু বলতে পারে, 'তুমি—তুমি—'

সুরজিৎ এবার যা বলে তা এইরকম। কাল অফিস থেকে ভবানীপুরে ফোন করে মায়ের খবর নিতে গিয়ে সে জানতে পারে, মাধুরী ওখানে নেই, জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই। কোথায় মাধুরী যেতে পারে, বার বার জিগ্যেস করলে সরল, ভালোমানুষ মা বিনির ব্যাপারটা বলে দেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মাধুরী।

সুরজিৎ বলল, 'তুমি ফিরে আসবে সে জন্যে আজ ছুটি নিয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম।'

মাধুরী উত্তর দিল না।

সুরজিৎ এবার বলে, 'মেয়ের বিয়েতে যাবে, আমাকে বললেই তো পারতে। মায়ের নাম করে একটা অজুহাত খাড়া করার দরকার ছিল না।'

সুরজিৎ কি ক্ষিপ্ত হয়ে আছে? মুখ তুলে যে তার দিকে তাকাবে, তেমন শক্তিটুকুও যেন আর অবশিষ্ট নেই মাধুরীর মধ্যে। শিথিল গলায় বলে, 'তুমিই তো একদিন বলেছিলে অতীত নিয়ে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুরজিৎ বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাই বলে মেয়ের বিয়েতে যেতে দেব না, এমন অমানুষ, নিষ্ঠুর আমাকে ভাবলে কী করে?'

ধীরে ধীরে এবার চোখ তুলে তাকায় মাধুরী। অতীত বলতে সে কি শুধু নিরুপমকেই বুঝিয়েছিল?

সুরজিৎ বলে, 'বিনি আর জামাইকে একদিন আমাদের এখানে খেতে বোলো, কেমন?'

বাইশ বছর একসঙ্গে কাটানোর পরও মানুষটাকে আশ্চর্য রকমের দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে মাধুরীর। তবু সুরজিতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় তার। ঝাপসা গলায় বলে, 'বলব।'

ফিরে এলাম

শ্রাবণ মাস। সেই ভোর থেকেই কালো কালো মেঘগুলি ভাসমান আদিম জন্তুর মতো আকাশময় হানা দিয়ে ফিরছিল। তুমুল ঝড়ো বাতাস, বিদ্যুতের হানাহানি—আয়োজনের কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তখনই বোঝা গিয়েছিল, বর্ষার এই দিনটা বড় বেশি আত্ম-সচেতন, বড় বেশি প্রমত্ত। তার রীতিনীতি মতিগতি, সবই দুরন্ত দুঃসহ ঢলের দিকে।

সব জেনেও, সব বুঝেও সেই ভোরে সুলতাকে নিয়ে শ্যামবাজারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। না-বেরিয়ে আমার সামনে বা পেছনে দ্বিতীয় পথ ছিল না।

শ্যামবাজার থেকে প্রথমে আমরা এসেছিলাম হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে বর্ধমান। বর্ধমান থেকে যখন পয়ারগঞ্জের শেষ বাসটা ধরেছিলাম তখন দুপুর আর নেই। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দিনটা বিকেলের মুখোমুখি এসে থমকে ছিল যেন।

সেই বাসেই এখনও চলেছি। বর্ধমানের শহরতলি পেরিয়ে কিছুক্ষণ দক্ষিণে ছুটে গাড়িটা একসময় পশ্চিমগামী হয়েছে। দিনটাও বিকেলের আগের সেই মুহূর্তে থেমে নেই। বিকেল

এবং সন্ধে ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে রাত্রিটাকে ত্বরান্বিত করতে ছুটছে। আর সমস্ত দিন ধরে আবহাওয়াটা যার জন্য তৈরি হচ্ছিল , সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে তা-ও শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে ঝির ঝির করে, থেমে থেমে, ফোঁটায় ফোঁটায়। পরে অবিশ্রান্ত প্রবল ধারায়।

বৃষ্টিটা সমানে চলছে। বাস যত এগোচ্ছে, মত্ততা ততই বাড়ছে। আকাশ-জোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় গুরু গুরু ঘা পড়ছে। পৃথিবীর আত্মাকে বিদীর্ণ করে বাজ পড়ে, বিদ্যুৎ ঝলকে যায়। আর এদের সঙ্গে উদ্দাম বাতাসের একটা চুক্তি হয়ে গেছে যেন। পশ্চিম বাংলার এই প্রান্তটাকে রসাতলে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের স্বস্তি নেই।

বৃষ্টি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাসের জানালাগুলো ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ সেগুলো খোলা ছিল, নিরাসক্ত শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। সুলতা আমার বিপরীত প্রান্তের 'লেডিজ সিটে' বসে আছে। তার চোখ দু'টিও ছিল আমার মতোই বাইরের দিকে ফেরানো।

বাইরে কোনো বিস্ময়ই ছিল না। শুধু যোজন যোজন রুক্ষ রক্তাভ মাঠ আর মাঝে মাঝে দিগন্তের ওপার থেকে অস্বাভাবিক লম্বা তালের গাছগুলি ইতস্তত মাথা তুলে রয়েছে। সুলতা এবং আমি এতক্ষণ এই শোভা দেখেই কাটিয়ে দিয়েছি। অথচ ভুল করেও পরস্পরের দিকে তাকাই নি। শুধু কি পয়ারগঞ্জের এই বাসে, শ্যামবাজার থেকেই আমরা কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছি না। এমনকি একটা কথাও হয় নি আমাদের মধ্যে।

জানালাগুলি বন্ধ হতে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই দৃষ্টিটাকে ভেতরে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। বাইরের মতোই বাসের ভেতরটা বিস্ময়বর্জিত।

যাত্রী প্রায় নেই বললেই চলে। দশ-বারোটি লোক এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে বসে ছিল। নেহাতই চাষী শ্রেণীর গেঁয়ো মানুষ। পরনে চিটচিটে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। কারো কারো আবার ফতুয়ার বদলে খেলো ছিটের জামা। খালি পা একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ধুলোয় ধূসর। চোখের দৃষ্টি কৌতূহলশূন্য, সরল। অর্থাৎ আকর্ষণ করার মতো কিছুই নেই তাদের।

অবশ্য একটি ব্যতিক্রম ছিল। আমার ঠিক ডান পাশে যে লোকটি বসে রয়েছে পুরোপুরি নাগরিক পালিশ না থাকলেও সর্বাঙ্গে অমার্জিত গ্রাম্য ভাবটা নেই। গ্রাম এবং শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় তার চেহারা রুচি এবং পোশাক থমকানো।

বয়সটা প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত ছুঁয়েছে। পর্যাপ্ত তেল ঢেলে মাথার কাঁচা-পাকা দুর্বিনীত চুলগুলিকে বশে আনার চেষ্টাটি চোখে পড়ল। মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি কেটে দু-পাশে ঢেউ খেলানোর ব্যর্থ প্রয়াসটিও দৃষ্টি এড়াল না। মুখে দিন তিনেকের জমানো দাড়ি গোঁফ। একখানা ফর্সা ধুতি আর গলাবন্ধ ফুলশার্ট পরনে। পায়ে কাঁচা চামড়ার চটি। আর তাতেই এই খালি-পায়ের দেশে সে রীতিমতো বিশিষ্ট এবং মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

এই আধা-গ্রাম্য আধা-শহুরে লোকটার দিকে তাকিয়ে কৌতুকই বোধ করলাম। কিন্তু কতক্ষণ আর! আমার মতো শহরের পোকাকে এই বেশে এই রুচিতে অনন্তকাল তো আর আটকে রাখা যায় না।

অতএব ঘুরতে ঘুরতে নিজের অজ্ঞাতসারে দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল আমার সঙ্গিনীর ওপর।

সঙ্গিনী! শব্দটা কানে আসতেই বুকের কোনো এক অজ্ঞাত স্তরে চমক লাগল যেন। কিন্তু চমক লাগলেই বা কী করা যাবে! সঙ্গিনী ছাড়া সুলতাকে আজ কী-ই বা ভাবতে পারি! এর চেয়ে যোগ্যতর শব্দ অন্তত আমার জানা নেই। অথচ এখনও সে আমার সমাজ-সম্মত স্ত্রী, আইনের দৃষ্টিতে বন্ধনটা ছিন্ন হয় নি।

জানালা বন্ধ হতে সুলতাও তার চোখ দু'টি বাসের ভেতর ফিরিয়ে এনেছিল। এখন সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। মফঃস্বলের বাসে যেমন থাকে, যথেচ্ছ ভুল বানানে কিছু কিছু সারগর্ভ নীতিকথা এখানে ওখানে লেখা রয়েছে। তারই একটার দিকে সুলতার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাকিয়েই রয়েছে সে। চোখে কিন্তু কোনো ভাবের খেলাই খেলছে না।

আমার সিট থেকে সুলতার মুখ নির্ভুল দেখতে পাচ্ছি। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। মাথার ঘোমটা খসে গেছে। বিশাল খোঁপাটা, দু'টি পাতলা ঠোঁট, প্রতিমার মতো দীর্ঘ চোখ, ভ্রু-যুগল, ফর্সা রক্তাভ মুখ এবং গালের সেই কালো তিলটি পর্যন্ত আমার দৃষ্টি সর্বত্র বিচরণ করছে। এই মুখটার দিকে তাকিয়ে আগে কত বার আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রাণের অতল থেকে কোনো উচ্ছ্বাসই উথলে উঠছে না। বরং অসহ্য এক অনুভূতি আর তিক্ত বিতৃষ্ণায় সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। সুলতা যেখানে বসে ছিল, তার পাশে খানিকটা জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। স্বামিত্বের স্বাভাবিক অধিকারে অনায়াসেই সেখানে বসতে পারতাম। বসাই উচিত ছিল। কিন্তু পারিনি। সুলতা আর আমার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ একটা দেওয়াল রয়েছে। সেটা পার হওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। বাসের সংক্ষিপ্ত পরিসরে, প্রায় নাগালের মধ্যেই সে বসে আছে, হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যায়, তবু মনে হচ্ছে, জীবনের দুই প্রান্তে, দুই বিপরীত মেরুতে আমরা রয়েছি। মাঝখানের অসহনীয় দূরত্বটা কিছুতেই অতিক্রম করা সম্ভব হবে না।

অথচ আমাদের বিয়েটা ছিল নিতান্তই ভালোবাসার। আমরা ব্রাহ্মণ, সুলতারা কায়স্থ। সবর্ণ না হলেও সুলতার বা আমার—কারো বাড়ি থেকেই বাধা আসে নি। দ্বিধামুক্ত প্রসন্ন মনেই অভিভাবকরা আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন।

সবই ছিল আমাদের সপক্ষে। তবু এই ভালোবাসার বিয়েটাকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা অসাধ্য হয়ে পড়ল।

বিয়ের আগে আমাকে ঘিরে সুলতার এবং সুলতাকে ঘিরে আমার প্রাণে যা ছিল তা হল আচ্ছন্নতা আর দুরন্ত উচ্ছ্বাসের সব-ভাসনো একটা ঢল।

সুলতা আর আমি একই বছরে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হয়েছিলাম। একই বছরে এম. এ পাস করেছি। সাবজেক্ট ছিল দু'জনেরই অভিন্ন—ইকনমিকস। ছাত্রী হিসেবে সুলতা খুবই ভালো। প্রায় অসাধারণের পর্যায়ে পড়ে। এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। ছাত্র হিসেবে আমার কিন্তু কোনো দীপ্তি ছিল না। আমি ছিলাম নিতান্তই গড্ডলিকা প্রবাহের। তবে আকর্ষণ করার মতো আমারও কোনো কোনো দিক ছিল। আমি সুদর্শন, সুপুরুষ। তার ওপর ভালো স্পোর্টসম্যান। পরস্পরকে দেখে আমরা মুগ্ধ বিস্মিত এবং চমৎকৃত হয়েছিলাম। এবং এম.এ পাস করার চার বছর পর আমাদের বিয়েও হল।

আশ্চর্য, বিয়ের আগের সেই বিস্ময়বোধ, মুগ্ধতাবোধ বিয়ের পর মাত্র একটা বছর অটুট ছিল। দ্বিতীয় বছরে এসেই সব কিছু থমকে গিয়েছিল যেন।

দু'টো মহাযুদ্ধ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে আমাদের পরিবারটা এখনও যৌথই রয়েছে। তিন কাকা, কাকিমারা, দুই জেঠা, জেঠাইমারা, বাবা-মা আর খুড়তুতো ভাইবোনদের নিয়ে আমাদের বিরাট মিলিত সংসার।

বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই সুলতা বলল, 'নতুন বাড়ি ভাড়া কর। তোমাদের এ-বাড়িতে এত লোকের হট্টগোলের মধ্যে আমার ভালো লাগে না।'

সুলতার স্বভাব আমার অজানা নয়। সে নির্জনতাপ্রিয়। একান্ত নিভৃতে বসে চুপচাপ পড়াশোনা করতে ভালোবাসে। তার কথাগুলো আমাদের যৌথ সংসারে বিচিত্রই বটে। অনভ্যস্ত কানে কেমন যেন বেসুরো ঠেকল। প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। উত্তর দিতে পারিনি।

কিন্তু উত্তর না দিয়ে পালাব কোথায়? বাড়ি বাড়ি করে আমার প্রাণান্ত করে ফেলল সুলতা। অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বললাম, 'একটা বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে কী পাগলামি শুরু করলে! এ কথা বাবা-কাকাদের কানে গেলে কী ভাববেন বল তো?'

'বাবা কাকাদের খুব ভয় তোমার? বেশ, আমিই তাঁদের বলছি।'

আশ্চর্য! সুলতা যা বলল তা-ই করল। সব শুনে বাবা, তিন কাকা এবং জেঠামশাইরা প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। এ ছিল তাঁদের পক্ষে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত।

বিমূঢ়তা কাটলে বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী বড় জেঠামশায় বলেছিলেন, 'তোমার যখন এখানে থাকার ইচ্ছে নয় তখন আলাদা ব্যবস্থাই কর।'

আলাদা ব্যবস্থাই হল। আজন্মের অভ্যস্ত পরিবেশ আর পরিচিত মানুষগুলোকে ছেড়ে শোভাবাজারে আড়াই কামরার ফ্ল্যাটে এক সপ্তাহের মধ্যে চলে গেলাম। ঈশান কোণে তখনই মেঘ জমেছিল। কে জানত সেই মেঘে এমন একটা প্রলয় লুকিয়ে আছে।

শোভাবাজারে এসে সুলতা-চরিত্রের নতুন নতুন দিকের দরজাগুলি একে একে খুলে যেতে লাগল।

আমার স্বভাবটা আশৈশব বহির্মুখী। এক মুহূর্ত যে স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকব, এ আমার পক্ষে অকল্পনীয়। খেলাধুলো নিয়েই এতকাল থেকেছি। আর সুযোগ পেলেই কলকাতার ছক-বাঁধা নাগরিক জীবন থেকে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছি। লম্বা ছুটিতে কাশী-দ্বারকা-গোয়া, আর্যাবর্ত কি দাক্ষিণাত্যে পাড়ি জমিয়েছি। আর সপ্তাহান্তে রবিবারের যে ছুটিটা মেলে, সেটাকেও এমনি এমনি ছেড়ে দিতাম না। শহরতলির বাস ধরে বাধাবন্ধনহীন প্রকৃতির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতাম। আর অন্য সব দিন অফিস ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতাম।

শোভাবাজারে এসে সুলতা বলল, 'এসব চলবে না। তোমার অফিস থেকে শোভাবাজার আসতে আধ ঘন্টা। আরো আধ ঘন্টা বেশি দিলাম। পাঁচটায় তোমার ছুটি। ছ'টার মধ্যে চলে আসবে।'

প্রথম প্রথম ভাবতাম সে একা একা থাকে। মুখ বুজে সারাদিন কাটানো সত্যিই কষ্টকর। কাজেই সুলতার নিঃসঙ্গতা দূর করতে বন্ধুবান্ধব আড্ডা-ভ্রমণ সবই ছাড়লাম।

বন্ধুরা পরিহাসের ছলে বলত, 'বিয়ে করে স্ত্রৈণ হয়ে গেলে হে। একেবারে স্ত্রী-শাসিত স্ত্রী-পালিত ভীরু প্রাণী। হেনপেকড।'

তাদের রসিকতা উপেক্ষাই করতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে একটার পর একটা শক্ত বেড়ি কখন যে সুলতা পরিয়ে দিয়েছিল, বুঝতে পারিনি। পায়ে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকে চোখ ফিরল। দেখলাম প্রতি মাসের শেষে মাইনের সম্পূর্ণ টাকাটাই সুলতার হাতে তুলে দিচ্ছি। সিগারেট খাওয়া, ট্রামভাড়া, দাড়ি কামানোর ব্লেড—এমনি টুকিটাকি দৈনন্দিন হাত-খরচের জন্য তার কাছে হাত পাততে হয়। শখ বলতে আমার ছিল মাঝে মাঝে সিনেমা দেখা। সিনেমা সুলতার অসহ্য। অতএব আমাকে তা বর্জন করতে হয়েছে। মাংসে তার রুচি নেই। সুতরাং আমাকেও সে ব্যাপারে নিস্পৃহ হতে হয়েছে।

অর্থাৎ আমার স্বাধীনতা অস্তিত্ব রুচি আহার-বিহার—সমস্ত কিছুই আমার অজান্তে একে একে গ্রাস করে ফেলেছে সুলতা। আমার চলাফেরা ওঠাবসা—সবই তার নির্দেশে, তার ইচ্ছেয়।

অফিসের সময়টুকু ছাড়া সমস্ত দিনই আমাকে বাড়িতে আটকে রাখে সুলতা। কপোত-কপোতীর মতো সর্বক্ষণ যে আমরা বকম বকম করি তা নয়, বরং বিপরীত ব্যাপারটাই ঘটে। সুলতা এমনিতেই স্বল্পভাষিণী। তার ওপর কী একটা রিসার্চ ওয়ার্ক নিয়ে মেতেছে। আমার সঙ্গে কথা বলার অবকাশটুকু পর্যন্ত তার নেই। কাজের জন্য লোক রেখে দিয়েছি। তাদের কেউ রাঁধে, কেউ বাজারে যায়, ঘর পরিষ্কার করে। অফিস যাবার সময় ঠাকুর-চাকরদের হাতে খেয়েই যেতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্রীটি তার গবেষণায় এতই মত্ত যে সে-সময়টা পর্যন্ত কাছে এসে বসে না। ওদিকে সারাদিন বাড়িতে বসে থাকা আমার মতো বহির্মুখী একটি মানুষের পক্ষে অসহ্য ব্যাপার। খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো তাই অবিরত ছটফট করি আর ভাবি আমার দুরন্ত উড়ু উড়ু স্বভাব দেখে যদি মুগ্ধই হয়েছিল সুলতা, তবে এমন করে ঘরে আটকাল কেন?

নিজের সম্বন্ধে সচেতন হতেই চমকে উঠলাম। এ আমি কোথায় এসে ঠেকেছি! একেবারে বশংবদ ক্রীতদাস হয়ে গেছি যে! এটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে একে একে পায়ের বেড়িগুলো ভাঙতে শুরু করলাম।

প্রথমে শুরু হল অফিস থেকে বাড়ি ফেরা দিয়ে। ছুটি হলেই আগে উর্ধ্বশ্বাসে শোভাবাজারের ট্রামে উঠতাম। একদিন আর উঠলাম না। তার বদলে বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ের আগের মতো চুটিয়ে আড্ডা দিলাম। বাড়ি যখন ফিরলাম—রাত দশটা। ফিরতেই ভ্রু দু'টো কুঁচকে গেল সুলতার। বিরক্ত অসন্তুষ্ট স্বরে বলল, 'এত দেরি হল যে!'

উত্তর দিলাম না। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে? জবাবদিহির জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সুলতা। অগত্যা বললাম, 'বন্ধুদের সঙ্গে খানিকটা গল্পটল্প করে এলাম। তাই—'

'বন্ধুদের সঙ্গে দশটা পর্যন্ত আড্ডা মেরে এলে! আর এদিকে আমি যে একা একা আছি সে হুঁশ নেই?'

'একা একা তোমাকে থাকতে কে বলেছে? দরকার হলে তুমিও খানিকটা বেড়িয়ে আসতে পার। তা ছাড়া—'

'কী?'

আমি চাই নি তবু কথাগুলো ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'রোজই যে পড়ি-মরি করে অফিস থেকে ছুটে এসে তোমাকে আগলাতে হবে, এমন দাসখত লিখে দিই নি।'

'কী, কী বললে!' প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল সুলতা।

'যা বলেছি তা তো শুনেইছ।' হাত থেকে তীর বেরিয়ে গেছে। তাকে আর ফেরাবার চেষ্টা করলাম না।

সুলতা কিছু বলতেই ভুলে গেল বুঝি। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে সে। এরপর নিয়মিত রাত করেই বাড়ি ফিরতে লাগলাম। বন্ধুরা বলল, 'ব্রেভো। এই না হলে পুরুষসিংহ!'

মনে আছে, সেই মাসের মাইনেটা আর সুলতাকে দিলাম না। পয়লা তারিখে সে যখন হাত পাতল, বললাম, 'ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা করে দিয়েছি।'

সুলতা বিস্মিত হল, 'আমাকে না জানিয়ে তোমার তো ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাবার কথা নয়। তা ছাড়া সারা মাস সংসার চলবে কী করে?'

'সংসার চালানোর দায়িত্ব আমার। সে জন্যে তোমার চিন্তা করতে হবে না।'

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল সুলতা। বলল, 'তুমি আমায় টাকা দিয়ে অবিশ্বাস কর?'

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। সুলতা চেয়েছিল, স্বজনবন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেবে। শুধু কি তা-ই, আমার রুচি স্বাধীনতা সত্তা—সব আত্মসাৎ করে নিজের পছন্দের ছাঁচে ঢালাই করে ফেলবে। আসল কথা, যতদূর বুঝেছি সুলতা কর্তৃত্বলোভী। আদিম কোনো স্ত্রী-শাসিত সমাজ থেকে মাঝখানের কয়েকটা শতাব্দী এক লাফে পার হয়ে সোজা একালে চলে এসেছে। আমাকে নিয়ে তার যে সাম্রাজ্য, সেখানে তার প্রভুত্ব হবে নিরঙ্কুশ—এই ইচ্ছাই ছিল সুলতার। হয়তো এটাই ছিল তার ভালোবাসার প্রকাশ। কিন্তু আমার মধ্যে বিপরীত একটি মানুষ রয়েছে। সেই দুর্বিনীত মানুষটা সজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করতে জানে না। সুলতার মনোভাব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সে বিচলিত হয়ে পড়েছে। এবং একটি একটি করে তার খোয়ানো স্বাধীনতা সবলে ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে। তাকে দুর্দম নেশায় পেয়ে গেছে যেন।

সুলতা চিৎকার করে উঠল, 'কী, চুপ করে রইলে যে?'

উত্তর দিলাম না। কী উত্তরই বা দেব? সুলতা এবার তার শিক্ষা-দীক্ষা-সুরুচি সব বিস্মৃত হয়ে উন্মাদের মতো চেঁচাতে লাগল, 'বুঝেছি—বুঝেছি—'

এর দিনকয়েক পর শোভাবাজারের ফ্ল্যাট ছেড়ে যৌথ সংসারে ফিরে এলাম। সুলতা আসতে চায় নি। বলেছে, 'ওখান থেকে আমিই ব্যবস্থা করে চলে এসেছি। ফিরে যাওয়াটা আমার পক্ষে খুবই অপমানের হবে।'

আপাত দৃষ্টিতে ঘটনাগুলি সাঙ্ঘাতিক নয়। নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু এই তুচ্ছতার মধ্যে বিস্ফোরক ঠাসা ছিল।

প্রথম যেদিন সুলতাকে অগ্রাহ্য করে অফিস থেকে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন থেকেই সুলতা আর আমার মধ্যে একটা অদৃশ্য দেওয়াল মাথা তুলেছিল। সেই দেওয়ালটা ক্রমাগত উঁচু হতে লাগল।

বুঝতে পারছিলাম, এবাড়ি ফিরে আসাটা সুলতার মনঃপূত হয় নি। একটা বিষাক্ত আক্রোশ সাপের মতো তার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল। সে ফুলছিল, ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল এবং আমাকে আক্রমণ করার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিল। তারই ভূমিকা হিসাবে আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, কথাবার্তা কদাচিৎ হত। রাতেও এক ঘরে আমার সঙ্গে থাকত না সুলতা।

এদিকে আমিও প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে আরম্ভ করলাম। বন্ধুবান্ধব-ক্লাব-আড্ডা সবাই একসঙ্গে হাত বাড়িয়ে বাইরের দিকে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। বিয়ের আগের আকর্ষণ মুগ্ধতা কিছুই আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না।

এভাবে মাসকয়েক চলার পর হঠাৎ একদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াল সুলতা। অফিস ছুটির পর আড্ডা টাড্ডা দিয়ে অনেক রাতে সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি। শাণিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সুলতা বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছ কেন? কেন আমাকে উপেক্ষা করছ?'

বললাম, 'উপেক্ষা?'

'নয়তো কী? দয়া করে খেতে দিচ্ছ, তাই খাচ্ছি। পরতে দিচ্ছ, পরছি। নইলে একবারও আমার খোঁজ নাও কি? মানসিক কী অবস্থায় আমার দিন কাটছে, তার খোঁজ রাখ কি? একটা দাসী-বাঁদীর সঙ্গে আমার তফাতটা কী? বল—বল—'

মনটা যে কারণেই হোক ভালো ছিল। ভেবেছিলাম রূঢ় হব না। স্বেচ্ছায় সুলতা যখন কাছেই এসেছে, তাকে বোঝাব। এবং সামান্য কিছু স্বাধীনতা তার হাতে তুলে দিয়ে সন্ধি করে নেব।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগে হিংস্র গলায় সুলতা চেঁচিয়ে উঠেছে, 'জানি কেন তুমি আমার সঙ্গে এ রকম করছ।'

'কেন?'

'নিশ্চয়ই আর কেউ জুটেছে। তাকে নিয়ে বেলেল্লাগিরি করছ, আমার দিকে তাকাবার সময় কোথায় তোমার?'

অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। কাজেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এমন একটা কথা যে সুলতার মতো শিক্ষিত মেয়ের মুখ দিয়ে বেরুতে পারে, এ ছিল আমার কল্পনার বাইরে। মুহূর্তে সব সদিচ্ছা বাষ্প হয়ে উবে গেল। মাথার মধ্যে কোনো একটা বারুদের স্তূপে আগুন লাগল যেন। উন্মত্তের মতো বলে উঠলাম, 'ঠিক বলেছ। তোমার দিকে তাকাবার আছে কী! কুৎসিত কদর্য মন—'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। তার আগেই গ্রাম্য মেয়ের মতো ডুকরে কেঁদে উঠল সুলতা। এবং আমার চরিত্রে পৃথিবীর সবটুকু কালি ঢেলে দিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ প্রখর স্বরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

এরপর থেকে বাড়িতে থাকাই দুরূহ হয়ে উঠল। এক এক সময় ইচ্ছা হত সুলতার ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে বিয়ের আগের সেই মুগ্ধতা আর বিস্ময়ের মধ্যে আবার ফিরে যাই। কিন্তু ফেরার আর উপায় ছিল না। আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না সে। দেখামাত্র খেপে উঠত, কাঁদত, চিৎকার করত। কিছু বলার অবকাশই পেতাম না। তা ছাড়া, মানুষ হিসাবে আমি কিছুটা অসহিষ্ণু প্রকৃতির। ধৈর্য টৈর্য কম। সুলতা কিছু বললেই উত্তেজিত হয়ে উঠতাম।

তিক্ততাটা শেষ পর্যন্ত শীর্ষবিন্দুতে এসে পৌঁছুল। তারই পরিণতিস্বরূপ কাল রাতে সুলতা এসে বলেছিল, 'এভাবে এখানে থাকতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর নোংরামি বাড়িয়ে লাভ নেই। কালই আমাকে পয়ারগঞ্জে দিয়ে এস।'

সুলতার ইচ্ছা এবং জেদ অনুযায়ী তাকে নিয়ে আজ সকালে পয়ারগঞ্জ রওনা হয়েছি। সুলতার বাবা রিটায়ার করার পর সেখানে বাড়ি করে চাষবাস আর বিরাট ফুলফলের বাগান নিয়ে আছেন।

পয়ারগঞ্জে আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না। কাকা-বাবা-জেঠামশায়, খুড়তুতো-জেঠতুতো এবং নিজের ভাইরা—সবাইকে বলেছিলাম সুলতাকে তার বাবার কাছে দিয়ে আসতে। কিন্তু এই অপ্রীতিকর অবাঞ্ছিত দায়িত্বটা কেউ নিতে চায় নি। কৌশলে এড়িয়ে গেছে। অগত্যা আমাকেই বেরুতে হয়েছে। আমার বিশ্বাস, পয়ারগঞ্জ থেকে আর কোনোদিন সুলতা আমার কাছে ফিরবে না।

ভাবনাটা বেশি দূর এগোয় না। আচমকা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে পয়ারগঞ্জের লাস্ট বাস থেমে গেল। বাইরে দুর্যোগটা প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, বর্ষার এই রাত্রিটা পৃথিবীর আদিম শৈশবে একটা ভয়াবহ প্রলয়ের মধ্যে ফিরে গেছে।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে সন্ত্রস্ত গুঞ্জন উঠল, 'ব্যাপার কী, বাস এভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল যে!'

ড্রাইভার লোকটি রসিক। কিছুক্ষণ স্টিয়ারিং ধরে টানাটানি করল। তারপর সগৌরবে ঘোষণা করল, 'গাড়ি আর যাবে না, শালার হার্টফেল করেছে।'

বলে কী ! শোনামাত্র চকিত হয়ে উঠলাম। এরপর আর কোনো বাসও নেই যে সেটা ধরে পয়ারগঞ্জ পৌঁছুতে পারব। আকাশে মেঘ দেখেও হঠকারিতার বশে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তবে কি এই নিদারুণ দুর্যোগের মধ্যে রাস্তায় বসে বসেই নিশিপালন করতে হবে!

একে একে যাত্রীদের অনেকেই সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেল। কোথায় গেল, জানি না। রসাতলেই কি না, কে বলবে!

আমার পাশে সেই আধা-গ্রাম্য আধা-শহুরে লোকটা কন্ডাক্টরের উদ্দেশে বলে উঠল, 'কুথায় এসে ঠেকলম হে?'

'তালডাঙার কাচাকাচি।' কন্ডাক্টর জবাব দিল।

'এঃ, ঘরের কাচে এসে কল বিগড়োল! শালার বিষ্টি যা আরম্ভ হয়েচে এ তো থামবে বলে মনে হচ্চে না। কতক্ষণ আব বসে রইব? তার চাইতে ভিজেই চলে যাই।' বলতে বলতে আমার দিকে ফিরল লোকটা 'না কি বলেন—'

লক্ষ করি নি, সেই বর্ধমান থেকেই সে বার বার আমাকে আর সুলতাকে লক্ষ করছিল। বুঝিবা তার চোখে কিছু কৌতূহলের খেলা ছিল। তার কথার কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। শুধু তাকিয়ে রইলাম।

লোকটা আবার বলল, 'ইদিগের লোক নন, তাই না?'

বললাম, 'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে আসছি। পয়ারগঞ্জে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন কী যে করব—'

আমার চোখেমুখে এবং গলার স্বরে অসহায়তা ছিল। লোকটা একমুহূর্ত কী ভাবল। তারপর বলল, 'অপরাধ যদি না লেন, এট্টা কথা কইব। শুদু শুদু বাসে বসে সারারাত কষ্ট পোয়াবেন কেন? তার চাইতে আমার বাড়িতে আজকের রাতটা কাটিয়ে দেবেন চলুন. কাল সকালে পয়ারগঞ্জ যাবেন—'

প্রস্তাবটা লোভনীয়। আবার কিছু সংশয়ও আছে। একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে যাওয়া উচিত হবে কি হবে না, বুঝতে পারছি না। খানিকটা ইতস্তত করে বললাম, 'কিন্তু—'

'কিন্তুন টিন্তুন লয়, আসেন দিকিন।' আমার দ্বিধা মানল না লোকটা। বৃষ্টি একটু কমলে প্রায় জোর করেই সুলতা আর আমাকে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সীমাহীন অন্ধকার। তার মধ্যেই পথ খুঁজে খুঁজে সে এগুতে লাগল। লোকটা যেন অমোঘ নিয়তি। অন্ধের মতো তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

যেতে যেতে লোকটার সবটুকু পরিচয় পেয়ে গেলাম। নিজের সবদিকের সব দুয়ারই সে অনর্গল করে দিল।

নাম তার ব্রজ। জাতে সৎচাষী। জীবিকা ব্যবসা। আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে কাঁচা আনাজ জোগাড় করে বর্ধমানে নিয়ে যায়। সেখানে কলকাতার পাইকারদের কাছে মাল বিক্রি করে লাস্ট বাসের আগে আর বাড়ি ফেরা হয় না। বিয়ে করেছে দেড় যুগের ওপর কিন্তু ছেলেপুলে হয় নি। সেজন্য দুঃখ আছে কিন্তু ক্ষোভ নেই। জগৎ-সংসারে তারা দু'টি প্রাণী। স্বামী আর স্ত্রী। এছাড়া কেউ নেই।

ব্রজ বলতে লাগল, 'আমরা দু'জন দু'জনকে লিয়ে আচি। আমায় ছাড়া ওর পিথিমী আঁধার। ওকে ছাড়া আমারও একটা দিন চলে না। লোকে কী বলে জানেন? বলে, আমরা নাকিন চকা-চকী। বেশ বলে, ভালো বলে। বেশ আচি দু'টিতে। বড় শান্তিতে আচি। ভগমান আমাদের সব দিয়েচে। ভাবি, ছেল্যাপুল্যার সাধটা যদিন মিটত! নাঃ, ও জিনিসটা লিয়ে নাড়াচাড়া এ

জন্মে আর হল না। সারাটা দিন তো বাড়ি থাকতে পারি না। এট্টা ছেল্যা কি মেইয়ে যদিন থাকত, বউটার সুবিদে হত। একা একা—'

শুনতে শুনতে একটা সুখী, আনন্দময় সংসারের ছবি আমার সামনে ভেসে উঠছিল।

ব্রজ আগে আগে যাচ্ছিল। তার পেছনে পাশাপাশি সুলতা আর আমি। একবার সুলতার দিকে তাকালাম। কিন্তু না, অন্ধকারে মুখটা তার দুর্বোধ্যই থেকে গেল।

চলতে চলতে একসময় গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে ব্রজ বলল, 'জানেন, আপনাদেরবে এই যে বাড়ি লিয়ে যাচ্চি, তাতে আমার স্বাত্থ আচে।'

সবিস্ময়ে বললাম, 'কিরকম?'

'বুঝলেন কিনা, কাল ভোরে মাল লিয়ে বার হইচি। আর আজ বাড়ি ফিরচি। পাইকেরের সন্‌গে হিসেব লিয়ে এট্টা গোলমাল হয়েছিল। তাই কলকাতা যেতে হল। যাবার আগে বউকে এট্টা খপর পয্যন্ত দিতে পারি নি। যাক সে কথা। বে'র পর থিকে এমনটা তো আর কুনোদিন হয় নি। এট্টা পুরো রাত মেইয়েছেলেটাকে ছেইড়ে কুনোদিন রই নি। বুঝতেই পারচেন বউটা রাগে ফুলে রয়েচে। আমারে দেকলে তো রক্ষে রাকবে না। ভাবচি আপনাদের দিয়ে পয়লা ধাক্কাটা সামলাব।' ব্রজ এমনভাবে বলল যেন আমি তার বহুকালের পরিচিত বিশ্বস্ত সুহৃদ।

কথাগুলো সুলতার মনে কী প্রতিক্রিয়া করছিল, জানি না। তবে আমার প্রাণের গভীরে নিদারুণ আলোড়ন তুলেছে।

শস্যহীন একটা মাঠ আর কিছু বন্ধ্যা কাঁকুরে প্রান্তর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা ব্রজর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। বাড়ি আর কি! টিনের চাল, মাটির দেওয়ালের খান দুই ঘর, বারান্দা আর সামনের দিকে উঠোন।

বৃষ্টিটা আরো কমে এসেছিল। উঠোন থেকে ব্রজ ডাকল, 'হেই গো, আলোটা লিয়ে এস দিকিন—'

এক ডাকেই হেরিকেন হাতে ঘর থেকে যে বারান্দায় বেরিয়ে এল, তার বয়স এক রহস্য। পঁচিশও হতে পারে, পঁয়তিরিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। পঁচিশ হোক, তিরিশ হোক, চল্লিশ হোক—বয়স কিন্তু তার দেহের কোথাও নিজের ছায়া ফেলতে পারেনি।

বেরিয়েই সে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, 'তুমার আক্কেলটা কি—' বলতে বলতে ব্রজর পেছনে আমাদের দেখে হঠাৎ থতিয়ে গেল। তারপর জিভ কেটে আড়-ঘোমটা টেনে দিল।

ব্রজ আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, 'যাক, পয়লা চোটটা য্যাকন সামলেচি ত্যাকন আর ভয় লেই।'

স্ত্রী সম্পর্কে তার ভয়টা যে অহেতুক এবং মধুর দাম্পত্য-লীলারই একটা অংশ তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

এরপর আমরা ঘরের ভেতর গেলাম। বৃষ্টিতে ভিজে জামাকাপড় সপসপে হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে দ্বিতীয় পোশাক ছিল না। অতএব ব্রজর দেওয়া শুকনো শাড়ি পরল সুলতা, আমি পরলাম ধুতি।

ইতিমধ্যে চা করে ফেলেছে ব্রজর বউ। ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে সুলতা আর আমাকে বসিয়েছে। সে এবং ব্রজ একটু দূরে চৌকাঠ ঘেঁষে মাটির ওপর বসেছে।

চা খেতে খেতে ব্রজর বউয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছি! প্রথম দর্শনে তার বয়সটা রহস্যময় মনে হয়েছিল। সেটা অকারণে নয়। সারা দেহে তার পর্যাপ্ত যৌবন। যৌবন তার শরীরে যেন ঋতুবিশেষের খেলা নয় যে এলাম, ফুটলাম, অবশেষে ঝরে গেলাম। যৌবনের সঙ্গে তার

চিরকালের সম্পর্ক। রূপ? এমন কী আর! মাজা মাজা রংখানি, চোখ দু'টি ছোটই, নাকটি ঈষৎ বোঁচা। রূপের হাটে যত ঘাটতিই থাক, যৌবন তার সব ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছে।

ব্রজরাও চা নিয়ে বসেছিল। কাত হয়ে বসে চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে ব্রজর বউ বলে উঠল, 'আপনারাই বলেন দিকিন চিন্তা হয় কি না? বলা লেই কওয়া লেই, পুরো এট্টা দিন লোকটা উধাও। আমি তো ভয়েই মরি— '

বুঝলাম ব্রজর সেই কলকাতা যাওয়ার প্রসঙ্গটা এবার উঠল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই খ্যাল খ্যাল করে হেসে উঠল ব্রজ। বলল, 'তুমাকে এট্টা সুযুগ করে দিলাম সেটা কাজে নাগাতে পারলে নি?'

'কিসের সুযুগ?' ব্রজর বউ স্বামীর দিকে তাকাল।

'কিসের আবার, আমি বুড়ো-ধুড়ো হয়ে গেচি, তুমি তো একনও ডাঁটো যুবুতীটি হয়েই আচ। ভেবেছিলাম, ফিরে এসে দেকব, ছেলেছোকরা কারুরে জুটিয়ে ভেগেচ।'

'আহা, কথার কি ছিরি! মুখেই শুধু, সত্যিই যদিন চলে যাই পেরানটা ফেটে যাবে।'

'অ্যাত দেমাক-–'

'হ্যাঁ, অ্যাতই—' বলেই আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে স্বামীর দিকে তীব্র কটাক্ষ হানল ব্রজর বউ আর সেই কটাক্ষের মধ্যে জীবনের সবটুকু সুধা বুঝি ছিল।

তাদের রসিকতাগুলি নিতান্তই গ্রাম্য। তবু মহানগর থেকে অনেক, অনেক দূরে বর্ধমানের অভ্যন্তরে এই গ্রামে এই দুর্যোগের রাত্রিতে সেগুলো আমার মতো একজন বিচক্ষণ নাগরিককে প্রায় মুগ্ধই করে ফেলল।

যাই হোক, ব্রজর বউ একসময় আমাদের সম্বন্ধে সচেতন হল, 'ওই দ্যাকো, লিজেদের লিয়েই মেতে রয়েচি। আপনারা এলেন, এট্টা কতাও একন পয্যন্ত কই নি।' স্ত্রীলোকটি আশ্চর্য সাবলীল, নিঃসংকোচ। তাড়াতাড়ি উঠে সুলতার পাশে এসে বসল সে। তারপর স্ত্রীসুলভ কৌতূহলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগল। কোথা থেকে আসছি? ব্রজের সঙ্গে কিভাবে আলাপ? কোথায় যাব?

যখন সে শুনল পয়ারগঞ্জে আমরা যাচ্ছি, জিগ্যেস করল, 'সেকেনে কে আচে?'

সুলতা বলল, 'আমার বাবা।'

'ও, বাপের বাড়ি যাওয়া হচ্চে। তা কদ্দিন থাকবেন?'

সুলতা চকিত হয়ে উঠল। এমন একটা প্রশ্ন সে প্রত্যাশা করে নি। আমার দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নিল। অস্ফুট সুরে বলল, 'দেখি কতদিন থাকা হয়।'

কী একটু ভেবে ব্রজর বউ এবার বলল, 'কদ্দিন বে হয়েচে?'

'বছর আড়াই।'

'ছেল্যাপুল্যা?'

সুলতা এবার মুখে কিছু বলল না। জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। আরো কতক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পালা চলত, কে জানে। হঠাৎ ব্রজ বলে উঠল, 'এবারে গপ্প থামাও। ঢের রাত হয়েচে। রাঁধাবাড়ার ব্যওস্থা—'

ব্রজর বউ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি।' চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়াল সে, আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'রাঁধতে তো চলিচি। তা আপনারা?'

'আমরা কী?' ব্রজর বউ কী বলতে চায় বুঝতে পারলাম না।

'কইছিলাম কি, আপনারা কী জাত?'

'ব্রাহ্মণ।'

'তাহলি তো বিপদ হল। আপনাদের এট্টু কষ্ট করতে হবে। সব জোগাড় করে দিচ্চি। রান্নাটা শুদুন —'

বুঝলাম বিপদটা কোথায়। বললাম, 'তোমরাই রাঁধ। আমরা জাত-টাত মানি না।'

'আমরা যে মানি।' ব্রজর বউ হাসল।

'তাহলে থাক গে। একটা তো রাত। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। রান্নার হাঙ্গামা করে আর দরকার নেই।'

'তাই কখুনো হয়? পেরথম এলেন, আর কুনোদিন আসবেন কি না কে জানে। ভিটেয় বসিয়ে উপুসী রাকতে পারি!'

সেই রাত্রেই কোথা থেকে মাছ-ডিম জোগাড় করে আনল ব্রজ। তার বউ নিপুণ, ক্ষিপ্র হাতে সব ব্যবস্থা করে দিল এবং সুলতাকে টেনে নিয়ে রাঁধতে বসাল।

সুলতা রাঁধছে। অভিজ্ঞতাটা নতুন বটে, চমকপ্রদও। কোনোদিন এর আগে তাকে উনুনের সামনে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

বাধ্য মেয়ের মতো ব্রজের বউয়ের নির্দেশে রাঁধল সুলতা। তারপর আর কিছু তাকে বলতে হল না। কী এক আত্মবিস্মৃতির ঘোরে আমাকে খেতে দিল। নিজে খেল।

আশ্চর্য! রেঁধে খাওয়ানো তো দূরের কথা, এই সুলতা বিয়ের পর আমার খাবার সময় কাছে এসে বসে নি পর্যন্ত। তবে কি এই প্রৌঢ় দম্পতি তার চেতনায় ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়ে গেছে!

খাওয়া দাওয়ার পর দু'জনে শুতে গেলাম। ব্রজ বড় ঘরখানা আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল। ব্রজর বউ পরিপাটি বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেছে।

সকালবেলা যে মন নিয়ে শ্যামবাজার থেকে বেরিয়েছিলাম, তার বিন্দুমাত্রও যদি অবশিষ্ট থাকত, এই ঘরখানাকে জতুগৃহ ছাড়া ভাবতেই পারতাম না। কিন্তু ইতিমধ্যেই পৃথিবীর রং বুঝি বদলে গেছে।

ঘরে ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুলতা। বৃষ্টিটা কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার খেপে উঠেছে।

কত, কত কাল পর? মনে হল যুগযুগান্ত পার হয়ে সুলতা আর আমি রাত কাটাবার জন্য একটি ঘরে আবার মিলিত হয়েছি।

প্রথমটা কী করব, ভেবে পেলাম না। কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইলাম। তারপর মাধ্যাকর্ষণের মতো দুর্বার এক টানে কখন যে সুলতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, জানি না। খুব আস্তে ডাকলাম, 'সুলতা—'

জানালার বাইরে থেকে মুখ ফেরাল সে।

বললাম, 'ব্রজরা চমৎকার মানুষ, না?'

'হ্যাঁ।'

'নিজেদের নিয়ে দু'টিতে বেশ আছে। খুব ভাব স্বামী-স্ত্রীর। একজনের জন্যে আরেক জনের—'

লক্ষ করলাম, সুলতার ঠোঁট দু'টো অসহ্য আবেগে থরথর করতে লাগল। অস্থির গলায় সে শুধু বলতে পারল, 'আমরা, আমরা—'

তার কাঁধে সস্নেহে একটা হাত রেখে বললাম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরাও—'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

বাইরে দুর্যোগটা সমানে মাতামাতি কবছে। করুক। ভেতরে সুলতা আর আমি পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলাম।

বিয়ের আগে পরস্পরকে দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, চমৎকৃত হয়েছি কিন্তু মগ্ন হই নি। কে জানত, পরস্পরের মগ্নতাই প্রেম। কে জানত, বর্ধমান জেলার এই দুর্গম অভ্যন্তরটা আমাদের জন্য ভালোবাসার নতুন পাঠ নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

পরের দিন ভোরেই আবার বেরিয়ে পড়লাম। ব্রজ আর তার বউ একটা দিন থেকে যাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করল। আমরা থাকলাম না।

বাস রাস্তা পর্যন্ত ব্রজ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। সেখানে গিয়ে রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকে গেলাম। একটু অবাক হয়েই ব্রজ বলল, 'ওকি, উদিকে গেলেন কেন? পয়ারগঞ্জের বাস তো ইদিক থিকে ধরতে হবে।'

বললাম, 'পয়ারগঞ্জে যাবার আর দরকার নেই। কলকাতাতেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

কথাবার্তাব মধ্যেই বাস এসে গেল। সুলতাকে নিয়ে উঠে পড়লাম। বিমূঢ়ের মতো ব্রজ দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রজ কি জানত, আমাদের মৃত বিস্মৃত আত্মাকে তারই বাড়িতে কাল রাতে ফিরে পেয়েছি!

নরকের পোকা

শহরের এই অঞ্চলে কিছু ধানচালের আড়ত, কাঠের গুদাম, করাত-কল আর টালিখোলা এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। সামনে দিয়ে চলে গেছে এবড়োখেবড়ো খোয়ার রাস্তা। দু'ধারের কাঁচা নর্দমা থেকে অনবরত দুর্গন্ধ উঠে এসে বাতাসে বিষ ছড়িয়ে যায়। চাপ-বাঁধা মশার ঝাঁক সারাক্ষণ নর্দমা দু'টোর ওপর উড়তে থাকে।

খোয়ার রাস্তা থেকে করাত-কলের পাশ দিয়ে একটা সরু গলি ডাইনে ঢুকে যে হতচ্ছাড়া চেহারার বস্তিটায় গিয়ে ঠেকেছে, সেটাকে নরকের খাস তালুক বলা যায়। টুটোফুটো টিনের চালের নোংরা কুৎসিত এই বস্তিটা হল পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা ক'টা মেয়েমানুষের শেষ আস্তানা। সুখী, ভদ্র মানুষের ভূগোল থেকে অনেক, অনেক দূরে নরকের এই সংরক্ষিত এলাকা।

বস্তি থেকে বেরিয়ে এসে দু'টো মেয়েমানুষ করাত-কলের বাড়ানো টিনের শেডের তলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে।

পৌষের মাঝামাঝি। এ বছর এই শহরটায় দুর্দান্ত শীত পড়েছে।

এখন কত রাত কে জানে। আকাশ থেকে ঘন হয়ে নামছে পৌষের হিম। নিচে মাটির লক্ষ কোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে মারাত্মক শীতলতা।

মিউনিসিপ্যালিটি অসীম উদাসীনতায় এ রাস্তায় দু-আড়াই শো গজ দূরে দূরে ক'টা কাঠের খুঁটি পুঁতে সেগুলোর গায়ে বাল্ব ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। প্রায় সবগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে। দু-একটা অবশ্য টিম টিম করে এখনও জ্বলে।

মেয়েমানুষ দু'টো যেখানে বসে আছে তার কাছাকাছি একটা আলো জ্বলছে। গাঢ় হিম এবং কুয়াশা বাল্বটার চারপাশে এমন জমাট বেঁধে আছে যে তিন হাত দূরের কিছুই প্রায় দেখা যায় না।

খোয়ার রাস্তাটা উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণে চলে গেছে। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, এখন সব সুনসান।

এমনিতে সন্ধের পর দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য চোর বাটপাড় মাতাল এবং গুণ্ডারা ঝাঁকে ঝাঁকে পেছনের বস্তিটায় হানা দিতে থাকে। তারপরও যে মেয়েমানুষেরা নিজেদের বিকোবার মতো খদ্দের জোটাতে পারে না, সোজা সামনের রাস্তায় চলে আসে। ততক্ষণে ধানচালের আড়ত, কাঠের গুদাম টুদাম বন্ধ হয়ে যায়।

রাত একটু বাড়লে ভদ্রপাড়ার মানুষজন পারতপক্ষে এ রাস্তা মাড়ায় না। ক্বচিৎ দু-একটা মড়া কাঁধে নিয়ে কিছু লোক চিৎকার করে গোটা এলাকা কাঁপাতে কাঁপাতে শ্মশানের দিকে চলে যায়। 'বল হরি, হরিবোল। আবার বল, হরিবোল।'

এখান থেকে মাইল দেড়েক তফাতে একটা মজা নদী সাপের খোলসের মতো পড়ে আছে। শ্মশানটা তার পাড়ে।

যে মেয়েমানুষ দু'টো করাত-কলের শেডের তলায় বসে আছে তাদের গায়ে রোঁয়াওলা খেলো উলের চাদর জড়ানো, চাদর দু'টো বহুকালের পুরনো, এখানে ওখানে অজস্র তালি। পৌষের হিম চাদর ভেদ করে তাদের হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। অসহ্য ঠাণ্ডায় হাত-পা অসাড় তো হয়ে গেছেই, দাঁতে দাঁতও লেগে যাচ্ছে।

তাদের নাম টগর আর চাঁপা। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। তবে ভাঙাচোরা মুখ, কর্কশ চামড়া, চোখের তলায় চিরস্থায়ী কালির ছোপ, ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখলে মনে হতে পারে তারা চল্লিশ পেরিয়ে গেছে।

টগর বলে, 'শীতে একেবারে কালিয়ে গেলাম। এট্টু গা গরম করে লিই।' শীতার্ত শরীরে খানিকটা উত্তাপ নিয়ে আসার জন্য একটা ছোট টিনের কৌটো থেকে দু'টো আধপোড়া বিড়ি এবং দেশলাই বার করে একটা চাঁপাকে দেয়।

বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে চাঁপা উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমে-মোড়া ঝাপসা রাস্তাটা একবার দেখে নেয়। না, একটা লোকও চোখে পড়ছে না। এমনকি বেওয়ারিশ কুকুর টুকুরগুলো পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে। প্রচণ্ড দুর্যোগে বা অন্য কোনো বিপর্যয়ের সময় কেউ না বেরুলেও মাতাল এবং লম্পটেরা পোকার মতো বুকে হেঁটে এখানে হাজিরা দেবেই। কিন্তু আজকের এই মারাত্মক ঠাণ্ডায় মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তিও বুঝি সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। আজ আর খদ্দেরের আশা নেই।

চাঁপা বলে, 'মড়াগুলোন সব আজ বেম্মচারী হয়ে গেল নাকিন লা টগরী?'

টগর বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে নাকের ফুটো দিয়ে নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'তা-ই তো মনে হচ্চে। কিন্তুন সব্বাই সন্নিসী হয়ে গেলে আমাদের চলে কী করে? উপুস দিয়ে মরতে হবে।'

চূড়ান্ত ক্ষয় এবং গ্লানির শেষ সীমান্তে পৌঁছেও রসিকতার বোধটুকু এদের একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। চাঁপা বলে, 'য্যাদ্দিন গতর আচে উপুস দেব কেন লা? আজ ঠাণ্ডায় বেরোয়নি, কাল লচ্ছারগুলোন ভাদ্দরমাসের কুত্তোর মতো জিভ লক লক করতে করতে ঠিক দৌড়ে আসবে।'

'তা যা বলিচিস। এ পবিত্তির (প্রবৃত্তির) তো মরণ লেই।'

মানুষ সম্পর্কে টগরদের অভিজ্ঞতা একটাই। নরকের একেবারে শেষ স্তরে পৌঁছে তারা জেনেছে, জৈব প্রবৃত্তির বিনাশ নেই। একমাত্র এরই জোরে তারা টিকে আছে। যতদিন কামুক পুরুষেরা এই পৃথিবীতে রয়েছে, তারাও থাকবে।

বহুদূরে জগতের সব সুখী, সোহাগিনী নারীরা উষ্ণ লেপের তলায় কাম্য পুরুষদের বুকের ভেতর মুখ রেখে যখন ঘুমিয়ে আছে তখন দু'টি জঘন্য মেয়েমানুষ কুয়াশা এবং হিমের ভেতর আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে।

একসময় টগর বলে, 'চ, ফিরে যাই। এই ঠাণ্ডায় বসে থাকলে নিমুনি ধরে যাবে।'

চাঁপা বলে, 'তাই চ।'

ওরা করাত-কলের শেডের তলা থেকে সবে নিচে নেমেছে, দূরে কিসের যেন আওয়াজ পাওয়া যায়। মিউনিসিপ্যালিটির যে দু-চারটে আলো এধারে ওধারে জ্বলছে তাতে কিছুই চোখে পড়ে না।

দৃষ্টিকে ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ করে চাঁপা এবং টগর ডাইনে এবং বাঁয়ে অনবরত তাকাতে থাকে। গাঢ় কুয়াশায় এবং হিমে চারপাশের সব কিছু ঢাকা। না দেখা গেলেও শব্দটা কিন্তু কানে আসছে। সেটা ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসে।

সৃষ্টিছাড়া দুনিয়ার দুই বাসিন্দার মনে সামান্য দুরাশাই বুঝি দেখা দেয়। টগর বলে, 'কিসের আওয়াজ বুজতে পারচিস?'

চাঁপা কান খাড়া করে বুঝবার চেষ্টা করে। তারপর চোখ কুঁচকে বলে, 'মনে হচ্চে মানুষের পায়ের আওয়াজ। কেউ ইদিকে আসচে।'

'এট্টু দেঁড়িয়ে যাই, কি বলিস?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্চে, আজকের রোজগারটা মার যাবে না।'

টগর কিছু বলে না। তবে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে সামান্য হেলিয়ে দেয়।

আরো কিছুক্ষণ বাদে দু-আড়াই শো গজ দক্ষিণে মিউনিসিপ্যালিটির যে বাতিটা জ্বলছে তার তলায় ঝাপসা ক'টা চেহারা দেখা যায়। মনে হয় মানুষই। চাঁপারা রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

টগর বলে, 'আগিয়ে দেকবি?'

চাঁপা বলে, 'না, একেনেই দেঁড়িয়ে থাকি।'

কুয়াশা এবং হিমের মধ্যেও ক'টা মানুষের কাঠামো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিছু একটা যেন তারা বয়ে নিয়ে আসছে।

এ পাড়ায় যারা মজা লুটতে আসে তারা কেউ ঘাড়ে মালপত্র চাপিয়ে আনে না। বড় জোর তাদের বগলে বা হাতে কালীমার্কা দিশি মদের বোতল থাকতে পারে।

টগর চাপা গলায় শুধোয়, 'এই মড়াগুলোন কারা। কাঁধে করে কী ঝ্যানো নে আসচে?'

চাঁপা বলে, 'ভগমান জানে। কাচে আসতে দে।'

কাছাকাছি আসার আগেই লোকগুলো হঠাৎ রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় তখনই আধফোটা কাতর গোঙানির শব্দ ভেসে আসে, সেইসঙ্গে অস্পষ্ট কিছু কণ্ঠস্বর—যার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

মেয়েমানুষ দু'টো নিজেদের অজান্তেই উদ্বেগ বোধ করতে থাকে।

টগর বলে, 'কী হল, বল দিকিন?'

চাঁপা বলে, 'ঠিক বুজতে পারচিনি।'

'দেঁড়িয়ে না থেকে, চ ওকেনে গে দেকি—'

চাঁপা সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বলে, 'যেতে তো চাইচিস। আবার কোনো হ্যাঙ্গামে গিয়ে পড়ব না তো?'

টগর নিরাসক্ত মুখে বলে, 'হ্যাঙ্গাম আর নতুন করে কী হবে? আমাদের মতো মেয়েমানুষদের ক্ষেতি যা হবার তা তো হয়েই গেচে। চ—'

চাঁপা আর কোনো প্রশ্ন করে না। খানিকটা কৌতূহল এবং খানিকটা উৎকণ্ঠা নিয়ে পায়ে পায়ে দু'জনে এগিয়ে যায়। করাত-কলের পর তিন-চারটে কাঠের গুদাম পেরিয়ে যেতেই ওরা তিনজন জ্যান্ত মানুষ এবং একটি মৃতদেহ দেখতে পায়। জীবন্ত মানুষদের তিনজনই পুরুষ। একজনের বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। বাকি দু'জনের কম। একজন বাইশ তেইশ বছরের যুবক, অন্যটি অল্পবয়সী কিশোর। মৃতদেহটি একজন মধ্যবয়সী মহিলার। যুবকটি মাটিতে শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে। প্রৌঢ় এবং কিশোরটি তাকে তুলে বসাবার চেষ্টা করছে।

একধারে খেলো কাঠের একটা খাটিয়া কাত হয়ে রয়েছে। এই ধরনের খাটে চাপিয়েই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। খাটিয়াটির পাশে রাস্তার ওপর মহিলাটির নিষ্প্রাণ শরীর পড়ে আছে।

টগররা বুঝতে পারে, যুবক, কিশোর এবং বয়স্ক লোকটি মহিলার মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছিল। তার ভার ধরে রাখতে না পেরে যুবকটি হয়তো পড়ে যায়, সেই সঙ্গে খাটিয়াসুদ্ধ মৃতদেহটি। দূর থেকে এই পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিল তারা।

মারাত্মক শীতের রাতে আচমকা কুয়াশা এবং হিম ফুঁড়ে দু'টি মেয়েমানুষকে কাছে আসতে দেখে বয়স্ক লোকটি আর কিশোর চমকে ওঠে, ভীত চোখে তাদের লক্ষ করতে থাকে।

টগর আর চাঁপা প্রৌঢ় এবং ছেলেটাকে দেখছিল। টগর জিগ্যেস করে, 'কী হয়েচে?'

প্রৌঢ় লোকটি ভাঙা ভাঙা গলায় যা জানায়, টগররা মোটামুটি তা আগেই আন্দাজ করেছিল। নতুন যে খবরটুকু পাওয়া যায় তা এইরকম। মৃত মহিলাটি বয়স্ক লোকটির স্ত্রী। যুবক এবং কিশোর তাদের ছেলে। ভয়াবহ ঠাণ্ডায় স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে আসার মতো লোক পাওয়া যায়নি। নিরুপায় হয়ে সে আর দুই ছেলে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসছিল। কিন্তু বড় ছেলের দু'দিন ধরে প্রচণ্ড জ্বর, তার ওপর মায়ের মৃত্যুশোক। ধুঁকে ধুঁকে মৃতদেহ বয়ে আনতে আনতে তার জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে আসে। এই পর্যন্ত এসে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। এখন এই ছেলেকে কী করে সুস্থ করে তোলা যাবে এবং কিভাবেই বা স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে সৎকার করবে, ভেবে পাচ্ছে না বয়স্ক লোকটি। এই জনমানবহীন রাস্তায় এমন একটি মানুষ নেই যার সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

সব শোনার পর টগর এবং চাঁপা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কিছু পরামর্শ করে নেয়।

একসময় টগর জিগ্যেস করে, 'আমরা যদিন মা নক্ষীকে শ্মোশানে নে যাই—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে যায়।

মেয়েমানুষ দু'টোকে আচমকা দেখার পর সেই প্রাথমিক ভীতি এবং সংশয় খানিকটা কেটে এসেছে প্রৌঢ়ের। তারা যেচে যেভাবে সাহায্য করতে চাইছে তা মেনে নেবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রৌঢ় হয়তো দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এতক্ষণে সে বুঝে ফেলেছে টগররা কোন স্তরের জীব এবং তাদের ক্ষয়াটে ভাঙাচোরা মুখে কিসের ছাপ মারা।

টগর ফের বলে, 'আপনারা বেপদে পড়েচেন, তাই বলতে ভরসা পাচ্চি! নইলে বুজতেই পাচ্চেন, আমরা হলুম গে নরকের পোকা—'

প্রৌঢ় এবারও চুপ।

চাঁপা বলে, 'আমরা ছুঁলে মা নক্ষীর যদিন পরকালের ক্ষেতি হযে যায় তা হলি আর ছুঁচ্চি না। যাই—'

সত্যিই চাঁপারা যখন চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, প্রৌঢ় বিচলিত হয়ে পড়ে। যত জঘন্যই হোক আর গায়ে যত পাঁকই মাখানো থাক, তবু দু'টো জীবন্ত মানুষ তো। এই দুর্জয় শীতের রাতে নির্জন রাস্তায় অসুস্থ ছেলে এবং মৃত স্ত্রীকে নিয়ে যখন সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে তখন এই মেয়েমানুষ দু'টো এগিয়ে এসেছে। তাদের সাহায্য না নিলে বাকি রাত এই হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেটা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

প্রৌঢ়রা ব্রাহ্মণ। নিজেদের জ্ঞান, বিশ্বাস এবং সংস্কার অনুযায়ী সৎভাবেই তারা জীবনযাপন করে এসেছে। বেশ্যারা ছুঁলে সাধ্বী স্ত্রীর স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা কতটা দুর্গম হয়ে উঠবে, এই মুহূর্তে তা চিন্তা করার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই তার। প্রৌঢ় রুদ্ধ গলায় ডাকে, 'শোন—'

টগররা থেমে যায়।

প্রৌঢ় বলে, 'তোমরা যা ভালো বোঝ, কর।'

টগর এবং চাঁপা উত্তর না দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে প্রথমে মৃতদেহটি খাটিয়ার ওপর তুলে সযত্নে শুইয়ে দেয়। তারপর বেহুঁশ যুবকটিকে ধরাধরি করে সামনে একটা গুদামের শেডের তলায় নিয়ে আসে। প্রৌঢ় এবং কিশোরটিও অবশ্য তাদের সঙ্গে হাত মেলায়।

এরপর যুবকটির কপালে বুকে হাত দিয়ে তাপ পরখ করতে করতে টগর বলে, 'হিমে গা কালিয়ে গেচে। শরীল গরম না হলি হুঁশ ফিরবে নি।' একটু চিন্তা করে চাঁপাকে বলে, 'ঝট করে আমার ঘর ঠেঞে (থেকে) হারকেল (হ্যারিকেন) আর ছেঁড়া ন্যাগড়া (নেকড়া) নে আয়। যাবি আর এসবি।'

চাঁপা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হেরিকেন টেরিকেন নিয়ে ফিরে আসে। এবার টগর ছেঁড়া কাপড়টা চার ভাঁজ করে হেরিকেনের মাথায় বসিয়ে গরম করে করে যুবকটির গালে গলায় কপালে সেঁক দিতে থাকে। আর চাঁপা তার হাত এবং পায়ের তেলো ঘষে ঘষে উত্তপ্ত করে তোলে।

কিছুক্ষণ পর যুবকের জ্ঞান ফেরে। আস্তে আস্তে উঠে বসে সে।

টগর বলে, 'এবেরে মা নক্ষীকে নে শ্মোশানে যাওয়া যাক।'

প্রৌঢ় এবং কিশোরটি একধারে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে টগরদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কোথাকার দু'টো অধঃপতিত মেয়েমানুষ যে এভাবে সেবা করতে পারে, কে ভেবেছিল! প্রৌঢ় বলে, 'তোমরা অনেক করেছ। আর কষ্ট দেব না। আমরাই শ্মশানে নিয়ে যেতে পারব।'

দুই ওঁচা মেয়েমানুষের ওপর এই শীতের রাতে অপার্থিব কিছু যেন ভর করে বসে। মৃতদেহটি শ্মশানে পৌঁছে দেওয়া যেন তাদের দায়। যুবকটিকে দেখিয়ে টগর বলে, 'এই মাস্তর হুঁশ ফিরেচে। এই শরীলে মা নক্ষীকে বয়ে শ্মোশানে নে যেতে পারবে নি।' প্রৌঢ় এবং কিশোরকে বলে, 'আপনারা খাটের এক মুড়ো ধরুন, চাঁপা আর আমি আরেক মুড়ো ধরি।'

আপত্তি করার কিছু নেই। সবে হুঁশ ফিরেছে। এই অবস্থায় দুর্বল রুগ্ণ শরীরে মায়ের মৃতদেহ বয়ে দেড় কিলোমিটার দূরের শ্মশানে নিয়ে যাবার শক্তি যুবকটির নেই।

টগরের পরিকল্পনামাফিক খাটের সামনের দিকটা তুলে ধরে প্রৌঢ় এবং কিশোর, পেছন দিকটা টগর আর চাঁপা। এইভাবে তারা এগিয়ে চলে। টগরের হেরিকেন হাতে ঝুলিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে যুবকটি।

শ্মশানে পৌঁছে দেখা যায়, কেউ কোথাও নেই। একপাশে প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মেটে ঘরে ঝড়ু ডোম একাই থাকে। সে দরজা বন্ধ করে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এই প্রচণ্ড শীতের রাতে প্রৌঢ়র স্ত্রী ছাড়া আর বোধহয় কেউ মরেনি। একটি রাতের জন্য মৃত্যুও হয়তো তার হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

শ্মশানের গায়েই মজা নদী, তার ওপারে ঘন গাছপালার ভেতর চাষাভুসোদের গাঁ। কিন্তু এখন কিছুই চোখে পড়ে না, গাঢ় কুয়াশা এবং হিম সমস্ত চরাচর মুড়ে রেখেছে।

শ্মশানের একধারে মৃতদেহসুদ্ধু খাটিয়া নামানো হয়।

টগর বলে, 'আপনারা বসুন, আমরা ঝড়ুকে ডেকে আনচি।'

খাটিয়ার পাশে প্রৌঢ় তার দুই ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাশে হেরিকেনটা টিম টিম করে জ্বলে।

টগর আর চাঁপা প্রচুর ডাকাডাকি করে এবং দরজায় ধাক্কা টাক্কা দিয়ে ঝড়ুকে জাগায়। বাইরে বেরিয়ে দুই জঘন্য মেয়েমানুষকে দেখে ঝড়ুর মাথায় খুন চড়ে যায়। কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলে, 'শালীরা, মাজ রাত্তিরে জ্বালাতে এয়েচিস কেন?' টগরদের সঙ্গে তার অনেক দিনের জানাশোনা।

টগর বলে, 'মড়া নে এইচি।'

ঘুম ভাঙবার জন্য বেজায় খেপে গেছে ঝড়ু। বলে, 'মববার আর সময় পেল নি?'

চাঁপা বলে, 'তুই ঘুমুবি বলে কেউ মরবে নি? যম তোর কাচে দাসখত নিখে দেচে—না?'

গজগজ করতে করতে ঝড়ু বলে, 'এই রাতের বেলায় হজ্জুত না করলে চলছেল না? কাল সকালে মড়াটা আনলে কী ক্ষেতিটা হত?'

'তোর ঘুমের নেগে (জন্য) নোকে মড়া বাসি করে ফেলে রাকবে?'

'ও, টাটকা মড়া জ্বালিয়ে সগ্‌গে পাটাতে চাইচিস নাকিন রে মাগীরা?' বলে কদর্য কিছু খিস্তি দেয় ঝড়ু।

টগররাও চুপ করে থাকে না। কিছুক্ষণ বেপরোয়া গালিগালাজের আদানপ্রদান চলতে থাকে। তারপর হয়রান হয়ে পড়ে ঝড়ু। টগরদের জিভে এমন ধাব এবং তাদের ভাঁড়ারে এত অফুরন্ত খিস্তিখেউড় জমানো যে দু'হাত তুলে সে বলে, 'ঠিক আচে বাবা, এবার ক্ষ্যামা দে। কোতায় তোদের মড়া?'

ঝড়ু রণে ভঙ্গ দেওয়ায় টগর আর চাঁপা খিস্তি থামায়। টগর শ্মশানের কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওকেনে—'

'চ—'

টগরদের পাশাপাশি চলতে চলতে ঝড়ু বলে, 'তোদের পাড়ার কে মরল?'

টগর বলে, 'আমাদের পাড়ার মড়া লয়।'

ঝড়ু অবাক হয়ে থাকে খানিকটা সময়। তারপর শুধোয়, 'তবে কার মড়া লিয়ে এলি?'

সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয় চাঁপা।

ঝড়ু হাঁ হয়ে যায়। তার বিস্ময় এক লাফে কয়েক গুণ বাড়ে। সে বলে, 'এই জম্পেশ ঠাণ্ডায় লিজেদের ঘরে পাসিঞ্জার (প্যাসেঞ্জার) না ঢুইকে (ঢুকিয়ে) রাস্তার মড়া নে এলি!'

চাঁপা তাকে কড়া ধমকে থামিয়ে দেয়।

একটু পর ওরা প্রৌঢ়দের কাছে চলে আসে।

নদীর দিক থেকে শীতের উলটোপালটা বাতাস ছুটে আসছিল। প্রৌঢ় এবং তার দুই ছেলে অসহ্য হিমে হি হি করে কাঁপছে।

ঝড়ু এক ধারে খাটে শায়িত মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়কে বলে, 'সাট্টিফিট এনেচেন?' অর্থাৎ ডাক্তার বা হাসপাতাল থেকে আনা ডেথ সার্টিফিকেট। চিতা সাজাবার আগে মহিলাটির মৃত্যু যে স্বাভাবিক, সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাইছে ঝড়ু। একবার মাঝরাতে একটা অল্প বয়সের বউকে খুন করে ক'টা লোক পোড়াতে এনেছিল। এই নিয়ে পরে প্রচুর হুজ্জুত হয়েছে। সেই থেকে ডেথ সার্টিফিকেট না আনলে মড়া পোড়ায় না ঝড়ু। দারুণ হুঁশিয়ার হয়ে গেছে সে।

প্রৌঢ় বলে, 'এনেছি।' ডেথ সার্টিফিকেটের একটা নকল বার করে দেয় সে।

ঝড়ু এবার বলে, 'কাঠের দাম আর আমার মজুরিটা দ্যান। দেড়শো ট্যাকা।'

কিছুক্ষণ বাদে ক্ষিপ্র হাতে চিতা সাজিয়ে ফেলে ঝড়ু। তারপর প্রৌঢ় এবং দুই ছেলে ধরাধরি করে মহিলার মৃতদেহ চিতায় তোলে।

মারা গেলেও এতক্ষণ মা চোখের সামনেই ছিল। দু তিন ঘন্টার মধ্যে তার নশ্বর দেহ শ্মশানের মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দুই ছেলেই একেবারে ভেঙে পড়ে। তাদের কাতর করুণ কান্নার আওয়াজ শীতের ভারী বাতাসে বিষাদ ছড়িয়ে দিতে থাকে। প্রৌঢ়টি অবশ্য শব্দ করে কাঁদছে না, তবে তার চোখ থেকে গাল বেয়ে ঢল নেমে আসছে।

একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে টগর আর চাঁপা। প্রৌঢ় যুবক কিশোর বা মৃত ওই মহিলা কাউকেই তারা চেনে না। টগরদের যা জীবন তাতে কারো জন্য শোক বা দুঃখ করার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। তাদের যাবতীয় কোমল অনুভূতি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তবু দু'জনেই টের পায়, কী এক কষ্টে বুকের ভেতরটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। নিজেদের অজান্তেই তাদের চোখ জলে ভরে যায়।

শুধু কোনোরকম প্রতিক্রিয়া নেই ঝড়ুর। মৃত্যু তার কাছে আলাদাভাবে লক্ষ করার মতো কোনো ঘটনাই নয়। একটা বিড়ি ধরিয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সে প্রৌঢ়কে বলে, 'আর দেঁড়িয়ে থাকবেন নি বাবু, কাজটা শ্যাষ করে ফ্যালেন। রোদ ফুটলে ঝাঁক বেঁইধে মড়া আসতে লাগবে। আপনাদের কাজ শ্যাষ হলে এট্টু জিরিয়ে লেবেন। তারপর সারাদিনই তো ঝঞ্ঝট।'

প্রৌঢ় উত্তর দেয় না। বিড় বিড় করে কী মন্ত্র পড়ে বড় ছেলেকে দিয়ে মুখাগ্নি করায়। সেটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ু চিতায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আর তখনই ব্যাকুল চিৎকার করে কিশোরটি মায়ের মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'মা, মা গো—'

প্রৌঢ় উদ্ভ্রান্তের মতো বলে, 'রাজা, রাজা—'

সে এগিয়ে আসার আগেই টগর এবং চাঁপা কিশোর অর্থাৎ রাজাকে টেনে সরিয়ে আনে। কিন্তু তাকে কি ধরে রাখা যায়? পাগলের মতো চিতার দিকে সে দৌড়ে যেতে চাইছে। কিন্তু টগররা যেতে দেয় না। শক্ত করে দু'জনে তার দু হাত ধরে রাখে। অনেক কষ্টে তাকে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বসায়। নিজেরা তার দু'পাশে বসে পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিমর্ষ গলায় বলে, 'কেঁদো নি বাবা, কেঁদো নি। বাপ মা কি কারো চেরকাল থাকে!'

রাজা উত্তর দেয় না। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফোঁপাতেই থাকে।

শেষ রাতে চিতার আগুন নিবে যায়। মহিলার শরীর বিলীন হওয়ার পর প্রৌঢ় তার দুই ছেলেকে নিয়ে নদীতে স্নান করে আসেন।

টগর এবং চাঁপার মধ্যে কয়েক ঘন্টায় কিছু একটা ওলটপালট ঘটে গিয়ে থাকবে। তারাও প্রৌঢ়দের সঙ্গেই নদীতে নেমে ডুব দিয়ে এসেছিল।

প্রৌঢ় এবার দশ টাকার পাঁচটা নোট বার করে টগরদের দিকে বাড়িয়ে কৃতজ্ঞ সুরে বলে, 'এটা ধর। মায়েরা, তোমরা আমাদের জন্যে যা করেছ তার—' বলতে বলতে তার গলা বুজে যায়।

টগর এবং চাঁপা চমকে তিন হাত পিছিয়ে হাতজোড় করে বলতে থাকে, 'ওটা নিতে পারব নি বাবা। সারাটা জেবন লরকে মুখ গুঁজে আচি। রোজই তো গায়ে নোংরা মেকে রোজগার করি। এট্টা দিন না হয় বাদই থাক। ছেলেদের নে ঘরে যান বাবা। এই শীতে ভেজা কাপড়ে থাকলে অসুক করবে। আমরা যাই—'

টগররা আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে শেষ রাতের ঝাপসা অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটি সাধারণ মানুষের কাহিনি

এবার কিছু আগেই এসে পড়েছে বৈজুলালরা। বৈজুলালেরা বলতে মিরজাপুরের নৌটঙ্কির দলটা। মেলা জমতে এখনও বেশ দেরি। আগে এসে তাঁবু টাঙিয়ে সামিয়ানা খাটিয়ে বসতে পারলে অনেক সুবিধা। অবশ্য মেলায় জায়গা পাওয়া নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। কেননা এক বছরের মেলা শেষ হতে না হতেই পরের বছরের জন্য জায়গা ইজারা করে রাখতে হয়। যখন হোক এলেই হল, বন্দোবস্ত করা জমি পাওয়া যাবেই। বৈজুলালদের জমি গেল বছরই ব্যবস্থা করা আছে।

আগে আসার সুবিধাটা অন্য দিকে থেকে। প্রথমত, মেলায় কেমন লোকজন হবে এবং সেই অনুপাতে লাভের অঙ্কটা কিরকম দাঁড়াবে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অন্য দলগুলো কিভাবে তৈরি হয়ে এসেছে, কোনো চমকপ্রদ পালা নামিয়ে বাজিমাত করে দেবে কিনা—সেখানে লোক লাগিয়ে এসবের হদিস পেলে নিজেদের পালাগুলো মেজে ঘষে জেল্লা ফুটিয়ে আরো আকর্ষক করে তোলা যায়। তা ছাড়া প্রচারের একটা দিক আছে। ইদানীং

সেটাই সব থেকে বড় দিক। কাড়া-নাকড়া পিটিয়ে যে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে পারবে তারই দিগ্বিজয়। উট ভাড়া করে, তার পিঠে মাইক তুলে হিন্দি ফিল্মের গানের ফাঁকে ফাঁকে দলের রঙিন হ্যান্ডবিল বিলি করাই একালের রেওয়াজ। অনেকে আবার উট বা হিন্দি গানে খুশি না—ক্লাউনের সাজে কাউকে সাজিয়ে টাঙ্গায় তুলে মেলাময় ঘোরাতে ঘোরাতে হ্যাণ্ডবিল ছড়াতে থাকে। মোট কথা, যেভাবে হোক নজরে পড়া। আগে এসে যে যেমন জমি তৈরি করে রাখতে পারবে আখেরে তার তেমন লাভ। অর্থাৎ আগে এলে এখানে বাঘে খায় না, সোনা মেলে।

কুলে-শীলে নৌটঙ্কি জিনিসটা বাংলাদেশের যাত্রাপালার কাছাকাছি। তার সঙ্গে ইদানীং থিয়েটারি ঢং মিশতে শুরু করেছে। একেবারে হাল আমলে আবার হিন্দি সিনেমার কিছু কিছু অনধিকার প্রবেশও ঘটে গেছে। একটি যৎসামান্য পালাকে ঘিরে এতে থাকে প্রচুর নাচ, প্রচুরতর গান এবং হাস্যরসের নামে অপর্যাপ্ত ভাঁড়ামি এবং সেক্সের বাড়াবাড়ি। খাঁটি জনতার জিনিস।

সাবেক আমলে বাংলাদেশের যাত্রার দলগুলো ছিল মেয়েমানুষ বর্জিত। স্ত্রী-ভূমিকাগুলো পুরুষেরাই অভিনয় করত। নৌটঙ্কিতে কিন্তু বিপরীত রীতি। পুরুষ এবং মেয়েমানুষ—দুই-ই এখানে পাওয়া যাবে। উভয়ের যৌথ নাচে-গানে-অভিনয়ে এই দলগুলো গড়ে উঠেছে।

নৌটঙ্কির দলগুলোকে ডাকতে হয় না। সমস্ত উত্তর ভারতে অর্থাৎ আর্যাবর্তে যেখানে যত মেলা হয় সেখানেই রবাহুতের মতো এরা হাজিরা দেয়। তারপর নেচে গেয়ে এবং ভাঁড়ামোর গাঁজলা রসে জনতাকে মাতিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের হিসেব বুঝে নেয়। এটাই তাদের জীবিকা। তবে বড় দলগুলোর কথা আলাদা। তাদের আগে থেকে অনেক সাধ্যসাধনা করে আনাতে হয়।

বৈজুলালেরা এবার যখন এখানে এল তখনও আকাশ থেকে কার্তিকের হিম ঝরতে শুরু করেনি। এখানে অর্থাৎ হরিহরছত্রের মেলায়। গণ্ডকী আর গঙ্গা নদীর সঙ্গমে এই মেলাটির তুলনা সারা আর্যাবর্তে—শুধু আর্যাবর্তে কেন, সারা দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভারতের এটি সব চাইতে বড় মেলা। চলেও অনেকদিন ধরে, মেয়াদ পুরো একটি মাস।

বৈজুলালেরা যখন এল তখনও চারিদিকে সাড়া পড়েনি। সবে মাত্র দু-চারখানি বয়েল গাড়ি কি ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা আসতে শুরু করেছে। নইলে মেলার বিশাল শূন্য চত্বরটা তখনও খাঁ খাঁ করছিল।

তারপর ধীরেসুস্থে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বৈজুলালদের প্রকাণ্ড তাঁবু উঠল। তার ভেতর ঝালর দেওয়া শামিয়ানা টাঙানো হল।

বৈজুলালদের তাঁবু আর শামিয়ানা বসতে বসতে মেলা সরগরম হয়ে উঠতে লাগল। প্রথম প্রথম সারাদিনে এক আধখানা বয়েল গাড়ি কি ঘোড়ার-টানা টাঙ্গা আসছিল। এখন চারিদিকে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে গাড়ির পর গাড়ি আসছে। দিনের বেলা তো আসছেই, রাত্তিরেও আসার বিরাম নেই। শুধু কি বয়েল গাড়ি আর টাঙ্গাই, লরি পর্যন্ত আসছে। ফলে গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমে এই মেলাটার মাথায় দিবারাত্রি সর্বক্ষণ ধুলোর মেঘ অনড় হয়ে আছে।

গাড়িগুলো আসছে আর যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় ক্ষিপ্র হাতে তাঁবু তুলে দোকান সাজিয়ে ফেলছে। ক'দিন আগেও মেলার যে চত্বরটা সুনসান ছিল, দেখতে দেখতে তার শূন্যতা ঘুচে

যাচ্ছে। তাঁবুতে তাঁবুতে আর দোকানে দোকানে সমস্ত জায়গাটা এখন ছয়লাপ। কিন্তু এ সবই ভূমিকা। ক'দিন পর মানুষের ভিড়ে, চিৎকারে, হল্লায়, বিকিকিনিতে পুরো একমাসের মেয়াদে যে প্রমত্ত উৎসবটা শুরু হবে—এ হল তারই ভূমিকা। উপমা দিয়ে বলা যায়, দরবারি গানের আগে যে বিলম্বিত লয়ের আলাপ, এখন যেন তারই পালা চলছে।

বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে এবার মেলায় এসেছে বৈজুলাল। কিংবা বলা যায়, দুরন্ত আবেগের স্রোতে ভাসতে ভাসতেই বুঝি এসেছে।

মিরজাপুরের নৌটঙ্কির দলটার সঙ্গে বিশ সাল এই মেলায় আসছে বৈজুলাল। প্রথম যেবার এসেছিল সে তিরিশ বছরের হট্টাকট্টা জোয়ান। হিসাব অনুযায়ী তার বয়স এখন পঞ্চাশ। তিরিশ আর কুড়ির যোগফলেই শুধু পঞ্চাশ, নইলে সময় বৈজুলালের গায়ে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। দু-টারটে চুলের রং বদলানো আর মুখে অতিরিক্ত ক'টি আঁচড় দেওয়া ছাড়া বয়স যেন স্থির হয়ে আছে। এই পঞ্চাশেও তার পিঠ টান টান, বুক পাথরের মতো নিরেট, হাত-পায়ের মোটা হাড়গুলোতে প্রচুর তাকত।

নৌটঙ্কি দলের সে মালিক না। বড় গাইয়ে বাজিয়েও নয়। তার কাজ হচ্ছে আসরের পেছন দিকে। নৌটঙ্কি দলে যত মানুষ আছে তাদের খেতে এবং স্নান করতে যে পরিমাণ জল দরকার, সবই দূর-দূরান্ত থেকে তাকে একাই বয়ে আনতে হয়। যেখানে যে মেলাতেই তাদের দল যাক, বৈজুলালকে জল বইতে হবেই।

প্রথম প্রথম এখানে আসার মধ্যে আনন্দ বা সুখ কোনোটাই ছিল না। নিতান্ত পেটের ভুখের জন্য আসত বৈজুলাল। কিন্তু গত দশ বছর ধরে এই আসাটার গায়ে ভিন্ ভাবের রং ধরেছে। রং ধরিয়েছে সেই মেয়েটা—যার নাম মোতিয়া।

মেয়ে! মোতিয়াকে কি আর মেয়ে বলা যায়? সে-ও তো চল্লিশ পার হতে চলেছে।

বৈজুলালের এবারের আসাটা ব্যতিক্রম। মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছে, এই মেলায় এটাই তার শেষ আসা। এখানে কেন, কোনো মেলাতেই সে আর যাবে না। নৌটঙ্কির দল ছেড়ে দেবে বৈজুলাল। বানজারাদের মতো ভেসে ভেসে বেড়াতে তার আর ভালো লাগে না। তার পঞ্চাশ বছরের জীবন এবার একটু বিশ্রাম চায়। মতিহারীর কাছে নিজেদের সেই গাঁওটিতে মোতিয়াকে নিয়ে এবার সে সংসার পাতবে। সেজন্য তৈরিও হয়ে এসেছে বৈজুলাল। নগদ তিনশো টাকা নিয়ে এবার মেলায় এসেছে সে।

তিনশো টাকা! টাকা তো নয়, ওগুলো মোতিয়ার মুক্তির দাম।

কোমরের কাছে একটা গোপন থলেতে এক টাকার তিনশো খানা নোট পাকিয়ে পাকিয়ে বেঁধে রেখেছে বৈজুলাল। সর্বক্ষণ ওই টাকাগুলোকে যখের মতো পাহারা দিয়ে চলেছে সে। এ জন্য তার চোখকান রক্তমাংস সর্বক্ষণ সজাগ।

আশেপাশে কেউ না থাকলে গেঁজেটা খুলে প্রায়ই টাকাগুলো গুনে গুনে দেখে বৈজুলাল। তার ভয়, এই বুঝি ওগুলো খোয়া গেল। যখন দেখা যায় পুরোপুরি তিনশোই আছে তখন সে নিশ্চিন্ত।

টাকার ব্যাপারে বৈজুলালের সতর্কতার শেষ নেই। নিজের শরীরের সঙ্গে ওগুলোর স্পর্শ সে ধরে রেখেছে। এর মধ্যে থেকে একটি পয়সা নিলেও কারো রেহাই নেই। পৃথিবীর যে প্রান্তেই সে যাক তার পিছু পিছু প্রেতের মতো ধাওয়া করে যাবে বৈজুলাল।

তিনশো টাকা! এই টাকা দিয়ে মোতিয়ার মুক্তি কিনবে বৈজুলাল। শুধু মোতিয়ার মুক্তিই কি, সেই সঙ্গে নিজের সমস্ত জীবনের একটি রমণীয় সাধও কিনবে সে।

মোতিয়া! মোতিয়া! মোতিয়া!

মোতিয়াও নৌটাঙ্কি দলের মেয়ে। তাদের দলটা অবশ্য ভিন্ন। তারা আসে সুদূর ভাগলপুর থেকে। আর বৈজুলালদের দলটা যায় মিবজাপুর থেকে। দশ বছর—অর্থাৎ প্রায় একযুগ আগে এই মেলাতেই মোতিয়ার সঙ্গে প্রথম আলাপ বৈজুলালের।

নদীর কিনার ঘেঁষে যেখানে বৈজুলালদের তাঁবু পড়েছে ঠিক তার পাশের জায়গাটাই হচ্ছে মোতিয়াদের।

এ বছর মোতিয়ারা এখনও এসে পৌঁছয়নি। তাদের জায়গাটা খালিই পড়ে আছে। বৈজুলাল জানে, দু-চার দিনের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে। সেই ক'টা দিনেরই শুধু অপেক্ষা। তারপরেই ওদের দলের মালিকের মুখে তিনশো টাকা ছুড়ে দিয়ে মোতিয়ার হাত ধরে সে চলে যাবে মতিহারীর কাছে তাদের সেই গাঁও-এ।

এবার মেলায় আসার পর থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে আছে বৈজুলাল। নৌটঙ্কি দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে মোতিয়াকে নিয়ে ঘর বাঁধবে---এই সুখের স্বপ্নটা বিচিত্র আচ্ছন্নতার মতো যেন তাকে ঘিরে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে বৈজুলাল, ঘুরছে ফিরছে আর নৌটঙ্কি দলের লোকদের জন্য সারা দিন নদী থেকে জল তুলে আনছে। সব কিছুই সে করছে বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে। কখন---কখন ভাগলপুরেব দলটা আসবে, সেই মুহূর্তটির জন্য বৈজুলাল একেবারে অস্থির হয়ে আছে।

দিনরাত ধুলো উড়িয়ে গাড়ি আর মানুষ আসছে মেলায়। যখনই ভৈসা কি বয়েল গাড়ি আসতে দেখা যায় তখনই ৈ.জুলাল ছোটে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত গাড়িগুলো পাশের ফাঁকা জায়গাটায় এসে থামে না। অন্য দিকে চলে যায়।

ভাগলপুরের দলটা এখনও আসছে না। সেজন্য বৈজুলালের দুর্ভাবনা যে হয় না তা নয়। তবে সেটাকে আমল দেয় না সে। বৈজুলাল জানে, আজ হোক কাল হোক, ভাগলপুরের দলটাকে একসময় না একসময় আসতেই হবে। না এসে তারা পারবে না।

যতদিন ভাগলপুরের দলটা না আসছে ততদিন বৈজুলাল অনবরত মোতিয়ার কথা ভেবে যাবে। মোতিয়ার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপটার কথা বার বার মনে পড়ছে তার। শুধু কি প্রথম দিনের আলাপটাই, গত দশ বছরের খুঁটিনাটি সব কিছুই মিছিল করে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেলার চিৎকার, হল্লা, মাথার ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে ধুলোর মেঘ—কিছুই, কিছুই যেন বৈজুলালের মনোযোগকে নাড়া দিতে পারছে না। তার আচ্ছন্ন অস্তিত্ব জুড়ে এবার শুধু একটি মাত্র নারীই রয়েছে। তার নাম মোতিয়া।

মনে পড়ে, বিশ বছর ধরে এই মেলায় আসছে সে। প্রথম দশটা বছর তার আসার মধ্যে কোনো আনন্দ ছিল না। থাকবেই বা কী করে?

নৌটঙ্কির দলের বৈজুলালের জীবন অনেকটা বান্ধুয়া মজুরের (বাঁধা মজুর) মতো। খোরাকি আর মাসিক পঁচিশটা টাকার জন্য দিবারাত্রি এখানে তাকে জল টানতে হয়।

খোরাকি! সে শুধু নামেই। নইলে নৌটাঙ্কি দলের সব লোকের খাওয়া হয়ে গেলে যা পড়ে থাকে তাতে পেট ভরার কথা নয়। অন্তত সারাদিন অসুরের মতো খাটুনির পর তো নয়ই। তবু এ দলেই থাকতে হয়। কেননা, আধপেটা হলেও তো কিছু মেলে এখানে। নইলে ভুখাই মরতে হবে।

এমন সাধের চাকরিটাও ছ'মাসের বেশি থাকে না। অবশ্য বেশির ভাগ নৌটঙ্কির দলই স্থায়ী, আর্যাবর্তের ছোটখাটো শহর আর গঞ্জে গঞ্জে বছরের বারো মাসই টহল দিয়ে ফেরে। কিন্তু মিরজাপুরের দলটার রীতিনীতি আলাদা। দলের যিনি মালিক অর্থাৎ সীয়াশরণজির মর্জি অন্যরকম। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন—এই ছ'টা মাস ভ্রাম্যমাণ দল নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। বাকি ছ'মাস দেশে ফিরে সংসার-ধর্ম পালন করেন। সুতরাং বাকি ছ'টা মাস পেটের ভুখের জন্য কী না করতে হয় বৈজুলালকে! কখনও সে হাটের কুলি, কখনও জনার কী ভুট্টা খেতের কৃষাণ, আবার কখনও একেবারে হাত-পা গুটনো বেকার।

প্রথম দশটা বছর অসীম ক্লান্তি নিয়ে এখানে যাওয়া-আসা করেছে বৈজুলাল। কিন্তু তার পরের দশ বছরে মেলায় এসে বৈজুলালের মনে হয়েছিল, জগতে তার চাইতে সুখী কেউ নেই। মনে হয়েছিল, তার প্রাণের সকল দিয়ে ঢেউ উঠেছে। পৃথিবীর রংই বদলে গিয়েছিল বৈজুলালের চোখে।

সেবার মেলায় এসে বৈজুলালেরা অবাক। নদীর কিনার ঘেঁষে প্রতি বছর যেখানে তাদের তাঁবু ওঠে তার পাশের জায়গাটা এতকাল খালিই পড়ে থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু সেবার এসে দেখা গেল তারা আসার আগেই সেখানে একটা তাঁবু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল ওটাও একটা নৌটঙ্কি দল—আসছে সুদূর ভাগলপুর জেলা থেকে। এসেই উটের পিঠে হিন্দি গানের রেকর্ড বাজিয়ে আর হ্যান্ডবিল বিলিয়ে মেলা সরগরম করে তুলেছে।

খবরটা খুব প্রীতিকর নয়। পৃথিবীর আর যেখানেই সহাবস্থান সম্ভব হোক, নৌটঙ্কি দলগুলোর মধ্যে একেবারেই নয়।

একই পেশার দু'টি দল পাশাপাশি তাঁবুতে থেকে জনতার মনোরঞ্জন করবে, এতখানি সহনশীলতা আর যার থাক মিরজাপুরের নৌটঙ্কি দলের মালিক সীয়াশরণজির ছিল না। তীব্র বিদ্বেষে চোখদু'টো কুঁচকে গিয়েছিল তাঁর। কপালে জটিল গভীর অসংখ্য রেখা ফুটে বেরিয়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বিরক্ত সুরে তিনি বলেছিলেন, 'শালে ভুচ্চরের ছৌয়ারা!' যাদের উদ্দেশে এই মধুর সম্ভাষণ তাদের কান পর্যন্ত অবশ্য কথাগুলো পৌঁছয়নি।

আক্রোশ যত প্রবলই হোক, সীয়াশরণজির কিছু করার ছিল না। ভাগলপুরের দলটাও তাঁদের মতো নগদ কড়ি গুনে দিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিয়েছে। আর যাই হোক, মেলা থেকে তাদের ওঠানো যাবে না।

ওঠানো না যাক, মনের ভেতর বিদ্বেষ পুষে রাখলে কেউ বাধা দেবার নেই। ভাগলপুরের দলটার ছোটখাটো ক্ষতি যে না করা যায় তা-ও নয়। সরাসরি যুদ্ধে না নেমে সীয়াশরণজি পেছন থেকে আক্রমণ শুরু করলেন। প্রথমত, নিজের লোকজনদের বলে দেওয়া হল, তারা যেন ভাগলপুরের দলটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, মুখের কথাটিও না বলে। ওদের সঙ্গে যে কথা বলবে তিনি তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেবেন। দ্বিতীয়ত, ভাড়াটে গুণ্ডা জোগাড় করে দলটার পেছনে লেলিয়ে দিলেন তিনি। ফলে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল রাতের অন্ধকারে

ওদের তাঁবুর দড়ি শামিয়ানা সুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে আছে। উটের পিঠে মাইক তুলে যখন ওরা হ্যাণ্ডবিল ছড়াতে বেরুত তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ইট গিয়ে পড়ত। কিংবা পালা চলার সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে এমন খিস্তি খেউড়, চিৎকার আর টিটকিরি শুরু হয়ে যেত যে পালা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া ওদের উপায় থাকত না।

শত্রুতাটা কোত্থেকে হচ্ছে দু-চার দিনের মধ্যেই তা টের পেয়ে গিয়েছিল ভাগলপুরের দলটা। সব জানার পর তারাও হাত-পা গুটিয়ে থাকেনি, বরং হাতিয়ারে শান দিতে বসেছিল। মেঘেব আড়াল থেকে অগ্নিবাণ এলে সেটা ঠাণ্ডা করার জন্য পালটা বরুণ বাণ তো ছুড়তে হবে।

অতএব দেখা যেতে লাগল, মিরজাপুরের তাঁবুর দড়িও কাটা হচ্ছে। টাঙ্গার ক্লাউন নিয়ে যখন তারা মেলা সরগরম করতে বেরুত তখন তাদের ওপরও ইট পড়তে লাগল।

যা ছিল আড়ালে, মনের অন্ধকার বিবরে, যা ছিল সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে, ক্রমশ পারার ঘায়ের মতো ফুটে বেরুতে লাগল। দু পক্ষের রেষারেষিটা একদিন পর্দার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে সদর রাস্তায় একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। প্রকাশ্যেই তখন এক পক্ষ আরেক পক্ষের উদ্দেশে খিস্তি ছুড়ত। বিরুদ্ধ পক্ষ উত্তরে যা বলত, আর যাই হোক তা শাস্ত্রের বাণী নয়। কথায় কথায় তাঁবু থেকে তারা লাঠি বার করে আনত এবং পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাদের আরক্ত চোখে যা ফুটে বেরুত তাকে বন্ধুত্ব বলা যায় না।

দশ বছর আগে পাশাপাশি তাঁবু দু'টো যেন নৌটঙ্কিব আসর নয়, দু'টো দুর্গ কিংবা যুদ্ধশিবির।

দুই দলের এই উত্তেজনা, আক্রমণ, পালটা আক্রমণ—কোনো কিছুই বৈজুলালকে ছুঁতে পারেনি। ওপর মহলে অর্থাৎ মালিকদেব মধ্যে যে বিদ্বেষ চলছিল তা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না। সে ফুরসতই বা তার কোথায়?

জল বয়ে বয়ে বৈজুলালের কাঁধে উটের কুঁজের মতো কড়া পড়ে গিয়েছিল। সারাদিন খাটুনির পর এমন উদ্যম আর অবশিষ্ট থাকত না যাতে ভাগলপুরের দলটার সঙ্গে যুদ্ধে নামা যায়। তখন তার ইচ্ছা করত পেট ভরে কিছু খেয়ে কোথাও না কোথাও অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিতে।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কি সব মেলে!

মনে পড়ে নদী থেকে জল তুলতে তুলতে সেদিন বিকেল হয়ে গিয়েছিল। ঠিক বিকেল নয়, বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি জায়গায় সময়টা ছিল থমকানো।

সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি বৈজুলালের। পেটের ভেতর নাড়িগুলো পাক খেতে শুরু করেছিল। তখন্য মেলায় অন্ধকার নামেনি, পশ্চিমের ভাসমান মেঘে বেলাশেষের রক্তাভা লেগে ছিল। তবু বৈজুলালের মনে হচ্ছিল, সব কেমন যেন ঝাপসা। কিছুই সে যেন বুঝতে পারছিল না। মেলার চিৎকার, হট্টগোল—সমস্তই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বুঝি। খিদের চোটে শুধু মনে হচ্ছিল, কানের কাছে ঝিঁঝিরা অবিরাম ডেকে চলেছে।

তাঁবুর সামনের দিকটায় নৌটঙ্কির শামিয়ানা। পেছন দিকে একখানা তেরপল টাঙিয়ে তার তলায় রসুইয়ের ব্যবস্থা। মনে আছে, সোজা সেখানে চলে গিয়েছিল সে।

ভুনিরাম পণ্ডিতের ওপর ছিল রসুইখানার ভার। লোকটা নৌটঙ্কির আসরে মন্ত্রী সাজে। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে রান্নাবান্নার অতিরিক্ত দায়িত্বটা পেয়েছে। তাতে লোকসান হয়নি তার, মাইনে ছাড়াও রান্না বাবদে মাসিক আরো দশ টাকা বেশি পেত।

যখন বৈজুলাল সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন ভুনিরামের হেঁসেল বন্ধ হয়ে গেছে। পেতলের বড় বড় বাসনগুলো লোক দিয়ে মেজে ঘষে ধুইয়ে মুছিয়ে সাজিয়ে রাখছিল সে।

বৈজুলাল বলেছিল, 'পণ্ডিত, খেতে দাও। ভুখের ঠেলায় আন্ধেরা দেখছি।'

'এ হে—হে—' বেতের মতো পাকানো প্রৌঢ় শীর্ণ ভুনিরাম মাপা আধ হাত জিভ কেটে, তালুতে চুক চুক শব্দ করে বলেছিল, 'হো রামজি---'

বৈজুলাল অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'কা হুয়া?'

কপালে চন্দনের তিলক, গলায় চাঁদির চৌকো তক্তি, পরনে একখানা চিটচিটে ফতুয়া আর হাঁটুঝুল ধুতি—এই হল ভুনিরামের সাজসজ্জা। মাথার চুল চামড়া ঘেঁষে নিরপেক্ষভবে সমান করে ছাঁটা। তার মাঝখানে উদ্ধত একটা টিকি আকাশের দিক খাড়া হয়ে আছে। লোকটা বিচিত্র মধুর হেসে বলেছিল, 'তোর খানা রাখতে বিলকুল ভুলে গেছি।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই বৈজুলালের মনে হয়েছিল, মাথার ভেতর একটা শিরা বুঝি ছিঁড়ে গেছে। কিংবা কেউ বুঝি তার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে দিয়েছে। ভরপেট খাদ্য কোনোদিনই তো মেলে না। তার ওপর মাঝে মাঝেই তার জন্য খাবার রাখতে ভুলে যায় ভুনিরাম। কী করবে, কী বলবে—সেই মুহূর্তে যেন বুঝে উঠতে পারেনি বৈজুলাল। শুধু একটা ক্রুদ্ধ হিংস্র জানোয়ারের মতো ভুনিরামের দিকে তাকিয়েছিল সে।

লোকটা দাঁত বার করে আবার বলেছিল, 'তা এক কাজ করিস, রাত্তিরে দু'বেলার খানা খাস।'

এবারও কিছু বলেনি বৈজুলাল। শুধু তার ইচ্ছা হচ্ছিল কবুতরের মতো ভুনিরামের সরু গলাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

একটা দুর্ঘটনা সেদিন হয়তো ঘটে যেত কিন্তু, তার আগেই রসুইখানা থেকে চলে গিয়েছিল ভুনিরাম। আর ধুলোর ওপর বসে পড়ে দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে অসহ্য খিদের জ্বালায় অবোধ বালকের মতো অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছিল বৈজুলাল।

কান্নাটা একটানা কতক্ষণ চলেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় একটা স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল, 'এ আদমি, এ—'

প্রথম বার খেয়াল করেনি বৈজুলাল। দ্বিতীয় বার ডাকটা কানে যেতেই চকিত হয়ে মুখ তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল।

খানিকটা দূরে ভাগলপুরের দলটার রসুইখানা। বৈজুলালদের মতোই তেরপল খাটিয়ে তাদেরও রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল আওরতটা।

আগেও বার দুই-তিন তাকে দেখেছে বৈজুলাল। দেখেছে মাত্র, সে দেখার মধ্যে অন্য কিছু ছিল না। নিস্পৃহ চোখে যেভাবে মানুষ গাছপালা বা মাঠঘাট ধানখেত দেখে সেইভাবে দেখেছিল। নদীর জল বইতে বইতেই তো তার দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। তবু এটুকু সে আন্দাজ করেছিল, ভাগলপুরের দরটার রসুইখানা ওই মেয়েমানুষটির হাতে।

কত বয়স হবে তার? বছর তিরিশেক তো বটেই। গায়ের রং মাজা মাজা। শক্ত ধাতের চেহারা।

খুঁতও আছে তার। মুখময় চেচকের (বসন্ত) দাগ। একটি চোখের ওপর সাদা সরের মতো ছানি। এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে তাকে দেখতে ভালোই লাগে।

চোখাচোখি হতেই আওরতটা হাতছানি দিয়েছিল।

প্রথমটা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থেকেছে বৈজুলাল। তারপর পায়ে পায়ে কাছে চলে গিয়েছিল। মেয়েমানুষটির চোখে চোখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'ডাকছ কেন?'

একটি পুরুষের চোখ তার চোখের ওপর। আওরতটা বুঝিবা বেশরম। সে নজর সরিয়ে নেয়নি। ঈষৎ ঝুঁকে বলেছিল, 'তুমহার ভুখ লেগেছে, না?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়নি বৈজুলাল। চোখ নামিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে, 'হ্যাঁ, লেকেন—'

'কী?'

'তুমি জানলে কী করে?'

আওরতটা হেসেছিল, 'তোমাদের পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলছিলে, এখান থেকে আমি শুনেছি। তারপর বসে বসে কাঁদছিলে, নিজের আঁখে দেখেছি। ভুখটা খুব জোর লেগেছে, তাই না?'

বিষণ্ণ স্বরে বৈজুলাল বলেছিল, 'হাঁ, বহুত জোর।' বলতে বলতেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, 'সুবে থেকে পানি বইতে বইতে জিন্দেগি একদম চুর চুর হয়ে যায়। তার ওপর খানা যদি না মেলে, বল—এ শয়তানি ভালো লাগে কারো? হারামজাদা ভূচ্চর কহাঁকা!'

সে কথার উত্তর না দিয়ে আওরতটা বলেছিল, 'একটা কথা—'

'কী?'

'তোমাকে যদি কিছু খেতে দিই, খাবে?'

সেই মুহূর্তে পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। অসংকোচে বৈজুলাল বলেছিল, 'দিলে কেন খাব না? জরুর খাব।'

আর কিছু শুধোয়নি আওরতটা। বৈজুলালকে বসিয়ে একটা কলাই-করা থালায় খানকয়েক চাপাটি, অড়হরের ডাল আর ামানা একটু পুদিনার চাটনি এনে দিয়েছিল।

সেই মুহূর্তে দু-দলের রসুইখানায় কোনো লোকজন ছিল না। ভুনিরাম পণ্ডিত আগেই মিরজাপুরের হেঁসেল থেকে চলে গেছে. খুব সম্ভব ভাগলপুরের দলটারও খাওয়া দাওয়ার পালা চুকে গেছে। খাবার সময়টুকু বাদ দিলে তাঁবুর পেছন দিকে দু-দলের কেউ বড় একটা আসে না।

পাওয়া মাত্র গোগ্রাসে খেতে শুরু করেছিল বৈজুলাল। আর মায়ের মতো পরম মমতায় তার খাওয়া দেখছিল আওরতটা।

আধাআধি খাবার পর খিদের তেজ যখন খানিকটা মরে এসেছে সেই সময় বৈজুলাল বলেছে, 'তুমি আজ খেতে না দিলে জরুর মরে যেতাম।'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক কী রীতি তা জানা নেই বৈজুলালের। সে বলে যাচ্ছিল, 'ভগোয়ান রামজি তুমহার ভালাই করবে।'

আওরতটা উত্তর দেয়নি। সে বৈজুলালের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল।

বৈজুলাল আবার বলেছিল, 'ওই শালে গিধ্‌ধড়কে বচ্চে ভুনিরাম—দু-চার রোজ বাদ বাদই ভূচ্চরের ছৌয়াটা আমার জন্যে খানা রাখতে ভুলে যায়। আমি জানি, আমার খানাটা ও বেচে দ্যায়। দশ শাল নৌটঙ্কির দলে ঢুকেছি। পেট ভরে কোনোদিন খেতে তো পেলামই না, তার ওপর মাঝে মাঝে পুরা ভুখা থাকতে হয়। এক এক সময় কী ইচ্ছা হয় জানো?

'কী?'

'দলের মাথায় তিন লাথ মেরে আর তিন বার থুক দিয়ে কোথাও চলে যাই।'

এ কথার উত্তরে আওরতটা কিছু বলেনি।

একটু চুপচাপ। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হঠাৎ কী যেন মনে হয়েছিল বৈজুলালের। থালা থেকে তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে সে বলেছিল, 'আরে—'

কিছুটা অবাক হয়ে আওরতটা শুধিয়েছে, 'কী হল?'

'এ তুমি কার খানা আমাকে দিলে?'

'যারই হোক, তুমি খাও।'

'নেহী, বলতে হবে তোমাকে। বল এ কার খানা? জরুর তুমহার।'

'হাঁ, আমারই। তাতে কী হয়েছে?'

একটু ভেবে নিয়ে বৈজুলাল বলেছিল, 'তুমি ভুখা থেকে আমাকে খাওয়ালে!'

আওরতটা বলেছিল, 'অতশত তোমাকে ভাবতে হবে না। আওরতেরা খেতে দেয়, পুরুষেরা খায়। দুনিয়ায় এই হল কানুন। তোমাকে খেতে দিয়েছি, শির নামিয়ে খেয়ে যাবে। ব্যস। কার খানা, কঁহাসে মিলি—অত কথায় তোমার কী দরকার?'

তবু বৈজুলালকে থামানো যায়নি। আওরতটা যখন খাওয়ার কথা বলে তখন তার জ্ঞান ছিল না। শুধু কি জ্ঞানই, লজ্জা-কুণ্ঠা—কিচ্ছু না। পেটের খিদেয় তখন তার মাথায় আগুন জ্বলছে। খিদের তীব্রতা খানিকটা কমলে তার হুঁশ ফিরে এসেছিল। জোর করেই বৈজুলাল জেনে নিয়েছিল, যে খাদ্য সে খাচ্ছে সেটা ওই আওরতটারই। জানার পর লজ্জার শেষ ছিল না তার। বলেছিল, 'ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কী করলে!'

'ঠিকই করেছি। আমার এখন ভুখ নেই।'

'ঝুট বলছ।'

'সচ বলছি, আমার ভুখ নেই।'

'সারা দিন গতরচুরণ খেটে রসুই করেছ আর তোমার ভুখ লাগেনি—একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বৈজুলাল বলেছিল, 'কভী নেহী, কভী নেহী।'

প্রসঙ্গটা এড়াবার জনাই বোধহয় আওরতটা তাতাতাড়ি বলে উঠেছিল, 'তুরন্ত খেয়ে নাও। জানো তো তোমাদের দলের সঙ্গে আমাদের দলের দোস্তি নেই। যা আছে তা হল বিলকুল দুশমনি। আমি তোমাকে এখানে বসে খাওয়াচ্ছি—কেউ যদি দেখে ফেলে, দু'জনেরই বিপদ হবে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। অতএব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্রুত হাত চালিয়ে বাকি রুটি ক'খানা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল বৈজুলাল। আর সেই সময় আওরতটি জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার কী নাম?'

নিজের নাম বলে পালটা প্রশ্ন করেছিল বৈজুলাল, 'তোমার?'

'মোতিয়া।'

আওরতটির অর্থাৎ মোতিয়ার নাম জানা হলে আর কী বলবে, ভেবে পায়নি বৈজুলাল।

মোতিয়াই বরং বলে উঠেছিল, 'একটা কথা বলছিলাম—'

'কী?'

'যখন খিদে পাবে আমার কাছে চলে এস।'

বৈজুলাল হেসেছিল, 'নিজেকে ভুখে মেরে আমার পেট ভরাবে তো?'

মোতিয়াও হেসেছিল, 'কী যে বল, তার ঠিক নেই। নিজে না খেয়ে রোজ রোজ তোমাকে খাওয়াব এত বড় দিল কি আমার আছে? তবে—'

'কী?'

'আমাদের দলের রসুইখানার ভার আমার হাতে, তা জানো তো?'

'জানি।'

'আমার যদি ইচ্ছে হয়, দু-চারটে লোককে খাইয়ে দিতে পারি। তাতে কারো খানায় টান পড়বে না। সমঝালে?' বলে চোখের একটা ইঙ্গিত করেছিল মোতিয়া।

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি বৈজুলালের।

সেদিন বৈজুলালকে নিজের ভাগের খাবার খাইয়ে একটা বিচিত্র খেলাই বুঝি শুরু করেছিল মোতিয়া। তারপর প্রায় রোজই সবার খাওয়া দাওয়া সারা হলে এবং দু-দলের রসুইঘরে ফাঁকা হয়ে গেলে বৈজুলালকে ডেকে নিয়ে যেত সে। ডেকেই খাওয়াতে বসাত।

খাওয়াব ব্যাপারে বৈজুলাল যে খুব একটা নিরুৎসুক ছিল তা নয়। তবে খেতে খেতে অত্যন্ত লজ্জা হত তার। বলত, 'রোজ রোজ এভাবে—'

মোতিয়া ধমক দিয়ে উঠত, 'তোমাকে আর শরমাতে হবে না। ভুনিরাম পণ্ডিত কী খেতে দেয়, নিজের আঁখে তা দেখেছি। এমন হট্টাকট্টা মরদ তুমি, তার ওপর জল টানার মেহনত। ওই খেয়ে ক'দিন বাঁচবে? জরুর একটা বুখার বাধিয়ে বসবে।'

সহানুভূতির কথায় বুকের ভেতর ভাঙচুর শুরু হয়ে যেত বৈজুলালের। কৃতজ্ঞতায় চোখদু'টি বুঝি ঝাপসা হয়ে আসত। গাঢ় কাঁপা গলায় সে বলত, 'জানো, তোমার মতো এমন করে আমাকে আর কেউ কোনোদিন বলেনি। আর—'

'কী?'

'এমন করে আমাকে কাছে বসে কেউ কোনোদিন খাওয়ায় নি।'

'সচ বলছ?'

'হাঁ সচ। রামজি কসম।'

'কেন, তোমার মা নেই?'

'নেহী।'

'বহেন?'

'নেহী।'

'তা হলে—' বলতে বলতে হঠাৎ থমকে যেত মোতিয়া।

'তা হলে কী? থামলে কেন? বল।' বৈজুলাল উদ্‌গ্রীব হত।

তক্ষুনি কিছু বলত না মোতিয়া। চোখ নামিয়ে অলস আঙুলে মাটিতে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে ফিসফিসিয়ে উঠত, 'তুমি শাদি করনি?'

মোতিয়ার কথা শেষ হত কি হত না। মেলার ফেনায়িত হট্টগোলকে স্তব্ধ করে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠত বৈজুলাল।

মোতিয়া বলত, 'হাসছ যে?'

'তোমার কথা শুনে।'

'কী এমন হাসির কথাটা তোমাকে বলেছি?'

'হাসির কথা নয়?'

ভারী গলায় মোতিয়া বলত, 'জরুর হাসির কথা নয়।'

কৌতুক থামিয়ে গম্ভীর মুখে বৈজুলাল বলত, 'এমন একটা কথা তুমি কিভাবে ভাবতে পারলে তা-ই ভেবে আমি তাজ্জব বনে যাচ্ছি। আমার মতো হতচ্ছাড়ার হাতে কোন বাপ লেড়কি তুলে দেবে? নৌটঙ্কির দলে জল বয়ে বিশগো রুপাইয়া মেলে। তা-ও তো ছ'মাসের নৌকরি। ওই রুপাইয়ায় নিজে খাব, না জরু পুষব?'

একটু থেমে মাথা নেড়ে আবার শুরু করত, 'না, কেউ নেই আমার। ইস দুনিয়ামে কোঈ নেহী হামনিকো। বাপ-মা-ভাই-বহেন-জরু—কেউ না। তিন বরিষ বয়েসে মা মরেছে, পাঁচ বরিষে বাপকে খতম করেছি। তারপর বছর কয়েক এক চাচার কাছে ছিলাম। মনে আছে দিনের বেলা বিশটা ভঁইস চরাতে হত। রাত্তিরে চাচীর পা টিপতাম আর খেতাম মার—চাচা আর চাচী কথায় কথায় জুতি, লকড়ি, হাতের কাছে যা পেত তা-ই দিয়ে বেদম ঠেঙাত। মারের চোটে পালিয়ে একদিন পাটনা চলে গেলাম। সেখানে ঘোড়ার গাড়ির এক কোচোয়ানের নৌকর হয়েছিলাম। তারপর বনলাম টিশনের কুলি। তারপর আরো কত কী যে করেছি, সব মনে নেই। দশ সাল হল নৌটঙ্কির দলে এসে ভিড়েছি। নায়, কোঈ নেহী হামনিকা।'

কথায় কথায় নানা প্রসঙ্গ এসে যেত। মোতিয়া প্রশ্ন করত, 'মুলুক কোথায় তোমার?'

'ভাগলপুরের নজদিগ (কাছে)। গাঁও-এর নাম ছত্তরগঞ্জ।'

'সেখানে কে আছে এখন?'

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল বৈজুলাল। বলেছিল, 'আমার কথাই তো খালি শুনছ। তোমার কোনো কথাই কিন্তু শোনা হল না। তোমার কথা বল—'

বিচিত্র হেসে মোতিয়া বলেছিল, 'আমার আবার কী কথা! শুনে লাভ নেই—'

'লাভ নুকশান আমি বুঝব। তুমি বল তো।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেনি মোতিয়া। অনেকক্ষণ পর আবছা গলায় শুরু করেছিল, 'তোমার জীওনের সাথ আমার জীওনের অনেকখানি মিল আছে।'

'ক্যায়সা?' উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বৈজুলাল।

মোতিয়া উত্তর দেয়নি। তার মুখের দিকে চেয়ে বৈজুলাল অনুমান করেছিল, নিজের থেকে মোতিয়া কিছু বলবে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তার জীবনের কথা জেনে নিতে হবে। সে বলেছিল, 'ঘর কঁহা তুমনিকা?'

'হুই কোশি নদীর কাছে।'

'বাপ-মা?'

'মালুম নেহী।'

'ভাই-বহেন?'

'মালুম নেহী।'

'শাদি হয়েছিল?'

'না।'

'উমর (বয়স) কত?'

'হোগা তিশ বরিষ।'

'এতগুলো বরিষ কাটল কিভাবে?'

কী একটু চিন্তা করে মোতিয়া শুরু করেছিল, 'জ্ঞান হবার পর দেখেছি আমি এক দূর সম্পর্কের মামার বাড়ি আছি। দশ বারো সাল তক ওখানেই ছিলাম। তারপর আমার ওমর যখন পন্দ্র কি ষোল হল তখন মামারা নৌটঙ্কির দলে তিনশো রুপাইয়ায় আমাকে বেচে দিলে। পয়লা পয়লা নৌটঙ্কির দলে ভালোই ছিলাম। গায়ের রং কালো হলেও দেখতে শুনতে খারাপ ছিলাম না, একটু আধটু গাইতেও পারতাম। আমাকে তালিম দিয়ে রানী সাজিয়ে আসরে তোলা হত। এইভাবে ছে সাল যাবার পর হঠাৎ আমার চেচক (বসন্ত) হল। তাতে একটা চোখ বরাবরের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল, মুখ ভর্তি গর্ত হল। আসর থেকে নামিয়ে আমাকে রসুইখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েক সাল ধরে নৌটঙ্কির দলে রসুই করে যাচ্ছি। এইভাবেই জীওন কেটে যাবে।'

শুনতে শুনতে বিচিত্র আবেগে বুকের ভেতরটা দুলে গিয়েছিল বৈজুলালের। অবরুদ্ধ স্বরে সে বলেছিল, 'এখানে কত রুপাইয়া তলব (মাইনে) পাও?'

'তলব পাব কেন?' মোতিয়া বলেছিল, 'আমাকে তো ওরা কিনেই নিয়েছে।'

অর্থাৎ মোতিয়া নৌটঙ্কি দলের বান্ধুয়া মজুর। পেটে ভাত বা রুটি আর পরনের খানকয়েক জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই সে পায় না।

সেবার একটা মাস দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গিয়েছিল। মেলা ভেঙে গেলে সবাই যখন যাবার জন্য ব্যস্ত সেই সময় বৈজুলাল বলেছিল, 'ক'টা দিন বেশ কাটল, না?'

'হাঁ।' মোতিয়া মাথা নেড়েছিল।

'এখান থেকে তোমরা কোথায় যাবে?'

'মোরাদাবাদের মেলায়। তোমরা?'

'আমরা উলটো দিকে—সেই কাটিহার।' বৈজুলাল বলেছিল, 'তা আসছে সাল আবার আসছ তো?'

'মালিকরা জানে।' মোতিয়ার গলায় উদাস একটু সুর ফুটেছিল।

ঝাপসা গলায় বৈজুলাল বলেছিল, 'আগেলা বছর যদি আসো আবার দেখা হবে। নইলে এই শেষ দেখা। একটু হেসেছিল সে।

মোতিয়াও হেসেছিল। আর দু'জনেই অনুভব করেছিল, বুকের ভেতর কোথায় যেন কষ্ট হচ্ছে।

পরের বছরও এসেছিল মোতিয়ারা, তার পরের বছরও।

এখানকার মেলায় প্রতি বছর নিয়মিত তারা আসতে শুরু করেছিল।

মিরজাপুরের আর ভগলপুরের—এই দুই দলের মধ্যে প্রথম বারের মতো শত্রুতাটা আর প্রকা ্য ছিল না। তারা বুঝতে পেরেছিল, শক্তিক্ষয় করলে দু পক্ষেরই ক্ষতি। তাই সম্ভবত, দু-দলের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে যা-ই থাক, সামনাসামনি কেউ কাউকে আঘাত হানছিল না। নির্বিঘ্নেই দু-দলের প্রচার চলছিল, তাঁবুর দড়ি আর কাটা হচ্ছিল

না কিংবা দর্শকদের মধ্য থেকে খিস্তি খেউড়ের ঢল নামিয়ে কেউ পালা ভাঙার চেষ্টাও করছিল না।

যাই হোক, মেলার হট্টগোল, হইচই—সব কিছুর মধ্যে থেকেও একটি নিরালা কোণে দুটি মানব-মানবী বিচিত্র খেলাঘর পেতে নিয়েছিল। এখানকার মেলার মেয়াদ পুরো একমাস। খেলাঘরটির আয়ুও তা-ই।

এই একটি মাসের জন্য মোতিয়া এবং বৈজুলাল, দু'জনেই সারাটা বছর উন্মুখ হয়ে থাকত। গোটা উত্তর ভারতে তাদের দল আলাদা আলাদা ঘুরে বেড়াত বটে, তবে তাদের উদ্গ্রীব দেহমন আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমেই পড়ে থাকত।

দীর্ঘ একটি বছর পর দেখা হলে পরস্পরকে নিয়ে কী করবে, মোতিয়া বা বৈজুলাল কেউ যেন বুঝে উঠতে পারত না। তাদের বুকের ভেতর পুরো এক বছরের কথা জমা হয়ে থাকত। দেখা হওয়ামাত্র একসঙ্গে সব বলে ফেলতে চাইত তারা। একটি বছর তারা কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কিভাবে প্রতিটি দিন কেটেছে, একজন আরেক জনের কথা কতটা ভেবেছে—নাঃ, কথা তাদের ফুরোতে চাইত না।

কথা তো ছিলই, সেইসঙ্গে খাওয়ানোও চলত।

মনে পড়ে, ফি বছরই আগের বছরের তুলনায়, বৈজুলালের জন্য মোতিয়ার যত্ন বা সেবা এবং উৎকণ্ঠা বেড়ে যেত। অবশ্য বৈজুলালের দিক থেকেও প্রতিদান ছিল। প্রতি বছরই মোতিয়ার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যেত সে। কোনো বার একখানা শাড়ি, কোনো বার দু'টো জামা, কোনো বার আয়না-চিরুনি কি মাথায় দেবার তেল।

এইভাবেই তিন-চারটে বছর কেটে গেছে।

মনে আছে, পঞ্চম বছরে যখন তাদের দেখা হল তখন মোতিয়া আঁতকে উঠেছিল, 'চেহারার এ কী হাল করেছ!'

বৈজুলাল হেসেছিল, 'কেন, কী করেছি?'

'বিলকুল দুব্‌লা হয়ে গেছ।'

'কই, আমার তো মনে হয় না।'

'তোমার মনে না হলে কী হবে, আমার তো দু'টা আঁখ আছে।'

সেবার খাওয়াবার ঘটাটা কিছু বেড়েছিল। নৌটঙ্কি দলের মালিকদের জন্য যে দুধ, মাংস এবং ভালো ভালো সব্‌জির ব্যবস্থা আছে—সেখান থেকে কিছু কিছু সরিয়ে বৈজুলালকে খাওয়াতে শুরু করেছিল মোতিয়া।

বৈজুলাল বলত, 'তুমি খাইয়ে খাইয়ে আমাকে মেরে ফেলবে নাকি?'

মোতিয়া উত্তর দিত না।

একেক সময় খেতে চাইত না বৈজুলাল। তখন নতুন নতুন রূপ ফুটে উঠত মোতিয়ার। কখনও স্নেহময়ী জননী, কখনও অভিমানিনী প্রেমিকা, কখনও আবার অবুঝ বালিকা বধূ। কেঁদে, ধমকে, মুখভার করে—যে কোনো উপায়েই হোক, বৈজুলালকে খাওয়াত সে আর বলত, 'না খেলে শরীরটা সারবে কিভাবে আর পানি টানার মতো গাধার খাটনি খাটবে কী করে?'

বৈজুলাল বলেছিল, 'একটা মাস না হয় তুমি আমাকে খাওয়ালে দাওয়ালে, যত্ন করলে। তারপর?'

মোতিয়া বলেছিল, 'তারপর কী?'

'আবার তো নেই তখলিফ।' বৈজুলাল বলে গিয়েছিল, 'বছরে একটা মাস যত্ন করে তুমি আমার অভ্যেস নষ্ট করে দিচ্ছ। এই মেলা থেকে চলে যাবার পর যত্ন করার কেউ তো থাকে না। তখন কী খারাপ যে লাগে!'

মোতিয়ার মুখে এবার ছায়া নেমে এসেছিল। সে বলেছে, 'লেকেন—'

'কী?'

'একমাসের বেশি তোমার কাছাকাছি থাকব কী করে বল—'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিল বৈজুলাল। তারপর সব দ্বিধা দু-হাতে সরিয়ে দিয়ে অস্থির কাঁপা গলায় বলেছে, 'তুমি ইচ্ছা করলেই সব সময় আমার কাছে থাকতে পার।'

মোতিয়া কিছুটা অবাক সুরেই বলেছিল, 'কিভাবে?'

এবার এক কাণ্ডই করে বসেছিল বৈজুলাল। বিচিত্র ঘোরের মধ্যে মোতিয়ার একখানা হাত ধরে বলেছিল, 'চল, আমরা কোথাও চলে যাই।'

হাত ছাড়িয়ে নেয়নি মোতিয়া। আস্তে আস্তে শুধু বলেছিল, 'লেকেন—'

'কা?'

'তোমাকে তো বলেছি, নোটঙ্কি দলে আমাকে তিনশো রুপাইয়ায় বিকিয়ে দিয়েছে মামারা। ওই টাকাটা না দিলে দল থেকে আমাকে ছাড়বে না।'

'তিনশো রুপাইয়া!' স্বরটা এবার অত্যন্ত ক্লান্ত আর ম্লান শুনিয়েছিল বৈজুলালের।

'হাঁ।' মোতিয়া মাথা নেড়েছিল। তার গলায় বৈজুলালের ক্লান্তিই যেন চারিয়ে গিয়েছিল।

তক্ষুনি আর কিছু বলেনি বৈজুলাল। অনেকক্ষণ পর প্রশ্ন করেছিল, 'তিনশো রুপাইয়া পেলেই ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে তো?'

মোতিয়া বলেছিল, 'হাঁ।'

সেবার এ নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি। শুধু বৈজুলাল অনুভব করেছিল, এভাবে চলতে পারে না। হরিহর ছত্রের মেলায় নারীসঙ্গময় একমাসের ক্ষণস্থায়ী জীবনটা তাকে পাগল করে তুলেছিল যেন। ক্ষণিকের আনন্দটাকে চিরকালের সাংসারিক একটা রূপ দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। বৈজুলাল স্থির করেছিল, যেমন করে হোক, মোতিয়ার মুক্তির দাম তিনশো টাকা জোগাড় করবেই। সে জন্য তৈরিও হয়েছিল বৈজুলাল।

নৌটঙ্কির দলে বৈজুলালের চাকরির মেয়াদ মাত্র ছ'মাস। বাকি ছ'মাস মুখে রক্ত তুলে অবিরাম পরিশ্রম করে গেছে সে। কুলি খেটে, জনারের খেতে কিষানি করে কিংবা আরো পাঁচ রকম উঞ্ছবৃত্তিতে টাকা জমিয়ে যাচ্ছিল।

এই টাকা জমানোর কথাটা অবশ্য মোতিয়াকে জানায় নি বৈজুলাল। সে ঠিক করেছিল, মোতিয়ার মুক্তির দামটা পুরোপুরি তার হাতে এসে গেলে একেবারে অবাক করে দেবে। সরাসরি ভাগলপুরের দলের মালিকের মুখে টাকাটা ছুড়ে দিয়ে মোতিয়ার হাত ধরে চলে যাবে বৈজুলাল।

কয়েক বছর উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে তিনশো টাকা জমানো সম্ভব হয়েছে। এ বছর সেই টাকা নিয়ে মেলায় এসেছে বৈজুলাল।

এখন বৈজুলালের বয়স পঞ্চাশ। জীবনের শেষ মাথায় পৌঁছে প্রাণের একান্ত সাধটাকে কিনে নিয়ে যাবে সে।

শুধু টাকাই জমায় নি বৈজুলাল। আরো একটা ব্যবস্থাও সে করে এসেছে। তাদের গাঁও-এ বড় জমিমালিকের খেতে মজুরের একটা কাজও জোগাড় করে ফেলেছে। ভাঙাচোরা পৈতৃক ঘরখানা সারিয়ে সুরিয়ে বাসযোগ্য করে রেখে এসেছে। মোতিয়াকে নিয়ে সেখানে উঠবে সে।

কিন্তু—কিন্তু গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমে এই মেলা এবার প্রায় জমে গেছে। তবু ভাগলপুরের দলটা এখনও এসে পৌঁছয়নি।

আসতে কারো কি বাকি আছে? মোরাদাবাদ থেকে পিতলের বর্তনওলারা এসেছে। গাজিয়াবাদ থেকে এসেছে তামার কারিগরেরা। আরো পশ্চিমে—দিল্লি লুধিয়ানা থেকে এসেছে উল-পশমের দোকানদাররা। দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছে পাথরের মূর্তিওলারা। বাংলা মুলুক থেকে এসেছে বেত আর বাঁশের মনোহারি সব দোকান। বোম্বাই মুলুক থেকে এসেছে ছাপা-শাড়িওলারা। নাগরদোলা, ঘুরনচৌকি, মাদারি খেল—কিছু আসতেই বাকি নেই। এমন কি ইলাহাবাদ আর লক্ষ্ণৌর বাঈমহল্লা থেকে তয়ফাওয়ালীরা পর্যন্ত এসে গেছে।

এই মেলার আরেক নাম 'হাতিঘোড়ার মেলা'। বিকিকিনির জন্য সেই হাতিঘোড়াও এসে গেছে। সমস্ত চত্বরটা আজকাল সর্বক্ষণ গম গম করতে থাকে।

সবাই এসে গেছে। শুধু আসেনি ভাগলপুরের দলটা। বৈজুলালদের পাশের জায়গাটা এখনও খালিই পড়ে আছে। অন্যান্য বছর বৈজুলালেরা আসার দু-চারদিনের মধ্যেই মোতিয়ারা এসে পড়ে। কিন্তু এবার তাদের পাত্তাই নেই।

বৈজুলাল অস্থির হয়ে উঠল। আরো দিন কয়েক দেখে, মেলা যখন পুরোপুরি জমে উঠেছে, সেই সময় ইজারাদারদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হল বৈজুলাল। কিন্তু সেখানে গিয়েও বিশেষ লাভ হল না। ভাগলপুরের দলটা এ বছর আসবে কি আসবে না—সে সম্বন্ধে কোনো খবরই দিতে পারল না ইজারাদাররা। শুধু তারা জানালো, গেল বছর দলটা জমির বন্দোবস্ত করে গেছে। সে জন্য তাদের বরাদ্দ অংশ এখনও খালি পড়ে আছে।

আরো কয়েক দিন কাটল। কিন্তু না, মোতিয়ারা এল না।

বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত বৈজুলালের হঠাৎ মনে পড়ল, ভাগলপুর থেকে মোতিয়াদের দল ছাড়াও আরো একটা নৌটঙ্কির দল এই মেলায় আসে।

কথাটা মনে পড়ামাত্র আর দেরি করল না সে। মেলার আরেক মাথায় গিয়ে তাদের খুঁজে বার করল।

মোতিয়াদের দলের মালিকের নাম লছমনজি। লছমনজির দলের কথা জিগ্যেস করতে এই দলের মালিক বলল, 'হাঁ-হাঁ, ওদের আমি চিনি। লেকেন ও দল তো ভেঙে গেছে।'

'ভেঙে গেছে!' বৈজুলাল চমকে উঠল।

'হাঁ। ছ'মাস আগে লছমনজি মারা গেছে। তার পরেই দলটা ভেঙে গেল।'

'এরা তা হলে আসবে না!'

'কী করে আসবে? দলই নেই।'

বৈজুলালের মনে হল, বুকের ভেতর শ্বাস যেন আটকে আসছে। হৃৎপিণ্ড জমাট বেঁধে গেছে। কিছুক্ষণ পর রুদ্ধস্বরে সে বলল, 'আচ্ছা আপনি জানেন, ওই দলে মোতিয়া বলে একটা আওরত ছিল। সে এখন কোথায়?'

'তা কী করে বলব! অন্য কোনো দলে-টলে গিয়ে ভিড়েছে হয়তো।'

বৈজুলাল আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে পড়ল। মেলার মধ্যে দিয়ে টলতে টলতে এলোমেলো বিশৃঙ্খল পায়ে হেঁটে চলেছে সে। মোতিয়ার নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা তার জানা নেই। ঠিকানা থাকলে তো জানা থাকবে। ভ্রাম্যমাণ নৌটঙ্কির দলে ঘুরতে ঘুরতে বছরের শেষে একবার এখানকার মেলায় আসে সে। বছরে একবার মোতিয়ার সঙ্গে দেখা হবে—এটাকেই অমোঘ আর অভ্রান্ত বলে জেনেছিল বৈজুলাল। কিন্তু মোতিয়াদের দলটা যে ভেঙে যাবে, কে তা ভাবতে পেরেছিল।

ভাগলপুরের দু নম্বর দলের মালিক বলেছে, ছ'মাস আগে লছমনজির দল ভেঙে গেছে। তা হলে এই ছ'মাস কোথায় আছে মোতিয়া? কোথায়? পৃথিবীর বিশাল অরণ্যে কিভাবে থেকে তাকে খুঁজে বার করবে বৈজুলাল?

কোমরের কাছে গোপন সেই গেঁজেটায় তিনশো টাকা রয়েছে। চামড়ায় টাকাগুলোর স্পর্শ পাচ্ছে বৈজুলাল।

চামড়াতেই শুধু, চেতনায় তা যেন দাগ কাটতে পারছে না।

মেলার ভিড় হট্টগোল চিৎকার—সব কিছুর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে বৈজুলাল। এতমানুষ, এত শব্দ—কিছুই যেন তাকে ছুঁতে পারছে না। তার চারিদিক ঘিরে এই মুহূর্তে যেন আলো নেই, বাতাস নেই। শুধুই অপার শূন্যতা আর অন্ধকার।

সীমান্ত

শেষ পর্যন্ত সীয়াশরণজিকেই আসতে হল।

লাইন-বাবুরা এখানে আসতে চায় না। কিসের টানেই বা আসবে!

এখানে মানুষ বলতে বিলাসপুরী কুলি কামিন। তাদের সাময়িক আস্তানা হিসেবে গুটিকতক হোগলার ঝুপড়ি আর চটের তাঁবু।

এখান থেকে আধ মাইলের মধ্যে সীমান্ত। সীমান্ত বরাবর রেলের লাইন বসাবার কাজ চলছে।

রেলের লাইন, ভাঙা পাথর আর স্লিপার স্তূপাকার হয়ে আছে।

চারপাশে ধু ধু নিষ্ফলা মাঠ, উঁচুনিচু কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি। নোনা মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে কিছু ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্‌ণ চেহারার কয়েকটা পলাশ।

এ সবও বাধা হত না। লাইন-বাবুরা হয়তো আসত যদি বাড়তি রোজগারের ভরসা থাকত। কিন্তু তার উপায় নেই।

এখানে আসার নাম শুনেই লাইন-বাবুরা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বসে।

অগত্যা সীয়াশরণজিকেই রওনা হতে হল। সীয়াশরণজিও লাইন-বাবু অর্থাৎ লাইন-ইনস্পেক্টর।

তিনি যখন এসে পৌঁছুলেন, আকাশে গলা কাঁসার রং ধরেছে। সেদিকে তাকানো যায় না। তাকালে চোখ ঝলসে যাবে। আকাশটা যেন পুড়ে পুড়ে গলে গলে নিচে ঝরে পড়ছে।

বিশ মাইল ট্রলিতে এসেছেন। সীয়াশরণজির মনে হল, এইমাত্র একটা আগুনের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এলেন। মনে হল, রোদের ছ্যাঁকা খেতে খেতে চামড়া মাংস কুঁকড়ে গেছে।

আগে থেকেই খবর দেওয়া হয়েছিল। সীয়াশরণজির জন্য আলাদা একটা তাঁবুর বন্দোবস্ত হয়েছে।

ট্রলি থেকে নামতেই কুলিদের সর্দার তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেল। কোনো দিকে তাকাবার মতো অবস্থা নয় সীয়াশরণজির। সিধা বাঁশের মাচানে দেহটাকে সঁপে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন।

কুলিদের সর্দার বলল, 'তখলিফ হচ্ছে ইনাসপিটারজি?'

অস্ফুট শব্দ করলেন সীয়াশরণজি। কী বললেন, ঠিক বোঝা গেল না।

সর্দার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একটি কামিনকে সঙ্গে নিয়ে আবার এল। ডাকল, 'ইনাসপিটারজি—'

চোখ বুজেই সীয়াশরণজি বললেন, 'হাঁ—'

'রতিয়াকে এনেছি। আপনার তখলিফ হচ্ছে। রতিয়া থোড়া হাওয়া করুক।'

সীয়াশরণজি এবারও জবাব দিলেন না। চোখও মেললেন না। তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই।

এটা কী তিথি কে জানে। সন্ধের ঠিক পরে পরেই চাঁদ দেখা দিল। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি বিভোর হয়ে আছে। আকাশটা গাঢ় নীল, আশ্চর্য স্নিগ্ধ। কে বলবে দুপুরে এই আকাশেই গলা কাঁসার রং ধরে ছিল!

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে।

ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে গেছে। শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। খানিক ধাতস্থ হয়ে উঠে বসেছেন সীয়াশরণজি। দুপুরে তাঁবুতে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁবুর ভেতরকার কিছুই দেখেননি। এখন সীয়াশরণজি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

তাঁবুতে আসবাব বলতে দু'টি বাঁশের মাচান, একটি মাটির সোরাই আর নারকেল পাতার গোটা দুই পাখা।

বাইরে একটা গলা পাওয়া গেল, 'অন্দর আসব সাহাব?'

জবাবের অপেক্ষা না করেই একটি কামিন ঘরে ঢুকল। তার হাতে তিনটে পেতলের বাসন।

প্রথমে খেয়াল করেননি সীয়াশরণজি। উদাসীন গলায় বললেন, 'তুই কে?'

'আমি রতিয়া। তামাম দিন আপনাকে দেখভাল করলাম। এখন পুছছেন আমি কে!'

সীয়াশরণজির মনে পড়ল। দুপুরে সেই ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় সর্দারের মুখে রতিয়ার নাম শুনেছিলেন বটে।

বাসন নামিয়ে লণ্ঠনটা উসকে জোরালো করল রতিয়া।

একটু আগে উদাসীন অন্যমনস্কের মতো কথা বলছিলেন সীয়াশরণজি। তেজী আলোতে রতিয়ার দিকে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন।

সুঠাম শরীর। চকচকে তামার মতো চামড়ার রং। কাঁধ থেকে দু'টো নিটোল, মসৃণ, নগ্ন হাত নেমে এসেছে। সুপুষ্ট শরীর, খাটো কাপড়ে বাগ মানে না। বিড়ালীর মতো কটা চোখ। জোড়া ভুরুর মাঝখানে কালো উল্কিতে সাপ আঁকা। হাঁটু পর্যন্ত আঁটো কাপড়। তারপর উদোম পা। হাতে রুপোর কাঙনা, পায়ের আঙুলে চুটকি। সারা দেহে উগ্র বন্যতা।

রতিয়া বলল, 'যে ক'রোজ থাকবেন, সর্দার আমাকে আপনার দেখাশোনা করতে বলেছে। আপনার খানা-উনা আমিই পাকিয়ে দেব।' পেতলের বাসনগুলো দেখিয়ে বলল, 'এই আপনার রাতের খানা—'

'ঠিক আছে, তুই এখন যা।'

'আপনার বিস্তারা পেতে দিয়ে যাই।'

'দরকার নেই, আমিই পেতে নেব। তুই এখন যা।'

এরকম তাড়া দিয়েই তাঁবু থেকে রতিয়াকে বার করে দিলেন সীয়াশরণজি।

যাবার আগে রতিয়া বলল, 'কাল ফির আসব ইনাসপিটারজি।' বলে একটু হাসল। তিনটে চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারপর শরীরটা দুলিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। তার সুপুষ্ট নিটোল মাংসল পুষ্ট পায়ের গোছ অনেকক্ষণ সীয়াশরণজির চোখে আটকে রইল।

পর দিন সকাল থেকেই কাজ শুরু হল।

কাজ আর কী! সীমান্ত-বরাবর রেলের লাইন আর স্লিপার পাতা হচ্ছে। সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুলি বসানো হচ্ছে। এই সবের ইন্সপেকশন অর্থাৎ তদারকি করা।

বিলাসপুরী কুলিরা ভারী ভারী লোহার লাইন টানে। আর হাঁকে, 'মারে জু—য়া-য়া—ন—ন—'

'হাঁইও—'

তাদের ঘামে-মাজা পিঠ আর মুখ রোদে চকচক করে।

দুপুরের আগে আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়।

সেই সকাল থেকে মহড়া চলে। রোদের তাত বাড়তে বাড়তে একসময় আকাশে গলা কাঁসার রং ধরে। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে লু বয়ে যায়। অনেক—অনেক দূরে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমে গেছে, ঠিক সেইখানে হিল হিল করে আগুনের একটা হলকা কাঁপতে থাকে।

এ বেলার মতো কাজ চুকল। বিকেলের পর যখন ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি জুড়োতে শুরু করবে, আবার কাজ আরম্ভ হবে।

সীয়াশরণজি তাঁবুতে ফিরলেন।

রতিয়া স্নানের জল আর দুপুরের খাবার রেখে গেছে।

রতিয়া ছিল না। না থাকায় মনে মনে স্বস্তিই বোধ করেন সীয়াশরণজি। ধীরেসুস্থে স্নান সেরে খেতে বসেই চমকে উঠলেন। পেতলের থালায় রোটি আর মাংস রেখে গেছে রতিয়া। থালাটা ঠেলে উঠে পড়লেন সীয়াশরণজি। হাঁকলেন, 'সর্দার—সর্দার—'

কুলিদের সর্দার ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ঢুকল, বলল, 'জি—'

'এ কী খানা দিয়েছে!'

যেমন এসেছিল, ছুটতে ছুটতে তেমনি বেরিয়ে গেল সর্দার। একটু পর রতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঢুকল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী হয়েছে সাহাব? কিছু গড়বড়?'

সীয়াশরণজি রতিয়াকে বললেন, 'কী সব পাকিয়েছিস!'

'কেন, গোস্ত আর চাপাটি।' লাইন-বাবু বলে ভয়ডর নেই রতিযার। সহজ স্বাভাবিক গলায় সে জবাব দিল।

সীয়াশরণজি বললেন, 'আমি মছলি-গোস্ত খাই না। এগুলো নিয়ে যা।'

থালাটা নিয়ে যেতে যেতে রতিয়া বেজার মুখে বলল, 'আপনার জন্যে বহুত মেহন্নত করে গোস্ত পাকিয়েছিলাম ইনাসপিটারজি। লেকেন আমার নসিবই খারাপ। আপনাকে খাওয়াতে পারলাম না।'

রতিয়া চলে গেল। এ বেলা সীয়াশরণজির খাওয়া হল না।

সন্ধে পর্যন্ত লাইন পাতার কাজ চলল।

রাতে তাঁবুতে ফিরে সীয়াশরণজি দেখলেন লণ্ঠন জ্বলিয়ে রতিয়া বসে আছে। তাঁকে দেখেই মেয়েটা হেসে উঠল। হাসল কিন্তু শব্দ হল না। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিনটে চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ভুরু দু'টো কুঁচকে যেতে উল্কির সাপটা আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল।

রতিয়া বলল, 'আপনার চাপাটি এনেছি ইনাসপিটারজি—'

সীয়াশরণজি জবাব দিলেন না। কেন যেন তাঁর মনে হল, রতিয়ার সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।

এ বেলা রোটি, ঢুলা শাক ভাজি, আলুর ছোকা আর মরিচের আচার নিয়ে এসেছে রতিয়া। খেতে বসে বেশ খুশিই হলেন সীয়াশরণজি। মরিচের আচার তাঁর খুব প্রিয়।

খেতে খেতে সীয়াশরণজি মুখ তুললেন। রতিয়া এখনও যায়নি। লণ্ঠনটার পাশে বসে ঘাড় বাঁকিয়ে চকচকে চোখে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সীয়াশরণজি বললেন, 'তুই এখনও যাসনি?'

'না ইনাসপিটারজি। আপনার খাওয়া হলে তাম্বু সাফ করব। তারপর বর্তন নিয়ে যাব।'

আর কিছু না বলে সীয়াশরণজি চাপাটি ছিঁড়তে লাগলেন।

খাওয়ার পর আঁচিয়ে বাঁশের মাচানে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন সীয়াশরণজি। রতিয়া ঠুক ঠাক, ঠুন ঠান শব্দ করে তাঁবু পরিষ্কার করতে লাগল।

বাইরে কালকের মতো ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। কাঁকুরে ডাঙা স্নিগ্ধ দুর্জ্ঞেয় রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দূরের ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্‌ণ পলাশগুলি অদ্ভুত এক শ্রী পেয়েছে।

মুগ্ধ হয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন সীয়াশরণজি। কতক্ষণ জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতের দৃশ্য দেখছিলেন, হুঁশ নেই। হঠাৎ পায়ের ওপর ঠান্ডা হাত পড়তেই চমকে উঠলেন। পা দু'টো দ্রুত টেনে নিয়ে গুটিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। দেখলেন, সামান্য ঝুঁকে ধূর্ত চতুর চোখে হাসছে রতিয়া।

মুখোমুখি সাপ দেখলে যেমন হয় সীয়াশরণজির অবস্থা ঠিক তেমনি। অস্ফুট, ভয় ভয় গলায় তিনি বললেন, 'কী—কী—কী মতলব?'

'কুছ না ইনাসপিটারজি। আপনার পা দাবিয়ে থোড়া আরাম দেব।'

সীয়াশরণজি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না, না, দরকার নেই। তুই যা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা জি।' তাঁবু থেকে বেরুবার আগে ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, 'বাতে কুছু দরকার হলে আমাকে বুলাবেন ইনাসপিটারজি। আমি পাশের ঝাপড়িতেই আছি।

রতিয়া চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে রইলেন সীয়াশরণজি। বুকের মধ্য থেকে কেমন এক ধরনের ঠাণ্ডা সিরসিরে কাঁপুনি উঠছে। কিছুতেই সেটা ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

সামলে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। নিজের কথা ভাবতে শুরু করলেন সীয়াশরণজি।

তিনি মৈথিলি ব্রাহ্মণ। সুগৌর ঋজু চেহারা। বেশ বয়স হয়েছে। চল্লিশ পার করেছেন। কিন্তু দু-একটা চুলে পাক ধরানো ছাড়া বয়স তাঁর চেহারায় আঁচড় কাটতে পারেনি। একই সঙ্গে গাম্ভীর্য আর প্রসন্নতা তাঁর মুখে চোখে আলাদা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে।

সীয়াশরণজি বিয়ে করেননি। কামিনীতে তাঁর মোহ নেই, কাঞ্চনে লোভ নেই। জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিকার এবং নির্মোহ।

এটুকুই সীয়াশরণজির সমস্ত পরিচয় নয়। জীবনে তিনি মিতাচারী, অদ্ভুত সংযমী। এমন খাদ্য খান না যাতে শরীর উত্তেজিত হয়, এমন কথা ভাবেন না যাতে মন বিচলিত হয়। নীতি এবং সংযমে তাঁর অটুট নিষ্ঠা।

সীয়াশরণজি লাইন-ইন্সপেক্টর। সমস্ত জীবন তিনি রেলের লাইন পেতে আসছেন। রেলের লাইনই শুধু নয়, নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইনও তিনি বসিয়ে চলেছেন। তার বাইরে যাবার উপায় নেই।

এখানে, এই কাঁকুরে ডাং আর বালিয়াড়িতে লাইন পাততে এসেছেন তিনি। সীমান্ত বরাবর রেলের লাইন টেনে নিতে মাস দুই সময় লাগবে।

দু মাস মেয়াদের সঙ্গে রতিয়ার কথাটা যতই ভাবলেন, বিচিত্র এক ভয় চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল।

সীয়াশরণজি ঠিক করলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন। পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলবেন না।

সীয়াশরণজি আসার পর দিন দশেক পার হল। লাইন পাতার কাজ পুরোদমে চলছে। দুপুরে আকাশ বাতাস কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি যখন অস্বাভাবিক তেতে থাকে, সেই সময়টুকু ছাড়া কাজের কামাই নেই। এ ক'দিনে অনেকখানি লাইন বসানো হয়েছে।

কাজ যেই চুকে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে চলে আসেন সীয়াশরণজি। তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অজান্তেই একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে।

সেই যে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন, তার সঙ্গে যতটা সম্ভব কম কথা বলবেন, তা আর হয়ে ওঠেনি।

এই বিলাসপুরী কামিনটা ভারি ফিচেল। হেসে হেসে ঢলে ঢলে প্রচুর কথা বলে। আশ্চর্য! সীয়াশরণজি তাকে নিজের অজান্তে কবে থেকে যেন খানিকটা প্রশ্রয়ও দিয়ে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে তাল রেখে পাল্লা দিয়ে কথা বলছেন, হাসছেন।

রতিয়া বলে, 'ইনাসপিটারজি কি শাদি-উদি করেছেন?'

'না।'

গালে একটা হাত রাখে রতিয়া। চোখের কটা তারা দু'টো চরকির মতো ঘোরে। কপট দুঃখ করে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, 'হায় রামজি, এখনও শাদি করেননি!'

সীয়াশরণজি হাসেন। বলেন, 'শাদি করিনি তো হয়েছে কী?'

'জনমটাই আপনার বেফায়দা হয়ে গেল ইনাসপিটারজি। সমঝালেন?'

'হাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন সীয়াশরণজি।

এমনিতে তাঁর ভুলো মন। লাইনের তদারকিতে হয়তো গিয়েছেন। ভুলে ছাতাটা সঙ্গে নেননি। রোদের তাতে চামড়া পুড়ে যাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে ছাতা নিয়ে আসে রতিয়া। ফিস ফিস করে বলে, 'আপনার বহুত ভুল হয় ইনাসপিটারজি। ভুল সজুত করার জন্যে একটা শাদি করুন। ঘরে জেনানা এলে আর ভুল হবে না।'

সস্নেহে ধমক দেন সীয়াশরণজি, 'যা যা তামাশাবালী—'

নধর ভুট্টাগাছের মতো শরীর দোলাতে দোলাতে চলে যায় রতিয়া।

জোর কাজ চলছে। আর মাসখানেকের মধ্যেই সীমান্ত পর্যন্ত লাইন পাতা হয়ে যাবে।

সীয়াশরণজি আসার পর পুরো দেড়টা মাস পার হতে চলল। এই দেড় মাসে রতিয়ার হাসি ঢলানি তামাশা নিজের অজান্তেই তাঁর সমস্ত সত্তাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আজকাল রতিয়াকে ছাড়া সীয়াশরণজির চলে না।

সকাল-দুপুর-সন্ধে—দিনে তিনবার তাঁর তাঁবুতে আসে রতিয়া। তাঁবু সাফ করে। চাপাটি-ভাজি সাজিয়ে দেয়। মাটির সোরাইতে জল ভরে রাখে। বিছানা পাতে। লণ্ঠনের কাচ মোছে। টুকিটাকি কাজ সারে আর হেসে হেসে মজার মজার কথা বলে, রসের কথা বলে।

ইদানীং আরো একটা কাজ বেড়েছে রতিয়ার। রাত্তিরে খেয়েদেয়ে সীয়াশরণজি শুয়ে পড়লে নরম ঠাণ্ডা হাতে তাঁর পা টিপে দেয়।

এখানে আসার পরের দিন তাঁর পায়ে রতিয়া হাত ঠেকাতেই চমকে উঠে বসেছিলেন সীয়াশরণজি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুকের ভেতর কাঁপুনি চলেছিল। কিন্তু কখন যে নিজের অজান্তে রতিয়ার এই সেবাটুকু মেনে নিয়েছেন, খেয়াল নেই তাঁর।

রতিয়ার আসতে দেরি হলেই সীয়াশরণজি অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁবুর বাইরে এসে পায়চারি করেন, এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকেন। রতিয়া যতক্ষণ না আসে, যেন স্বস্তি পান না।

এদিকে সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুলি পোঁতা হচ্ছে, স্লিপার বসানো হচ্ছে। আর পনেরো দিনের মধ্যেই রেল-লাইন সীমান্ত ছোঁবে।

কুলি কামিন এবং ইন্সপেক্টরজির শ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

আজ একটানা সমস্ত দিন কাজ হয়েছে। দুপুরে খেতে আসতে পারেননি সীয়াশরণজি। রতিয়া বার দুই ডেকে ফিরে গেছে।

সন্ধের পর আকাশে চাঁদ দেখা দিল। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ উঠে আসছে। দুপুরের গনগনে আকাশটা এখন স্নিগ্ধ এক রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঝিরঝিরে, মিঠে বাতাসে সমস্ত দিনের অবসাদ জুড়োতে জুড়োতে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীয়াশরণজি। কারণ নেই, তবু অদ্ভুত এক খুশিতে মন ভরে আছে তাঁর।

তাঁবুর বাইরে থেকেই সীয়াশরণজি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'রতিয়া—রতিয়া—'

অন্য দিন ডাকতে হয় না। পায়ের শব্দ পেলেই লণ্ঠন হাতে বাইরে বেরিয়ে আসে রতিয়া।

বার তিনেক ডাকার পরও সাড়া মিলল না। অগত্যা তাঁবুর ভেতরে ঢুকলেন সীয়াশরণজি। রতিয়া নেই। এক কোণে তেলের লণ্ঠনটা জ্বলছে।

লাইন থেকে ফিরে রতিয়াকে দেখা, তার সঙ্গে গল্প করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অহেতুক খুশিতে মনটা ভরিয়ে তাঁবুতে ফিরেছিলেন সীয়াশরণজি। এখন কেমন যেন উদাস লাগছে।

মাচানের ওপর নিঝুম হয়ে পড়ে রইলেন সীয়াশরণজি।

খানিকটা পর তাঁবুর বাইরে খচমচ শব্দ হল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন সীয়াশরণজি। আকুল আগ্রহে ডাকলেন, 'আয় আয় রতিয়া।'

কিন্তু তাঁবুর ভেতর যে ঢুকল সে রতিয়া নয়। অন্য একটা কামিন। সে পেতলের থালায় চাপাটি-ভাজি এনেছে।

থালা নামিয়ে কামিনটা চলে গেল।

সীয়াশরণজি একবার ভাবলেন, কামিনটাকে ডেকে রতিয়ার কথা জিগ্যেস করেন। কিন্তু কেমন যেন সংকোচ হল। সংকোচটাকে ছাপিয়ে তাঁর ইচ্ছা জয়ী হল না।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন সীয়াশরণজি। মনের সঙ্গে অনেক যুঝলেন। কিন্তু একটা অবুঝ চাপা কষ্ট তাঁকে অস্থির করে তুলল। আর সেই কষ্টটাই তাঁকে তাঁবুর বাইরে টেনে আনল।

লাইনের ধারে টিকারা বাজিয়ে কুলিরা হোলির গীত গাইছে তখন। সন্তর্পণে তাদের এড়িয়ে যেখানে ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্‌ণ পলাশগাছগুলো সারি-বাঁধা জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে চলে এলেন সীয়াশরণজি।

শিমুল আর পলাশের নিচে কামিনদের ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলোর চারপাশে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করলেন। বার বার ভাবলেন, রতিয়াকে ডাকেন। এতে দোষের কিছু নেই। রতিয়া রোজ তাঁর তাঁবুতে যাচ্ছে। তা ছাড়া ইন্সপেক্টরজি যদি তাঁকে রাতে ডাকেনই, কুলিরা খারাপ চোখে দেখবে না। সীয়াশরণজিকে বিশ্বাস করে তারা।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত রতিয়াকে আর ডাকা হল না। অসহ্য এক যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীয়াশরণজি।

সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের বাতাসে চোখদু'টো জুড়ে এসেছিল।

কে যেন ডাকল, 'ইনাসপিটারজি—'

চোখ মেলেই সীয়াশরণজি যাকে দেখলেন সে রতিয়া। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। প্রথমেই যে কথা বললেন তা এই, 'কাল রাতে আসিস নি কেন রতিয়া?'

রতিয়া জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে সেই হাসি হাসল যাতে শব্দ নেই।

একটা রাত না ঘুমিয়ে চোখ বসে গেছে। হনু দু'টো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মুখ শুকনো, চুল উড়ুউড়ু। সীয়াশরণজিকে দেখতে দেখতে রতিয়া বলল, 'চেহারার এ কী হাল হয়েছে!'

ব্যস্তভাবে সীয়াশরণজি বললেন, 'ও কিছু না, কিছু না। কাল তুই আসিস নি কেন?'

রতিয়া এবারও জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে আগের মতোই হাসতে লাগল।

সীয়াশরণজি ফের বললেন, 'হাসছিস কেন?'

'বলব?' জবাবের অপেক্ষা না রেখেই ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, 'কাল রাতে একটা বেকুব মুরুখ আমার ঝোপড়ির পাশে ঘুর ঘুর করছিল। লেকিন ভরোসা করে ঝোপড়িতে ঢুকল না। মুরুখটার জন্যে কষ্ট হল।' খিল খিল করে দমকে দমকে হেসে উঠল রতিয়া, 'আমি চাইছিলাম সে আমার তাঁবুতে আসুক, এক সাথ রাতটা কাটাই। লেকেন বদ নসিব! কা করে? কাওয়ার (কাপুরুষ) কাঁহিকা!'

সীয়াশরণজি শিউরে উঠলেন। নিজেকে কোথায় নামিয়ে এনেছেন তিনি! শেষ পর্যন্ত একটা কামিনের কাছে তাঁর চাপা লোভ ধরা পড়ে গেল! তীব্র গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'নিকাল যা—'

হাসি থামিয়ে সীয়াশরণজির মুখের দিকে তাকাল রতিয়া। সে মুখে কী দেখল সে-ই জানে। আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল।

আজ আর বেরুলেন না সীয়াশরণজি। সমস্ত দিন তাঁবুতে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন। এতকাল নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইন পেতে এসেছেন। জীবনের চাকা মসৃণ নিয়মেই তার ওপর দিয়ে চলছিল। কিন্তু এখানে, দেশের এই সীমান্তে এসে, চল্লিশটা বছর পার হয়ে জীবনের সীমান্তে পৌঁছে সেটা বেচাল হয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করেছে। প্রায় দু'টি মাস অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে সীয়াশরণজি আজ আত্মস্থ হলেন।

স্থির করে ফেললেন, আজই এখান থেকে চলে যাবেন।

বিকেলে কুলি-কামিনদের অবাক করে দিয়ে ট্রলিতে উঠলেন সীয়াশরণজি।

সকলের সঙ্গে রতিয়াও ট্রলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার কটা চোখ দু'টো ধক ধক করছে। রতিয়ার চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন সীয়াশরণজি।

বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় রতিয়া বলল, 'ডরপোক—'

ট্রলি চলতে শুরু করল। জীবনের ভয়ানক এক সীমান্ত থেকে পালিয়ে গেলেন সীয়াশরণজি।

বাদশা বেগম

ছিটে বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে যখন তখন দু'টো ড্যাবডেবে চোখ ঘুরপাক খায়। নাজিমার শ্যামলা রঙের টান টান শরীরে তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগে যেন। গনগনে আখার ভেতর থেকে জ্বলন্ত একখানা কাঠ বার করে উঁচিয়ে ধরে সে। বলে, 'যা যা বান্দা, এইখান থিকা ভাগ। ভুইয়া সাবের তামুক সাইজা দে গিয়া।'

পাকঘরের (রান্নাঘরের) ওপাশে বর্ষায় মানকচুর জঙ্গল ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছিল। তার আড়ালে চোখ দু'টো চট করে সরে যায়।

নাজিমা তখনও সামনের আখার মতো গন গন করতে থাকে। জিভের আগায় তার আগুনের আঁচ, 'দিনরাইত ভুইয়া সাহেবের পয়জার (জুতো) খায়, তার নজরখান এক্কেরে (একেবারে) আসমানে। যা যা বান্দা, পেত্নীর পিছনে পাক খা গিয়া।'

আখায় রাঙা মাটির হাঁড়িতে পানকাইজ চালের ভাত ফুটছে টগবগিয়ে। তার সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

নিজের রূপ যৌবন সম্পর্কে ভীষণ সচেতন নাজিমা। চোখ দু'টো সরে গেলে দ্রুত শরীরের ওপর দিকটা খুলে ফেলে। লাল বুটি-বসানো পরিপূর্ণ দুই বুক দেখতে দেখতে নিজেরই নেশা লেগে যায় যেন। কালো কুচকুচে চোখের তারা দু'টোর ওপর গাঢ় আবেশের মতো কিছু নেমে আসে নিবিড় হয়ে।

নাজিমা জানে, তার ডান গালে মসুর ডালের মতো লাল একটা তিল রয়েছে। এই তিলটা তাকে যেন অলৌকিক করে তুলেছে। সে জানে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁচা বয়সের ছেলেছোকরাদের মাথা ঘুরে যায়, তারা আর চোখ ফেরাতে পারে না।

পাকঘরের পেছনে মানকচুর জঙ্গলের পর মোত্রার ঝোপ। মোত্রার সতেজ ডাঁটিগুলোর মাথায় ধপধপে সাদা ফুল ফুটে আছে। মোত্রাবনের মাঝখান দিয়ে একটা ছোট খাল তির তির করে বয়ে গেছে।

বুক ঢেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় নাজিমা। জানালার সামনে গিয়ে সন্ধানী চোখে বাইরে তাকায়। খানিক দূরে খালের ধার ঘেঁষে একটা কোষ নৌকো স্থির দাঁড়িয়ে আছে। মোত্রার দীঘল ডাঁটিগুলোর ফাঁক দিয়ে একটা ডোরা-কাটা সবুজ লুঙ্গি দেখা যায়। নৌকোর ওপর কারো মুখ দেখা না গেলেও সে যে অনিবার্যভাবেই হাসেম সেটা বলে দিতে পারে নাজিমা। তার জন্যই হাসেম ওখানে বসে আছে। তেমন হলে সারা দিন, সারা দিন কেন, সারাটা জীবন সে ওভাবে বসে থাকতে পারে তার আশায়। খানিক আগে হাসেমকে ভগিয়ে দিলেও খুশিতে মন ভরে যায়। একটি পুরুষ তারই জন্য সমস্ত দুনিয়া ভুলে গিয়ে অপেক্ষা করছে, এটা ভেবে কোন যুবতীর প্রাণ না সুখে আর গর্বে ভরে যায়!

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে পাকঘর থেকে বেরিয়ে খালপাড়ে এসে দাঁড়ায় নাজিমা। কোমরে হাত রেখে ঘাড় বাঁকিয়ে দু চোখে ভ্রূকুটি ফোটায়। ঠোঁট টিপে, কপাল কুঁচকে অনেকক্ষণ হাসেমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নেয়। তারপর বলে, 'কি রে বান্দা, অখনও এইখানে বইসা আছস!'

কালো চেহারার আলিসান জোয়ান হাসেম। নাজিমার সামনে সে একেবারে কুঁকড়ে যায়। হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'এই—এই—' এইটুকু বলতেই তার সমস্ত সাহস যেন উবে যায় পলকে।

নাজিমা এবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'এইখানে কি রে বান্দা, কলুবাড়িতে যা।'

অবাক হয়ে ভয়ে ভয়ে হাসেম জিগ্যেস করে, 'কলুবাড়িতে যামু ক্যান?'

'সেইখান থিকা সোয়া স্যার ত্যাল লইয়া আয়। তরাতবি (তাড়িতাড়ি) যা।'

'ত্যাল দিয়া কী হইব?'

'কী হইব জানস না? পিঠে মাখতে হইব। বড় ভুইয়া জুতা হাতে লইয়া নাচতে আছে তোর লেইগা। যা, গিয়া পিঠ পাইত্যা দে।'

'ভুইয়া সাবে আমারে জুতার বাড়ি মারে!'

'না, পিরিত করে। পিরহান (জামা) তুইলা পিঠখান দ্যাখা দেখি।' বলে চোখের কোণ দিয়ে হাসেমকে বিদ্ধ করতে করতে নিঃশব্দে হাসতে থাকে নাজিমা।

হাসেম উত্তর দেয় না। কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে ভূতের মতো।

নাজিমা বলে, 'কী হইল, গেলি না অখনও?'

আচমকা যেন হাসেমের ওপর দুঃসাহস ভর করে। সে বলে, 'না, যামু না। কিছুতেই না।'

চোখ দু'টো সরু করে নাজিমা চাপা গলায় বলে, 'ক্যান?'

দুঃসাহসটা এবার আরো বেড়ে যায় হাসেমের। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সে বলে, 'বোঝস না, তোরে দুই দণ্ড না দেখলে পরানটা য্যান কেমুন করে!'

'আ লো আমার রসের নাগর লো!' কপট রাগে চোখের তারায় যেন আগুন ঝলকায় নাজিমার। সে বলে, 'যা যা বান্দা, আমার পিছুন ছাইড়া হাইলা চাষা ওসমান মিয়ার কানা মাইয়াটারে সুহাগ কর গিয়া। নজরখান মাটিতে নামা আসমান থিকা।'

মুখটা দুঃখে বেদনায় একেবারে নীলবর্ণ হয়ে যায়। করুণ মুখে হাসেম বলে, 'তুই বড় ছ্যাকা দিয়া কথা ক'স। পরানটা এক্কেরে ফালা ফালা হইয়া যায়।'

রঙ্গিনী নাজিমা ফের হাসেমকে নিয়ে মজার খেলায় মেতে ওঠে, 'তাই নিকি! রাঙ্গা পরশু আসিস, গাবের আঠা দিয়া তোর পরানটা জোড়া লাগাইয়া দিমু।' বলেই জোরে জোরে হেসে ওঠে। হাসির তোড়ে তার শরীর বেঁকেচুরে দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে।

অঘ্রান মাসের ঝলমলে দুপুর। চারপাশের আমরুজ বাতাবি গাব আর কাউ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আরামদায়ক হাওয়া, হু হু করে। সমস্ত চরাচর জুড়ে শুধু বাতাস আর অজস্র রোদ। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে বুনো টিয়া আর সাদা বকের ঝাঁক।

'এই নাজিমা—এই হারামজাদী বান্দি—'

হঠাৎ বড় ভুঁইয়া শাজাহান খোন্দকারের কর্কশ গলা পেছন দিক থেকে ভেসে আসে। গলা তো নয়, অঘ্রানের মেঘশূন্য আকাশ থেকে নাজিমা আর হাসেমের মধ্যে একটা বাজ পড়ে।

হাসেমকে নিয়ে মজায় হাসিতে রগড়ে খালের ধারে একটা আলাদা রঙিন দুনিয়া তৈরি করে নিয়েছিল নাজিমা। তাদের অজান্তে বড় ভুঁইয়া যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ টের পায় নি। দু'জনে চমকে ওঠে, ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে যায়।

শাজাহান খোন্দকার হিংস্র চোখে হাসেম এবং নাজিমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নেয়। তারপর বলে, 'এই তো শয়তানের ছাও দুইটায় এইখানে রইছে। হাসমা. তোরে না কইছি, নাজিমার পিছনে বিলাইয়ের লাখান (বেড়ালের মতো) ছোক ছোক করবি না। নাও (নৌকো) থিকা নাইমা আয় সুমুন্দির পুত।'

শাজাহান খোন্দকারকে দেখে আতঙ্কে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল হাসেমের। দিশেহারার মতো সে কোষ নৌকোতেই বসে থাকে।

গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে শাজাহান এবার হুঙ্কার ছাড়ে, 'কুত্তার ছাও, কথা কানে গেল না? নাইমা আয়—'

মুখটা একেবারে ছাইবর্ণ হয়ে গেছে হাসেমের। এলোমেলো পা ফেলে সে নেমে এসে শাজাহানের সামনে দাঁড়ায়। তার চোখের দিকে তাকাতে পারে না হাসেম, ঘাড় ভেঙে মাথাটা আপনা থেকেই বুকের ওপর ঝুলে পড়ে যেন।

বড় ভুঁইয়া বলে, 'তোরে যে উত্তরের বাগিচা থিকা আইজ বেবাক সুপারি পাড়তে কইছিলাম। পাড়ছস?'

রুদ্ধস্বরে হাসেম কোনোরকমে বলতে পারে, 'জি—জি—'

'পাড়স নাই তাইলে (তা হলে)?' বলতে বলতে পা থেকে সোয়া সের ওজনের কাঁচা চামড়ার পয়জার খুলে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে হাসেমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শাজাহান খোন্দকার।

পিঠের ওপর একের পর এক ঘা পড়তে থাকে। চামড়া ফেটে রক্ত ছোটে। আর দাঁতে দাঁত চেপে পেশীগুলো শক্ত করে রাখে হাসেম। মুখ দিয়ে একটি কাতর আওয়াজও বার করে না।

পয়জার চালাতে চালাতে বড় ভুঁইয়ার চোখেমুখে ঘাতকের উল্লাস ফুটে বেরোয়। হাসেমের পিঠ থেকে রক্তের স্রোত গড়িয়ে নামতে থাকে।

এতক্ষণ একধারে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল নাজিমা, তার সমস্ত শরীর আতঙ্কে থর থর কাঁপছে। একসময় গোঙানির মতো শব্দ করে বলে, 'ওরে আর মাইরেন না ভুইয়া সাব, আর মাইরেন না। সগল দোষ আমার, আমিই ওরে ডাইকা আনছিলাম।'

মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শাজাহান খোন্দকার। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে, 'তোর কথাই রাখলাম নাজিমা। যা রে কুত্তার ছাও। তিন পহর বেইলের মইধ্যে (বেলার মধ্যে) সুপারি পাড়ন শ্যাষ না হইলে মুরগির বদলা তোরেই জবাই করুম। মনে থাকে য্যান—'

তা অবশ্য বড় ভুঁইয়া পারে। এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মানুষ দুনিয়ায় খুব কমই জন্মেছে।

হাসেম প্রায় টলতে টলতে উত্তরের সুপারি বাগিচার দিকে চলে যায়। আর শাজাহান খোন্দকার নাজিমাকে বলে, 'এই বান্দি, আয় আমার লগে। আর কুনোদিন হাসমার লগে বাতচিত করতে না পারস তার ব্যবস্থা করতে আছি।'

নাজিমারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ডান দিকে গেলে সজনে গাছের জটলা। বড ভুঁইয়ার পেছন পেছন ভীরু কবুতরের মতো সেদিকে চলে যায় নাজিমা।

দুই

রোমশ ভুরু দু'টো পাকিয়ে পাকিয়ে কাঁকড়া বিছের ল্যাজের মতো করে ফেলল তমিজুদ্দিন শিকদার। তারপর পাঁশুটে রঙের চুলগুলো হাতের চেটো দিয়ে চেপে চেপে মাথার ওপর পাট করে বসিয়ে দিল। তারও পর ঝুটো পাথর বসানো ঠাকুরদার আমলের টুপিটা মাথার ওপর পরিপাটি করে পরে নিল। এখন নিজেকে সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে। মেজাজটা নবাব বাদশার মতো হয়ে উঠতে থাকে তার।

তমিজুদ্দিনের গলাটা গো-বকের মতো বেজায় লম্বা। সেটা সামনের দিকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়ে সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে, 'আইজ তিন মাস ধইরা খালি সবুরই করতে আছি। আর পারুম না। তিন মাসে সাতটা ক্যান, দুনিয়ার বেবাক ডানা-কাটা হুরী আইনা ফেলান যায়। আর আপনে আধাখান মাইয়া জুটাইতে পারলেন না। নগদা পাচশ ট্যাকা আগাম দিয়া গেছি।'

এখন, এই ঝকঝকে দুপুর বেলাতেই গেঁজানো দিশি মদ গিলে মেজাজটা বেশ তর হয়ে আছে শাজাহান খোন্দকারের। চোখ দু'টো টকটকে লাল। নেশার ঘোরে মাথা অল্প অল্প দুলছে। কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে দার্শনিকের মতো নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সে বলে, 'শিকদার

সাবের ম্যাজাজখান জবর তিতা হইয়া রইছে দেখি। দুই-এক ঢোক চলব নিকি? খাসা চীজ, কাইল আমতলির গঞ্জ থিকা লইয়া আইছি এক বোতল।'

'তোবা তোবা—' দুই কানে দু হাত ঠেকিয়ে জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়ে তমিজুদ্দিন। ধিক্কার দিতে দিতে বলে, 'এমুন কথা আর কইয়েন না ভুইয়া সাব, জব্বর গুনাহ্‌র কথা।' তার মুখচোখ দেখে মনে হয়, শাজাহানের প্রস্তাবে তার গা গুলিয়ে উঠেছে। দুনিয়ায় শরাব পানের মতো এত বড় অপরাধ আর বুঝিবা দ্বিতীয়টি নেই.

অগত্যা বড় ভুঁইয়াকে বলতেই হয়, 'আইচ্ছা থাউক ওই সগল। আপনের যখন ইচ্ছা নাই তখন কী আর করা!'

আশ্বস্ত হয়ে তমিজুদ্দিন শিকদার বলে, 'হ হ, ওই দোজখের পানির নাম আমার কাছে আর করবেন না। এইবার কামের কথাখান ক'ন। যেইর লেইগা আইছি তার কী হইল? কিছু কি করতে পারছেন?'

'আহা, এক্কেরে ঘুড়ার পিঠে চাইপা আইছেন য্যান। দুই দণ্ড জিরান, পান-তামুক খান, দুই-চাইরটা সুখ-দুঃখুর কথা হউক। তারপরে—' বলতে বলতে থেমে যায়।

তমিজুদ্দিন এমন ভালো ভালো কথাতেও খুশি হয় না। তার ছোট ছোট গোল চোখ দু'টো জ্বলে ওঠে যেন। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। উত্তেজনায় লাল ফেজটাকে ঘন ঘন খুলে আবার পরতে থাকে সে। তীব্র চাপা গলায় বলে, 'আইজ তিন মাস আপনের কাছে ধুরাঘুরি করতে আছি সাতটা মাইয়ার লেইগা। ঘুরতে ঘুরতে পায়ের হাড্ডি ঢিলা হইয়া গেল। আইজকার (আজকের) মইধ্যে আসমান হউক আর দোজখই হউক, মাইয়া আমার চাই-ই। মনে রাখবেন, নগদা ট্যাকা আপনেরে দিয়া গেছি পাচ শ।'

মাথা হেলিয়ে শাজাহান খোন্দকার বলে, 'হ। ট্যাকা যে দিছেন, একশত্ বার তা মানি। কিন্তুক কী করি ক'ন?' তাকে খানিকটা নিরুপায় মনে হয় এবার।

তমিজুদ্দিন হঠাৎ যেন শাজাহানের সমস্যা খানিকটা আঁচ করে বলে, 'আপনে নিচ্চয় পারতে আছেন না। আগে আগে কত মাইয়ামানুষ জুটইয়া দিছেন। কুনো ঝঞ্ঝাট কি হইছে?'

'না, ঝঞ্ঝাট হয় নাই। তয় কিনা, তেমুন ঢক-পদের মাইয়া পাইতে আছি না।'

গভীর দুর্ভাবনায় এবার ডুবে যায় তমিজুদ্দিন। বলে, 'আগের মাগীগুলান পলাইয়া যাওনে আমার রংমহল্লা এক্কেরে শূইন্য (শূন্য)। থাকনের মইধ্যে পইড়া রইছে টেরা আসমানী, লেংড়ি কুলসম আর আছে বুড়িধুড়ি হালিমা। ব্যবসা এক্কেরে মাথায় উঠছে। গঞ্জের বড় বড় পাইকাররা আইজকাল আর আসে না, বেবাক চইলা যায় উই মোহনগঞ্জে। একটা কিছু না করলে আমি গেছি।' গলার স্বর আগের মতো চড়া নেই। বড় ভুঁইয়ার দু হাত জড়িয়ে ধরে রীতিমতো মিনতিই জানাতে থাকে তমিজুদ্দিন।

শাজাহান বলে, 'সগলই বুঝি শিকদার সাব। চেষ্টার তো কসুর করি নাই। তয়—'

'তয় কী?'

'সাতটা মাইয়া আইজই দিতে পারুম না। একটা দেই। অখন এই দিয়াই কাম চালান। পরে আরো জুটাইয়া দিতে আছি।' বলে একটু থেমে, পরক্ষণে একটু দম নিয়ে ফের শুরু করে, 'কিন্তুক একখান কথা আছে এইর মইধ্যে।'

তমিজুদ্দিন জিগ্যেস করে, 'কী কথা?' তাকে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ দেখায়।

পানে ছোপানো লাল লাল টেরা-বাঁকা দাঁত মেলে অমায়িক হাসে শাজাহান। বলে, 'বোঝেনই তো, দিনকাল কেমুন পড়ছে। সগল জিনিসই বড় আক্রা। যুবুতী মাইযামানুষ হইলে তো কথাই নাই। জব্বর চড়া দাম। তাই কইতে আছিলাম---'

তমিজুদ্দিন উত্তর না দিয়ে পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

গলার ভেতর গ্যাদগেদে আওয়াজ করে শাজাহান বলে, 'আরো পাচ শ ট্যাকা না হইলে—হে হে, ভালো চীজের লেইগা ভালো দাম তো ধইরা দিতে হয়। আপনে বুঝমান মানুষ, আপনেরে আর কী বুঝামু?'

তমিজুদ্দিন প্রায় আঁতকে ওঠে, 'পাচ শ ট্যাকা! ক'ন কী খোন্দকার সাব! অ্যাত কাল আপনের লগে কারবার করতে আছি। এক এক মাইয়া এক শ ট্যাকা! আর পাইকারি সাতটা মাইয়া দিলে পাচ শ ট্যাকা। আর আপনে কিনা আইজ একটা মাইয়ার লেইগা চাইতে আছেন হাজার ট্যাকা!' শেষ দিকে তমিজুদ্দিনকে বেশ উত্তেজিত দেখায়।

শাজাহান উত্তর দেয় না, শুধু একটা ভুরু ওপরে তুলে, আরেকটা নামিয়ে, ঠোঁট টিপে মিটি মিটি হাসতে থাকে।

তমিজুদ্দিন এবার গলা চড়িয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলে, 'মশকরার এট্টা সময় আছে!'

তমিজুদ্দিনের রাগ উত্তেজনা ক্রোধ, কোনো কিছুই শাজাহান খোন্দকারের ওপর এতটুকু প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। একটা হাত তুলে একান্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে সে বলে, 'আহা হা, চটেন ক্যান শিকদার সাব? আপনের লগে অ্যাত কাল ব্যাপার (ব্যবসা) করতে আছি। কারবার করতে গিয়া কুনোদিন আপনের লগে মশকরা করছি! হাজার ট্যাকা যেমুন গইন্যা (গুনে) দিবেন, তেমুন মালও দেইখা শুইনা বুইঝা নিবেন। একখান কথা কই আপনেরে---'

'কী কথা?' অত্যন্ত অসন্তুষ্ট সুরে কপাল কুঁচকে জিগ্যেস করে তমিজুদ্দিন শিকদার।

'আপনে নিচ্চিন্ত থাকেন, আপনেরে ঠকামু না। এমুন মাইয়া হাজার ট্যাকায় দিমু যারে একবার দেখলে নবাব বাদশার তরি (পর্যন্ত) ভিরমি লাগব। এমুন মাইয়া দুনিয়ায় দুই চাইরটার বেশি পয়দা হয় না শিকদার সাব।' বলে নিঃশব্দে সেই মিটি মিটি হাসিটা দুই ঠোঁটের ওপর ফুটিয়ে তোলে। তারপর মুখটা তমিজুদ্দিনের বাঁ কানের ভেতর প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে হঠাৎ গলার স্বর ঝপ করে কয়েক পর্দা নামিয়ে বলে ওঠে, 'আমার নিজের ভোগের জিনিস, আপনের হাতে তুইলা দিমু। তিন মাস ধইরা আপনে ঘুরাঘুরি করতে আছেন, অতগুলান ট্যাকা আগাম গইন্যা দিয়া গেছেন. আইজও যদি ফিরাইয়া দেই অধম্ম হইব। যে জিনিস দিমু তারে আপনের রংমহল্লায় নিয়া তুললে সোনা মিয়া, ধলা মিয়া, কালা মিয়া, বোচা মিয়া, চোখা মিয়া—বেবাকে ওইখানে ঘেটি (ঘাড়) গুইজা পইড়া থাকব। কেউ বাড়িত্ ফিরতে চাইব না।'

তবু খুঁতখুঁত করতে থাকে তমিজুদ্দিন, 'কিন্তুক মোটে এট্টা মাইয়া!'

শাজাহান খোন্দকার জব্বর উপমা দিয়ে ভারিক্কি চালে এবার বলে, 'তমিজুদ্দিন সাব, আসমানে মিট মিট কইরা কত তারাই তো জ্বলে, কিন্তুক চান্দের (চাঁদের) লগে তাগো কি তুলনা হয়? যে জিনিস দিমু, আপনের রংমহল্লা এক্কেরে রোশনিতে ভইরা যাইব। ট্যারা কানা ল্যাংড়া দিয়া ভরলে ওইটা আর রংমহল্লা থাকে না, খোয়াড় হইয়া যায়।' একটু থেমে বিপুল উৎসাহে ফের শুরু করে, 'এ যেমুন আসমানের চান্দ তেমুন সোনার মোহর। হে—হে—' টেনে টেনে হাসতে থাকে শাজাহান।

তমিজুদ্দিনের খুঁতখুঁতুনি এবং সংশয় তবু কাটে না। সে সেই কথাটাই ফের আওড়ায়, 'তভু তো এট্টাই মাত্তর মাইয়া। নিজের চৌখে না দেইখা নেই ক্যামনে?'

শশব্যস্তে শাজাহান বলে ওঠে, 'সেই কি কথা! না দেইখা, যাচাই না কইরা নিবেন ক্যান? ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া, পা ও থেইকা মাথা তরি দেইখা তবে স্যান নিবেন। পছন্দ না হইলে নিতে কমু না। দামটা কিন্তুক উই হাজারই। একখান ফুটা কড়ি কম না।'

শেষ পর্যন্ত অনেক টালবাহানার পর মনস্থির করে ফেলে তমিজুদ্দিন। বলে, 'তাইলে একবার দেখাইয়াই ফালান।'

'নিচ্চয়। অখনই আনতে আছি।' তমিজুদ্দিনকে একা ঘরের মধ্যে রেখে ভেতর-বাড়ির দিকে চলে যায় শাজাহান খোন্দকার।

ভেতর-বাড়িতে বিশাল ঢালা উঠোন। সেখানে বসে কুলোয় তিল ঝাড়ছিল নাজিমা। কুলো নাড়ার তালে তালে তার পুষ্ট সুঠাম দেহ আশ্চর্য এক মোহ ছড়িয়ে দুলতে থাকে।

নিঃশব্দে নাজিমার পাশে এসে দাঁড়ায় শাজাহান।

ঝকঝকে ছুরির ফলার মতো অঘ্রানের দুপুর। চারিদিক নিঝুম হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঘুঘুর ডাক বাতাসে বিষাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

নাজিমার হাত ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে সুগোল স্তন দু'টি দোল খায়। সেদিকে তাকিয়ে চোখের তারা লোভে চকচকিয়ে ওঠে শাজাহানের। স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে যায়। এই মেয়েটা মাস কয়েক হল ছোট বিবি ফুলবানুর সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছে। প্রথম দেখেই শাজাহান ঠিক করে রেখেছিল, একে হাতছাড়া করবে না। নাজিমার এই মারাত্মক শরীর একান্তভাবে তারই জন্য যেন তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাড়িভর্তি লোকজন—তিন বিবি, তাদের জন বিশেক ছেলেমেয়ে। তা ছাড়া প্রচুর কামলা এবং বাঁদি।

নিজের একটা মানসম্মান আছে শাজাহানের। সে একজন মান্যগণ্য মানুষ। হুট করে তার পক্ষে একটা বাঁদিকে নিয়ে মেতে ওঠা ভালো দেখায় না। লোকলজ্জা তো আছেই, তা ছাড়া তিন বিবির যা মেজাজ! একটু এদিক ওদিক হলে তারা তার ওপব একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিশেষ করে ছোট বিবি ফুলবানু একেবারে বাঘিনী। সেদিন সামান্য কারণে শাজাহানের বুকের ওপর চড়ে ধারাল নখে তার পাঁজরার অনেকখানি মাংস খুবলে নিয়েছিল। তা শুকোতে দিন পনেরো সময় লেগেছে, তবে দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি। ওটা বোধহয় সারা জীবন থেকেই যাবে।

তবু শাজাহান ভেবে রেখেছিল, নাজিমাকে তার চাই। ওর শরীরটা দখল করতে না পারলে এই জীবনই বৃথা। তক্কে তক্কে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল শাজাহান। কিন্তু হঠাৎ আজ তমিজুদ্দিন শিকদার এসে হাজির। আর কী আশ্চর্য, খানিকটা টানা হ্যাঁচড়ার পর হাজার টাকা দিতে রাজিও হয়ে গেল।

আসলে মেয়েমানুষ নিয়ে তমিজুদ্দিন শিকদারের যে কারবার তাতে বহু যুবতী জোগান দিয়ে থাকে শাজাহান। তার সঙ্গে এ ব্যাপারে বহু দিনের লেন দেন। চর কিংবা বহুদূরের গাঁ থেকে গরিব ঘরের মেয়েদের দালাল লাগিয়ে জুটিয়ে আনে শাজাহান। কিছুদিন নিজের বাড়িতে পেট-ভাতায় কাজ করিয়ে তমিজুদ্দিনের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এবার দালালরা তেমন মেয়ে টেঁয়ে জোটাতে পারছিল না। অথচ তমিজুদ্দিন তিন মাস ধরে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে বাড়তি পাঁচশো টাকার লোভ শাজাহান যে দেখিয়েছে সেটা নাজিমার কথা মাথায় রেখেই। মনে মনে তার ধারণা ছিল, এত চড়া দামের কথায় ভড়কে যাবে তমিজুদ্দিন।

কিন্তু সে রাজি হয়ে যাওয়ায় ভেতরে ভেতরে খানিকটা হতাশই হয়ে পড়ে বড় ভুঁইয়া। পরক্ষণে তার খেয়াল হয়, নাজিমার মারাত্মক দেহটার চাইতে হাজারটা টাকা কম লোভনীয় নয়।

লুব্ধ চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চাপা গলায় শাজাহান ডাকে, 'নাজিমা—'

কুলো থামিয়ে দ্রুত ঘুরে বসে নাজিমা। মেয়েমাত্রই পুরুষের চোখের ভাষা বোঝে। বড় ভুঁইয়া তার কাছে কী চায় সেটা সে আন্দাজ করতে পারে। একটু ফাঁকা পেলেই সে তার কাছে এসে দাঁড়ায়। তবে একটাই বাঁচোয়া, এখানে গোটা বাড়ি সারাক্ষণ লোকজনে গম গম করে। এবাড়িতে কাউকে ফাঁকায় পাওয়াই মুশকিল। তা ছাড়া তিন বিবি তাদের স্বামীর স্বভাব খুব ভালো করেই জানে। তারা দিনরাত বড় ভুঁইযাকে চোখে চোখে রাখে।

কিন্তু এই দুপুর বেলা হঠাৎ নির্জন উঠোনে শাজাহানকে একা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় নাজিমা। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলে, 'কী ক'ন ভুইয়া সাব?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

পায়ের পাতা থেকে চুল পর্যন্ত নাজিমাকে দেখে নেয় শাজাহান। নাজিমার পরনে এই মুহূর্তে ময়লা ডুরে শাড়ি আর পিঁজে-যাওয়া জামা। রুক্ষ চুল উড়ছে। মুখটা ধুলো আর ঘামে মাখা।

শাজাহানের তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না নাজিমা। মুখ নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর একসময় শাজাহান বলে, 'উঁহু উঁহু, এয়াতে (এতে) হইব না। তরাতরি ঘরে গিয়ে চুল পাইট (পাট) কইরা বাইন্ধা আয়। মুখ ধুইয়া, কপালে সবুজ টিপ পরবি। আর তোর পাতাবাহার শাড়িখান পইরা আসবি। যা--'

দ্রুত মুখ তোলে নাজিমা। ভয় ছাপিয়ে এবার তার চোখেমুখে অসীম বিস্ময় ফুটে বেরোয়। বড় ভুঁইয়া তাকে কেন সেজেগুজে পটের বিবি হয়ে আসতে বলছে, কিছুই মাথায় ঢোকে না। বিমূঢ়ের মতো সে বলে, 'আমার পাতাবাহারী শাড়িখান ছিড়া গেছে ভুইয়া সাব।'

'তয় এক কাম কর। আমার মাইঝা বিবি আসমানীর একখান ঝলমইলা পাটের শাড়ি আছে। সেইখান পইরা আয়।'

নাজিমা আঁতকে ওঠে, 'বিবিজানের শাড়ি আনুম কেমনে? জানতে পারলে আমারে তাজাই গোরে পাঠাইব। এমুন সব্বনাইশা কাম আমি পারুম না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে শাজাহান বলে 'ঠিকই ক'স। আইচ্ছা তুই এইখানে এট্টু খাড়া (দাঁড়া), আমি একখান শাড়ি লইয়া আসি।'

কোত্থেকে কার শাড়ি জুটিয়ে আনবে, ফলে তার কী প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, ভাবতে ভাবতে দম আটকে আসে নাজিমার।

কিছুক্ষণ পর কী একটা লুকিয়ে নিয়ে এধারে ওধারে সতর্কভাবে তাকাতে তাকাতে নাজিমার কাছে চলে আসে শাজাহান। পিরহানের তলা থেকে একখানা দামি শাড়ি আর জামা বার করে নাজিমাকে দিতে দিতে বলে, 'যা, এইখান পইরা আয়।'

এটা আসমানী বিবিজানের পাটের শাড়ি না, তবে কার কে জানে। হয়তো বড় কি ছোট বিবিজানের। যারই হোক, ধরা পড়ে গেলে তাকে ওরা নির্ঘাত শেষ করে ফেলবে। কাঁপা গলায় নাজিমা বলে, 'কিন্তুক—'

তার মনোভাব বুঝতে পারছিল বড় ভুঁইয়া। বলেন, 'ডরাইস না। আমি সামলামু। যা—যা—'

বড় ভুঁইয়ার মুখের ওপর কথা বলার রীতি নেই এ বাড়িতে। সে যা হুকুম দেবে, কাজের লোকেদের মাথা পেতে বিনা প্রতিবাদে তা তামিল করতে হয়ে। তবু নিজের অজান্তে ফস করে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে নাজিমার মুখ থেকে, 'এই শাড়ি পিন্ধা (পরে) কই যামু?'

'তোরে আমি শাদি দিমু। পোলার বাড়ি থেইকা তোরে দেখতে আইছে। তাগো কাছে এট্টু সাইজা গুইজা না গেলে কি হয়!'

কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থাকে নাজিমা। এমন অবিশ্বাস্য প্রস্তাব আগে কেউ তাকে দেয় নি। তার মতো মেয়ের শাদি হতে পারে, এমন বিস্ময়কর ঘটনা দুনিয়ায় ঘটা সম্ভব বলে সে কোনোদিন ভাবতে পারে নি। নাজিমা শুধু বলতে পারে, 'আমার শাদি দিবেন!'

'হ। আর খাড়ইয়া থাকিস না।' একরকম ঠেলতে ঠেলতেই শাজাহান খোন্দকার নাজিমাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। শুধু তাই না, শাড়িটাড়ি বদলানো না হওয়া পর্যন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। নাজিমা বেরিয়ে এলে তাকে সঙ্গে করে বাইরের ঘরে যেখানে তমিজুদ্দিন শিকদার অপেক্ষা করছে, সটান সেখানে নিয়ে আসে।

তমিজুদ্দিন অস্থির পায়ে ঘরময় পায়চারি করছিল। স্নায়বিক উত্তেজনায় মাথার লাল ফেজটা বার বার খুলে বার বার তালুর ওপর বসিয়ে দিচ্ছিল। পাঁচ শো আগাম দেওয়া আছে। কে বলতে পারে, তাকে এখানে বসিয়ে রেখে পেছনের দরজা দিয়ে শাজাহান খোন্দকার ভেগে পড়ল কিনা। পরক্ষণে সন্দেহটা অবশ্য নিজেই উড়িয়ে দেয়। শাজাহান কারবারী মানুষ। ক'টা টাকার জন্য এমন কাজ করবে না। তা ছাড়া নিজের ঘরবাড়ি ফেলে সে যাবেই বা কোথায়?

তার এই সব এলোমেলো ভাবনা চিন্তার মধ্যে নাজিমাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে শাজাহান।

নাজিমার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ তমিজুদ্দিনের চোখে পাতা পড়ে না। তার মনে হয়, এ মেয়ের দাম হাজার টাকা তো কিছুই না, হওয়া উচিত এক লাখ সোনার মোহর।

নাজিমার দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বসে পড়ে তমিজুদ্দিন শিকদার।

শাজাহান খোন্দকার বলে, 'এই সেই মাইয়া। দেইখা, বাজাইয়া, পরখ কইরা নেন।'

তাকিয়ে থাকতে থাকতে তমিজুদ্দিনের চোখ ঝকঝক করতে থাকে। গালের কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে আসবে যেন। রক্তের মধ্যে তার আগুনের হলকা ছুটতে থাকে। ফেজটা আরো বারকতক খুলে এবং পরে নিয়ে চাপা লুব্ধ গলায় সে বলে, 'ঠিকই কইছেন খোন্দকার সাব, ছুরাৎ (রূপ) এক্কেরে ডানা-কাটা হুরীর লাখানই।'

লোকটার তাকানো, কথা বলার ভঙ্গি—সব কিছুর মধ্যে কদর্য কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। নাজিমার বুকের ভেতরটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে ভীরু পাখির মতো। তমিজুদ্দিন শিকদারকে আগে সে কোনোদিন দেখে নি, তার সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণাই নেই। তবু মধ্যবয়সী এই লোকটাকে দেখামাত্র মনে হয়েছে, এ মানুষ ভালো না। এ কার সঙ্গে তার শাদির ব্যবস্থা করেছে বড় ভুঁইয়া!

শাজাহান জিগ্যেস করে, 'মাইয়া দেখা নি হইছে শিকদার সাব?'

'অখনকার মতো হইল। ইচ্ছা হয়, তামাম জীবন ওরে দেখি। ঠিক আছে, পরে ফির দেখা যাইব ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া, পরানের আশ মিটাইয়া।'

শাজাহান এবার নাজিমাকে চলে যেতে বলে। নাজিমা মুখ নামিয়ে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে টের পায়, হাঁটুদু'টো ঠকঠক কাঁপছে।

শাজাহান চারপাশ তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করে। নাঃ, সে আর তমিজুদ্দিন ছাড়া কাছাকাছি কেউ নেই। তমিজুদ্দিনের গা ঘেঁষে বেশ ঘন হয়ে বসে সে। নিচু গলায় বলে, 'পছন্দ যখন হইয়াই গেছে, তাইলে আর পাচশো ট্যাকা—'

'নিচ্চয় দিমু—'

কোমরের গেঁজে থেকে একশো টাকার পাঁচখানা পাকানো নোট বার করে শাজাহানের হাতে তুলে দেয় তমিজুদ্দিন। বলে, 'এই নেন। পুরা দাম চুকাইয়া দিলাম। আজই রাইতের মইধ্যে মাইয়াটারে লইয়া যামু কিলাম।'

বরাবরই শাজাহান দেখে এসেছে টাকাপয়সার ব্যাপারে হাত খুব দরাজ তমিজুদ্দিনের। মুখ দিয়ে জবান একবার বেরিয়ে গেলে সেটা সে রাখবেই। নোটগুলো পকেটে গুঁজতে গুঁজতে শাজাহান বলে, 'নিচ্চয় নিবেন। আপনের জিনিস আপনে ছাড়া কে নিব? অখন খাওন দাওন কইরা এট্টু জিরান। রাইতে যাওনের বন্দোবস্ত কইরা দিমু।'

তিন

উত্তর দিকের বাগিচা জুড়ে শুধু সুপুরি গাছ। থোকা থোকা সুপুরি পেকে কাঁচা সোনার রং ধরেছে।।

হাসেম সেই দুপুর থেকে সুপুরি পাড়ছে। এখন অঘ্রানের বেলা বেশ হেলে গেছে। অজস্র সুপুরির ছড়া মাটিতে পড়ে আছে টাল দিয়ে।

সুপুরি গাছগুলো এমন ঘন করে লাগানো হয় যে একটা গাছে উঠলে আর নামতে হয় না। এক গাছের আগা থেকে আরেক গাছের আগায় চলে যাওয়া যায় খুব সহজেই।

হাসেম দুর্দান্ত গাছ বাইতে পারে। সেই যে দুপুরে সে গাছের মাথায় চেপেছিল, এখনও নামে নি। গাছে গাছে ঘুরে সুপুরি পেড়েই চলেছে।

নাজিমা তমিজুদ্দিনের কাছ থেকে সোজা নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। সেখানে দামি শাড়ি বদলে নিজের তালি-মারা শাড়িটা পরে নেয়। বড় ভুঁইয়ার দেওয়া শাড়িটা পরে থাকতে ভরসা পায় নি সে। ওটা নিশ্চয়ই ভুঁইয়ার কোনো এক বিবির কাপড়। তার চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এধারে ওধারে তাকাতেই নাজিমা দেখতে পায়, সব চেয়ে উঁচু যে সুপুরি গাছটা আকাশ ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে তার আগায় বসে দা দিয়ে পাকা সুপুরির ছড়া কাটছে হাসেম।

নিচে থেকে নাজিমা ডাকে, 'নাইমা আয় তরাতরি। জবর খবর দিমু।'

এক মুহূর্তও দেরি করে না হাসেম। বনবিড়ালের মতো তর তর করে গাছ বেয়ে নেমে আসে। একটা লুঙ্গি গুটিয়ে মালকোচা করে পরা ছাড়া তার গায়ে আর কিছু নেই। বড় ভুঁইয়ার পয়জারের ঘা খেয়ে তার পিঠের চামড়া ফেটে গিয়েছিল। পিঠময় রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। সেদিকে চোখ পড়তে ভীষণ কষ্ট হতে থাকে নাজিমার। বলে, 'বড় ভুঁইয়া য্যান কী! মনিষ্য না। এমুন কইরা মারে!'

সহানুভূতির ছোঁয়ায় বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায় হাসেমের। রুদ্ধ গলায় সে বলে, 'আমি আর এইখানে থাকুম না নাজিমা। দিনরাইত অ্যাত কাম যে উয়াস (শ্বাস) ফালানের সোময় পাই না। তার উপুর মাইর। এমুন মাইর আর সইহ্য হয় না। ইনামগঞ্জে যে গয়নার নাও আসে, সেই নাওয়ে মাঝি হইয়া চইলা যামু।'

নাজিমা ভয় পেয়ে যায়। সতর্ক চোখে দ্রুত চারিদিক দেখে নিয়ে বলে, 'চুপ চুপ, এমুন কথা কুনোদিন মুখেও আনিস না।'

'ক্যান, চুপ থাকুম ক্যান?'

'আমরা হইলাম বান্দা আর বান্দি। আমাগো কি পলানের কথা ভাবন (চিন্তা করা) উচিত? আমাগো জনম হইল পরের বাড়িতে খাইটা খাইটা জানটা শ্যাষ কইরা ফেলান। মনে নাই, কী কইয়া আমরা এই বাড়িতে আইছিলাম? যত কাল বড় ভুঁইয়া আমাগো না ছাড়তে আছে, এইখানেই থাকতে হইব। সে যা কইব হেয়াই (তাই) করতে লাগব। আমাগো মুক্তি নাই।'

আজ কিছু একটা যেন ভর করেছে হাসেমের ওপর। অসীম দুঃসাহসে সে বলে, 'আমি পলাইয়া যামু। কেউ আমারে ধইরা রাখতে পারব না।' বলতে বলতে নাজিমার একটা হাত দু হাতে আঁকড়ে ধরে, 'যাবি তুই আমার লগে? যাবি?'

বিজলি চমকের মতো কী যেন খেলে যায় নাজিমার রক্তের ভেতর। আগে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা কত কথা বলেছে। কিন্তু এই প্রথম নাজিমাকে ছুঁল হাসেম। চোখ নামিয়ে নাজিমা কাঁপা গলায় বলে, 'কুনখানে যাইতে চাস?'

অঘ্রানের বেলা আরো হেলতে শুরু করে। রোদের রং বদলে যাচ্ছে দ্রুত। বাতাসের তাপ জুড়িয়ে আসছে। দূরে কুঁজিকাঁটা আর বেতের ঝোপে ডাহুকেরা থেকে থেকে ডেকে উঠছে।

দূর দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হাসেম বলে, 'উই দিকে ম্যাঘনার চরে আমার এক ফুফু থাকে। চল যাই, তার কাছে যাই গা। গয়নার নাওয়ে কাম করুম। দুই ট্যাকা রোজ আর খোরাকি। উঠতে বইতে (বসতে) বড় ভুইয়ার কিল, গুতা আর পয়জারের বাড়ি খাইতে হইব না। যাবি আমার লগে?' উৎসাহে চোখ দু'টো চকচক করতে থাকে তার।

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাজিমা বলে, 'আমি আর কই যামু? ফুফু তো তোর। কুন সম্পক্ক ধইরা সেইখানে যামু?' বলে চোখের কোণ দিয়ে হাসেমের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে থাকে।

হাসেমের মুখ ম্লান দেখায়। নাজিমার সঙ্গে সে মনে মনে কোন মধুর সম্পর্ক তৈরি করে রেখেছে আর তারই সুবাদে এবং জোরে যে মেঘনার চরে ফুফুর বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়, মুখ ফুটে সাহস করে তা আর বলতে পারে না। হাসেম শুধু বলে, 'আমার ফুফু তোর কেউ হয় না?'

হাসেমের দিকে চোখ রেখে নাজিমা বলে, 'আমার আবার কী হইব? হেয়া (তা) ছাড়া—'

সব উদ্যম যেন হারিয়ে ফেলেছে হাসেম। শিথিল গলায় বলে, 'হেয়া ছাড়া কী?'

'আমার শাদি হইব দুই চাইর দিনের মইধ্যে।'

'তোর শাদি হইব!' উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিগ্যেস করে হাসেম।

নির্বিকার মুখ করে নাজিমা বলে, 'ক্যান, আমার শাদি হইতে নাই? দুনিয়ায় এত মাইনষের শাদি হয়, রাজার হয়, বাদশার হয়, ভিখারীর হয়—আমার হইলেই দোষ নিকি?' বলে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে থাকে।

বুকের ভেতর হাজারটা ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে যেন হাসেমের। মনে হয়, পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

নাজিমা বলে, 'কী হইল তোর? মুখে দেখি রাও (কথা) নাই? ভাবিস না, সোয়ামীর ঘর করতে যখন যামু তোরে আমার বান্দা কইরা লগে নিমু।'

এবার গলার ভেতর থেকে স্বরটাকে অনেক কষ্টে বার করে আনতে পারে হাসেম। বলে, 'সাচাই (সত্যিই) তোর শাদি হইব?' কথাগুলো গোঙানির মতো শোনায়।

নাজিমা বলে, 'আমি তোর লগে মশকরা করি নিকি! পরানের নাগর আমার! মশকরা কবনের আর মানুষ নাই দুনিয়ায়?'

বাজ পড়া মানুষেব মতো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে হাসেম। তারপর শ্বাস টানার মতো শব্দ করে জিগ্যেস করে, 'কার লগে তোর শাদি?'

ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে, এদিক থেকে ওদিক থেকে ঘুরে ফিরে হাসেমকে দেখতে দেখতে নাজিমা বলে, 'আর যার লগেই হউক, তোর লগে না।' একটু থেমে বলে, 'দ্যাখ গিয়া, বাইরের ঘরে ভুইয়া সাবের কাছে আমার ভাতার বইসা আছে। কী ছুরাৎ! মাথায় বান্দরের লাখান চুল, চাম (চামড়া) ঝুইলা পড়ছে, বয়স হইব তিন কুড়ি। যা যা, দেইখা আয়।'

একেবারে দিশেহাবা হয়ে পড়ে হাসেম। কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

নাজিমা ফের তাড়া লাগায়, 'কি রে, গেলি না?'

হাসেম এবারও চুপ।

নাজিমা বলতে থাকে, 'গুসা হইছে? এট্টু আধটু হওনের কথাই। আমারে দুই দণ্ড না দেখলে তুই তো আবার চৌখে আন্ধার দ্যাখস। কিন্তুক কিছুই করনের নাই রে হাসমা। তমিজুদ্দিন শিকদারের কাছে আমারে এট্টু আগে লইয়া গেছিল বড় ভূইয়া। চোখমুখ দেইখা মনে হইল আমারে জব্বর পছন্দ হইছে তমিজ মিয়ার। এই শাদি কেউ ঠেকাইতে পারব না।' বলতে বলতে গলার স্বর একেবারে বদলে যায়। কেমন যেন ধরা ধরা, ভাঙা ভাঙা। আচমকা দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নাজিমা।

হাসেম খুব সাদাসিধে মানুষ। এতক্ষণ তার সঙ্গে যে নাজিমা তামাশা করছিল সেটা সে ধরতে পারেনি। হঠাৎ তার কান্নায় একেবারে হকচকিয়ে যায়।

নাজিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে জড়ানো গলায় বলে, 'বড় ভুইয়া দোজখ থিকা একটা ইবলিশ ধইরা আনছে। খোদ শয়তানের লাখান দেখতে। বাইরের ঘরে যাইতে দুই চৌখ দিয়া আমারে য্যান গিলতে লাগল। বড় ভুইয়া ওর লগেই আমার শাদি দিতে চায়।'

হাসেম একেবারে ভেঙে পড়ে। বলে, 'অখন উপায়?'

'তুই পুরুষ মানুষ না? উপায় তো তুই বাইর করবি।' নাজিমা বলতে থাকে, 'কইলি না ম্যাঘনার চরে তোর ফুফুর কাছে লইয়া যাবি। এইখান থিকা এমুনভাবে পলামু য্যান জনমনিষ্যে ট্যার না পায়। তুই যা বলদা (বোকা), আবার কারো কাছে কইয়া ফেলাইস না। এক্কেরে মুখ বুইজা থাকবি।'

'আইচ্ছা।'

হাসেম কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ডাকটা শোনা যায়, 'নাজিমা—'

চমকে দু'জনে বাঁ দিকে তাকায়। বড় ভুঁইয়া শাজাহান খোন্দকারের তিন নম্বর বিবি ফুলবানু কখন যে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে, তারা টের পায় নি। অঘ্রানের ঝকঝকে আকাশ থেকে এই পড়ন্ত বেলায় আচমকা বাজ পড়লে যা হত সেইরকম প্রতিক্রিয়াই ঘটে দু'জনের। নাজিমা এবং হাসেম একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

কয়েক মাস আগে এই ফুলবানুকেই ইদিলপুর থেকে শাদি করে এনেছিল বড় ভুঁইয়া শাজাহান খোন্দকার। এর সঙ্গেই জীবন্ত যৌতুক হয়ে নাজিমা এ বাড়িতে ঢুকেছিল।

ফুলবানুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে পরতে পরতে সব রক্ত সরে যায়। ভয়ে, আতঙ্কে নাজিমা কাঁপতে থাকে।

ফুলবানুর চোখ এখন ধকধক করছে। গলার শির ছিঁড়ে সে চেঁচায়, 'কতক্ষণ ধইরা ডাইকা ডাইকা গলা ফাইড়া ফালাইলাম, তবু হুমৌর (সাড়া) নাই! ভাবলাম, গেল কই শয়তানের ছাও? বিচরাইতে বিচরাইতে (খুঁজতে খুঁজতে) এইখানে আইসা দেখি কিনা হাসমার লগে ঢলাইয়া ঢলাইয়া পিরিত করে! আয় আমার লগে, তোরে আইজ শ্যাষ করুম।'

বড় ভুঁইয়ার তিন বিবির মধ্যে কাঁচা বয়সের এই ছোট বিবিটির মেজাজ মারাত্মক। প্রথমত সে পয়সাওলা ঘরের মেয়ে, তার ওপর বয়সটা কম, দেখতেও সুন্দর। রূপের এবং বাপের বাড়ির টাকার দেমাকে সর্বক্ষণ মকমক করে। মধ্যবয়সী বড় ভুঁইয়া তার সামনে ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে থাকে। এই ভুঁইয়া বাড়িতে তার ওপর কথা বলার কেউ নেই।

ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে নাজিমা, কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না।

ফুলবানু গলা আরেক পর্দা চড়িয়ে দেয়। হাসেমের দিকে আঙুল তুলে বলে, 'উই হারামজাদার লগে পলানের মতলব করতে আছস—না?'

নাজিমার বকের ভেতর শ্বাস আটকে যায়। কোনোরকমে সে বলতে পারে, 'না বিবিজান, না—'

ফুলবানু ভেংচে ওঠে, 'না বিবিজান! আমি য্যান কিছুই শুনি নাই? আয় আমার লগে। আয়---' প্রায় ছোঁ মেবে নাজিমার একটা হাত তুলে ধরে টানতে টানতে তাকে ভেতর-বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে থাকে সে।

চার

এক হাতে ধরা রয়েছে নাজিমা। আর এক হাতে ঝোপ থেকে আটকিরার একটা ডাল ভেঙে নেয় ফুলবানু এবং সমানে নাজিমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে চেঁচাতে থাকে।

তার চিৎকারে ভুঁইয়া বাড়ির অন্য কামলা আর বাঁদিরা তটস্থ হয়ে ওঠে। তারা ভয়ে ভয়ে দূরে সরে যায়।

ভেতর-বাড়ির উঠোনে এসে নাজিমার হাত ছেড়ে তাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় ফুলবানু। আটকিরার ডালটা দিয়ে গায়ের জোরে একটা ঘা বসায় নাজিমার কাঁধে। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে নাজিমা। বলে, 'মাইরেন না বিবিজান, মাইরেন না। আমি আপনের কী করছি! তার থিকা আমারে ছাইড়া দ্যান। যেই দিকে দুই চৌখ যায়, যাই গিয়া।'

হাতের ডালটা দ্বিতীয় বার ওপরে তুলতে গিয়ে একেবারে থ হয়ে যায় ফুলবানু। যে বাঁদির চিরদিন মুখ বুজে বোবা হয়ে থাকার কথা সে কিনা গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বার করেছে! ফুলবানুর বিস্ময় আরো এক কারণে, তার মুখের ওপর এভাবে কেউ কোনোদিন প্রতিবাদ জানায় নি। এত দুঃসাহস এই বাঁদিটার হল কী করে!

প্রাথমিক বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে অসহ্য রাগে ফুলবানুর মাথার ভেতর যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তার দু চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, 'কুত্তার ছাও, কথার খই ফুটছে মুখে! পলাইয়া যাওনের মতলব করছ!'

আটকিরার ডাল বাতাসে সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে নাজিমার মুখে বুকে পিঠে হাতে কেটে কেটে বসতে থাকে। চামড়া ফেটে দাগড়া দাগড়া হয়ে যায়, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে।

দাঁতে দাঁত চেপে, দমবন্ধ করে মার সয়ে যায় নাজিমা। কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও আজ বেরোয় না। তার ওপর এই মুহূর্তে অলৌকিক কোনো শক্তি যেন ভর করে বসেছে। সে ঘোরের মধ্যেই বলে যায়, 'হ হ, পলাইয়া যাইতেই চাই। থাকুম না এইখানে। সুযুগ পাইলেই ভাইগা যামু। এমুন মাইর আর সইহ্য হয় না।'

'কেমনে তুই পলাইয়া যাইস, দেখুম।' আটকিরার ডাল নির্মম আক্রোশে অবিরাম আছড়ে পড়তে থাকে নাজিমার ওপর।

এই সময় বড় ভুঁইয়া ভেতর-বাড়িতে এসে একেবারে হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'আহা হা, ওরে মারো ক্যান? কী এমুন দুষ (দোষ) করল ছেমরিটা (মেয়েটা)?'

মারতে মারতে হাঁপিয়ে গিয়েছিল ফুলবানু। স্বামীর দিকে ফিরে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে, 'মারুম না তো কি সুহাগ করুম? কুর্মা-পুলাও খাওয়ামু? জানো, শয়তানের ছাওটা উই বান্দার লগে পলানের মতলব করতে আছিল। সেই সোময় ধইরা ফালাইলাম।'

এত বড় একটা দুঃসংবাদ শুনেও পুরোপুরি নির্বিকার থাকে শাজাহান খোন্দকার। নিস্পৃহ মুখে বলে, 'মতলব করছিল কিন্তুক পলাইয়া তো যাইতে পারে নাই। মাইর ধইর না কইরা উই পাটের গুদামে ঢুকাইয়া বাইরে থিকা ছিকল তুইলা দাও।'

বড় ভুঁইয়ার প্রস্তাবটা মনঃপূত হয় ফুলবানুর।

শাজাহান ফের বলে, 'তুমার লগে একখান দরকারি কথা আছে বিবিজান। আসো আমাব লগে।'

দক্ষিণ দিকে পাটগুদামে নাজিমাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয় ফুলবানু। তারপর বড ভুঁইয়ার সঙ্গে পুবের ঘরখানায় চলে আসে। বড় ভুঁইয়া বলে, 'এট্টা কথা কমু। গুসা করবা না তো?'

'ধানাই পানাই না কইর, ড্যাকরা কইলেই পারে।' ফুলবানুর গলা থেকে এক ঝলক মধুবর্ষণ হয়।

হাত কচলাতে কচলাতে বড় ভুঁইয়া বলে, 'কই কি, তোমার লেইগা সোনার রুলি, গোট, রূপার মল বানাইতে দিমু।' বলে ফুলবানুর মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে লক্ষ করতে থাকে।

তীক্ষ্ণ চোখে স্বামীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নেয় ফুলবানু। নাঃ, তার সঙ্গে মশকরা করছে না বড় ভুঁইয়া, মিথ্যে স্তোকও দিচ্ছে না বলে মনে হয়। এবার রীতিমতো খুশি হয় ফুলবানু। হেসে হেসে বলে, 'তুমি আমার সোয়ামী, সুহাগ কইরা দিতে চাও তো দিবা। কিন্তুক ঘরে আইনা লুকাইয়া চুরাইয়া কওনের কামটা কী?'

'তুমার এত বুদ্ধি কিন্তুক এট্টা কথা বোঝো না ক্যান? অন্য বিবিরা আছে না? তারা জানতে পারলে আমার বুকের চাম (চামড়া) টাইনা তুইলা ফেলাইব।'

'হ, ঠিকই।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ফুলবানু।

'আর একখান কথা।' বলতে বলতে হাত কচলানি আরো বেড়ে যায় বড় ভুঁইয়ার।

স্বামীর কাঁচুমাচু মুখ দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে ফুলবানু। বড় ভুঁইয়া বলে, 'আমি একখান কাম কইরা ফেলাইছি। খেইপা উঠবা না কিলাম।'

সন্দেহটা আরো বেড়ে যায় ফুলবানুর। সে বলে, 'কী কাম?'

শাজাহান বলে, 'শাদির পর তুমার লগে যে বান্দিটা আইছিল তারে আমি বেইচা দিছি।'

ফুলবানু চমকে ওঠে, 'উই নাজিমারে?'

সে আর কিছু বলার আগে পকেট থেকে পাঁচশো টাকার নোটগুলো বার করে তার হাতে গুঁজে দিতে দিতে শাজাহান বলে, 'তুমার রুলি, গোট, মলের দান। বান্দিটারে বেইচা এই ট্যাকা মিলছে।'

নগদ টাকার মহিমা অসীম। বাঁদি হাতছাড়া হয়ে যাবার রাগ এবং ক্ষোভ পলকে মিলিয়ে যায় নাজিমার। সে বলে, 'তুমি আমার সোয়ামী। তুমি যা কইবা তাই হইব। তারে কাইটা ফালাও, মাইরা ফালাও, বেইচা দাও—যা পরানে চায় তাই কর। কিন্তুক আমার উই রুলি গোট মল তিনদিনের ভিতর চাই।'

'নিচ্চয়। আইজ রাইতেই বান্দিটারে তমিজুদ্দিন শিকদারের নাওয়ে তুইলা দিমু কিলাম।' খুশিতে শাজাহান খোন্দকারের চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। নাজিমাকে তমিজুদ্দিনের হাতে তুলে দেবার একটাই বড় বাধা ছিল, তা হল ফুলবানু। সে বাধাটাও পার হওয়া গেছে। এখন শাজাহানের মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, একটা দিগ্বিজয় করে ফেলেছে সে।

পাঁচ

গুদামের ভেতর সোনালি পাটের স্তূপের ওপর বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে নাজিমা। দূরে বাঁশঝাড় আর রোয়াইল গাছগুলোর মাথায় বেলাশেষের রঙিন আলো আটকে আছে। নাজিমা ভাবছিল, তার বাঁদির জীবন কোনোদিনই শেষ হবে না। চিরকাল এই গুদামের ভেতর আটকে থাকতে হবে। সে বুঝতে পারছে না, বড় ভুঁইয়া আর ফুলবানু তাকে নিয়ে এখন কী ফন্দি আঁটছে।

বাইরে শেকল খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ঘরের ভেতর এসে ঢুকল রোকেয়ার আম্মা। তার হাতে মাটির সানকিতে মোটা মোটা রাঙা আউশ চালের ভাত আর বেগুনের ছালুন।

রোকেয়ার আম্মার বয়স যে কত—ষাট, সত্তর না আশি—তার হিসেব নেই। সারা গায়েব চামড়া কুঁচকে একেবারে জালি জালি। চোখে ছানির সর পড়েছে। পাঁচ হাত দূরের কিছু ভালো দেখতে পায় না।

রোকেয়ার আম্মাও নাজিমার মতোই ভুঁইয়া বড়ির বাঁদি। ভুরুর ওপব হাত রেখে চারিদিক ঠাওর করতে করতে সে বলে, 'নাজিমা কই লো?'

নাজিমা বলে, 'এই যে এইখানে।' পাটের স্তূপের ওপর থেকে নিচে নেমে আসে সে।

রোকেয়ার আম্মা বলে, 'তোর লেইগা ভাত আর ছালুন আনছি। খা।' তারপর গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে দেয়, 'দ্যাখ তো আর কেউ এইখানে আছে নিকি?'

নাজিমা বলে, 'না।'

রোকেয়ার আম্মা কাছে এগিয়ে এসে নাজিমার কানের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে ফিস ফিস করে, 'উত্তরের ঘরের বেড়ায় আড়ি পাইতা শুনছি ভুইয়া সাব তোরে বেইচা দিছে হাজার ট্যাকায়। আইজ রাইতেই তোরে চালান কইরা দিব কোন এক শিকদারের লগে। তোরে বেচার ট্যাকা দিয়া নয়া বিবির মল রুলি কিন্যা দিব।'

'কী কইলা আম্মা!' প্রায় চিৎকার করে ওঠে নাজিমা।

রোকেয়ার আম্মা ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলে, 'চুপ মার পেত্নীর ছাও। এই সগল কথা বড় ভুঁইয়ার কানে গেলে তোরে আমারে দুই জনেরেই শ্যাষ কইরা ফালাইব।'

'কিন্তুক বড় ভুঁইয়া যে দুফারে কইল আমারে শাদি দিব!'

'মিছা কথা। শাদির নাম না করলে তুই যদিন যাইতে না চাস। বড় ভুঁইয়াটা এট্টা শকুন। আর শোনলাম উই শিকদারটা মানুষ ভালো না—সাইক্ষাৎ ইবলিশ।'

করুণ মুখে নাজিমা এবার বলে, 'আমারে ছাইড়া দাও আম্মা। অখনই আমি পলামু।'

'এইটা আমি পারুম না লো নাজিমা। নয়া বিবি আর বড় ভুঁইয়া তোরে নজরে নজরে রাখছে। হুইশার (হুঁশিয়ার) থাকবি।'

পাটগুদামে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা নেমে আসে।

একসময় কী ভেবে খুব শান্ত গলায় নাজিমা বলে, 'আমারে কেমুন কইরা লইয়া যাইব, তুমি জানো?'

'শুনছি নাওয়ে কইরা নিব।'

'কখন?'

'রাইতে।'

'আমার একখান উপকার করবা আম্মা? তামাম জনম তোমার বান্দি হইয়া থাকুম।' বলতে বলতে মাটিতে বসে পড়ে রোকেয়ার আম্মার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে নাজিমা।

'আরে ওঠ, ওঠ ছেমরি। পা ও ছাড়—' একরকম জোর করেই নাজিমাকে টেনে তোলে রোকেয়ার আম্মা। বলে, 'কী করতে ক'স আমারে?'

'হাসেমরে কইবা সন্ধ্যার সময় য্যান গিবিগুঞ্জের হাটে হিজলের জঙ্গলটার কাছে খাড়াইয়া থাকে। কইবা তো?' দুনিয়ার সবটুক আকুলতা নিয়ে রোকেয়ার আম্মার দুই কাঁধ আঁকড়ে ধরে নাজিমা।

বুড়ি দ্বিধান্বিতের মতো খানিকক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, 'আইচ্ছা।'

'কেও য্যান এই কথাখান জানতে না পারে।'

'আইচ্ছা।'

রোকেয়ার আম্মা আর দাঁড়ায় না। বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে চলে যায়।

আর আস্তে আস্তে জানালার পাশে গিয়ে অন্যমনস্কর মতো বাইরে তাকায় নাজিমা। ভাত আর ছালুন মাটির সানকিতে পড়েই থাকে।

ছয়

সন্ধের পর একখানা বড় ঘাসি নৌকোয় তমিজুদ্দিনের সঙ্গে নাজিমাকে তুলে দিয়েছে বড় ভুঁইয়া। এখন নৌকোটা বিশাল জলপোকার মতো তরতর করে এগিয়ে চলেছে। চারজন মাঝি সমানে বৈঠা বাইছে। জল কাটার একটানা ছপ ছপ আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

কিছুক্ষণ আগে রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ উঠে এসেছে দিগন্তের তলা থেকে। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে গোটা চরাচর। হীরের বুটির মতো অগুনতি তারা ছড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে।

এদিকে নৌকোর ছইয়ের ভেতর বসে আছে নাজিমা, খানিক দূরে তমিজুদ্দিন শিকদার। এক কোণে হেরিকেন জ্বলছে। সেটার আলো বেশ জোরাল।

তিন হাত দূরে ডানা-কাটা হুরীর মতো এক যুবতী। নিজের স্নায়ুতে প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ করছিল তমিজুদ্দিন শিকদার। হাত বাড়ালেই নাজিমাকে ধরা যায়, তবু অসীম সংযমে নিজেকে আটকে রেখেছে সে।

মেয়েটা আশ্চর্য যাদুকরী। তমিজুদ্দিন শিকদার তার প্রায় ষাট বছরের জীবনে কম মেয়ে তো ঘাঁটে নি। নিজের বিবি চার চারটি। তা ছাড়া তার যে রংমহল রয়েছে সেখানে জল-বাংলার নানা দিগন্ত থেকে কত যুবতী যে জুটিয়ে এনে তুলেছে তার কোনো হিসেব নেই। কিন্তু নাজিমার মতো এমন মেয়ে তার চোখে পড়েনি। যাদের এতকাল দেখে আসছে তাদের বেশির ভাগই গরিব কিষানের ঘরের মেয়ে। না খেতে পেয়ে কি আধপেটা খেয়ে তাদের শরীরে শাঁস বলতে কিছুই থাকে না। হাড্ডিসার রোগা গালভাঙা এই মেয়েগুলোর কণ্ঠার হাড় মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকে। চোখ এক আঙুল গর্তে। কর্কশ চামড়া থেকে খই উড়তে থাকে। তার ওপর যা সব সুরৎ! চারকোনা তেকোনা বা ভাঙাচোরা মুখ। কারো বোঁচা নাক, কারো পাটের ফেঁসোর মতো চুল, কারো ছোট ছোট চোখ, পুরু ঠোঁট। প্রথম প্রথম এদের দেখলে পেটের ভাত উলটে আসে। তারপর কিছুদিন খাইয়ে দাইয়ে, গায়ে মাথায় তেল ঘষে, রঙচঙে শাড়ি পরিয়ে, চোখে কাজল লাগাবার পর তবে তো তাদের দিকে তাকানো যায়। পেত্নীর বাচ্চাগুলোকে ধরে এনেই রংমহল্লায় দাঁড় করিয়ে দিলে তার ব্যবসা কবে লাটে উঠে যেত!

কিন্তু এই মেয়েটা, এই নাজিমা না খেতে-পাওয়া ঘরের মেয়ে হয়েও এমন আশ্চর্য চেহারা, এমন নেশা ধরাবার মতো যৌবন কোথায় পেল? এই মেয়ে তো বাদশার ঘরে থাকার কথা। তার বদলে সে কিনা শাজাহান খোন্দকারের নয়া বিবির বাঁদি! এ ঘোর অন্যায়। না না, এমন অবিচার কোনোভাবেই হতে দেওয়া যায় না।

অনেকক্ষণ পলকহীন নাজিমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটা বড় গিরগিটির মতো পাছা ঘষটাতে ঘষটাতে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে তমিজুদ্দিন। বলে, 'তোমারে উই ভুইয়া বান্দি কইরা রাখছিল। শুনছি হেয়ার (তার) নয়া বিবি উঠতে বইতে তোমারে মাইর ধইর করত। তোমার দুঃখুর আন্ধার আমি ঘুচাইয়া দিমু। তোমারে আমার খোদ বেগম কইরা নিমু। যা চাও হেয়াই পাইবা। তোমার লেইগা আসমানের চান্দ্ পাইড়া আনুম।' আসলে নাজিমাকে দেখার পর থেকেই সে মনস্থির করে ফেলেছে, এমন রত্ন সে হাতছাড়া করবে ন।

নাজিমা উত্তর দেয় না, মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে।

তমিজুদ্দিন থামে নি। সে সমানে বলে যায়, 'শুনছ নিচ্চয়, উই ইবলিশ ভুইয়া তোমারে হাজার ট্যাকায় আমার কাছে বেইচা দিছে। মাইয়া কিনা নিয়া আমি কী ব্যাপার করি হেয়াও নিচ্চয় শুনছ। কিন্তুক তোমারে আমি রংমহল্লায় পাঠামু না, এক্কেরে মাথায় কইরা রাখুম। আমার আরো গণ্ডাখানেক বিবি রইছে, তারা হইব তোমার বান্দি। বাড়িতে ফিরা গিয়া মোল্লা মুছুল্লি ডাইকা কাইলই তোমারে শাদি করুম।' তমিজুদ্দিনের উচ্ছ্বাস তুবড়ির মতো ফেটে পড়তে থাকে।

শিকদারের বকবকানি কিছুই কানে ঢুকছিল না নাজিমার। সে শুধু রুদ্ধশ্বাসে একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। মুখ নামিয়ে বসে থাকলেও হঠাৎ ডান পাশের জানালা দিয়ে তার চোখে পড়ে দূরে মিট মিট করে অনেকগুলো আলো জ্বলছে। নাজিমা জানে ওটা গিরিগঞ্জের হাট। ওখানে হাসেম তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

দ্রুত মুখ তুলে দারুণ খুশির গলায় নাজিমা তমিজুদ্দিনকে বলে, 'আমার কী নসিব! আছিলাম বান্দি, আপনের মেহেরবানিতে হমু বেগম। দিল খুশ কইরা দিলেন বড় সাব। কিন্তুক একখান কথা—'

নাজিমার কথা শুনতে শুনতে তমিজুদ্দিন একেবারে গলে পড়ছিল। সে হাঁ হাঁ করে ওঠে. 'কী কথা নাজিমা, কী কথা?'

'ছইয়ের ভিত্‌রে জবর গরম লাগে। বাইরে গিয়া বইতে চাই।'

'নিচ্চয়, নিচ্চয়। তোমার যেমনে আরাম হয় তাই কর গুলাবজান। চল, বাইরে যাই।'

তমিজুদ্দিন শিকদারের সঙ্গে বাইরের পাটাতনে গিয়ে দাঁড়ায় নাজিমা।

এতক্ষণে গিরিগঞ্জের হাটের অনেক কাছে চলে এসেছে ঘাসি নৌকোটা।

আচমকা কাউকে কিছু বুঝে ওঠা বা বাধা দেবার সুযোগ না দিয়ে নাজিমা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খাল-বিল-নদীর দেশের মেয়ে, একটা দ্রুতগামী ফলুই মাছের মতো জল কেটে কেটে সে গিরিগঞ্জের হাটের দিকে এগিয়ে যায়।

ঘাসি নৌকোয় প্রবল হইচই শুরু হয়ে যায়। সব চেঁচামেচি ছাপিয়ে তমিজুদ্দিনের গলা চড়তে থাকে, 'পলাইল, পলাইল। ধর, ধর---' দু-একজন মাঝির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দও কানে আসে। কিন্তু অন্ধকারে তারা কোথায় খুঁজে পাবে নাজিমাকে!

কিছুক্ষণ পর পাড়ে উঠতেই হিজল গাছের জটলার কাছে হাসেমের সঙ্গে নাজিমার দেখা হয়ে যায়। রোকেয়ার আম্মা তা হলে মিথ্যে ভরসা দেয়নি। নাজিমা রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'তোরে এইখানে পামু কি পামু না, বুঝতে পারতে আছিলাম না। ডরে আমার বুক কাপতে আছিল।'

হাসেম বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে নাজিমার দিকে। রোকেয়ার আম্মা তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল ঠিকই কিন্তু কারণটা বিশ বার জিগ্যেস করেও জানতে পারে নি। শুধু নাজিমা যে তাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছে, এটুকুই সে জানাতে পেরেছিল। পাটগুদামে গিয়ে নাজিমার কাছ থেকে যে জেনে আসবে, সে সাহস তার হয় নি।

নদী থেকে নাজিমা যে এভাবে হিজল বনে উঠে আসবে, কে ভাবতে পেরেছিল! হাসেম জিগ্যেস করে, 'গাঙ হাতইরা (সাঁতরে) কই থিকা (কোত্থেকে) আইলি?'

জলের মধ্যে এলোপাথাড় হাত-পা চালিয়ে, তামিজুদ্দিনের মাঝিদের তাড়া খেতে খেতে এতটা সাঁতরে আসার ধকলে হাঁপাচ্ছিল নাজিমা। সে বলে, 'পরে শুনিস। তোর লগে নাও আছে?'

হাসেম বলে, 'আছে একখান কোষ (গলুইহীন ডিঙি)। উই কিনারে বাইন্ধা রাইখা হেই সন্ধ্যা থিকা খাড়ইয়া আছি। ব্যাপারখান কী?'

'অখন কুনো কথা না। তরাতরি ম্যাঘনার চরে তোর ফুফুর বাড়িত্‌ আমারে লইয়া যা। নাইলে ধরা পইড়া যামু। উই শোন---'

কান খাড়া করে সচকিত হাসেম নদীর দিকে তাকায়। তমিজুদ্দিনের ঘাসি নৌকোটা এদিকে এগিয়ে আসছে, সেই সঙ্গে হল্লা আরো বেড়ে চলেছে।

শশব্যস্তে দু'জনে ওধারের কোষ নৌকোয় উঠে সেটা ছেড়ে দেয়। তরতর করে নৌকো মেঘনার জল কেটে এগিয়ে চলে।

পেছনে বন্দি জীবন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো পড়ে থাকে। সামনে সুখস্বপ্নের মতো মেঘনার চরে তাদের মুক্ত পৃথিবী। সেখানে তারা আর বান্দা বা বাঁদি নয়, তারা বুঝিবা বাদশা এবং বেগম।

জন্মদাত্রী

ধবধবে উর্দিপরা দারোয়ান গেট খুলে দিতেই লাল মারুতি-ওমনিটা ভেতরে ঢুকে নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে যে উঁচু পিলারওলা বিশাল তেতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তার নাম 'মুখার্জি ভিলা'। ওটার দিকে তাকানো মাত্র গোথিক স্থাপত্যের কথা মনে পড়ে যায়।

ছড়ানো কম্পাউন্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়িটার সামনে, পেছনে এবং দু'পাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। সামনের দিকে চমৎকার ফুলের বাগান, নুড়ির রাস্তাটা তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। পেছনে গ্যারাজ, সারভেন্টস কোয়ার্টার্স ইত্যাদি। দু'পাশে লাইন দিয়ে সিলভার পাম, যেগুলোর মাথা উদ্ধত ভঙ্গিতে সোজা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এই বনস্পতিগুলো 'মুখার্জি ভিলা'র অহঙ্কার। সত্তর-আশি বছর আগে তৈরি এই বাড়িটাকে কলকাতার হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের তালিকায় রাখা যেতে পারে।

মারুতি-ওমনিটা চালিয়ে এনেছিল রাহুল। দারুণ সুপুরুষ, ছ'ফিটের মতো হাইট। তার লম্বাটে মুখ, চওড়া কপাল, ব্যাকব্রাশ-করা চুল, উজ্জ্বল চোখ, টকটকে রং—সব কিছুতে এমন এক রুচি আর আভিজাত্য রয়েছে যা মুহূর্তে তার বংশ-পরিচয় জানিয়ে দেয়। খুব বনেদি, বিত্তবান পরিবারে সে জন্মেছে।

চাবি দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে বাঁ পাশে তাকাল রাহুল। পারমিতা দুই হাত কোলের ওপর রেখে আড়ষ্টের মতো বসে আছে।

আজ নভেম্বরের দু তারিখ। ক'দিন আগে দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। শরৎকালের পর হেমন্তের শুরু থেকে কলকাতার তাপমাত্রা নামতে থাকে। এখন, এই বিকেলবেলায় বাতাসে বেশ একটা ঠাণ্ডার আমেজ। তবু পারমিতার কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। ভেতরকার লুকনো টেনশন ফুটে উঠেছে চোখেমুখে।

পারমিতার মনোভাবটা বুঝতে পারছিল রাহুল। আজই প্রথম তার মা স্বর্ণলতা ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নামটা যেমনই হোক, মায়ের স্বভাবে লতার মতো নমনীয়তা নেই। যা আছে তা হল রূঢ় কাঠিন্য ; কখনও কখনও সেটাকে নিষ্ঠুরতা মনে হতে পারে। স্বর্ণলতা সম্পর্কে আগেই পারমিতাকে সব জানিয়ে দিয়েছিল রাহুল ; কোনো কিছুই গোপন করেনি। আসলে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছে সে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে টালিগঞ্জে এই মারুতি-ওমনিতে পারমিতা যখন উঠল তখনও তার যে মনোবলটুকু ছিল, 'মুখার্জি ভিলা'য় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

পারমিতার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু চব্বিশ-পঁচিশের বেশি দেখায় না। আশ্চর্য কোনো ম্যাজিকে বয়সটাকে সে যেন চার-পাঁচ বছর কমিয়ে রেখেছে। রং একটু চাপা হলেও তার ডিম্বাকৃতি নিটোল মুখমণ্ডল, বড় বড় দীর্ঘ চোখ, নাক, চিবুক, গ্রীবা, সতেজ স্বাস্থ্যের লাবণ্য—সব মিলিয়ে অলৌকিক একটা ব্যাপার আছে।

স্বর্ণলতা জাঁকজমক খুব পছন্দ করেন। তাই পারমিতাকে আজ তার একমাত্র দামি শাড়ি, একটা সবুজ কলাপাতা রঙের মাইশোর সিল্ক যার আঁচল আর পাড়ে দারুণ সব নকশা—পরতে

হয়েছে। বিউটি পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধেছে। যে সামান্য ক'টা গয়না আছে তাও পরেছে। তাকে মায়াকাননের কোনও পরীর মতো মনে হচ্ছে।

পারমিতার কাঁধটা আলতো করে ছুঁয়ে নিচু গলায় রাহুল বলল, 'বি স্টেডি—' সে বুঝতে পারছিল তার নিজের গলাও কাঁপছে। হয়তো পারমিতার টেনশনটা তার মধ্যেও চারিয়ে গেছে।

পারমিতা চুপ করে থাকে।

রাহুল এবার গাড়ি থেকে নেমে ওধারের দরজা খুলে দিতে দিতে বলল, 'নামো—'

অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো নিঃশব্দে নেমে এল পারমিতা। গাড়িটা যেখানে থেমেছে তার পাশ থেকে শ্বেতপাথরের চওড়া চওড়া সিঁড়ি। রাহুলের পাশাপাশি সেগুলো পেরিয়ে ওপরের চাতালে উঠে এল সে। এখানে দু'ধারে মোটা মোটা থামের সারি। তার মাঝখান দিয়ে খানিকটা এগুলে কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড দরজা, যার মাথার দিকটা অর্ধগোলাকার।

দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে পা দিতেই লাল কার্পেটে মোড়া মস্ত হল-ঘর। চার-পাঁচ সেট সোফা, সেন্টার টেবল, ছোট ছোট টিপয় নানা জায়গায় সাজানো রয়েছে। একধারে দারুণ একটা পিয়ানোও চোখে পড়ে। সিলিং থেকে নেমে এসেছে ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে প্রচুর অয়েল পেন্টিং। আর কী কী আছে, সে সব খুঁটিয়ে দেখার মতো মনের অবস্থা নয় পারমিতার। হল-ঘরের ভেতর দিয়ে সামনের প্যাসেজের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

রাহুলও থেমে গিয়েছিল। জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

পারমিতা মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি ফিরে যাব।'

'তার মানে?'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'কিসের ভয়? তুমি কি কোনো অন্যায় করেছ?' রাহুল বোঝাতে চেষ্টা করল।

পারমিতা উত্তর দিল না।

ভেতরে ভেতরে মায়ের ব্যাপারে উৎকণ্ঠা ছিলই রাহুলের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলে পারমিতা আরো ঘাবড়ে যাবে ; তাই গোগাগোড়া নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে। সে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই। আমরা যা ঠিক করেছি সেটাই হবে।' পারমিতার একটা হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'চল—'

হল-ঘরের ডান পাশে একটা প্যাসেজ। সেটা দিয়ে খানিকটা গেলে দোতলায় ওঠার জন্য পেতলের পাত-বসানো কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি। সেখানে একটি মাঝবয়সি কাজের লোককে দেখা গেল। রাহুল জিগ্যেস করল, 'মা কোথায় অতুলদা?'

অতুল নামের লোকটা দ্রুত একবার পারমিতাকে দেখে নিয়ে বলল, 'দোতলার হল-ঘরে আপনাদের জন্যে বসে আছেন। বড় সাহেবও আছেন।' রাহুল যে পারমিতাকে নিয়ে আসবে খুব সম্ভব সে তা জানে; হয়তো স্বর্ণলতা বলে থাকবেন, কিংবা অন্য কোনোভাবে শুনেছে।

বড় সাহেব অর্থাৎ তার বাবা জ্যোতিভূষণও অপেক্ষা করছেন জেনে ভীষণ অবাক হল রাহুল। সাংসারিক কোনো ব্যাপারেই থাকেন না তিনি। পড়াশোনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা, ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা—এ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই তাঁর। ঐতিহাসিক হিসেবে জ্যোতিভূষণের খ্যাতি আন্তর্জাতিক। শুধু এদেশেরই না ; ইউরোপ আমেরিকার নাম-করা পাবলিশাররা তাঁর অনেক বই প্রকাশ করেছে। নানা কনফারেন্স, বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পড়ানো ইত্যাদি কারণে প্রায়ই লন্ডন, সিডনি, টোরোন্টোতে ছুটতে হয় তাঁকে। রাহুলরা তিন ভাইবোন। সে সবার ছোট, দিদিদের বিয়ে হয়ে

গেছে। ছেলেমেয়েরা কে কী পড়বে, মেয়েদের কোথায় বিয়ে হবে—এ সব ব্যাপারে স্বর্ণলতার মতামতই শেষ কথা। রাহুলের ধারণা জ্যোতিভূষণ যে আজ দোতলায় বসে আছেন সেটা মা চেয়েছেন বলে। হয়তো পারমিতা সম্পর্কে তিনি একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান না।

ওপরেও হুবহু একতলার মতোই একটা হল-ঘর। তেমনই কয়েক সেট সোফা, ঝাড়বাতি, অয়েল পেন্টিং। বাড়তির মধ্যে রয়েছে টিভি, ভি সি আর, গোটা চারেক নানা রঙের টেলিফোন, অজস্র কিউরিও আর পেতলের অসংখ্য টবে বিচিত্র চেহারার সব অর্কিড। হল-ঘরটার তিন দিকে চার-পাঁচটা বেডরুম। নিচের তলার মতোই ডান দিকে প্যাসেজ। অর্থাৎ তেতলায় ওঠার সিঁড়িটা ওখানেই।

রাহুলের সঙ্গে দোতলায় আসতেই পারমিতার চোখে পড়ল, হল-ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝাড়বাতির তলায় দু'টো আলাদা সোফায় বসে আছেন স্বর্ণলতা আর জ্যোতিভূষণ। তাঁদের কথা এত বার রাহুলের মুখে সে শুনেছে যে দেখামাত্রই চিনতে পারল।

স্বর্ণলতার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। চুলের অনেকটাই সাদা হয়ে এসেছে, ত্বকের চিকন মসৃণতাও তেমন নেই, তবু সৌন্দর্যের যে রশ্মিগুলো এখনও থেকে গেছে, চোখ ঝলসে দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। তাঁর সাজসজ্জায় রয়েছে নিখুঁত বনেদিয়ানার ছাপ। ঘি-রঙের যে মূল্যবান সিল্কের শাড়িটি তিনি পরেছেন তার পাড়ে নানা রঙের সুতোর কারুকাজ। আংটি, নাকছাবি, ব্রেসলেট এবং সরু হারের পেনডান্ট—সব কিছুতেই হীরে বসানো। খুব সম্ভব বিউটি পার্লার থেকে তিনিও চুল বাঁধিয়ে এসেছেন। সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের সঙ্গে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন এক অটুট গাম্ভীর্য রয়েছে যাকে দাম্ভিকতা মনে হতে পারে।

রাহুলের সঙ্গে জ্যোতিভূষণের চেহারার দারুণ মিল। ওঁরা যে বাবা এবং ছেলে, বলে দিতে হয় না। ত্রিশ-বত্রিশ বছর পর চুল পাকলে, শরীরে বেশি করে মেদ জমলে, ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট হলে রাহুল তার বাবার মতোই হয়ে যাবে।

জ্যোতিভূষণের পরনে ঘরোয়া পোশাক—ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবি। এই বয়সেও তাঁর চুল বেশ ঘন। চোখে পুরু ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। হঠাৎ দেখলে তাঁকে রাশভারি মনে হবে। তবে খুঁটিয়ে লক্ষ করলে বোঝা যায় মানুষটা চুপচাপ, অন্যমনস্ক ধরনের।

পারমিতাকে নিয়ে স্বর্ণলতাদের সামনে চলে এল রাহুল। মা আর বাবার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে পারমিতা।'

পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন স্বর্ণলতা। পারমিতাকে বললেন, 'বোসো—'

পারমিতা নেহাতই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। এমন বিশাল বাড়িতে স্বর্ণলতাদের মতো এত অভিজাত মানুষদের কাছাকাছি আসার সুযোগ আগে আর কখনও হয়নি। অদ্ভুত এক কাঁপুনি বুকের ভেতর থেকে স্রোতের মতো শরীরের নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল যেন। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না সে। স্বর্ণলতা বলামাত্র একটা সোফায় নিজের শরীরের ভার কোনোরকমে ছেড়ে দিল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'সোনু তোমার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ তোমাকে আগে কখনও দেখিনি। তাই আজ ডেকে পাঠিয়েছি। আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আশা করি সঠিক উত্তর পাব।'

রাহুলের ডাকনাম যে সোনু, পারমিতা তা জানে। মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়ল সে, অর্থাৎ সব প্রশ্নেরই উত্তর দেবে।

আগে থেকেই বোধহয় বলা ছিল। একটা বেয়ারা নিচু গ্লাস-টপ ট্রলির ওপর নানা আকারের প্লেটে খাবার বোঝাই করে নিয়ে এল। এ সব ছাড়াও রয়েছে জলের গেলাস, ভাঁজ-করা ক'টা ন্যাপকিন, কাঁটা-চামচ এবং ফাঁকা কিছু প্লেট। মস্ত আয়তক্ষেত্রের মতো সেন্টার টেবলটায় সেগুলো দ্রুত সাজিয়ে দিয়ে ফাঁকা ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে ডান দিকের প্যাসেজে সে অদৃশ্য হল।

পারমিতা বেশ কয়েক বার রাহুলের সঙ্গে নাম-করা, এয়ার-কণ্ডিশনড হোটেলে খেতে গেছে কিন্তু এত সুন্দর, কারুকার্যময় ক্রকারি আগে আর দেখেনি। সুখাদ্যেরও ছড়াছড়ি। দামি চকোলেট কেক, তালশাঁস সন্দেশ, সিঙাড়া, সরভাজা, ক্ষীরের পান্তুয়া, চিকেন কাটলেট, নানা ধরনের বিস্কুট, কাজুবাদাম ইত্যাদি।

পারমিতা শুনেছে, বনেদি বাড়িতে আতিথেয়তায় কোনোরকম ত্রুটি হয় না। এখানে এসে নিজের চোখেও তাই দেখতে পেল। স্বর্ণলতা একটা ন্যাপকিনের ভাঁজ খুলে তার ওপর প্লেট রেখে বিভিন্ন পাত্র থেকে কাটলেট, সন্দেশ এবং কাজুবাদাম তুলে নিয়ে পারমিতার হাতে সেটা দিতে দিতে বললেন, 'খাও। আর যা যা ইচ্ছে হয় নিজে নিয়ে নিয়ো।'

জ্যোতিভূষণ এবং রাহুলও খাবার তুলে নিয়েছিল। পারমিতাকে দেওয়ার পর স্বর্ণলতাও নিলেন। বললেন, 'খেতে খেতে কথা বলা যাক।'

অত্যন্ত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কাটলেটের একটা টুকরো কেটে মুখে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পারমিতা।

স্বর্ণলতা এবার বললেন, 'সোনু তোমার সম্বন্ধে আমাকে কিছু জানিয়েছে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। শুনেছি তুমি একটা চাকরি কর।'

মেয়েদের চাকরি করাটা এ বাড়ির মানুষদের চোখে কতটা অন্যায় পারমিতা জানে না। আবছা গলায় বলল, 'হ্যাঁ। চাকরি না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। তাই—'

স্বর্ণলতা কিছু একটা আন্দাজ করে বললেন, 'না না, চাকরি করাটা অপরাধ, এ আমি বলছি না। শুধু জানতে চাইছিলাম।'

জ্যোতিভূষণ এই প্রথম মুখ খুললেন, 'সবারই স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। ইউরোপ আমেরিকায় সব মেয়েই কিছু না কিছু করে। অনেকে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, বিরাট বিরাট বিজনেস অর্গানাইজেশন চালায়। ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পর্যন্ত কোথায় নেই মেয়েরা? আশার কথা, আমাদের দেশেও কাজ সম্পর্কে মেয়েদের এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ছে। এটা ভালো লক্ষণ।'

স্বামীর কথায় স্বর্ণলতা খুব একটা কান দিলেন বলে মনে হল না। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কোথায় কাজ কর?'

পারমিতা বুঝতে পারছিল, বিরুদ্ধ পক্ষের ঝানু ল'ইয়ারেরা যেভাবে উলটোপালটা জেরা করে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায়, স্বর্ণলতার উদ্দেশ্যও যেন তাই। সতর্ক ভঙ্গিতে সে উত্তর দিল, 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সিতে।'

'বড় কোম্পানি?'

'না, মাঝারি ধরনের।'

'এমপ্লয়ী কতজন?'

'সব মিলিয়ে বাইশ।'

'তোমাকে কী করতে হয়?'

'আমি কম্পিউটার সেকশনের চার্জে আছি। সেই সঙ্গে ক্লায়েন্টদের এয়ার আর রেলের টিকেটের ব্যবস্থা করতে হয়।'

স্বর্ণলতা জিগ্যেস করলেন, 'কম্পিউটারের কোর্স কোথায় করেছিলে?'

একটা বিখ্যাত ইনস্টিটিউটের নাম করে পারমিতা বলল, 'ওরাই কোর্স কমপ্লিট করার পর এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।' সে জানে এই সব কথাবার্তা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। আসল লক্ষ্যে ঘা মারার আগে স্বর্ণলতা প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন।

পারমিতার খেতে ইচ্ছা করছিল না। ধীরে ধীরে হাতের প্লেটটা সেন্টার টেবলে নামিয়ে রাখল সে।

স্বর্ণলতা বললেন, 'এ কি, তুমি তো কিছুই খেলে না।'

'আজ দুপুরে খেতে খেতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই---' কথাগুলো মিথ্যে করেই বলল পারমিতা। আজ এ বাড়িতে আসবে বলে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছিল। অন্যদিনের মতো সাড়ে বারোটায় খেয়ে সে গিয়েছিল বালিগঞ্জের এক বিউটি পার্লারে। সেখানে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। চুল বাঁধিয়ে বাড়ি ফিরতে তিনটে বেজে যায়। তার কিছুক্ষণ পরেই মারুতি-ওমনি নিয়ে চলে গিয়েছিল রাহুল। কোনোরকমে শাড়িটাড়ি পালটে তার সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে। সাড়ে বারোটার পর এক কাপ চাও জোটেনি। স্বাভাবিকভাবেই খিদে পাওয়ার কথা। কিন্তু উত্তেজনা, ভয়, মানসিক চাপ, সব মিলিয়ে খিদের অনুভূতিটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

স্বর্ণলতা জোর বা অনুরোধ কোনোটাই করলেন না। নিঃশব্দে নিজের খাওয়া শেষ করে চারটে কাপে টিপট আর মিল্কপট থেকে লিকার এবং দুধ ঢেলে পারমিতাকে জিগ্যেস করলেন, 'চা নিশ্চয়ই খাবে?'

গরম চা হয়তো স্নায়ুগুলোকে খানিকটা স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। পারমিতা মাথা হেলিয়ে দেয়—খাবে।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার চায়ে ক'টা সুগার কিউব দেব?'

পারমিতা বলল, 'দু'টো।'

রাহুল আর পারমিতার কাপে দু'টো করে, তাঁর এবং জ্যোতিভূষণের কাপে একটা করে সুগার কিউব দিয়ে চা তৈরি করে ফেললেন স্বর্ণলতা।

রাহুলদের খাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সবাই চায়ের কাপ তুলে নিল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'শুনেছি তোমার মা-বাবা, ভাইবোন, কেউ নেই।'

পারমিতা বলল, 'না।'

'অন্য আত্মীয়স্বজন?'

'দুই কাকা আর এক মামা আছেন। কাকারা দু'জনেই দিল্লিতে। মামা আছেন জব্বলপুরে। ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই হয়। দু-তিন বছর পর কলকাতায় এলে দেখা করে যান।'

স্বর্ণলতা সামনের দিকে ঝুঁকে এবার জিগ্যেস করলেন, 'তোমাদের বাড়িতে তুমি কি একলাই থাকো?'

পারমিতা বুঝতে পারছিল, স্বর্ণলতা তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে অতল খাদের দিকে টেনে নিয়ে চলেছেন। নিচু গলায় বলল, 'আমার এক দূর সম্পর্কের বিধবা পিসিমাও আমার সঙ্গে থাকেন।'

স্বর্ণলতা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, 'আর তোমার মেয়ে?'

এই প্রশ্নটা যে অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে সেটা জানতো পারমিতা। তার হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল যেন। মুখ নামিয়ে ঝাপসা গলায় বলল, 'আমার কাছেই থাকে। আমি যতক্ষণ বাইরে থাকি, পিসিমা দেখাশোনা করেন।'

জ্যোতিভূষণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

স্বর্ণলতার ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। বললেন, 'কী হল? উঠলে যে?'

জ্যোতিভূষণ বললেন, 'আমার একটা জরুরি কাজ আছে। এখনই বেরুতে হবে।'

জ্যোতিভূষণকে আটকানো গেল না। 'তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে—' বলতে বলতে ডান দিকের একটা বেডরুমে চলে গেলেন।

চকিতের জন্য পারমিতার মনে হল, এরপর যে অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা উঠতে চলেছে, জ্যোতিভূষণ সেটা শুনতে চান না।

স্বর্ণলতা একটু বিরক্ত হলেন, 'কোনো মানে হয়? প্রবলেম এলে অ্যাভয়েড করাটা ভদ্রলোকের চিরকালের স্বভাব।' বলে আবার পারমিতার দিকে তাকালেন, 'তোমার মেয়ের বয়েস কত?'

'পাঁচ।'

'স্কুলে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। বাড়ির কাছেই একটা প্রিপেরেটরি স্কুলে পড়ছে। মর্নিং ক্লাস। পিসিমাই ওকে দিয়ে আসেন, নিয়েও আসেন।'

খানিকটা সময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কেটে যায়।

তারপর স্বর্ণলতা বলেন, 'এবার সবচেয়ে অপ্রিয় কথাটা বলতে হবে।'

পারমিতা কিছু বলল না। বধ্যভূমিতে চরম মুহূর্তের জন্য যেন অপেক্ষা করতে লাগল।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার আগের স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে কতদিন আগে?'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল পারমিতার। বলল, 'তিন বছর।'

'কারণটা কী ছিল?'

পারমিতা জানাল, তার প্রথম পক্ষের স্বামী মনোতোষ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, দুশ্চরিত্র এবং মদ্যপ। তার সঙ্গে মানিয়ে চলার অনেক চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব হয়নি। আত্মরক্ষার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমার মেয়েকে যে নিজের কাস্টোডিতে রেখেছ, তাতে তোমার এক্স-হাজব্যান্ড আপত্তি করেনি?'

পারমিতা বলল, 'করেছিল। কিন্তু আমি নিজের রাইট ছাড়িনি। ওর কাছে থাকলে মেয়েটা মানুষ হত না। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোর্টে আপিল করেছিলাম। জজ ওকে আমার হাতে তুলে দেন।'

স্বর্ণলতা এবার জিগ্যেস করলেন, 'তোমার যে পিসিমার কথা বললে তিনি কি তোমার ডিপেন্ডান্ট? মানে তুমি আশ্রয় না দিলে তাঁর অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?'

'আছে। পিসির এক দেওরের ছেলে কানপুরে থাকে। সে অনেক বার ওঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। আমিই নিজের স্বার্থে ধরে রেখেছি।'

'তোমার পিসিমা সম্পর্কে তাঁর দেওরের ছেলে কি এখনও ইন্টারেস্টেড?'

'নিশ্চয়ই। গত মাসেও চিঠি লিখেছিল।'

স্বর্ণলতা কিছুটা আরাম বোধ করলেন যেন। বললেন, 'ওদিকে থেকে তা হলে সমস্যা থাকছে না। তোমার মেয়ের সম্বন্ধে কোনো ডিসিশন নিয়েছ?'

পারমিতা চুপ করে প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করে।

স্বর্ণলতা ফের বললেন, 'আমি বলতে চাইছি, সোনুর সঙ্গে তোমার বিয়েটা যদি হয়ই—যদিও এ জাতীয় বিয়ে আমাদের পছন্দ নয়—তোমার মেয়ের কী হবে? সে কোথায় থাকবে?'

পারমিতা এতটাই চমকে উঠল যে তার গলা থেকে দুর্বোধ্য গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

স্বর্ণলতা থামেননি, 'আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছেন, দুই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা আছেন। এই বিয়েটা তাঁদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। তবু সোনুর জেদে আমরা রাজি হয়েছি। মেয়ের ব্যবস্থা করে তোমাকে এ বাড়িতে আসতে হবে।'

পারমিতা বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। একসময় রুদ্ধস্বরে জিগ্যেস করে, 'কী ব্যবস্থা করব?'

'সেটা তোমাকেই ভাবতে হবে। তবে একটা পরামর্শ দিতে পারি। সেটা করা যায় কিনা চিন্তা করে দেখতে পার।'

'বলুন—'

'তোমার আগের স্বামী কোথায় থাকে?'

'বাঙ্গালোরে।'

'মেয়েকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে পার।'

অবসন্ন গলায় পারমিতা বলল, 'তা কী করে সম্ভব?'

স্বর্ণলতার চোখেমুখে কঠোরতা ফুটে বেরোয়। বলেন, 'অসম্ভব কেন?'

পারমিতা বোঝাতে চেষ্টা করে, রীতিমতো যুদ্ধ করে কোর্ট থেকে সন্তানের অধিকার সে আদায় করে নিয়েছে। এখন যেচে তাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াটা শুধু অসম্মানজনকই নয়, সাঙঘাতিক পরাজয়ও। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ, মনোতোষ ফের বিয়ে করেছে। তার নতুন সংসারে মেয়েটা কতটা যত্ন, সমাদর আর স্নেহ পাবে সে সম্পর্কে পারমিতার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

স্বর্ণলতাকে এবার রোবোটের মতো দেখায়। ভাবলেশহীন মুখে তিনি বলেন, 'আমার যা বলার বলেছি। এখন তুমি কী করবে, সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।'

রাহুল তার প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মাকে খুব ভয় পায় এবং তাঁর সামনে কুঁকড়ে থাকে। এতক্ষণে সে মুখ খুলল। ঢোক গিলে বলল, 'মা, তুমি বাচ্চাটার কথা সিমপ্যাথেটিক্যালি—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে স্বর্ণলতা বললেন, 'তোমরা যথেষ্টই অ্যাডাল্ট। ইচ্ছা করলে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে করতে পার। তেমন কিছু করলে এ বাড়ির সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।' বলতে বলতে তিনি উঠে পড়লেন। অর্থাৎ এ নিয়ে আর কোনো আলোচনাই করবেন না।

আচ্ছন্নের মতো পারমিতাও উঠে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ পর রাহুলের পাশে বসে টালিগঞ্জের দিকে যেতে যেতে দূরমনস্কের মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল পারমিতা।

কলকাতা মেট্রোপলিসে সন্ধে নেমে গিয়েছিল। কর্পোরেশনের আলো এবং বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির নিওন সাইন এর মধ্যেই জ্বলে উঠেছে। অজস্র আলো, গাড়ির স্রোত, মানুষের ভিড়, দু'ধারের উঁচু উঁচু সব বাড়ি এবং অন্যান্য দৃশ্যাবলী, কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না পারমিতা। চোখের সামনে থেকে সব দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে দুরন্ত এক উজান টানে সে কয়েক বছর পেছনে ফিরে যেতে থাকে।

তার বাবা বনবিহারী দত্ত ছিলেন একটা বড় মার্চেন্ট ফার্মের বড়বাবু। আই. এ পাস করে ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিলেন। প্রোমোশন পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত রিটায়ারমেন্টের কিছু আগে একটা সেকশানের ইন-চার্জ হতে পেরেছিলেন। খুব একটা উচ্চাশা তাঁর ছিল না। চাকরিতে আরো উঁচুতে যে উঠতে পারেননি সে জন্য আক্ষেপও না। মাঝারি মাপের আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে গতানুগতিক দিন কাটিয়ে গেছেন। অত্যন্ত শান্ত, নির্বিরোধ, ভদ্র মানুষ। মা ও বাবার মতো সাদাসিধে, সরল। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ বিশেষ বুঝতেন না। এঁদের মেয়ে পারমিতার কিন্তু কিছু উচ্চাকাঙক্ষা ছিল। ম্যাড়মেড়ে জীবনযাপনের কথা সে ভাবতে পারত না। তবে যা সে চায় সেটা না পেলে ছিনিয়ে নিতে হবে, এমন তীব্র, আগ্রাসী ব্যাপারও তার মধ্যে ছিল না। যা ছিল তা হল কোমল, রঙিন, গোপন একটি স্বপ্ন। ভালো বিয়ে হবে, স্বামী হবে সুদর্শন, শিক্ষিত, প্রচুর অর্থ থাকবে তাদের, হাতের সামনে সাজানো থাকবে আরামের অজস্র উপকরণ।

কখনও কখনও অলৌকিকভাবে ইচ্ছাপূরণ ঘটে যায়। পারমিতার জীবনেও তাই হয়েছিল। ইংরেজিতে মোটামুটি একটা অনার্স পেয়ে বি. এ পাস করার তিন মাসের মধ্যে মনোতোষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার। এর ভেতর প্রেমটেমের কোনো ব্যাপার নেই। তার মায়ের এক মাসতুতো বোন, সম্পর্কে মাসি, এই সম্বন্ধটা এনেছিলেন। মনোতোষরা একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে, তাদের দাবিদাওয়া কিছু নেই; খবরটা পেয়েই মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

স্বাস্থ্যবান, এম বি এ স্বামী, মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে তার একজিকিউটিভ পোস্ট, বিরাট স্যালারি, পর্যাপ্ত পার্কস, কেয়াতলায় বারো শো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কোম্পানির গাড়ি, প্রতি বছর হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ানোর জন্য অঢেল ট্র্যাভেল অ্যালাওয়েন্স অর্থাৎ পারমিতার স্বপ্নের মাপে মাপে সমস্ত কিছু মিলে গিয়েছিল।

দু'টো বছর ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই পারমিতা জেনে গেছে, মনোতোষ ড্রিঙ্ক করে। মদ্যপানটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে ট্যাবুর মতো। প্রথম প্রথম পারমিতার মানিয়ে নিতে অসুবিধা হত। মনোতোষ বুঝিয়েছে, বিশাল কোম্পানির একজিকিউটিভ পোস্টে কাজ করতে হলে পার্টিতে যেতে হয়, পার্টিতে গেলে ড্রিঙ্ক করতে হয়। ক্রমশ এটা মেনে নিয়েছিল সে। এর মধ্যে তাদের একটি মেয়েও হয়ে গেছে—রুনি।

কিন্তু একদিন জানা গেল, নারীঘটিত নানা স্ক্যান্ডালও রয়েছে মনোতোষের। এই নিয়ে রোজ খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি। মাঝরাতে আকণ্ঠ হুইস্কি খেয়ে এসে সারা তল্লাট মাথায় তুলে চিৎকার জুড়ে দিত সে। সারাক্ষণ অপমান আর লাঞ্ছনা। প্রতি মুহূর্তে মনোতোষ বুঝিয়ে দিত, দয়া করে একজন কেরানির মেয়েকে বিয়ে করেছে। পারমিতাকে মুখ বুজে সব সয়ে যেতে হবে। অশান্তি শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল যে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হল না। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনে তারা আলাদা হয়ে গেল। মেয়েকে নিয়ে প্রচণ্ড টানাহেঁচড়া হয়েছে, পারমিতা তার স্বত্ব ছাড়েনি।

আলাদা হওয়ার পর রুনিকে নিয়ে টালিগঞ্জে মা-বাবার কাছে চলে এসেছিল সে। বনবিহারী ততদিনে রিটায়ার করেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির যে টাকাটা পেয়েছিলেন, ব্যাঙ্কে

ফিক্সড ডিপোজিট করে মাসে মাসে ইন্টারেস্ট তুলতেন। তাতে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মোটামুটি চলে যাচ্ছিল কিন্তু পারমিতারা চলে আসায় বাড়তি চাপ পড়ল।

পারমিতা ইচ্ছা করলে মনোতোষের কাছ থেকে তার মেয়ের ভরণপোষণের টাকা আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু যার সঙ্গে সম্পর্কই শেষ হয়ে গেছে তার টাকা হাত পেতে নিতে ঘৃণাবোধ করত সে।

তার আত্মসম্মান বোধ ছিল প্রচণ্ড। শুধু সেটা ধরে বসে থাকলে তো বাঁচা যায় না। পারমিতার চোখে পড়ছিল, সংসার চালাতে বনবিহারী নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছেন। সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন। রিটায়ারমেন্টের পর কোথায় নিরুদ্বেগ শান্তিতে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন তা নয়। ফের একটা পার্ট টাইম কাজ জোগাড় করে নিতে হয়েছিল তাঁকে।

বাবার দিকে তাকিয়ে ভীষণ কষ্ট হত পারমিতার। সে বুঝতে পারছিল, এভাবে চলতে পারে না। বনবিহারী অনন্ত কাল থাকবেন না; তাঁর মৃত্যুর পর তাদের কী হবে? ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত।

ক' বছর ধরেই কম্পিউটারে ট্রেনিং নেওয়া লোকজনের চাহিদা বেড়ে গেছে। তাদের কাছে চাকরি-বাকরির প্রচুর সুযোগ। একটা নাম-করা ট্রেনিং সেন্টারে দশ মাসের কোর্স কমপ্লিট করার পর ওরাই পারমিতাকে 'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি'তে চাকরিটা পাইয়ে দেয়। মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ক্রমশ কাটতে থাকে তার।

বছর খানেকের ভেতর পারমিতা জীবনটাকে যখন ফের গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে সেই সময় একমাস আগে-পরে আচমকা মা আর বাবার মৃত্যু হল। পারমিতার সামনে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। বাড়িতে সে এবং রুনি ছাড়া আর কেউ নেই। ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে একা ফেলে কী করেই বা অফিসে যায়? মেয়ের দেখাশোনা করতে হলে চাকরি ছাড়তে হয় আর চাকরি ছাড়লে খাবে কী? পারমিতার যখন এইরকম দিশেহারা অবস্থা সেইসময় সমস্যাটা সামলে নেওয়া গেল। দূর সম্পর্কের বিধবা পিসি রাজলক্ষ্মীকে পেয়ে যায় সে। ষাটের কাছাকাছি বয়স, নিঃসন্তান, স্বাস্থ্য ভালো এবং পিছুটান বলতে কিছু নেই। তা ছাড়া মানুষটি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। সংসারের সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। বাড়ির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেল পারমিতা।

স্বপ্নভঙ্গ আগেই হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত সুখ বা সাধ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। পারমিতার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল, রুনিকে বড় করে তোলা। রাজলক্ষ্মী যতদিন থাকবেন তার দুর্ভাবনা নেই কিন্তু কোনোদিন যদি তিনি চলে যেতে চান বা মারা যান? মানুষের মতিগতি বা আয়ুর কথা তো কিছু বলা যায় না। ভাবনাটাকে অবশ্য বিশেষ আমল দেয়নি সে। আগেভাগে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে তোলার মানে হয় না।

রাজলক্ষ্মী আসার পর মসৃণভাবেই দিন কাটতে থাকে। দুশ্চিন্তা হয়তো নেই, তবে সব কিছুই গতানুগতিক, একঘেয়ে। সকালে উঠে বাজারে যাওয়া, তারপর মেয়েকে পড়িয়ে চা খেতে খেতে সাড়ে আটটা বেজে যায়। সাড়ে ন'টার ভেতর স্নান সেরে, ভাত খেয়ে চার্টার্ড বাসে অফিসে ছোটা। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর মেয়েকে এ বেলাও কিছুক্ষণ পড়িয়ে ঘন্টাখানেক টিভি দেখে রাতের খাওয়া চুকিয়ে দশটা নাগাদ শুয়ে পড়া। এই তার দৈনন্দিন রুটিন। কোনোরকম উত্থানপতন নেই। একটা দিন আরেকটা দিনের যেন জেরক্স কপি।

জীবন যখন ধীর চালে সরলরেখায় এগিয়ে চলেছে, সেইসময় হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসে পড়ল পারমিতা। একদিন দুপুরে রাহুল 'গোল্ডেন সার্কল ট্রাভেল এজেন্সি'তে এল। সে একটা বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অফিসার। 'গোল্ডেন সার্কল ট্রাভেল এজেন্সি' ওদের যাবতীয় ট্রেন আর প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেয়। রাহুলের জরুরি কাজে বম্বে যাওয়ার কথা। প্লেনের টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কী একটা গোলমালের জন্য রাহুলকে ট্রাভেল এজেন্সিতে আসতে হয়েছিল।

এয়ার টিকেটের ব্যাপারগুলো পারমিতাই দেখাশোনা করে। রাহুল তার সঙ্গে দেখা করে সমস্যাটা জানাতেই আধ ঘণ্টার ভেতর সে সব ঠিক করে দেয়।

রাহুল যে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, সেটা প্রথম আলাপের দিনই টের পেয়েছিল পারমিতা। টিকেটের ঝঞ্ঝাট মিটে গেলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছে রাহুল। মাঝে মাঝেই তাকে ফোন করত। খুবই সাধারণ কথাবার্তা। কেমন আছেন, নিজে থেকে আমার খোঁজ নেন না, আমাকেই খবর নিতে হয়, ইত্যাদি।

রাহুলের ফোন এলে গোড়ার দিকে অস্বস্তি বোধ করত পারমিতা। একটা বড় কোম্পানির সুদর্শন তরুণ অফিসার ট্রাভেল এজেন্সির কাজের বাইরে তার সম্বন্ধে একটু বেশি মাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এটা ভেতর ভেতরে তাকে আড়ষ্ট করে তুলত। যতই চাকরি বাকরি করুক, অনেকগুলো মধ্যবিত্ত ট্যাবু তার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তার খোঁজখবর নেওয়াটা যে আদৌ শোভন নয় তা কিন্তু কিছুতেই রাহুলকে বলতে পারত না পারমিতা।

কেননা ওদের কোম্পানিকে সারভিস দিয়ে তাদের এজেন্সি বহু টাকা কমিশন পায়। রাহুল চটে গেলে ওরা হয়তো অন্য এজেন্টের কাছে চলে যাবে। কাজেই ভদ্রতা বজায় রেখে সংক্ষেপে তার কথার উত্তর দি ত সে।

দু-একমাস এভাবে চলার পর একদিন রাহুল ফোনে বলল, 'বুঝলেন ম্যাডাম, ঠিক জমছে না।'

বুঝতে না পেরে পারমিতা জিগ্যেস করেছে, 'কী জমছে না?'

'এই আলাপটা। দু-চারদিন পর ফোনে কয়েক মিনিটের কথাবার্তায় কি স্যাটিসফ্যাকশন হয়?'

পারমিতা চুপ করে থেকেছে।

রাহুল গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে ... বলেছে, 'অফিসের বাইরে কোথাও আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা হতে পারে না?'

পারমিতা চমকে উঠেছে, 'কেন বলুন তো?'

রাহুল বলেছে, 'ধরুন গল্প করব।'

পারমিতা বলতে যাচ্ছিল কলকাতায় কয়েক লাখ সুন্দরী মেয়ে আছে; ওদের বাদ দিয়ে গল্প করার জন্য তাকেই বা বেছে নেওয়া হল কেন?

শেষ পর্যন্ত বলা আর হল না।

রাহুল এবার বলেছে, 'আমাকে ভদ্রলোক ভাবতে পারেন। আপনার অস্বস্তির কারণ নেই।'

দ্বিধান্বিতভাবে পারমিতা বলছে, 'ঠিক আছে। কোথায় দেখা হবে, বলুন—'

'আমি আপনাদের অফিস থেকে আপনাকে তুলে নেব।'

'না। আমাদের অফিসে আসার দরকার নেই। আপনার গাড়িতেও উঠব না।'

'তা হলে?'

'আমাদের অফিস থেকে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম খুব কাছে। ছুটির পর আমি ওটার মেইন গেটের সামনে ওয়েট করব। তবে একটা কথা—'

'বলুন—'

'আমি সাড়ে ছ'টার ভেতর বাড়ি ফিরি। আজও ফিরব।'

'তাই হবে।'

সেই শুরু। তারপর অনেক বার তাদের বাইরে দেখা হয়েছে। ক্রমশ পারমিতা বুঝতে পেরেছে, রাহুল খুবই ভদ্র, প্রাণবন্ত, হৃদয়বান যুবক। কোনোদিন এমন একটি কথা উচ্চারণ করেনি কিংবা ইঙ্গিত দেয়নি যা অশালীন বা নোংরা।

কবে থেকে যে রাহুল সম্পর্কে সে আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেছে এবং কখন কিভাবে পরস্পরের অনেক কাছে এসে পড়েছে, নিজেরই খেয়াল নেই পারমিতার। প্রথম দিকের সেই আড়ষ্টতা বা অস্বাচ্ছন্দ্য কোনোটাই আর ছিল না। যত দেখছিল ততই মনে হচ্ছিল রাহুল কখনও তার ক্ষতি করবে না। রাহুলের ওপর তার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, অসংকোচে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে আসত। রাহুলের সঙ্গে রোজ দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে প্রতিদিন ফোনে একবার কথা বলতে না পারলে মন খারাপ হয়ে যেত। আগে ওর গাড়িতে ওঠার কথা বললে বুক কেঁপে উঠত। পরে সংশয় বা ভীতি পুরোপুরি কেটে গিয়েছিল। পারমিতা বুঝতে পেরেছিল, তার অমর্যাদা হয় এমন কিছুই করবে না রাহুল। কোনো কোনো দিন অফিস ছুটির পর ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেলে রাহুল তাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। পারমিতা কিন্তু তাকে ভেতরে যাওয়ার কথা বলত না। রাজলক্ষ্মী আছেন, রুনি আছে। ওরা রাহুলের বাড়িতে আসাটা কী চোখে দেখবে, সে সম্পর্কে তার প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা এবং দ্বিধা ছিল। রাহুল এমনই ভদ্র যে একদিনও বাড়ি নিয়ে যেতে বলেনি। হয়তো ভেবেছে, পারমিতার নিশ্চয়ই অসুবিধা আছে।

রাহুল যে বিরাট অভিজাত বংশের ছেলে, ক্রমশ জেনে গিয়েছিল পারমিতা। নিজের কথা অবশ্য কিছুই বলেনি সে।

পরিচয়ের পর পাঁচ ছ মাস কেটে গেছে। তারপর একদিন বিকেলে রেস্তোরাঁর নিরিবিলি কোণে বসে খেতে খেতে রাহুল হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'বেশ কিছুদিন আমরা মিশছি। একজন আরেক জনকে এতদিনে জানা হয়ে গেছে। এবার বোধহয় আমাদের একটা ডিসিশন নেওয়া দরকার।'

মেলামেশা এবং গভীর বন্ধুত্ব যে অনিবার্য পরিণতির দিকে যাবে সেটা অনেক আগেই টের পেয়েছিল পারমিতা। শুরুতেই রাহুলের মোহভঙ্গ ঘটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তার কিন্তু পারেনি। বহুদিন গভীর রাতে সারা কলকাতা যখন গাঢ় ঘুমের আরকে ডুবে আছে, সেই সময় একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তারায়-ভরা নিঝুম আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ফেলেছে সে। বুঝেছে রাহুলকে ঘিরে একটা রঙিন স্বপ্নকে সে-ও তো কম প্রশ্রয় দেয়নি। তার গোপন লোভও কম ছিল না। তবু ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে পারমিতা চমকে উঠেছে। মুখ নামিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বসে থেকেছে সে ; তারপর খুব নিচু কাঁপা গলায় বলেছে, 'আমি তোমাকে জেনেছি ঠিকই, কিন্তু তুমি আমার কিছুই প্রায় জানো না।'

'যেটুকু জেনেছি সেটাই যথেষ্ট। তার বেশি কিছু দরকার নেই।'

'ডোন্ট বি ইমোশনাল রাহুল। আবেগ জিনিসটা ভালো কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের হলে পরে ভীষণ দুঃখ পেতে হয়। তখন দেখবে আজ যে সম্পর্কটা রয়েছে সেটা ভেঙেচুরে দু'জনের মধ্যে তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

পারমিতার কণ্ঠস্বর এমনই ভারী, গম্ভীর এবং আবেগশূন্য যে চকিত হয়ে উঠেছিল রাহুল। তার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলেছে, 'এগজাক্টলি তুমি কী চাইছ?'

পারমিতা বলেছে, 'কোনো কিছু গোপন না রেখে নিজের সব কিছু জানাতে। আগেই বলতে পারতাম কিন্তু পারিনি। সেটা যেমন ছিল আমার দুর্বলতা, তেমনি অন্যায়ও।'

রাহুল খানিকটা নিরুপায়ভাবেই যেন বলেছে, 'ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছে, বল। তবে মনে মনে আমি যা ভেবে রেখেছি সেটা কোনোভাবেই বদলাবে না।'

তার কথা যেন শুনতেই পায়নি পারমিতা। দূরমনস্কর মতো নিজেদের মধ্যবিত্ত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করে মনোতোষের সঙ্গে বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, মা বাবার মৃত্যু, রুনিকে নিয়ে টিকে থাকার জন্য ধারাবাহিক লড়াই—একটানা, প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে গেছে সে।

তার কথা শেষ হওয়ার পর রেস্তোরাঁর সেই কোণটিতে অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে, কারুর খেয়াল নেই।

একসময় রাহুল বলে উঠেছে, 'সব শুনলাম।'

মুখ তুলে রাহুলের দিকে তাকিয়েই দ্রুত চোখ নামিয়ে নিয়েছিল পারমিতা। কিছু বলতে চাইছিল, পারেনি। হাজারটা এস্রাজে একসঙ্গে এলোপাথাড়ি ছড় টানলে যেমনটা হয়, তার বুকের ভেতর তাই যেন ঘটতে লাগল। রাহুল এরপর কী বলবে, সেটা বুঝিবা তার জানাই আছে। তবু সে অপেক্ষা করতে থাকে।

রাহুল বলেছে, 'আজকের সোসাইটিতে এমনটা ঘটতেই পারে। তুমি যে সো কলড সতী সাধ্বীদের ট্র্যাডিশনের ফাঁদে পা দিয়ে একটা বাজে লোকের সঙ্গে থেকে বাকি জীবনটা নষ্ট করে দাওনি, বরং সাহস করে ডিভোর্স নিয়ে বেরিয়ে এসেছ, সে জন্যে শ্রদ্ধাই হচ্ছে। আমার দিক থেকে তোমার ব্যাপারে কোনোরকম হেজিটেশান নেই।'

তীব্র, অসহ্য আবেগে, নাকি সুখে, পারমিতার সমস্ত অস্তিত্ব যেন উথলপাথল হয়ে যাচ্ছিল। রাহুলের মতো এমন উদার, এমন সহৃদয় মানুষ আগে সে কখনও দেখেনি। কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, সুখ—এ সবের মধ্যেও কিছুটা অনিশ্চয়তা যে ছিল না তা নয়। সে বলেছে, 'কিন্তু রুনি—'

এবার যেন একটু থমকে গেছে রাহুল। বলেছে 'মনে হয় সমস্যা হবে না। তবে—'

'তবে কী?'

'আমাদের বংশে এমন বিয়ে তো কখনও হয়নি। মা-বাবাকে, বিশেষ করে মাকে বোঝাতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রাহুলই আবার বলেছে, 'সময় হয়তো লাগবে। বাট উই শ্যাল ডেফিনিটলি ওভারকাম।'

পারমিতা উত্তর দেয়নি।

রাহুল এবার বলেছে, 'অনেকদিন ধরেই তোমাদের বাড়ি যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে। সাহস করে বলতে পারিনি। একদিন নিয়ে যাবে?'

অর্থাৎ তারা কেমন পরিবেশে থাকে, সেটাই হয়তো দেখতে চেয়েছে রাহুল। পারমিতা বলেছি, 'আজই চল না—'

সেই যে টালিগঞ্জে আসা শুরু হয়েছিল, তারপর প্রায়ই আসত রাহুল। রুনি এমনিতে গায়ে-পড়া, মিশুকে মেয়ে। যেমন আদুরে তেমনি হাসিখুশি। মায়ের সবটুকু সৌন্দর্য নিংড়ে নিয়ে সে অলৌকিক ফুলের মতো হয়ে উঠেছে। তাকে ভালো না লেগে পারা যায় না। প্রথম দিনই রাহুলের সঙ্গে তার দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শুধু রুনিই না, রাহুলের মার্জিত, মধুর ব্যবহারে রাজলক্ষ্মীও মুগ্ধ হলেন।

বারকয়েক যাতায়াতের পর একদিন রাজলক্ষ্মী বলেছিলেন, 'ছলেটা খুব ভালো রে। ও কেন আসে বুঝতে পারি—'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল পারমিতার। সে পিসির দিকে তাকাতে পারেনি। বিব্রতভাবে লাজুক কিশোরীর মতো হাতের নখ খুঁটে যাচ্ছিল।

রাজলক্ষ্মী পারমিতার পাশে বসে সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিগ্যেস করেছেন, 'রাহুল কি তোকে কিছু বলেছে?'

মাথা হেলিয়ে অস্ফুট গলায় পারমিতা বলেছে, 'হ্যাঁ।'

রাহুল কী বলে থাকতে পারে, সেটা রাজলক্ষ্মী যেন জানেন। বলেছিলেন, ' তা হলে আর আপত্তি করিস না।'

পারমিতা চুপ।

রাজলক্ষ্মী বলেছেন, 'কী-ই বা বয়েস তোর! সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। এভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না। তুই রাজি হয়ে যা মা।'

দ্বিধান্বিতভাবে পারমিতা বলেছে, 'আমি রুনির কথা ভাবছি পিসি।'

'রাহুল যদি তোকে মেনে নিতে পারে, রুনিকেও পারবে।'

'গোল্ডেন সার্কল ট্র্যাভেল এজেন্সি'তে পারমিতার সঙ্গে কাজ করে রোহিণী। তার অনেক আগে থেকেই রোহিণী ওখানে চাকরি করছে। মেয়েটা পাঞ্জাবি হিন্দু, তার মতোই ডিভোর্সি, বৃদ্ধ রিটায়ার্ড বাবাকে নিয়ে ভবানীপুরের একটা ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। তার মা নেই, নিজের ছেলেমেয়েও হয়নি। মোটামুটি ঝাড়া হাত-পা।

রোহিণী পারমিতার খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সত্যিকারের বন্ধু। তাকেও রাহুলের ব্যাপারটা জানিয়েছে সে। কী করা উচিত সে সম্বন্ধে পরামর্শও চেয়েছে।

রোহিণী বলেছে, 'ছেলেটাকে তো ভীষণ সিমপ্যাথেটিক মনে হচ্ছে। তুই আপত্তি করিস না। তবে রুনির ব্যাপারটা ঠিক করে নিবি।' রোহিণীর জন্ম কলকাতায়। সে চমৎকার বাংলা বলতে পারে।

এরপর রাহুলের সঙ্গে যত বারই দেখা হয়েছে, পারমিতা জিগ্যেস করেছে, 'মাকে আমাদের কথা বলেছ?'

রাহুল বিব্রতভাবে বলেছে, 'এখনও বলিনি। মানে তেমন সুযোগ পাচ্ছি না।'

এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন রাহুল এসে বলেছিল, 'মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

পারমিতার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল। সে জিগ্যেস করেছে, 'আমি আমার যে একটা মেয়ে আছে, এ সব জানিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু গোপন কর নি?'

অল্প হেসে রাহুল বলেছে, 'গোপন করে লাভ আছে? ধরা তো পড়তেই হবে। তা ছাড়া আমরা অন্যায় কিছু করছি না।'

পারমিতা এবারও চুপ করে থেকেছে।

রাহুল থামেনি, 'মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে।'

পারমিতা চমকে উঠেছে, 'আমাকে!' পরক্ষণে মনে হয়েছে, ছেলে কাকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনতে চাইছে তাকে দেখতে চাওয়াই তো স্বাভাবিক।

রাহুল বলেছে, 'হ্যাঁ। কবে যেতে পারবে বল---'

'যেতে যখন হবেই তখন আর দেরি করে কী হবে?' পারমিতা বলেছে, 'তুমি যেদিন বলবে -- '

রাহুল আজকের দিনটা ঠিক করেছিল।

কতক্ষণ মারুতি-ওমনির জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল খেয়াল নেই পারমিতার। কখন যে গাড়িটা তাদের টালিগঞ্জের বাড়ির সামনে এসে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেটাও লক্ষ করেনি।

রাহুল আস্তে ডাকল, 'পারমিতা---'

আশ্চর্য কোনো টাইম মেশিনে করে অতীতে চলে গিয়েছিল পারমিতা। আবার সে এই সময়ে ফিরে এল। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে কলিং বেল বাজাতে রাজলক্ষ্মী দরজা খুলে দিলেন। পারমিতা ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকতেই রুনি এসে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে জড়িয়ে ধরে একটা সোফায় বসে পড়ল সে।

রাহুলও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সে কিন্তু বসল না। পারমিতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে বলল, 'অত ভেঙে পড়ো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

পারমিতা কিছু বলল না।

রাহুল এবার বলল, 'আমি আজ যাই। কাল আবার আসব।'

রাহুল চলে যাওয়ার পর রুনি জিগ্যেস করল, 'মা, রাহুল আঙ্কেলদের বাড়িটা খুব সুন্দর, তাই না?' আজ যে পারমিতা রাহুলদের বাড়ি গিয়েছিল সেটা সে জানে।

অন্যমনস্কের মতো পারমিতা সাড়া দিল, 'হুঁ।'

'রাহুল আঙ্কল বলেছিল ওদের ছাদে অনেক পাখি, হরিণ আর খরগোশ আছে। দেখেছ?'

পারমিতা উত্তর দিল না।

একধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে তাকে দেখছিলেন রাজলক্ষ্মী। আজ বিকেলের দিকে পারমিতা যখন রাহুলের সঙ্গে বেরুল তখন থেকেই তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। বললেন, 'ও বাড়িতে কী হল রে?' চাপা উদ্বেগ আর উত্তেজনায় তাঁর গলা যেন কেঁপে গেল।

স্বর্ণলতার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব জানিয়ে পারমিতা বলল, 'আমি কী যে করব, বুঝতে পারছি না।' অসীম নৈরাশ্যে তার কণ্ঠস্বর বুজে যায়।

বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকেন রাজলক্ষ্মী। এ এমন এক জটিল সমস্যা যে কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

প্রচণ্ড অস্থিরতা পারমিতাকে যেন ক্রমশ বিপর্যস্ত করে ফেলতে লাগল। তারই মধ্যে কোনো রকমে খাওয়া চুকিয়ে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়ল সে, কিন্তু ঘুম এল না। বার বার রুনির দিকে ফিরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবল, স্বর্ণলতার শর্ত অনুযায়ী এই মেয়েটাকে ছেড়ে সে থাকবে কী করে? কোথায়ই বা তাকে রাখবে?

পরদিন অফিসে গেল না পারমিতা। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। চোখ জ্বালা জ্বালা করছিল। সারা শরীর জুড়ে গভীর অবসাদ। সে টের পাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

সন্ধের দিকে রাহুল এল। বলল, 'বিকেলে তোমাদের অফিসে ফোন করেছিলাম। তোমার বন্ধু রোহিণী বললে, তুমি যাওনি। কী ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি?'

পারমিতা বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। বোসো—'

রাহুলকে দেখে রুনি তার কাছে চলে এসেছিল। পারমিতা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্য ঘরে রাজলক্ষ্মীর কাছে পাঠিয়ে দিল।

রাহুল বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিগ্যেস করল, 'কী হল? রুনিকে-'

তাকে থামিয়ে দিয়ে পারমিতা বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার আর্জেন্ট কিছু কথা আছে। রুনির এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।'

উৎসুক সুরে রাহুল জিগ্যেস করল, 'কী কথা?'

পারমিতা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'তোমার মা কাল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের বাড়িতে রুনির জায়গা হবে না।'

রাহুল ভীষণ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে।

পারমিতা তার চোখে চোখ রেখে জিগ্যেস করল, 'তোমার লাইফে আমার কতটা প্রয়োজন?'

রাহুল হকচকিয়ে যায়, 'এতদিন পর এরকম আননেসেসারি কথার কোনো মানে হয়?'

'হয়।'

'কিরকম?'

উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল পারমিতা, 'জানতে চাইছি, আমার জন্যে তুমি কতদূর যেতে পার?'

হেসে হেসে রাহুল বলল, 'সে তো তুমি জানোই।'

তার দিকে ঝুঁকে তীব্র গলায় পারমিতা বলল, 'তোমার মা বলেছিলেন, রুনিকে ও বাড়িতে নিয়ে গেলে তোমার সঙ্গে ওঁদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তুমি রুনি আর আমার জন্যে বাড়ি থেকে চলে আসতে পার?'

'মা-বাবাকে ছেড়ে?'

'হ্যাঁ। কেননা রুনি কাছে না থাকলে আমি মরে যাব।'

অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল রাহুল। তারপর শ্বাসটানা গলায় বলল, 'আমাকে কয়েক দিন ভাবতে দাও। মানে—'

পারমিতা উত্তর দিল না। রাহুলের আরেকটা দিক কালই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বর্ণলতার মুখের ওপর জোর দিয়ে সে বলতে পারেনি, পারমিতার সঙ্গে রুনিকেও 'মুখার্জি ভিলা'য় নিয়ে যাবে। সে ভীরু, দুর্বল, দ্বিধান্বিত। সারা জীবন ভাবলেও রুনির সম্বন্ধে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মতো দুঃসাহস তার নেই।

আজ সামনাসামনি বলা যাবে না। কাল চিঠি লিখে পারমিতা জানিয়ে দেবে, তার এবং রুনির সম্বন্ধে আর ভাবার প্রয়োজন নেই রাহুলের।

বিরুদ্ধ পক্ষ

মাঝারি মাপের ফ্ল্যাটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবার পর পোপটলাল পারেখ বললেন, 'কি, পছন্দ তো?'

মাস চারেক আগে একটা বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মে চাকরি পেয়ে বম্বে এসেছি। এখানে আসার পর বাড়ি-টাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। বম্বে শহরে আকাশের তারা খসিয়ে আনাটা বাড়ি পাওয়ার চাইতে ঢের সহজ ব্যাপার।

চারটে মাস আমি একটা গেস্ট-হাউসে আছি। এখানে, এই বম্বে শহরে সাতটায় সানরাইজ। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতেই সাড়ে আটটা বেজে যায়। সাড়ে ন'টায় অফিসে অ্যাটেনডান্স। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে সাবার্বান ট্রেনের দম-আটকানো ভিড়ে নিজেকে গুঁজে দিয়ে চলে যাই প্রপার বম্বেতে।

সাড়ে ন'টা থেকে একটানা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অফিসে আর মাথা তুলতে পারি না। ঘাড় গুঁজে ফাইলের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। তারপর এক ঘন্টা লাঞ্চ ব্রেক। উদিপি, সিন্ধি কি ইরানি হোটেলে দুপুরের খাওয়াটা সেরে দেড়টায় আবার ব্যাক বে রিক্লামেশনের বাইশ-তলা বিশাল স্কাইস্ক্রেপারে গিয়ে ঢুকি। ওখানেই আমার অফিস। দেড়টায় ঢুকবার পর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাকি পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকে না, অগুনতি ফাইল বিরাট হাঁ করে আমাকে তার ভেতর গিলে নেয়।

পাঁচটার পর অফিস ছুটি হলে বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। বাবা মা আর দু'টো ছোট ভাই কলকাতায় রয়েছে। দু বছর হল বাবা রিটায়ার করেছেন। ছোট ভাই দু'টো বি. কম পাস করে বসে আছে। এই অবস্থায় বম্বেতে গেস্ট-হাউসে থেকে নিজের খরচ চালিয়ে আবার কলকাতার সংসার টানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। একটা বাড়ি-টাড়ি পেলে সবাইকে নিয়ে আসা যায়। তাতে খরচটা আমার মাপের মধ্যে নিয়ে আসতে পারব। তাছাড়া সিন্ধি কি উদিপি হোটেলে খেয়ে পেটের বারোটা বেজে যাচ্ছে। মা এলে পাকস্থলীটাকে অন্তত রক্ষা করা যাবে।

কিন্তু বম্বে শহরে বাড়ি কোথায়? প্রপার বম্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। চার মাস ধরে গোটা আউটস্কার্ট চষে বেড়িয়েছি, কিন্তু এক কামরার একটা ঘরও খুঁজে বার করতে পারিনি।

ঘর কি পাওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু কিভাবে যায়, বারোশো মাইল দূরের কলকাতা থেকে আসা আমার মতো একটা নতুন ছেলের পক্ষে তা জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি।

শেষ পর্যন্ত বাড়ির ব্যাপারে কিছুই করতে না পেরে পোপটলাল পারেখকে ধরেছি।

আমি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করি পোপটলাল সেখানকার সুপারিনটেনডেন্ট। মধ্যবয়সী এই গুজরাটি ভদ্রলোক মানুষ হিসেবে অত্যন্ত হৃদয়বান। আমি যেদিন এই অফিসে রিপোর্ট করলাম সেদিন থেকেই তাঁর স্নেহের উষ্ণতা অনুভব করে আসছি।

পোপটলাল বম্বে শহরের অন্ধিসন্ধি সব জানেন। তিনিই খোঁজাখুঁজি করে লোক লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রপার বম্বে থেকে বারো-চোদ্দ কিলোমিটার দূরে সান্তাক্রুজ ইস্টে একটা পাঁচতলা বাড়ির একেবারে মাথায় একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট বার করেছেন। আর সেটাই তিনি আমাকে এই মুহূর্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো শেষ করলেন।

ফ্ল্যাটটায় দু'খানা বড় বেডরুম, একটা হল, তাছাড়া আলাদা কিচেন, বাথরুম ইত্যাদি ইত্যাদি তো রয়েছেই। সব চাইতে সুবিধাজনক যেটা তা হল সাবার্বান ট্রেনের স্টেশনটা বাড়ির গায়েই, দু' মিনিট হাঁটলেই ঘোড় বন্দর রোডে গিয়ে প্রপার বম্বের এক্সপ্রেস বাস পাওয়া যায়। আমার পক্ষে এর চাইতে ভালো বাড়ি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

বাড়িটা পোপটলাল পারেখের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের, তাঁর নাম ভরতরাম ঢোলাকিয়া। তিনিও এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

আমি পোপটলালকে বললাম, 'হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। কত ভাড়া দিতে হবে?'

'পাঁচশো! তবে—'

'কী?'

'দশ হাজার টাকা পাগড়ি (সেলামি) দিতে হবে।'

ভরতরাম হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'মানে বুঝতেই পারছেন, বাড়িভাড়া দিয়ে আমাকে খেতে হয়। নইলে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে এসেছেন, বুঝি পাগড়িটা নেওয়া উচিত না—'

পাগড়ি ছাড়া বম্বেতে এক ইঞ্চি জায়গা পাওয়া যায় না। যে ফ্ল্যাটটা এইমাত্র দেখলাম কম করে তার পাগড়ি হওয়া উচিত বিশ হাজার টাকা। পোপটলাল পারেখের খাতিরে দশ হাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এর চাইতে সস্তায় খুঁজতে গেলে বম্বে শহরে এ জন্মে আর বাড়ি মিলবে না। বললাম, 'ঠিক আছে, দশ হাজারই দেব।'

কথাবার্তা পাকা করে আমরা তিনজন ফ্ল্যাটটা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়েই পোপটলাল আর ভরতরাম সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। আমাকে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। কেননা এই পাঁচতলা বাড়িটার প্রত্যেক ফ্লোরে দু'টো করে মুখোমুখি ফ্ল্যাট, আর এই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ল উলটো দিকের ফ্ল্যাটটা থেকে মাধুরী বেরিয়ে আসছে।

তিন বছর পর মাধুরীকে কলকাতা থেকে বারোশো মাইল দূরে আরব সাগরের পাড়ের এই শহরে দেখব, কে ভাবতে পেরেছিল! অবাক বিস্ময়ে পলকহীন তাকিয়ে রইলাম।

মাধুরীও আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার চোখেও অপার বিস্ময়। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর সে-ই প্রথম বলল, 'সঞ্জীবদা না?'

মাধুরীর বয়স তেইশ-চব্বিশ। গায়ের রঙ খুব ফর্সাও না, আবার কালোও না। দুয়ের মাঝামাঝি। মসৃণ ত্বক, লম্বাটে মুখ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা বাদামি সিল্কের মতো চুল, ভাসা ভাসা মাঝারি চোখ, মেলে দেওয়া পাখির ডানার মতো টান টান ভুরু, পাতলা ফুরফুরে নাক। পরনে প্রিন্ট-করা সিল্কের শাড়ি আর স্লিভলেস ব্লাউজ, পায়ে উঁচু হিলের স্লিপার।

তিন বছর আগে কলকাতায় থাকতে মাধুরী ছিল বেশ মোটাসোটা, তুলতুলে নরম চর্বি দিয়ে তখন তার শরীরটা ছিল তৈরি। বাজে চর্বি ঝরে গিয়ে এই তিন বছরে তার চেহারায় ঝকঝকে ইস্পাতের মতো একটা ধারাল ভাব এসেছে।

তার চোখেমুখে এবং শরীরের গড়নে কোথায় যেন অদৃশ্য একটা আকর্ষণ ছিল। সেটা এই তিন বছরে অনেক বেড়েছে। মাধুরীর চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি এখানে!'

মাধুরী বলল, 'আমরা তো এখানেই থাকি।'

'ওই ফ্ল্যাটটায়?'

'হ্যাঁ।'

পোপটলালরা সিঁড়ি ভেঙে চারতলার ল্যান্ডিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওখান থেকেই পোপটলাল গলা তুলে বললেন, কী হল চ্যাটার্জি, যাবে না?'

একটু চমকে উঠলাম। মাধুরীকে দেখার পর পোপটলালদের কথা খেয়াল ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'আপনারা নামতে থাকুন। আমি আসছি।'

চোখের কোণ দিয়ে মাধুরীকে দেখিয়ে পোপটলাল বললেন, 'চেনাশোনা বুঝি?'

'হ্যাঁ।' আস্তে ঘাড় কাত করলাম।

পোপটলাল আর কিছু জিগ্যেস করলেন না, ভরতরামকে সঙ্গে করে নেমে গেলেন।

মাধুরী এবার বলল, 'তুমি এখানে কী করে সঞ্জীবদা?'

কী উদ্দেশ্যে এই ফ্ল্যাট বাড়িতে এসেছি মাধুরীকে জানিয়ে দিলাম।

মাধুরী অবাক হয়ে বলল, 'তুমি তা হলে ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিচ্ছ!'

'হ্যাঁ।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই মাধুরীর মা আর ছোট বোন সুব্রতা ওদের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাধুরীর মা বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে মাধু?' বলতে বলতেই আমার ওপর তাঁর চোখ এসে পড়ল, 'কে, সঞ্জীব নাকি?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম, তারপর দু'পা এগিয়ে মাধুরীর মাকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। এস, ভেতরে এস—'

বললাম, 'আজ আর যাব না মাসিমা, এক্ষুনি আমাকে ব্যাক বে রিক্লামেশনে দৌড়তে হবে।'

মাধুরীর মা বললেন, 'তোমাকে বোম্বাইতে দেখব ভাবতে পারিনি।'

'আমি এখানে একটা চাকরি নিয়ে এসেছি।'

'ও মা, তাই নাকি? কদ্দিন আগে এসেছ?'

'মাস চারেক।'

'ওই দেখ, আমরা কিচ্ছু জানি না। জানবই বা কোত্থেকে? কলকাতা থেকে আসার পর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগও নেই, দেখাসাক্ষাৎও নেই।'

মাধুরী এই সময় বলে উঠল, 'জানো মা, সঞ্জীবদা ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিচ্ছে।'

মাধুরী মা বললেন, 'তাই বুঝি? বাঃ, খুব ভালো। আবার এক জায়গায় থাকা যাবে।'

মাধুরীর বোন সুব্রতার বয়স সতেরো-আঠারো। সে হঠাৎ রগড়ের গলায় বলে উঠল, 'আবার মজাসে ঝগড়া শুরু করা যাবে।'

মাধুরীর মা আর আমি, দু'জনেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম।

মাধুরীর মা ধমকের গলায় সুব্রতাকে বললেন, 'বাঁদর মেয়ে, চুপ কর।'

মাধুরী কিন্তু এতটুকু বিব্রত হয় নি। সে ঠোঁট কামড়ে হাসতে লাগল।

মাধুরীর মা আমার দিকে ফিরে এবার বললেন, 'ওই দেখ, আসল কথাটাই জিগ্যেস করা হয় নি। তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?'

বললাম, 'ভালো।'

'ফ্ল্যাট ভাড়া নিচ্ছ, ওঁদের নিয়ে আসবে তো?'

'হ্যাঁ, মাসিমা।'

'তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।'

এরপর বাড়ির অন্য সবাই কে কেমন আছে, কে কী করছে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলেন মাসিমা। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম, 'আজ যাই।'

'এস।'

মাধুরীও আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নিচে নেমে এল। নামার সময়ই ও ওদের বাড়ির তিন বছরের সব কথা তিন মিনিটে জানিয়ে দিয়েছে। মাধুরীর বাবা হরিনারায়ণবাবু এখনও কাস্টমসে চাকরি করছেন, তবে এটাই তাঁর রিটায়ারমেন্টের বছর। মাধুরী কলকাতা থেকে বি. এ পাস করে এসেছিল। এখানে সে এল. আই. সি'তে একটা চাকরি পেয়েছে। সুব্রতা একটা নাম-করা ইনস্টিটিউটে অফিস সেক্রেটারিশিপ করছে। ওদের কোনো ভাই-টাই নেই।

কথায় কথায় দু'জনে সান্তাক্রুজ স্টেশনে চলে এসেছিলাম। মাধুরী আন্ধেরিতে যাবে। ওখানকার জোনাল অফিসে সে কাজ করে। আর আমি যাব তার উলটোদিকে চার্চ গেট স্টেশনে।

টিকিট কেটে ওভারব্রিজ পেরিয়ে আমি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যখন নেমে যাচ্ছি তখন মাধুরী বলল, 'তোমরা তাড়াতাড়ি চলে এস সঞ্জীবদা—'

বললাম, 'আচ্ছা।'

'সুব্রতা যা বলল তাই করব কিন্তু।'

'ঝগড়া তো?'

'হ্যাঁ। তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে করে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে ওটা ছাড়া এই তিন বছরে ভীষণ অসুবিধা হয়েছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তিন বছর ইন্টারভ্যালের পর নতুন এনার্জি নিয়ে আবার শুরু করতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।' বলে হাসতে হাসতে ওভারব্রিজ ধরে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে গেল মাধুরী। ওখান থেকেই আন্ধেরির ট্রেন ধরবে সে।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে চার্চগেটের ট্রেনে উঠে প্রপার বম্বের দিকে যেতে যেতে তিন বছর আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার।

কলকাতায় শ্যামবাজারের কাছে একটা জিলিপির প্যাঁচের মতো গলির শেষ মাথায় মাধুরীরা আর আমরা একই বাড়িতে থাকতাম। বাড়িটা যে কোন আদ্যিকালের কে জানে। খুব সম্ভব জব চার্নক নিজের হাতে ওটার ভিত পুঁতেছিলেন। সূর্য উত্তরায়ণে না গেলে ও বাড়িতে এক

ফোঁটা রোদ ঢুকত না। দু-তিনটে মাস বাদ দিলে বাড়িটা ছিল চির প্রদোষের রাজ্য। অবশ্য ছাদে গেলে খানিকটা রোদ পাওয়া যেত। গরম কালটা তবু এক রকম। শীত পড়লে মেঝে থেকে সর্বক্ষণ বরফের মতো হিম উঠতে থাকত। তাছাড়া বাড়ির ইলেকট্রিকের লাইনগুলো পুরনো ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল, যখন তখন আলো নিবে যেত, ফ্যান বন্ধ হত। জলের কলেরও সেই অবস্থা।

জল কল রোদ ইলেকট্রিসিটি, এসব নিয়ে মাধুরীদের সঙ্গে প্রায় রোজই আমাদের খিটিমিটি লেগে থাকত। এককে দিন ঝগড়াটা সকালে শুরু হয়ে ক্লাসিক গানের আলাপ তান এবং বিস্তারের মতো সারাদিনই চলতে থাকত। ওদের পক্ষের মূল গাইয়ে ছিল মাধুরী নিজে, তার সঙ্গে সঙ্গত করতেন ওর মা, সুব্রতা আর ওর বাবা। আমাদের পক্ষের আসল আর্টিস্ট আমি। আমার সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির অন্য সবাই ধুয়ো ধরত।

বেশির ভাগ দিনই যুদ্ধটা হত জল কল নিয়ে। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। স্নান করতে নিচের তলায় নেমে দেখি, চৌবাচ্চায় এক ফোঁটা জল নেই। চিৎকার করে বলতাম, 'এটা কিরকম হল মাধুরী, তোমাদের কি এতটুকু কনসিডারেশন থাকতে নেই?'

মাধুরী তখন কলেজে বি. এ পড়ছে। আমার গলা পেয়েই সে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসত। বলত, 'কী বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই, সবটুকু জল তোমরা শেষ করে দিলে। আমি এখন কী করে চান করি?'

'তোমার কি ধারণা আমরা সাহারা মরুভূমি থেকে এসেছি? সব সময় চৌবাচ্চার জল আর কল নিয়ে পড়ে আছি?'

'সাহারা থেকে এসেছ, না চেরাপুঞ্জি থেকে তা আমাদের জানবার দরকার নেই। আমরা স্নানের সময় দু বালতি জল পেলেই খুশি হব।'

'তোমরা জল পাবে কি পাবে না, তার কৈফিয়ৎ কি আমাদের দিতে হবে?'

'নিশ্চয়ই দিতে হবে। তোমরা নিচে থাক। চৌবাচ্চার জল কোথায় যায়, তোমরা ছাড়া ওপর থেকে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'অত সন্দেহ হলে চৌবাচ্চার কাছে সারা দিন বসে পাহারা দিলেই পার।'

আমাদের চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যেই মাধুরীর মা বাবা আর সুব্রতা বেরিয়ে আসত। ওপরের বারান্দায় আমার মা বাবা আর ভাইরা রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে যেত। দু পক্ষের আর্মি মবিলাইজেশনের পর কোরাসে যে চিৎকার শুরু হত তাতে শ্যামবাজারের সেই গলির মাথা থেকে যাবতীয় কাক চিল চড়ুই আর শালিক পালিয়ে যেত।

শুধু কলের বা চৌবাচ্চার জল নিয়ে না, ছাদের ভাগাভাগি, ইলেকট্রিসিটির বিল ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট বড় সব ব্যাপারে রোজই ওপরে নিচে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত।

ঝগড়া ছাড়া ওদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হত না। দেখা হলেই দুপক্ষ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

এইভাবে মাধুরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পুরো দশটা বছর কেটে গেছে। তারপর একদিন ওর বাবা বদলি হয়ে বম্বে চলে এলেন। নিচের তলাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়িওলা তারপর আর ওটা ভাড়া দেয় নি। তার গেঞ্জির কল ছিল, নিচের তলায় সে গো-ডাউন করেছে। মাধুরীরা চলে যাবার পর বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ঝগড়া নেই, চিৎকার নেই।

কাকেরা চড়ুইয়েরা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছিল। টানা দশ বছর যুদ্ধের পর শান্তি নামলেও কেমন যেন সব কিছু ফাঁকা লাগতে শুরু করেছিল।

সকালবেলা ঝগড়া করতে করতে আমরা উঠতাম, রাত্তিরে ঝগড়া করতে করতে ঘুমোতে যেতাম। মাধুরীরা চলে যাবার পর দশ বছরের সেই অভ্যাসটায় দারুণ একটা ধাক্কা লেগেছিল।

মা বলতেন, 'মাধুরীরা ছিল, সময়টা বেশ কেটে যেত। এখন আর ভালো লাগে না।'

বাবা এবং ভাইরাও সেই একই কথা বলত। আসলে দিনরাত একটানা দশ বছর যুদ্ধ করলেও তলায় তলায় কোথায় যেন একটা টানও ছিল। মাধুরীরা চলে যাবার পর সেটা টের পাওয়া গেছে।

যাই হোক, সময় তো আর কোথাও হাঁটু গেড়ে বসে থাকে না। সেটা চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেছে। তার মধ্যে বাবা রিটায়ার করেছেন, ভাইরা গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে। আমি এম কম পাস করে আচমকা একটা চাকরি পেয়ে বম্বে চলে এসেছি। আর কি আশ্চর্য, এতকাল পর আবার মাধুরীদের সঙ্গে দেখা হল। কলকাতার মতো এবার আর ওপরে নিচে নয়, একেবারে মুখোমুখি থাকতে হবে।

পরের দিনই পোপটলালের আত্মীয়টিকে পাগড়ি এবং ভাড়ার টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটটা নিয়ে নিলাম। তারপর একটা মাসও কাটল না। মা বাবা ভাইদের কলকাতা থেকে নিয়ে এলাম। ওরা মাধুরীদের দেখে অবাক। কী অদ্ভুত কাণ্ড, ওরা মাধুরীদের এত কাছে পেয়েও যুদ্ধ ঘোষণা করল না। শুধু বলল, 'যাক বাবা, এক ঘর চেনা-জানা মানুষ পেয়ে বাঁচালাম।'

তারপর দেখা যেতে লাগল, আমার মা-বাবা মাধুরীর মা-বাবার সঙ্গে খার-এ রামকৃষ্ণ মিশনে গীতা পাঠ শুনতে যাচ্ছেন। আর আমরা অর্থাৎ মাধুরী সুব্রতা আমি আর আমার দুই ভাই তপু এবং তনু কোনো ছুটির দিনে চলে যেতাম পুনে, কখনও এলিফ্যান্টা কেভে, কখনও জুহু বীচে, কখনও বা দু-তিন দিনের জন্য গোয়ায় কি অজান্তা-ইলোরায়।

তা ছাড়া যদিও মাধুরী এবং আমার অফিস বম্বে শহরের দক্ষিণে এবং উত্তরে, একেবারে পরস্পরের উলটোদিকে, তবু ইচ্ছে থাকলে কী না হয়! ছুটির পর আগে থেকে একটা জায়গা ঠিক করে আমরা দেখা করি।

মাধুরী বলে, 'দেখ, এভাবে ঠিক জমছে না।'

ওর কথা বুঝতে না পেরে আমি জিগ্যেস করি, 'কিভাবে?'

'এই ঝগড়াঝাঁটি না করে জাস্ট লাইক গুড নেবারস আমরা যে আছি, এতে কোনো চার্ম নেই। কলকাতায় দশ বছর লড়াই করে করে হ্যাবিট এরকম হয়ে গেছে যে—'

'ঠিক বলেছ। লোকসভায় অপোজিশন না থাকলে সেসান জমে না।'

'ওয়ারটা ডিক্লেয়ার করব কী নিয়ে? কল জল ইলেকট্রিক মিটার, সবই তো আলাদা।'

'তাই তো—'

ভেবে বললাম, 'এক কাজ করা যাক। ঝগড়ার কোনো টপিক বার করা যায় কিনা সেটা খুঁজতে থাকো। আমিও বার করতে পারি কিনা দেখি।'

মাধুরী বলল, 'ঠিক আছে।'

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। এর মধ্যে যুদ্ধ বাধাবার মতো কোনো বিষয়বস্তু বা আছিলা খুঁজে বার করতে পারি নি আমরা। তবে আমার মাথায় অন্য একটা পরিকল্পনা এসেছে।

একদিন ছুটির পর ব্যান্ড স্ট্যান্ডে সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'দেখ মাধুরী, তুমি যদি হেল্প্ কর, ঝগড়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

মাধুরী দু চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল, 'কী সাহায্য চাও?'

বললাম, 'যদি সাহস দাও, বলব।'

'দিলাম সাহস।'

'তুমি এক ফ্ল্যাটে থাকো, আমি আরেক ফ্ল্যাটে। কল জল ইলেকট্রিসিটি কিছুই কমন নয়। যদি পার্মানেন্টলি আমাদের ফ্ল্যাটে চলে আসো তা হলে, মানে কাছাকাছি থাকলে ঝগড়া কি আর একটা বাধানো যাবে না?'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাধুরী। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। তার ফর্সা মুখে ধীরে ধীরে রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে আমার কাঁধের কাছে পিঁপড়ের কামড়ের মতো কুট করের একটা চিমটি কাটল সে। তারপর আবছা ফিসফিসে গলায় বলল, 'এই মতলব?' তার চোখে জোনাকির মতো হাসি ঝিকমিক করতে লাগল।

আমি দু'হাত জোড় করে বললাম, 'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে না পারলে আমি বাঁচব না। বল রাজি কিনা?'

একটু চুপ করে থেকে মাধুরী বলল, 'রাজি!' বলেই কুট করে দ্বিতীয় চিমটিটি কাটল।

বিদেশী

ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা আলতাফ হোসেনের বহুকালের অভ্যাস। আজও পাঁচটাতেই উঠে হোটেলের ব্যালকনিতে এসে বসেছেন।

সময়টা নভেম্বরের মাঝামাঝি। এর মধ্যেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে কলকাতায়। সূর্য এখনও ওঠেনি। কনকনে উত্তুরে হাওয়া সারা গায়ে হিম মেখে প্রবল দাপটে বয়ে যাচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে। মনে হচ্ছে, শীতটা এবার অনেক আগে আগেই নেমে যাবে।

আলতাফ হোসেনের পরনে পাজামা এবং গরম পাঞ্জাবির ওপর মোটা পশমি চাদর। সেটা আরেকটু ঘন করে জড়িয়ে নিলেন তিনি। ভোরের এই ঠাণ্ডাটা বেশ আরামদায়ক লাগছে।

তিনি যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে যেদিকে যতদূর চোখ যায় সব ঝাপসা। কুয়াশার ভেতর চারপাশের উঁচু উঁচু হাই-রাইজগুলোকে অস্পষ্ট পেন্সিল স্কেচের মতো মনে হয়। ষাট ফুট নিচে চওড়া অ্যাসফাল্টের রাস্তাটা এখন একেবারেই ফাঁকা। ক্বচিৎ দু-চারটে দুধের গাড়ি বা খবরের কাগজের ভ্যান ভোরের নৈঃশব্দ্যকে চুরমার করে গাঁক গাঁক করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দিন দশেক আগে ঢাকা থেকে দিল্লি হয়ে আজমীর শরিফ গিয়েছিলেন আলতাফ। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনদিন হল কলকাতায় এসেছেন।

আলতাফের বয়স এখন ছিয়াত্তর। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, দেশ তখনও ভাগ হয়নি, এই শহরে শেষ এসেছিলেন। তারপর এই এলেন। এবার আসার একটা উদ্দেশ্য আছে।

ছিয়াত্তরেও স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই আলতাফের। এখনও একা একা চলাফেরা করতে পারেন। কিন্তু আয়ুর কথা কেউ বলতে পারে না। ভারতে যখন আসাই হয়েছে তখন ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। পরে হয়তো আর সে সুযোগ পাওয়া যাবে না।

তবে দেখা যে করতে পারবেন সে ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নন আলতাফ। কেননা দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় তাঁদের সেই নগণ্য মফস্বল শহর থেকে পুরনো বন্ধুদের কে কোথায় ভেসে গেছে, ক'জন বেঁচে আছে, তাদের ঠিকানাই বা কী, কিছুই জানা নেই তাঁর। এই এক কোটি মানুষের বিশাল মেট্রোপলিসে ঠিকানাহীন চার পাঁচটি বন্ধুকে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যে কলকাতায় তিনি শেষবার এসেছিলেন তার সঙ্গে আজকের এই শহরের বিশেষ কোনো মিল নেই। অগুনতি হাইরাইজ, জনবিস্ফোরণের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ, রাস্তায় রাস্তায় অন্তহীন গাড়ির স্রোত তো আছেই, সেই সঙ্গে কলকাতা যে কতদিকে কতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, এখানে না এলে জানা যেত না। তাঁর স্মৃতির শহর যে এতটা বদলে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। দেশভাগের আগের কলকাতার সামান্য একটু আদলই এখন অবশিষ্ট আছে। নইলে সবই প্রায় অচেনা, অভাবনীয় এবং চমকে দেওযার মতো। এখানে পাঁচ বছর রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেও বন্ধুদের খোঁজ পাওয়া যাবে না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় ঠিক করেছেন। তিনদিন আগে কলকাতায় পৌঁছেই হোটেলে সুটকেস ব্যাগট্যাগ রেখে, ঠিকানা জোগাড় করে চলে গিয়েছিলেন একটা ইংরেজি আর দু'টো বাংলা খবরের কাগজের অফিসে। কাগজগুলোর 'চিঠিপত্র' বিভাগে ছাপার জন্য একটি করে চিঠি দিয়ে এসেছেন। সেগুলোর বয়ান এইরকম।

'ঢাকা জেলার ছোট শহর বাজিতপুরে আমাদের চার পুরুষের বাস। আমার জন্ম সেখানে। জীবনের প্রথম তিরিশ বছর ওই শহরে কাটিয়েছি। সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে রাজধানী ঢাকায় চলে এসেছি। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা।

'বাজিতপুরে থাকাকালীন আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু ছিল। তারা হল পরিতোষ গোস্বামী, মণিমোহন ঘোষ, অম্বিকা চাকলাদার, ভূপতিনাথ বসাক আর নৃপতি সরকার। এরাও পুরুষানুক্রমে ওই শহরে বাস করে এসেছে। দেশভাগের পর এই বন্ধুরা ভারতে চলে আসে। এদের মধ্যে মণিমোহন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্রিটিশ আমলে ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে অন্তরীণ হওয়া ছাড়াও বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে জেল খেটেছে। মণিমোহনের এই পরিচয়টা বিশেষভাবে দেওয়ার কারণ, ভারতে তাকে হয়তো অনেকেই চিনবেন।'

'আমার এই বন্ধুরা কে কোথায় আছে, জানি না। জীবনের অন্তিম পর্বে তাদের দেখার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছি।'

'বর্তমানে আমি সার্কুলার রোডে 'ড্রিমল্যান্ড ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেল'-এ আছি। আর পাঁচদিন এখানে থাকব। বন্ধুরা এই চিঠি পড়ামাত্র যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। দুর্ভাগ্যবশত এরা কেউ জীবিত না থাকলে এদের পুত্রকন্যারা যদি পিতৃবন্ধুকে দেখতে আমার হোটেলে আসে বড়ই আনন্দ লাভ করব।

আলতাফ হোসেন'

'চিঠিপত্র' বিভাগের সম্পাদকদের তিনি অনুরোধ করে এসেছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিঠি যেন ছাপা হয়। কাল পর্যন্ত ওগুলো বেরোয়নি। হয়তো স্থানাভাবের কারণে। এজন্য ভেতবে ভেতরে আলতাফ বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

কতক্ষণ ব্যালকনিতে বসে ছিলেন খেয়াল নেই। হঠাৎ আলতাফের চোখে পড়ে কুয়াশা কেটে গিয়ে কখন যেন রোদ উঠে গেছে। সামনের সার্কুলার রোড, দূরের ক্যামাক স্ট্রিট বা চৌরঙ্গিতে এখন প্রচুর মানুষজন। বাস, মিনিবাস আর প্রাইভেট কারের ঢল নেমেছে চারপাশে। রাত পোহাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইচই এবং ব্যস্ততায় সরগরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে এই শহর।

ধীরে ধীরে উঠে তিনি টয়লেটে চলে যান। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসতেই রুম বয় এসে টয়লেট এবং কামরা সাফ করে, বেড-শিট পালটে বিছানা ঠিক করে দিয়ে যায়। তারপর একটা বেয়ারা ট্রেতে চায়েব সরঞ্জাম, ব্রেকফাস্ট এবং তিনখানা খবরের কাগজ সাজিয়ে ঘরে ঢোকে। যে কাগজগুলোতে আলতাফ চিঠি দিয়ে এসেছিলেন রোজ সকালে বেয়ারাকে তার একটা করে কপি কিনে আনতে বলেছেন।

টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে চলে যায় বেয়ারা। আলতাফ তৎক্ষণাৎ কাগজগুলোর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজ তিনটে কাগজেই তাঁর চিঠি ছাপা হয়েছে। বিভাগীয় সম্পাদকদের মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে টি-পট থেকে কাপে লিকার এবং দুধ ঢেলে সুগার কিউব মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে ভাবতে থাকেন, এই চিঠি সকালেই বন্ধুদেব চোখে পড়ার কথা। যদি তাবা বেঁচে থাকে দু-তিন ঘণ্টা পর নিশ্চয়ই ফোন আসবে। পরক্ষণে একটা খটকা লাগে তাঁর। তিনি ধরেই নিয়েছেন বন্ধুরা কলকাতায় বা তার আশেপাশে রয়েছে, কিন্তু যদি না থাকে? অনিশ্চিতভাবে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তাঁর মনে হয়, সবাই কি আর কলকাতার বাইরে আছে? যদি বাইরেও থাকে, কাগজগুলো দূরত্ব অনুযায়ী কারো কাছে দুপুরে, বিকেলে কি সন্ধের ভেতর পৌঁছে যাবে। আজ না পারলেও, আশা করা যায়, কাল পরশু কিংবা তার পরদিন ওরা যোগাযোগ করবে।

নাতি-নাতনি এবং পুত্রবধূরা কলকাতা থেকে বালুচরি শাড়ি, ইন্ডিয়ান কসমেটিকস এবং ভালো শার্ট প্যান্টের পিস কিনে নিয়ে যেতে বলেছে। কিন্তু বন্ধুদের কার কখন ফোন আসবে ঠিক নেই। আলতাফ স্থির করে ফেলেন আজ কাল এবং পরশু হোটেল থেকে বেরুবেন না। এর ভেতর বন্ধুদের সাড়া পাওয়া না গেলে কিছু করার নেই।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে খবরের কাগজগুলো নিয়ে শুয়ে পড়েন আলতাফ। খাটের পাশে একটা নিচু টেবলে ছোট টেলিফোন রয়েছে। চোখের সামনে খবরের কাগজ থাকলেও তাঁর সমস্ত মনোযোগ সেদিকে।

এগারোটা বেজে যখন পঁচিশ, আলতাফ ঠিক করলেন স্নানটা সেরে নেওয়া যাক। বিছানা থেকে তিনি নামতে যাবেন, সেইসময় হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। অসীম আগ্রহে সেটা তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে ভারী গলা ভেসে আসে, 'আমি মণিমোহন ঘোষ। আলতাফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলছি কি?'

দেখা যাচ্ছে কৌশলটা ষোল আনা কাজে লেগেছে। বন্ধুদের ভেতর আলতাফের সব চেয়ে

প্রিয় ছিলেন মণিমোহন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা এই মানুষটির প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।

মণিমোহনের কণ্ঠস্বব শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা গাঢ় আবেগে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল আলতাফের। বললেন, 'হ্যা, আমি আলতাফ। কতকাল পর তোমার গলা শুনলাম—' তাঁর বলার ভঙ্গিতে পূর্ববঙ্গের টান।

'সকালে খবরের কাগজে তোমার চিঠিটা পড়ে কী ভালো যে লাগল, বলে বোঝাতে পারব না। বাজিতপুরের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। সে কী আজকের ব্যাপার! তোমার চিঠিটা যেন আমাকে আগের জন্মে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।'

'তোমাদের ঠিকানা তো জানি না। খবরের কাগজে চিঠি না দিয়ে উপায় ছিল না।'

'পদ্ধতিটা বুদ্ধি করে ভালই বার করেছিলে।'

দু'জনে প্রাণ খুলে জোরে জোরে হাসতে থাকেন।

একসময় আলতাফ বলেন, 'তোমার খবর পরে নিচ্ছি। আগে বল অন্য বন্ধুরা কে কেমন আছে, কোথায় থাকে।'

মণিমোহন জানান, পার্টিশানের পর নৃপতিরা, অম্বিকারা, ভূপতিরা এবং তাঁরা সোজা কলকাতায় চলে এসেছিলেন। পরিতোষরা চলে যান আসামে। তাঁদের কোনো খবর জানা নেই মণিমোহনের। নৃপতি আর ভূপতি মারা গেছেন। নৃপতির স্ত্রীও বেঁচে নেই। তাঁদের দুই মেয়ে বিয়ের পর বিদেশে চলে গেছে। ভূপতি কলকাতায় আসার পর বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর বিধবা স্ত্রীকে তাঁর এক শালা জামশেদপুরে নিজের কাছে নিয়ে যায়। বছর চারেক আগে পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, এখনকার কথা বলতে পারবেন না মণিমোহন।

অম্বিকা জীবিত আছেন। শুধু তাই নয়, এখনও অত্যন্ত কর্মক্ষম। দেশভাগের পর কলকাতায় এসে ব্যবসা করে কারখানা বসিয়ে প্রচুর পয়সা করেছেন। নিউ আলিপুরে প্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ি। ছেলেরা সবাই শিক্ষিত এবং কৃতী। বাবার বিরাট ব্যবসা, সাত-আটটা কারখানা তারাই দেখে। তবে সবার মাথার ওপর রয়েছেন অম্বিকা। তিনিই মূল শক্তি। তাঁর নির্দেশে এতগুলো প্রতিষ্ঠান মসৃণ নিয়মে চলছে। প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী অম্বিকা চাকলাদারকে অমান্য করার সাহস ছেলেদের কারো নেই।

আলতাফ বললেন, 'অম্বিকার কথা শুনে ভালো লাগল। রিফিউজি হিসেবে এদেশে এসে এতখানি রাইজ করা সহজ ব্যাপার নয়। আশা করি, আমার চিঠিটা তার নজরে পড়লে ফোন করবে। তবু ওর ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা যদি দাও—'

ফোন নাম্বার আর ঠিকানা দিলেন মণিমোহন। তারপর বললেন, 'এবার তোমার কথা বল আলতাফ।'

'সে তো বলবই। তার আগে তোমারটা শুনি—'

'শুনে আর কী হবে। আজ রাতে আমাদের এখানে দু'টো ডালভাত খাও। তখন নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

দারুণ খুশির গলায় আলতাফ বলেন, 'নিশ্চয়ই খাব। বাজিতপুরে তোমার মা, মানে মাসিমার হাতের রান্না কত খেয়েছি। সে সব মুখে লেগে আছে। তোমার ঠিকানা বল, কিভাবে যাব তার ডিরেকশানটা দাও—'

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে একটা সরু রাস্তায় থাকেন মণিমোহনরা। সেখানকার ঠিকানা দিয়ে ট্যাক্সি করে সন্ধের দিকে চলে আসতে বলেন তিনি।

আলতাফ বলেন, 'ঠিক আছে, চলে যাব।'

মণিমোহন বললেন, 'তোমাদের কথা কিন্তু জানা হল না আলতাফ। ক'টি ছেলেমেয়ে, তারা কী করছে টরছে —'

আলতাফ বলেন, 'তুমি আমাকে সাসপেন্সে ঝুলিয়ে রাখলে। আমি সেটা করছি না। শোন তবে—' পঁয়তাল্লিশ বছরের পারিবারিক ইতিহাস সংক্ষেপে জানিয়ে দেন তিনি। পাকিস্তান হওয়ার পর বাজিতপুর থেকে স্ত্রী এবং বড় ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন আলতাফ। শুরু করেন কাপড়ের ব্যবসা আর ছাপাখানা। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য ফিরে যায়। টাকা আসতে থাকে স্রোতের মতো। সেই টাকার বেশির ভাগটাই নতুন নতুন ব্যবসাতে ঢেলেছেন। তার ফলও পেয়েছেন। টঙ্গির কাছে এখন দু'টো গারমেণ্ট ফ্যাক্টরি তাঁর। ফবেন কোলাবরেশনে সেখানে জিনসের ট্রাউজার্স আর শার্ট তৈরি হয়, তার আশি ভাগ এক্সপোর্ট করেন অস্ট্রেলিয়ায় আর মিডল ইস্টে। ছ'খানা ট্রেডল মেশিন দিয়ে ছাপাখানা আরম্ভ হয়েছিল। সেই জায়গায় এখন বারোখানা পাঁচ কালারের অফসেট মেশিন, ডিটিপি বাইশ খানা।

বাজিতপুরে থাকার সময় একটি মাত্র ছেলে হয়েছিল। ঢাকায় আসার পর আরো দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম। সবাই উচ্চশিক্ষিত। বড় আর মেজো ছেলে গারমেন্ট ফ্যাক্টরি দেখে, আলতাফ এবং ছোট ছেলে দেখে ছাপাখানা। দুই মেয়ের একজন আর্কিটেক্ট, অন্যজন ডাক্তার। তাদের ভালো বিয়ে হয়েছে। ধানমণ্ডিতে দু'খানা বাড়ি করেছেন, গাড়ি আছে চার-পাঁচটা। জীবনে যা যা কাম্য সবই পেয়েছেন। তাঁর কোনো আক্ষেপ নেই।

সব শুনে খুব আন্তরিক গলায় মণিমোহন বলেন, 'বা, এ তো বিরাট সাকসেস স্টোরি। শুনে খুব আনন্দ হল।' একটু থেমে বলেন, 'সন্ধেয় আসছ কিন্তু। আমারই গিয়ে তোমাকে হোটেল থেকে নিয়ে আসা উচিত ছিল কিন্তু বিকেলে—'

তাঁকে থামিয়ে আলতাফ বলেন, 'এ নিয়ে ভেবো না। টালিগঞ্জ মোটামুটি আমার চেনা। ঠিক সময়ে চলে যাব।'

মণিমোহনের সঙ্গে কথা বলার পর আলতাফ স্নান খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েন। দুপুরের দিকে ঘন্টাখানেক ঘুমনো তাঁর বরাবরের অভ্যেস। স্বল্পক্ষণের এই দিবানিদ্রায় শরীরটা বেশ ঝরঝরে থাকে। ভাবলেন, অম্বিকার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার তো পাওয়াই গেছে। অম্বিকা যদি যোগাযোগ নাও করেন তিনি বিকেলের দিকে ফোন করবেন।

কিন্তু ঘুমনো আর হল না। দুই চোখ যখন জুড়ে আসছে সেই সময় ফোন বেজে ওঠে। সেটা তুলে কানে লাগাতে অচেনা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'আলতাফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

কলকাতায় আসার পর ঢাকায় স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দিয়েছেন এখানে কোথায় উঠেছেন। তারা রোজ সন্ধের পর ফোন করে। তিনি আন্দাজ করলেন এটা হয়তো অম্বিকার গলা। মণিমোহনের সঙ্গে ঘন্টা দেড়েক আগে কথা হয়ে গেছে। এ শহরে অম্বিকা ছাড়া আর কে তাঁকে ফোন করতে পারে? আলতাফ বলেন, 'আমিই আলতাফ। তুমি নিশ্চয়ই অম্বিকা?'

ওধার থেকে এবার শোনা যায়, 'বুঝলে কী করে?' অম্বিকার গলায় বিস্ময় মাখানো।

'পঁচাত্তর ছিয়াত্তর বছর বয়স হল। এটুকু অনুমানশক্তি এতদিনে কি আমার হয়নি?'

'তা বটে।'

এবার দুই বন্ধু পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বাজিতপুরের সেই স্বপ্নময় দিনগুলিতে ফিরে যান। পুরনো স্মৃতির ভেতর কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকার পর এখন কে কী করছেন, ছেলেমেয়ে ক'টি, ইত্যাদি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন। দেশভাগের পর সব দিক থেকে পরস্পরের চমকপ্রদ ধারাবাহিক সাফল্যের ইতিহাস শুনে দু'জনেই মুগ্ধ এবং খুশি. অবশ্য অম্বিকার কথা মণিমোহনের কাছে আগেই জেনেছেন আলতাফ।

একসময় আলতাফ বলেন, 'সন্ধেবেলা গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। চলে আসবে কিন্তু। রাত্তিরে একসঙ্গে ডিনার খাব। আমার ছেলেরা, ছেলের বউরা, আমার স্ত্রী, তুমি, আমি—সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

আলতাফ বলেন, 'আজ তো যেতে পারব না ভাই।'

'কেন?'

'মণিমোহন খেতে বলেছে। তার ওখানে যেতে হবে।'

'মণিমোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?'

'না। খবরের কাগজে আমার চিঠি দেখে কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল।'

'ও, আচ্ছা—'

একটু চুপচাপ।

তারপর আলতাফ হোসেন জিগ্যেস করেন, 'মণি এখন কী করছে?'

অম্বিকা পালটা প্রশ্ন করেন, 'কেন তোমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, কিছু বলেনি?'

'না। ওর বাড়িতে গেলে নাকি সব জানতে পারব।'

অম্বিকা উত্তর দিলেন না।

আলতাফ হোসেন এবার বলেন, 'দেশের জন্যে ওর যা স্যাক্রিফাইস তাতে ওর মন্ত্রী-টন্ত্রী হওয়া উচিত। তোমাদের এখানে পার্লামেন্টের মেম্বারদের যেন সংক্ষেপে কী বলা হয়?'

অম্বিকা বলেন, 'এম পি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এম পি। সেই রকমই শুনেছিলাম, মনে পড়ছিল না। মণি মিনিস্টার না হোক, এম পি হওয়ার তো বাধা ছিল না।'

'ও কী হতে পারত, আর কী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলব না। তবে মণির মতো বিষয়বুদ্ধিহীন, আন-প্র্যাকটিক্যাল লোক জীবনে আর দু'টি দেখলাম না। ওর স্বভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে কোনো শব্দ নেই।'

আলতাফ আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

ঘন্টা চারেক পর টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে নবীন হালদার রোডে মণিমোহনদের পুরনো শ্যাওলা-ধরা নোনা-লাগা একতলা বাড়িটার সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে আলতাফ যখন নামলেন, কলকাতার ওপর নভেম্বরের সন্ধে নেমে গেছে।

মণিমোহন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্যাক্সির আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

পঁয়তাল্লিশ বছর আগের যুবক মণিমোহন আর যুবক আলতাফ হোসেনের চেহারা এতদিনে আগাগোড়া বদলে গেছে। এখানে এই সময়ে আসার কথা জানা না থাকলে কেউ কাউকে চিনতেই পারতেন না।

পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ দু'জনে তাকিয়ে থাকেন। আলতাফের স্বাস্থ্য এই বয়সেও যথেষ্ট ভালো কিন্তু মণিমোহনের শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে। রোগা, কৃশ, ভগ্নস্বাস্থ্য মণিমোহনকে লক্ষ করতে করতে মন খুব খারাপ যায় আলতাফের।

একসময় মণিমোহন বলেন, 'আলতাফ?'

আলতাফ হোসেন আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

'এস।' আলতাফের একখানা হাত ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে যেতে মণিমোহন বলেন, 'কতদিন পর তোমাকে দেখলাম। ভাবতেই পারিনি তুমি আমাদের মনে করে রাখবে!'

আলতাফ বলেন, 'কী যে বল! জীবনের তিরিশটা বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি। এখন না হয় আমরা দুই দেশের নাগরিক। তাই বলে বন্ধুত্বটা ভুলে যাব? কিন্তু—'

'কী?'

'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার!'

মণিমোহন সামান্য হাসেন, উত্তর দেন না।

রাস্তার ওপর সদর দরজা। ভেতরে ঢুকলে প্রথমে ইট বিছানো খানিকটা ফাঁকা উঠোন। তার বাঁ-ধারে কলতলা, স্নানের জায়গা, রান্নাঘর। সামনের দিকে পর পর তিনখানা বেডরুম, একটা টালির চালের টানা বারান্দা সেগুলোর সামনে দিয়ে চলে গেছে।

বাড়িতে ঢুকে মণিমোহন গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলে ডাকতে থাকেন, 'সোনা—এই সোনা, তোর আলতাফ কাকু এসে গেছে।'

সবগুলো বেডরুমে এবং রান্নাঘরে আলো জ্বলছিল। একটি সাতাশ আটাশ বছরের ভারি সুশ্রী মেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আলতাফকে প্রণাম করে মণিমোহনকে বলে, 'বাবা, তুমি কাকুকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। যান কাকু, আমি আসছি।'

আলতাফ বাড়িতে ঢুকেই লক্ষ করেছেন বাইরের মতোই ভেতরটাও জরাজীর্ণ। দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে গেছে। বেশ ক'টা জানালার পাল্লা ভাঙা। দরজাগুলোও পুরোপুরি আস্ত নেই, অদৃশ্য ঘুণপোকারা তাদের আয়ু শেষ করে এনেছে। আরেকটা ব্যাপার তাঁর মনে হয়, বাড়িটা বড় বেশি নিঝুম। মণিমোহন এবং সোনা ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। মণিমোহনের সন্তান কি এই একটিই? তাই যদি হয় স্ত্রী মমতা কোথায়? তিনি কি বেঁচে নেই? এতদিন বাদে আলতাফ দেখা করতে এসেছেন, বেঁচে থাকলে হইচই করে নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন। কিন্তু—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হল না, তার আগেই মণিমোহন তাঁকে দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানায় নিয়ে আসেন।

একধারে একটা তক্তপোশে যে বিছানাটা রয়েছে তার ওপর ধবধবে চাদর টান টান করে পাতা। আরেক ধারে দু'টো পুরনো কাচের আলমারিতে প্রচুর বই। ঘরের মাঝখানে গদিওলা চারটে বেতের চেয়ার আর একটা কাঠের সেন্টার টেবিল। চেয়ারের গদিগুলোর ওয়াড় আর সেন্টার টেবিলের ওপরকার ফর্সা টেবিল ক্লথ দেখে মনে হল আজই সেগুলো পালটানো হয়েছে। বিছানার চাদরটাও তাই। আলতাফ আসবেন বলেই হয়তো যতটা সম্ভব ফিটফাট রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মণিমোহন বললেন, 'বোসো ভাই—'

দু'জনে মুখোমুখি বসে পড়েন।

আলতাফ বেশ দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'তুমি আর সোনা ছাড়া বাড়িতে কি আর কেউ নেই?'

মণিমোহন বলেন, 'বড় ছেলে আছে, তবে না থাকার মধ্যেই।'

'কেন?'

'অত তাড়া কিসের? আছ তো কিছুক্ষণ। সব জেনে যাবে।'

'মমতাকে তো দেখছি না।'

এবার বিষণ্ণ হাসেন মণিমোহন। বলেন, 'না, তুমি আগের মতোই আছ দেখছি। ধৈর্য বড় কম।' একটু থেমে বলেন, 'মমতার ক্যানসার। চারমাস হাসপাতালে পড়ে আছে। আসছে মাসে অপারেশন হবে। আদৌ বাড়ি ফিরে আসবে কিনা কে জানে।'

আলতাফ চমকে ওঠেন, 'বল কী!'

মণিমোহন বলেন, 'এতেই ঘাবড়ে গেলে? আমার পারিবারিক ইতিহাস সবটা শুনলে কী করবে জানি না। না শোনাই ভালো আলতাফ। দু-চারদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছ। মন ভারাক্রান্ত করে কী লাভ? তার চেয়ে অন্য গল্প করা যাক।'

রুদ্ধ স্বরে আলতাফ বলেন, 'না, তুমি বল। আমি শুনব।'

এইসময় সোনা চা বিস্কুট এবং ডালমুট নিয়ে আসে। বলে, 'কাকা, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, এখন একটু চা খান। আধ ঘণ্টার ভেতর আমার রান্না হয়ে যাবে। রাতের খাওয়া ক'টায় খান?'

আলতাফ বুঝতে পারছিলেন মমতা অসুস্থ হওয়ার পর এই বাড়ির যাবতীয় দায়িত্ব এখন সোনার। তুলনামূলকভাবে নিজের মেয়েদের কথা মনে পড়ে যায়। লেখাপড়া ছাড়া সংসারের একটা কাজও তাদের করতে হয়নি। তারপর তো বিয়েই হয়ে গেল। দুই মেয়েরই শ্বশুরদের অঢেল টাকা। তাছাড়া তাদের নিজেদের প্রফেসনেও প্রচুর আয়। কাজেই সংসারের একটি কুটোও তাদের নাড়তে হয় না। মণিমোহনের এই মধুর স্বভাবের মেয়েটিরও তো জীবন তেমন মসৃণ এবং সুখকর হতে পারত।

আলতাফ বিষণ্ণ একটু হাসেন। বলেন, 'আমার জন্যে তোমার খুব কষ্ট হল তো?'

সোনার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফোটে। বলে, 'রান্নার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'বা রে, আমাদের জন্যে রাঁধতে হয় না? কি, বললেন না কখন খাবেন?'

'তুমি যখন দেবে তখনই খাব।'

'আচ্ছা—'

সোনা চলে যায়।

মণিমোহন এবার এভাবে শুরু করেন। দেশভাগের পর বাজিতপুরের বাড়ি এবং চাষের জমি বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছিলেন তা দিয়ে টালিগঞ্জের এই বাড়িটা কিনেছেন। দেশের জন্য জেল খাটার কারণে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেত। যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মাসোহারা, পরবর্তীকালে তাম্রপত্র, ইত্যাদি। কিন্তু দেশসেবার নগদ মূল্য তিনি নিতে চাননি। একটু চেষ্টা চরিত্র করলে সে আমলে ইলেকশানে দাঁড়িয়ে এম এল এ হওয়া যেত। কিন্তু স্বাধীনতার পরের রাজনীতির চেহারা দেখে তিনি চমকে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে যে সব মানুষ দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, জেলখানার অন্ধকারে কাটিয়ে দিয়েছেন বছরের

পর বছর, অকাতরে সহ্য করেছেন কলোনিয়ান মাস্টারদের যাবতীয় বর্বর নির্যাতন, তাদের সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল ধূর্ত ধুরন্ধরদের একটা দল। দেশের জন্য একটা দিনও এরা জেল খাটেনি, ত্যাগ করেনি এক কানাকড়িও। এদের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীন ভারতের ক্ষমতাদখল আর অর্থ। মণিমোহন বুঝতে পারছিলেন, এই পোস্ট-ইন্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়টদের সঙ্গে তাঁর পক্ষে মানিয়ে চলা অসম্ভব। তিনি ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং বেদনাদায়ক তা হল তাঁর মতো অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীই এই সব চতুর ক্ষমতালিপ্সু নতুন দেশসেবকদেব সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন।

পুরনো যাঁরা তখনও ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের একজন অবশ্য মণিমোহনকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানেও তিন চাব বছরের বেশি তিনি টিকতে পারেননি, কেননা তাঁর সেই অফিসটায ছিল রমরমা ঘুষের বাজার। প্রতিবাদ জানিয়ে চাকরিটা ছেড়ে দেন। এরপর আরো দু'চার জায়গায় কাজ করেছেন। সর্বত্র এক হাল। সাহসী, আপসহীন এই মানুষটি কোথাও নিজেকে মানাতে পারেননি।

পরাধীন ভারতের জেলখানায় বসে মণিমোহনের মতো মানুষেরা একদা স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীনতার পর এ দেশের নাগরিকেরা হবে সৎ, নির্লোভ, পরিচ্ছন্ন। ভারতবর্ষের এমন একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠবে যা সারা পৃথিবীকে অবাক করে দেবে। কিন্তু সব দেখেশুনে হতাশ, বিপর্যস্ত মণিমোহন নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিলেন। তবে কিছু তো একটা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়ে পড়াতে শুরু করলেন। দু'বেলা দু ব্যাচ ছাত্রছাত্রী বাড়িতে এসে পড়ে যায়। এটাই কয়েক বছর ধরে তাঁর জীবিকা।

মমতা অবশ্য সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন এমন একটা ডিপার্টমেন্টে যেখানে ঘুষেব সুযোগ নেই। নইলে মণিমোহনের যোগ্য স্ত্রী হিসেবে কাজটা ছেড়ে দিতে হত। বছর পাঁচেক আগে রিটায়ার করেছেন তিনি। তাঁর পেনশনের টাকাটা এই সংসারের একটা বড় ভরসা।

মণিমোহনদের তিন ছেলেমেয়ে। দুই ছেলের পর একমাত্র মেয়ে সোনা। বড় ছেলে প্রণব লেখাপড়ায় ছিল অসাধারণ, স্কুল ফাইনাল আর হায়ার সেকেন্ডেরিতে স্ট্যান্ড করেছিল। কিন্তু বি. এসসি পড়তে পড়তে সত্তর দশকের উত্তাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইতে দুই পায়ে গুলি লেগেছিল। কয়েক মাস হাসপাতালে কাটাবার পর পা দু'টো খুইয়ে কিছুদিনের জন্য জেল খাটে, তারপর বাড়িতে এসেছে। তার নড়াচড়ার উপায় নেই।

ছোট ছেলে রাজীব ছাত্র হিসেবে মোটামুটি ভালোই, তবে খুবই স্বার্থপর, কেরিয়ারিস্ট। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে এম. এসসি করার পর একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে কানাডায় চলে যায়। সেখানে ডক্টরেট করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। সহকর্মী ব্রাজিলের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ওখানকার সিটিজেনসিপ নিয়েছে। দেশে আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। বাড়ির সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখে না।

সোনা সবার ছোট। সে বছর চারেক আগে মডার্ন হিস্ট্রিতে এম. এ করেছে। রেজাল্ট মোটামুটি খারাপ নয়, হাই সেকেন্ড ক্লাস। মাঝে মাঝে অন্যের লিভ ভ্যাকান্সিতে নানা কলেজে পড়াচ্ছে কিন্তু পার্মানেন্ট চাকরি এখনও হয়নি। কবে হবে, আদৌ হবে কিনা, কে জানে। মমতার ক্যানসার হওয়ার পর সংসারটা এখন ওর কাঁধে।

শুনতে শুনতে কষ্টও হচ্ছিল, আবার একই সঙ্গে এই স্বার্থহীন, আদ্যোপান্ত সৎ, আদর্শবাদী বন্ধুটির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল আলতাফের।

মণিমোহন বলেন, 'সব চেয়ে বড় সমস্যা কী জানো ভাই, মেয়েটার আটাশ বছর বয়েস হল কিন্তু বিয়ে দিতে পারছি না।'

আলতাফ বেশ অবাক হয়েই জিগ্যেস করেন, 'সোমা এত শিক্ষিত, এত সুন্দর—বিয়েটা আটকাচ্ছে কিসে?'

'টাকার জন্যে।' বিমর্ষ সুরে বলেন মণিমোহন, 'ভালো ঘরে বিয়ে দিতে হলে যা খরচ করতে হবে সে সামর্থ আমার নেই।'

বিস্ময় বাড়ছিলই আলতাফের। তিনি বলেন, 'কী বলছ মণি! দেশের জন্যে তুমি এত স্যাক্রিফাইস করেছ, তোমার মেয়েকে তো মাথায় করে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

মণিমোহন উত্তর দেন না, ম্লান একটু হাসেন শুধু।

আলতাফ ভাবছিলেন, মণিমোহনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, মমতা ক্যানসারে শয্যাশায়ী, রাজনীতি করতে গিয়ে দুই পা খোয়া গেছে প্রণবের, ছোট ছেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—সবই ঠিক, তাই বলে আটাশ বছরের মেয়ে বাপের সংসার আগলে পড়ে থাকবে, তা তো হতে পারে না। লাবণ্য থাকতে থাকতে সোনার বিয়েটা হওয়া দরকার। তিনি একজন সফল অর্থবান মানুষ, সহৃদয়ও। একটা কেন, দশটা মেয়ের বিয়ে তিনি দিতে পারেন। প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন, 'তুমি সোনার বিয়ে ঠিক কর। টাকার চিন্তা আমার—' কিন্তু বলতে গিয়েও থমকে যান। যে মানুষ তাম্রপত্র নেননি, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন ফিরিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতির জন্য একের পর এক চাকরি ছেড়েছেন, তিনি কি অন্যের সাহায্য বা অনুগ্রহ নেবেন?

শেষ পর্যন্ত কথাটা বলা হয় না আলতাফের। খাওয়া দাওয়ার পর 'আবার আসব' এবং 'তোমাদের সঙ্গে হাসপাতালে মমতাকে দেখতে যাব' ইত্যাদি বলে অনেক রাতে হোটেলে ফিরে গেলেন। মণিমোহনদের জন্যে মনটা বিষণ্ণ হয়ে রইল। একজন নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামীর এই পরিণতি তিনি আশা করেননি।

পরদিন সন্ধেবেলায় অম্বিকা দামি ফরেন লিমুজিন পাঠিয়ে আলতাফকে নিউ আলিপুরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

দেশভাগের পর ঢাকার নিও-রিচদের মতোই অম্বিকাদের বাড়ি। চোখধাঁধানো স্থাপত্য, সামনে সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের লন, ফুলের বাগান, দেশি এবং বিদেশি মিলিয়ে ছ'সাতটা গাড়ি।

অম্বিকা দোতলার বিরাট ব্যালকনিতে বসে অপেক্ষা করছিলেন। আলতাফ লিমুজিন থেকে নামতেই নিচে নেমে এলেন। বাল্যবন্ধুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওপরের বিশাল ড্রইং রুমে নিয়ে যেতে যেতে ডাকাডাকি করে সবাইকে সেখানে আসতে বললেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল আলতাফকে ঘিরে জমজমাট আড্ডা বসে গেছে। অম্বিকা তো আছেনই, তাঁর স্ত্রী নিরুপমা, দুই পুত্রবধূ সুজাতা আর বিপাশা, তিন ছেলে সন্দীপ, দীপক আর রাজেশ তাঁকে ঘিরে বসেছে।

ছেলে আর ছেলের বউদের প্রথমে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন অম্বিকা। ছেলে এবং

পুত্রবধূরা সবাই খুব কৃতী। তবে ছোট ছেলে রাজেশের এখনও বিয়ে হয়নি। দুই পুত্রবধূই দারুণ সুন্দরী, স্মার্ট, হাসিখুশি এবং উচ্চশিক্ষিত। তাদের ব্যবহারও চমৎকার।

নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে উর্দি-পরা দুই বেয়ারা চা কফি কাজুবাদাম কাবাব আর ফিশ ফিঙ্গার দিয়ে যেতে লাগল। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ তো চলছিলই, সেই সঙ্গে এখনকার কলকাতা আর ঢাকার নানা গল্পও হচ্ছিল। সুজাতা আর বিপাশা মাঝে মাঝেই বলছিল, 'কাকা, আপনাদের বাড়ির সবাইকে নিয়ে একবার আসবেন।'

আলতাফ বলছিলেন, 'নিশ্চয়ই। তোমরাও একবার ঢাকায় এস।'

'যাব।'

কথাবার্তা চলছিল ঠিকই কিন্তু বার বার আলতাফের চোখ চলে যাচ্ছিল রাজেশের দিকে। অম্বিকার এই ছোট ছেলেটি সত্যিই সুপুরুষ। ছ'ফিটের মতো হাইট, লম্বাটে মুখ, ধারাল নাক, উজ্জ্বল চোখ, ঘন ভুরু, দৃঢ় চিবুক—সব মিলিয়ে দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। রাজেশকে দেখতে দেখতে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন আলতাফ।

ড্রইং রুমের আড্ডা ভাঙল রাত দশটায়। তারপর দোতলারই আরেক প্রান্তে প্রকাণ্ড ডাইনিং হলে ডিনার শুরু হল। বাড়ির সবাই আলতাফের সঙ্গে খেতে বসে গেল। অম্বিকার স্ত্রী নিরুপমার ইঙ্গিতে দুই বেয়ারা নিখুঁত যন্ত্রের দক্ষতায় খাবার সার্ভ করতে লাগল।

ড্রইং রুমের আড্ডার মতো হাসিতে গল্পে এবং টুকরো টুকরো মজার কথায় ডিনার জমে উঠল। এখানেও কী এক স্বয়ংক্রিয় নিয়মে আলতাফের চোখ মাঝে মাঝেই রাজেশের মুখে আটকে যাচ্ছিল।

একসময় ডিনার শেষ হল। তারপর আর বসলেন না আলতাফ। অনেক রাত হয়ে গেছে। এখনই হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়া দরকার। তিনি খুবই নিয়মানুবর্তী এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। কোনো কারণেই বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন না। তাতে শরীর খারাপ হয়।

আলতাফ অম্বিকাকে বললেন, 'এবার আমি যাব। কিন্তু—'

অম্বিকা উৎসুক চোখে বন্ধুর দিকে তাকান, 'কী?'

'তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

'বেশ তো, বল।'

'এখন না। কাল তুমি একবার আমার হোটেলে আসতে পারবে?'

'কখন?'

'আমার তো এখানে কোনো কাজকর্ম নেই। সব সময় ফ্রি। তোমার কখন সময় হবে?'

একটু ভেবে অম্বিকা বলেন, 'ধর সকালের দিকে, ন'টা নাগাদ। ফ্যাক্টারিতে যাবার আগে তোমার হোটেল হয়ে আসব।'

আলতাফ বলেন, 'চলে এস।'

পরদিন ঠিক ন'টাতেই অম্বিকা এলেন।

এলোমেলো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আলতাফ বলেন, 'এবার কাজের কথাটা শুরু করা যাক।'

অম্বিকা হেসে হেসে বলেন, 'আমি প্রস্তুত।'

'পরশু আমি মণির বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'সে তো জানি।'

একটু চুপ করে থেকে আলতাফ বলেন, 'ওদের সম্বন্ধে সব খবর নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন অম্বিকা।

আলতাফ বলেন, 'বন্ধু হিসেবে ওর ব্যাপারে তোমার কিছু করা উচিত।'

অম্বিকা বলেন, 'এই কথাটা আমি বহুবার ভেবেছি। কিন্তু তুমিও তো ওর ছেলেবেলার বন্ধু। ওকে ভালো করেই চেনো। কারো সাহায্য ও নেবে না।'

'আমি আর্থিক সাহায্যের কথা বলছি না।'

'তা হলে?'

উত্তর না দিয়ে সোজা অম্বিকার চোখের দিকে তাকান আলতাফ। তারপর বলেন, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

ভেতরে ভেতরে একটু থমকে যান অম্বিকা। ধীরে ধীরে বলেন, 'আগে শুনি, তারপর তো রাখার কথা।'

'মণির মেয়েটি চমৎকার। মডার্ন হিস্ট্রিতে এম. এ। দেখতে ভালো। তোমার ছোট ছেলের সঙ্গে চমৎকার মানাবে। আমার ইচ্ছে ওদের বিয়ে হোক।'

অম্বিকার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। আবেগহীন ভারী গলায় বলেন, 'তা হয় না আলতাফ।'

এই জবাবটা যেন প্রত্যাশিত ছিল না। আলতাফ চকিত হয়ে বলেন, 'কেন?'

'মণির আর আমার ফ্যামিলি স্টেটাস এক নয়। এ বিয়ে সুখের হবে না।'

'কী বলছ তুমি! মণি দেশের জন্যে কত স্যাক্রিফাইস করেছে। লোকে তাকে সম্মান করে। টাকা না থাকলেও মর্যাদা তো আছে।'

'মণি ঝোঁকের মাথায় কবে কী করেছিল সে সব কেউ মনে করে রাখেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেন্টিমেন্ট নিয়ে মানুষ আজকাল মাথা ঘামায় না।'

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে অম্বিকা বলেন, 'আমাকে জোর কোরো না ভাই। তুমি বিদেশী। দু-চারদিনের জন্যে ইন্ডিয়ায় এসেছ। গল্প কর, আড্ডা মারো। এসবের মধ্যে থেকো না।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন আলতাফ। তারপর রুদ্ধ গলায় বলেন, 'আমি বিদেশী! আরে তাই তো, ঝোঁকের মাথায় সীমা পার হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক বুঝতে পারিনি কতদূর এগুনো উচিত।'

অম্বিকা উত্তর দেন না। হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। আচ্ছা চলি—'

ডোনার জন্য

১৯৮৮

সল্ট লেক স্টেডিয়ামের ঠিক পরের স্টপেজে স্টেট ট্রান্সপোর্টের ঝকঝকে, নতুন বাসটা জয়ন্তীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় কোনো পদ্ধতিতে তার চোখ বাঁ হাতের কবজিতে বাঁধা সুন্দর, চৌকো ঘড়িটার দিকে চলে যায়। এখন তিনটে বেজে একচল্লিশ। কাঁটায় কাঁটায় চারটের 'স্কাইলার্ক' নামের বাড়িটায় ডোনার সঙ্গে তার দেখা হবে। শনিবারের বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা, এই এক ঘন্টা সময় ডোনার সঙ্গে কাটাতে পারে সে। চারটের আগে 'স্কাইলার্ক'-এ প্রবেশ তার পক্ষে নিষিদ্ধ। পাঁচটার পর এক মিনিটও সে ওখানে থাকতে পারবে না, আদালতের সেরকমই নির্দেশ।

পাঁচ বছর ধরে প্রতি শনিবার তিনটে পাঁচের বাস ধরে সল্ট লেকে আসছে জয়ন্তী। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস এর এতটুকু হেরফের হওয়ার উপায় নেই। শনিবারের বিকেল চারটেয় ডোনার সঙ্গে দেখা হবে, এর জন্য সারা সপ্তাহ সে উন্মুখ হয়ে থাকে।

অন্য সব শনিবার তিনটে পাঁচের বাসটা চারটে নাগাদ সল্ট লেকে পৌঁছে। যায়। কিন্তু আজ রাস্তা ছিল প্রায় ফাঁকা, কোথাও জ্যাম-ট্যাম হয়নি। প্রায় ঝড়ের গতিতে তিনটে একচল্লিশে, অর্থাৎ উনিশ মিনিট আগে বাসটা চলে এসেছিল। এই উনিশটা মিনিট জয়ন্তীকে রাস্তায় কাটিয়ে দিতে হবে।

জয়ন্তীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। শ্যামবর্ণ। এই বয়সেও ভরাট, লম্বাটে মুখ। মাঝারি ধরনের হাইট। ত্বক টান টান, মসৃণ। নাক ঈষৎ মোটা, ঠোঁট দু'টি পাতলা, চিবুকের ডৌলটি চমৎকার, ডান গালে মসুর ডালের মতো লালচে একটা তিল, ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় চোখ দু'টিতে গভীর দৃষ্টি। অজস্র চুল একটা বড় খোঁপায় আটকানো। পরনে হালকা গোলাপি রঙের প্রিন্টেড শাড়ি, যার জমিতে ফুল-লতাপাতার নকশা। বাঁ হাতে ঘড়ি, ডান হাতে খাঁজ-কাটা সোনার কঙ্কণ, গলায় লকেটওলা সরু চেন, নাকে ছোট্ট হীরের নাকছাবি। তার বাঁ কাঁধ থেকে সুদৃশ্য লেডিজ ব্যাগ কোমরের কাছে ঝুলছে। ডান হাতে পলিথিনের বড় একটা প্যাকেট।

আগস্ট মাস শেষ হয়ে এল। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে আকাশ এখন ঝকঝকে নীল। মনে হয় মাথার ওপর গোটা সল্ট লেক জুড়ে কেউ যেন পালিশ করা একখানা আয়না টাঙিয়ে রেখেছে। ঝড়বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই। এ বছরের মতো বর্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিলেও আকাশের এ-কোণে ও-কোণে পেঁজা তুলোর মতো সাদা ধবধবে কিছু মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই, শরতের ঝিরঝিরে হাওয়া ধাক্কা দিতে দিতে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই তারা চলেছে।

বাস স্টপেজে এখনও দাঁড়িয়েই আছে জয়ন্তী। সুদূর নীলাকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল নিচে সল্ট লেকের এই রাস্তাটায় দুরন্ত গতিতে বাস কি প্রাইভেট কার ছুটে যাচ্ছে। মানুষজন তেমন একটা চোখে পড়ে না। কোনাকুনি তাকালে গোলাকার, সুবিশাল স্টেডিয়াম। আবছাভাবে জয়ন্তীর মনে পড়ল, কার কাছে যেন শুনেছিল, এতবড় স্টেডিয়াম নাকি এশিয়ায় আর কোথাও নেই। দূরমনস্কর মতো কয়েক পলক সেদিকে তাকিয়ে থেকে চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় সে। এখানে যেধারেই তাকানো যাক, লাইন দিয়ে চোখ-ধাঁধানো সব বাড়ি, পিকচার পোস্টকার্ডে যেমনটি দেখা যায় অবিকল তেমনি। রাস্তার ওধারে অনেকটা জায়গা এখনও

ফাঁকা পড়ে আছে, বাড়ি-টাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়নি। ওখানে কাশফুলে চারিদিক ছয়লাপ। শরৎকাল যে তার নিজের মহিমায় হাজির হয়েছে, এই সল্ট লেকে এলে খানিকটা টের পাওয়া যায়।

আশেপাশের দৃশ্যাবলী জয়ন্তী দেখছিল ঠিকই, তবে তার মাথার ভেতর অদৃশ্য কোনো কম্পিউটারে সেই উনিশ মিনিটের হিসেবটা চলছিলই। হঠাৎ তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন জানান দেয়, সময় হয়ে গেছে। দ্রুত বাঁ হাতটা উলটে সে দেখতে পায় চারটে বাজতে তিন মিনিট বাকি।

বাস স্টপেজ থেকে বাঁদিকে যে সোজা রাস্তাটা চলে গেছে তার শেষ মাথায় 'স্কাইলার্ক'। স্বাভাবিকভাবে হাঁটলে ঠিক তিন মিনিটে পৌঁছুনো যায়। কিন্তু নিজের অজান্তেই জোরে জোরে পা ফেলে 'স্কাইলার্ক'-এর সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় সে। ইওরোপের কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে যে সব 'ভিলা'র ছবি ভ্রমণের বইতে দেখা যায়, অনেকটা সেই ধরনের চমৎকার দোতলা বাড়ি, সামনের দিকে বাগান। একধারে নিচু নকশা-করা গেট।

'স্কাইলার্ক'-এ জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান আটটা বছর কাটিয়ে গেছে জয়ন্তী। এই সময়ের প্রথম দিকের ক'টি বছরের স্মৃতি খুবই মধুর, প্রায় স্বপ্নের মতো। পরে শুধুই তিক্ততা, উত্তেজনা, অশান্তি। এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কবেই চুকে গেছে তবু প্রতি শনিবার যখনই সে এখানে আসে, বুকের ভেতর তীব্র এক ব্যাকুলতা তাকে কিছুক্ষণ অস্থির করে রাখে।

নিজের মধ্যে যে অদৃশ্য তোলপাড়টা চলছিল সেটা সামলে নিয়ে গেট খুলে ভেতরে চলে এল জয়ন্তী। গেটের পর থেকে নুড়ির রাস্তা, যার দু'ধারে নানা রকম দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ, অর্কিড আর মসৃণ করে ছাঁটা সবুজ ঘাসের কার্পেট। রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে রঙিন পাথরের পাঁচটা সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো পেরিয়ে ওপরে উঠলে মোজেইক-করা গ্রিল-বসানো বারান্দা।

এ বাড়ির একতলায় এবং দোতলায় ক'টা বেডরুম, ক'টা বাথরুম, কোথায় ডাইনিং হল, কোথায় ড্রইং রুম, কোন ঘরের সঙ্গে ব্যালকনি—সব জয়ন্তীর মুখস্থ। এমনকি, ফি শনিবার সে যে এক ঘণ্টা সময় এখানে কাটিয়ে যায় তখন কী কী ঘটবে, কার কার সঙ্গে দেখা হবে, সমস্ত কিছুই আগে থেকে তার জানা। পাঁচ বছর ধরে একটা ছকে-বাঁধা রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। কিংবা বলা যায় অভ্যাসে।

রাস্তা পার হয়ে বারান্দায় পা দিতে না দিতেই ডান পাশের বার্নিশ-করা ওভাল শেপের দরজাটা অন্য সব শনিবারের মতো খুলে হরেন সসম্ভ্রমে বলে, 'আসুন বৌদি—'

হরেন এ বাড়ির কাজের লোক। বহুদিন ধরে এখানে আছে। বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। মাঝারি হাইট, গায়ের রং তামাটে, অটুট স্বাস্থ্য, গোল মুখ এবং মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। পরনে মোটা সুতোর ধুতি আর রঙিন হাফ শার্ট। অনেকগুলো বছর কলকাতায় কাটালেও তার চেহারায় বা চালচলনে শহুরে পালিশ সেভাবে পড়েনি। গ্রামীণ সরলতার অনেকখানিই হরেনের মধ্যে টিকে আছে। 'স্কাইলার্ক'-এর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও সে জয়ন্তীকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে থাকে।

হরেন দরজার একধারে সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়েছিল। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জয়ন্তী জিগ্যেস করে, 'তুমি ভালো আছ তো হরেনদা?' এই রুটিন প্রশ্নটা পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত করে আসছে সে। হরেন সম্পর্কেই খোঁজখবর নেয় জয়ন্তী। 'স্কাইলার্ক'-এর অন্য বাসিন্দাদের সম্পর্কে তার আদৌ কোনো কৌতূহল নেই।

হরেন মাথাটা সামান্য হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ বউদি। আপনি?'

'একরকম চলে যাচ্ছে।'

'আপনি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছেন।'

এ কথার উত্তর না দিয়ে জয়ন্তী বলে, 'ডোনা কোথায়?' আসলে মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয় একতলার ড্রইং রুমে। কোনো কোনো শনিবার সে এসে জানতে পারে, ডোনা দোতলায় রয়েছে। তার আসার খবর পেলে নিচে নেমে আসে। অবশ্য বেশির ভাগ দিনই একতলায় সে অপেক্ষা করে।

হরেন বলে, 'নিচেই আছে বউদি—'

বাইরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে ডান পাশে চমৎকার সাজানো বিশাল ড্রইং রুম। এখানকার সোফা, ডিভান, সেন্টার টেবল এবং অন্য সব ক্যাবিনেট, আর সুদৃশ্য রঙিন টেলিভিশন সেট, সব একদিন নিজে পছন্দ করে কিনেছিল জয়ন্তী। সে এখান থেকে চিরকালের মতো সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাবার পর কিছুই বদলানো হয়নি। অবিকল তেমনটিই থেকে গেছে। শুধু এই বসার ঘরটিই না; ডাইনিং হল, কিচেন, বাথরুম এবং সবগুলো শোওয়ার ঘরও মনের মতো করে সাজিয়েছিল সে। জয়ন্তী শুনেছে তার পছন্দ-করা একটি আসবাবও এদিক ওদিক হয়নি। অনীশ অর্থাৎ তার প্রাক্তন স্বামী ফের বিয়ে করেছে। অনীশের নতুন স্ত্রী পারমিতাও কেন কে জানে, 'স্কাইলার্ক'-এর খাট সোফা ইত্যাদির সঙ্গে জড়ানো যে সব পুরনো স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে সেগুলো বিদায় করার কথা ভাবেনি।

ডোনা একধারে একটা সোফায় বসে ছিল। জয়ন্তী ড্রইং রুমে পা দিতেই দৌড়ে ছুটে এসে তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। জয়ন্তীর দু'টো হাতও নিঃশব্দে মেয়ের কাঁধের ওপর উঠে আসে। অনেকক্ষণ চুপচাপ দু'জনে সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর জয়ন্তী মেয়েকে নিয়ে একটা বড় সোফায় পাশাপাশি বসে।

ডোনার বয়স এখন দশ। এর মধ্যে ভারি সুন্দর হয়ে উঠেছে সে। তার চোখেমুখে চেহারায় অবিকল জয়ন্তীর আদলটি যেন বসানো।

আগে আগে শনিবার জয়ন্তীকে দেখলেই কাঁদতে শুরু করত ডোনা। তার সঙ্গে চলে যেতে চাইত। কান্নাজড়ানো গলায় বার বার বলত, এ বাড়িতে থাকতে তার একটুও ভালো লাগে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্ত করতে হত। এখন আর কাঁদে না ডোনা। সে জেনে গেছে মায়ের সঙ্গে তার যাওয়ার উপায় নেই। 'স্কাইলার্ক'-এই তাকে থেকে যেতে হবে। আজকাল না কাঁদলেও তার চোখেমুখে সারাক্ষণ বিষাদ মাখানো থাকে। জয়ন্তী বুঝতে পারে, মেয়েটার সারল্য ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ডোনা একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। শনি-রবি, দু'দিন তার ছুটি। জয়ন্তী জানে, শনিবার তার জন্য সেই সকাল থেকে উন্মুখ হয়ে থাকে মেয়েটা।

ডোনার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জয়ন্তী জিগ্যেস করে, 'লাস্ট শনিবার দেখে গিয়েছিলাম, ঠাণ্ডা লেগে কাশি হয়েছিল। সেরে গেছে?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় ডোনা। বলে, 'হ্যাঁ। ঠাকুমা হরেন কাকুকে দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে এনেছিল। ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেছি।'

ভেতরে ভেতরে বেশ একটু ধাক্কা খায় জয়ন্তী। ঠাকুমা অর্থাৎ তার প্রাক্তন শাশুড়ি প্রীতিলতা ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলেন, অনীশ বা পারমিতা নয়। সে শুনেছে, অনীশ আর

পারমিতা ডোনার সম্পর্কে খুবই উদাসীন। তার লেখাপড়া, অসুখবিসুখ—সব দিকে প্রীতিলতার নজর। এ বাড়িতে তিনিই তাকে আগলে আগলে রেখেছেন। অথচ অনীশ একরকম জোর করে আদালতে জয়ন্তীর বিরুদ্ধে হাজারটা সাক্ষী দাঁড় করিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল মেয়ে তার কাছে থাকলে খারাপ হয়ে যাবে। হয়তো নিজের অধিকার বা কর্তৃত্ব জাহির করার জন্য এটা করেছিল; মেয়েকে ভালবেসে নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রীতিলতাও ছেলের এই কাজে পুরোপুরি সায় দিয়েছিলেন। নাতনিকে তিনি সত্যিই ভালবাসেন। তাকে হারানোর ভয়ে এটা তিনি করে থাকবেন। কিছুদিন ধরেই একটা প্রবল দুর্ভাবনা জয়ন্তীকে প্রায় সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে। প্রীতিলতার বয়স সাতাত্তর, স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। বছর চারেক আগে একটা বড় ধরনের স্ট্রোক হয়েছিল। তার জের এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রায়ই এটা-সেটা লেগে আছে। হার্ট অ্যাটাকটা তাঁর আয়ু যে দ্রুত কমিয়ে আনছে তাতে কোনো রকম সংশয় নেই। তাঁর কিছু হয়ে গেলে মেয়েটার কী হবে, ভাবতেও সাহস হয় না। পারমিতার এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। হলে ডোনার প্রতি ওদের উদাসীনতা, অবহেলা হাজার গুণ বেড়ে যাবে, আর সেই চাপে মেয়েটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এই কথাটা যখনই মনে পড়ে, মারাত্মক এক ভয়ে তার শ্বাস আটকে আসে। আদালতের রায় জয়ন্তীর বিপক্ষে। ডোনাকে যে নিজের কাছে নিয়ে যাবে তারও উপায় নেই। ওর কিছু হলে সে বাঁচবে না।

অনীশ একটা বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। পারমিতাও সেই কোম্পানির একজন বড় মাপের অফিসার। শনি আর রবি দু'জনেরই ছুটি। তবে এই দু'দিন ওরা বাড়িতে প্রায় থাকেই না। কচিৎ কখনও শনিবারটা থাকলে চারটে থেকে পাঁচটা, এই একটা ঘণ্টা দোতলাতেই কাটিয়ে দেয়। ওরা ছাড়া এ বাড়িতে প্রীতিলতা এবং জন চারেক কাজের লোক রয়েছে। হরেনকে বাদ দিলে অন্য কাউকে এ সময় নিচে দেখা যায় না। একতলাটা যেন তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা।

জয়ন্তী জিগ্যেস করে, 'তোর পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে?'

ডোনা বলে, 'হচ্ছে—'

'স্কুলে রেগুলার যাচ্ছিস?'

'কাশি হয়েছিল বলে ঠাকুমা একদিন পাঠায়নি।'

'ঠিকই করেছেন।'

জয়ন্তী লক্ষ করল, ডোনা তার কথার উত্তর দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু আজ তাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। মনে হয়, কিছু ভাবছে সে।

জয়ন্তী এবার বলে, 'লাস্ট উইকে যখন এসেছিলাম, তুই বলেছিলি, পুজোর আগে স্কুল থেকে তোদের এক্সকারসনে নিয়ে যাবে।'

ডোনা বলে, 'হ্যাঁ। ডেটও ঠিক হয়ে গেছে। থার্ড অক্টোবর।'

জয়ন্তী বলে, 'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'চাঁদিপুর।'

'ক'দিনের এক্সকারসন?'

'পাঁচদিন। থার্ড যাব, আট তারিখে ফিরে আসব।'

'সাবধানে থাকবি। টিচাররা ছাড়া একা একা সমুদ্রে নামবি না।'

'হুঁ—'

একটু ভেবে জয়ন্তী বলে, 'ভালোই হল, তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি। বেড়াতে যাবার সময় কাজে লাগবে।'

অন্যমনস্কতা যেন ক্রমশ বাড়ছে ডোনার। সে ঔৎসুক্য দেখাল না, চুপচাপ বসে রইল।

যে বড় পলিথিনের প্যাকেটটা সঙ্গে করে এনেছিল, সেটা এবার খুলে ফেলে জয়ন্তী। ফি শনিবারই মেয়ের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে সে। কোনো বার বড় চকোলেট বার, কোনো বার কাজুবাদাম বা আঁকার জন্য রঙের বাক্স বা জিনসের প্যান্ট কিংবা কোয়ার্টজ ঘড়ি। আজ সে নিয়ে এসেছে অদ্ভুত ধরনের সাইড ব্যাগ, যেটার আকৃতি লোমওলা কুকুরের মতো, সারা গা নরম সোনালি লোমে বোঝাই। পিঠে জিপ লাগানো, ভেতরটা ফাঁপা। এই ব্যাগটায় দু' চারটে জিনস, ফ্রক, স্কার্ট, তোয়ালে ইত্যাদি নানা দরকারি জিনিস ভরে তিন-চারদিনের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসা যায়।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, ব্যাগটা তোর পছন্দ হয়েছে?'

অন্য সময় সে কিছু নিয়ে এলে দারুণ খুশি হয় ডোনা। চকোলেট-টকোলেট আনলে তক্ষুনি প্যাকেট খুলে খেতে শুরু করে। ফ্রক, জিনস, ঘড়ি-টড়ি আনলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। তার চোখমুখ চকচক করতে থাকে। কিন্তু আজ তার কী যে হয়েছে কে জানে; একেবারে আগ্রহশূন্যের মতো ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথাটা হেলিয়ে দেয়। অন্যমনস্কতাটা কিছুতেই কাটছে না মেয়েটার।

অনেকক্ষণ ধরেই ডোনাকে লক্ষ করছিল জয়ন্তী। এবার সে বলল, 'কী ভাবছিস রে ডোনা?'

একটু যেন চমকে ওঠে ডোনা। নিজের অজান্তেই বুঝিবা বলে, 'মা, ঠাকুমা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

ব্যাপারটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে ভীষণ হকচকিয়ে যায় জয়ন্তী। বিবাহ বিচ্ছেদের পর পাঁচ বছর, প্রতি সপ্তাহে এখানে আসছে সে, কিন্তু প্রীতিলতা কোনো দিনও তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। পাছে দেখা হয়ে যায়, তাই শনিবারের বিকেলে এই সময়টা তিনি একতলার ধারে কাছে ঘেঁষেন না। এত বছর বাদে হঠাৎ কী এমন ঘটতে পারে যাতে প্রাক্তন পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বলার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছেন? ডোনার মুখে শোনার পরও পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না জয়ন্তীর। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ়ের মতো সে জিগ্যেস করে, 'তোকে কে বললে?'

ডোনা বলে, 'ঠাকুমা নিজে।'

এরপর আর সংশয় না থাকার কথা। তবু বিস্ময়টা কোনোভাবেই কাটছে না জয়ন্তীর। মেয়ের কথার কী উত্তর দেবে সে ভেবে পেল না।

এই সময় হরেন একটা ট্রেতে চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট সাজিয়ে এনে সেন্টার টেবিলে রেখে গেল। ফি শনিবার জয়ন্তীর জন্য এসব নিয়ে আসে সে। এটা একটা রুটিনের মতো ব্যাপার। কিন্তু জয়ন্তী চা বা খাদ্যবস্তুগুলো কখনও ছোঁয় না।

হরেন চলে যাবার পর জয়ন্তী বলে, 'ঠাকুমা কেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় তুই জানিস?'

ধীরে ধীরে মাথাটা ডাইনে এবং বাঁয়ে নাড়তে নাড়তে ডোনা বলে, 'না। কাল বিকেলে বলছিল তুমি এলে ঠাকুমাকে যেন নিচে ডেকে আনি।'

এত বছর পর তাকে কী বলতে চান প্রীতিলতা? প্রবল এক উৎকণ্ঠা বোধ করছিল জয়ন্তী। সেই সঙ্গে তীব্র কৌতূহলও।

মায়ের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল ডোনা। জয়ন্তীর সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্কটা কী, এই অল্প বয়সেই সে জেনে গেছে। ঠাকুমা কথা বলতে চাইলেও, মা বলবে কিনা, এ বিষয়ে সে যথেষ্ট সন্দিহান। নিচু গলায় ডোনা বলে, 'ঠাকুমাকে ডেকে আনব মা?—যাই?'

উত্তর দিতে একটু সময় লাগে জয়ন্তীর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে, 'যা।'

ডোনা চলে গেল।

আর সুসজ্জিত, বিশাল ড্রইং রুমে একা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আশ্চর্য এক উজান টানে কয়েক বছর পিছিয়ে যায় জয়ন্তী।

খুবই সাদামাঠা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে। বাবা, মা আর সে, এই তিনজনকে নিয়ে ছোট্ট ছিমছাম সংসার। বাবা ছিল স্টেট গভর্নমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্টে সেকশান অফিসার। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে শুরু করে ঘষতে ঘষতে শেষ পর্যন্ত ওইখানে পৌঁছেছিল। মিডল ক্লাস ফ্যামিলির অল্পশিক্ষিত, গিন্নিবান্নি জাতীয় মহিলারা যেমন হয়, মা ছিল তাই। সরল এবং স্নেহপ্রবণ। যাদবপুরে আড়াই কাঠা জমির ওপর পুরনো আমলের একতলা নিজস্ব একটা বাড়ি ছিল ওদের।

সেকেন্ড ডিভিসনে আই. এ পাস বাবা আর ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়া মায়ের একমাত্র সন্তান জয়ন্তী কিন্তু ছাত্রী হিসেবে ছিল দুর্ধর্ষ। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট, বি. এ ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড এবং এম. এ'তেও তাই।

ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে অনীশের সঙ্গে জয়ন্তীর আলাপ। সাবজেক্ট অবশ্য তাদের এক ছিল না। অনীশ ইকনমিকসের ছাত্র। মাধ্যমিক থেকে এম. এ পর্যন্ত তার রেজাল্টও চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো।

যাই হোক, আলাপ থেকে বন্ধুত্ব এবং তারপর প্রেমে পৌঁছুতে ওদের তিন মাসের বেশি সময় লাগেনি। তবে গোড়ার দিকে খানিকটা দ্বিধা ছিল জয়ন্তীর। তারা একেবারেই মধ্যবিত্ত। আর অনীশরা সোসাইটির সবচেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ। তার বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে রিটায়ার করেছেন। মা বেথুন কলেজ থেকে স্বাধীনতার আগে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এ পাস করেছিলেন। অনীশের মা এবং বাবার দিকের আত্মীয়স্বজনরা প্রায় সবাই অত্যন্ত কৃতী। দু দিকেই আই. এ. এস, আই. পি. এস, চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট, ডাক্তার, সলিসিটর বা সফল বিজনেসম্যানের ছড়াছড়ি। দুই পরিবারের আকাশ পাতাল পার্থক্যের কথাটা কখনও কখনও জয়ন্তী মনে করিয়ে দিলে প্রায় তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিত অনীশ। সে শুধু বলত, 'আই লাভ ইউ। দ্যাটস অল।'

এদিকে তার সম্বন্ধে স্ক্যান্ডালের কিছু কিছু খবর কানে আসছিল জয়ন্তীর। 'ফুলে ফুলে মধু খাওয়া' বলে বহুকালের পুরনো একটা কথা আছে। অনীশের স্বভাবটা নাকি সেইরকম। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। দু চারটে বেনামী চিঠিও এসেছিল জয়ন্তীর কাছে। কোন কোন মেয়ের কিভাবে কতটা ক্ষতি অনীশ করেছে তার বিবরণ সেগুলোতে ছিল। পত্রদাতারা তাকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছে---অনীশের মতো বাজে, লম্পট ছেলের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক যেন সে না রাখে, রাখলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে।

চিঠিগুলো অনীশকে দেখিয়েছিল জয়ন্তী। অনীশ হেসে হেসে বলেছে, 'সব মিথ্যে। ব্যাপারটা কী জানো— জেলাসি। তোমার আমার রিলেশানটা অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। আমার এগেনস্টে যে সব স্ক্যাণ্ডাল রটেছে সেগুলো যদি সত্যি হত, কেউ চিঠি লিখত না, স্ট্রেট

তোমার সঙ্গে দেখা করে বলে যেত। সব কাওয়ার্ড, স্কাউন্ড্রেলের দল। পেছনে থেকে ছুরি মারা ছাড়া এদের আর কোনো কাজ নেই। এই চিঠিগুলোর একটা ওয়ার্ডও বিশ্বাস কোরো না।'

তখন জয়ন্তী এমনই আচ্ছন্ন যে অনীশ ছাড়া তার কাছে এই পৃথিবীতে বিশ্বাসযোগ্য অন্য কেউ ছিল না। যা অনিবার্য, এরপর তাই ঘটেছিল। যে যুবক প্রচুর নারীসঙ্গ করেছে, কেন কে জানে সে দুম করে জয়ন্তীকে বিয়ে করে ফেলেছিল। এ নিয়ে কম অশান্তি হয়নি। বিয়েটা আদৌ মেনে নিতে পারেননি প্রীতিলতা এবং অনীশের বাবা শোভনদেব। অতি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়ে যার কোনোরকম উজ্জ্বল পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই, নেই কোনো বলার মতো পেডিগ্রি, না মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, তাকে পুত্রবধূ হিসেবে সহ্য করা অসম্ভব ব্যাপার। শোভনদেব যতকাল বেঁচে ছিলেন, জয়ন্তীর সঙ্গে কোনোদিন একটি কথাও বলেননি। প্রীতিলতা অতটা রূঢ় হননি, তবে বরাবর একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। অনীশের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে জয়ন্তী 'স্কাইলার্ক' নামের অভিজাত বাড়িটিতে ঢুকতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু সে যে এ বাড়ির কেউ নয়, নিতান্তই অবাঞ্ছিত, সেটা বুঝিয়ে দিতেন প্রতি মুহূর্তে।

বিয়ের আগেই এম. এ'টা হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তীর। রেজাল্ট ভালো হওয়ায় একটা কলেজে লেকচারশিপ পেয়ে যায় সে। অনীশ অবশ্য ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার পর চাকরি নেয়নি ; ম্যানেজমেন্ট কোর্স শেষ করে একটা বড় কোম্পানিতে জয়েন করেছিল। ছ'মাস পর সে অফিস বদলায়। এইভাবে তিন-চারটে কোম্পানি ঘুরে এখন একটা নাম-করা মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মে আছে।

শ্বশুর-শাশুড়ি মর্যাদা না দিলেও অনীশের ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র দুঃখ বা অভিযোগ ছিল না। কিন্তু বিয়ের তিন-চার বছর বাদে হঠাৎ বদলে যেতে শুরু করে অনীশ। যে শুভাকাঙ্ক্ষীরা বেনামী চিঠি লিখে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, তাদের আশঙ্কা যে মিথ্যে নয় সেটা বুঝতে পারে জয়ন্তী। একদিন জানা গেল, অফিসের এক সহকর্মী পারমিতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে অনীশ। এদিকে একটি মেয়ে হয়ে গেছে তাদের --ডোনা।

প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল জয়ন্তী। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে অনীশকে ফেরানোর জন্য কী না করেছে সে! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই টের পেল অসম যুদ্ধে নেমেছে। পারমিতা কলকাতার বিখ্যাত, বনেদি বংশের মেয়ে। অঢেল টাকা তাদের। উত্তর এবং মধ্য কলকাতায় তাদের বারো চোদ্দটা বাড়ি। পুরনো ভিনটেজ কার থেকে আধুনিক মডেলের ঝকঝকে টোয়োটা ইত্যাদি মিলিয়ে ডজনখানেক দেশি বিদেশি গাড়ি। ব্যাঙ্কে কত যে টাকা, বড় বড় কোম্পানিতে কত যে শেয়ার তার হিসেব নেই। তা ছাড়া চোখ ঝলসে দেবার মতো সৌন্দর্য পারমিতার। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষায় তার রেজাল্টটাও অসাধারণ। গ্ল্যামার, অর্থ, আভিজাত্য, বংশগৌরব-- কোনো দিক থেকেই তার ধারে কাছে ঘেঁষার যোগ্যতা নেই জয়ন্তীর। প্রতিদিন তখন অশান্তি, উত্তেজনা আর তিক্ততা।

অনীশের দিক থেকে একদিন জানানো হয়েছিল জয়ন্তী যেন ঝঞ্ঝাট না করে ডিভোর্সে রাজি হয়ে যায়। এর জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ তাকে দেওয়া হবে। জয়ন্তীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিবাহ বিচ্ছেদ মেনে নেবে না, যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে ডিভোর্সটা ঠেকিয়ে রেখে লাভই বা কী। অনীশের সঙ্গে সম্পর্কটা কোনোদিনই ভালো হওয়ার নয়। গ্লানিকর, অসম্মানজনক অস্তিত্ব নিয়ে 'স্কাইলার্ক'-এ পড়ে থাকার মানে হয় না। সে ডিভোর্সে রাজি হয়ে গিয়েছিল একটি মাত্র শর্তে। ডোনাকে তার চাই। কিন্তু

মেয়েটাকে পাওয়া যায় নি। অগত্যা কোর্টে যেতে হয়েছিল। অনীশরা তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলা এনে, ভাড়াটে সাক্ষী জোগাড় করে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল যাতে মনে হয়েছে ডোনা তার কাছে থাকলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রীতিলতার মতো শিক্ষিত মহিলা তার বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়িয়ে যেন বিষ উগরে দিয়েছিলেন। ফলে মেয়েকে ওরাই পেয়ে গিয়েছিল। তবে সামান্য একটু করুণা করা হয়েছিল। সপ্তাহে একদিন ঘন্টাখানেকের জন্য ডোনাকে দেখে যেতে পারবে জয়ন্তী। পাঁচ বছর ধরে সেইভাবেই চলছে।

আদালতের রায় বেরুবার অনেক আগেই যাদবপুরে নিজেদের বাড়ি চলে গিয়েছিল জয়ন্তী। এর মধ্যে বাবা রিটায়ার করেছে। ইচ্ছা করলে ফের বিয়ে করতে পারত সে। কলেজের অবিবাহিত সহকর্মীদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে এগিয়েও এসেছিল। তারা যে শেষ পর্যন্ত অনীশের মতো বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। জয়ন্তী রাজি হয়নি। হাতজোড় করে বিনীতভাবে সে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। আসলে একবার বিয়ে করেই তার মোহভঙ্গ ঘটে গেছে।

এদিকে অনীশদের বাড়িতেও কিছুটা ওলটপালট ঘটে গেছে। শোভনদেব মারা গেছেন। প্রীতিলতার বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পারমিতাকে বিয়ে করে সল্ট লেকে নিয়ে এসেছে অনীশ। ওরা বাড়িতে বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে থাকে না। অফিস, ট্যুর—এসব নিয়েই আছে। বাড়িতে থাকলে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে পার্টি, মদ্যপান, চড়া সুরের ওয়েস্টার্ন মিউজিক। পারমিতা তো বটেই, অনীশ পর্যন্ত ডোনার খোঁজখবর নেয় না। ডোনা বা হরেন যে দু'জনের সঙ্গে জয়ন্তীর যোগাযোগ আছে, তারা এসব তাকে জানায়নি। 'স্কাইলার্ক'-এর আশেপাশে যাদের বাড়ি তাদের কেউ কেউ তার কলেজে ফোন করে বলেছে। এই খবরগুলো পাওয়ার পর থেকে ডোনার জন্য সারাক্ষণ সে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে।

কতক্ষণ একা একা বসে ছিল, খেয়াল নেই। পায়ের শব্দে চকিত হয়ে মুখ ফেরাতেই জয়ন্তী দেখতে পায়, ডোনার কাঁধে হাতের ভর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে ড্রইং রুমে ঢুকছেন প্রীতিলতা। একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায় জয়ন্তী। এ কাকে দেখছে সে? এই কি সেই অভিজাত, দাম্ভিক, বৃদ্ধ বয়সেও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী প্রীতিলতা? পাঁচ বছর তাঁকে দেখেনি সে কিন্তু এর ভেতর তাঁর শরীর ভেঙেচুরে যে এমন ধ্বংসস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কে তা ভাবতে পেরেছিল?

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল প্রীতিলতার, দোতলা থেকে নেমে আসতে হাঁফ ধরে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে হাঁ করে জোরে জোরে শ্বাস টানছিলেন।

অদৃশ্য কেউ যেন প্রবল এক ধাক্কায় জয়ন্তীকে দাঁড় করিয়ে দেয়। নিজের অজান্তেই সে প্রায় দৌড়ে প্রীতিলতার কাছে গিয়ে তাঁর একটা হাত ধরে সযত্নে সোফায় বসিয়ে দেয়। তারপর তাঁকে প্রণাম করে একধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। এতদিন পর প্রীতিলতার সঙ্গে দেখা, সে আড়ষ্ট বোধ করছিল।

খানিকটা সুস্থ হয়ে প্রীতিলতা বলেন, 'দাঁড়িয়ে কেন বউমা, বোসো।'

প্রীতিলতার মুখে 'বউমা' শব্দটা খচ করে কানে যেন বিঁধে যায় জয়ন্তীর। এ বাড়ির সঙ্গে তার যে কোনো সম্পর্কই নেই সেটা হয়তো মনে নেই প্রাক্তন শাশুড়ির। পুরনো অভ্যাসবশেই বুঝিবা তিনি শব্দটা উচ্চারণ করেছেন। জয়ন্তী কিছু বলে না, প্রীতিলতার মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় ধীরে ধীরে বসে পড়ে।

প্রীতিলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করেন, 'কেমন আছ বউমা?'

নিচু গলায় জয়ন্তী বলে, 'ভালো। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে আপনার!'

প্রীতিলতা বলেন, 'আমার যে একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, সেটা কি তোমাকে কেউ বলেনি?'

'বলেছে। কিন্তু—' কথা শেষ না করেই জয়ন্তী থেমে যায়।

সে কী বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রীতিলতার। স্ট্রোকের খবর পেয়েও ওর পক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যে সম্ভব ছিল না সেটা তিনি জানেন। এ ব্যাপারে আর কিছু না বলে ডোনার দিকে ফিরে বলেন, 'দিদিভাই, তুমি একটু ওপরে যাও। আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলব। পরে হরেনকে দিয়ে খবর পাঠাব। তখন এসে মায়ের সঙ্গে গল্প কোরো।'

ডোনা খুব বাধ্য মেয়ে, 'আচ্ছা' বলে চলে যায়।

ফের জয়ন্তীর দিকে ঘুরে প্রীতিলতা বলেন, 'এতকাল বাদে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি বলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গেছ, তাই না?'

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে জয়ন্তী বলে, 'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে আমার বিশেষ একটা অনুরোধ আছে।'

উৎসুক চোখে প্রীতিলতার দিকে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তী।

প্রীতিলতা দু'হাত বাড়িয়ে জয়ন্তীর একটা হাত ধরে বলেন, 'অনীশ যে ফের বিয়ে করেছে সেটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। পারমিতা আর অনীশ একেবারেই অমানুষ। ওরা যা সব করে বেড়ায় সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু দু'জনের কারুরই ডোনার দিকে নজর নেই। মায়া মমতা, দায়িত্ববোধ—এসব না থাকলে ছেলেমেয়েকে কি মানুষ করে তোলা যায়? আমি যতকাল আছি ডোনাকে দেখে রাখতে পারব। কিন্তু টের পাচ্ছি বেশিদিন আর আয়ু নেই। যে কোনো সময় ডাক এসে যেতে পারে। তাই বলছিলাম তুমি ডোনাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।'

স্নায়ুমণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কিছু একটা ঘটে যায় জয়ন্তীর। অনেকক্ষণ পলকহীন প্রীতিলতার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে ওঠে, 'কিন্তু একদিন তো কোর্টে সাক্ষ্য দিয়ে আপনারা ডোনাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, ভুল করেছিলাম। ডোনা এই বংশের মেয়ে। তাকে ছেড়ে দিতে আমাদের, বিশেষ করে আমার অধিকার বোধে লেগেছিল। এখন দেখছি অধিকারের চেয়ে মেয়েটার জীবন, তার ভবিষ্যৎ অনেক বেশি মূল্যবান। তুমি ওকে নিয়ে যাও।'

'আপনার ছেলে কি ওকে ছাড়তে চাইবে?'

অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে ওঠে প্রীতিলতার মুখে। তিনি বলেন, 'তার আপত্তি হবে না।'

জয়ন্তী বলে, 'আদালত কি এভাবে নিয়ে যেতে দেবে?'

'সে ব্যবস্থা আমি করব। কোর্টে অ্যাপিল করে বলব, আমি অন্যায় করেছিলাম। যার কাছে থাকলে ডোনার সবচেয়ে ভালো হবে তার কাছে ওকে ফিরিয়ে দিতে চাই।'

হঠাৎ প্রীতিলতার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে জয়ন্তী। কান্নার উচ্ছ্বাসে তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। প্রীতিলতা ধীরে ধীরে তাঁর রুগ্ণ, দুর্বল একটি হাত তার মাথায় রেখে বসে থাকেন। জয়ন্তী অনুভব করে বৃদ্ধা মহিলাটির স্পর্শের ভেতর দিয়ে আশ্চর্য এক মমতা তার মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে।

দু'পিঠ

রাতের শেষ লোকাল ট্রেনটা নীলাকে রানীপুর পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে নেমে চমকে উঠল নীলা, ভয়ও পেয়ে গেল খুব। হঠাৎ শীত লাগার মতো একটা কাঁপুনি তার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসতে লাগল যেন।

চারিদিকে অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, কোথাও একফোঁটা আলো নেই। তার মানে আজও এদিকটায় ইলেকট্রিসিটি গেছে। লোডশেডিং-এর কল্যাণে সপ্তাহে কম করে তিন চার দিন রানীপুরে আলো জ্বলে না।

সময়টা ভাদ্রের শেষাশেষি। নিয়ম অনুযায়ী শরৎকাল। কিন্তু রানীপুর এখনও প্রাণ ধরে বর্ষাকে বিদায় দিতে পারেনি। পাথরের চাংড়ার মতো ভারী ভারী মেঘ গোটা আকাশটা মুড়ে রেখেছে। ফলে চাঁদ উঠলেও দেখা যাচ্ছে না, তারাগুলোও অদৃশ্য। থেকে থেকে উলটোপালটা জলো বাতাস ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। বর্ষার এই আবহাওয়া অন্ধকারটাকে ঘন আর ভীতিকর করে তুলেছে।

সেই এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে লম্বা প্ল্যাটফর্মটার আগাগোড়া একবার দ্রুত দেখে নিল নীলা। একটু আগে লাস্ট লোকাল ট্রেন থেকে সে একাই নামেনি, আরো কয়েকজনকেও নামতে দেখেছিল। কিন্তু অন্ধকারে হুটহাট কোথায় কোন দিকে যে তারা উধাও হয়ে গেছে, কে জানে।

রানীপুর স্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে একটা জবরদখল কলোনিতে নীলাদের বাড়ি। এত রাত্তিরে এতটা রাস্তা একা একা কী করে যাবে, নীলা ভাবতে পারছিল না। আজই প্রথম লাস্ট ট্রেনে রানীপুর ফিরল নীলা। অন্য দিন এর আগের, অর্থাৎ আটটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনটায় আসে সে।

নীলার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। কলকাতার এক মার্চেন্ট অফিসের টাইপিস্ট। অফিস ছুটির পর নাইট কলেজ সেরে শিয়ালদা থেকে আটটা পঁয়ত্রিশের ট্রেন ধরে। কিন্তু আজ কলেজে শেষ ক্লাসটা ছিল প্রফেসর পি. এন. বি'র। নোট দিতে দিতে তিনি মিনিট পনেরো সময় বেশি নিয়েছিলেন। ফলে আগের ট্রেনটা ধরতে পারেনি নীলা।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে! ভয়ে ভয়ে নীলা এগিয়ে চলল। যেতে যেতে ভাবল, স্টেশন মাস্টারকে একবার বলবে যদি তিনি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি অ্যাসবেস্টসের সংক্ষিপ্ত ছাউনির তলায় স্টেশন মাস্টারের ঘর এবং টিকেট-কাউন্টার। লাস্ট ট্রেনটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তালা পড়ে গেছে। বর্ষার ঘোর-লাগা এই অন্ধকারে কে আর নির্জন স্টেশনে পড়ে থাকতে চায়।

নীলা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তার শেষ ভরসাটুকুও গেছে। কিন্তু বাড়ি তো ফিরতেই হবে। প্রায় শ্বাসরুদ্ধের মতো সে স্টেশনের বাইরে চলে এল।

স্টেশনের ঠিক গায়েই সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড। এখন স্ট্যান্ডটা একেবারে ফাঁকা। রিকশা থাকলে তাতেই চলে যাওয়া যেত। নেই যখন, হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। নীলা হাঁটতেই লাগল।

স্টেশন ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে দু'ধারে ফাঁকা মাঠ, তার মধ্যে এক-আধটা কল-কারখানা। জায়গাটা খুব খারাপ। আজেবাজে লোকেদের আস্তানা আছে এখানে।

কোনো দিকে না তাকিয়ে প্রায় ঝড়ের বেগে সে ছুটছিল। হঠাৎ তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। একটা ঢ্যাঙামতো লোক অন্ধকারে উলটো দিক থেকে আসছে। কাছাকাছি এসে সে-ও দাঁড়িয়ে গেল।

লোকটা কে, কোথায় থাকে, ভালো না খারাপ, কিছুই জানে না নীলা। তবু অন্ধকার নির্জন রাতে তাকে দেখে সে যেন অনেকখানি ভরসা পেয়ে গেল। হাজার হোক একটা মানুষ তো।

নীলাই প্রথমে কথা বলল। জানালো, লাস্ট ট্রেনে সে কলকাতা থেকে এসেছে, কিন্তু এমন কাউকে স্টেশনে পায়নি যাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে, একা একা তার ভয় করছে, এখন যদি ভদ্রলোক দয়া করে তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

নীলা বলল, 'নবজীবন কলোনিতে।'

লোকটা একটু ভেবে বলল, 'আমার সঙ্গে আপনি যাবেন?'

নীলা বলল, 'যাব বৈকি। বুঝতে পারছি আপনাকে এত রাত্তিরে কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু এই উপকারটুকু করতেই হবে। সামনেই একটা বাজে পাড়া আছে—একা একা ওখান দিয়ে একটা মেয়ের পক্ষে যাওয়া—বুঝতেই পারছেন—'

লোকটা দ্বিধার গলায় এবার বলল, 'আচ্ছা, চলুন—'

পাশাপাশি যেতে যেতে নীলা বলল, 'চিরদিন আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

লোকটা উত্তর দিল না।

মিনিটখানেক হাঁটবার পর কোত্থেকে একটা রিকশা মাটি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল।

নীলা বলল, 'রিকশাটা নিলে কিন্তু ভালো হয়। পাঁচ মিনিটেই বাড়ি পৌঁছুনো যাবে। আপনাকেও তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে পারব।'

লোকটা বলল, 'বেশ তো।'

ওরা রিকশায় উঠে বসল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নীলা বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হচ্ছেন?'

লোকটা বলল, 'বিরক্ত হব কেন?'

নীলা বলল, 'এই জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি বলে।'

লোকটা বলল, 'না না, ওসব ভাববেন না।'

নীলা বলল, 'হয়তো আপনার কোনো জরুরি কাজ ছিল, আমার জন্য অসুবিধা হল —'

লোকটা বলল, 'কোনো কাজই আমার ছিল না।'

নীলা এলোমেলোভাবে আরো দু'চারটে কথা বলল। তার সঙ্গীটি খুবই স্বল্পভাষী, হুঁ হাঁ করে সংক্ষেপে উত্তর দিতে লাগল।

রিকশাটা যখন নবজীবন কলোনির কাছে এসে গেছে সেই সময় দপ করে রাস্তার দু'ধারের বাড়িঘরে, মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে উঠল। তার মানে আবার ইলেকট্রিসিটি ফিরে এসেছে।

আলো জ্বলতেই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল নীলা। লোকটার নাম অবনী নন্দী, রানীপুরের মার্কামারা বদমাশ, জুয়াড়ি। আচমকা লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়ল নীলা। তারপর রিকশাওলাকে একটা টাকা দিয়ে বলল, 'বাবুকে নিয়ে চলে যাও।'

অবনী অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'কী হল আপনার? নামলেন কেন? উঠুন উঠুন, বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসি।'

নীলা দাঁড়াল না, উত্তরও দিল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে নবজীবন কলোনির দিকে ছুটতে ছুটতে ভাবল, অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় একটা বজ্জাতের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, তাই বলে তাকে সঙ্গে করে এত আলোর মধ্যে বাড়িতে তো নিয়ে যাওয়া যায় না!

বর্ষায় একদিন

উত্তর বিহারের এই ধু ধু মাঠটার মাঝখান দিয়ে লম্বা কাঁচা সড়ক — এ অঞ্চলে যাকে বলে 'কাচ্চী' — সোজা তিন মাইল দূরের হাইওয়েতে গিয়ে পড়েছে। মাঠ বলতে সবুজ ঘাসের একটানা প্রান্তর নয়, বেশির ভাগটাই উঁচু-নিচু কাঁকুরে মাটির ডাঙা, এবড়ো খেবড়ো। চারিদিকে ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম আব পিপর গাছ। অনেক দূরে ছোট বড় টিলার ফাঁকে ফাঁকে পেন্সিলের আঁচড়ের মতো ঝাপসা দু-চারটে গাঁ।

আগের তিন দিন এ দিকে ধুম বৃষ্টি হয়ে গেছে। তবে আজ সকাল থেকে ছিটেফোঁটাও ঝরেনি। জল ধরে গেলেও আকাশ জুড়ে গাভিন মোষের মতো ছন্নছাড়া মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। ভারী, জলো হাওয়া মাঠের ওপর যেন থমকে আছে। গাছের একটা পাতাও নড়ে না। যেদিকে যত দূর চোখ যায়, সব থম-মারা, রুদ্ধশ্বাসে কিসের অপেক্ষায় যেন রয়েছে। আসলে আয়োজনে কোথাও ফাঁক নেই, যে কোনো মুহূর্তে ফের শুরু হয়ে যাবে তুমুল দুর্যোগ; লক্ষ কোটি জলের ফোঁটা সিসের ফলা হয়ে নেমে আসবে আকাশ থেকে, ভেসে যাবে সমস্ত চরাচর।

এখনও বেলা তেমন হয়নি। মেঘের কিনারা দিয়ে সূর্যের যে ভীরু রশ্মিগুলো নেমে এসেছে, শ্রাবণের সকালটাকে ঝলমলে করে তোলার পক্ষে তা আদৌ যথেষ্ট নয়। ম্যাড়মেড়ে, নিরুত্তাপ আলো বর্ষার এই দিনটাকে যেন বড় বেশি স্যাঁতসেঁতে করে তুলেছে।

ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে এখানে মাটি গলে থকথকে মাংসের মতো হয়ে আছে। হাঁটতে গেলে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়।

এই সকালবেলায় মাথার ওপর বর্ষার ঘন কালো মেঘ নিয়ে থকথকে গলা মাটিতে গোড়ালি গেঁথে গেঁথে এগিয়ে যাচ্ছিল নাথুনি। সে আসছে আড়াই মাইল পেছনের একটা গাঁ বারহৌলি থেকে; যাবে তিন মাইল মাঠ পেরিয়ে যেখানে হাইওয়ে, তার ওধারে নানকিপুরা টাউনে। দু'দিন ধরে তারা উপোস দিচ্ছে। গাঁয়ে কাজকর্ম নেই, তাই কামাইও নেই। শহরে গিয়ে কিছু একটা জুটিয়ে চাল-ডাল, ছাতু কি আটার ব্যবস্থা করে সন্ধের আগে আগে ফিরে আসবে।

নাথুনির বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। লম্বাচওড়া মজবুত চেহারা তার, হাড়গুলো মোটা মোটা। লম্বাটে রুক্ষ মুখ, কর্কশ চামড়া, শির বার-করা হাত, তেলহীন জটপাকানো চুল বা পায়ের নিরেট গোছ — কোনো কিছুতেই লালিত্যের চিহ্নমাত্র নেই। চোখের খর চাউনি লক্ষ করলে বোঝা যায়, দুনিয়ার কাউকেই সে বিশ্বাস করে না। নারীত্বের শেষ মাধুর্যটুকু কবে তার শরীর

থেকে উধাও হয়েছে, সে নিজেও বুঝি তা মনে করে রাখেনি। নাথুনির সর্বাঙ্গে পুরুষালি কঠোরতা তার নিজস্ব ছাপ মেরে রেখেছে।

এই মুহূর্তে তার পরনে তালি-মারা জামা আর খাটো ময়লা শাড়ি। শাড়িটার ঝুল হাঁটুর তলায় কয়েক আঙুল নেমেই শেষ। দু'হাতে তামার বেটপ কাংনা আর নাকের পাটায় ঝুটো পাথর-বসানো চাঁদির নাকফুল ছাড়া সারা গায়ে আর কোনো দামি ধাতুর লেশটুকুও নেই।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে হাতখানেক কাদায় যতটা জোরে সম্ভব পা চালাতে চালাতে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নেয় নাথুনি। না, সে ছাড়া এত বড় মাঠে আর কেউ নেই। চারিদিক আশ্চর্য নিঝুম। শুধু কোথায় যেন একটা পরদেশি গুগা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দিগন্ত-জোড়া নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া আর আধপেটা খাওয়ার পরও নাথুনির শরীরে রয়েছে অসীম শক্তি, বনভৈসীদের গায়ে যেমনটা থাকে। শক্তি ছাড়াও যা আছে তা হল দুর্জয় সাহস। এত বড় বিশাল জনহীন মাঠের ওপর দিয়ে একা একা চলতে তার এতটুকু ভয় লাগছে না।

কতক্ষণ হেঁটেছিল, মনে নেই নাথুনির। হঠাৎ কার যেন ডাক আবছাভাবে ভেসে আসে, 'এ — এ আওরত —'

প্রথমটা সেভাবে খেয়াল করেনি নাথুনি। কিন্তু ডাকাডাকিটা থামে না। অগত্যা সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এধারে ওধারে তাকাতে পেছনে, অনেকটা দূরে একটা লোককে দেখতে পায়। সে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

আগে যা ভাবা গিয়েছিল, মাঠটা ঠিক ততটা নির্জন নয়। নাথুনি বেশ অবাকই হয়ে যায়। তাকে না হয় পেটের দানার জন্য নানকিপুরায় যেতে হচ্ছে, কিন্তু এই লোকটা মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে বেরিয়ে এল, আর ঘোর বর্ষায় কাকপক্ষিও যখন বেরোয় না, তখন তিন মাইল কাদা ভেঙে সে চলেছেই বা কোথায়? নাথুনির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা হল এই রকম। তার লালিত্য টালিত্য না-ই থাক, তবু সে একটা আওরত তো। লোকটা ভালো, না বজ্জাত, কিছুই জানা নেই। এই ফাঁকা মাঠে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ সাহায্যের জন্য ছুটে আসবে না। মেয়েমানুষের আজন্মের সংস্কারে সমস্ত শিরাস্নায়ু টান টান করে নাথুনি অপেক্ষা করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটা কাছে চলে আসে। বয়স চল্লিশের ওধারে। আখাম্বা তালগাছের মতো ঢ্যাঙা, চৌকো মুখ, ভুরু দু'টো যেন ইঁদুরে খোবলানো, গালে খাপচা খাপচা আগাছার মতো দাড়ি। গায়ের রং ভুসো কালিতে আগাপাশতলা চোবালে যেমন হয় হুবহু তাই। চামড়া ফেটে ফেটে খই উড়ছে। লম্বা দুই হাত কাঁধ থেকে জানু পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই বিদঘুটে চেহারার লোকটার দুই চোখে যেন আশ্চর্য জাদু মাখানো। এমন সরল, নিষ্পাপ চোখ ক্বচিৎ দেখা যায়।

লোকটার পরনে খেলো ছিটের ঠেটি ফুলপ্যান্ট আর বেখাপ্পা একটা জামা যার হাতদু'টো আবার নেই; কাঁধের কাছ থেকেই ছেঁড়া। পিঠে ঢাউস একটা বোঁচকা বাঁধা, খুব সম্ভব তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি সেটার ভেতর পোরা আছে।

লোকটা পোকায়-খাওয়া হলদেটে দাঁত বার করে বলে, 'আমার নাম লাখপতি, দুনিয়ার সবাই বলে লাখুয়া। তোমার নামটা কী?'

লোকটাকে দেখামাত্র টের পাওয়া যায় গরিবের চাইতেও গরিব। তার নাম নাকি লাখপতি! মনে মনে বেশ আমোদই লাগে নাথুনির। পরক্ষণে সে প্রায় রুখে ওঠে, 'আমার নাম দিয়ে কী হবে? মতলব কী তোমার?'

লোকটা অর্থাৎ লাখুয়া থতমত খেয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে, 'কোনো মতলব নেই। বাতচিত করতে সুবিধা হয়, তাই জানতে চাইলাম।'

কপাল কুঁচকে ধারাল চোখে লাখুয়ার পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত আদ্যোপান্ত দেখে নেয় নাথুনি। তার ত্রস্ত, হতচকিত ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না লোকটার মাথায় কোনোরকম দুরভিসন্ধি রয়েছে। তবে জন্মের পর থেকে ত্রিশ বত্রিশ বছরে দুনিয়ার হালচাল অনেক দেখেছে নাথুনি। জীবনে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। সে জানে মুখ দেখে গলে গেলে বহু সময় ঠকতে হয়। বাইরে থেকে কাউকে হয়তো সাধু-মহাত্মা মনে হতে পারে, কিন্তু একটু নাড়াচাড়া দিলেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে মারাত্মক সব ফন্দি।

লাখুয়ার দিকে চোখ রেখে ভেতরে ভেতরে খুব সতর্ক হয়ে থাকে নাথুনি। গলার স্বর সামান্য নরম করে নিজের নামটা জানিয়ে জিগ্যেস করে, 'বল, আমার কাছে কী দরকার?'

লাখুয়া বলে, 'নানকিপুরায় যাব।' পেছন দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাতে দেখাতে বলে যায়, 'উঁহা এক দেহাতের গাঁওবালারা বললে এই মাঠটা পেরুলে নানকিপুরা টৌন। ঠিক যাচ্ছি তো?'

পলকে নিদারুণ সন্দেহে মনটা ভরে যায় নাথুনির। সে নিজেও নানকিপুরায় যাচ্ছে। লোকটা কি আগাম খবর জোগাড় করে তার পিছু নিয়েছে? পরক্ষণে ভাবে, লাখুয়া হয়তো সত্যি কথাই বলছে। তার মন্দ উদ্দেশ্য না-ও থাকতে পারে।

নাথুনি বলে, 'গাঁওবালারা ঠিকই বলেছে।' তারপর সামান্য একটু কৌতূহল হয় তার। শুধোয়, 'নানকিপুরায় কোনো কাজে যাচ্ছ?'

লাখুয়া বলে, 'হাঁ। শুনেছি ওখানে বড়ে বড়ে জমিমালিকরা খেতির কাজের জন্যে লোক নেয়। যাচ্ছি, যদি কিছু একটা জুটে যায়। পুরা এক রোজ ভুখা আছি, হাতে একটা পাইসা নেই।'

কী আশ্চর্য, একই কারণে নাথুনি নিজেও নানকিপুরায় চলেছে। ফের মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে তার। কিন্তু লোকটা ভালোমানুষের মতো মুখ করে যেভাবে বলেছে তাতে ধন্দ থাকার কথা নয়। নাথুনি বলে, 'আমিও সেখানে যাচ্ছি। ইচ্ছা হলে আমার সঙ্গে যেতে পার। তবে একগো বাত —'

'কী?'

কোমরের গোপন খাঁজ থেকে জং-ধরা আধ হাত চাকুর ফলা ধাঁ করে বার করে আনে নাথুনি। বলে, 'হোঁশিয়ার, বজ্জাতি করলে পেটের ভেতর এটা ঢুকিয়ে দেব। আগেও তিন তিন হারামির পেটে ঢুকিয়েছি।' আসলে ছুরিটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। কাজের খোঁজে উত্তর বিহারের এই অঞ্চলটা তাকে চষে বেড়াতে হয়। মানুষের চেহারা নিয়ে চিতা গিধ আর শিয়ালেরা চারপাশে থিক থিক করছে। কখন অস্ত্রটা কাজে লাগবে কে বলতে পারে।

'হো রামজি —' আঁতকে উঠে তিন পা পিছিয়ে যায় লাখুয়া। নিজের পেটে একটা হাত রেখে আস্তে টোকা দিতে দিতে ভয়ার্ত সুরে বলে, 'এটা ছাড়া দুনিয়ার আর কিচ্ছু আমি বুঝি না, আর কোনো দিকে আমার নজর নেই।'

'সচ?'

'সচ — সচ — সচ। ভগোয়ান রামজি কসম। বিশ্বাস কর, আমার গলা দিয়ে ঝুটা জবান বেরোয় না।'

'ঠিক হ্যায়।' চাকুর ফলাটা ফের কোমরে শাড়ির নিচে গুঁজে নাথুনি বলে, 'তুমি আমার সাত কদম আগে আগে হাঁটবে। আর পথে একটা কথাও বলবে না।' তার উদ্দেশ্য হল, লাখুয়া

সামনে থাকলে তার ওপর নজর রাখা যাবে। কিন্তু পাশাপাশি বা পেছনে থাকলে আচমকা কী করে বসবে, আগে থেকে টের পাওয়া সম্ভব নয়।

'তোমার যেমন মরজি —' বলে সত্যিই গুনে গুনে সাত পা সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে লাখুয়া।

এবার অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে যায় নাথুনি। লোকটার যদি বুরা মতলব থেকেও থাকে এবং তার ভালোমানুষির খোলসের আড়াল থেকে হুট করে সেটা বেরিয়েও আসে, সহজে কিছু করতে পারবে না। লাখুয়া ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই সে প্রস্তুত হয়ে যাবে। লাখুয়ার সঙ্গে হাতিয়ার আছে কিনা জানা নেই। যদি সশস্ত্রও হয়, একটি মাত্র পুরুষের পক্ষে নাথুনিকে কাবু করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

নাথুনি লক্ষ করে, একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না লোকটা। আঠালো কাদায় পা টেনে চলতে চলতে আপন মনেই সে বিড় বিড় করে, 'মিট্টির যা হাল, এভাবে চললে নানকিপুরায় পৌঁছুতে দুফার পার হয়ে যাবে। তখন কি আর কামকাজ পাওয়া যাবে?'

কথাগুলো যত নিচু গলায় বলুক না লাখুয়া — নাথুনি ঠিকই শুনতে পেয়েছে। তারও একই ধরনের দুশ্চিন্তা। নানকিপুরা টাউনে জমি মালিকদের কাছে সেও তো চলেছে। তাদের সঙ্গে দেখা না হলে এতটা রাস্তা এত কষ্ট করে ছুটে যাওয়া স্রেফ বরবাদ। আজকের দিনটাও পুরোপুরি উপোস দিতে হবে কিনা কে জানে।

একটা লোক মাত্র সাত কদম আগে আগে হাঁটছে, কাদায় তার পা টানার চবত চবত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি তার গায়ের ঘামে-ময়লায় মেশানো বোটকা, ভারী গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কাজেই কতক্ষণ আর মুখ বুজে থাকা যায়? রাস্তা তো কম নয়, কথা বলতে বলতে গেলে সময় মোটামুটি কেটে যাবে।

নাথুনি ডাকে, 'এ আদমি —'

সামনের দিকে চোখ রেখে লাখুয়া সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

'তোমার কথা শুনে মনে হয়েছে, এ দিকে থাকো না। ঘর কোথায়?'

'ঘর নেই।'

রীতিমতো অবাক হয়ে নাথুনি জিগ্যেস করে, 'মতলব?'

লাখুয়া পেছন ফিরে তাকায় না। থকথকে মাটিতে পা ডুবিয়ে চলতে চলতে বলে ওঠে, 'এটা ঠিক হচ্ছে না।'

'কোনটা?'

'তুমি বলেছিলে বাতচিত করা চলবে না। বিলকুল জবান বন্ধ করে হাঁটতে হবে। এখন তুমি আমাকে কথা বলাতে চাইছ। আমার কিন্তু কসুর নেই।'

নাথুনি থতিয়ে যায়। লাখুয়াকে যতটা সাদাসিধে মনে হয়েছিল আসলে দেখা যাচ্ছে সে ঠিক ততখানি ভালোমানুষ নয়। বেশ মিচকে ধরনের, দরকার মতো চোরাগোপ্তা ঘা সে-ও মারতে পারে। নাথুনি বলে, 'ঠিক হ্যায়, আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি —'

লাখুয়া এবার বলে, 'যা বলেছি বিলকুল সচ, আমার ঘর নেই।'

'তা হলে থাকো কোথায়?'

'কোঈ ঠিক নেহী। সারা দিন কামকাজের ধান্দায় ঘুরি। রাতে যেখানে জায়গা পাই — হাটিয়ার চালায়, লোকের বাড়ির চবুতরে কি গাছের তলায় — শুয়ে পড়ি।'

বাড়িঘর নেই, শোওয়ার ব্যবস্থা যেখানে সেখানে, এমন উদ্ভট মানুষ নাথুনির চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনও দেখেছে কিনা সন্দেহ। লাখুয়া সম্পর্কে তার যেটুকু সংশয়ও বা অবশিষ্ট ছিল,

অজান্তেই যেন তা ঘুচে যায়। নিজের ঘর-সংসার ছাড়া জগতের কোনো ব্যাপারেই নাথুনির এতটুকু আগ্রহ নেই। কিন্তু অচেনা এই সঙ্গীটির জন্য তার কৌতূহল যেন ক্রমশ অদম্য হয়ে উঠতে থাকে।

সাত কদম পেছনে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে সুখ নেই। তার ওপর লাখুয়া ভুল করেও একবারও ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে না। সে যা হুকুম দিয়েছে অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলেছে। হঠাৎ নাথুনির অহঙ্কারে কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগে। তার চেহারা যতই জবরদস্ত পুরুষালি ধাঁচের হোক না, তবু সে একটা রক্তমাংসের আওরত' আখাম্বা লোকটা নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে — দুনিয়ার সেরা রাজকুমার? হাত-পা চোখমুখের ছিরি তো ওই। তার এতই দেমাক যে পেছন ফিরে দেখেও না কে তার সঙ্গে চলেছে!

দু'জনে একই তালে মাঝখানের দূরত্বটা বজায় রেখে পা ফেলছিল। হঠাৎ চলার গতিটা বাড়িয়ে লাখুয়ার পাশে চলে আসে নাথুনি। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে লাখুয়া একবার সঙ্গিনীকে লক্ষ করে, তারপর আগের মতোই সামনের দিকে চোখ রেখে কাদায় পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকে।

নাথুনি বলে, 'তুমি বললে তোমার ঘর নেই। লেকিন কেউ তো মিট্টি ফোঁড়কে বেরিয়ে আসে না। সবারই মা-বাপ থাকে, ভাই বহেন থাকে — '

লাখুয়া কাদা ভাঙতে ভাঙতে উদাসীন সুরে বলে, 'তুমি আমার জীওন কহানি জানতে চাইছ?'

'হাঁ। চুপচাপ আর কতক্ষণ হাঁটা যায়! বল -

'তোমার ভালো লাগবে না।'

'না লাগুক, আরম্ভ তো করে দাও।'

লাখুয়ার হয়তো বেশি কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু এই নাছোড়বান্দা আওরতটা যেভাবে ধরেছে, এড়ানো খুবই মুশকিল। অগত্যা একটানা, ভোঁতা গলায় সে যা বলে যায় তা এই রকম। উত্তর বিহারের চৌহদ্দি শেষ হয়ে যেখানে নেপালের শুরু, সেইখানে অর্থাৎ দুই দেশের বর্ডারের কাছাকাছি একটা হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাতে তার জন্ম। ভাই-বোন নেই, খুব অল্প বয়সে মা-বাপ হারিয়ে বসেছে। যে কয়েক 'ধুর' চাষের জমি তাদের ছিল চাচারা সেটুকু কেড়েকুড়ে নিয়ে তাকে গাঁ-ছাড়া করে দেয়। তারপর থেকেই তার ভ্রাম্যমাণ জীবনের শুরু। গাঁ থেকে বেরিয়ে লাখুয়া সোজা চলে এসেছিল সাহারসা টাউনে। সেখানে এক কাঠগোলার মালিকের কাছে তিন চার বছর কাজ করেছে। মালিক লোকটা এমনিতে খারাপ ছিল না, কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙলেই শরাবের বোতল নিয়ে বসত। নেশাটা মাথায় চড়ে বসলে বিলকুল জানোয়ার হয়ে উঠত সে। হাতের কাছে যা পেত ভেঙে চুরমার করে ফেলত। আর লাখুয়াকে ধরে বেধড়ক পেটাত। মার সইতে না পেরে একদিন সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। তারপর কয়েকটা বছর ছ'সাত জন জমিমালিকের জমিতে লাঙল ঠেলে কি ধান গেহুঁ কেটে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু খরায় জমি চৌচির হয়ে গেলে বা বানে ভাসলে চাষের কাজ পুরোপুরি বন্ধ। চাষ বন্ধ তো লাখুয়ার কামাইও বন্ধ। এভাবে তো বাঁচা যায় যায় না। অগত্যা সে গিয়ে ভিড়েছিল এক নৌটঙ্কির দলে। সেখানে তবলা আর 'ফালুট' (ফ্লুট) বাজানো শিখে বেশ নাম করে ফেলেছিল। কিন্তু তার কপাল, দলটা বেশি দিন টিকল না, উঠে গেল। এবার সে এক বড় ঠিকাদারের কাছে নৌকরি জুটিয়ে নেয়। এখানে তাকে সড়ক বানানো আর পাথর ভাঙার কাজ করতে হত। এই সব 'গতরচূরণ' কাজে এমন মারাত্মক খাটুনি যে বছর তিনেকের মধ্যে গলা দিয়ে ভলকে ভলকে খুন উঠতে লাগল। হাসপাতালে যেতে ডাক্তারসাব জানিয়ে দিলেন প্রাণে বাঁচতে হলে আপাতত এই মেহনতের কাজ ছাড়তে হবে। ছেড়েও দিল লাখুয়া। তখন থেকে

আর নৌকরি বা বাঁধাবাঁধি কাজ নয়, শুরু হল উঞ্ছবৃত্তি। দুনিয়ার তুখোড় ভূ-পর্যটকদের মতো সারা উত্তর বিহার ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের কাজ জুটিয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছে সে। এইভাবে জীবনের চল্লিশ বিয়াল্লিশটা বছর কেটে গেছে।

দু দিন আগে এই বিশাল মাঠের পুব দিকের একটা ছোট টাউনে এসেছিল লাখুয়া। সেখানে কাজটাজ কিছু জোটেনি, তবে লোকজনের কাছে শুনেছে নানকিপুরায় গেলে রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে। তাই ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সে বেরিয়ে পড়েছিল।

সব শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে নাথুনি। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'বহোত কষ্ট করে বেঁচে আছ। তবে আমার হালও তোমার চেয়ে কিছু ভালো নয়।'

লাখুয়া উত্তর দেয় না।

নাথুনি কিন্তু নিজের ঘর সংসারের কথা সাত কাহন করে না শুনিয়ে ছাড়ে না। তারা থাকে এই মাঠের দক্ষিণ দিকে একটা গাঁয়ে। তার মরদ পুরা তিন সাল বিছানায় নানা রোগে কাবু হয়ে পড়ে আছে। দু'টো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের মতো গরিবের চাইতেও গরিব মানুষের টাকাপয়সা, সোনাদানা, জমিজমা কিছুই থাকে না। এদিকে সব মিলিয়ে চার চারটে পেট। তাই রোজ সকালে কাজের খোঁজে সে বেরিয়ে পড়ে। কিছু কামাই করে আনতে পারলে ভালো, নইলে স্রেফ উপোস।

এমন একটা শোচনীয় জীবন কাহিনি শোনার পরও এতটুকু প্রতিক্রিয়া নেই লাখুয়ার। তার ভেতর একটা নিরেট উদাসীনতা রয়েছে। আসলে বেঁচে থাকার জন্য উদয়াস্ত তাকে এতই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয় যে অন্যের দুঃখে বিচলিত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় বা শৌখিনতা তার নেই।

নাথুনি ফের কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভারী জলো বাতাস চিরে চিরে কোত্থেকে যেন একটা গলার স্বর ভেসে আসে। কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলছে, কিন্তু তার একটি শব্দও বোঝা যায় না।

নাথুনি আর লাখুয়া থমকে দাঁড়িয়ে এধারে ওধারে তাকাতে থাকে। কিন্তু এই বিশাল জনহীন প্রান্তরে একটি মানুষও চোখে পড়ে না। মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে তারা দু'জন ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই।

দুর্বোধ্য সেই কণ্ঠস্বরটি ফের শোনা যায়। একটানা শব্দপুঞ্জের ভেতর থেকে দু-একটি কথা এবার বুঝতে পারে নাথুনিরা। 'এ ভাইয়া — এ বহেনিয়া — আ-আ-আ—' অর্থাৎ কেউ তাদের ডাকাডাকি করছে।

মাঠের চারপাশে তাকাতে তাকাতে এতক্ষণে নাথুনির চোখে পড়ে, ডানদিকে কোনাকুনি, অনেক দূরে মোটরগাড়ির মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক সেটার পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে প্রবল বেগে হাত নেড়ে সমানে ডাকছে, 'ইধর — ইধর আও —'

নাথুনি লোকটার দিকে চোখ রেখে লাখুয়াকে জিগ্যেস করে, 'কী হতে পারে বল তো আদমিটার?'

লাখুয়া বলে, 'কী করে বলব? এই তো পহলে ওকে দেখলাম।'

নাথুনিকে চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'জরুর কোনো মুশকিলে পড়েছে।'

লাখুয়া কিছু বলে না।

দূরের লোকটা এক মুহূর্তের জন্য থামেনি, হাত নেড়ে নেড়ে একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে।

নাথুনি বলে, 'কী করবে?'

লাখুয়া মুখ তুলে দ্রুত আকাশ দেখে নেয়। যে ছন্নছাড়া মেঘগুলো এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছিল, এখন তারা জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। সূর্যটা আর দেখা যায় না, মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। দিনের আলোতে যেটুকু জেল্লাও বা ছিল, সেটা যেন ক্রমশ নিবে গিয়ে সমস্ত চরাচরকে ম্লান করে দিচ্ছে।

লাখুয়া বলে, 'আসমানের হাল দেখেছ? বহোত বুরা।'

নাথুনিও আকাশের দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ।'

'এখন আদমিটার কাছে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তার ওপর যদি বারিষ নামে, ঝামেলায় পড়ব। ওকে 'না' বলে দিয়ে চল তুরন্ত মাঠ পেরিয়ে যাই।'

'নেহী—'

একটু অবাক হয়ে লাখুয়া জিগ্যেস করে, 'কী করতে চাও?'

নাথুনি জানায়, লোকটা যখন এত কাতরভাবে ডাকাডাকি করছে, নিশ্চয়ই মারাত্মক কোনো সমস্যায় পড়েছে। ফাঁকা, জনশূন্য প্রান্তরে তাকে একা ফেলে চলে যাওয়া ঠিক নয়।

লাখুয়া আর আপত্তি করে না। বলে, 'ঠিক হ্যায়—'

দু'জনে কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটার কাছে চলে আসে। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা তার। থ্যাবড়া নাক, কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল, ভাঙাচোরা গাল আর থুতনিতে পাতলা দাড়ি, ঘোলাটে চোখ। খসখসে চামড়ার তলা থেকে হাতের মোটা মোটা শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ভাঙা নখের ভেতর রাজ্যের ময়লা।

লোকটার পরনে দুই বুক-পকেটওলা খাকি হাফশার্ট আর ঢোলা, বেখাপ্পা ফুলপ্যান্ট যার পায়ের দিকের পুরোটা কাদায় মাখামাখি। জামাপ্যান্টের আড়াল থাকলেও বোঝা যায় সে খুবই দুর্বল, বুকের ছাতি বেজায় সরু, অনেকটা পাখির মতো।

লোকটার পেছনে, খানিক দূরে যে মোটরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটার হাল হুবহু তারই মতো। মান্ধাতার বাপের আমলে তৈরি এই ঝরঝরে পুরনো আমলের গাড়িটার সামনের দিকের চেহারা মোটরের মতো কিন্তু পেছনের অংশটা অবিকল যেন বয়েল গাড়ি। কাঠের পাটাতন বানিয়ে সেটার মাথায় টিনের ছই বসানো হয়েছে। গরুর বদলে গাড়িটা ইঞ্জিনে টানে, এটুকুই যা তফাত। বয়েল গাড়ি আর মোটর মিলিয়ে এই বিচিত্র ধরনের যান বিহারের এই অঞ্চলে মাল বয়ে বেড়ায়।

দ্রুত একবার লোকটাকে তার গাড়িসুদ্ধ দেখে নিয়ে নাথুনি বলে, 'অমন শিয়ারের (শিয়াল) মতো চিল্লাচ্ছিলে কেন? কা হুয়া তুমনিকো?'

একটানা, না থেমে লোকটা বলে, 'বহেনিয়া, আমি বিলকুল ফেঁসে গেছি। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী করব, কী না করব, ভেবে ভেবে যখন দিমাগ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন ভগোয়ান রামজির কিরপায় তোমাদের দেখতে পেলাম। তোমরা আমাকে বাঁচাও—'

লোকটার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে নাথুনি আর লাখুয়া হকচকিয়ে যায়। নাথুনি জিগ্যেস করে, 'কিসে ফাঁসলে তুমি, সব খুলে বল।'

লোকটা হড়বড়িয়ে এবার যা বলে তা এইরকম। তার নাম চৌপটলাল। নানকিপুরা টৌনের সবচেয়ে বড় মোটর মেরামতি কারখানা আর গ্যারেজের মালিক বিন্ধ্যাচলি সিং রাজপুতের কাছে থাকে। গাড়ি সারাই ছাড়াও বিন্ধ্যাচলির ট্রান্সপোর্টের বিরাট কারবার। অনেকগুলো লরি, মাটাডোর রয়েছে তার। আর আছে মোটরের সঙ্গে বয়েল গাড়ির ভেজাল দেওয়া গণ্ডাতিনেক অদ্ভুত চেহারার যান। বিন্ধ্যাচলি এই সব লরি টরি মাল বওয়ার জন্য ভাড়া খাটায়। যে সমস্ত দুর্গম জায়গায় ভারী লরি ঢুকতে পারে না সেখানে বয়েল গাড়ি-মার্কা মোটর পাঠাতে হয়। এই

ধরনের একটা গাড়ি অর্থাৎ এই মুহূর্তে ওধারে যেটা পড়ে আছে, পাঁচ সাত সাল ধরে সেটা চালিয়ে আসছে চৌপটলাল।

পরশু সকালে ঘ্যানঘেনে বারিষ সবে শুরু হয়েছে, তার মধ্যেই সে মালপত্র নিয়ে গিয়েছিল ভোগবানিতে। এই মাঠটা দক্ষিণ দিকে যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরও মাইল আষ্টেক গেলে বরখা নদীর পাড়ে ভোগবানি হল মস্ত জমজমাট এক গঞ্জ। সেখানে গিয়ে মাল খালাস করার পর ধুম জ্বরে পড়ে যায় চৌপটলাল। দেড় দিন ওখানে কাটিয়ে আজ ভোরে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভোগবানি পেছনে ফেলে এই মাঠ পর্যন্ত পৌঁছুবার আগে একটা গাঁয়ের কাছে আসতেই গাঁওবালারা তার গাড়ি রুখে জবরদস্তি দু'টো লোককে গাড়িতে তুলে দেয়। এদের একজন পুরুষ, অন্যটি মেয়েমানুষ। দু'জনেরই অনেক বয়স, এবং তারা মারাত্মক রোগে ভুগছে। গাঁওবালারা বলেছিল, ওদের নানকিপুরার বড় হাসপাতালে পৌঁছে দিতে। প্রথমটা রাজি হয়নি চৌপটলাল কিন্তু বুড়ো মানুষ দু'টোর হাল দেখে শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি করেনি। কিন্তু মাঠে এসে খানিক দূর এগুতেই সব গোলমাল হয়ে গেছে; ইঞ্জিন আচমকা বানচাল হয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ধৈর্য ধরে সমস্ত শোনার পর নাথুনি বলে, 'বুঝলাম। আমাদের কাছে কী চাও তুমি?'

প্রশ্নটার সরাসরি উত্তর না দিয়ে আচমকা নাথুনি আর লাখুয়া দু'জনের দু'টো হাত ধরে চৌপটলাল বলে, 'এস আমাব সঙ্গে—'

'কঁহা?'

'এসই না—'

একরকম টানতে টানতেই নাথুনিদের গাড়ির পেছন দিকটায় নিয়ে আসে চৌপটলাল। তার হাত ছেড়ে দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওই যে দেখ—'

টিনের ছইয়ের তলায় কাঠের পাটাতনের ওপর দু'টো মানুষ পাশাপাশি পড়ে আছে। পুরুষটির সারা গায়ে শাঁস বলতে কিছু নেই। হাড়ের ওপর জেলজেলে, কোঁচকানো চামড়া জড়ানো, গলাটা সরু লিকলিকে। তার ওপর ছোবড়া-ছাড়ানো শুকনো নারকেলের মতো মাথা। একটু আধটু যে চুল রয়েছে তা যেন পাটের ফেঁসো। পরনে ময়লা, চিটচিটে, ঠেটি কাপড় আর অজস্র ফুটোওলা ফতুয়া। মেয়েমানুষটার হালও তারই মতো। রুগ্ণ, পাকিয়ে যাওয়া চেহারা। একটা ছেঁড়া টেনা দিয়ে গা কোনোরকমে ঢাকা।

দু'জনেই বেহুঁশ হয়ে আছে। মেয়েমানুষটির চোখদু'টি বোজা, কিন্তু মুখটা খোলা। মাঝে মাঝে তার গলা থেকে খুব ক্ষীণ, কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর বুড়ো লোকটার সারা গা চেচকের (বসন্ত) গুটিতে বোঝাই, একটা ছুঁচ ফেলার জায়গা নেই। মনে হয় তার প্রচণ্ড জ্বর, মুখটা টসটস করছে। চোখ অবশ্য মেয়েমানুষটার মতো বন্ধ নয়, পুরোপুরি খোলা, ছানি পড়া তারা দু'টো একেবারে স্থির। কোনোরকম সাড়াশব্দ করছে না সে।

দু'জনকে দেখতে দেখতে আঁতকে ওঠে নাথুনি। বলে, 'হো ভাগোয়ান, এ তুমি কাদের নিয়ে এসেছ! এখনও জিন্দা আছে কী করে?' একটু থেমে বলে, 'বুড়হাটার তো চেচক। বুড়হীর কী হয়েছে?'

চৌপটলাল জানায়, গাঁওবালাদের কাছে সে শুনেছে, বুড়ির ক'দিন ধরে সমানে ভেদবমি চলছে।

নাথুনি বলে, 'এমন বিমার আদমিদের আনতে গেলে কেন? ওদের ছেলেমেয়ে, রিস্তেদার কেউ নেই?'

'নেহী।'

'বুড়হী কি বুড়হার ঘরবালী?'

'নেহী, দোনোকা বিচ কোঈ রিস্তেদারি নেহী হ্যায়।'

চৌপটলাল এই দু'টি মানুষ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানিয়ে দেয়। এদের জমিজমা, ঘরবাড়ি কিছুই নেই। গাঁওবালাদের করুণার ওপর নির্ভর করে তারা এতকাল বেঁচে আছে। যার কাছে গিয়ে তারা হাত পাতে, কেউ ফেরায় না। একরকম ভিখমাঙোয়াই বলা যায়।

নাথুনি এবার শুধোয়, 'তা গাঁওবালারাই তো ওদের নানকিপুরার অসপাতালে নিয়ে যেতে পারত। তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল কেন?'

চৌপটলাল বলে, 'যা বারিষ, এর ভেতর এতটা রাস্তা বয়ে আনে কী করে? ওদের তো আর মোটর-উটর নেই। আমার গাড়িটা ফাঁকা বলেই না তুলে দিয়েছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর চৌপটলাল ফের বলে, 'এখন তোমরা দুই বুড়হা বুড়হীর ওপর থোড়েসে কিরপা কর।'

নাথুনি জিগ্যেস করে, 'ক্যায়সে?'

হাতজোড় করে চৌপটলাল বলে, 'এখনই ওদের নানকিপুরার অসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এই বানচাল গাড়ি আমি একা ঠেলে নিয়ে যেতে পারব না। তোমরা যদি হাত না লাগাও—' বলতে বলতে থেমে যায় সে।

নাথুনি একেবারে আঁতকে ওঠে। সে যা জবাব দেয় তা এইরকম। এক হাঁটু থকথকে কাদার ভেতর দিয়ে কমসে কম তিন মাইল গাড়ি ঠেলে নানকিপুরায় যেতে জান বেরিয়ে যাবে। কখন পৌঁছতে পারবে তার ঠিকঠিকানা নেই, হয়তো বিকেল হয়ে যাবে। অথচ জরুরি কাজে তাকে এবং লাখুয়াকে দুপুরের আগে ওই টাউনটায় না গেলেই নয়।

নাথুনি বলে, 'মাফ কর। আমরা চললাম—' লাখুয়াকে বলে, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? তুরন্ত পা চালিয়ে দাও—'

লাখুয়া তৎক্ষণাৎ সায় দেয়, 'হাঁ হাঁ—জরুর।'

ওরা যখন চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, নাথুনির একটা হাত ধরে কাতর মুখে চৌপটলাল বলতে থাকে, 'মাত যাও বহেন। আমরা থাকতে দু'টো মানুষ মরে যাবে? যদি ওদের বাঁচাতে পারি, থোড়েসে কোসিস করে দেখব না?'

চৌপটলালের বলার ভঙ্গিতে এমন তীব্র ব্যাকুলতা ছিল যে নাথুনি আর লাখুয়া থমকে যায়। এতক্ষণ নিজেদের চিন্তাতেই তারা ডুবে ছিল। কখন নানকিপুরায় পৌঁছুবে, কখন জমি মালিকদের কাছে কাজ জুটিয়ে কিছু কামাই করবে, এ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের মনে হয়, শুধু পেটের দানা জোটানো ছাড়াও দুনিয়ায় আরো কিছু করণীয় আছে। দু'টো মানুষ জনশূন্য বিশাল মাঠের মাঝখানে বেঘোরে মারা যাবে, এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।

নাথুনি আর লাখুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনোভাবটা যেন বুঝতে পারে চৌপটলাল। নাথুনির হাতটা ধরাই ছিল, আস্তে টান দিয়ে বলে, 'আও—'

নাথুনি লাখুয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী আর করবে? দেখি, মানুষ দু'টোকে যদি বাঁচানো যায়—'

লাখুয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

এবার তিন জনে মিলে গাড়িটা ঠেলতে শুরু করে। সামনের দিকে এক হাতে স্টিয়ারিং, আরেক হাতে জানালা চেপে ধরে ঠেলছে চৌপটলাল। পেছনে রয়েছে নাথুনি আর লাখুয়া। কিন্তু কাদায় গাড়ির চাকা এমন জাম হয়ে আটকে গেছে যে প্রথম দিকে এতটুকু নড়ানো গেল না।

লাখুয়া বলে, 'হাতের জোরে হবে না, কাঁধ লাগিয়ে ধাক্কা মারতে থাক। তাতে যদি কাজ হয়—'

নাথুনি বলে, 'হাঁ।'

দু'জনে শরীরের সবটুকু শক্তি কাঁধে জড়ো করে, গাড়ির দু'ধারে ঠেকিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে। চৌপটলাল অবশ্য আগের মতোই স্টিয়ারিং আর জানালা ধরে ঠেলে চলেছে। কিন্তু তার গায়ে আর কতটুকু জোর! তবু যেটুকু পারছে, করছে। গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে তার গলার শিরাগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে উঠেছে। চোখদু'টো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর গাড়ি নড়ে ওঠে; ধীরে ধীরে কাদার ঘন স্তর কেটে কেটে এগিয়ে যায়।

এধারে জমাট-বাঁধা মেঘপুঞ্জ তার কাজ শুরু করে দেয়। গোড়ার দিকে ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর প্রবল তোড়ে বৃষ্টি নেমে আসে। মনে হয়, মাথার ওপর থেকে গোটা আকাশ গলে গলে ঝরে পড়ছে। সেই সঙ্গে উলটোপালটা বাতাস মাঠের ওপর দিয়ে এলোপাথাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে যেন। আর আকাশটাকে আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ চমকে যায়। কড় কড় আওয়াজে কাছে, দূরে বাজ পড়তে থাকে। সমস্ত চরাচর যেন পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের দিনে ফিরে যাচ্ছে।

চারিদিকের সব আওয়াজ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ির ছাউনির তলা থেকে বুড়ো লোকটার গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে তার।

হঠাৎ নাথুনির খেয়াল হয়, গাড়ির পেছন দিকের খোলা জায়গাটা দিয়ে তোড়ে বৃষ্টির জল ঢুকে বুড়ো আর বুড়িকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। একে বুড়োর গা-ভর্তি চেচকের গুটি, তার ওপর রয়েছে জ্বরের তাড়স। এত ভিজলে আর হাসপাতালে পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে না; তার আগে মৌত অবধারিত।

নাথুনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চৌপটলালকে ডাকে, 'এ গাড়িবালা—'

প্রথমটা শুনতে পায়নি চৌপটলাল। বারকয়েক ডাকাডাকির পর তার সাড়া পাওয়া যায়, 'কী বলছ বহেন?'

'একবার এদিকে এস।'

'কায়?'

'এসই না—'

গাড়ি ঠেলা স্থগিত রেখে নাথুনিদের কাছে চলে আসে চৌপটলাল।

নাথুনি বুড়োবুড়িকে দেখিয়ে বলে, 'বারিষ ঠেকাতে না পারলে ওরা মরে যাবে। তোমার গাড়িতে বোরা উরা (বস্তা) কি চট আছে?'

'কেন?'

'পেছন দিকটা ঢেকে দিতে হবে।'

বস্তা বা চট টট কিছু ছিল না, তবে সামনের দিকে সিটের তলায় বড় এক টুকরো তেরপল রয়েছে। দ্রুত সেটা এনে তিনজনে ছাউনির পেছন দিকের খোলা অংশটা এমনভাবে ঢেকে দেয় যাতে ভেতরে আর জল ঢুকতে না পারে।

ফের গাড়ি ঠেলতে শুরু করে তারা। জামাকাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। পাঁচ হাত দূরেও এখন নজর চলে না। ডাইনে বাঁয়ে সামনে, যেদিকে তাকানো যাক, সব ঝাপসা। পৃথিবীতে তারা তিনজন, একটা বানচাল গাড়ি এবং দু'টো মরণোন্মুখ বুড়োবুড়ি ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

বৃষ্টির কামাই নেই। যেন আবহমান কাল ধরে ঝরেই চলেছে। ভিজে ভিজে হাত-পা সিঁটিয়ে গিয়েছিল নাথুনিদের। গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে মনে হচ্ছিল, হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছে। শরীরের হাড়-মাংস যেন ছিঁড়ে পড়বে।

হাইওয়ের কাছে নাথুনিরা যখন এল, বৃষ্টি ধরে গেছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে মলিন একটু আভা দেখা দিয়েছে। বোঝা যায়, দিনটা ফুরিয়ে আসছে। খানিক পরেই সন্ধে নেমে যাবে।

এখান থেকে নানকিপুরার হাসপাতাল বেশি দূরে নয়। যে জীবনীশক্তিটুকু নাথুনিদের মধ্যে তখনও অবশিষ্ট ছিল তার জোরে শেষ পর্যন্ত চৌপটলালের গাড়ি সেখানে পৌঁছে যায়।

দুই বুড়োবুড়িকে তখনই হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হয়। ডাক্তারসাবরা জানান— চেচক, জ্বর, ভেদবমি, বৃষ্টিতে ভেজা এবং গাড়ির হটরানির পরও ওরা বেঁচে আছে।

দু'টো 'বিমার' বেহুঁশ মানুষকে যে জীবন্ত অবস্থায় হাসপাতালে টেনে নিয়ে আসতে পেরেছে, এতেই যাবতীয় উদ্বেগ কেটে যায় নাথুনিদের। মাঠের মাঝখানে বুড়োবুড়িকে ফেলে এলে নির্ঘাত তারা মারা পড়ত। সেটা ভীষণ আক্ষেপের ব্যাপার।

চৌপটলাল বলে, 'তোমাদের জন্যে মানুষ দু'টো বেঁচে যাবে, মনে হচ্ছে। ভগোয়ান তোমাদের ভালাই করবে।'

নাথুনিরা একটু হাসে। তারপর বিদায় নিয়ে হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় চলে আসে।

লাখুয়া শুধোয়, 'এবার কী করবে?'

নাথুনি বলে, 'কী আর, ঘরে ফিরে যাব।'

'একবার জমি মালিকদের খোঁজ করবে নাকি?'

'কোঈ ফায়দা নেহী।'

'তবু চল না, যদি দু-একজন থেকে যায়। ছোটামোটা একটা কাম যদি মেলে—'

আগ্রহশূন্যের মতো নাথুনি বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

নানকিপুরা টাউনের একধারে অনেকগুলো বিরাট বিরাট ঝাঁকড়া-মাথা কড়াইয়া গাছ গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। রোজ সকালে চারিদিকের ভাড়াটে খেতমজুরেরা এসে সেগুলোর তলায় জড়ো হয়। জমি মালিকের লোকেরা এখান থেকে দরকারমতো মজুর বেছে নিয়ে যায়।

কড়াইয়া গাছের নিচে এসে দেখা গেল সব সুনসান। কেউ কোথাও নেই। অর্থাৎ আজকের মতো মজুর বাছাবাছির কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

নাথুনি বলে, 'কী বলেছিলাম? নিজের চোখে দেখলে তো।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে লাখুয়া।

নাথুনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'আন্ধেরা হয়ে আসছে। তুমি কি নানকিপুরায় থেকে যাবে?'

'হাঁ।'

'চলি। কাল আবার কামকাজের খোঁজে আসব। তখন যদি থাকো, দেখা হবে।'

'হাঁ। লেকিন—'

'কা?'

'তখন বলেছিলে, আটা ছাতু কিছু না নিয়ে গেলে বালবাচ্চা নিয়ে উপোস দিতে হবে।'

'উপোস দেওয়াটা আমাদের আদত (অভ্যাস) হয়ে গেছে। না হয় আরেকটা দিন ভুখা থাকব। তবু তো দু'টো বুড়হা বুড়হীকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি, কী বল?'

'হাঁ।'

একটু হাসে নাথুনি, তারপর ঝাপসা হয়ে আসা, ম্লান আকাশের তলা দিয়ে দূরে, হাইওয়ের ওধারে ধু ধু প্রান্তরের দিকে চলে যায়।

মল্লিকা

নরিম্যান পয়েন্টের ছাব্বিশ তলা অফিস বাড়িটার টপ ফ্লোর থেকে গ্যালপিং লিফটটা মাঝে মাঝে থেমে থেমে ধাঁ-ধাঁ করে নিচে নেমে যাচ্ছিল। ঝিঁঝির ডাকের মতো তার মৃদু একটা শব্দ হচ্ছে।

লিফট বক্সের ভেতর মোটে দু'টি মানুষ—সোমনাথ চ্যাটার্জি আর ধীরাজলাল দেশাই। কেননা এখন প্রায় সাতটা বাজে। এই ছাব্বিশ তলা স্কাই স্ক্রেপারটার সবগুলো ফ্লোরে যত অফিস-টফিস আছে, অনেক আগেই ছুটি হয়ে গেছে। সুতরাং লিফটে ভিড় না থাকাই স্বাভাবিক।

তবে পাঁচটায় গোটা অফিসবাড়ি ফাঁকা হয়ে গেলেও সোমনাথকে সাতটা আটটা পর্যন্ত থাকতে হয়। তার কারণ কাজের প্রচণ্ড চাপ। মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের যে বিভাগটির সঙ্গে ইমপোর্ট এক্সপোর্ট জড়িত, সোমনাথ তার একজন বড় অফিসার। ওয়েস্টার্ন রিজিওনের সে প্রায় সর্বেসর্বা। তার অফিস এই বিশাল বাড়িটার টপ ফ্লোরে।

সোমনাথের বয়স তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ। তবে তিরিশ টিরিশের বেশি দেখায় না। ছ'ফিটের ওপর হাইট, মেরুদণ্ড টান টান, চওড়া মজবুত কাঁধ। হঠাৎ দেখলে তাকে বাঙালি বা ভারতীয় মনে হয় না। তার গায়ের লালচে রঙে, নীলাভ চোখে এবং পাতলা ভুরুতে ইউরেশিয়ান টাচ আছে।

মাত্র তিন মাস হল সোমনাথ বম্বে রিজিওনে এসেছে, তার আগে সে ছিল দিল্লিতে।

সোমনাথের সঙ্গী ধীরাজ দেশাই অবশ্য এ অফিসের কেউ না। তবে সোমনাথের কাছে তার দরকার আছে।

ধীরাজের বয়স ছাপ্পান্ন সাতান্ন। গায়ের রং টকটকে। চওড়া কপাল, কাটা কাটা মুখ, তীক্ষ্ণ নাক সামনের দিকে বাঁকানো। বাজপাখির মেলে দেওয়া ডানার মতো ঘন ভুরুর তলায় তার ধূর্ত, চতুর চোখ। গায়ে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। পরনে নিখুঁত ইংলিশ স্যুট, তার সঙ্গে মাথায় গুজরাটি টুপি। লোকটার ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিশাল বিজনেস, ফ্লোরা ফাউন্টেনের কাছে তার প্রকাণ্ড অফিস। নিজের ব্যবসার ব্যাপারেই সোমনাথের কাছে আসে সে।

তিন মাস আগে যেদিন সোমনাথ বম্বে রিজিওনে এল তার দু'দিন পর থেকেই লোকটা নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে। ইমপোর্ট এক্সপোর্টের পারমিট সংক্রান্ত এমন কিছু সুবিধা সে চায়

আইনসঙ্গতভাবে তা দেওয়া সম্ভব না। লোকটা আভাসে ইঙ্গিতে মোটা ঘুষের কথা জানিয়েছে, সোমনাথ আমল দেয়নি। অফিসার হিসাবে সে অত্যন্ত স্ট্রিক্ট। তবু লোকটা রোজই আসে। সোমনাথ বিরক্ত হয়ে খেপে উঠে একেক দিন তাড়িয়ে দেয়। লোকটার কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য, কখনও সে উত্তেজিত হয় না। শান্ত ঠাণ্ডা মুখে একটু হেসে বিদায় জানিয়ে চলে যায়, কিন্তু পরের দিন বেয়ারা এসে আবার তার স্লিপ দেয়। নাছোড়বান্দা পোকার মতো লোকটা সোমনাথের গায়ে আটকে আছে।

অন্য দিন এসে পারমিট-টারমিটের কথা তুলে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে ধীরাজ দেশাই। আজ কিন্তু সে ধারই মাড়ায় নি সে। কিছুক্ষণ আগে সোমনাথের চেম্বারে ঢুকে তার কোঁচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছে, 'আপনাকে আর ডিসটার্ব করব না স্যর—'

সোমনাথ অবাক হয়ে গেছে। তারপর হালকা বিদ্রূপের গলায় বলেছে, 'হঠাৎ আমার এরকম সৌভাগ্য?'

'তিন মাস আপনাকে দেখছি। তাতে মনে হয়েছে আপনি কড়া প্রিন্সিপল্-এর লোক। আনডিউ কোনো প্রিভিলেজ আপনার কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। পারমিটের আবদার করে আপনাকে আর বিব্রত করছি না।'

'ধন্যবাদ।'

'তবে আমার একটা আর্জি আছে।'

'বলুন—'

'উই ক্যান বী গুড ফ্রেন্ডস। এতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

সোমনাথের কোঁচকানো ভুরু এবার সহজ, স্বাভাবিক হয়েছে। সরলভাবে হেসে সে বলেছে, 'আরে না না, আপত্তি থাকবে কেন?'

ধীরাজ দেশাই বলেছে, 'তবে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে আমরা চা খাব আর পারমিট ছাড়া এনি ড্যাম থিং ইন দা ওয়ার্ল্ড—ধরুন পলিটিকস, করাপশন, ন্যাচারাল ক্যালামিটি, স্পোর্টস, সেক্স— এটসেট্রা নিয়ে চুটিয়ে গল্প করব।'

সোমনাথের স্নায়ুর ওপর অস্পষ্ট ছায়া পড়েছে। লোকটা তাকে কোনোরকম ফাঁদে ফেলতে চায় না তো? সোমনাথ খবর পেয়েছে, লাখ লাখ টাকা ধীরাজ দেশাই-এর, মাল্টি-মিলিওনেয়ার বলতে যা বোঝায় সে তা-ই। বম্বের যত দামি দামি ফ্যাশনেবল পাড়া—মালাবার হিল, ওরলি, জুহু, ব্যাণ্ডস্ট্যান্ড — সব জায়গায়. তার ফ্ল্যাট আছে। আর আছে গণ্ডা গণ্ডা ইম্পোর্টেড গাড়ি। লোকটা ইচ্ছা করলে সোমনাথের মতো লোককে আরদালি রাখতে পারে। তবু তার কাঁচুমাচু মুখ, তেলতেলে মোলায়েম হাসি আর হাত কচলানোর বহর দেখে মনে হচ্ছিল সোমনাথ এক কাপ চা খেলে লোকটা হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে যাবে।

চা খাইয়ে ধীরাজ তাকে আর কতটা ফাঁদে ফেলতে পারে? 'দেখাই যাক কী হয়,' এমন গোছের একটা মনোভাব সোমনাথের মধ্যে কাজ করে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সে ধীরাজের সঙ্গে চা খেতে আড্ডা দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

তিন মিনিটও লাগল না, গ্যালপিং লিফটটা সোজা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এল। বাইরে বেরুতেই দেখা গেল বম্বে শহরের ওপর সন্ধ্যা নেমে গেছে। চারিদিকে কালো জামদানি শাড়ির মতো অন্ধকার ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এখান থেকে বাঁ দিকে চোখ ফেরালে আরব সাগর। সামনে মেরিন ড্রাইভের রাস্তাটা আধখানা বৃত্তের মতো বেঁকে মালাবার হিলসের দিকে চলে গেছে। পেছনে ব্যাক বে

রিক্লামেশনের নতুন স্কাইস্ক্রেপার কমপ্লেক্স— কুড়ি তলা, বাইশ তলা, আটাশ তলা, তিরিশ তলা, অগুনতি হাইরাইজ সেখানে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই মুহূর্তে মেরিন ড্রাইভের রাস্তায় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মার্কারি আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। দূরে উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায়, মেরিন লাইনসের ফ্লাইওভারে কিংবা চৌপট্টির ওভার ব্রিজটার গায়ে নানা কোম্পানির অসংখ্য রঙিন নিওন জ্বলছে।

ঘাড়ের পাশ থেকে ধীরাজ দেশাই বলে উঠল, 'একটু কষ্ট করে আসুন স্যার, আমার গাড়িটা ওখানে রয়েছে।' খানিকটা দূরে রাস্তার পার্কিং জোনে আঙুল বাড়িয়ে দিল সে।

অফিস থেকে সোমনাথকে একটা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। ধীরাজ দেশাইয়ের সঙ্গে চা খেতে যাবে বলে নিজের গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল সে। কথা আছে, চা খাওয়ার পর ধীরাজই তাকে তার কোলাবার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে।

পাশাপাশি যেতে যেতে ধীরাজ দেশাই আবার বলল, 'কোথায় বসে চা খাবেন বলুন? সাতটা ক্লাবে আমার মেম্বারশিপ আছে। এই ক্লাবগুলোর একটা হল মালাবার হিলে, একটা গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে, একটা ওরলিতে, একটা জুহুতে—'

হাত তুলে ধীরাজ দেশাইকে থামিয়ে দিল সোমনাথ। বলল, 'আপনার যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চলুন। তবে দু'ঘণ্টার বেশি আমি থাকতে পারব না। এখন সাতটা বাজে, ন'টার ভেতর আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবেন।'

বশংবদ প্রজার মতো ধীরাজ দেশাই বলল, 'ঠিক আছে স্যার, ন'টার ভেতরেই পৌঁছে দেব।' একটু থেমে কী চিন্তা করে আবার বলল, 'জুহুর ক্লাবেই চলুন স্যর। অন্য ক্লাবগুলোতে দারুণ ভিড়, সব সময় হাট বসে থাকে। জুহুটা বেশি নিরিবিলি, প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে।'

সোমনাথ উত্তর দিল না।

পার্কিং জোনে যে ঝকঝকে প্রকাণ্ড গাড়িটার সামনে এসে ধীরাজ দেশাই সোমনাথকে দাঁড় করাল সেটা সেভেনটি-ফোর মডেলের ইম্পোর্টেড ইতালিয়ান কার। গাড়িটা এয়ার-কণ্ডিশনড। জানালার নীলাভ কাচগুলো বন্ধ, ভেতরে আলো জ্বলছে না। গাড়িতে কেউ আছে কিনা, কিংবা কী আছে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ওরা গিয়ে দাঁড়াতেই নিঃশব্দে পেছনের দরজা খুলে গেল। ধীরাজ দেশাই বলল, 'আসুন স্যার—'

সোমনাথ বলল, 'আপনি আগে উঠুন।'

'তাই কখনও হয়? আপনি থাকতে—' বিনয়ে এবং অতিরিক্ত ভদ্রতায় পিঠ বেঁকে যেতে লাগল ধীরাজ দেশাইর।

অগত্যা প্রথমে সোমনাথকে উঠতেই হল। উঠেই আবছাভাবে সে দেখতে পেল, সামনের সিটে ঝকঝকে উর্দি-পরা শোফার বসে আছে। আর এই পেছনের সিটের ও-মাথায় জানালার ধার ঘেঁষে একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। যেহেতু ভেতরে আলো নেই, অস্পষ্ট নীলাভ অন্ধকারে মেয়েটার চোখমুখ বা বয়স কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না।

এই গাড়িটা এত বড় যে পেছনের সিটে চারজন হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারে। সোমনাথ মেয়েটির ছোঁয়া বাঁচিয়ে একটু দূরেই বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ফোমের আরামদায়ক নরম গদির ভেতর দেড় ফুট ঢুকে গেল। আর সে বসতেই ধীরাজ দেশাই উঠে এসে তার গা ঘেঁষে বসল। তারপর বলল, 'স্যর, আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে।'

সোমনাথ জানতে চাইল, 'কেন?'

'গাড়ির লাইটটা আজ বিকেল থেকে খারাপ হয়ে গেছে। অন্ধকারে ভূতের মতো বসে থাকতে কি ভালো লাগে! মুখ না দেখলে কথা বলে সুখ নেই।'

'আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

ধীরাজ দেশাই এবার শোফারকে বলল, 'জুহু চল।' তারপর সোমনাথের দিকে ফিরে বলতে লাগল, 'আপনি স্যর আমার অনুরোধটা রেখেছেন, আমাকে ফিরিয়ে দেন নি—সেজন্যে আই অ্যাম সো হ্যাপি, সো গ্রেটফুল—' বম্বের একঘেয়ে মনসুনের মতো সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে যেতে লাগল সে।

আর তা শুনতে শুনতে চোখের কোণ দিয়ে ডান পাশে বসে থাকা মেয়েটাকে দেখতে চেষ্টা করল সোমনাথ। কিন্তু না, মেয়েটার মুখ ওদিকে ফেরানো। জানালার নীল কাচের বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

মেয়েটা কে, বোঝা যাচ্ছে না। সোমনাথের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করিয়ে দেওয়া দূরের কথা, মেয়েটার সঙ্গে একটা কথাও ধীরাজ দেশাই নিজেও বলে নি। ড্রাইভার, সোমনাথ আর সে ছাড়া অন্য কেউ আছে, ধীরাজের ভাবগতিক দেখে তা মনে হয় না। মেয়েটার অস্তিত্ব পুরোপুরি ভুলে গিয়ে সে বসে আছে।

ধীরাজ দেশাইর তোষামোদ আর ঘ্যানঘ্যানানি মাথা ধরিয়ে দিচ্ছিল, কপালের দু'পাশে রগদু'টো সমানে ঘোড়ার মতো লাফিয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, চা খাওয়ার কথায় রাজি না হলেই ভালো হত। কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর তার আর উপায় নেই। যেভাবে লোকটা বকে যাচ্ছে, শুনতে শুনতে দু'ঘণ্টা বাদে একখানা ব্রেন টিউমার না গজিয়ে যায়।

মেরিন ড্রাইভের তেলতেলে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে পঞ্চাশ মাইল স্পিডে গাড়িটা উড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এতটুকু শব্দ নেই, গাড়িটা এক ইঞ্চিও লাফাচ্ছে না। সোমনাথের মনে হচ্ছিল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল একটা ঘরে বসে আছে।

একটানা বক বক করতে করতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতেই ধীরাজ দেশাই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ড্রাইভার, রুখো রুখো—'

ততক্ষণে তারা মেরিন লাইনসের ফ্লাই-ওভারটার কাছে এসে পড়েছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে শোফার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল।

ধীরাজ দেশাই প্রায় হাতজোড় করে সোমনাথকে বলল, 'স্যর, যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলব—'

আচমকা রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে দিতে অবাক হয়ে গিয়েছিল সোমনাথ, কিছুটা বিরক্তও। সে বলল, 'কী ব্যাপার?'

'এক জায়গায় আমি একটা ইমপর্টান্ট ডকুমেন্ট ফেলে এসেছি। ওটা হারিয়ে গেলে খুব বিপদে পড়ে যাব। আমি স্যর এখানে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরছি। আপনি কাইন্ডলি জুহুতে চলে যান। আপনি পৌঁছুবার পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমি চলে আসছি।'

'কিন্তু জুহুতে আপনার ক্লাব তো আমি চিনি না।'

'সে জন্যে অসুবিধা হবে না।' কোণের দিকের সেই মেয়েটিকে দেখিয়ে ধীরাজ দেশাই বলল, 'ও আমার পি.এ, আপনাকে ক্লাবে নিয়ে যাবে।' মেয়েটাকে বলল, 'তুমি এঁকে নিয়ে যাও। দেখো এঁর কোনোরকম অসুবিধা না হয়।'

মেয়েটি বলল, 'ঠিক আছে স্যর।'

ধীরাজ দেশাই বার বার ক্ষমা চেয়ে নেমে পড়ল। সোমনাথের ইচ্ছা হল, সে-ও নেমে যায়। এই লোকটার কথায় রাজি হয়ে কী ইঁদুরকলে যে সে পড়ছে! কিন্তু নামা হল না, নামার কথাটা বলা পর্যন্ত গেল না। তার আগেই গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল এবং মুহূর্তে পঞ্চাশ মাইল স্পিড উঠে গেল।

মালাবার হিলস বাঁয়ে রেখে কাম্বালা হিল পেরিয়ে গাড়িটা যখন ওরলিতে এসে পড়েছে, সেই সময় কানের পাশ থেকে চাপা সুরেলা একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'স্যর—'

চমকে ঘাড় ফেরাল সোমনাথ। সেই মেয়েটা জানালার ধার থেকে কখন যেন অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। কাঁধের ওপর তার গরম নিশ্বাস পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

এতক্ষণে গাড়ির ভেতরকার নীলাভ অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে সোমনাথের। মেয়েটাকে অনেকখানিই দেখতে পাচ্ছিল সে। ধারাল নাক তার। পেন্সিলে-আঁকা ভুরুর তলায় যে চোখ তাতে যৌনগন্ধ মাখানো। রক্তাভ ঠোঁটে ঝকঝকে দু'টো দাঁত কেটে বসে আছে। মোমে-মাজা গলা, অনাবৃত সুগোল বাহু কাঁধ থেকে নেমে এসেছে, দু'হাতের দশটি বড় বড় ছুঁচলো নখ রক্তরঞ্জিত। মুখটা ডিমের মতো লম্বাটে। পরনে ছোট হট প্যান্ট আর বিশাল বুকে সংক্ষিপ্ত সী-থ্রু ব্রা। এই পোশাকে শরীরের দশ ভাগের এক ভাগও ঢাকা পড়ে নি। সাঁচিস্তূপের মতো দুই বুকের প্রায় সবটাই, সরু কোমর, সুগভীর নাভি, তার নিচের অনেকখানি অববাহিকা এবং নীল মাখনের পাহাড়ের মতো দুই উরু, পেলব পা—সবই তার উন্মুক্ত। তার গা থেকে উত্তেজক সেন্টের গন্ধ উঠে আসছিল।

এতক্ষণ ভালো করে লক্ষই করে নি সোমনাথ। এবার তাকে দেখতে দেখতে নাকের ভেতর এবং মস্তিষ্কে সোডার ঝাঁঝের মতো কিছু একটা অনুভব করতে লাগল।

ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে রেখেই একটু হাসল মেয়েটা। তারপর আগের মতো সুরেলা গলায় বলল, 'চুপচাপ বসে থাকতে নিশ্চয়ই আপনার খারাপ লাগছে। য়ু আর সার্টেনলি ফিলিং আনকমফোর্টেবল।' নিখুঁত ইংরেজিতেই কথা বলছিল সে।

জড়ানো কণ্ঠস্বরে কী একটা উত্তর দিল সোমনাথ।

মেয়েটা আবার বলল, 'আমি যদি আপনার সঙ্গে গল্প করি, কিছু মনে করবেন না তো?'

'আরে না না, মনে করব কেন?' সোমনাথ টের পাচ্ছিল, তার স্নায়ুগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

একটু চুপচাপ। তারপর মেয়েটি বলল, 'আমার বস্ মিস্টার দেশাই কাল বলছিলেন আপনি এখানকার লোক, আই মিন, মহারাষ্ট্রিয়ান নন।'

'ঠিকই বলেছেন।' বলে একটু হাসল সোমনাথ। কী ভেবে সামান্য কৌতূহলের সুরে পরক্ষণে বলল, 'আমার সম্বন্ধে আপনাদের আলোচনা হয় নাকি?'

'বা রে, আমাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস, আর আপনি এই ওয়েস্টার্ন রিজিওনের বলতে গেলে টপমোস্ট পার্সন। আপনার সম্বন্ধে আলোচনা হবে না!'

মেয়েটা ঠিকই বলেছে। যাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কনসার্ন, সোমনাথ সম্পর্কে তাদের মধ্যে আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক, সে কোনো উত্তর দিল না।

মেয়েটা আবার বলল, 'বম্বেতে আপনি কতদিন আছেন?'

সোমনাথ বলল, 'তিন মাসের মতো।'

'এখানে কোথায় থাকেন?'

'কোলাবায়। মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের অফিসারদের জন্য যে সব ফ্ল্যাট আছে তার একটাতে—'

'এর আগে কোথায় ছিলেন স্যর?'

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল সোমনাথের। নীলাভ সাপের মতো একটি অনাবৃত বাহু সোমনাথের কাঁধের ওপর দিয়ে তার গলা বেষ্টন করল। সেই সঙ্গে সোমনাথ অনুভব করল সাঁচিস্তূপের মতো মেয়েটার বুক তার বাঁ পাঁজরের হাড়ের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। মাখনের পাহাড়ের মতো একটা নীল উলঙ্গ উরু একান্ত অবলীলায় তার কোলের উপর উঠে এল। আর একটা নরম মুখ কাঁধ আর চিবুকের খাঁজের মধ্যে উঠে এসে আটকে রইল। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা নীলাভ চুল থেকে উগ্র গন্ধ উঠে এসে সোমনাথের নাকের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যেতে লাগল। চিবুকে-ঘাড়ে-গলায় মেয়েটার নিশ্বাস পড়ছে তপ্ত লু-বাতাসের মতো। সোমনাথের মনে হতে লাগল, তার রক্তচাপে দ্রুত বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে। এয়ার-কণ্ডিশনড গাড়ির ভেতরেও সে গল গল করে ঘামতে লাগল। নিমেষে তার জামা ভিজে সপসপে হয়ে গেল।

মেয়েটি আদুরে গলায় আবার বলল, 'বললেন না তো স্যর, এর আগে কোথায় ছিলেন?'

সোমনাথের গলার ভেতর থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'দিল্লিতে—' তারপরেই সে মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে নীল সাপের মতো শীতল মসৃণ পিছল একটি শরীর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

সোমনাথ তীক্ষ্ণ চাপা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ড্রাইভার, গাড়ি রুখো— '

গাড়ি থামল না। ঘাড়ের খাঁজ থেকে মেয়েটার গলা বুজগুড়ির মতো ভেসে উঠল, 'ডোন্ট বি সিলি স্যর, বিহেভ লাইক অ্যান ইন্টেলিজেন্ট ম্যান। আপনি হাজার চিৎকার করলেও গাড়ি থামবে না। আর —'

শ্বাসরুদ্ধের মতো সোমনাথ বলল, 'আর কী?'

'আপনি নেমে যাবার চেষ্টা করলে আমাকে কিন্তু চেঁচাতে হবে এবং প্যান্টি আর ব্রা ছিঁড়ে লোকজনকে বলতে হবে আপনি আমাকে রেপ করতে চাইছেন। আপনার মতো একজন দায়িত্বশীল অফিসারের পক্ষে তার ফলাফল কী হতে পারে, ভেবে দেখবেন।'

সোমনাথ বুঝতে পারছিল এই মেয়েটাকে দিয়ে ফাঁদ পেতেছে ধীরাজ দেশাই, আর সেই ফাঁদে সে পা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নাকমুখ দিয়ে আগুনের হলকার মতো ঝাঁঝ বেরিয়ে আসছিল তার। কিভাবে ফাঁদটা কেটে বেরুনো যায়, সে ভাবতে পারছিল না। তবে এটা বুঝতে পারছিল, এখন মাথাটা পুরোপুরি ঠাণ্ডা রাখতে হবে এবং কৌশলে মেয়েটার চোখে ধুলো ছিটিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে সোমনাথ বলল, 'কী যে বল, তোমার মতো প্রেটি ইয়ং গার্লের সঙ্গ ছেড়ে আমি কখনও নেমে যেতে পারি?'

মেয়েটা স্বপ্নময় রঙিন অন্ধকারে ঢেউ তুলে একটু হাসল, 'দ্যাটস লাইক আ গুড বয়।' বলেই ঘাড়ের খাঁজে দীর্ঘ চুমু খেল।

সোমনাথ বলল, 'এতক্ষণ আমরা একসঙ্গে রয়েছি অথচ তোমার নামটাই কিন্তু জানা হয়নি।'

'আমার নাম স্টেলা—'

'আমি সোমনাথ।'

ঘাড়ের ভেতরে থেকে দ্রুত মুখটা তুলে সোমনাথের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল স্টেলা। তারপর বলল, 'সোমনাথ কী? হোয়াটস ইওর সারনেম?'

হঠাৎ কী হল মেয়েটার? তার পদবি জানবার জন্য এত খেপে উঠল কেন? অবাক হয়ে সোমনাথ বলল, 'চ্যাটার্জি।'

পরিষ্কার বাংলা ভাষায় স্টেলা এবার জিগ্যেস করল, 'আপনি বাঙালি?'

'হ্যাঁ, কেন?'

সোমনাথের শরীর থেকে নীল সাপের প্যাঁচ মুহূর্তে খসে গেল। কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল স্টেলা। কোল থেকে মাখনের স্তূপের মতো উরু সরিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে সোমনাথকে দেখতে দেখতে সে বলল, 'কোনোদিন আপনারা কি কসবাতে ছিলেন?'

যে মেয়ের নাম স্টেলা তার মুখে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল সোমনাথ। কসবার নাম শুনে সে হকচকিয়ে গেল। সে শুনেছে খড়ি পেতে কারা যেন ভূ-ভারতের খবর বলে দিতে পারে। স্টেলা কি তাদের কেউ?

রুদ্ধশ্বাসে স্টেলা আবার বলে উঠল, 'আপনার বাবার নাম কি মণিমোহন চ্যাটার্জি?'

বিমূঢ়ের মতো সোমনাথ বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এসব জানলে কী করে? তুমি কে?'

তার কথা যেন শুনতেই পেল না স্টেলা। তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে শোফারকে বলল, 'রুখো—রুখো--'

একটুও শব্দ না করে ইম্পোর্টেড গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেলা সোমনাথকে প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তায় নামিয়ে দিল।

সমস্ত ব্যাপারটা এতই আকস্মিক আর অভাবনীয় যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না সোমনাথ। বিভ্রান্তের মতো সে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। স্টেলা মুখ বাড়িয়ে খুব চাপা গলায় শুধু বলল, 'আমি মল্লিকা—'

মাথার ভেতর একটা শিরা কট করে কেটে গেল যেন। রক্তের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু ঘটে যেতে লাগল। সোমনাথ চিৎকার করে কী বলতে গেল, তার আগেই নিঃশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সেটা চলতে শুরু করেছে। মুহূর্তে অসংখ্য দ্রুতগামী বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট কারের ভিড়ে সেটা মিশে গেল।

যতক্ষণ গাড়িটা দেখা যায়, দাঁড়িয়ে থাকল সোমনাথ। তারপর নিশি-পাওয়া মানুষের মতো ফুটপাথের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

মল্লিকাকে প্রথম কবে দেখেছিল সোমনাথ?

মনে পড়ছে, কসবাতে তাদের প্রকাণ্ড কমপাউন্ডওলা যে তিনতলা বাড়িটা রয়েছে তার ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তখন বিকেল, সময়টা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, অর্থাৎ শীতের আয়ু ফুরিয়ে আসছে।

এখন থেকে পনেরো ষোল বছর আগে কসবার ওদিকটা ছিল খুবই নিরিবিলি, বাড়িঘরের চাইতে ফাঁকা জায়গা বেশি। ডোবা-পুকুর, বাঁশঝাড়, ঝোপজঙ্গল প্রচুর দেখা যেত। ওপরে তাকালে বিশাল নীলাকাশ চোখে পড়ত।

তখন কত আর বয়স সোমনাথের, বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে, রেজাল্ট বেরোয় নি, হাতে তার অঢেল সময়।

শীতশেষের সেই পড়ন্ত বেলায় মাথার ওপর অগুনতি পাখি উড়ছিল। রোদে তখন বাসি হলুদের রং ধরেছে। সূর্যটা কসবার উঁচুনিচু বাড়িগুলোর মাথায় লাল রিবন বাঁধতে বাঁধতে পশ্চিমে নেমে যাচ্ছে।

ছাদের কার্নিসের কাছে দাঁড়িয়ে রোদ, পাখি, লাল টুকটুকে সূর্য দেখতে দেখতে হঠাৎ সোমনাথের চোখে পড়েছিল, তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে মোড়ের মাথার পুরনো নোনা-ধরা একতলা বাড়িটার সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িটার মাথায় প্রচুর মালপত্র —দড়িতে বাঁধা ঢাউস বিছানা, টিনের বাক্স, পোর্টম্যান্ট, খেলো কাঠের টেবল চেয়ার, বেতের ঝুড়ি, বড় আয়না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাড়িটা থামতেই সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে প্রথমে নেমেছিল। তারপর নেমেছিল হাড়-বার-করা, রোগা, অ্যানিমিক চেহারার মধ্যবয়সী একটি মহিলা—খুব সম্ভব মেয়েটির মা। তারও পর আট থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে।

সেই সতেরো আঠারো বছরের মেয়েটা এবার গাড়ির ভেতর থেকে পা-কাটা কোলকুঁজো চেহারার রুগ্ণ একটি প্রৌঢ়কে নামিয়ে এনে প্রায় কোলে করেই একতলা বাড়িটায় রেখে এসেছিল। তারপর কমবয়সি ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে হাতে হাতে ধরাধরি করে যাবতীয় লটবহর ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। সোমনাথ বুঝতে পারছিল, এ বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল। তবে মেয়েটার নাম যে মল্লিকা, সেটা তখন সে জানত না। জানার কথাও নয়। না জানলেও মল্লিকাকে সেই তার প্রথম দেখা।

তারপর রাস্তায় টাস্তায় অনেক বার দেখা হয়েছে মল্লিকার সঙ্গে। কেউ কথা বলে নি, বলার কোনো কারণও ছিল না। তবে মেয়েটা দারুণ সুন্দর, তার চেহারা খুবই আকর্ষণীয়, সে পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ভালো লাগার একটা রেশ অনেকক্ষণ আলতো নেশার মতো সোমনাথের গায়ে জড়িয়ে থাকত।

সে লক্ষ করত, বাড়ির যাবতীয় কাজ করে মেয়েটা। দুধ আনা, বাজার করা, লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন তোলা—হাসিমুখে সব করে যেত। তারপর বিকেল হলেই, পশ্চিমের গাছপালার ওধারে যখন সূর্যটা নেমে যেত সেই সময় দারুণ সেজে হাতে ফ্যাশনেবল লেডিজ ব্যাগ ঝুলিয়ে সোমনাথদের বাড়ির সামনে দিয়ে ওধারের বড় রাস্তায় চলে যেত। তারপর কখন কত রাতে ফিরত, সোমনাথ বলতে পারবে না। তবে পরের দিন সকালেই আবার দেখা যেত, সরকারি মিল্ক বুথ থেকে দুধ আনছে, বাজার করছে কিংবা রেশনের দোকানে লাইন লাগাচ্ছে। ততদিনে তার নামটা জানা হয়ে গেছে সোমনাথের।

মল্লিকারা আসার এক মাস পর সোমনাথের এম. এ'র রেজাল্ট বেরিয়েছিল। সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছে।

মনে আছে, রেজাল্ট বেরুবার দু'দিন পর দুপুরে শোভাবাজারে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল সে। গোটা দুপুর আড্ডা মেরে বিকেলে সে এসেছিল এসপ্ল্যানেডে। এত তাড়াতাড়ি কসবায় ফিরবে, না ভবানীপুরে আরেক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আরেক রাউন্ড আড্ডা জমাবে ভাবছে, সেই সময় মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মেয়েটা। তারপর স্নিগ্ধ হেসে কাছে এসে বলেছিল, 'অভিনন্দন।'

মল্লিকার সঙ্গে আগে অসংখ্য বার দেখা হলেও সেই তার প্রথম কথা বলা। সোমনাথ বলেছিল, 'কিসের অভিনন্দন?'

'আপনি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছেন—সেই জন্যে।'

সোমনাথ অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'আমার রেজাল্টের কথা আপনাকে কে বলল?'

মল্লিকার চোখ দু'টো এতই সুন্দর আর স্বচ্ছ, মনে হয়, সব সময় জলে ধুয়ে আছে। সে বলেছিল, 'আমাদের পাড়ার সবাই বলছে। ভেবেছিলাম, আপনাদের বাড়ি গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আসব।'

'গেলেই পারতেন।'

'সাহস হয় নি।'

'কেন?'

'কে কী ভাববে—'

'কিছুই ভাবত না।'

মল্লিকা উত্তর দেয় নি।

রেজাল্ট বেরুবার পর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, সবাই দারুণ খুশি হয়েছিল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অচেনা একটি মেয়ে এসে এভাবে অভিনন্দন জানাবে, এতটা ভাবা যায় নি। দারুণ ভালো লাগছিল সোমনাথের। সে বলেছিল, 'আপনার কি এখন জরুরি কোনো কাজ আছে?'

কবজি উলটে ঘড়ি দেখতে দেখতে মল্লিকা বলেছিল, 'এখন নেই। তবে ছ'টার পর এক জায়গায় যেতে হবে।

'ছ'টা বাজতে এখনও পঞ্চাশ মিনিট দেরি। তার মধ্যে কোথাও গিয়ে এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে। আপনার আপত্তি নেই তো?'

মল্লিকা জানিয়েছিল, আপত্তি নেই।

ওরা কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে পর্দাঢাকা কেবিনে মুখোমুখি বসেছিল। শুধু চা-ই নয়, যতটা মনে আছে, কাটলেট-টাটলেটের অর্ডার দিয়েছিল সোমনাথ।

খেতে খেতে মল্লিকা বলেছিল, 'আপনি তো আমাদের পাড়ার আইডল।'

'কিরকম?'

'সবার মুখে শুধু আপনারই কথা। ম্যাট্রিক থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটির সব পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছেন। আপনার মতো ছেলে হয় না—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সোমনাথ লাজুক হেসেছিল, 'যত সব আজেবাজে কথা। জানেন—'

মল্লিকা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল, 'কী?'

'প্রথম যেদিন আপনারা এলেন সেদিন আমাদের বাড়িব ছাদ থেকে আপনাকে দেখেছি।'

'তাই নাকি? আমি তো আপনাকে দেখি নি।' মল্লিকা হেসেছিল।

সোমনাথ এবার বলেছিল, 'আপনারা আমাদের পাড়ায় এসেছেন, ইচ্ছে হত আলাপ করব। অনেক বার ভেবেছিও। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'সাহস হয় নি। ভাগ্যিস রেজাল্টটা মোটামুটি খারাপ হয় নি, তাই আলাপ হয়ে গেল।'

এরপর এলোমেলো টুকরো টুকরো কী কথা হয়েছে, এতকাল পর আর মনে নেই।

গল্প করতে করতে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। আচমকা হাতঘড়িটা আরেক বার দেখে সটান উঠে দাঁড়িয়েছিল মল্লিকা। অস্থিরভাবে বলেছিল, 'আমাকে এবার যেতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে উদার হাতে বেয়ারাকে টিপস দিয়ে মল্লিকার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সোমনাথ। বলেছিল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

'আপনিই বলুন।'

'কাল?'

'বেশ। কোথায়?'

'ধরুন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের সামনে—'

'কখন?'

'চারটের সময়।'

'ঠিক আছে।'

একটু ভেবে সোমনাথ এবার বলেছে, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

চমকে তার দিকে ফিরে মল্লিকা বলেছে, 'কেন?'

'তা হলে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি। আমার এখন কোনো কাজ নেই।'

তীক্ষ্ণ চাপা গলায় মল্লিকা বলেছে, 'না না, আমি নিজেই যেতে পারব।' সোমনাথকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দুম করে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে সে উঠে পড়েছিল।

পরের দিন ঠিক চারটেয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের সামনে দেখা হয়েছিল মল্লিকার সঙ্গে। খানিকটা গল্পটল্প করে আগের দিনের মতো ছ'টার সময় চলে গিয়েছিল সে। তবে ঠিক হয়েছিল, পরের দিন আবার তাদের দেখা হবে।

এরপর থেকে সোমনাথরা রোজ বিকেলে কোথাও না কোথাও গিয়ে বসত। কোনোদিন তারা যেত ইডেন গার্ডেনে, কোনোদিন লেকের পাড়ে, কোনোদিন বা ময়দানের মাঝমধ্যিখানে। এর মধ্যে কখন যেন তারা পরস্পরকে 'তুমি' টুমি করে বলতে শুরু করেছে। আর টুকরো-টুকরোভাবে মল্লিকাদের পারিবারিক কিছু কিছু খবর জানতে পেরেছে সোমনাথ। ওর বাবা মার্চেন্ট অফিসের কেরানি ছিল। অ্যাকসিডেন্টে ভদ্রলোকের পা কাটা যাওয়ার পর ওদের খুবই খারাপ সময় চলছে। মল্লিকা আই. এ পর্যন্ত পড়েছিল। ছোটখাটো একটা কাজ করে সে, তার ওপরেই সংসারের সব দায়-দায়িত্ব এসে পড়েছে। কিন্তু সে কী করে, কোথায় তার অফিস, সেটা আর বলে নি। সোমনাথও জিগ্যেস করে নি।

সোমনাথের মনে আছে, অদ্ভুত এক নেশার ঘোরে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল তার। বিকেলের দিকে ময়দানে, ভিক্টোরিয়ার ফুলের বাগানে কিংবা গঙ্গার ধারে মল্লিকার সঙ্গে একবার করে রোজ দেখা না হলে খুব খারাপ লাগত। তবে একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, ছ'টা সাতটার বেশি একদিনও তাকে আটকানো যেত না। মাস দেড়-দুই এভাবে কাটবার পর সোমনাথের ছোট বোন সবিতা—তখন কলেজে পড়ত—হঠাৎ একদিন তাকে ছাদের এক কোণে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'সেজদা, এটা তুই কী করছিস!'

বুঝতে না পেরে সোমনাথ জিগ্যেস করেছিল, 'কী করছি?'

'মল্লিকার সঙ্গে আজকাল নাকি খুব ঘুরে বেড়াচ্ছিস?'

সোমনাথের বুকের ভেতরটা চমকে উঠেছিল। ঢোক গিলে সে বলেছিল, 'কে মল্লিকা?'

সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বরে লম্বা টান দিয়ে সবিতা বলেছিল, 'মল্লিকাকে চিনিস না! আর ভালমানুষ সাজতে হবে না। তুই ক্যাচ হয়ে গেছিস।'

দম-আটকানো গলায় সোমনাথ এবার বলেছে, 'মল্লিকার সঙ্গে বেড়াই—এ খবর'টা কে দিলে?'

'অনিলকাকু।' অনিল ব্যানার্জি সোমনাথের বাবার মামাতো ভাই এবং একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। সবিতা বলে যাচ্ছিল, 'অনিলকাকু আজ সকালে এসে বাবাকে বলছিল, মেয়েটা খুব খারাপ টাইপের। ওর সঙ্গে মেলামেশা করলে বিপদে পড়তে হবে। পুলিশ নাকি ওর ওপর ওয়াচ রাখতে গিয়ে তোকে তার সঙ্গে দেখেছে।'

মল্লিকা সম্বন্ধে এরকম একটা ব্যাপার ভাবা যাচ্ছিল না, সবটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। তবে বাবা তাদের ঘোরাঘুরির কথা জানতে পেরেছেন, সেটা মোটেই সুখবর নয়। বাবা

রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দুর্দান্ত রাশভারি আর রাগী। পুরনো আমলের নীতিটীতি এবং মূল্যবোধ কমা সেমিকোলন পর্যন্ত মেনে চলেন। অবিবাহিত যুবক যুবতীদের অবাধ মেলামেশায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি। ভয়ে ভয়ে সোমনাথ জিগ্যেস করেছিল, 'বাবা কিছু বলেছেন?'

'খুব রেগে আছেন। আমি আগেই জানিয়ে দিয়ে গেলাম। এবার নিজের মুণ্ডু কী করে বাঁচাতে হয়, তুই বুঝবি।'

মনে আছে, সেদিনই বাবার ঘরে ডাক পড়েছিল সোমনাথের। গমগমে ভারী গলায় এজলাসে রায় দেবার মতো করে বাবা বলেছিলেন, 'তোমার সব খবর অনিল দিয়ে গেছে। সে যাক, দিস ইজ মাই ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্নিং. তুমি ওই বাজে মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করবে। শি ইজ আ ব্ল্যাকমেলার। ভালো ফ্যামিলির ছেলেদের সঙ্গে মিশে তাদের সর্বনাশ করে। আশা করি দিস উড বি এনাফ ফর ইউ।'

সোমনাথ ঘাড় নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল। কোনোদিন বাবার মুখের ওপর চোখ তুলে সে কথা বলে নি। কিন্তু তার মনে হয়েছিল, একটি গরিব অসহায় মেয়ের ওপর অকারণে অন্যায় করা হচ্ছে। বাবা বলার পরও সে মল্লিকার সঙ্গে দেখা করেছে। মেয়েটার আকর্ষণ এমনই অপ্রতিরোধ্য যে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। তা ছাড়া এই দেখা করাটা ছিল বাবার বিরুদ্ধে তার প্রোটেস্ট। তবে মল্লিকাকে পুলিশের কথাটা সে বলতে পারে নি।

দু'দিন বাদে বাবার ঘরে আবার তার ডাক পড়েছিল। বাবার দিকে সেদিন তাকানো যায়নি। তাঁর মুখ-ঘাড়-গলা টকটকে লাল। মনে হচ্ছিল, তাঁর রক্তচাপ একটা বিপজ্জনক সীমানায় পৌঁছে গেছে। তিনি প্রচণ্ড গম্ভীর গলায় শুধু বলেছিলেন, 'এম. এ পাস করে তোমার যে ডানা গজাবে, ভাবতে পারিনি। মনে রেখো, তোমার প্রতিটি স্টেপের খবর আমি রাখছি। কিভাবে মেয়েটার সঙ্গে তোমার মেলামেশা বন্ধ করা যায় দেখছি। ইউ মে গো নাউ—'

পরের দিন সকালে কে যেন খবর দিয়েছিল, মল্লিকাদের বাড়ি পুলিশ এসেছে। শোনামাত্র সোমনাথ ছুটে গিয়েছিল। একজন জুনিয়র অফিসার তখন মল্লিকাকে বলছিল, 'বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এই লোকালিটি ছেড়ে যেতে হবে।'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো হঠাৎ চিৎকার করে সোমনাথ বলোছিল, 'কেন, কেন যাবে? কী অন্যায় ওরা করেছে?'

যুবক পুলিশ অফিসারটিকে সোমনাথ চেনে। সে বলেছিল, 'ওঁর প্রফেশন সম্বন্ধে আমাদের কাছে অনেক সেনসেশানাল খবর আছে। তা ছাড়া এখানকার বাসিন্দারা চায় না এঁরা এখানে থাকুন। এই দেখুন এঁর বিরুদ্ধে কত লোক সিগনেচার দিয়েছে।' বলেই এক টুকরো কাগজে মল্লিকাদের পাড়া থেকে তুলে দেওয়ার আবেদন এবং তার তলায় অনেকগুলো নামের স্বাক্ষর দেখিয়েছিল। প্রথম স্বাক্ষরটি সোমনাথের বাবার।

সোমনাথ বলেছিল, 'ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন, এঁদের ওপর কিন্তু খুবই ইনজাসটিস হচ্ছে।' বলেই লক্ষ করেছিল কৃতজ্ঞ চোখে মল্লিকা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পুলিশ অফিসারটি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সোমনাথের বাবা হঠাৎ সেখানে এসে হাজির। কঠোর গলায় তিনি ছেলেকে বলেছিলেন, 'তোমার জন্যে একটা নোংরা জায়গায় আমাকে আসতে হল। মনে হচ্ছে, আমি আত্মহত্যা করি। একটা ডার্টি উম্যানকে তুমি ডিফেন্ড করছ!'

সোমনাথের হাত-পা উত্তেজনায় কাঁপছিল। দুর্বল গলায় সে বলল, 'কিন্তু বাবা—'

আচমকা ওধার থেকে মল্লিকা বলে উঠেছিল, 'এরা যা বলছেন, আমি তা-ই। খুবই খারাপ মেয়ে। তুমি যাও সোমনাথ, আমার ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে।'

সোমনাথ এবার কী বলবে ভেবে পায় নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। তার দু'দিন বাদে ঘোড়ার গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে মল্লিকারা কসবা ছেড়ে চলে গেছে। তারপর ওকে অনেক খুঁজেছে সোমনাথ, কোথাও পায় নি।

দেখতে দেখতে পনেরো ষোলটা বছর কেটে গেছে। এম. এ'র পর কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে কমার্স মিনিস্ট্রিতে বড় চাকরি পেয়েছে সোমনাথ। সঙ্গে সঙ্গে বিয়েও করেছে, তারপর এক বছর দু'বছর পর পর একটা করে প্রোমোশন পেয়ে এখন সে ওয়েস্টার্ন রিজিওনে এসেছে। দু'টি ছেলেমেয়ে, সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে তার সুখের সংসার। সে দায়িত্বশীল অফিসার, পরিতৃপ্ত ফ্যামিলি-ম্যান।

কিন্তু এতকাল বাদে এভাবে আরব সাগরের পাড়ের এই শহরে মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল! আর দেখাই যখন হল এবং পরিচয়ও পাওয়া গেল তখন একটা কথাও বলা গেল না তার সঙ্গে। অদ্ভুত এক বিমূঢ়তার মাঝখানে তাকে ছুড়ে দিয়ে চলে গেছে মল্লিকা।

পরের দিন দুপুরবেলা অফিসে একটা ফাইল দেখছিল সোমনাথ, হঠাৎ ফোন এল। রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই ওধার থেকে একটি মেয়ের গলা ভেসে এল, 'মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সোমনাথ বলল, 'বলুন—'

'আমি মল্লিকা —'

সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের কষে-বাঁধা ছিলার মতো স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গেল সোমনাথের। অসহ্য এক উত্তেজনা, নাকি অস্থিরতা, তার ওপর ভর করল। ফোনটা প্রায় মুখে লাগিয়ে কাঁপা গলায় সে বলল, 'কোত্থেকে ফোন করছ?'

'কুড়ি মাইল দূর থেকে—'

'একবার কি আমার এখানে আসা যায় না?'

'না।'

'তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করছে। কসবা ছেড়ে পনেরো ষোল বছর আগে তোমরা কোথায় গেলে?'

বিষণ্ণ হাসল মল্লিকা, 'কী হবে সে-সব জেনে?'

দারুণ আগ্রহের গলায় সোমনাথ বলল, 'না না, তুমি বল। জানো, তোমাকে অনেক খুঁজেছি। কোথাও পাই নি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করছি। না পেয়ে ভালোই হয়েছে।' বলেই একটু থামল মল্লিকা। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'কসবা থেকে আমরা বাগবাজার চলে গিয়েছিলাম। তারপর এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে বম্বে এসেছি।'

'তোমার মা-বাবা-ভাইবোনরা কেমন আছে?'

'বাবা মারা গেছে। দু'টো বোনের বিয়ে দিয়েছি। একটা ভাই কলকাতায় মস্তান হয়েছে, আরেকটা ভাই কোচিনে স্মাগলিং করছে। মা আমার কাছে বম্বেতে আছে। আমি কী করছি জিগ্যেস করলে না তো?'

সোমনাথ জড়ানো গলায় যা বলল, তার কিছুই বোঝা গেল না।

শব্দ করে হাসল মল্লিকা। বলল, 'কলকাতায় থাকতে যা ছিলাম, এখনও তাই আছি। আমি ব্ল্যাকমেলার। কলকাতায় ছোট র‍্যাকেটে ছিলাম, এখানে এসে বড় র‍্যাকেটে ঢুকেছি। বদমাশগুলো আমাকে দিয়ে তোমার মতো লোকদের ফাঁদে ফেলে নানারকম সুবিধা আদায় করে। বাবার চাকরি যাওয়ার পর সেই যে গলায় ফাঁস আটকেছে, আর সেটা খুলতে পারলাম না। এ জীবনে পারবও না বোধ হয়।'

'একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কী?'

'কাল আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'একটা প্রাইভেট ক্লাবে। সেখানে আমি তোমার সঙ্গে নানারকম কাণ্ড করতাম। কী করতাম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আর এই সব অ্যাকটিভিটির সময় গোপনে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রাখা হত। সেই ছবি ডেভলাপ করিয়ে ধীরাজ দেশাই তোমাকে দেখাত এবং বলত, লাইসেন্সের ব্যাপারে সুবিধা করে দাও। তুমি কী করতে সেটা অবশ্য তোমার ব্যাপার। তবে একটু সাবধান করে দিচ্ছি, চারপাশে ধীরাজের মতো সাপ ঘুরছে। বী কেয়ারফুল।'

একটু চুপ করে থেকে সোমনাথ এবার বলল, 'একটা কথা—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে অন্তর্যামীর মতো মল্লিকা বলল, 'তুমি কী বলবে জানি। কাল তোমাকে হঠাৎ ওভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম কেন, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'যখন গাড়িতে উঠেছিলে জানতাম না, তুমিই সোমনাথ। চেহারা তোমার বদলে গেছে, বেশ মোটা হয়েছ। যখন জানলাম তখন না নামিয়ে উপায় ছিল না।'

'কেন?'

'আর কিছু জিগ্যেস করো না।'

'ধীরাজ দেশাইকে কী কৈফিয়ৎ দিয়েছ?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই।'

'আচ্ছা—'

'বল।'

'তুমি তো জানতে আমার বাবাই তোমাদের নানা কায়দা করে তোমাদের কসবা থেকে তুলে দিয়েছিলেন?'

'জানতাম।'

'তারপরেও আমাকে ছেড়ে দিলে? আমার বাবা এখনও জীবিত, আমার নামে স্ক্যান্ডাল রটিয়ে তাঁকে তো শেষ করে দিতে পারতে।'

মল্লিকার হাসির শব্দ ভেসে এল। তারপরই গভীর, গাঢ় গলায় সে বলল, 'আমি এও তো জানি তুমি কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে আমার অনেক কাছে এসেছিলে। সবাই যখন আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাইছে তখন তুমিই রুখে দাঁড়িয়েছিলে। আমার জন্য কেউ এভাবে ভাবে নি সোমনাথ—'

দুরন্ত ঢেউ-এর মতো এক আবেগ সোমনাথকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। সে বলল, 'তুমি কি আমাকে, তুমি কি আমাকে—'

মল্লিকা বলল, 'চুপ কর সোমনাথ, আমি খুব খারাপ মেয়ে। আমাকে স্বপ্ন দেখানো কি তোমার উচিত?'

'তোমার সঙ্গে আর একবার কি দেখা হতে পারে? ধর, আজ-কাল-পরশু—যে কোনোদিন, যে কোনো জায়গায়?'

'তুমি অনেস্ট অফিসার, রেসপনসিবল ফাদার, হ্যাপি হাজব্যান্ড। আজ-কাল-পরশু, কোনোদিনই পৃথিবীর কোনো জায়গায় আমাদের দেখা হবে না।'

সোমনাথ তবু কী বলতে যাচ্ছিল, ওধার থেকে লাইনটা কেটে দিল মল্লিকা।

শমিতার উপাখ্যান

অন্য দিনের মতো আজও খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শমিতার। ছোটবেলায় ভীষণ ঘুমকাতুরে ছিল সে কিন্তু মর্নিং স্কুল থাকত বলে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই মা ডাকাডাকি করে তাকে জাগিয়ে দিতেন। ক্লাস থ্রিতে ওঠার পর আর ডাকতে হত না। স্বয়ংক্রিয় কোনো নিয়মে সে নিজেই জেগে যেত। এটাই ক্রমশ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

আজ ঘুম ভাঙলেও বিছানা থেকে ওঠার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না শমিতার। ডাবল লেপ আর একটা জাপানি কম্বলের তলায় বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে আধখানা বৃত্তের আকারে বেলা ন'টা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে সে। ইদানীং মাসখানেক ধরে এমনটাই চলছে।

সময়টা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। ঋতুচক্রের হিসেব অনুযায়ী শীতের তীব্রতা এখন কমে আসার কথা। কিন্তু হিমালয়ের কাছাকাছি বলে চা-বাগানে ঘেরা এই শহরটায় সে নিয়ম খাটে না। সেই যে নভেম্বরের গোড়ার দিকে এখানে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছিল, এই ফেব্রুয়ারিতে সেটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

লেপ-কম্বলের উষ্ণতার মধ্যে শমিতা যে বেলা ন'টা পর্যন্ত কুঁকড়ে পড়ে থাকে তার একমাত্র কারণ উত্তরবঙ্গের শীতই নয়, আসলে মাসখানেক আগে তার এম. এ ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে ওঠার কোনো তাড়াই নেই। এখন সে পুরোপুরি চাপমুক্ত। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে, ঘোর আলস্যে, সময়কে যেভাবে খুশি অপচয় করলে কারুর আপত্তি হবে না।

চাপ না থাকলেও সামান্য একটু দুশ্চিন্তা রয়েছে শমিতার। তার বয়স এখন চব্বিশ। মায়ের ইচ্ছে, এ বছরই তার বিয়েটা হয়ে যাক। শমিতা তা চায় না। তার ধারণা এম. এ-তে রেজাল্ট ভালো হবেই। তারপর বছর দুই রিসার্চ করার পর বিয়ের কথা ভাবা যেতে পারে, কিন্তু মা কিছুতেই শুনতে চাইছেন না। তাঁর এক বান্ধবীর ছেলে আদিত্যকে মায়ের ভীষণ পছন্দ। ছেলেটি কলকাতায় একটা বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মের একজিকিউটিভ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদিত্যর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে মা কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে চান। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে তার প্রচুর অশান্তি হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁকে টলানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে রেজাল্ট বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে বিয়েটা কী করে দু'বছর পিছিয়ে দেওয়া যায় তার একটা স্ট্র্যাটেজি ভেবে বার করতে হবে। তবে মাকে ঠেকানো যাবে কিনা সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নয় শমিতা। অবশ্য মায়ের দিক থেকে ভাবলে তিনি যেটা চাইছেন সেটা অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার বাবা একজন বিখ্যাত মানুষ এবং এখনও জীবিত, সারা

দেশের কাছে তিনি এক পরমাশ্চর্য কিংবদন্তির নায়ক, কিন্তু তাঁর সঙ্গে শমিতার কোনো সম্পর্ক নেই। বাইশ বছর আগে মায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সে আর মা ছাড়া পৃথিবীতে তাদের আর কেউ নেই। মায়ের শরীর স্বাস্থ্যও কিছুদিন ভালো যাচ্ছে না। এমনিতে তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস কিন্তু বছরখানেক ধরে অদ্ভুত একটা ভীতি বা আশঙ্কা তাঁর মাথায় ফিক্সেশানের মতো আটকে আছে। মায়ের ধারণা বেশিদিন আর বাঁচবেন না, মৃত্যুর আগে মেয়ের জীবন এবং ভবিষ্যৎ তিনি সুরক্ষিত করে দিয়ে যেতে চান। শমিতা যে ঘরটায় শুয়ে আছে, তারপরেই লম্বা একটা হল। সেটার একদিকে চেয়ার-টেবল পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা, আরেক দিকে সোফা, ডিভান, সেন্টার টেবল আর টিভি দিয়ে সাজানো লিভিং রুম। হলটার উলটোদিকে মায়ের বেডরুম, তার পাশে স্টোর, কিচেন, বাথরুম এবং তাদের কাজের মেয়ে লক্ষ্মীদির জন্য মাঝারি মাপের একটা ঘর। সব মিলিয়ে বাংলো টাইপেব এই একতলাটা মায়ের কোয়ার্টার। তার মা নিরুপমা দত্ত এখানকার গোল্ডেন ভ্যালি টি গার্ডেনসের হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস।

শুয়ে শুয়ে শমিতা লিভিং রুমে চেনা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তার মতো নিরুপমারও খুব ভোরে ঘুম ভাঙে। কিন্তু একবার জেগে গেলে তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন না। ভোর থেকে রাতে শোওয়ার আগে পর্যন্ত সময়টা তাঁর নির্দিষ্ট একটা রুটিনে বাঁধা। ঘুম থেকে উঠে প্রথমে তিনি যান বাথরুমে। মুখটুখ ধুয়ে বাসি পোশাক পালটে চলে আসেন লিভিং রুমে। টিভির সামনে বসে দিনের প্রথম সংবাদ পাঠের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। লক্ষ্মী এর মধ্যেই এক কাপ চা দিয়ে যায়। চা খেতে খেতে খবর শোনার পর স্কুলে যে ক্লাসগুলো নেবেন, ঘণ্টা দুই তার জন্য পড়াশোনা করে নেন। জোড়াতালি দিয়ে, যেমন তেমন করে ক্লাস নিয়ে ছাত্র ঠকানোর কৌশলগুলো এখনও তিনি রপ্ত করতে পারেননি। এ জীবনে তা আর সম্ভব হবে না। পড়াটড়া হয়ে গেলে স্নান খাওয়া সেরে স্কুলে। বিকেলে ফিরে এসে আধঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর খানিকক্ষণ বাইরে গিয়ে হাঁটাহাঁটি। সূর্যাস্তের পব বাড়ি ফিরে টিভিতে পর পর দিল্লির হিন্দি সমাচার, ইংরেজি নিউজ এবং কলকাতার বাংলা সংবাদ শুনবেনই। যদি ভালো কোনো সিরিয়াল থাকে তাও মাঝে মধ্যে দেখেন। তবে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাব খাতা থাকলে খবর ছাড়া আর সব বন্ধ। রাত্তিরে দশটায় ডিনার সেরে ঘুম। অবশ্য তার আগে কলকাতা থেকে মফস্বল এডিশানের যে বাংলা কাগজটা আসে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নেন। মায়ের দৈনন্দিন জীবনযাপনের এই ছকটা কতকাল ধরে দেখে আসছে শমিতা। এ সব তার মুখস্থ। সারা পৃথিবীর নানা খবর জানাটা মায়ের কাছে প্রচণ্ড নেশার মতো ব্যাপার। দিনরাত টিভি দেখে আর খবরের কাগজ পড়ে মস্তিষ্কে অজস্র তথ্যের একটা সংগ্রহশালা বসানোর মধ্যে কী মজা থাকতে পারে, ভেবে পায় না শমিতা। দেশ-বিদেশের অত খবর কী দরকার? যেটুকু জরুরি তার বাইরে বাড়তি আর কিছু জানতে চায় না সে। আসলে মস্তিষ্ককে যতটা ভারমুক্ত রাখা যায়।

অনেকক্ষণ মায়ের সাড়াশব্দ নেই। টিভিটাও যে চলছে না তা বোঝা যায়। তবে রান্নাঘরের দিক থেকে কাপ প্লেট আর চামচ নাড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। তার মানে লক্ষ্মীদি মায়ের জন্য চা করছে। টি-গার্ডেনে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিলেও চা খুব একটা পছন্দ করে না শমিতা। বিকেলে এক কাপ পেলেও চলে, না পেলেও আপত্তি নেই।

কী ভেবে লেপ-কম্বলের তলা থেকে মুখটা একবার বার করল শমিতা। বাঁ পাশ ফিরে শুয়েছিল সে। ওধারের জোড়া কাচের জানালাটার পরদা কাল ভালো করে টেনে দেয়নি লক্ষ্মীদি, খানিকটা ফাঁক থেকে গেছে। সেখান দিয়ে বাইরে যতদূর চোখ যায় গাঢ় কুয়াশায় সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দু-আড়াই ঘণ্টার আগে এই কুয়াশা কাটবে না। এবার ডান

পাশে হল-ঘরটার দিকে মুখ ফেরায় শমিতা। তার বেডরুমের ওধারে দরজাটা রাতে খোলাই থাকে। পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় সেজন্য হল-ঘরের আলো জ্বালেননি নিরুপমা। আবছা অন্ধকারে অলৌকিক কোনো সিলুয়েট ছবির মতো কোলের ওপর দুই হাত রেখে চুপচাপ বসে আছেন তিনি। কিচেনটা কোণের দিকে বলে লক্ষ্মীকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

শমিতা কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর মুখের ওপর লেপ টেনে দেয়। চিরকাল মুড়ি দিয়ে শোওয়ার অভ্যাস তার। কতক্ষণ বাদে শমিতার খেয়াল নেই, হঠাৎ টিভি চলার আওয়াজ ভেসে আসে। দিল্লির হিন্দি সংবাদ-পাঠিকার ভরাট, সুরেলা কণ্ঠস্বর টুকরো টুকরোভাবে শুনতে পায় সে। তালিবানদের সঙ্গে দোস্তম বাহিনীর মরণপণ লড়াই .... অন্ধ্রে ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্রগামী বহু জেলে নৌকো নিখোঁজ .... গডম্যান চন্দ্রস্বামীর জামিন না-মঞ্জুর, এমনি নানা খবরের পর কাল মাঝরাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বিখ্যাত .... দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিং হোমে .... ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে .... ভোর পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি .....'

বিখ্যাত ব্যক্তিটি কে, সংবাদ-পাঠিকা নিশ্চয়ই তাঁর নাম বলেছেন কিন্তু শমিতা শুনতে পায়নি। কিংবা খেয়াল করেনি। কলকাতায় কত নাম-করা লোকই তো হার্ট অ্যাটাক, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ বা মারাত্মক ক্যান্সারের শিকার হয়ে রোজ নার্সিং হোমে ভর্তি হচ্ছেন। খবরের কাগজ, টিভি বা রেডিও অনবরত এঁদের সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে সারা দেশকে উৎকণ্ঠায় রাখেন। কিন্তু তার এবং নিরুপমার ব্যাপারে যা জরুরি নয় তা নিয়ে মাথা ঘামায় না শমিতা। মেয়েটার ভেতর আবেগহীনতার মতো কিছু একটা আছে। সংবাদ-পাঠিকা একটু আগে কলকাতায় যে খ্যাতিমান মানুষটির কথা বললেন তাঁর নাম না-জানার জন্য তার আক্ষেপ নেই।

কিন্তু হঠাৎ লিভিং রুম থেকে নিরুপমার চাপা, আর্ত কণ্ঠস্বর কানে আসে। সেই সঙ্গে অস্পষ্ট কান্নার মতো আওয়াজ।

শমিতার প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হল— বিস্ময়। নিরুপমাকে পৃথিবীর আর সবার চেয়ে সে অনেক বেশি করে চেনে। তার এই মা'টি ধীর, স্থির এবং ভীষণ চাপা ধরনের। আনন্দ, দুঃখ, ক্রোধ বা উত্তেজনা, তাঁর ভেতরে কখন কী চলে, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। সমস্ত রকম উচ্ছ্বাস বা আবেগকে অসীম কর্তৃত্বে তিনি দমিয়ে রাখতে জানেন, কখনই সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটতে দেন না। একমাত্র শমিতাই তাঁর নিরুচ্ছ্বাস মুখচোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে তিনি কতটা উত্তেজিত বা কতটা খুশি। সেই মা কাঁদছেন, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হল তার। সে কি ভুল শুনেছে? কিন্তু না, কান্নাটা চলছেই, যদিও আগের চেয়ে আরো অস্পষ্ট। এর কারণ কী হতে পারে, কিছুতেই ভেবে পায় না শমিতা। খানিকটা হতবুদ্ধির মতো লেপটেপ সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে সে। এতক্ষণে বাইরের কুয়াশা অনেকটাই কেটে গেছে। যেটুকু আছে, মিহি সিল্কের ওড়নার মতো চারিদিকের বাড়িঘর, চা-বাগান, আকাশ— সমস্ত কিছুর গায়ে লেপটে রয়েছে। রোদ উঠতে শুরু করেছে। সোনালি আলোয় ভরে যাচ্ছে হিমঋতুর সকাল। শীতের সময়, রাতে শোওয়ার আগে বিছানায়, মাথার কাছে একটা উলের চাদর যত্ন করে রেখে দেয় শমিতা, যাতে সকালে উঠে খোঁজাখুঁজি করতে না হয়। কাল রাতেও ওটা রেখেছিল। দ্রুত চাদরটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে হল-ঘরে চলে আসে সে। নিরুপমা সেই একইভাবে সোফায় বসে আছেন। গায়ে একটা শাল রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা ডান পাশের কাঁধ থেকে আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। হাতদু'টো তেমনই কোলের ওপর জড়ো করা। পার্থিব কোনো ব্যাপারেই বুঝিবা তাঁর খেয়াল নেই। আধবোজা চোখ থেকে সরু ফ্রেমের চশমার তলা দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে যাচ্ছে। টিভিটা এখন চলছে না। খুব সম্ভব খবরের পর ওটা বন্ধ করে দিয়েছেন নিরুপমা। নিচু সাইড টেবলে চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। লক্ষ্মীকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না। মাকে চা দিয়ে সে হয়তো বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে নিরুপমাকে কয়েক পলক লক্ষ করে শমিতা। তার বাহান্ন বছর বয়সের এই জননীটি এখনও বেশ সুশ্রী। গায়ের রং একটু চাপা ঠিকই, কিন্তু শরীরের গড়নটি চমৎকার। এই বয়সেও এক ফোঁটা মেদ জমেনি, মসৃণ ত্বক, লম্বাটে নিটোল মুখমণ্ডল, পাতলা টান টান নাক, চোখদু'টো শালিকের চোখের মতো কাজল-পরা। মাথাভর্তি অজস্র কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে সময়ের অদৃশ্য মেক-আপ ম্যান নিঃশব্দে ব্রাশ চালিয়ে কিছু কিছু রুপোলি ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে ঠিকই, তবু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও যৌবনের শেষ রশ্মিগুলোকে নিজের শরীর থেকে এখনও বিলীন হয়ে যেতে দেননি। আগে যখনই মায়ের দিকে তাকিয়েছে, শমিতা ভেবেছে, এই ম্যাজিকটা কী করে সম্ভব হল? কিন্তু আজ সেদিকে একেবারেই নজর নেই তার।

নিরুপমার চোখ থেকে যে জলবিন্দুগুলো ঝরে পড়ছে, একদৃষ্টে সে তাই দেখে চলেছে।

চব্বিশ বছরের জীবনে কখনও মাকে আগে কাঁদতে দেখেছে কি শমিতা? মনে পড়ল না। খুব ছোটবেলায় বুঝতে পারত না, বড় হওয়ার পর বাবার সঙ্গে যখন বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা জানতে পারল, জানতে পারল পৃথিবীতে তাদের আর কেউ নেই, তখনও মাকে কোনোদিন আজকের মতো এমন ভেঙে পড়তে দেখেনি। পায়ে পায়ে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় শমিতা। খুব আস্তে ডাকে, 'মা----'

নিরুপমা চকিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকান। যেন অতি গোপন কিছু ধরা পড়ে গেছে, সেভাবে অসীম সংকোচে দ্রুত চশমা খুলে চোখ মুছে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে ধরা ধরা, ঝাপসা গলায় বলেন, 'কী বলছিস?'

'কী হয়েছে?'

'কই, কিছু না।'

'তবে কাঁদছিলে কেন?'

'কোথায় আবার কাঁদলাম?'

স্থির দৃষ্টিতে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে শমিতা বলে, 'তুমি আমাকে বলবে না মা?'

শমিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিলেন না নিরুপমা। মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলেন, 'কিছু হলে তো বলব।' একটু থেমে ফের বলেন, 'এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লি কেন? যা, শুয়ে থাক গিয়ে।'

নিরুপমার কাঁধে একটা হাত রেখে গভীর গলায় শমিতা বলে, 'মা, আমার দিকে তাকাও।'

মুখটা সামান্য তুলেই নামিয়ে নেন নিরুপমা। বলেন, 'বল কী বলবি—'

'তুমি তো আমার কাছে কখনও কিছু লুকোও না। কোনো কারণে তুমি কষ্ট পেলে আমার মন কিরকম খারাপ হয়ে যায় সে কি তোমার জানা নেই?'

নত চোখে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন নিরুপমা। একসময় বলেন, 'আমার মুখ থেকে নাই বা শুনলি। পরে সবই জানতে পারবি।' বলেই আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে যান।

মা যে তাঁর সঙ্গোপন কষ্টের কথা নিজের থেকে বলবেন না, সেটা বোঝাই গেছে। না বললে কষ্টটা কিসের, সে জানবে কেমন করে? বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হল-ঘরের শেষ মাথায় দেওয়াল জোড়া কাঠের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় শমিতা। কখন যেন লক্ষ্মী ভারি পরদা সরিয়ে জানালার দু-একটা পাল্লা খুলে দিয়ে গেছে। দূরমনস্কর মতো সামনের দিকে তাকায় সে। বাইরে এক দিকে পাহাড়ের ঢালে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগান। আরেক দিকে গোল্ডেন ভ্যালি টি গার্ডেনগুলোর নানা কর্মচারীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী কাঠ আর ইটের তৈরি ছোট-বড় কোয়ার্টার। এ ছাড়া স্কুল-বিল্ডিং, চা-বাগানের অফিস, বাজার

ইত্যাদি। পিকচার পোস্টকার্ডে স্বপ্নের মতো অলৌকিক যে সব শহরের ছবি ছাপা থাকে, গোল্ডেন ভ্যালি টি গার্ডেনসের এই টাউনশিপ অনেকটা সেইরকম। ইংরেজ আমলে বানানো এই শহরের আভিজাত্য আর মর্যাদা খানিকটা খোয়া গেলেও এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

শমিতা চা বাগান টাগানের দিকে তাকিয়েই ছিল শুধু, কিন্তু চারিদিকে পরমাশ্চর্য দৃশ্যাবলির কিছুই যেন সেভাবে তার চোখে পড়ছিল না। হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে যে কনকনে উত্তুরে হাওয়া মুখের ওপর চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে, সেদিকেও তার এতটুকু খেয়াল নেই। আসলে মায়ের চিন্তাটা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হঠাৎ শমিতার মনে হল, খানিক আগে টেলিভিশনের খবর শোনার পর থেকেই মা ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু দিল্লি থেকে প্রচারিত হিন্দি সমাচারে কী এমন থাকতে পারে যা উত্তরবঙ্গের একজন শান্ত, সংযত, শ্রদ্ধেয় বাঙালি মহিলাকে কয়েক মিনিটের ভেতর পুরোপুরি তছনছ করে দিয়েছে? হিন্দি সমাচারের খবরগুলো বার বার মনে করার চেষ্টা করল শমিতা কিন্তু তেমন কোনো জোরাল হেতুই খুঁজে পাওয়া গেল না।

নিরুপমা বলেছেন, তাঁর কষ্টের কারণটা শমিতা নিজেই জানতে পারবে। কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। জানালার কাছ থেকে নিজের ঘরে ফিরে এল সে। এখান থেকে হল-ঘরের ওধারে মায়ের বেডরুমের একটা অংশ দেখা যায়। শমিতা লক্ষ করল, নিরুপমা তাঁর বিছানায় দু'টি হাঁটুর ওপর কপাল রেখে আচ্ছন্নের মতো বসে আছেন। একটুক্ষণ তাঁকে দেখে বাথরুমে ঢুকে পড়ল সে। মুখটুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতে না আসতেই লক্ষ্মী এসে হাজির। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাঝারি হাইট। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তার মজবুত শরীর। চৌকো ধরনের মুখ। তার চেহারায় নারীসুলভ লাবণ্যের চেয়ে জবরদস্ত পুরুষালি ভাবটাই বেশি। দু দু'বার বেশ ঘটা করে তার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু কোনোটাই বেশিদিন টেকেনি। লক্ষ্মীর দুই স্বামীই ছিল অতীব হারামজাদা। প্রথমটা যেমন মাতাল তেমনি রগচটা, পান থেকে চুন খসলে তাকে বেদম ঠেঙাত। এলোপাথাড়ি মারতে মারতে নাকমুখ দিয়ে একেক দিন রক্ত বার করে দিত। গোড়ার দিকে মুখ বুজে থাকলেও সহ্যের তো একটা সীমা আছে। বিয়ের মাসতিনেক পরে থেকে সে রুখে দাঁড়িয়ে পালটা মার দিতে শুরু করল। শক্তিটা তার গায়েও খুব একটা কম নেই। নিয়মিত যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে আরো কয়েকটা মাস অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় কাটাল তারা। তারপর একজনের হাঁটু আর কোমরের হাড় যখন ভাঙল এবং আরেক জনের মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধল, পাড়াপড়শিরা এসে বললে, বিয়ের সুখ ঢের ভোগ করেছ, এবার দু'জনে ফারাক হয়ে যাও। নইলে কেউ একজন খুন হয়ে যাবে। পড়শিদের এই রায় দু'জনেই মেনে নেয়।

কাটান ছাড়ানের তিন বছর পর লক্ষ্মীর দ্বিতীয় বার বিয়ে। আগের বিয়ের মতো এখানে মারদাঙ্গা জাতীয় সামরিক ব্যাপার ছিল না। লক্ষ্মীর দু নম্বর স্বামীটি ছিল ছিঁচকে চোর। একদিন রাত্তিরে তার সোনাদানা, টাকাপয়সা, বাসনকোসন, সব হাতিয়ে নিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। তারপর থেকে বিয়ে ব্যাপারটার ওপর প্রচণ্ড ঘেন্না ধরে গেছে লক্ষ্মীর। তার বাপ-মা নেই, একমাত্র ভাই কোনোরকম সম্পর্ক রাখে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে পিছুটান বলতে কিছু নেই। দু নম্বর বিয়েটা নষ্ট হওয়ার পর নানা জায়গায় ভাসতে ভাসতে শমিতাদের কাছে এসে ঠেকেছে সে। পাঁচ বছর ধরে এখানেই আছে। শমিতারাই তার সব।

লক্ষ্মী বলে, 'তোমার খাবার দিয়ে যাব?'

নিরুপমা ছুটির দিন ছাড়া ব্রেকফাস্ট করেন না। স্রেফ দু'খানা বিস্কুট আর এক কাপ চা। আজ স্কুল আছে। সকালের খাবারটা শমিতাকে একা একাই খেতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার খাওয়ার এতটুকু ইচ্ছা নেই। সে বলে, 'পরে খাব।'

লক্ষ্মী বলে, 'আমি কিন্তু এখন বাজারে যাব। অনেক কেনাকাটা আছে। ফিরতে একটু দেরি হবে।'

লক্ষ্মী বাড়ির সব কিছু সামলায়। বাজারহাট, রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, এমনকি কাপড় কাচা পর্যন্ত একা নিজের হাতে করে থাকে। শমিতা বলে, 'ঠিক আছে।'

লক্ষ্মী বলে, 'রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গেলাম। খিদে পেলে খেয়ে নিয়ো।'

'আচ্ছা—'

লক্ষ্মী চলে যায়।

চা-বাগানের এই শহরে শমিতার প্রচুর বন্ধু। কয়েকজন তার মতোই এবার এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে। অন্য দিন এই সময়টা এদের কারুর না কারুর বাড়ি গিয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে আসে। কিন্তু আজ আর বেরুতে ইচ্ছা করল না। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পাশের সাইড টেবল থেকে একটা রঙিন ফিল্ম ম্যাগাজিন তুলে পাতা ওলটাতে লাগল। সময় কাটানোর জন্য এই সব ম্যাগাজিন মন্দ নয়। পাতায় পাতায় হিন্দি সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের দারুণ দারুণ সব ব্লো-আপ ছবি, সেই সঙ্গে 'পরদা কা পিছে' জাতীয় নানা রকমের রগরগে কেচ্ছার মুচমুচে বিবরণ। শমিতা পাতার পর পাতা উলটে যাচ্ছে ঠিকই, চোখের সামনে দিয়ে চিত্রতারকাদের আশ্চর্য মোহময় সব শরীর রঙিন ঝলকের মতো একের পর এক বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। সমস্ত স্নায়ু টানটান করে মায়ের জন্য সে অপেক্ষা করছে। এরপর নিরুপমা কী করবেন, তার জানা নেই। বুকের ভেতর তীব্র উৎকণ্ঠা অনুভব করতে থাকে শমিতা। কতক্ষণ বাদে তার খেয়াল নেই, হঠাৎ টিভির আওয়াজ আবার ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে শমিতা টের পায়, সকালে হিন্দি সমাচারের পর এখন ইংরেজি নিউজ শুরু হয়েছে দিল্লি থেকে। চোখের সামনে থেকে ফিল্ম ম্যাগাজিনটা সরাতেই তার চোখে পড়ে ঘণ্টাখানেক আগের মতো নিরুপমা লিভিং রুমে সোফার ওপর একই ভঙ্গিতে কোলের ওপর দুই হাত জড়ো করে রুদ্ধশ্বাসে খবর শুনছেন। কখন তিনি তাঁর বেডরুম থেকে নিঃশব্দে উঠে এসে টিভি চালিয়ে দিয়েছেন, সে লক্ষ করেনি। মুহূর্তে মস্তিষ্কের ভেতর থেকে অদৃশ্য একটা সংকেত পেয়ে যায় শমিতা। মায়ের কষ্টের কারণটা নিশ্চয়ই দিল্লি থেকে প্রচারিত খবরগুলোর মধ্যেই কোথাও রয়েছে। খুব আস্তে, পায়ের এতটুকু আওয়াজ না করে লিভিং রুমে মায়ের সোফার পেছনে এসে দাঁড়ায় সে।

নিরুপমার চোখদু'টো টিভির পর্দার ওপর স্থির হয়ে আছে।

সুন্দরী সংবাদ-পাঠিকা চমৎকার কণ্ঠস্বরে খবর পড়ে যাচ্ছেন।

কোথাও জড়তা নেই, ভঙ্গিটা দারুণ :রতরে। এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট আগে হিন্দিতে যে সংবাদগুলো শোনা গিয়েছিল এখন তারই ইংরেজি তর্জমা প্রচার করা হচ্ছে। সেই অন্ধ্রপ্রদেশের ঘূর্ণিঝড় .... আফগানিস্তানের দখল নিয়ে তালিবান আর দোস্তম বাহিনীর লড়াই ... গডম্যান চন্দ্রস্বামী ... লাখুভাই পাঠক মামলা ইত্যাদির পর হঠাৎ গলার স্বরে পরিবর্তন ঘটিয়ে জানানো হল চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা সঞ্জয়কুমার কাল মধ্যরাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। ....'

এরপর সংবাদ-পাঠিকা কী পড়ে গেলেন তার একটি বর্ণও মাথায় ঢুকল না শমিতার। সঞ্জয়কুমারের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার স্নায়ুতে একটা ধাক্কা লেগেছিল। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেয় সে, টের পায় সারা শরীরে প্রচণ্ড এক কাঠিন্য নেমে এসেছে। নিজের অজান্তেই তার হাত দু'টো মায়ের সোফাটা আঁকড়ে ধরে। হিন্দি সমাচারে সঞ্জয়কুমারের খবরটা শোনার পর থেকেই যে নিরুপমা ভেঙে পড়েছিলেন এবার তা স্পষ্ট হয়ে যায়। হয়তো তাঁর

ধারণা ছিল সমাচারের সোয়া ঘণ্টা বাদে ইংলিশ বুলেটিন প্রচারের সময় সঞ্জয়কুমারের শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু প্রত্যাশিত সুখবরটি পাওয়া গেল না।

সঞ্জয়কুমারের আসল নাম রাধাবিনোদ দত্ত। এমন একটা গাঁইয়ামার্কা, গ্ল্যামারহীন নাম সিনেমায় অচল। তাই রুপোলি পর্দার জন্য পিতৃদত্ত নামটা তো বদলে দিয়েছেনই, পদবিটাও বর্জন করেছেন। সঞ্জয়কুমার নামটা বাংলা এবং হিন্দি সিনেমার দর্শকদের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। তাঁর নামে সারা দেশে অগুনতি ফ্যান ক্লাব। এই লোকটাকে জড়িয়ে কত যে গসিপ তার কোনো লেখাজোখা নেই।

রাধাবিনোদ দত্ত বা সঞ্জয়কুমার হলেন নিরুপমার প্রাক্তন স্বামী এবং শমিতার বাবা। এই পুরুষশাসিত সোসাইটিতে সসম্মানে বাঁচতে হলে পিতৃপরিচয়টা ভীষণ জরুরি। স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েব রেকর্ডে রাধাবিনোদের নামটা তার সঙ্গে জুড়ে আছে। পারলে এই লোকটার পিতৃত্বকে সে অস্বীকার করত। কিন্তু আমৃত্যু ওটার হাত থেকে তার রেহাই নেই। যতদিন বেঁচে থাকবে রাধাবিনোদকে ঘৃণাই করে যাবে শমিতা। কিন্তু মা? স্ত্রীর মর্যাদা যে দেয়নি, চরম অসম্মান করে একরকম গায়ের জোরে যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে তার প্রতি নিরুপমার মোহ এখনও কাটে নি, সে তা জানে। ডিভোর্সের বাইশ বছর বাদেও রোজ স্নানের পর চুলের ভেতর খুব সরু করে সিঁদুরের একটা রেখা লুকিয়ে লুকিয়ে টানেন মা, বাইরে থেকে অবশ্য তা দেখা যায় না। যে ভঙ্গুর দাম্পত্যজীবন বহুকাল আগে ধ্বংস হয়ে গেছে তার স্মৃতিচিহ্ন এভাবে ধরে রাখার মানে হয় না। আসলে নিরুপমার মাথায় সেকালের সতীসাধ্বী রমণীদের আত্মা ভর করে আছে, যাদের কাছে স্বামীদের কোনো দোষ থাকতে পারে না, তাদের সাত খুনের জায়গায় একশো খুন মাপ। কিন্তু শমিতার চোখে রাধাবিনোদ ক্রিমিনাল ছাড়া কিছু নয়। একটা দুশ্চরিত্র, স্বার্থপর লম্পটের জন্য কেন যে নিরুপমার এমন দুর্বলতা, সে ভেবে পায় না।

ইংরেজি নিউজ শেষ হয়ে টিভিতে কী একটা সিরিয়াল টিরিয়াল শুরু হয়েছে। সে দিকে লক্ষ্য ছিল না শমিতার। একদৃষ্টে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তখনকার মতো এবারও নিরুপমা কাঁদছেন, তাঁর গলার ভেতর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ শমিতার মাথায় যেন আগুন ধরে যায়। প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'কেন কাঁদছ মা?'

শমিতা যে নিউজের সময় তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, নিরুপমা আগেই টের পেয়েছিলেন। আচমকা মেয়ের গলা শুনে তাই তিনি চমকে উঠলেন না। শমিতার কথার উত্তরও দিলেন না।

শমিতা এবার বলে, 'একটা বাজে লোকের জন্যে তোমার এই সেন্টিমেন্টের কোনো মানে হয় না।'

আবছা গলায় নিরুপমা বলেন, 'চুপ কর শমি।'

শমিতা মায়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে গলার স্বর আরেক পর্দা উঁচুতে তোলে, 'যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, যে আমাদের পুরোপুরি অস্বীকার করেছে, বাইশ বছরে একদিনও খোঁজ খবর নেয়নি, তোমাকে চরম অসম্মান করেছে, তার মতো একটা লোকের জন্যে কেন তুমি কাঁদবে?'

নিরুপমা বলেন, 'শমি, তুই এখন এখান থেকে যা।'

তিনি কাঁদছিলেন ঠিকই, কিন্তু কান্নার মধ্যেও তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কর্তৃত্ব ছিল যে শমিতার আর মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হয় না। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে আসে সে। বিছানার ধারে বসে মায়ের দিকে কিন্তু তাকিয়েই থাকে।

নিরুপমার ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। শমিতা বুঝতে পারে, তাঁর ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন নিরুপমা। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দেন। লিভিং রুমের একধারে উঁচু কাঠের স্ট্যান্ডে গাঢ় লাল রঙের একটা টেলিফোন রয়েছে। এবার সেখানে গিয়ে ফোনটা তুলে ডায়াল করতে থাকেন।

এখান থেকে লং ডিসটান্স লাইনে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা আছে।

শমিতা মায়ের দিক থেকে চোখ সরায়নি। একটু পর নিরুপমার গলা তার কানে ভেসে এল। মা কলকাতায় সতীনাথ লাহিড়ির সঙ্গে কথা বলছেন। সতীনাথ তাঁর লতায়পাতায় কিরকম যেন ভাই হন, সে দিক থেকে শমিতার মামা। অন্য আত্মীয়স্বজনেরা তাদের সঙ্গে বহুকাল কোনো সম্পর্ক রাখে না। সতীনাথ কিন্তু ব্যতিক্রম। মানুষটা দারুণ আমুদে, হুল্লোড়বাজ এবং সহানুভূতিশীল। কলকাতা থেকে মাসে পাঁচ-সাত বার শমিতাদের ফোন করবেনই। দু-এক বছর পর পর এখানে এসে তাদের দেখেও যান। কুড়ি-একুশ বছর আগে নিরুপমা যখন তাকে নিয়ে উত্তর বাংলার এই চা-বাগানে চলে আসেন তারপর থেকে এই সতীনাথ ছাড়া বাইরের পৃথিবীর আর কারুর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নেই।

সতীনাথ হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। মাঝারি ধরনের পসার তাঁর। আসলে প্র্যাকটিশের দিকে তাঁর তেমন মন নেই। অভিনয়ের দিকে দারুণ ঝোঁক। গ্রুপ থিয়েটারের নাটকে আর ফিল্মে মাঝে মাঝে নানা ভূমিকায় তাঁকে নামতে দেখা যায়। স্টেজ এবং সিনেমা, দুই জগতের সঙ্গেই সতীনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এমন কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী নেই যাঁদের তিনি চেনেন না।

নিরুপমার কথাগুলোই শুধু কানে আসছিল শমিতার। সতীনাথ কী উত্তর দিচ্ছিলেন তা শোনা না গেলেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। মা সঞ্জয়কুমার সম্পর্কে নার্সিং হোমে খোঁজখবর নিয়ে তাঁকে ফোন করে জানাতে বলছিলেন, 'টিভিতে খুব বেশি কিছু বলে না। যে মেডিক্যাল টিমটা ওকে দেখছে তাদের কাছ থেকে ডিটেলে সব জেনে নিয়ে আমাকে এক দেড়ঘণ্টা পর পর ফোন করবি। আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি।'

সতীনাথ নিরুপমার চেয়ে সাত আট বছরের ছোট। তিনি হয়তো বললেন, ফোন করবেন।

নিরুপমা বলেন, 'আমি আজ আর স্কুলে যাচ্ছি না, কোয়ার্টারেই থাকব। ঘণ্টাখানেকের ভেতর তোর ফোন না পেলে আমাকেই করতে হবে। আচ্ছা, রাখছি।' বলে টেলিফোন জায়গামতো রেখে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

শমিতা তার বেডরুমে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে। সঞ্জয়কুমারের আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকের খবর শুনে গোড়ার দিকে সে নিজেকে নির্বিকার রাখতে চেয়েছিল, মাকে ভেঙে পড়তে দেখে মনে হয়েছিল এই ধরনের বাজে ভাবালুতার মানে হয় না। কিন্তু এখন ভেতরে ভেতরে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে সে। আগেও একটু মানসিক চাপ অনুভব করেছিল শমিতা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা উড়িয়ে দিয়েছে। এবার তা পারা গেল না। মায়ের কান্না, সতীনাথকে তাঁর ফোন, টিভির খবর, সব মিলিয়ে কী এক অস্থিরতা যেন নিজের অজান্তে তার মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছিল। সঞ্জয়কুমার সম্পর্কে তার মনোভাব হঠাৎ যে পালটে গেছে তা ভাবার কারণ নেই। তবু এই প্রতিক্রিয়াটাও মিথ্যে নয়। সতীনাথ ঘণ্টাখানেক পর ফোন করে কী বলবেন, তা জানার জন্য তার কেমন এক উৎকণ্ঠা হচ্ছে।

শমিতা আচমকা উঠে দাঁড়ায়। লিভিং রুমে উদ্দেশ্যহীনের মতো বারকয়েক হাঁটাহাঁটি করে কিচেনের কাছে চলে আসে। তার মনে পড়ে, লক্ষ্মী তার সকালের খাবার ওখানে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু এখন খেতে ইচ্ছা করছে না। পায়ে পায়ে ফিরে এসে সে লিভিং রুমের

জোড়া জানালার কাছে দাঁড়ায়। দূরে উঁচুনিচু পাহাড়ের যে স্কাইলাইন দিগন্তে পরমাশ্চর্য একটা নকশা তৈরি করেছে তার ওধার থেকে সূর্য অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। যতদূর চোখ যায়, ঝলমলে সোনালি আলোয় চারিদিক ভরে যাচ্ছে। বাতাস থেকে কনকনে হিমের ভাব কিছুটা কমে গেছে। চা-বাগানের এই শহর ঘণ্টাদেড়েক আগেও ছিল ভয়ানক নির্জন। এখন প্রচুর লোকজন দেখা যাচ্ছে—বাঙালি, নেপালি, বিহারি এবং ভারতের নানা অঞ্চলের মানুষ। সবারই সারা গা মোটা, ভারী শীতের পোশাকে মোড়া। বেশ কিছু সাইকেল, অটো আর মাঝে মধ্যে দু-চারটে জিপও চোখে পড়ছে।

শমিতা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বাজার থেকে ফিরে এসে লক্ষ্মী সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার উঁচু গলা ভেসে আসে, 'খাবার খাওনি কেন?'

না খাওয়ার কারণটা জানিয়ে দেয় শমিতা।

অনেকদিন এক বাড়িতে কাটালে কাজের মেয়েদের খানিকটা অধিকার জন্মায়। শমিতা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে অনিয়ম করলে বা রাতে শুতে দেরি করলে লক্ষ্মী বকাবকি করে। সে বলে, 'না খেয়ে পিত্তি পড়লে তখন ঠেলা বুঝবে।'

শমিতা উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ গজগজ করার পর রান্নাবান্নার তোড়জোড় শুরু করে লক্ষ্মী।

একসময় নিরুপমা তাঁর বেডরুম থেকে ডাকেন, 'লক্ষ্মী—'

লক্ষ্মী ক্ষিপ্র হাতে আনাজ কাটতে কাটতে সাড়া দেয়, 'কী বলছেন মা?'

'তোমার তাড়াহুড়ো করতে হবে না। আমি আজ স্কুলে যাচ্ছি না। দশটা নাগাদ তোমাকে একটা চিঠি লিখে দেব। রেখাদিকে দিয়ে আসবে।'

রেখাদি অর্থাৎ রেখা মণ্ডল গোল্ডেন ভ্যালি টি গার্ডেনস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। নিরুপমা না গেলে তাঁর ক্লাসগুলো যাতে অন্য টিচারদের ভাগ করে দেওয়া যায় সেজন্যই চিঠি পাঠাতে হবে। পারতপক্ষে তিনি স্কুল কামাই করেন না। কোনো কারণে যেতে না পারলে ছাত্রছাত্রীদের যাতে পড়াশোনার ক্ষতি না হয় তাই আগেভাগে ব্যবস্থা করে দেন।

সতীনাথের সঙ্গে কথাবার্তার পর আরো তিনঘণ্টা কেটে গেছে। এর ভেতর লক্ষ্মীকে দিয়ে স্কুলে চিঠিও পাঠিয়ে দিয়েছেন নিরুপমা। তিনি বলেছিলেন এক দেড়ঘণ্টা পর পর যেন সঞ্জয়কুমারের সর্বশেষ খবর তাঁকে জানানো হয়। কিন্তু সতীনাথের ফোন এখনও আসেনি। দিনের এই সময়টা টেলিফোনের লাইনগুলো ভীষণ ব্যস্ত থাকে। সতীনাথ কি উত্তর বাংলার লাইন পাচ্ছেন না?

জোড়া জানালার পাশ থেকে শমিতা নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল অনেক আগেই। কিন্তু তার চোখদু'টো রয়েছে মায়ের দিকেই। নিরুপমা এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে পারছেন না। একবার বসছেন, পরক্ষণে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। বার বার লিভিং রুমে এসে এলোমেলো ঘোরাঘুরি করছেন, আবার ফিরে যাচ্ছেন নিজের ঘরে। কিন্তু তাঁর কান দু'টো রয়েছে টেলিফোনের দিকে। যত সময় কাটছে ততই যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে নিরুপমার। দু-চারবার ডায়াল করে সতীনাথকে ধরতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পনেরো কুড়ি ফুট দূরত্বে বসে শমিতা বুঝতে পারল কলকাতার লাইন পাননি।

একটা বাজতে মিনিট কুড়ি যখন বাকি, সেই সময় সতীনাথের ফোন এল। নিরুপমা দৌড়ে এসে টেলিফোনটা তুলে নিলেন। 'হ্যালো, সতীনাথ? তোকে কতবার বললাম, এক দেড়ঘণ্টা বাদে বাদে ফোন করবি ... অ্যাঁ ... বল .... টিভির স্পেশাল বুলেটিন .... না, সকালের দিকে সেই যে দিল্লির নিউজ শুনেছিলাম তারপর আর টিভি খুলিনি ... কী ছিল বুলেটিনে?.....'

ওধার থেকে সতীনাথ কী জবাব দিলেন, শোনা না গেলেও নিরুপমার প্রতিক্রিয়া দেখে টের পাওয়া গেল মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে। তাঁর হাত থেকে টেলিফোনটা মেঝেতে ছিটকে পড়ল। শমিতা লক্ষ করল, মায়ের সমস্ত শরীরের জোড়গুলো দ্রুত আলগা হয়ে যাচ্ছে। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। টলতে টলতে একসময় যখন হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছেন, শমিতা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। রান্নাঘর থেকে লক্ষ্মীও দেখতে পেয়েছিল, উর্ধ্বশ্বাসে সেও ছুটে এসেছে।

শমিতা নিরুপমার দেহের ভার ঠিকমতো ধরে রাখতে পারেনি। তারা দু'জনেই নিচে পড়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে মায়ের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে শমিতা অসীম উৎকণ্ঠায় বলে ওঠে, 'কী হয়েছে মা? সতীনাথমামা কী বলল?'

লক্ষ্মীকেও ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। সে-ও ঝুঁকে বলল, 'মা, এমন করছেন কেন? শরীর খারাপ লাগছে?'

শমিতা বা লক্ষ্মী, কারুর কথার উত্তর দিলেন না নিরুপমা। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কান্নার উচ্ছ্বাসে তাঁর সমস্ত শরীর বেঁকেচুরে যেতে লাগল। শমিতারা ধরাধরি করে তাঁকে লিভিং রুমের ডিভানে শুইয়ে দিল।

অনেকক্ষণ একটানা কান্নার পর জড়ানো গলায় নিরুপমা শমিতাকে বলেন, 'তোর বাবা আর নেই।' শোকের প্রাথমিক, প্রবল আঘাত ততক্ষণে কিছুটা কাটিয়ে উঠেছেন তিনি।

এটাই ভেবেছিল শমিতা। লম্পট হোক, স্বার্থপর হোক, দুশ্চরিত্র হোক, সঞ্জয়কুমার নামের লোকটা তার বাবা। যদিও মনে মনে তাঁকে সে ঘৃণা করে, তবু জন্মদাতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হওয়াটা বুঝি বা মানুষের আদিম সংস্কার, রক্তের ভেতরেই সেটা থেকে যায় কিনা কে জানে। মায়ের মতো ভেঙেচুরে না গেলেও সঞ্জয়কুমারের মৃত্যুসংবাদে বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগে। কী বলবে যখন ভেবে উঠতে পারছে না সেই সময় নিরুপমা ফের বলেন, 'সতীনাথ বলছিল, একটার সময় রেডিওতে তোর বাবার সম্বন্ধে কী স্পেশাল প্রোগ্রাম যেন করবে। আমাদের রেডিওটা এখানে নিয়ে আয়।'

শমিতাদের একটা ট্রানজিস্টর সেট রয়েছে। সেটা প্রায় চালানোই হয় না। তারা টিভিই দেখে থাকে। এখন দৌড়ে গিয়ে মায়ের ঘরের টেবল থেকে নিয়ে এসে টিভির মাথায় বসিয়ে চালিয়ে দেয় সে।

কী একটা লঘুসঙ্গীত ধরনের গান চলছিল। মিনিট খানেক বাদে সেটা থামতেই ঘোষিকার গভীর, বিষাদময় কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'অপরিসীম বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি, ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম তারকা সঞ্জয়কুমারের জীবনাবসান ঘটেছে আজ বেলা এগারোটা বেজে বাইশ মিনিটে। যতকাল সিনেমা শিল্পটি আছে, ততদিন তাঁর নাম জনচিত্তে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর অবদান আমাদের চলচ্চিত্রকে অজস্র রত্নমুকুটে ভূষিত করেছে। তাঁর আকস্মিক অকালপ্রয়াণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা কোনোদিনই পূরণ হওয়ার নয়।' ইত্যাদি নানা শোকোচ্ছ্বাসের পর জানানো হল, প্রয়াত শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর মরদেহ কাল চৌরঙ্গির এক নাম-করা বিশাল হল-ঘরের সামনে শায়িত থাকবে। বিকেল চারটের পর মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা বেরুবে। কসবায় তাঁর জন্মস্থান এবং কর্মস্থল বিভিন্ন স্টুডিও পরিক্রমার পর নিয়ে যাওয়া হবে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

ঘোষণাটি শেষ হওয়ার পর রেডিও বন্ধ করে দেয় শমিতা। এ দিকে ডিভানের ওপর উঠে বসেছেন নিরুপমা। তাঁর চোখ থেকে অনবরত জল ঝরে যাচ্ছে। সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। বললেন, 'শমি, রাজারামবাবুকে ফোনে ধরে লাইনটা আমাকে দে।'

রাজারাম পাণ্ডে গোল্ডেন ভ্যালি টি গার্ডেনসের ম্যানেজার। নিরুপমা কেন তাঁকে ফোন করতে চাইছেন বুঝতে পারল না শমিতা। এ নিয়ে সে প্রশ্ন করে না, নির্দেশমতো রাজারামকে ডায়াল করে টেলিফোনটা মায়ের হাতে দিল।

নিরুপমা বললেন, 'মিস্টার পাণ্ডে, খুব জরুরি কাজে আজই আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। একটা ট্রেনের টিকেট—'

শমিতা চমকে উঠেছিল। রাজারামের সঙ্গে নিরুপমার কথাবার্তার মধ্যেই সে বলে ওঠে, 'তুমি কলকাতায় যাবে মা?'

নিরুপমা রাজারামকে একটু অপেক্ষা করতে বলে শমিতার দিকে তাকান। বলেন, 'হ্যাঁ। এই সময় তো যাওয়াই উচিত। শেষবারের মতো দেখতে চাই —' গলা ধীরে ধীরে বুজে আসে তাঁর।

মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর যে নাড়াটা লেগেছিল তা পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে শমিতা। সে বলে, 'তোমাকে যেতে হবে না। সেখানে গিয়ে কী করবে তুমি? একদিন যে তুমি তার স্ত্রী ছিলে সে মর্যাদা কি কেউ দেবে? শুধু শুধু—'

মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে নিরুপমা বলেন, 'কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আমি যাচ্ছি না। তোকে তো বললাম, শেষ দেখাটা দেখতে চাই—'

শমিতা বুঝতে পারছিল, নিরুপমা মনস্থির করে ফেলেছেন, তাঁকে কোনোভাবেই আটকানো যাবে না। সে ফের কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মা হাত তুলে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। তারপর রাজারামকে বললেন, 'দয়া করে আমাকে আজকের ট্রেনের একটা টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলে খুব উপকার হয়। যে কোনো ক্লাসের হলেই চলবে—'

গোল্ডেন ভ্যালি টি গার্ডেনসের এমপ্লয়িদের প্লেন বা ট্রেনের জরুরি টিকেট, হাসপাতালে ভর্তি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই ম্যানেজারের অফিসকে জানালে হয়ে যায়। কর্মচারীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে রাজারামের তীক্ষ্ণ নজর। নিরুপমার কথা শেষ হতে না হতেই শমিতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তোমাকে আমি একা যেতে দেব না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। দু'খানা টিকেটের কথা বল।'

নিরুপমা এক পলক মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাই বললেন।

টি গার্ডেনসের অফিস থেকে একখানা অ্যামবাসাডর দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্মীর ওপর বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে শমিতাকে নিয়ে সেটায় করে নিরুপমা যখন শিলিগুড়ি পৌঁছুলেন সন্ধে নেমে গেছে। গোল্ডেন ভ্যালি টি গার্ডেনসের নাম সারা দেশ জুড়ে। একশো বছরের পুরনো এই কোম্পানির ম্যানেজার রাজারাম খুবই প্রভাবশালী মানুষ। তিনি লোক পাঠিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের টিকেটই শুধু নয়, রিজার্ভেশনও করিয়ে রেখেছিলেন।

ট্রেনে এতটুকু অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আরামে শমিতারা কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারত কিন্তু নিরুপমা বা সে কেউ ঘুমোতে পারল না। নিরুপমা তবু ট্রেনে ওঠার পর শুয়ে পড়েছিলেন। শমিতা শোয়নি, কাচের জানালার পাশে গায়ে পুল-ওভারের ওপর মোটা গরম চাদর জড়িয়ে চুপচাপ বসে থেকেছে। বাইরে গাঢ় হিমে এবং কুয়াশায় সব কিছু আড়ষ্ট হয়ে আছে। পাঁচ ফুট দূরত্বেও নজর চলে না। ক্বচিৎ কুয়াশা ফুঁড়ে দু-চারটে অলৌকিক আলোর বিন্দু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, ট্রেনটা ছোটখাটো কোনো শহর টহর পার হয়ে গেল। শমিতা বাইরে তাকিয়েই আছে শুধু। আসলে ট্রেনটা যত কলকাতার দিকে ছুটছে ততই অপার্থিব কোনো টাইম মেশিনে চড়ে সে যেন আশ্চর্য এক উজান টানে ক্রমশ

পিছিয়ে যেতে যেতে তার ছোটবেলায় ফিরে গেল। খুব কম বয়সের কথা মনে নেই শমিতার। তবে জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে সে দেখে আসছে তারা উত্তর বাংলার চা বাগানে থাকে। গোড়ার দিকে মা যখন খুব সাধারণ একজন টিচার, তাদের দেড় কামরার ছোট একটা কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছিল। পরে নিরুপমা অ্যাসিস্টান্ট হেডমিস্ট্রেস হলে এখনকার বাংলোটা পান। ওখানে তাদের তেরো চোদ্দটা বছর কেটে গেল। শমিতার ছোটবেলাটা চা-বাগানে তার সমবয়সী অন্য সব ছেলেমেয়ের থেকে আলাদা কিছু ছিল না। শুধু একটা তফাতই তার চোখে পড়েছে। বন্ধুদের বাড়িগুলো ছিল তাদের বাবা-মা-ভাইবোন নিয়ে জমজমাট। তাদের বাড়িতে মা, সে এবং কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। একটু বড় হওয়ার পর শমিতা ভাবত আর সবার মতো তার বাবা নেই কেন। তবে এ নিয়ে মাকে কখনও কোনো প্রশ্ন করেনি।

মা হয়তো তার মনোভাব বুঝতে পারতেন কিন্তু কিছুই বলতেন না। সে যেবার ক্লাস সেভেনে উঠল সে বছর নিরুপমা হঠাৎ একদিন বলেছিলেন, 'তুমি বড় হয়েছ। এবার তোমার কিছু কিছু কথা জানা দরকার। না জানালে আমার পক্ষে অন্যায় হবে।'

মা কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

নিরুপমা বলেছেন, 'আমি তোমার বাবার কথা বলতে চাইছি। তুমি কার মেয়ে সেটা তোমার জানা উচিত। এতদিন ছোট ছিলে বলে বলিনি।'

বিমূঢ়ের মতো শমিতা বলেছে, 'আমার বাবার নাম তো রাধাবিনোদ দত্ত।'

'হ্যাঁ। তাঁর অন্য নামও আছে। আর সেই নামেই তিনি বিখ্যাত। সারা দেশ তাঁকে চেনে।'

শমিতার বিস্ময় বাড়ছিলই। সে জিগ্যেস করেছে, 'আরেকটা নামের কথা যে বললে, সেটা কী?'

উত্তর না দিয়ে চামড়া দিয়ে বাঁধানো পাঁচটা মোটা খাতা শমিতার হাতে দিয়ে নিরুপমা বলেছিলেন, 'এগুলো আমার ডায়েরি। এরকম আরো উনিশ কুড়িটা আছে। সব তোকে দেব। পড়লে তোর মনে যে প্রশ্নগুলো আছে তার উত্তর পেয়ে যাবি। তা ছাড়া আরো অনেক কিছুই জানতে পারবি।'

মা যে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক রাতে ডায়েরি লেখেন তা জানা ছিল শমিতার। লেখার পর তাঁর পড়ার টেবলের ড্রয়ারে সেটা চাবি দিয়ে রাখেন। পাছে তাঁর ডায়েরি অন্যের হাতে পড়ে যায় তাই চাবিটা সর্বক্ষণ নিজের কাছেই রেখে দেন।

নিরুপমা যে তাঁর নিজস্ব, গোপন দিনলিপি তাকে কোনোদিন পড়তে দেবেন ভাবতে পারেনি শমিতা। যাই হোক, সে দিন রাতেই পাঁচখানা খাতা পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাকি ডায়েরিগুলো চেয়ে নিয়েছিল। দু'দিনের মধ্যে সেগুলোও শেষ। নিরুপমার রোজনামচা লেখা শুরু হয়েছিল পঁচিশ বছর আগে। পঁচিশ বছরে মোট পঁচিশখানা ডায়েরি। প্রতিদিনের নানা খুঁটিনাটি বিবরণ সেখানে লেখা আছে।

দিনলিপিগুলো যেন অন্তহীন আর্ট গ্যালারি। সেখানে সাজানো রয়েছে অজস্র মানুষের ছবি। কিন্তু প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন একটি পুরুষ আর একটি নারী— রাধাবিনোদ এবং নিরুপমা। এঁদের পারস্পরিক তীব্র আকর্ষণ, বেপরোয়া উদ্দাম প্রেম, বিয়ে, নানা টানাপোড়েন, পরে রাধাবিনোদের বিশ্বাসঘাতকতা—সব মিলিয়ে যে নাটকীয় উপকরণগুলো রয়েছে তা দিয়ে দুর্ধর্ষ একখানা ফিল্ম তৈরি করা যায়।

কসবায় রাধাবিনোদদের বিশাল বাড়ি। তিন জেনারেশন ধরে তাঁরা সেখানে আছেন। তাঁদের যৌথ পরিবারের সবাই কৃতী—কেউ অধ্যাপক, কেউ নাম-করা ল'ইয়ার, কেউ সফল বিজনেসম্যান কিংবা বড় কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। এমন এক বংশে জন্মেও

রাধাবিনোদ ছিলেন একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এই পরিবারের ছেলেমেয়ে সবাই ছাত্র হিসেবে অসাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে কারুর কারুর রেজাল্ট চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে বার দুই ফেল করে কোনোরকমে টিকিয়ে টিকিয়ে পাসটা করেছিলেন। বি. এ ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে বছর দেড়েক কলেজে যাতায়াত করে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কটা চুকিয়ে দেন। সবাই ততদিনে তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছে। কেউ তাঁর সঙ্গে বিশেষ কথা টথা বলত না। এক ধারে প্রবল তাচ্ছিল্যের মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতেন রাধাবিনোদ।

তবে একটা কথা মানতেই হবে, তাঁর মতো সুপুরুষ ক্বচিৎ কখনও চোখে পড়ে। তাঁর তাকানো, হাসি এবং কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য এক ম্যাজিক ছিল। আর নেশা বলতে অভিনয়। তখন, অর্থাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে গ্রুপ থিয়েটারের নানা রোলে তাঁকে নামতে দেখা গেছে। এই অভিনয়ের জন্যই লেখাপড়াটা তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। আর এই কারণেই বাড়ির সবাই তাঁর ওপর খেপে উঠেছিল। তাঁদের গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারে অ্যাক্টিং ব্যাপারটা ছিল মারাত্মক ধরনের ট্যাবু। বাড়ির ছেলেরা স্টেজে উঠে গলা কাঁপিয়ে পার্ট বলবে, এটা তারা ভাবতেই পারত না। লেখাপড়া ছাড়ার জন্য বাড়ির লোকেরা যতটা ক্ষুব্ধ, তার চেয়ে অনেক বেশি অসন্তুষ্ট এই অভিনয়ের কারণে। অথচ, এটা স্বীকার করতেই হবে অ্যাক্টিং ভালোই করতেন রাধাবিনোদ। তার সঙ্গে মুগ্ধ করার মতো দৈহিক সৌন্দর্য তো ছিলই। নাটকের জগতে তখন তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। কাগজে তাঁর ছবি বেরোয়, নাট্য সমালোচকরা তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে প্যারার পর প্যারা লিখে যায়।

ঠিক এই সময়ে নিরুপমারা রাধাবিনোদদের পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে এসে উঠলেন। তখন তিনি ইংরেজি নিয়ে এম. এ পড়ছেন। এক পাড়ায় থাকলে যা হয়, রাধাবিনোদের সঙ্গে আলাপও হয়ে গিয়েছিল তাঁর এবং মুহূর্তে প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। নিরুপমা হালকা, চটুল ধরনের মেয়ে নন। খুবই গম্ভীর, ধীর, স্থির এবং অন্তর্মুখী। তাঁর পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডও চমকে দেওয়ার মতো। বাবা একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, মা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, একমাত্র দিদি আই. এ. এস। নিরুপমার পক্ষে একটি বি. এ পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে দেওয়া যুবকের জন্য, সে যত সুপুরুষই হোক না, ঘাড় গুঁজে পড়ার কারণ নেই। কিন্তু পৃথিবীর সব কিছুই তো অঙ্ক কষে, হিসেব করে হয় না।

আলাপ হওয়ার পর কিছুদিন পাড়াতেই মাঝেমধ্যে দেখা হত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা। ব্যস, এই পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ একদিন ক্লাস ছুটির পর নিরুপমা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসছেন, দেখলেন গেটের কাছে রাধাবিনোদ দাঁড়িয়ে আছেন। রীতিমতো অবাক হয়েই জিগ্যেস করেছিলেন, 'আপনি এখানে?'

রাধাবিনোদ বিব্রত একটু হেসে বলেছেন, 'আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল, তাই—'

সারা মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গিয়েছিল নিরুপমার। লাজুক দৃষ্টিতে একবার রাধাবিনোদের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

রাধাবিনোদ এবার গলার স্বর নিচু করে বলেছেন, 'চলুন কোথাও গিয়ে বসা যাক।'

সেই শুরু। তারপর কবে থেকে যে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নিরুপমা রাধাবিনোদের সঙ্গে সারা দুপুর, বিকেল, কোনো কোনো দিন বেশ খানিকটা রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে, সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়ে সময় কাটিয়ে দিয়েছেন, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে তাঁর ডায়েরিতে। যেদিন রাধাবিনোদের নাটক থাকত সেদিন আরো রাত হয়ে যেত। ওঁদের একটা নাটকও বাদ দিতেন

না নিরুপমা। অদম্য এক নেশার ঘোর সারাক্ষণ তাঁর ওপর ভর করে থাকত যেন। কখন রাধাবিনোদের সঙ্গে দেখা হবে, সেজন্য ঘুম ভাঙার পর থেকেই তিনি চঞ্চল হয়ে থাকতেন। কোনো কারণে একদিন গোপনে দেখা না হলে, মনে হত দিনটাই পুরোপুরি বিফলে গেল।

নিরুপমাদের পরিবারে অলিখিত কিছু নিয়ম ছিল। তাঁর মা এবং বাবা দু'জনেই ছিলেন উদার, আধুনিক এবং সংস্কারমুক্ত। মেয়েদের স্বাধীনতায় কখনও তাঁরা হাত দিতেন না, তবে চাইতেন সন্তানেরা পারিবারিক শৃঙ্খলাকে মর্যাদা দিক।

নিরুপমা এতকাল তাঁর পড়াশোনা নিয়েই ছিলেন। ইউনিভার্সিটির ক্লাস, লাইব্রেরিতে গিয়ে রেফারেন্স বই থেকে নোট নেওয়া, সকালের দিকে এবং রাত্তিরে নিয়ম করে ঘণ্টা পাঁচেক পড়া, নানা প্রশ্নের উত্তর লেখা—এর মধ্যেই তাঁর পৃথিবী ছিল সীমাবদ্ধ। তাঁর মেয়ে বন্ধুদের প্রায় সবারই একটা করে বয়-ফ্রেন্ড ছিল, কেউ কেউ পলিটিকস নিয়ে মেতে থাকত, কারুর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দারুণ একটা বিয়ে করে আমেরিকা কি কানাডায় চলে যাওয়া। দু-একজন ছিল কেরিয়ারিস্ট। তারা স্বপ্ন দেখত, এম. এ'র পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা ফরেন সার্ভিসের পরীক্ষায় উতরে দুর্দান্ত একটা চাকরি জোটাবে। নিরুপমা এভাবে কিছুই ভাবেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল এম. এ'তে ভালো রেজাল্ট করে রিসার্চ করা। কিন্তু রাধাবিনোদ সব ওলটপালট করে দিয়েছিলেন।

এতদিন ক্লাসের পর লাইব্রেরিতে গিয়ে নোট টোট নেওয়ার পর সোজা বাড়ি চলে আসতেন নিরুপমা। কলকাতায় প্রায় রোজই ট্রাফিক জ্যাম লেগে থাকে। তা সত্ত্বেও সাতটার বেশি কোনোদিনই দেরি হত না। কিন্তু রাধাবিনোদের সঙ্গে ঘোরাঘুরির পর ফিরতে একেক দিন আটটা, ন'টা কি দশটাও হয়ে যেত। প্রথম দিকে মা বা বাবা কিছুই বলতেন না। নিরুপমার ওপর তাঁদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দু-চার মাস লক্ষ করার পর বুঝিবা আর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তাঁদের মনে কোথাও একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল।

বাবা একদিন নিরুপমাকে কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, 'তোর আজকাল ফিরতে দেরি হয় কেন?'

বাবা শান্ত, গম্ভীর মানুষ, স্বল্পভাষী, তবে খুবই সহৃদয় আর স্নেহপ্রবণ। তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারেননি নিরুপমা। নতমুখে, প্রায় আবছা গলায় বলেছিলেন, 'ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি যাই। আমাদের লাইব্রেরিতে সহজে বইটই পাওয়া যায় না। যেটা চাইব, আগেই কেউ না কেউ সেটা নিয়ে রেখেছে। আমার বন্ধুর কাছে ভালো কিছু রেফারেন্স বই আছে। তাই---'

বাবা ইচ্ছা করলে বন্ধুর নামঠিকানা জিগ্যেস করতে পারতেন। করেননি। করলে ভীষণ অস্বস্তিতে পড়তে হত নিরুপমাকে। আসলে মিথ্যে বলার অভ্যাস নেই, বললে ধরা পড়ে যেতেন। বাবা সেদিন শুধু বলেছিলেন, 'কলকাতা শহরটা আর আগের মতো নেই। তোমার মতো একটা ইয়াং মেয়ের পক্ষে বেশি রাত করে ফেরাটা নিরাপদ নয়। সন্ধের ভেতর যেমন ফিরে আসতে তেমনি আসবে।'

বাবা সতর্ক করে দেওয়ার পর ক'দিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছেন নিরুপমা। কিন্তু তারপর ফের দেরি হতে লাগল। কলকাতা যত বড় শহরই হোক, আর লুকিয়ে চুরিয়ে যতই তাঁরা ঘোরাঘুরি করুন, আত্মীয়স্বজন বা কসবার দু-চারজন প্রতিবেশীর চোখে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে গেছেন। তারাই মা-বাবাকে খবর দিয়েছে।

মা-বাবা প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। কোনোরকমে হায়ার সেকেন্ডারির চৌকাঠ পেরিয়ে যে ছোকরা নাটক করে বেড়ায়, তার সঙ্গে নিরুপমা সস্তা, বাজে মেয়েদের মতো রাস্তায় রাস্তায়

টই টই করে বেড়াচ্ছে, ভাবতেও মাথা কাটা যাচ্ছিল তাঁদের। মেয়ের রুচি এত নিচে নেমে গেছে, এ ছিল তাঁদের কাছে অভাবনীয়।

বাবা এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে একটি কথাও বলেননি। মা কিন্তু চুপ করে থাকেননি। গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে বলেছেন, 'একটা থার্ড ক্লাস ছোকরার সঙ্গে ঘুরতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি যে বংশের মুখে এভাবে চুনকালি দেবে, আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।'

নিরুপমা মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, 'রাধাবিনোদ বাজে ছেলে নয়, একজন খুবই ট্যালেন্টেড অ্যাক্টর।'

গলার স্বর কয়েক পর্দা উঁচুতে চড়িয়ে মা এবার বলেছেন, 'বা বা, চমৎকার!' রাগে, উত্তেজনায় তাঁর মুখচোখ যেন ফেটে পড়ছিল।

নিরুপমা বুঝতে পারছিলেন, রাধাবিনোদ সম্পর্কে তাঁর মুখ থেকে যা বেরিয়ে গেছে সেখান থেকে আর ফেরা যায় না। তিনি বলেছিলেন, 'কেউ বড় চাকরিটাকরি করতে চায়, কারুর লক্ষ্য বিজনেসে ফ্লারিশ করা, কেউ বা অন্য কোনো প্রফেশন বেছে নেয়। ওর ইচ্ছা অভিনয়টাকে ঘিরে কেরিয়ার—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মা চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'চুপ কর—'

নিরুপমা আর কিছু বলেননি।

মায়ের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে এবার তিনি জিগ্যেস করেছেন, 'যে জিনিয়াসটিকে তুমি আবিষ্কার করেছ, তাকে নিয়ে তুমি কী করতে চাও?'

তখনও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু ভাবেননি নিরুপমা। মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলেন, আগে এম. এ পরীক্ষাটা হোক। তারপর দেখা যাক কী করা যায়। কিন্তু কে জানত হঠাৎ ধরা পড়ে যাবেন। নিরুপমা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। মাথায় আসছিল না, মায়ের প্রশ্নের উত্তরটা কিভাবে দেবেন। মা ধমকে উঠেছিলেন, 'কী হল, মুখ বুজে আছ কেন? জবাব দাও।'

এবার নিরুপমার ভেতর থেকে অদৃশ্য কেউ যেন প্রম্পট করে উত্তরটা বলে দিচ্ছিল, আর সেটাই আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে আউড়ে গেছেন, 'আমরা—আমবা বিয়ে করব।'

মুহূর্তে সমস্ত বাড়িটায় স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। মা এবার আর চেঁচামেচি বা রাগারাগি করেননি, খুব ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করেছেন, 'তুমি যা বললে তা ভেবেচিন্তে বলেছ তো?'

নিরুপমা এমনিতে ধীর, স্থির কিন্তু তাঁর মধ্যে অনমনীয় একটা জেদ ছিল। তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ।'

'কবে বিয়েটা করতে চাও?'

'এম. এ পরীক্ষার পব।'

'না।'

মা কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন নিরুপমা।

মা এবার বলেছেন, 'তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম। এর ভেতর যদি সিদ্ধান্ত বদলাও, আমরা খুশি হব। নইলে সাতদিন পর তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। মনে রেখো, এ বিয়ে আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না।'

বাবা কাছেই বসে ছিলেন। এবার চিৎকার করে বলছেন, 'একটা হারামজাদা, লোফার, স্কাউন্ড্রেলকে সত্যিই যদি তুমি বিয়ে কর, এ বাড়ির দরজা তোমার কাছে চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে।' কলেজের অধ্যক্ষ বাবাকে কেউ কখনও একটি খারাপ বা বাজে কথা উচ্চারণ

করতে শোনেনি। তাঁর মুখ থেকে সেদিন একসঙ্গে তিনটে অশালীন শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। তিনি যে কতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

নিরুপমা মা বা বাবা কারুর কথার উত্তর দেননি। পরদিন রাধাবিনোদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। শুনে হকচকিয়ে গেছেন রাধাবিনোদ। বলেছেন, 'এখন তা কী করে সম্ভব? আমার কোনো ফিক্সড ইনকাম নেই। মাঝে মধ্যে গ্রুপ থিয়েটার থেকে ডাক আসে। এই ধরনের থিয়েটারগুলোর অবস্থা তো জানো। নিজেদের হল নেই, কোনোরকমে টাকা পয়সা জোগাড় করে এখানে ওখানে শো করে। এদের কাছ থেকে যা পাই তার ওপর ভরসা করে বিয়ে করা সম্ভব? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আমাদের বাড়িতে—' বলতে বলতে থেমে গেছেন রাধাবিনোদ।

তাঁর মনোভাবটা বুঝতে পেরেছিলেন নিরুপমা। জিগ্যেস করেছেন, 'আপত্তি হবে?'

'আমার সেই রকমই ধারণা।'

'কেন?'

'জানোই তো আমাদের ফ্যামিলিতে আমিই সব চেয়ে অপদার্থ। সবাই লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট। চাকরিবাকরি, প্রফেশন বা বিজনেস, যে যেখানে আছে সকলেই সাকসেসফুল। আর আমি? আমার দাম ফুটো পয়সাও নয়। এভরিওয়ান হেটস মি। এর ওপর যদি বিয়ের কথা বলি—'

রাধাবিনোদকে থামিয়ে দিয়ে নিরুপমা বলেছেন, 'কিন্তু তোমার মতো ট্যালেন্ট তোমাদের বাড়ির আর কার আছে?'

রাধাবিনোদ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, 'আরো একটা কথা আছে।'

'কী?'

'সব মানুষের জীবনে ছোট বড় একটা না একটা স্বপ্ন থাকে। স্বপ্নও বলতে পার, আবার অ্যাম্বিশানও বলা যেতে পারে। আমারও সেরকম একটা কিছু আছে।'

'জানি। তুমি বড় অ্যাক্টর হতে চাও। সারা দেশের মানুষ তোমার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হোক—এই তো?'

'হ্যাঁ।' রাধাবিনোদ জানিয়েছিলেন, নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে, খানিকটা এস্টাব্লিশড না হয়ে হুট করে বিয়ে করাটা ঠিক হবে না। বিয়ে করা মানেই চাকরির খোঁজে এক অফিস থেকে আরেক অফিসে দৌড়াদৌড়ি, একে তাকে ধরা। ফলে সারা জীবন ধরে যে টার্গেটটা সামনে রেখে তিনি ছুটছেন সেখানে আর কোনোদিনই পৌঁছুনো যাবে না। এ দিকে বাড়িতে তিনি একরকম অবাঞ্ছিত, তার ওপর বউ নিয়ে গিয়ে তুললে তার ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে ভাবতে সাহস হয় না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিরুপমা বলেছেন, 'ঠিক আছে, তোমার চাকরির কথা ভাবতে হবে না। তুমি মন দিয়ে তোমার কেরিয়ার তৈরি করবে। সংসার চালানোর দায়িত্ব আমার।'

রাধাবিনোদ চমকে উঠেছেন, 'সেটা কী করে সম্ভব? তুমি কি চাকরিবাকরি কর?'

'বললাম তো, এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আজই আমরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে বিয়ের নোটিশ দেব। এর মধ্যে তুমি একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট ভাড়া করে ফেল। বিয়ের পর আমরা যেন সেখানে গিয়ে উঠতে পারি।'

নিরুপমা যে রাধাবিনোদকে বিয়ে করতে চলেছেন, এ খবরটা ওঁদের বাড়িতে কিভাবে যেন পৌঁছে গিয়েছিল। রাধাবিনোদের বাবা-কাকারা তাঁকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো বুঝিয়েছেন একটা অপদার্থ মাকাল ফলকে বিয়ে করে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করার মানে হয়

না। চোখের ক্ষণিক নেশা কেটে গেলে আমৃত্যু নিরুপমাকে আপশোশ করতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু নড়ানো যায়নি। স্কুল ফাইনালের পর থেকে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে টিউশনি করে গেছেন নিরুপমা। তার একটা পয়সাও খরচ হয়নি, সব ব্যাঙ্কে জমা করে রেখেছিলেন। বাড়ি ভাড়া করার জন্য সেই টাকা তুলে রাধাবিনোদকে দিয়েছিলেন তিনি।

বিয়ের পর নিরুপমারা চেতলার একটা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিলেন। তার আগেই একটা চাকরি জোগাড় করে ফেলেছেন তিনি। কম বয়সে একটা খুব নাম-করা মিশনারি স্কুলে পড়তেন। ছাত্রী হিসেবে ছিলেন অসাধারণ। শান্ত, মধুর স্বভাবের জন্য প্রিন্সিপাল মিসেস স্টেলা জনসন থেকে সব শিক্ষিকাই তাঁকে ভালোবাসতেন। নিরুপমা যে বছর বিয়ে করলেন, তখনও মিসেস জনসন প্রিন্সিপাল ছিলেন। নিরুপমা সোজা তাঁর কাছে চলে যান। মিসেস জনসন বলেছিলেন, 'টিচিং প্রফেশনে যখন এসেই গেলে তখন বি টি'টা করে নাও। আর ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করার সময় তো পাবে না, প্রাইভেটে এম. এ'টা দিয়ে দাও।

মিশনারি স্কুলে মাইনে-টাইনে মোটামুটি ভালোই ছিল কিন্তু তাতে বাড়ি ভাড়া দিয়ে সংসার চালাতে কষ্টই হত। তা ছাড়া হল টল তেমন না পাওয়ায় রাধাবিনোদের গ্রুপ থিয়েটারের শো এই সময়টা বহুদিন প্রায় বন্ধই ছিল। তাঁকেও হাত খরচের টাকা দিতে হত। সেজন্য দু-একটা টিউশনি করেছেন নিরুপমা।

স্কুলে পড়ানো, প্রাইভেটে এম. এ'র জন্য প্রস্তুতি, টিউশনি—এ সবের ফাঁকে ফাঁকে রাধাবিনোদের কেরিয়ার তৈরির দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। প্রায়ই বলতেন, 'শুধু গ্রুপ থিয়েটারের দু-চারটে শোয়ের আশায় বসে থাকলে চলবে না। ক'টা দর্শক আর এই সব নাটক দেখে। সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছুতে হলে ফিল্মে তোমাকে নামতেই হবে। সিনেমার চেয়ে বড় মিডিয়াম আর নেই।'

রাধাবিনোদ বলছেন, 'সিনেমায় কে আমাকে চান্স দেবে? ফিল্মওলাদের কাউকেই আমি চিনি না।'

'চিনি না বললে তো হবে না, তাদের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা কর।'

রাধাবিনোদ ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জোগাড় করে ফিল্ম ডিরেক্টর আর প্রোডিউসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। আনকোরা একজন অভিনেতাকে সিনেমায় সুযোগ দিতে কেউ রাজি হয়নি।

হতাশাজনক এই সময়টায় একটা দারুণ নাম-করা রঙিন ফিল্ম ম্যাগাজিনের একটি রিপোর্টার চেতলার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, রাধাবিনোদেরই প্রায় সমবয়সী। দারুণ টগবগে, প্রাণবন্ত যুবক। তার কাজ হল স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘুরে নানা ছবির শুটিং কভার করা আর গ্রুপ থিয়েটারের যে সব নাটক হয় সেগুলোর সমালোচনা লেখা। ক'দিন আগে দক্ষিণ কলকাতার একটা মঞ্চে রাধাবিনোদের অভিনয় দেখে সে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে ঠিকানা জোগাড় করে ছুটে এসেছে। এর আগে কাগজে রাধাবিনোদের প্রশংসা বেরুলেও কেউ বাড়িতে আসেনি। ফলে রাধাবিনোদ এবং নিরুপমা দারুণ খুশি। সেদিন আর নিরুপমার স্কুলে যাওয়া হয়নি। ম্যাগাজিনের প্রতিবেদক, অর্থাৎ অশোক নামের যুবকটি এসেছিল সকালের দিকে। তার সঙ্গে রাধাবিনোদের অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল, তখন আর স্কুলে যাওয়া যায় না।

নানা কথার মধ্যে একসময় অশোক রাধাবিনোদকে বলেছিল, 'আপনি শুধু এই নাটক নিয়ে পড়ে আছেন কেন? ফিল্মে চলে আসুন। দেখবেন একটা ফাটাফাটি ব্যাপার হয়ে যাবে।'

নিরুপমা বলেছেন, 'আমিও সেই কথাই বলি। ওকে আপনি একটু বোঝান তো।'

রাধাবিনোদ বিষণ্ণ হেসে জানিয়েছেন, বেশ কিছু সিনেমার লোকের সঙ্গে তিনি ফোনে কথা বলেছেন বা তাদের বাড়ি গিয়ে দেখা করেছেন কিন্তু তার ফলাফল সুখকর হয়নি।

কিছুক্ষণ কী ভেবে অশোক বলেছে, 'ওভাবে হবে না। নানা স্টাইলে নানা পোশাকে আপনার ক'টা কালার ছবি আমাকে দিন। সেই সঙ্গে কোন কোন নাটকে কী ধরনের রোলে অভিনয় করেছেন সেগুলো ইংরেজিতে টাইপ করে কয়েক কপি জেরক্স করে দেবেন। অ্যাপ্রোচটা সব দিকে প্রফেশনাল হওয়া দরকার।' অশোকের মধ্যে একটা দারুণ একবগ্‌গা ব্যাপার রয়েছে। তার মাথায় কিছু একটা চাপলে সেটি না করে ছাড়ে না। তার মনে হয়েছিল, রাধাবিনোদের মতো একজন দক্ষ অভিনেতার সিনেমায় বড় রকমের ব্রেক পাওয়া উচিত। ফোটোগুলো নিয়ে সে নিজে প্রোডিউসার আর ডিরেক্টরদের কাছে গেছে। জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে ফিল্মের লোকেদের সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। নিজেদের ছবির প্রচারের জন্য অশোককে তাদেরও প্রয়োজন। ফিল্মওলাদের মাথায় রাধাবিনোদের কথাটা শুধু ঢুকিয়ে দেয়নি অশোক, নিজেদের কাগজে তাঁর নতুন রঙিন ছবির সঙ্গে চমৎকার রাইট-আপ ছেপে পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র খুব তাড়াতাড়ি একজন চোখ-ধাঁধানো নায়ক পেতে চলেছে। নিজে তো লিখেছেই, অন্য সব কাগজে তার যে বন্ধুরা কাজ করত তাদের দিয়েও রাধাবিনোদ সম্পর্কে লিখিয়েছে। এতগুলো কাগজে লেখালিখি হওয়াতে দারুণ একটা পাবলিসিটি হয়ে গিয়েছিল, তার রেজাল্টও পাওয়া যাচ্ছিল। প্রডিউসার বা ডিরেক্টরদের কাছে থেকে ডাক পেতে শুরু করেছিলেন রাধাবিনোদ।

অশোক গ্রুপ থিয়েটারের একজন প্রায়-অচেনা অভিনেতার জন্য যে সারা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তোলপাড় করে ফেলেছিলে তার পেছনে কোনো স্বার্থ ছিল না। একজন অসাধারণ তারকাকে আবিষ্কার করে বাংলা সিনেমাকে উপহার দিয়েছে, এতেই সে তৃপ্ত।

প্রথম দিকে মাঝারি মাপের রোল দেওয়া হচ্ছিল রাধাবিনোদকে। কখনও নায়কের বন্ধু, কখনও নায়িকার ভাই, ইত্যাদি। এভাবে কিছুদিন চলার পর একজন প্রডিউসার সাহস করে এবং বলা যায় ঝুঁকি নিয়েই রাধাবিনোদকে নায়কের ভূমিকায় নামিয়েছিলেন। সিনেমায় হিরো হিসেবে রাধাবিনোদ নামটা খুবই বেখাপ্পা, তাই এ সময় ওটা বদলে দেওয়া হয়। রাধাবিনোদ তখন থেকেই সঞ্জয়কুমার।

প্রথম ছবিটাই হিট করে গিয়েছিল। তারপর থেকে সঞ্জয়কুমারকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রডিউসারদের লিমুজিন ওঁদের বাড়ির সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছিল।

একজন সফল চিত্রতারকা, যাঁকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ছে তাঁর পক্ষে ক'দিন আর চেতলার ছোট, দমচাপা, দু'কামরার ফ্ল্যাটে থাকা যায়? সঞ্জয়কুমারেরা ল্যান্সডাউন রোডে, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একটা চার কামরার বড় ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিলেন। তার মধ্যে নিরুপমা বি টি পাস করেছেন আর প্রাইভেটে এম. এ'টাও। ততদিনে শমিতারও জন্ম হয়েছে।

সেই যে বক্স অফিস সাকসেস দিয়ে আরম্ভটা হয়েছিল তারপর পরপর সাতটা ছবি সুপার হিট। বাংলা সিনেমার কোনো নায়কের এ জাতীয় হিটের রেকর্ড নেই। আর হিটের পর হিট মানেই আরো টাকা, আরো খ্যাতি, আরো গ্ল্যামার।

সঞ্জয়কুমারকে ঘিরে স্বপ্নবৎ রঙিন ঘূর্ণির মতো পৃথিবী তখন দুরন্ত গতিতে ঘুরে চলেছে।

আচমকা অজস্র টাকা আর জনপ্রিয়তা মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল সঞ্জয়কুমারের। অর্থ আর গ্ল্যামারের সঙ্গে হাজার রকমের ভাইস ক্রমশ তাঁকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। পার্টি, হুইস্কি

আর নারী তখন বড় বেশি সুলভ। হাজার হাজার তরুণী—সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার থেকে অভিজাত পরিবার পর্যন্ত, সবাই তাঁকে একটু দেখা বা সামান্য একটু ছোঁয়ার জন্য উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটছে। নায়িকারা তাঁর সঙ্গে অভিনয় করার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে যেন মারাত্মক এক প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল। যারা বেশিমাত্রায় বেপরোয়া, একেক দিন ছোঁ মেরে সঞ্জয়কুমারকে শুটিংয়ের পর তুলে নিয়ে হোটেলে গিয়ে রাত কাটিয়ে দিত। তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য এভাবে তাদের নরম, উষ্ণ, লোভনীয় শরীরকে তারা টোপ হিসেবে ব্যবহার করত যাতে সঞ্জয়কুমার তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেন। তিনি যে নায়িকাকে চাইবেন, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এমন প্রডিউসারের সাহস ছিল না আপত্তি করে। সঞ্জয়কুমার ছবিতে থাকা মানেই সে ছবি হিট। আর হিট ছবির নায়িকাদেরও তো বাজার দর চড়ে যায়। সঞ্জয়কুমারের সঙ্গে শোওয়ার একমাত্র কারণ হল টাকার অঙ্ক বাড়ানো আর নিজেদের কেরিয়ারকে আরো ঝকঝকে করে তোলা। যে নায়িকা তাঁর হিরোইন হওয়ার সুযোগ পায় তার গ্ল্যামার দশগুণ বেড়ে যায়। অনেক উঁচু আকাশের এই তারকাটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবতীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তারা শুধু হিস্টিরিয়ার ঘোরে দূর থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা বিজনেসম্যানের গ্ল্যামার-আক্রান্ত মেয়েদের এতই জোর যে তাঁর কাছাকাছি ঘেঁষলে বাধা দেওয়ার সাহস কারুর নেই। এদের কেউ কেউ তাঁকে জোর করে তাদের লিমুজিনে তুলে উধাও হয়ে যেত। এইসব মেয়েদের শরীর ঝাঁঝাল, বেপরোয়া সেক্সের বারুদ দিয়ে ঠাসা। উদ্দাম রাত কাটিয়ে পরদিন সঞ্জয়কুমারকে তারা ছিবড়ে করে ছাড়ত।

ফিল্মের শুটিং, পার্টি, হুইস্কি আর নারীসঙ্গ ক্রমশ নিরুপমাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছিল। দু'দিন, চারদিন, পরে পনেরো কুড়ি দিন পর একবার বাড়িতে ফিরে খানিকক্ষণ কাটিয়ে চলে যেতেন সঞ্জয়কুমার। নিরুপমা আর শমিতার প্রতি তাঁর টান যেন বাইরের হাজারটা তীব্র আকর্ষণে কমে আসছিল। এ দিকে রঙিন ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনগুলো জমকালো স্ক্যান্ডালের গন্ধ পেয়ে গেছে। এদের বোধহয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো একটা করে দুর্দান্ত গোয়েন্দা দপ্তর রয়েছে। তারা গোপন ষড়যন্ত্রকারীর মতো পেছনে লেগে থেকে সঞ্জয়কুমার কোন হিরোইন বা বিজনেসম্যানের মেয়ের সঙ্গে কোন হোটেলে, গেস্ট হাউস বা অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটাচ্ছেন তার খবর নিয়ে, ছবি তুলে ছাপিয়ে দিত। গাঁজানো তাড়ির মতো সঞ্জয়কুমারের চটচটে কেচ্ছায় তখন আবহাওয়া মাত হয়ে গেছে।

সেই চেতলায় থাকার সময় থেকেই অশোকের সঙ্গে নিরুপমাদের ঘনিষ্ঠতা। ক্রমশ সেটা বাড়ছিলই। ল্যান্সডাউন রোডে উঠে আসার পরও নিয়মিত সে আসত, সপ্তাহে দু'দিন তো নিশ্চয়ই। অশোক সত্যিসত্যিই এই পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী। একমাত্র তার কাগজেই সঞ্জয়কুমারের কোনো স্ক্যান্ডাল বেরোয়নি।

সঞ্জয়কুমারের রাতারাতি এই আমূল পরিবর্তন তাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল। সে নিরুপমাকে বলেছে, 'কাগজে যা সব বেরুচ্ছে, আপনার কি চোখে পড়ে?'

নিরুপমা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। বলেছেন, 'পড়ে বইকি। না পড়লেও লোকে এসে দেখিয়ে যায়। দু-একটা বাজে কাগজ থেকে আমার কাছে এ ব্যাপারে কমেন্টের জন্যে এসেছিল। আমি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'সঞ্জয়কে ফেরানো দরকার। নইলে আপনাদের ফ্যামিলি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছু একটা করুন।'

'আমি কী করতে পারি বলুন। তার সঙ্গে আমার তো প্রায় দেখাই হয় না—'

একটু ভেবে অশোক বলেছে, 'ঠিক আছে, দেখি ওকে ধরে আনতে পারি কিনা।'

দিন তিনেক বাদে অশোক সঞ্জয়কুমারকে কোত্থেকে যেন ধরে নিয়ে এসেছিল। তাঁকে ঘিরে হাওয়ায় হাওয়ায় যে কেচ্ছার আঁশটে গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, সোজাসুজি সেই প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল। সঞ্জয়কুমার হেসে হেসে প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। বলেছেন, 'এই সব বাজে ব্যাপার নিয়ে কেন যে মাথা ঘামাচ্ছ বুঝতে পারি না। কোনো মানে হয়?'

অশোক এবং নিরুপমা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'তুমি এ সব মিথ্যে বলছ?'

'আরে বাবা, ফিল্ম লাইনে নাম-টাম করলে কিছু স্ক্যান্ডালও জুটে যায়। সেটা কি তোমরা জানো না?'

ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর সঞ্জয়কুমার আর অশোক পরস্পরকে তুমি করে বলত। অশোক বলেছে, 'আমি কাগজের লোক। কোনটা মিথ্যে কোনটা সত্যি, তা আমার জানা আছে। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। নিজের ফ্যামিলি লাইফটা নষ্ট কোরো না।'

নিরুপমাও অনেক বুঝিয়েছেন, কান্নাকাটি করেছেন কিন্তু সঞ্জয়কুমার যে খুশি হননি সেটা তাঁর থমথমে মুখ দেখে বোঝা গেছে।

সে দিনের পরও কিন্তু তাঁর নতুন লাইফ-স্টাইল এতটুকু পালটায়নি।

স্বামীকে ফেরানোর জন্য কম চেষ্টা করেননি নিরুপমা। যেখানে যেখানে তাঁকে পাওয়া সম্ভব সেই সব জায়গায় ছুটেছেন। স্টুডিওতে গিয়ে বসে থেকেছেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কখনও সখনও বাড়িতে নিয়েও আসতে পেরেছেন কিন্তু বেশির ভাগ সময় পারেননি। শুটিং অনেক রাত পর্যন্ত এক্সটেনসন হবে, এই কারণে সঞ্জয়কুমার স্টুডিওতে থেকে গেছেন। কিন্তু নিরুপমার পক্ষে অতক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি, কেননা শমিতার বয়স তখন মাত্র দু-তিন বছর। যদিও তার জন্য আয়া টায়া রাখা হয়েছিল, তবু তাদের ওপর খুব একটা ভরসা করতে পারতেন না নিরুপমা. সাতটা সাড়ে-সাতটা বাজলেই বাড়ি ফিরে আসতেন।

টাকা, চমৎকার সাজানো ফ্ল্যাট, গাড়ি, সুখ এবং আরামের অজস্র উপকরণ— কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু নিরুপমার মনে হত এ সব নিছকই অর্থহীন। মনে হত এতটা স্বার্থপর, হৃদয়হীন, অমানুষের জন্য নিজের জীবনটা নেহাতই ধ্বংস করে ফেলেছেন। নিরুপমার মানসিক অবস্থাটা যখন এইরকম, বম্বে থেকে সঞ্জয়কুমারের কাছে দুর্দান্ত সব অফার আসতে লাগল। তিনি তাদের ফিরিয়ে দিলেন না, হিন্দি ছবিতে না নামলে সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে পৌঁছুনো যায় না। তিনি দু-একটা অফার বেছে নিলেন এবং নিজের উদ্দাম জীবনযাপনের মধ্যে একদিন এসে নিরুপমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন, তিনি কাজের জন্য বম্বে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন।

নিরুপমা বুঝতে পারছিলেন, কলকাতায় থাকলে সঞ্জয়কুমারের সঙ্গে তবু মাঝে মধ্যে দেখা হত, এখন তিনি একেবারেই নাগালের বাইরে চলে যাবেন। ঘুড়ির সুতো পুরোপুরি কেটে গেল; আর তাঁকে ফেরানোর উপায় নেই। অসীম হতাশা আর শূন্যতায় ক্রমশ ডুবে যেতে থাকেন নিরুপমা।

বম্বে যাওয়ার কিছুদিন পর ওখানকার রঙিন একটা ট্যাবলয়েডে দারুণ উত্তেজক খবর বেরুল। ওই শহরেরই এক বাঙালি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মেয়ের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। সঞ্জয়কুমারের সঙ্গে সেই মেয়েটি অর্থাৎ রোমির ছবিও বেরিয়েছে। এরপর অন্য কাগজগুলো একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁঝাল কেচ্ছায় পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলল তারা। তার উত্তাপ কলকাতায় এসেও লাগল।

খবরগুলো চোখে পড়ার পর অশোক নিরুপমার কাছে ছুটে এসেছিল। বলেছিল, 'বউদি, আপনি বম্বে চলে যান।'

বিষণ্ণ হেসে নিরুপমা বলেছেন, 'কিছু লাভ হবে না। কলকাতাতেই তো কত মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করল। আমি কি ঠেকাতে পেরেছি? কিছুই করার নেই অশোকদা—'

এর কিছুদিন বাদে বম্বে থেকে গণেশ এসে হাজির। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাঝারি, পেটানো স্বাস্থ্য, কটা চোখ, চৌকো ধরনের মুখ, এবং চওড়া মাংসল কাঁধ—সব মিলিয়ে বোঝা যায় তার মধ্যে অনেকখানি নিষ্ঠুরতা লুকনো রয়েছে। লোকটা একসময় ছিল মার্কামারা মস্তান। কত যে ছোরাছুরি আর পাইপ গান চালিয়েছে তার হিসেব নেই। এখন অবশ্য অনেক ভদ্র বা বিনয়ী হয়েছে। আগের মতো মারমুখী উগ্রতা নেই। সঞ্জয়কুমার যখন প্রথম সিনেমার হিরো হন তখন থেকে গণেশ তাঁর সঙ্গে লেগে আছে। সে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। অনেকটা বডিগার্ড বা পার্সোনাল সেক্রেটারির মতো।

গণেশকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন নিরুপমা। বলেছেন, 'কী ব্যাপার, দাদাকে ছেড়ে হঠাৎ কলকাতায় চলে এলে!' সিনেমার হিরোদের দাদা বলা রেওয়াজ। সঞ্জয়কুমারকে তাই গণেশও দাদা বলে থাকে।

গণেশ হাতজোড় করে, কাঁচুমাচু মুখে, প্রচুর ধানাইপানাই করে যা এবার বলেছে তা এইরকম। সঞ্জয়কুমার বম্বের শিল্পপতির মেয়ে রোমিকে বিয়ে করবেন। যেহেতু হিন্দু কোড বিল পাস হয়ে গেছে সে জন্য নিরুপমার সঙ্গে তাঁর আইনসম্মত বিবাহ-বিচ্ছেদটা পাওয়া প্রয়োজন। সঞ্জয়কুমার কোনোরকম তিক্ততা চান না। অশান্তি বা উত্তেজনা তাঁর আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। চুপচাপ ডিভোর্সটা মেনে নিলে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন নিরুপমা। কয়েক লাখ টাকা ছাড়াও, বড় একটা ফ্ল্যাট এবং একটা নতুন গাড়ি এবং মাসে মাসে হাজার দশেক করে টাকা। বাকি জীবন আরামে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যাবে তাঁর।

প্রথমটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল নিরুপমার। তারপর মাথার ভেতর আগুনের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছিল, চোখের সামনের দৃশ্যমান সমস্ত কিছু গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে নিরুপমা বলেছেন, 'তোমার দাদাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বল। আর এটা জানিয়ে দিও আমার ঘুষের প্রয়োজন নেই।'

তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন। মা-বাবার কাছে ফেরার উপায় ছিল না। আর শ্বশুরবাড়িতেও যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, তাদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। আসলে পেছন দিকের সবগুলো সেতু ভেঙে তিনি বাড়ি থেকে একদা বেরিয়ে এসেছিলেন।

শিল্পপতির মেয়েকে সঞ্জয়কুমার বিয়ে করবেন শুনে প্রথমটা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন নিরুপমা। কী হবে তাঁর এবং শমিতার ভবিষ্যৎ, সে সম্পর্কে দিনকয়েক কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেননি। তাঁর ভাবনাচিন্তা তখন এলোমেলো, অস্থির, পর্যুদস্ত। অবশ্য তারপরেই অনমনীয় এক জেদ তাঁর ওপর যেন ভর করেছিল। সঞ্জয়কুমারের মতো এক লম্পট, বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য ছাড়াই তিনি নিজের তো বটেই, শমিতার ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত করে দেবেন।

কলকাতা অসহ্য লাগছিল। মাস দুয়েকের ভেতর গোল্ডেন ভ্যালি টি গার্ডেনসের চাকরি জোগাড় করে উত্তর বাংলায় চলে এসেছিলেন নিরুপমা। তারপর কুড়িটা বছর এখানেই কেটে গেল।

এর মধ্যে শমিতাকে বড় করে তুলেছেন তিনি। তাঁর স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছিল শমিতা। তারপর দশ মাইল দূরের একটা কলেজ থেকে বি. এ করে এম. এ পড়তে কলকাতায় গিয়েছিল। মাত্র দু'টো বছর সে কলকাতার হস্টেলে থেকেছে। তা ছাড়া বাকি বছরগুলো সে মায়ের কাছ-ছাড়া হয়নি।

শমিতার মনে আছে, কোনোদিন নিরুপমার মুখে সঞ্জয়কুমারের কথা শোনেনি। শান্ত, অন্তর্মুখী, নিজের মধ্যে নিবিষ্ট এই মহিলাটির প্রাক্তন স্বামী সম্পর্কে কী ধরনের মনোভাব সেটা

বুঝতেই পারেনি সে। এমনকি যে সব ডায়েরি মা তাকে পড়তে দিয়েছিলেন সেগুলোতে তাঁদের ডিভোর্সের পর থেকে সঞ্জয়কুমার সম্বন্ধে একটি লাইনও নেই। নিরুপমার জীবন থেকে তিনি যেন সম্পূর্ণ মুছে গেছেন। কিংবা এমনও হতে পারে, নিরুপমাই তাঁর স্মৃতিকে টেনে নিয়ে যাওয়া আর প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু কাল সঞ্জয়কুমারের মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর যেভাবে তিনি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছেন তাতে মনে হয়েছে মুখে কিছু না বললেও বা দিনলিপিতে তাঁর কথা না লিখলেও বিবাহবিচ্ছেদের বাইশ বছর বাদেও এই মানুষটি গোপনে নিরুপমার সমস্ত জীবন জুড়েই ছিলেন। ...

পরদিন ট্রেনটা কলকাতায় পৌঁছুল সকালের দিকে। তখনও ন'টা বাজেনি। সতীনাথকে কালই ফোন করে আসার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন নিরুপমা। তিনি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছিলেন।

নিরুপমাকে দেখে চমকে উঠেছেন সতীনাথ। তাঁর ওপর দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল যেন। সতীনাথ কিছু বলার আগে নিরুপমা ভাঙা ভাঙা, আবছা গলায় জিগ্যেস করেছেন, 'ওকে কোথায় রাখা হয়েছে?'

সতীনাথ বলে, 'চৌরঙ্গির একটা হল-ঘরে।'

শমিতা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার মনে পড়ে গেল, কাল রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল সঞ্জয়কুমারের মরদেহ বিকেল পর্যন্ত ওখানেই রাখা হবে।

নিরুপমা বলেন, 'আমাকে সেখানে নিয়ে চল--'

সতীনাথ বলেন, 'তোমাকে দেখে ভীষণ খারাপ লাগছে। সারারাত নিশ্চয়ই ঘুমোওনি। আগে আমাদের বাড়ি চল। একটু রেস্ট নিয়ে ওখানে যাবে।'

'না। আমি সোজা ওখানে যেতে চাই।'

নিরুপমার কণ্ঠস্বরে এমন এক দৃঢ়তা ছিল যে দ্বিতীয় বার আর বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলা গেল না। সতীনাথ শুধু বললেন, 'ঠিক আছে।'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গির কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল অজস্র শোকাচ্ছন্ন মানুষ তাদের প্রিয়তম শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে চলেছে। আরো খানিকটা গেলে দেখা গেল, বিশাল জনতা লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হুড়োহুড়ি বা হইচই নেই। সব সুশৃঙ্খল। গোটা পরিবেশ জুড়ে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এসেছে। নানা বয়সের নারীপুরুষ যারা কিউতে দাঁড়িয়ে আছে তাদের অনেকের হাতেই বড় বড় ফুলের তোড়া বা মালা। প্রায় কেউই কথা বলছিল না। সঞ্জয়কুমারের আকস্মিক মৃত্যু তাদের একেবারে বিহ্বল করে ফেলেছে। দু-একজন যদিও বা বলছিল তা-ও অনুচ্চ, চাপা গলায়। তবে কয়েকটি তরুণীকে ফুঁপিয়ে কাঁদতেও দেখা যাচ্ছে।

সঞ্জয়কুমার সম্বন্ধে কোনোদিনই তেমন একটা কৌতূহল ছিল না শমিতার। তবে তিনি যে খুবই জনপ্রিয় এই ধারণাটা অবশ্যই ছিল। কিন্তু এত অসংখ্য মানুষ তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর আকস্মিক মৃত্যু তাদের এভাবে নাড়া দিয়ে গেছে, আজ কলকাতায় না এলে জানা যেত না। এই গম্ভীর শোককাতর পরিবেশে এমন কিছু রয়েছে যা শমিতাকে ক্রমশ বিহ্বল করে ফেলতে লাগল। সঞ্জয়কুমার সম্পর্কে তার মনে যে ইমেজটি রয়েছে তা খুবই খারাপ। চিরকাল এই স্বার্থপর, দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক লোকটি সম্বন্ধে তার মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণা, আক্রোশ আর ক্রোধ জমা হয়ে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সব যেন ভুলে গেল সে। গাড়ির ব্যাক সিটে পাশাপাশি তারা তিনজন বসে ছিল—শমিতা, নিরুপমা আর সতীনাথ। শমিতা চোখের কোণ দিয়ে একবার মায়ের দিকে তাকায়। নিরুপমা নিঃশব্দে অঝোরে কেঁদে চলেছেন। হঠাৎ তার মনে হল,

আজ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এক চিত্রতারকার জন্য যে হাজার হাজার অনুরাগীর ঢল নেমেছে রাস্তায়, তাঁকে একটু একটু করে সৃষ্টি করেছেন এই মহিলাটি। অথচ বিপুল জনতার একজনও নিরুপমাকে চেনে না।

ফুটপাথে দীর্ঘ লাইন থাকলেও রাস্তার দিকটায় মসৃণভাবে গাড়িটাড়ি চলতে পারছিল কিন্তু যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের হল-এ সঞ্জয়কুমারের মরদেহ শায়িত সেখানে আসতে দেখা গেল বিশাল জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের হয়তো লাইন দিয়ে অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য নেই। তবে বিশৃঙ্খলা কোথাও চোখে পড়ছে না। জায়গাটা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। দু-চারজন ডিসি বা এসি জাতীয় অফিসারও রয়েছেন। তাঁরা সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন।

সতীনাথ বললেন, 'আর তো গাড়ি নিয়ে এগুনো যাবে না। কিন্তু যা ক্রাউড আর পুলিশের কড়াকড়ি, লাইন ছাড়া ভেতরে ঢুকতে দেবে কিনা কে জানে।' তাঁকে বেশ চিন্তিত দেখাল।

নিরুপমা বললেন, 'তা হলে লাইনে গিয়েই দাঁড়াই।'

'না না, দেখি কী করা যায়।' ড্রাইভারকে রাস্তার উলটোদিকে গাড়িটা পার্ক করতে বলে নিরুপমাদের নিয়ে নেমে পড়েন সতীনাথ। তারপর ভিড়ের ভেতর রাস্তা করে এগিয়ে গেলেন। বিশাল বাইশ-তলা বাড়িটার সামনের দিকে লোহার প্রকাণ্ড গেট। সেখানেও ক'জন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা সতীনাথদের থামিয়ে দিলেন। সতীনাথ নিরুপমাকে দেখিয়ে একজন অফিসারকে নিচু গলায় কিছু বললেন। খুব সম্ভব তাঁর পরিচয় দিয়ে থাকবেন। অফিসার চকিত হয়ে এবং সসম্ভ্রমে নিরুপমাদের ভেতরে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিলেন।

গেটের পর অনেকটা ফাঁকা জায়গা, তার দু'ধারে সুদৃশ্য ফোয়ারা এবং ফুলের বাগান। তারপর পাথরে-বাঁধানো চওড়া চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে প্রকাণ্ড চাতাল। সেখানে নানা কাগজের অগুনতি সাংবাদিক এবং ফোটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া সুষ্ঠুভাবে যাতে জনতা সঞ্জয়কুমারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারে সেজন্য বড় বড় সরকারি অফিসার এবং ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকজনেরা রয়েছেন।

শমিতারা যখন চাতালের মাঝামাঝি চলে এসেছে সেই সময় কেউ যেন বলে ওঠেন, 'বউদি, আপনি—'

তারপরেই দেখা গেল সাংবাদিকদের ভেতর থেকে মধ্যবয়সী একটি লোক এগিয়ে এলেন। চুলের আধাআধি সাদা হয়ে গেলেও অশোককে চিনতে অসুবিধে হল না শমিতাদের। নিরুপমার বিবাহ বিচ্ছেদের পর সতীনাথের মতো অশোকও মাঝেমধ্যে উত্তর বাংলায় গিয়ে তাঁদের খোঁজখবর নিয়েছেন। অবশ্য শেষের দিকে আট দশ বছর আর যাননি।

নিরুপমা ধরা গলায় বললেন, 'এ সময় না এসে কি পারা যায়?'

অশোক বললেন, 'ঠিক। আসুন আমার সঙ্গে—'

চাতালের পর কাচের দরজা পেরিয়ে অশোকের সঙ্গে হল-ঘরে চলে এলেন নিরুপমারা। সঞ্জয়কুমারের মরদেহ শোয়ানো রয়েছে একটি ফুলের বিছানায়। বিছানা বাদ দিলেও চারিদিকে ফুলের তোড়া আর মালার পাহাড়। চন্দনের গন্ধওলা অজস্র ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফুল এবং ধূপের সুগন্ধে সুবিশাল হল-ঘরটা ভরে আছে। কোথায় যেন খুব ধীর লয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বাজানো হচ্ছে।

মরদেহ ঘিরে এখানেও প্রচুর ভিড়। মন্ত্রী, এম. এল. এ, এম. পি, শিল্পপতি, গায়ক থেকে কলকাতা বম্বে আর মাদ্রাজের বিখ্যাত অনেক চিত্রতারকা। আর রয়েছে ক্যামেরাসুদ্ধ টিভির লোকজনেরা। তারা ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয়কুমার সম্পর্কে সবার মন্তব্য টেপ করে রাখছে।

অভিভূতের মতো সঞ্জয়কুমারকে লক্ষ করছিল শমিতা। মনে হয় না তিনি মৃত। যেন চোখ বুজে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। কতক্ষণ শমিতা তাকিয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সঞ্জয়কুমারের মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন রোমি দত্ত—তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। রোমির পাশে তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। ছেলেটির বয়স আঠারো উনিশ, মেয়েটির ষোল সতেরো। সঞ্জয়কুমারের সঙ্গে এদের ছবি বহুবার নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাই দেখামাত্রই চিনতে পারল শমিতা। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা কঠোর হয়ে যায়। মনে হয়, এরা তাকে আর নিরুপমাকে বঞ্চিত করে সঞ্জয়কুমারকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

এই সময় কে একজন টিভির লোকেদের রোমির কাছে নিয়ে আসে। বলে, 'ইনি সঞ্জয়কুমারের স্ত্রী। এঁর জন্যেই সঞ্জয়কুমার সঞ্জয়কুমার হতে পেরেছেন। এঁর একটা—'

লোকটার কথা শেষ হতে না হতেই মাথার ভেতর যেন রক্তবাহী কোনো শিরা ছিঁড়ে যায় শমিতার। চিৎকার করে বলে ওঠে, 'সব মিথ্যে, আটার লাই।' এক কোণে সবার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখের জলে সঞ্জয়কুমারকে শেষ বিদায় জানাচ্ছিলেন নিরুপমা। দৌড়ে গিয়ে তাঁর একটা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে যেন বলে, 'এই মহিলা, সঞ্জয়কুমারের প্রথম স্ত্রী নিরুপমা দত্তর স্যাক্রিফাইস ছাড়া তিনি কোথায় থাকতেন? পৃথিবীর কেউ তাঁর নামও জানত না। এই মহিলা নিজের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন সবাইকে ত্যাগ করে একদিন সঞ্জয়কুমারের জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপর—' তার মা যা যা করেছেন সব একটানা বলে যায়।

বিব্রত, স্তম্ভিত নিরুপমা তাকে থামাতে চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না।

সবাই হতচকিত। সমস্ত হল-ঘরে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন।

ট্রেন

১৯৭৬

এ কাহিনিকে নিখুঁত, শাস্ত্র-সুলক্ষণ একটি গল্প বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই সংশয় রয়েছে। সব গল্পের মতো অবশ্যই এর একটা শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।

আসলে এটি আমার অভিজ্ঞতার কাহিনি। এর কপালে গল্পের শীলমোহর লাগিয়ে সদর দরজায় এনে দাঁড় করাতে আমার খুবই আপত্তি। দাঁড় করালে মিথ্যা ভাষণের দায় থেকে মুক্তি নেই। দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতাটার মানহানি ঘটে যায়।

মনে পড়ে, সাত বছর আগে ভুসাওয়াল জংসনে নয়না শ্রীবাস্তব আর অর্জুন শ্রীবাস্তবকে দেখে চমক লেগেছিল। পরের দিন বোম্বাইতে ফিরেই তাদের কথা যদি লিখে ফেলতাম, লেখাটার গায়ে সেই চমকের রেশ খানিকটা ফুটে থাকত।

সাত বছর পর আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে সেদিনের সেই বিস্ময়, বিমূঢ়তা আর বিভ্রান্তি নিজের মধ্যেই অনেকখানি থিতিয়ে গেছে। তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সত্তার অতল স্তরে ঢেউ তুলতে তা যথেষ্টই। সেটুকু দিয়ে অনায়াসেই একটি রহস্য-নাটকের ভূমিকা রচনা করা যায়।

অভিজ্ঞতাটা এইরকম।

সাত বছর আগে ভুসাওয়াল জংসনে একটি ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে ছিলাম। এ ট্রেনটা এখান থেকেই ছাড়ে; গন্তব্য বোম্বাই। আমার দৌড়ও বোম্বাই পর্যন্ত।

সে সময় একটা ওষুধ কোম্পানির আমি ছিলাম সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। অর্থাৎ কোম্পানি আর ওষুধের দোকানদারদের মধ্যে ঘটকালি করতে হত।

আমার হেড অফিস বোম্বাইতে, থাকতাম ভুসাওয়ালে। কোম্পানির মাল চালাবার জন্য জায়গাটা চষে ফেলতাম আর প্রতি মাসে একবার করে হেড অফিসে এসে কাজকর্ম কেমন চলছে তার রিপোর্ট দিয়ে যেতাম।

সেদিন ট্রেনে খুব একটা ভিড় ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কামরাটিতে আমি বসে ছিলাম তাতে মাত্র দশ-বারো জন যাত্রী। বিক্ষিপ্তভাবে তারা এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিল।

সময়টা ছিল রাত্রি। ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর পেরিয়ে গিয়েছিল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রেনটা ছেড়ে দেবে।

মাসটি ছিল ফাল্গুন। নামেই ফাল্গুন। নইলে আকাশে বাতাসে কোথাও ষষ্ঠ ঋতুর ঘোর লেগে নেই। সাত বছর আগের সেই দিনটার মতিগতি রীতিনীতি—সব কিছুই ছিল হেমন্তের বিষণ্ণতার দিকে। জানালার বাইরে যতদূর চোখ যায় শুধুই কুয়াশা—গাঢ়, নিবিড়, স্তরে স্তরে সাজানো নিবিড় কুয়াশা। দুর্ভেদ্য যবনিকার মতো সেই কুয়াশা চারিদিকে অনড় হয়ে ছিল।

দূরমনস্কের মতো বাইরে তাকিয়ে ছিলাম।

এদিকে অভ্রান্ত নিয়মে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যেই দু'বার ঘন্টি হয়ে গেছে। তৃতীয় ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ গার্ড এবং ইঞ্জিনের হুইসিল শোনা যাবে। তারপরেই বিশাল-দেহ এই লোহার সরীসৃপ ছুটতে শুরু করবে।

তৃতীয় ঘন্টিটি সবেমাত্র পড়তে শুরু করেছে, সেই সময় কামরার দরজা খুলে ব্যস্তভাবে প্রায় হুড়মুড় করে যারা উঠে এল তাদের একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ।

কত বয়স হবে পুরুষটির? চল্লিশোর্ধ্ব তো বটেই, তবে পঞ্চাশের অনেক নিচে। প্রৌঢ়? তা একরকম বলা যায়। তবে যৌবন তখনও তার ওপর থেকে পুরোপুরি দখল ছাড়েনি।

লোকটি আশ্চর্য সুপুরুষ। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর তার; মেরুদণ্ড ঋজুরেখায় ওপর দিকে উঠে গেছে। চওড়া কবজি, তীক্ষ্ণ নাক, বিস্তৃত বুক। গায়ের রং টকটকে—গৌরবর্ণই বলা যায়। নিখুঁত কামানো মুখে মোমে-মাজা কাঁচাপাকা গোঁফ—যার প্রান্ত দু'টি বহুকালের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম। চওড়া মোটা জুলপি দু'টি গালের মাঝামাঝি নেমে এসেছে।

এই নাক, এই মুখ, এই রং—সব মিলিয়ে এমন চেহারা এ অঞ্চলে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে দুর্লভ। এ রূপ পুরোপুরি আর্যাবর্তের।

লোকটির পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি, ফিনফিনে ধুতি। মাথায় জরির কাজ-করা হলুদ পাগড়ি। চোখের কোণে সুর্মার টান। পায়ে শৌখিন নাগরা। সাজসজ্জায় সামন্ত যুগ থেকে খুব বেশি দূরে সে এগিয়ে আসতে পারেনি।

পুরুষটির তুলনায় রমণীটির বয়স অনেক কম। সে যে তরুণী—এর মধ্যে সংশয়ের অবকাশ নেই। কপালের আধাআধি পর্যন্ত ঘোমটা টানা। কনুই থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত, মুখটা, গলার কিছু অংশ আর পায়ের পাতা দু'খানি—এ ছাড়া সমস্ত শরীরই ছিল তার দামি বেনারসিতে মোড়া।

তার দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরাতে পারিনি। সে যেন আমাকে পলকে যাদু করে ফেলেছিল। চোখ দু'টি তার বিশাল; মাঝখানে নীল মণি দু'টি যেন টলটলে সরোবর। পুরষটির মতোই তার নাক তীক্ষ্ণ। তবে গায়ের রং আরো দীপ্ত, আরো রক্তাভ। ছোট্ট কপালের পর থেকেই কুঞ্চিত ঘন চুলের ঘের। গলার যে অংশটুকু দেখতে পেয়েছিলাম সেখানে কোনো রেখা নেই; একেবারে পেলব আর মসৃণ। হাতের আঙুলের সঙ্গে চাঁপার কলির উপমা দেওয়া

হয়। সেটা বোধহয় অতিরঞ্জন নয়। অন্তত তরুণীটির হাতের দিকে তাকিয়ে আমার তাই মনে হয়েছিল। মেয়েটি যেন পুতুল—তুলতুলে মোমের পুতুল।

মনে আছে, কামরায় উঠে তারা এক কোণে জানালার ধার ঘেঁষে পাশাপাশি বসে ছিল। তার একটু পরেই ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

আমার দৃষ্টিটা কিন্তু মেয়েটির মুখের ওপর স্থির হয়েই ছিল। এমন রূপসী কি আগে আর দেখিনি? নিশ্চয়ই দেখেছি। তবে অমন অভব্যের মতো তাকিয়ে ছিলাম কেন? সেটা অকারণে নয়।

মেয়েটির রূপ আমার সমস্ত সত্তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল ঠিকই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একসময় চোখ নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিতাম। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে ফেরানো হয়নি। মেয়েটির মুখে বাইরের গাঢ় কুয়াশার মতো পৃথিবীর সবটুকু বিষণ্ণতা যেন জমা হয়ে ছিল। নিষ্প্রাণ, অনুভূতিশূন্যের মতো পুরুষটির পাশে বসে ছিল সে। জীবনের কোনো লক্ষণই তার মধ্যে আবিষ্কার করা যাচ্ছিল না।

মনে পড়ে, দু-তিনটে বড় স্টেশন পেরিয়ে একটা ছোট ফ্ল্যাগ স্টেশনে হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষটি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'বড় তিয়াস পেয়েছে, সোরাইটা দাও তো। পানি নিয়ে আসি।'

লক্ষ করেছি, গাড়িতে ওঠার পর এই তাদের প্রথম কথা। না, আমার অনুমান ভুল নয়। যে হিন্দিটা সে বলল তা শুনেই নিঃসংশয় হওয়া গেছে, তারা উত্তর ভারতের মানুষ।

তাদের সঙ্গে চামড়ার একটা সুটকেস, একটা হোল্ড-অল আর ছিল বেতের প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি। নিঃশব্দে ঝুড়ির ভেতর থেকে কাচের সোরাই বার করে সঙ্গীর হতে দিয়েছে তরুণীটি। তারপর অতল গভীর বিষাদের মধ্যে আবার ডুবে গেছে।

আর সোরাই পেয়েই কামরার দরজা খুলে স্টেশনে নেমে গেছে পুরুষটি। তারপর?

তারপর ঘড়ির কাঁটায় সময় পাক খেয়ে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে দশটি মিনিট কেটে গেছে। কিন্তু—কিন্তু পুরুষটি ফেরেনি।

একসময় প্ল্যাটফর্মের ঘন্টি এবং গার্ডের হুইসল—একই সঙ্গে বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন চলতে শুরু করে দিয়েছে।

দূরে বসে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বুকের ভেতর শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সর্বনাশ—জল আনতে লোকটা গেল কোথায়? এদিকে এই মেয়েটি একা। তার ওপর ট্রেনও ছেড়ে দিয়েছে এবং ক্রমশ তার গতিও বেড়ে যাচ্ছে। এখন কী করা যায়?

ওদিকে সেই বিষাদময়ী মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিল সে। কিন্তু গাঢ় কুয়াশার যবনিকা ভেদ করে কিছু দেখবে, সাধ্য কী!

কামরার অন্য সব যাত্রী, যারা ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল—হতভম্ব হয়ে গেছে। কী করা উচিত, তারা যেন বুঝে উঠতে পারছিল না।

নাঃ, আমি আর বসে থাকতে পারি। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী করব? কী করলে বোম্বাইগামী এই গাড়ির কামরায় সেই লোকটিকে ফিরিয়ে আনা যায়? ভাবতে গিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কর্তব্যটা মনে পড়ে গেছে। লাফ দিয়ে সিটের ওপর উঠে চেন টেনে দিয়েছি। তারপর মেয়েটির সামনে গিয়ে জিগ্যেস করেছি, 'যে ভদ্রলোক জল আনতে নেমে গেছেন, উনি আপনার কে?'

জানালার বাইরে বুক পর্যন্ত বার করে তাকিয়ে ছিল মেয়েটি। আমার কথা কানে যেতে শরীরের ওপর দিকটা ভেতরে নিয়ে এসেছে। তারপরেই নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

বুঝতে পেরেছিলাম, অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস তার নেই। সম্ভবত যে জগতে তার বাস সেটা এখনও অসূর্যম্পশ্যা, আধুনিক কালের আলো-বাতাস সেখানে বিশেষ পৌঁছুতে পারেনি।

আমি বলেছিলাম, 'এখন লজ্জার সময় নয়। বলুন উনি কে?'

এবার ঘোমটার তলা থেকে মৃদু কণ্ঠ ভেসে এসেছে, 'আমার স্বামী।'

'কী নাম?'

মেয়েটি এবার উত্তর দেয়নি।

আমি অসহিষ্ণু সুরে বলেছিলাম, 'নামটা না জানলে কী বলে ডাকব? যদি অন্য কামরায় উঠে থাকেন? কিংবা স্টেশনেই যদি থেকে যান—নামটা জানা থাকলে সুবিধে হবে।'

মেয়েটি নাম বলে নি। তবে একটি কাগজে ভাঙা-ভাঙা বাঁকাচোরা নাগরী হরফে লিখে দিয়েছিল, অর্জুন শ্রীবাস্তব। হাতের লেখা দেখেই অনুমান করা যায়, মেয়েটি বেশি লেখাপড়া জানে না।

এদিকে গাড়িটা থেমে গিয়েছিল। খানিক পর কালো উর্দি-পরা গার্ডের মুখ দেখা দিয়েছে। কেন চেন টানা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করেছেন। আমি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছি।

তারপর শুরু হয়েছিল খোঁজা। গার্ড সাহেব এবং আমি তো ছিলামই। আমাদের কামরার আরো জনকয়েক এগিয়ে এসেছিল।

প্রতিটি কামরায় আমরা হানা দিয়েছিলাম। অর্জুন শ্রীবাস্তবের নাম ধরে ডেকেছিলাম। কিন্তু না, তাকে কোথাও পাওয়া যায় নি।

অবশেষে আমরা স্থির করেছিলাম, সেই ছোট ফ্ল্যাগ স্টেশনটিতে গিয়ে খুঁজে দেখব।

গাড়িটা একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এখান থেকে ফ্ল্যাগ স্টেশন আধ মাইলের মধ্যে। আমরা জনপাঁচেক রেল লাইন ধরে কুয়াশার দেওয়াল ঠেলে ঠেলে ফিরে গিয়েছিলাম। গার্ড সাহেব অবশ্য যাননি। গাড়িটাকে অনাথ করে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা ফেরা পর্যন্ত গাড়ি আটকে রাখবেন।

ফ্ল্যাগ স্টেশনেই অর্জুন শ্রীবাস্তবকে আবিষ্কার করা গিয়েছিল। অর্জুনের কথা বলার আগে স্টেশনটার একটু পরিচয় দেওয়া যাক। স্টেশন বললে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। অতখানি গৌরব তার প্রাপ্য নয়। অ্যাসবেস্টসের আব্রুহীন সংক্ষিপ্ত ছাউনি। তার তলায় ইতস্তত দু-চারটে বেঞ্চি ছড়িয়ে ছিল। আর ছিল খান দুই তিন তেলের বাতি। কত বছর যে বাতিগুলোর কাচ পরিষ্কার করা হয় নি! ফলে কালি জমে জমে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যাতে ভেতরের আলো বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। যেটুকুও বা এসেছে, চারিদিকের নিবিড় কুয়াশা আর অন্ধকার অপসারিত করার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম, স্টেশনটা একেবারে নির্জন। সম্ভবত যে লোকটি ফ্ল্যাগ দেখিয়ে ট্রেন পাস করায় তার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। ডেরায় ফিরে গিয়ে সেই মুহূর্তে সে হয়তো নিজেকে বিছানায় সঁপে দিয়েছে।

উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে এই জনহীন স্টেশনটিতে একটি মাত্র লোকই ছিল। সে অর্জুন শ্রীবাস্তব। তার দিকে তাকিয়ে আমি প্রথমটা স্তম্ভিত, তারপর বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম।

দু'টো বেঞ্চি জোড়া লাগিয়ে তার ওপর বসে ছিল লোকটা। শুধু বসে যে ছিল তা নয়। পরম তৃপ্তির সঙ্গে সিগারেট টানছিল আর গল গল করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। সিল্কের পাঞ্জাবিটা খুলে তালগোল পাকিয়ে বালিশের মতো করে একপাশে রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ সিগারেটটা শেষ হলেই পরিপাটি একটি ঘুমের জন্য সে শুয়ে পড়বে।

আশ্চর্য, লোকটার চোখেমুখে উদ্বেগের একটি রেখাও ফুটে নেই। স্ত্রী অসহায়ের মতো বোম্বাইগামী ট্রেনে চলে গেছে, সে সম্বন্ধে কোনো দুর্ভাবনার লক্ষণই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নি। পৃথিবীর সব চাইতে সুখী, পরিতৃপ্ত আর ভাবনাশূন্য মানুষের মতো অর্জুন শ্রীবাস্তব সেই জনহীন প্রান্তরে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় বসে ছিল। শাস্ত্রে কি এদেরই মুক্তপুরুষ বলা হয়েছে?

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটা কেঁপে গিয়েছিল অর্জুনের। রীতিমতো চকিত হয়ে উঠেছে সে।

আমি বলেছিলাম, 'আপনার নাম অর্জুন শ্রীবাস্তব নিশ্চয়ই?'

'জি।' অর্জুন মাথা নেড়েছিল। সবিস্ময়ে বলেছিল, 'লেকিন—'

'কী?'

'আপনি আমার নাম কী করে জানলেন?'

'আপনার স্ত্রীর কাছে শুনেছি।'

অর্জুন শ্রীবাস্তব এবার হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলেছে, 'আমার স্ত্রীর কাছে? কিন্তু সে তো বোম্বাইয়ের ট্রেনে রয়েছে!'

'জি।' আমি বলেছিলাম, 'আমিও ওই ট্রেনে ওই কামরাতেই ছিলাম। ভুসাওয়াল থেকে আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে উঠতেও দেখেছি। আপনি হয়তো আমাকে খেয়াল করেন নি।'

বিমূঢ়ের মতো অর্জুন শ্রীবাস্তব বলেছিল, 'জি, না। লেকিন—'

'কী?'

'আপনি ট্রেনে ছিলেন। কিন্তু এখানে—আমার কাছে—'

অর্জুন শ্রীবাস্তবের মনোভাবটা বুঝতে পেরে বলেছিলাম, 'আমি লক্ষ করেছি, আপনি জল আনবার জন্যে এই স্টেশনে নেমে গিয়েছিলেন। তাবপর আর ফেরেন নি। এদিকে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল—'

অর্জুন শ্রীবাস্তব ব্যস্তভাবে বলে উঠেছিল, 'হাঁ হাঁ, তিয়াস লাগতে সোরাই নিয়ে পানির খোঁজে এখানে নেমেছিলাম। কিন্তু কোথাও পানি মেলে নি। এদিকে ছাতি আমার ফেটে যাচ্ছিল। তাই—তাই নজদিকের একটা গাঁও-এ গিয়েছিলাম পানি আনতে। ভেবেছিলাম, তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারব। এসেও ছিলাম। লেকেন টিশনে ঢুকতে না-ঢুকতে ট্রেনটা ছেড়ে দিলে।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'ট্রেনটা ধরতে না পেরে কী ভাবনা যে হয়েছিল! স্ত্রী একা রইল কামরায়। হা রে আমার ছাতির তিয়াস! পাগলের মতো যে লোকটা এখানে ঝাণ্ডা দেখায় তার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। সে বললে, আজ আর কোনো উপায় নেই। কাল সুবেতে বোম্বাইয়ের একটা ট্রেন আছে। সেটা ধরে স্ত্রীর খোঁজ করতে পারেন। কী আর করি, রাত্তিরটা এখানে কাটানো ছাড়া আর কোনো পথ দেখতে পাই নি।'

একদৃষ্টে, প্রায় নিষ্পলক অর্জুন শ্রীবাস্তবের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। লোকটা কি চতুর অভিনেতা? স্ত্রীর জন্য তার দুশ্চিন্তার কথাগুলো বলেছে বটে, কিন্তু একটু আগে তার মুখেচোখে তেমন কোনো লক্ষণই তো ছিল না। একান্ত নির্ভাবনায় আর পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে সে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। আমার সমস্ত সত্তার ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কী এক প্রতিক্রিয়া যেন ঘটে গিয়েছিল। তবে কি— তবে কি—

আমার মধ্যে যে চমকটা খেলে গিয়েছিল ভালো করে সেটা বিশ্লেষণ করবার আগেই অর্জুন শ্রীবাস্তব আবার বলে উঠেছিল, 'তা বাবুজি, বললেন না তো আমার এখানে কিভাবে এলেন—'

অন্যমনস্কের মতো বলেছিলাম, 'ট্রেনটা ছেড়ে দেবার পর আপনার স্ত্রী অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আমিও কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে আপনার খোঁজ করতে করতে এখানে এসে পড়েছি। নিন—এখন চলুন—'

এবার এক কাণ্ডই করে বসেছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব। লাফ দিয়ে উঠে আমার একখানা হাত বুকের ভেতর টেনে নিয়ে কাঁপা আবেগে রুদ্ধ স্বরে বলেছিল, 'বহুত—বহুত সুক্রিয়া বাবুজি। আপনার জন্যে আমার বিপদটা কাটল। কী উপকার যে আমার করলেন—'

তার উচ্ছ্বাস আমার প্রাণে ঢেউ তুলতে পারে নি। নিজের হাতখানা কোনোরকমে মুক্ত করে নিস্তরঙ্গ সুরে আগের কথাটাই আবার উচ্চারণ করেছিলাম, 'তাড়াতাড়ি চলুন। গাড়ি অনেকক্ষণ আটকে রয়েছে।'

'হাঁ হাঁ, চলিয়ে—' বলেই যে পাঞ্জাবিটা ডেলা পাকিয়ে এতক্ষণ বালিশ হয়ে ছিল সেটা ব্যস্তভাবে গায়ে চড়িয়ে জলভর্তি সেই কাচের সোরাইটা বেঞ্চির তলা থেকে তুলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব।

রেলের লাইন ধরে কুয়াশা আর অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমরা ট্রেনের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে সমানে ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব। কিভাবে, কোন ভাষায় বললে কৃতজ্ঞতাটা সঠিক বোঝানো যাবে, সেটাই যেন বুঝে উঠতে পারছিল না সে।

ধন্যবাদের ফাঁকে ফাঁকে অর্জুন বলেছিল, 'আপনার মতো উপকারী আদমি সারা জিন্দেগিতে আমি আর দেখি নি। আপনি ওই কামরায় না থাকলে কী বিপদ যে আমার হত!'

আমি উত্তর দিই নি।

অর্জুন শ্রীবাস্তব আবার বলেছিল, 'আপনি আমার খানদানের ইজ্জত বাঁচিয়েছেন বাবুজি।'

এবারও আমি নিশ্চুপ।

অর্জুন শ্রীবাস্তব বলে যাচ্ছিল, 'নৈনীর কাছে আমাদের প্রকাণ্ড হাভেলি আছে। আমরা ওখানকার জমিন্দার। স্ত্রীকে যদি ফিরে না পেতাম, জমিন্দারিতে আমার শির নিচু হয়ে যেত বাবুজি। তাছাড়া—'

এতক্ষণে আমি মুখ খুলেছিলাম, 'তা ছাড়া কী?'

'আমাদের সমাজে বড় বেশি আব্রু। হাভেলি থেকে কদাচিৎ মেয়েরা বাইরে বেরুতে পারে।' অর্জুন শ্রীবাস্তব বলে যাচ্ছিল, 'আমার স্ত্রীকে আজ না পেলে ভারী মুশকিল হত।'

'কিরকম?' নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্নটা করে বসেছিলাম।

'আমার স্ত্রী কোনোদিন হাবেলি থেকে বার হয় নি। দুনিয়ার হালচাল কিছুই সে জানে না। আপনার মতো ইমানদার আদমি আর ক'জন? মানুষের ছদ্মবেশে বেশির ভাগই তো চিতা, নেকড়ে, শিয়ার আর সাপ। আমার স্ত্রী কার হাতে যে গিয়ে পড়ত!'

যা অনুমান করেছিলাম তা-ই। মেয়েটি অসূর্যম্পশ্যাই। এবার আর কিছু বলি নি। অর্জুন শ্রীবাস্তব ফের বলে উঠেছে, 'আরেকটা কথা বাবুজি—'

'কী?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু গাঢ় কুয়াশা আর অন্ধকারে অর্জুন শ্রীবাস্তবের মুখ ঝাপসা হয়ে ছিল।

অর্জুন বলেছিল, 'আজ আমি স্ত্রীকে যদি না পেতাম আরেক দিক থেকে বিপদ ছিল। আমাদের খানদানের কানুন হচ্ছে এই, যে ঔরত একটা রাতও কোনো কারণে আত্মীয়স্বজন ছাড়া আলাদা থাকবে তাকে তার হাভেলিতে ঢোকানো হয়ে না।'

আমি শিউরে উঠেছিলাম। কিছু একটা বলতেও চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু গলার মধ্য থেকে অব্যক্ত গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল শুধু।

অর্জুন বলেছিল, 'ধরুন, আমার স্ত্রীকে আজ যদি না-ই পেতাম আর দু-দশ রোজ বাদে কাউকে ধরে সে বাড়ি পৌঁছুত, তার সামনে হাভেলির দরজা কিছুতেই খুলত না। ওদিকে বাপের বাড়িতে গিয়ে যে উঠবে, তারও উপায় নেই। সেখানকার দুয়ারও খুলত না। তাই বলছিলাম বাবুজি, বহুত—বহুত সুক্রিয়া। আমার খানদানের ইজ্জত আপনি বাঁচিয়েছেন।'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর হঠাৎ আমি বলে উঠেছিলাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার স্ত্রীকে যদি আজ না-ই পেতেন তাতে তাঁর তো কোনো দোষ ছিল না।'

'না, তা ছিল না।'

'তবে দিনকয়েক পরে তিনি ফিরে গেলে তাঁকে ঘরে তুলতে আপত্তি কী?'

'আপত্তি কিসের? না—কিছুমাত্র না।' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে অর্জুন শ্রীবাস্তব বলেছে, 'তবে কিনা—'

'কী?' আমি প্রশ্ন করেছি।

'সে যত নির্দোষই হোক, আমাদের খানদানের কানুন অনুযায়ী তাকে হাভেলিতে জায়গা দেওয়া যাবে না। কোনোমতেই না। উপায় নেই বাবুজি, হাত-পা একেবারে বাঁধা।'

আরেক বার আমি শিউরে উঠেছিলাম। কী উত্তর দেওয়া যায় সেই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

সীমাহীন নীরবতার মধ্যে একসময় আমরা ট্রেনে ফিরে এসেছিলাম। আর কামরায় উঠতে না-উঠতেই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। সেই তরুণীটি উন্মত্তের মতো অর্জুন শ্রীবাস্তবের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। কামরায় যে আরো মানুষ আছে এবং তারা যে তাকিয়ে রয়েছে, হাভেলির দেওয়ালে ন্দিনী মেয়েটির সেদিকে কোনো লক্ষ্যই ছিল না।

অর্জুন শ্রীবাস্তব বিব্রত বোধ করছিল। স্ত্রীর হাতের বেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু পারছিল না। চাপা গলায় বলেছিল, 'ছাড়—ছাড়—'

মেয়েটি ছাড়ে নি। তার বাহুবন্ধন ক্রমশ আরো প্রবল আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে ফুলে ফুলে একটানা কান্না তো চলছিলই।

সেই অবস্থাতেই অর্জুন শ্রীবাস্তব স্ত্রীকে নিয়ে সিটে গিয়ে বসেছিল। কোমল গলায় বলেছিল, 'কেঁদো না, কেঁদো না নইনা, কেঁদো না। আমি তো ফিরেই এসেছি।'

নইনা অর্থাৎ নয়না। অর্জুন শ্রীবাস্তবের স্ত্রীর নাম তা হলে নয়না শ্রীবাস্তব।

স্বামীর কথায় নয়নার কান্না কিন্তু থামেনি। বরং উত্তাল হয়ে উঠেছিল। জড়িত, ভীত, ভাঙা গলায় সে বলেছিল, 'তুমি—তুমি আমাকে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিলে—'

স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পরম স্নেহে অর্জুন শ্রীবাস্তব বলেছিল, 'তুমি পাগল হয়েছ নইনা! আমি কি তোমাকে ফেলে পালাতে পারি, না পারা সম্ভব! তুমি আমার ধরমপত্নী। না—না, ওকথা তুমি মনেও এনো না। ওসব যদি ভাবো, আমাকে তা হলে আত্মহত্যা করতে হবে।' একটু থেমে আবার শুরু করেছিল, 'পানি আনতে তো আগের টিশনে নেমেছিলাম। ওখানে পানি না পেয়ে গিয়েছিলাম এক গাঁও-এ। ফিরে এসে দেখি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।'

স্বামীর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে নয়না শ্রীবাস্তব বলেছিল, 'ঝুট—ঝুট, সব ঝুট।'

এবার যেন কিছুটা অবাকই হয়ে গিয়েছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব। নিজের বুক থেকে স্ত্রীর মুখটা তুলে ধরে বলেছিল, 'কী ঝুট?'

'তুমি আমাকে যা বললে। তোমার পানি আনতে যাওয়াটা ঝুট—একটা বাহানা মাত্র। আসল মতলব হচ্ছে আমাকে ফেলে পালানো।'

বয়স্ক প্রবীণ অভিভাবক যেমন করে সকৌতুক হাসিমুখে শিশুর অসংখ্য অন্যায় উপেক্ষা করে তেমনই একটি ভাব ফুটে উঠেছিল অর্জুন শ্রীবাস্তবের মুখে। স্নিগ্ধ হেসে সে বলেছিল, 'নাঃ, মাথাটা তোমার একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে নইনা। ডাক্তারের কাছে আর না নিয়ে গেলেই নয়।'

অর্জুন শ্রীবাস্তবের কথা শেষ হয়েছে কি হয় নি, হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসেছে নয়না। স্বামীকে নিজের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর অর্জুনের চোখে চোখ রেখে বলেছে, 'আমার শির খারাপ হয়েছে?'

হাসতে হাসতে ঘাড় হেলিয়ে অর্জুন শ্রীবাস্তব বলেছে, 'হাঁ—জরুর।'

এবার সমস্ত পরিবেশ ভুলে গিয়ে আত্মবিস্মৃতের মতো নয়না শ্রীবাস্তব চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আমার শির খারাপ হয়ে গেছে! আমার শির খারাপ হয়ে গেছে! তা হলে—তা হলে—'

'কী?' অর্জুন শ্রীবাস্তবের মুখ থেকে হাসিটা তখনও বিলীন হয়ে যায় নি।

'তিন রোজ আগে ইলাহাবাদ টিশনে একটা ট্রেনে আমাকে তুলে দিয়ে তুমি যে সরে যেতে চেয়েছিলে—বল, বল—সেটা মিথ্যে? ঝুট?' নয়নার চোখ যেন জ্বলছিল।

দূরে নিজের সিটটিতে বসে একটা চমকপ্রদ রহস্য-নাটকের সংলাপ শুনছিলাম যেন। নয়নার শেষ কথাগুলো কানে যেতে মনে হয়েছিল, মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত দুরন্ত বেগে শিরশিরিয়ে নেমে গিয়েছিল। লক্ষ করেছিলাম, অর্জুন শ্রীবাস্তবের মুখ থেকে একটু আগের হাসিটুকু দপ করে নিবে গেছে।

নয়না শ্রীবাস্তব থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছিল, 'সেদিন সেই কুলিটা যদি তোমাকে খুঁজে বার না করত, আমার কপালে কী যে ছিল!'

স্তিমিত সুরে অর্জুন শ্রীবাস্তব বলে যাচ্ছিল, 'কী বলছ তার মাথামুণ্ডু নেই। নাও, আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বোসো।'

নয়না শ্রীবাস্তব বসে নি। হঠাৎ স্বামীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে আবার ফোঁপাতে শুরু করেছিল, 'দশ রোজ আগে হাভেলি থেকে কেন আমাকে নিয়ে বেরিয়েছিলে? কেন—কেন? বল—তোমার ইচ্ছেটা কী? বল—'

'ইচ্ছে আবার কী?' স্ত্রীকে দু'হাতে পায়ের কাছ থেকে তুলে এনে নিজের পাশে বসিয়েছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব। তারপর আশ্বাসের সুরে বলেছিল, 'কোনো খারাপ ইচ্ছে নেই নইনা। হাভেলি থেকে তো বেরুতে পারো না, তাই একটু দেশ ঘুরতে বেরিয়েছি তোমাকে নিয়ে।'

'না না—' অবুঝের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে কান্না এবং ত্রাসে বিকৃত ভারী গলায় নয়না শ্রীবাস্তব বলেছিল, 'ঘুরতে বেরুনো সত্যি নয়। তুমি আমার জীবন বরবাদ করে দিতে চাও। লেকেন—'

'কী?'

'আমি তো—আমি তো—' মাত্র এটুকুই বলতে পেরেছিল নয়না শ্রীবাস্তব। তারপরেই স্বরটা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অর্জুন শ্রীবাস্তব আবার প্রশ্ন করেছে, 'তুমি কী?'

'আমার বাপের বাড়ির দেশের সেই ছেলেটা—রাজীব শর্মা, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখি নি। আমার শাদির পর তোমার কাছে চলে এলাম। আমার সঙ্গে দেখা করতে সে তোমার

হাভেলিতে আসত। তোমাকে তো সবই বলেছি, রাজীব আমাকে একদিন শাদি করতে চেয়েছিল। আমাকে না পেয়ে সে খেপে গেছে। সে যদি খেপে যায় আমার কী কসুর? বল, কী কসুর আমার? কেন তুমি আমার জিন্দেগি নষ্ট করে দিতে চাও?'

অনুচ্চ, চাপা গলায় অর্জুন শ্রীবাস্তব বলেছিল, 'রাজীবই তোমাকে শাদি করতে চেয়েছিল, তুমি তাকে চাও নি?'

'আমার কুঁয়ারী জীবনে কী চেয়েছিলাম, সেকথা ভুলে গেছি।'

'বিলকুল ভুলে গেছ?'

'হাঁ।'

দূরে বসে লক্ষ করেছিলাম, অর্জুন শ্রীবাস্তবের চোখ দু'টো দপ করে জ্বলে উঠেছে। তার মুখে পৃথিবীর সবটুকু অবিশ্বাস আর ঘৃণা যেন মাখানো। মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই মুখটা আবার কোমল হয়ে গেছে তার, চোখ দু'টি হয়ে উঠেছে স্নেহতরল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ গলায় বলেছে, 'আর কথা নয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার শুয়ে পড়।'

বিচিত্র এই দম্পতি কিন্তু বোম্বাই পর্যন্ত যায় নি। তার কিছু আগে একটা স্টেশনে নেমে গেছে।

মনে পড়ে, অর্জুন শ্রীবাস্তব আর নয়না শ্রীবাস্তব নেমে যাওয়ার পরও তাদের ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই দু'টি মানুষের কথাবার্তা, আচার-আচরণ এবং চোখমুখের নানা প্রতিক্রিয়া আমার হাতে কিছু বিচ্ছিন্ন সূত্র তুলে দিয়েছিল। মাঝখানের ফাঁকগুলো কল্পনা দিয়ে রিপু করে সেই সূত্রগুলোর সাহায্যে একটা কাহিনি গড়তে চেষ্টা করেছিলাম— সেই চির পুরাতন, ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি। যার এক প্রান্তে ছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব, এক প্রান্তে রাজীব শর্মা আর তৃতীয় প্রান্তে নয়না শ্রীবাস্তব।

নয়নার বিয়ের আগে, সম্ভবত ছেলেবেলা থেকেই রাজীবের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। হতে পারে রাজীব তাদের পাশের বাড়ির ছেলে। সেই সুবাদে নয়নাদের বাড়িতে যাতায়াতে বাধা ছিল না। ধরে নেওয়া যাক, শৈশব এবং কৈশোরটা তাদের একই সঙ্গে কেটেছে। তারপর যৌবনের শুরুতে বুকের ভেতর আবেগের নদী যখন টলমল, পৃথিবী যখন স্বপ্নময়, জীবন যখন রঙিন স্রোতের মতো---সেই সময়, ঠিক সেই সময় রাজীব এবং নয়না নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল। তারা অনুভব করেছিল, পরস্পরকে না পেলে তাদের বেঁচে থাকা নিরর্থক। খুব সম্ভব তারা স্থির করেছিল, বিয়ে করবে। বিয়েটা যদি কোনো কারণে না হয়, পরিচিত জগতের কোলাহল থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে।

কিন্তু—কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত নয়নার সঙ্গে রাজীবের বিয়ে হয়নি। হতে পারে তারা অসবর্ণ কিংবা অভিভাবকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি। আবার আজন্মের পারিপারিক বন্ধন ছিন্ন করে কোথাও চলে যাবার মতো মনের জোরও হয়তো ছিল না। থাকলেও শেষ মুহূর্তে বুঝিবা তাদের মধ্যে সংশয়ের ছায়া পড়েছে। হয়তো—হয়তো নয়নাই নারীত্বের চিরন্তন সংস্কারে অনিশ্চয়তায় ঝাঁপ দিতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছে।

অবশেষে একদিন নয়নার সঙ্গে অর্জুন শ্রীবাস্তবের বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর বুকের ভেতর পুরনো আগুন বুঝি নিবে যায় নি। রাজীব শর্মা তাই প্রায়ই অর্জুন শ্রীবাস্তবের হাভেলিতে আসা-যাওয়া শুরু করেছিল।

প্রথম প্রথম, খুব সম্ভব নয়নার বাপের বাড়িতে দেশের লোককে আনাগোনা করতে দেখে খুব একটা অখুশি হয় নি অর্জুন শ্রীবাস্তব। তারপর ধীরে ধীরে তার মনের গভীর স্পর্শকাতর জায়গাটায় ছায়া পড়েছে। সেই ছায়াটা একদিন তীব্র সন্দেহের আকার নিয়েছিল। হতে পারে, নয়নার সঙ্গে রাজীবকে কোনো ঘনিষ্ঠ আপত্তিকর অবস্থায় সে আবিষ্কার করেছে। হতে পারে স্ত্রীকে এই নিয়ে তিরস্কারও করেছে। আর তারই ফলে নয়না শ্রীবাস্তব রাজীবকে অর্জুন শ্রীবাস্তবের হাভেলিতে আসতে বারণ করে দিয়েছিল।

খুব সম্ভব রাজীব শর্মার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু হয়তো নয়না শ্রীবাস্তবের সঙ্গে অন্য কোনো গোপন পথে তার যোগাযোগটা অব্যাহত ছিল। আবার না-ও থাকতে পারে।

এদিকে অর্জুন শ্রীবাস্তবের অস্তিত্বের গহন অন্ধকারে কী প্রতিক্রিয়া চলছিল, কে বলবে। এরই মধ্যে একদিন স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছিল সে। তারপর এলাহাবাদ স্টেশনে নয়নাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নিজে উঠতে ভুলে গিয়েছিল। সেদিন একটা কুলি তাকে খুঁজে বার করে নয়নার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

আরেক দিন সেই ফ্ল্যাগ স্টেশনে জল আনতে নেমে ট্রেন ধরতে পারে নি অর্জুন শ্রীবাস্তব। সেদিন আমি তাকে ফিরিয়ে এনেছিলাম।

মনে পড়ে, সাত বছর আগে অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত স্ত্রীর কাছে স্বামীকে পৌঁছে দিতে পেরে মহৎ কাজ করার গর্বে খানিকটা স্ফীত যে না হয়েছিলাম, তা নয়। আত্মতুষ্টিতে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছিলাম।

কিন্তু—কিন্তু সাত বছর পর আজ সেই অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আরেকটি সম্ভাবনা আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সত্তা স্তম্ভিত হয়ে গেল যেন। পৃথিবীতে বোম্বাইগামী একটি মাত্র ট্রেনই তো নেই। কে বলতে পারে, আর কোনো ট্রেনে নয়নাকে তুলে দিয়ে অর্জুন নিজে উঠতে ভুলে গেছে কিনা অথবা কোথাও জল আনতে নেমে আর ফেরেই নি!

স্বাদ

কাচের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের এই ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। মেঝেতে মেরুন রঙের ম্যাট্রেস, এক ধারে গ্লাসটপ সেক্রেটারিয়েট টেবল, রঙিন টেলিফোন, ফোম-লাগানো চেয়ার, মাথার ওপর ঝকঝকে সিলিং ফ্যান—এ ঘরের সব কিছুর মধ্যেই সুরুচির ছাপ।

এখান থেকে বাইরে তাকালে মহেশমুণ্ডা শহরের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। ছোটনাগপুরের ছোট্ট নিরিবিলি শহর মহেশমুণ্ডা এক কথায় চমৎকার।

এই মুহূর্তে অজিতেশ তাঁর চেয়ারটিতে বসে ডান দিকের জানালা দিয়ে অলস চোখে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

আজ তেমন কাজের চাপ নেই। ফাইল-টাইল যা ছিল, সব দু'টোর মধ্যে পরিষ্কার করে দিয়েছেন অজিতেশ। ক্লিয়ারেন্সের জন্য গোটা পঞ্চাশেক চেক জমা পড়েছিল, ফিক্সড ডিপোজিট আর লকারের জন্য এসেছিল আট দশজন লোক। সে সবও দু'টোর মধ্যেই চুকে গেছে। তারপর থেকে চেয়ারে আধশোয়ার মতো করে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে মহেশমুণ্ডা শহরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কলকাতা হেড অফিস থেকে মাত্র এক মাস হল মহেশমুণ্ডার ব্রাঞ্চে ম্যানেজার করে অজিতেশকে পাঠানো হয়েছে। এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ভীষণ ভালো লেগে গেছে তাঁর।

অজিতেশের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নাকমুখ কাটা-কাটা; শরীরে বয়সের ভার তেমন পড়ে নি। তবে চুলের আধাআধি রুপোর তার হয়ে গেছে। তিনি অবিবাহিত। এই ব্যাঙ্ক-বাড়িটার দোতলায় তাঁর কোয়ার্টার। অজিতেশের সংসার পুরোপুরি ভৃত্যতান্ত্রিক। একটি চাকর আর রান্নার জন্য একটা মৈথিলি বামুন ছাড়া এখানে তাঁর আর কেউ নেই।

এখন চারটের মতো বাজে। সময়টা জুনের মাঝামাঝি। আকাশ জুড়ে কালো কালো মেঘেরা হানাদারের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে আর ক'দিনের মধ্যেই বর্ষা নেমে যাবে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় মহেশমুণ্ডা শহরটাকে ফ্রেমে আটকানো একখানা ছবির মতো মনে হচ্ছে। জায়গাটার পাহাড়ী মেজাজ। চারিদিকে চড়াই আর উতরাই। উতরাইয়ের ঢালে ঢালে এবং টিলার মাথায় নানা জাতের গাছপালা—দেবদারু, ওক, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি। এসবের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর সুন্দর বাড়ি; আর চোখে পড়ে কালো ফিতের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা। দূরে পেন্সিলের অস্পষ্ট আঁচড়ের মতো পরেশনাথ পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে।

দূরমনস্কর মতো দেখে যাচ্ছিলেন অজিতেশ। হঠাৎ কে যেন খুব কাছ থেকে ডেকে উঠল, 'স্যার—'

চমকে ঘুরে বসতেই অজিতেশ হরিনারায়ণ সান্যালকে দেখতে পেলেন। লোকটা কখন যে ইঁদুরের মতো সুড়ুত করে এ ঘরে ঢুকে পড়েছে তিনি টের পাননি।

হরিনারায়ণের বয়স চুয়ান্ন পঞ্চান্ন, বাঁকানো বেতের মতো ঢ্যাঙা চেহারা। শরীরে মাংসের চাইতে হাড় বেশি। চৌকো মুখ, চোখ এক ইঞ্চি গর্তে ঢোকানো, চুল ধোঁয়াটে রঙের। লোকটা এই ব্যাঙ্কের কেরানি, টাকা তোলার জন্য চেক জমা দিলে ক্লায়েন্টকে টোকেন দেওয়া তার কাজ। তিরিশ বছর ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্বটা পালন করে যাচ্ছে সে।

অজিতেশ শুনেছেন, তিরিশ বছর আগে চাকরি পেয়ে সেই যে হরিনারায়ণ মহেশমুণ্ডার এই ব্রাঞ্চে এসেছিল তারপর থেকে আর নড়ে নি। আসলে ট্রান্সফার আর প্রোমোশনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু তার খুঁটির জোর নেই, ফলে কিছুই হয় নি। তাই এই মহেশমুণ্ডায় জীবন কাটিয়ে দিতে হচ্ছে।

অজিতেশ জিগ্যেস করলেন, 'কিছু বলবেন?'

হরিনারায়ণ টেবলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে হাত কচলাতে কচলাতে খুব বিনীতভাবে বলল, 'স্যার, আজ কি আপনার সময় হবে?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনি বোধহয় আমার ব্যাপারটা ভুলে গেছেন। কথা দিয়েছিলেন আমাদের বাড়িতে যাবেন—'

এবার মনে পড়ে গেল অজিতেশের।

তিনি মহেশমুণ্ডায় আসার পরই হরিনারায়ণ ধরেছিল, একদিন তাদের বাড়ি নিয়ে যাবে। দু-চারদিন পর পরই কথাটা মনে করিয়ে দেয় সে। 'যাব, যাব' করে একমাস কেটে গেছে কিন্তু ব্যাঙ্কের নানারকম কাজে যাওয়াটা আর হয়ে ওঠেনি। ব্যস্তভাবে অজিতেশ বলে উঠলেন, 'না না, ভুলব কেন? আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই যাব।'

হরিনারায়ণের বাঁকানো শরীর আরো একটু ঝুঁকে পড়ল, 'আমার খুব ইচ্ছে, আজই চলুন। অফিস ছুটির পর আমি আপনাকে নিয়ে যাব। আজ আর 'না' বলবেন না স্যার।'

কাজের চাপ টাপ নেই। ছুটির পর হয় দোতলার কোয়ার্টারে গিয়ে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে ইংরেজি ক্রাইম ফিকশান কি থ্রিলার-ট্রিলার পড়ে সময় কাটাতে হবে, নইলে একা একা মহেশমুণ্ডা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন। তার চাইতে হরিনারায়ণের সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে খানিকক্ষণ গল্প টল্প করে সময় কাটিয়ে এলে মন্দ লাগবে না। একটু হেসে অজিতেশ বললেন, 'ঠিক আছে, যাব।'

খুশিতে হরিনারায়ণের ভাঙাচোরা মুখ চকচকিয়ে উঠল। একটু উচ্ছ্বসিতভাবেই সে বলল, 'অ্যাদ্দিনে স্যার, আমি সাকসেসফুল হলাম।'

হরিনারায়ণের এই উচ্ছ্বাসটুকু ভালোই লাগল অজিতেশের। তিনি হাসলেন, কিছু বললেন না।

ঘন্টাখানেক বাদে ব্যাঙ্ক ছুটির পর হরিনারায়ণের সঙ্গে বাইরের রাস্তায় আসতেই সে বলল, 'স্যার, একটা রিকশা ডাকি?'

অজিতেশ জিগ্যেস করলেন, 'আপনার বাড়িটা কতদূরে?'

'উঁচা মহল্লায়।'

উঁচা মহল্লা এই ব্যাঙ্ক থেকে মাইল দেড়েকের মতো রাস্তা। অজিতেশ বললেন, 'রিকশার দরকার নেই, চলুন হাঁটতে হাঁটতে যাই। বিকেলে পায়ে হেঁটে বেড়াতে ভালোই লাগবে।'

হরিনারায়ণ তবু জিগ্যেস করল, 'কষ্ট হবে না তো?'

'একটুও না।'

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন।

এই মহেশমুণ্ডা শহরে কম করে কুড়ি-পঁচিশটা মাইকা মাইন অর্থাৎ অভ্রের খনি রয়েছে। গিরিডিকে বাদ দিলে অভ্রখনির সংখ্যা এখানে সব চাইতে বেশি। ইণ্ডিয়া থেকে যত মাইকা বিদেশে এক্সপোর্ট করা হয় তার সিকি ভাগ জোগায় মহেশমুণ্ডা। এখানকার যে কোনো রাস্তার দু'ধারে চকচকে পাতলা আঁশের মতো অভ্র ছড়িয়ে আছে; কোথাও কোথাও পাহাড়ের মতো অভ্রের স্তূপ চোখে পড়ে।

চড়াই-উতরাই ভেঙে উঁচা মহল্লায় হরিনারায়ণের বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল।

বাড়িটা একটা ছোটখাটো টিলার মাথায়, অনেকটা বাংলো ধরনের। ওপরে টালির চাল, চারধারে ইটের দেয়াল, মেঝে টকটকে লাল সিমেন্টের। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে সুন্দর ফুলের বাগান।

বাইরের ঘরের টিউব লাইট জ্বালিয়ে একটা বেতের সোফায় অজিতেশকে বসিয়ে হরিনারায়ণ বলল, 'স্যার, এক মিনিট আপনাকে একটু একলা থাকতে হবে। আমি ভেতরে খবর দিয়ে আসি।'

অজিতেশ হরিনারায়ণের মতলবটা বুঝতে পেরেছিলেন। হেসে হেসে বললেন, 'বাড়ির লোকদের একদম ব্যস্ত করবেন না। এক কাপ বিনা-চিনি চা ছাড়া আমি কিন্তু আর কিচ্ছু খাব না।'

হরিনারায়ণ বিনীতভাবে হাসল, 'সে দেখা যাবে'খন। এতদিন বলে বলে বাড়ি আনতে পেরেছি। চিনি-ছাড়া শুধু এক কাপ চা খেয়ে গেলে কি আমাদের ভালো লাগবে স্যার?'

'ঠিক আছে, ওর সঙ্গে দু'খানা বিস্কুট দেবেন। নাথিং মোর—'

'আপনার কথা বাড়ির মেয়েদের বলব। তারপর তারা যা ভালো বোঝে তাই করবে। আমার কিন্তু সেখানে হাত নেই।'

হরিনারায়ণ ভেতরে চলে গেলেন। অজিতেশ বসে বসে বাইরের ঘরটা দেখতে লাগলেন।

ঘরটা ভারি ছিমছাম। বেতের সোফা-টোফা ছাড়া এক ধারে কাচের বুক-কেসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলি সাজানো রয়েছে। বুক-কেসটার পাশে গোল একটা টেবলের ওপর হায়দ্রাবাদি ফুলদানিতে একগুচ্ছ টাটকা রজনীগন্ধা। আরেক ধারে কারুকাজ-করা কাঠের স্ট্যাণ্ডে ব্রোঞ্জের একটা নটরাজ মূর্তি। দেওয়ালগুলো হালকা সবুজ রঙের। এক দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটা পেন্সিল স্কেচ, তার উলটো দিকের দেওয়ালটায় একটি হাসিমুখ তরুণীর ফোটো।

ফোটোটা দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। কোথায়, কবে, কতদিন আগে তাকে দেখেছেন, প্রথমটা মনে করতে পারলেন না।

ছবির মেয়েটা দুরন্ত আকর্ষণে তাঁকে যেন টানছিল। পলকহীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর কখন যে নিজের অজান্তে উঠে এসে ফোটোটার সামনে দাঁড়িয়েছেন, অজিতেশের খেয়াল নেই। সেটা দেখতে দেখতে আচমকা বিদ্যুৎচমকের মতো সব মনে পড়ে গেল। সময়ের উজান টানে তিনি যেন তিরিশ বত্রিশ বছর আগের পূর্ব বাংলার এক মফস্বল শহরে ফিরে গেলেন।

তখন অজিতেশের বয়স আর কত? খুব বেশি হলে ষোল সতেরো। আর সুধার চোদ্দ পনেরো। হ্যাঁ, ফোটোর মেয়েটার নাম সুধাই।

ধলেশ্বরী পাড়ের এক ছোট্ট নগণ্য গ্রাম দীঘাপোতা ছিল অজিতেশদের দেশ। তাঁরা ছিলেন ভীষণ গরিব। বাবা দীঘাপোতা হাই স্কুলের সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন; বাড়িটা ছাড়া বাড়তি এক ইঞ্চি জমিজমা ছিল না তাঁদের। সে আমলে বাবা মাইনে পেতেন তেত্রিশ টাকা বারো আনা, আর করতেন যজমানি। এই সামান্য উপার্জনে সাত-আটজনের বিরাট সংসার কিভাবে যে চালাতেন তিনিই জানেন।

অজিতেশকে ঘিরে বাবার উচ্চাশা ছিল আকাশছোঁয়া। ওই অল্প ক'টা টাকা থেকেই কিছু কিছু বাঁচিয়ে তিনি অজিতেশকে পড়িয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, এখন একটু কষ্ট করলে শেষ জীবনে ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেলে ভালো ডিভিডেণ্ড পাবেন।

ফার্স্ট ডিভিসনে অজিতেশ ম্যাট্রিকটা পাশ করায় বাবার উচ্চাশা দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন, ছেলেকে আরো পড়াবেন।

কিন্তু দীঘাপোতা গ্রামে কলেজ টলেজ ছিল না। অনেক ভাবনা চিন্তার পর নবীপুরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল বাবার। নবীপুর তাঁদের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে বেশ নাম-করা একটা মফস্বল শহর; মোটর-লঞ্চে গেলে ঘন্টা তিনেক লাগত। সেখানে একটা ভালো ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল আর ছিলেন মহীতোষ মজুমদার। মহীতোষ নবীপুরের সব চাইতে নাম-করা ফৌজদারি উকিল, দুর্দান্ত পসার তাঁর; হুড় হুড় করে তাঁর ঘরে তখন পয়সা ঢুকছে। নবীপুরে নদীর ধার ঘেঁষে কুড়ি বিঘা জমি ঘিরে পুকুর বাগান এবং তেতলা প্রকাণ্ড বাড়ি বানিয়েছিলেন। সব চাইতে যেটা জরুরি ব্যাপার তা হল মহীতোষ মজুমদার অজিতেশদের দূর

সম্পর্কের আত্মীয় এবং মানুষ হিসেবে খুবই দিলদরিয়া। দু'হাতে যেমন রোজগার করেন, দশ হাতে খরচও করে থাকেন।

মহীতোষের কথা মনে হওয়া মাত্র বাবা তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন যদি অনুগ্রহ করে তিনি অজিতেশকে তাঁর বাড়িতে থেকে কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করে দেন, এ উপকার জীবনে ভুলবেন না। চারদিনের মাথায় উত্তর এসে গিয়েছিল। চিঠি পেয়েই যেন অজিতেশকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে পড়ানোর সব দায়িত্ব মহীতোষের।

উত্তর পাওয়ার পরের দিনই লঞ্চে উঠে নবীপুরে চলে গিয়েছিলেন মহীতোষ।

মনে পড়ে, ভোরবেলা নবীপুরের জেটিঘাটে তাঁদের লঞ্চটা এসে থেমেছিল। তখনও রোদ ওঠে নি। যদিও সময়টা পুজোর কাছাকাছি, পাতলা সিল্কের মতো কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে ছিল।

টিনের সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে আর শতরঞ্চি-মোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা বিছানাটা কাঁধে চাপিয়ে লঞ্চ থেকে নিশ্চল জেটিতে নামতেই বিরাট লম্বা-চওড়া চেহারার একটি লোকের ওপর তাঁর চোখ অনিবার্যভাবেই গিয়ে পড়েছিল। ভদ্রলোকের পরনে ঢলঢলে সাদা ফুল প্যান্ট আর হাফ শার্ট, কোমরে বেল্ট, পায়ে ভারী বুট।

ভদ্রলোকও এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে অজিতেশকে দেখে ফেলেছিলেন। বড় বড় পা ফেলে তাঁর কাছে গিয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, 'তুমি কি দীঘাপোতা থেকে আসছ?'

অজিতেশ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার নাম কি অজিতেশ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি মহীতোষ মজুমদার।'

আত্মীয়তা থাকলেও মহীতোষকে আগে আর কখনও দেখেননি অজিতেশ। ঠিকানাটা অবশ্য জানা ছিল। ভেবেছিলেন লঞ্চ থেকে নেমে লোকজনকে জিগ্যেস করে করে বাড়িটা বার করে ফেলবেন। কিন্তু মহীতোষ নিজেই যে তাঁকে লঞ্চঘাটায় নিতে আসবেন, এতটা আশা করা যায় নি। মালপত্র নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে প্রণাম করেছিলেন অজিতেশ।

দু'হাতে তাঁকে তুলে ধরে মহীতোষ বলেছিলেন, 'ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছ, আমি রিয়ালি হ্যাপি। চল এবার—' বলে তিনি নিজে অজিতেশের টিনের বাক্সটা তুলে নিয়েছিলেন। অজিতেশ আপত্তি করলেও শোনেননি।

লঞ্চঘাটার গা ঘেঁষে বড় রাস্তা। সেখানে একটা ফিটন দাঁড়িয়ে ছিল। মহীতোষ অজিতেশকে নিয়ে সেটায় উঠতেই কোচোয়ান গাড়ি হাঁকিয়ে দিয়েছে।

নদীর গা ঘেঁষে রাস্তাটা চলে গেছে। ফিটনের স্বাস্থ্যবান লাল ঘোড়াটা টগবগিয়ে ছুটছিল।

পাশাপাশি বসে এক ধারে নদী, আরেক ধারে নবীপুরের বাড়িঘর দেখতে দেখতে মহীতোষের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছিলেন অজিতেশ।

মহীতোষ বলেছিলেন, 'তোমার বাবা ভালো আছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাড়ির আর সবাই?'

'সবাই ভালো আছে।'

'আমার বাড়িটা তোমার নিজের বাড়ি বলে মনে করবে, বুঝলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোনোরকম সংকোচ করবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোমার যখন যা দরকার, চেয়ে নেবে।'

'আচ্ছা।'

'কলেজে অনেক রকম বাজে ছেলে রয়েছে। বদ সঙ্গ সবসময় অ্যাভয়েড করে চলবে। তোমার বাবা বহু কষ্ট করে তোমাকে মানুষ করতে চাইছেন। অনেক আশা নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর আশাভঙ্গ ঘটে এমন কিছু করবে না।' বলে একটু থেমেছিলেন মহীতোষ। পরক্ষণেই আবার শুরু করেছিলেন, 'আমার কাছে দু'বছর থেকে তুমি ইন্টারমিডিয়েট পড়বে। দু'বছর বাদে যে অজিতেশকে আমি তোমার বাবার কাছে ফেরত পাঠাব সে যেন হীরের টুকরো হয়।'

ভদ্রলোককে সেদিন ভোরে অত্যন্ত সহৃদয় আর আপনজন মনে হয়েছিল অজিতেশের। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আপনার মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করব।'

'খুব ভালো কথা।'

একটু চুপচাপ। তারপর মহীতোষই আবার বললেন, 'আরেকটা কথা—'

অজিতেশ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

মহীতোষ বলেছিলেন, 'তুমি আমার কাছে থেকে পড়াশোনা করবে, প্রতিদানে কিছুই আমি চাই না। শুধু আশা করব তুমি এমন কিছু করবে না যাতে আমার সম্মান নষ্ট হয়। আর আমার ঘরের ভিতে কখনও সিঁধ চালাবে না।'

অজিতেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিধ্বনির মতো করে বলেছিলেন, 'সিঁধ চালাব!'

'বুঝতে পারছ না নিশ্চয়ই?'

'আজ্ঞে না—'বিমূঢ়ের মতো মাথা নেড়েছিলেন অজিতেশ।

'পরে পারবে।'

কথায় কথায় ফিটনটা মহীতোষের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল। ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে।

একতলায় যেখানে গাড়িটা থেমেছিল সেখানে চোদ্দ পনেরো বছরের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরনে সোনালি সিল্কের শাড়ি আর কনুই পর্যন্ত হাতাওলা ব্লাউজ, ব্লাউজের হাতায় কুঁচি দেওয়া ঝালর। মেয়েটার মুখ প্রতিমার মতো, সরু তুলিতে আঁকা ভুরু, পাতলা রক্তাভ ঠোঁট, ভাসা ভাসা টানা চোখ, ফুরফুরে ধারাল নাক। চেহারাটা রোগামতো।

অজিতেশরা নামতেই মেয়েটা দৌড়ে কাছে চলে এসেছিল। আদুরে গলায় মহীতোষকে বলেছিল, 'আমাকে তুমি কেন লঞ্চঘাটায় নিয়ে গেলে না বাবা, কেন নিয়ে গেলে না?'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'তুই ঘুমুচ্ছিলি, তাই আর ডাকি নি।'

'কেন ডাকলে না? কেন ডাকলে না?'

'ডাকলে তো রেগে উঠতিস।'

মেয়েটা পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলেছিল, 'না, রাগতাম না।' নাকের ভেতর একটানা হুঁ হুঁ শব্দ করে গিয়েছিল সে।

বোঝা গিয়েছিল, মহীতোষ তাকে লঞ্চঘাটে নিয়ে যাবেন কথা দিয়েছিলেন। না নিয়ে যাওয়ার জন্য সে রেগে গেছে। তিনি বলেছিলেন, 'এরকম করতে নেই সুধা।'

সেই প্রথম মেয়েটির নাম জানতে পেরেছিলেন অজিতেশ।

সুধা মহীতোষের কথা না শুনে সমানে হুঁ হুঁ করে গিয়েছিল আর হাত-পা ছুড়ছিল। মহীতোষ বলেছিলেন, 'এদিকে আয়, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—'

অজিতেশের দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছোড়াটা বন্ধ করেছিল সুধা। কিন্তু নাকী সুরে হুঁ হুঁটা করেই যাচ্ছিল। সে বলেছিল, 'না।'

'লক্ষ্মী সোনা, আয়। এরকম করতে নেই। সারা রাত জেগে ছেলেটা এসেছে। দেখছিস না, ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না?'

দ্রুত এক পলক অজিতেশকে লক্ষ করে নাকের ভেতরকার সেই হুঁ হুঁ শব্দটা থামিয়ে দিয়েছিল সুধা। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল।

মহীতোষ বলেছিলেন, 'এ হল তোমার অজিতেশদাদা—' আর অজিতেশকে বলেছিলেন, 'এ আমার একমাত্র মেয়ে সুধা।'

সুধা একদৃষ্টে লক্ষ করছিল অজিতেশকে। সেদিন তাঁর চুলে ছিল কদম ছাঁট, চোখেমুখে স্পষ্ট গ্রাম্য ছাপ। তাঁর পরনে ছিল ক্ষারে-কাচা লালচে ধুতি আর লালচে হাফ শার্ট, পায়ে তালি মারা লাল কেডস। নিজের মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ থেকে অজিতেশকে দেখতে দেখতে সুধা বলেছিল, 'একেবাবে গেঁয়ো ভূত—'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'ছিঃ, এরকম কথা বলতে নেই।'

সুধা হঠাৎ ঝর্নার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠেছিল, 'বাবা, ওর চোখ দু'টো দেখেছ— ঠিক বাছুরের মতো। জামা কাপড়ের ছিরি দেখ! আর জুতোটা!' সে হেসেই যাচ্ছিল, হেসেই যাচ্ছিল।

মহীতোষ অজিতেশকে বলেছিলেন, 'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা; একেবারে পাগল মেয়ে। এস—'

অজিতেশকে সঙ্গে করে মহীতোষ বাড়ির ভেতর যাবেন, সেই সময় দারুণ রূপসী মধ্যবয়সি একটি মহিলা বেরিয়ে এসেছিলেন।

এক পলক অজিতেশের দিকে তাকিয়ে মহিলা জিগ্যেস করেছিলেন, 'এই বুঝি?'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।' তারপর অজিতেশের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'ইনি সুধার মা।'

পরে অজিতেশ জেনেছিলেন, সুধার মায়ের নাম মনোরমা।

অজিতেশ মনোরমাকে প্রণাম করতেই তাঁর চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে তিনি চুমু খেয়ে বলেছিলেন, 'বেঁচে থাক বাবা। তোমার ভালো করে পাসের খবর পেয়ে আমরা কী খুশি যে হয়েছি!'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'ও কোন ঘরে থাকবে?'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মনোরমা বলেছিলেন, 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে রেখেছি।' স্নিগ্ধ সদয় গলায় অজিতেশকে বলেছিলেন, 'এস বাবা—'

একতলাতেই কোণের দিকের একটা ঘরে অজিতেশের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ঘরটার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে সুন্দর ছায়াচ্ছন্ন বাগান পেরিয়ে রাস্তা, রাস্তার ওপারে নদী।

যেদিন তিনি সুধাদের বাড়ি গিয়েছিলেন সেদিনই মহীতোষ তাঁকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

অজিতেশের মনে পড়ে, সেসব দিনে তিনি ছিলেন ভয়ানক লাজুক। কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতেন না; কারুর সঙ্গে মিশতেনও না। বিশেষ করে সুধাকে দেখলে একেবারে জড়সড় হয়ে যেতেন। তখন কলেজে যাওয়া ছাড়া প্রায় সারাদিনই নিজের ঘরে বই-

টই নিয়ে বসে থাকতেন, কিংবা পুরনো আমলের ভারী খাটের ওপর শুয়ে অলস চোখে রাস্তার ওপারে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

সুধার মা মনোরমা প্রায়ই তাঁর ঘরে এসে তাড়া দিতেন, 'কিরে ছেলে, এরকম করে সারাদিন বই মুখে করে বসে থাকে! যাও, নদীর পাড় থেকে একটু ঘুরে এস।'

মহীতোষও তাঁর মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে অজিতেশের খবর নিতেন। বলতেন, 'এখানে কিরকম লাগছে?'

অজিতেশ বলতেন, 'ভালো।'

'কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'আজ্ঞে না।'

'তোমার মাসিমার কাছে শুনি দিনরাত পড়াশোনা কর। ঘর থেকে বেরোও না। দিস ইজ ব্যাড। একটু না বেড়ালে শরীর ভালো থাকে! রোজ বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে টিফিন খেয়ে বেড়িয়ে আসবে।'

কয়েক দিন তাড়া দিলে তবে হয়তো একদিন অজিতেশ বেড়াতে যেতেন।

মনে পড়ে, প্রথম কয়েকদিন সুধা তাঁর কাছে আসে নি বা কথা টথা বলে নি। দূর থেকে ঠোঁট কামড়ে আর চোখ কুঁচকে তাঁকে লক্ষ করত। তারপর এক ছুটির দিনের দুপুরে গোটা বাড়ি যখন নিঝুম, মহীতোষ আর মনোরমা ওপর তলায় ঘুমুচ্ছেন আর নিচের তলায় অজিতেশ ইতিহাসের একটা প্রশ্নের উত্তর লিখছেন সেই সময় জানালার বাইরে হঠাৎ কাকাতুয়ার ডাক শোনা গিয়েছিল।

মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন অজিতেশ কিন্তু কাকাতুয়া দেখা যায় নি। আবার তিনি খাতায় ঝুঁকে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুনো টিয়ার ডাক শোনা গিয়েছিল—টরর্, টরর্– মুখ তুলে এবারও টিয়া দেখা যায় নি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আবার লিখতে শুরু করেছেন অজিতেশ, পায়রার ডাক কানে এসেছিল এইভাবে একে একে চড়াই, শালিক, কাক ইত্যাদি নানা পাখির ডাক ভেসে এসেছে কিন্তু মুখ তুললেই কেউ নেই।

কিরকম একটা সন্দেহ হতে পা টিপে টিপে জানালার কাছে যেতেই দেখা গিয়েছিল ঘরের বাইরে একধারে দাঁড়িয়ে আছে সুধা। বোঝা গিয়েছিল এসব পাখির ডাক তারই কাজ। মেয়েটা এতরকম পাখির গলা নকল করতে পারে, ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অজিতেশ। কিন্তু তাকে কী বলবেন, ঠিক করে উঠতে পারেন নি। ফিরে যে যাবেন তা-ও পারছিলেন না।

সুধা বলেছিল, 'খুব ভালো ছেলেগিরি দেখানো হচ্ছে, না?'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিলেন অজিতেশ, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় নি।

সুধা আবার বলেছিল, 'আমরা জানি তুমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছ। খুব গর্ব, না? আমাদের দিকে ফিরেও তাকানো হয় না।'

অজিতেশ চুপ।

সুধা এবার বলেছে, 'ঠিক আছে, গুড বয়গিরি তোমার বার করছি। আমরা বছর বছর ফেল করব আর তুমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করবে, স্কলারশিপ পাবে, সেটি কিছুতেই হবে না। আজ আমি যাচ্ছি, কাল থেকে মজাটি টের পাবে।'

পরের দিন থেকে সুধা সত্যি সত্যি তার পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে গিয়েছিল। পড়তে বসলেই সে বই কেড়ে নিত। কখনও কলেজ থেকে ফিরে অজিতেশ দেখতেন তাঁর নোট-

নেওয়া খাতার ওপর কালি ঢালা রয়েছে। কোনোদিন বা দেখা যেত বইয়ের পাতা কাঁচি দিয়ে কাটা।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সুধার সম্বন্ধে সন্ধি করতে হয়েছিল। অজিতেশ ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছিল, কী করলে সুধার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

সুধা বলেছিল, 'আমি যেভাবে বলব ঠিক সেইরকম চলতে হবে।'

অজিতেশ বলেছিলেন, 'কিভাবে চলব, বলে দিন।'

সুধা অবাক হয়ে বলেছিল, 'আমি 'তুমি' করে বলছি আর তুমি আমাকে 'আপনি' করে বলছ! এখন থেকে আমাকে 'তুমি' করে বলবে।'

'ঠিক আছে। আপনাকে 'তুমি' করে বলব।'

'বজ্জাতি হচ্ছে! একসঙ্গে 'আপনি' 'তুমি' কী? শুধু তুমি।'

অজিতেশ ঘাড় কাত করে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, কী করতে হবে বল—'

সুধা একটু ভেবে বলেছিল, 'আমার সঙ্গে নদীর পাড়ে বেড়াতে যাবে।'

অজিতেশ চমকে উঠেছিলেন, 'কিন্তু তোমার মা-বাবা?'

'দূর হাঁদা গোবিন্দ, বাবা-মাকে লুকিয়ে যাব। আমি আগে যাব। তারপর তুমি। একসঙ্গে বেরুলে ধরা পড়ে যাব না?'

'কিন্তু বাইরে কেউ আমাদের দেখে যদি বলে দেয়?'

'আমরা সবার সামনে ঘুরে বেড়াব নাকি?'

'তা হলে?'

'তোমাদের কলেজের ওধারে নদী যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে বেশি লোক যায় না। আমরা সেখানে যাব।'

শুনতে শুনতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বরফের মতো কিছু একটা ওঠা-নামা করেছিল। বুকের ভেতর অনবরত হাতুড়ির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। আস্তে ঘাড় হেলিয়ে মাথা নেড়েছিলেন অজিতেশ।

সেই শুরু। তারপর তাঁকে নিয়ে কী না করেছে সুধা! একদিন একটা জেলেডিঙি চুরি করে ধলেশ্বরীর চরেও গিয়েছিল। আরেক দিন লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েছিল যাত্রা শুনতে, তারপর ভোর হবার আগেই ফিরে এসেছিল।

অজিতেশের সব সময় ভয় হত, এই বোধহয় ধরা পড়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে কবে যে ভয়টা কেটে গিয়েছিল, এতদিন বাদে আর মনে পড়ে না। সুধাকে ঘিরে দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কেটে যেতে শুরু করেছিল। গরমের ছুটিতে কিংবা বড়দিনের সময় বাড়ি ফিরে যেতেন ঠিকই কিন্তু সেখানে ভালো লাগত না। ধলেশ্বরী পাড়ের সেই সুন্দর ছোট্ট মফস্বল শহরটায় কবে ফিরে আসবেন সেজন্য ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে থাকতেন।

দেখতে দেখতে দু'টো বছর কেটে গিয়েছিল।

মনে আছে, সেদিন তাঁর ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সন্ধের একটু আগে আগে কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন অজিতেশ। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। তার কারণও ছিল। কারণটা হল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, দু-একদিনের মধ্যে তাঁকে বাড়ি যেতে হবে। তারপর সুধাদের এই শহরে আর ফেরা হবে না। কেননা এই শহরে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে। বি. এ পড়তে হলে তাঁকে ঢাকায় যেতে হবে। সুধার সঙ্গে আর দেখা হবে না, এই কথাটা যত ভাবছিলেন

ততই বুকের ভেতর অদ্ভুত এক কষ্ট অনুভব করছিলেন অজিতেশ। তাঁর আঠারো উনিশ বছরের নরম মন দুঃখে ভেঙেচুরে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ বসে ছিলেন, খেয়াল নেই। হঠাৎ সুধা ঘরে এসে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'ভূতের মতো চুপ করে বসে কী ভাবছ?'

অজিতেশ বলেছিলেন, 'কী আবার ভাবব, কিছু না।' বলে মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকিয়েছিলেন।

'নিশ্চয়ই ভাবছ। বল—' সুধা অজিতেশের মুখটা তার দিকে ফেরাতে ফেরাতে বলেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন নি অজিতেশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝাপসা গলায় বলেছিলেন, 'আমি কাল কি পরশু বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'বা রে, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল না!' বলতে বলতে একটু থেমে ফের বলেছেন, 'তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না সুধা।'

সুধা চমকে উঠেছিল, 'কেন?'

'তোমাদের এখানকার কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়া যায়। সেটা তো হয়েই গেল। এরপর বি. এ পড়তে হলে অন্য কোথাও যেতে হবে। তোমার সঙ্গে আর কী করে দেখা হবে বল—'

সুধা জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিল, 'না—'

অজিতেশ বলেছিলেন, 'কী না?'

'তোমার এখান থেকে যাওয়া হবে না।'

'কিন্তু পরীক্ষা হয়ে গেল। আমি এখানে কী করে থাকব বল?'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসেছিল সুধা, দু'হাতে অজিতেশকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল, 'আমি জানি না, জানি না, জানি না—'

যে মেয়েটা এই দু'বছর ধরে তাঁর ওপর সমানে জোর খাটিয়ে এসেছে আচমকা তাকে কাঁদতে দেখে কী করবেন, ভেবে পান নি অজিতেশ। তা ছাড়া আগে আর কখনও সুধা তাঁকে এভাবে জড়িয়ে ধরে নি। বুকের ভেতর শিহরণ খেলে গিয়েছিল তাঁর। অসহ্য উত্তেজনায় আর সুখে ভীষণ কাঁপছিল সারা শরীর। অজিতেশ বলেছিলেন, 'কিন্তু আমি কী করব বল —' তাঁর কাঁপুনিটা গলার স্বরেও যেন ভর করেছিল।

সুধা বলেছিল, 'সে তুমি বুঝবে! আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

অজিতেশ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, ঘরের ভেতর হঠাৎ বাজ পড়ার মতো ভারী মোটা গলা শোনা গিয়েছিল, 'হারামজাদা বজ্জাত!'

চমকে উঠে সুধাকে বুকের ভেতর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে অজিতেশ দেখেছিলেন, পাঁচ ফুট দূরে মহীতোষ দাঁড়িয়ে আছেন। অজিতেশ তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারেন নি, ঘাড় নিচু করে ছিলেন।

মহীতোষ চিৎকার করে বলেছিলেন, 'প্রথম আসার দিন ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম, আমার ঘরে সিঁধ চালাবে না। সেই সিঁধটি চালিয়ে দিলে! স্কাউন্ড্রেল, শুয়োর, ভেবেছ কী, তোমার মতো গেঁয়ো স্কুল মাস্টারের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব! দয়া করে এখানে এনে পড়িয়েছি আর তার রিটার্ন হল এই! দাঁড়াও, চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। আমার চাবুকটা কোথায়?'

দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে মহীতোষ চাবুক আনতে যাবেন, সেই সময় সুধা বলে উঠেছিল, 'ওর কোনো দোষ নেই। ওকে মেরো না বাবা, মেরো না। সব দোষ আমার—'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, আত্মীয়র ছেলে—মারব না।' বলেই অজিতেশের দিকে ফিরেছিলেন, 'উপকার করেছিলাম, তার যথেষ্ট প্রতিদান পাওয়া গেছে। কিন্তু আর না, আজই এখনই তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এ শহরে যেন আর কখনও তোমাকে না দেখি। গেট আউট—' বলে সুধার হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

আর নিজের টিনের সুটকেসে জামাকাপড় বইপত্তর পুরে তখনই সুধাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন অজিতেশ।

মনে পড়ে, সেদিন বাড়িতে ফিরে যাবার লঞ্চ ছিল না। লঞ্চ পাওয়া যাবে পরের দিন সকালে। সারা রাত শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সকালে লঞ্চঘাটায় এসেছিলেন অজিতেশ। টিকিট-ঘরটা ছিল নদীর পাড়ে। টিকিট কেটে অজিতেশ জেটির দিকে যাবেন, সেইসময় দৌড়ুতে দৌড়ুতে সুধা এসেছিল। ঝাপসা গলায় সে শুধু বলেছিল, 'তোমাকে বাবা ওভাবে তাড়িয়ে দিল! আমাকে ক্ষমা কর অজিতেশদা—'

অজিতেশ শুধু বলেছিলেন, 'তুমি আবার এখানে এলে কেন? মেসোমশাই জানতে পারলে ভীষণ রাগারাগি করবেন।'

'করুক রাগারাগি—' বলে একটু থেমে সুধা আবার বলেছিল, 'তোমাকে একটা কথা বলবার জন্য এসেছি।'

'কী কথা?'

'তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না, তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।'

বুকের ভেতর তোলপাড় করে ঢেউ উঠেছিল অজিতেশের।

সুধা আবার বলেছিল, 'আমার কথা তোমার মনে থাকবে অজিতেশদা?'

অজিতেশ গাঢ়, গভীর গলায় বলেছিলেন, 'থাকবে, নিশ্চয়ই থাকবে।'

লঞ্চ ছাড়ার ঘন্টা পড়ে গিয়েছিল। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। অজিতেশ ঝাপসা গলায় বলেছিলেন, 'যাই—'

মনে পড়ে, বাড়ি ফিরে যাবার কিছুদিন বাদেই পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে থাকতে থাকতেই অজিতেশ শুনেছিলেন, দাঙ্গায় সুধার বাবা মারা গেছেন, সুধারা কোথায় চলে গেছে কেউ খবর দিতে পারে নি। দাঙ্গার পর হল দেশভাগ। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে অজিতেশরা এপার বাংলায় চলে এলেন। এপারে এসে বেঁচে থাকার জন্য নতুন করে যুদ্ধ শুরু হল। প্রথম দিকে থাকতেন শিয়ালদা স্টেশনে। তারপর যাদবপুরের ওদিকে জবরদখল কলোনিতে বাঁশ টালি দিয়ে ঘর তুলে বাবা-মা-ভাইবোনদের নিয়ে গেলেন অজিতেশ। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত রেজাল্টটা ভালোই ছিল। তার জোরে রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েছিলেন। সেটা ছেড়ে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে এলেন ব্যাঙ্কের চাকরিতে।

পার্টিশনের পর পশ্চিম বাংলায় এসে কোনোদিকে তাকাবার সময় ছিল না অজিতেশের। একে একে ভাইদের মানুষ করতে হয়েছে তাঁকে, তাদের জন্য চাকরি-টাকরি যোগাড় করে জীবনে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়েছে, বোনেদের বিয়ে দিতে হয়েছে। এসব করতে করতে কবে যে জীবনের পঞ্চাশটা বছর পার করে এসেছেন, কে জানে! সবাইকেই তিনি ঘর-সংসার করে

দিয়েছেন, শুধু নিজেরই বিয়ে-টিয়ে করা হয় নি। কখন যে হাতের ফাঁক দিয়ে বিয়ের বয়সটা বেরিয়ে গেছে, টের পান নি।

সুধার কম বয়সের ফোটোটার দিকে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন মনে নেই। হঠাৎ হরিনারায়ণের ডাক কানে এসেছিল, 'স্যার—'

চমকে ঘাড় ফেরাতেই অজিতেশের চোখে পড়েছিল, একটু দূরে হরিনারায়ণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পাশে সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছরের একটি মহিলা এবং তেরো চোদ্দ বছরের একটি ছেলে আর দশ বারো বছরের একটি মেয়ে।

হরিনারায়ণ বলেছিলেন, 'এ আমার ছেলে রানা, ও আমার মেয়ে শমিতা, আর এ আমার স্ত্রী—'

রানা আর শমিতা অজিতেশকে প্রণাম করেছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ ছিল না অজিতেশের। ততক্ষণে তাঁর চোখ এসে পড়েছে মহিলাটির দিকে। এত বছর বাদেও সুধাকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল না। বয়সের কিছু ভার নেমেছে তার শরীরে, সিঁথির কাছে দু-চারটে চুল রুপোর তার হয়ে গেছে তবু ধলেশ্বরীপাড়ের সেই খেয়ালি জেদী একরোখা মেয়েটাকে সময় ভেঙেচুরে একেবারে বদলে দিতে পারে নি।

সুধাও একদৃষ্টে অজিতেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর আধফোটা গলায় বলল, 'অজিতেশদা না!'

এতকাল পরও তাঁকে তবে চেনা যায়! সময় তাঁকেও একেবারে পালটে দিতে পারে নি! অজিতেশ বললেন, 'হ্যাঁ। এত বছর বাদে তোমাকে এখানে দেখব ভাবিনি। কেমন আছ তুমি?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সুধা হাসল, 'মন্দ কী। তুমি?'

'চলে যাচ্ছে।'

হরিনারায়ণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। এবার বলে উঠল, 'স্যার, আপনি আমার স্ত্রীকে চেনেন!'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলে ওদের বাড়িতে দু'বছর থেকে আমি পড়াশোনা করেছি।'

এরপর চা এবং মিষ্টি-টিষ্টি এল। খেতে খেতে প্রচুর গল্প হল। অজিতেশ নিজের কথা বললেন। দাঙ্গার পর কিভাবে মহীতোষের মৃত্যু ঘটেছিল, কিভাবে একটি মুসলমান মাঝি সুধাদের তারপাশায় নিয়ে এসে গোয়ালন্দের স্টিমারে তুলে দিয়েছিল, তারপর কলকাতায় এসে কিভাবে আত্মীয়ের বাড়িতে অনেক কষ্টের মধ্যে দিন কেটেছে, কিভাবে শেষ পর্যন্ত হরিনারায়ণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়—সব শুনে গেলেন অজিতেশ। শুধু একটা কথাই অজিতেশের জানা হল না। সেদিন লঞ্চঘাটায় সুধা কথা দিয়েছিল, তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। তবু হরিনারায়ণকে বিয়ে করল কেন? পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন, হয়তো এই বিয়েটা না করে সুধার উপায় ছিল না। তবু কথাটা তার মুখ থেকেই শুনতে ইচ্ছা করছিল অজিতেশের। কিন্তু হরিনারায়ণের সামনে সে প্রশ্ন করা যায় না। তিনি ভাবলেন, সুযোগ পেলে কথাটা জিগ্যেস করবেন।

এরপর থেকে হরিনারায়ণ অজিতেশকে প্রায়ই তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে লাগল। বোঝা যায়, সুধাই নিয়ে যেতে বলে।

অজিতেশরও খুব খারাপ লাগে না। ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়া বাকি দিনটা একা একাই কাটত এতকাল। এখন ওদের সঙ্গে গল্প করে সময়টা ভালোই কাটে। নিয়মিত যেতে যেতে ব্যাপারটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল, সুধার যেন বিয়ে হয়নি, আর তিনিও এখনও সেই ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রই রয়েছেন। আর তাঁরা ছোটনাগপুরের অভ্রখনির এই শহরে নয়, ধলেশ্বরীপাড়ের সেই ছোট্ট মফস্বল শহরে যেন ফিরে গেছেন।

শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল, প্রতিদিন ছুটির পর সুধাদের বাড়ি একবার না গেলে তাঁর ভালো লাগে না। ছুটি টুটি হলে কোনোদিন সবাইকে নিয়ে অজিতেশ উশ্রী ফলস দেখতে যান, কোনোদিন যান পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে, কোনোদিন বা দল বেঁধে মধুপুর কি গিরিডিতে পিকনিক করতে। কিন্তু হরিনারায়ণ এমনভাবে গায়ের সঙ্গে জুড়ে থাকে যে সেই কথাটা আর জিগ্যেস করা হয় না।

দেখতে দেখতে ক'টা মাস কেটে গেল। তারপর সেই দিনটি এল।

সুধাদের বাড়ি বিকেলে অজিতেশের আসার কথা। কিন্তু সেদিন দুপুরের দিকেই তিনি চলে এলেন। বাইরের ঘরের কাছাকাছি এসে হরিনারায়ণকে ডাকতে যাবেন হঠাৎ সুধার গলা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বোঝা যাচ্ছিল, হরিনারায়ণের সঙ্গে সে কথা বলছে।

আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনার অভ্যাস নেই অজিতেশের। এটাকে তিনি নোংরামিই মনে করেন। তবু তিনি না পারছিলেন এগুতে, না পারছিলেন পিছিয়ে যেতে।

সুধা বলছিল, 'বিয়ে তো করে নি। এত বয়েস হয়েছে, ছোঁকছোঁকানি যায় না। রোজ বেড়ালের মতো আমাদের বাড়ি ঘুরঘুর করতে আসে। আমি সব বুঝি।'

হরিনারায়ণ বলল, 'তোমাদের বাড়ি যখন পড়াশোনা করত তখন দু'জনে প্রেমের সাগরে ভেসে বেড়াতে, তাই না?'

'তোমার বুঝি তাই মনে হয়? আরে বাবা, আমি ছিলাম নাম-করা পয়সাওলা উকিলের মেয়ে আর অজিতেশদা গেঁয়ো স্কুল মাস্টারের ছেলে। দয়া করে আমার বাবা ওকে বাড়িতে রেখে পড়িয়েছিলেন। যাকে দয়া করা হয় তার সঙ্গে কেউ প্রেম করে না। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

'আমি কোনোদিন ওর দিকে তাকাতামও না। তবে অজিতেশদা ড্যাব ড্যাব করে গরুর মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু আমি ছিলাম অনেক উঁচু ডালের ফল, ওর হাত সেখানে কখনও পৌঁছয়নি।'

'যাক গে, এবার একটা কাজ করতে পারবে?'

'কী?'

'তিরিশ বছর তো ব্যাঙ্কের কেরানি হয়েই রইলাম। অজিতেশবাবুকে ধরে আমার একটা প্রোমোশনের ব্যবস্থা করে দাও। উনি রেকমেণ্ড করলে হয়ে যাবে।'

'তুমি ভেবো না, ওর নাকে বড়শি আটকানো আছে। আমি যা বলব ও তাই করবে, যেদিকে ঘোরাব সেদিকে ঘুরবে। তোমাকে কথা দিলাম, প্রোমোশন পেয়ে যাবে।'

শুনতে শুনতে স্তম্ভিতের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অজিতেশ। এই সুধাই কি একদিন বলেছিল তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না?

অজিতেশ আর ওদের ডাকলেন না, ক্লান্ত এলোমেলো পা ফেলে ফিরে যেতে লাগলেন।

কোনো একদিন

দু'ধারে ধানের খেত। মাঝখান দিয়ে সরকারি পাকা সড়ক, এ অঞ্চলে যাকে বলে পাক্কী—এঁকেবেঁকে, পাক খেয়ে খেয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

আষাঢ় মাস শেষ হয়ে এল। ভরা বর্ষা। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, গাভিন মোষের মতো কালো কালো মেঘ। মেঘের ভারে আকাশটা যেন অনেকখানি নেমে এসেছে।

এখন দুপুর। কিন্তু সূর্যটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিরেট মেঘপুঞ্জের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে রুগ্ণ, ফ্যাকাসে আলোটুকু বেরিয়ে এসেছে তাতে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ ঝুঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সেখানে আবছা আঁচড়ের মতো পাহাড়ের উঁচুনিচু একটা রেখা চোখে পড়ে।

এই দুপুরবেলায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলা দিয়ে তিন চাকাওলা বিচিত্র একটা গাড়ি চালিয়ে সোজা পুব দিকে চলেছে ধনেরি। গাড়িটা একসময় ছিল সাইকেল রিকশা। পেছনের সিট টিট ফেলে দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে চেরা বাঁশের পাটাতন। তার ওপর তেরপলের ছাউনি। পাটাতনে আড়াআড়ি শোয়ানো রয়েছে আড়াই হাত চওড়া, পাঁচ হাত লম্বা একটা তক্তা। আর আছে মোটা দড়ির স্তূপ, তেল-পাকানো বাঁশের লাঠি এবং ঢাউস একটা টিনের বাক্স। বাক্সটার ভেতর আছে পনেরোটা খাপে ঢাকা ছুরি, আট দশটা রঙিন কাঠের বল, ইত্যাদি। নানা ধরনের খেলা জানে ধনেরি। এগুলো তার সরঞ্জাম।

এবার ধনেরির দিকে তাকানো যেতে পারে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো। গাল দু'টো ভাঙা, চামড়া খসখসে। চুল উঠে উঠে চাঁদির অনেকটা জায়গা ফাঁকা। কণ্ঠা ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। একসময় সে যে টগবগে, হট্টাকট্টা চেহারার একটা জোয়ান ছিল সেটা তার হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড়গুলোর দিকে তাকালে টের পাওয়া যায়। শরীরে ভাঙচুর শুরু হলেও ধনেরি এখনও যথেষ্ট শক্তির অধিকারী।

ভোরবেলায়, তখনও কাকপক্ষির ঘুম ভাঙে নি, তাদের বারহৌলি গাঁ থেকে গাড়িতে মালপত্তর চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ধনেরি। সে যাবে চল্লিশ মাইল দূরের ধারাবনি টাউনে—এই এলাকার সব চেয়ে বড় জমি-মালিক মৈথিলি ব্রাহ্মণ রামবহাল ঝা'র বাড়িতে। সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা হেলে যাবে।

কয়েক বছর আগে গাঁয়ে গঞ্জে আর ছোট ছোট টাউনে ঘুরে বাঁদর, সাপ, ঘোড়া আর ভালুকের খেলা দেখাত ধনেরি। কিন্তু তার জন্তুগুলো একে একে মরে যাওয়ায় ওই সব খেলা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। নতুন করে ফের যে বাঁদর টাদর কিনবে তেমন পয়সা তার নেই। তা ছাড়া জন্তুজানোয়ার নিয়ে আজকাল খেলা দেখানোর প্রচুর ঝঞ্ঝাট। সরকার থেকে অনেক রকম কড়াকড়ি করে দিয়েছে।

তাই ধনেরিকে খেলার ধাঁচ পালটে ফেলতে হয়েছে। পেট তো চালাতে হবে। ক'বছর ধরে সে রণপায়ে চড়ে দৌড়বাজি দেখায়, দু হাতে দশটা রঙিন বল নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে লোফালুফি করে কিংবা কাউকে কাঠের পাটাতনে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে তার চারপাশে ধারাল ছোরা ছুড়তে থাকে।

কিন্তু এ সব খেলার সমঝদার প্রায় নেই বললেই হয়। লোকে আজকাল সিনেমা দেখে, টিভি দেখে। নেহাত রামবহাল ঝার মতো দু-চারজন রয়েছেন বলে ধনেরি কোনোরকমে টিকে

আছে। রামবহাল সিনেমা টিনেমা পছন্দ করেন না, ছুরিখেলা লাঠিখেলার দিকেই তাঁর ঝোঁক। মাঝে মাঝে তিনি ধনেরিকে ডেকে পাঠান। কালও লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলেন। তাই আজ সে ধারাবনি চলেছে। রামবহাল কোন খেলাটা দেখতে চাইবেন, আগে থেকে জানান না, তাই যখনই ডাক আসে ধনেরি তার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ধারাবনিতে যায়।

কাল শেষ রাত থেকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। তোড়টা মাঝে মাঝে বাড়ে, কখনও একটু কমে।

বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য গাড়িটার সামনের দিকের হ্যান্ডেলে মান্ধাতার আমলের একটা ছাতার বাঁকানো ডাণ্ডা বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু শতচ্ছিন্ন ছাতাটার অগুনতি দরজা-জানালা দিয়ে যেভাবে জলের ছাট ঢুকছে তাতে একেবারে নেয়ে গেছে ধনেরি। ধোঁকার টাটির মতো ওটা না থাকলেও চলত।

ধনেরির পরনে খাটো মাপের ফুল প্যান্ট আর তালি-মারা জামা, পায়ে টায়ার কাটা স্যান্ডেল। সে প্রাণপণে প্যাডেল করে যাচ্ছে।

গাড়িটা তার নিজস্ব নয়, দরকারমতো দু-একদিনের জন্য সে এটা ভাড়া নিয়ে থাকে।

পাক্কীর দু'পাশের খেতগুলোতে হাঁটুসমান জল। সবুজ ধানগাছগুলো তার ওপর মাইলের পর মাইল জুড়ে মাথা তুলে আছে। মাঝেমধ্যে দূরপাল্লার বাস, লরি, ভ্যান কি বয়েল্‌ গাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো দিকে লক্ষ নেই ধনেরির। কখন ধারাবনিতে পৌঁছুবে সেটাই তার একমাত্র চিন্তা। আসলে হাতের পয়সাকড়ি ফুরিয়ে এসেছে। রামবহাল ঝা'র কাছ থেকে কিছু টাকা পেলে কয়েকটা দিনের জন্য সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

হঠাৎ কারো গলা কানে এল, 'এই-রুখো-রুখো।' চমকে সামনের দিকে তাকাতে ধনেরির চোখে পড়ল একটা তিরিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েমানুষ সমানে হাত নেড়ে তাকে থামতে বলছে।

কাছাকাছি এসে গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দেয় ধনেরি। মেয়েমানুষটার জামাকাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গায়ে লেপটে আছে। সে জিগ্যেস করে, 'গাড়ি রুখতে বললে কেন?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে অবাক বিস্ময়ে মেয়েমানুষটি বলে ওঠে, 'আরে তুম!'

ভালো করে লক্ষ করতেই ধনেরিও চিনে ফেলে। বিস্ময়টা তারও কম নয়। মেঘে ছাওয়া আকাশের নিচে, এই দুপুরবেলায় অবিরাম যখন বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে, প্রায় নির্জন পাক্কীতে চুনিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে, ভাবতে পারেনি সে। একই কথা বলে ধনেরি, 'তুই!'

'হাঁ, হামনি—'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ধারাবনি। তুমি?'

'আমিও।'

'অনেকটা রাস্তা হেঁটে হেঁটে থকে গেছি। গৈয়া গাড়ি, ভৈসা গাড়ি, যাকেই থামতে বলি কেউ থামে না। শেষ পর্যন্ত তুমি গাড়ি রুখলে। আমাকে ধারাবনি পৌঁছে দেবে?'

ধনেরি বলে, 'ঠিক হ্যায়, পেছন দিক দিয়ে উঠে পড়।'

কথামতো উঠে তেরপলের ছাউনির তলা দিয়ে ধনেরির ঠিক পেছনে কোনাকুনি বাঁশের পাটাতনে জড়সড় হয়ে বসে পড়ে চুনিয়া।

ঘাড় হেলিয়ে তাকে দেখছিল ধনেরি। চুনিয়া কতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছে, কে জানে। তার হাত-পায়ের আঙুল সিঁটিয়ে গেছে। গালে কপালে ভেজা চুল লেপটে আছে। বুকের ওপর আড়াআড়ি দু'টো হাত রেখে সে কাঁপছিল।

ধনেরি টিনের পেল্লায় বাক্সটা দেখিয়ে বলল, 'ওটার ওপর আরাম করে বস। কাঠের পাটার তলায় একটা গামছা আছে। সেটা বার করে মাথা মুছে নে।'

যা যা বলা হল তাই করে চুনিয়া।

ধনেরি ফের গাড়িটা চালাতে শুরু করে। বৃষ্টির জোর এখন কম, মিহি চিনির দানার মতো ঝরে যাচ্ছে।

বিস্ময়েব ঘোর এখনও কাটেনি ধনেরির। সামনে চোখ রেখে সে জিগ্যেস করে, 'তুই আসছিস কোত্থেকে?'

চুনিয়া উত্তর দেয়, 'গাঁও দুমরিয়া।'

'সে তো বহোত দূর। কমসে কম সাত মিল জরুর হোগা।'

'হাঁ।'

'এতটা রাস্তা পায়দল এসেছিস!'

'কা করে! গাড়ি চড়ার পাইসা কোথায়?'

'আমার সাথ দেখা না হলে কী হত!'

চুনিয়া অল্প হাসে. 'কী আর হত! পায়দলই গারাবনি যেতাম।'

ধনেরি বলে, 'বহোত কষ্ট হত।'

'আমাদের মতো মানুষের কষ্ট তো জীওনভর লেগেই থাকে। তা নিয়ে ভাবলে চলে!'

'ঠিক বাত।'

হঠাৎ কী খেয়াল হতে ধনেরি শুধোয়, 'দুমরিয়া থেকে আসছিস—মতলব—'

চুনিয়া বলে, 'হাঁ, ওখানেই তো আমার সসুরাল।'

কোমরে একটা ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে ঘুরে বসে ধনেরি। ধন্দ-ধরা মানুষের মতো জিগ্যেস করে, 'মধিপুরায় শিউলালের সাথ তোর শাদি হয়েছিল না?'

চুনিয়া মুখ নিচু করে জানায়, শিউলালের সঙ্গে তার বিয়েটা কবেই কাটান ছাড়ান হযে গেছে। তারপর দুমরিয়া গাঁয়ের জগনাথের সঙ্গে তার দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়। সে দোঘরিয়া, অর্থাৎ দু'টি পুরুষের ঘর কবেছে। চুনিয়া আরো জানায়, তার দু নম্বর মরদটি জীবিত নেই। প্রচণ্ড নেশাভাং করত আদমিটা ; বছর দেড়েক আগে গলায় রক্ত উঠে মারা যায়।

শুনতে শুনতে রীতিমতো দুঃখই হয় ধনেরির। চুনিয়া তাদের গাঁ বারহৌলিরই মেয়ে। কী সুন্দরই না দেখতে ছিল সে। তার জন্য কম বয়সে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ধনেরি। চুনিয়াও তাকে পাগলের মতো চেয়েছে। কিন্তু ওদের যে শাদি হয় নি তার কারণ একটাই। সেটা হল জাতওয়ারি সওয়াল। ধনেরিরা কোয়োর, শুদ্ধ ভাষায় যাদের বলে কুশবাহাছত্রি। আর চুনিয়ারা দোসাদ। আলাদা জাত হওয়ায় তাদের বিয়েটা আটকে যায়।

ধনেরি যদি আবহমান কালের জাতপাতের প্রথা ভেঙে কিছু একটা গোলমাল পাকিয়ে বসে সেই ভয়ে চুনিয়ার বাপ তার চোদ্দ বছর পেরুবার আগেই রাতারাতি শিউলালের সঙ্গে শাদি চুকিয়ে ফেলে। শাদির পর মধিপুরায় চলে যায় সে। তারপর একবারও বারহৌলিতে আসে নি। আসবেই বা কার কাছে? চুনিয়ার শাদির একমাসের ভেতর তার মা-বাপ দু'জনেই পর পর মারা যায়। যদি ওর দু-চারটে ভাইবোন থাকত, যাতায়াতটা হয়তো বন্ধ হত না।

চুনিয়া মধিপুরায় চলে যাবার পর একেবারে ভেঙে পড়েছিল ধনেরি। বারহৌলি তার কাছে এতই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে একদিন উদ্দেশ্যহীনের মতো বেরিয়ে পড়ে। বছর দুই কখনও রাঁচি, কখনও হাজারিবাগ, কখনও ধানবাদ বা ঝরিয়ায় ঘোরার পর কষ্টটা জুড়িয়ে গেলে আবার বারহৌলিতে ফিরে আসে। একটা বিয়েও করেছিল কিন্তু আওরতটা বছর না ঘুরতেই নৌটঙ্কির

দলের এক ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে ধনেরি একবারে ঝাড়া হাত-পা। আগেই, তার ছেলে বয়সে মা-বাবা মরে ফৌত হয়ে গিয়েছিল।

বাপ মাঙ্গিলাল ছিল গরিবের চাইতেও গরিব। বড় জমি-মালিকের খেতে আর খামারে 'গতর চুরণ' খেটে সংসারের সবার পেটের দানা জোগাড় করত। ধনেরির জন্য সোনাদানা, টাকাপয়সা কিছুই রেখে যেতে পারে নি। ধসে-পড়া একটা টিনের চালা ছাড়া এক ধুর বাড়তি জমি পর্যন্ত তাদের নেই।

অল্প বয়সে এক মাদারি খেলোয়াড়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জীবজন্তু নিয়ে নানা ধরনের চমকদার খেলা শিখে নিয়েছিল ধনেরি। সেই সঙ্গে হাতের অজস্র কসরতও। এই খেলাগুলো না শিখলে তাকে না খেয়ে ভুখা মরতে হত।

নিজের নানা ধরনের খেলা আর পেটের চিন্তা নিয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল ধনেরির। কিন্তু এতকাল পর আবার যে চুনিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল।

বহুদিন আগের চুনিয়ার সেই 'পরী য্যায়সা' চেহারা আর নেই। অনেক ভেঙে গেছে। সফেদিয়া ফুলের পাপড়ির মতো গায়ের রং জ্বলে জ্বলে এখন কালো। চামড়ার তলা থেকে হাতের মোটা মোটা শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গালে, চোখের তলায় কালচে কালচে ছোপ। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা রুক্ষ, কর্কশ পুরুষালী ভাব।

ধনেরি আবার সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে জিগ্যেস করে, 'তুই তো বললি তোর দুসরা মরদ মরে গেছে।'

চুনিয়া বলল, 'হাঁ।'

'সসুরালে কে কে আছে?'

'দুই বুড়হা বুড়হী—আমার সাস আউর সসুর (শাশুড়ি আর শ্বশুর), আর আমার একটা ছৌরা—উমর পাঁচ সাল।'

'ছেলেটাকে নিয়ে তুই আবার তো শাদি করতে পারতিস?'

দোসাদ কোয়েরি তাতমা বা গঞ্জুদের ঘরে কোনো মেয়ের তিন চার কি তারও বেশি বার শাদি করে তেঘরিয়া, চৌঘরিয়া বা পাঁচঘরিয়া হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এটা কেউ গর্হিত অপরাধ মনে করে না।

চুনিয়া বলে, 'অনেকেই তো শাদি করে তাদের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, লেকিন শাদিটা করি কী করে?'

'কেন? অসুবিধাটা কোথায়?'

চুনিয়া জানায়, নতুন বিয়ে করে অন্য মরদের ঘর করতে গেলে বুড়ো শ্বশুর শাশুড়িকে কে দেখবে? ওরা কমজোর, সারা বছরই প্রায় নানা রোগে কাবু হয়ে থাকে। চুনিয়া ছাড়া বুড়োবুড়িকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। সে না থাকলে ওরা ভুখা মরে যাবে।

তাদের মতো গরিব হাভাতেদের ঘরের একটি মেয়ের এমন মহানুভবতায় রীতিমতো অবাকই হয় ধনেরি। চুনিয়ার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে যায়। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ, ঠিকই বলেছিস।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ধনেরি জিগ্যেস করে, 'তোদের জমিন-উমিন আছে?'

চুনিয়া বলে, 'কঁহা জমিন! এক ধুর ভি নেহী।'

ধনেরি বলে, 'তা হলে সম্‌সার চলছে কী করে?'

চুনিয়া জানায়, চাষের মরসুমে আর ধান কাটাইয়ের সময় সে মনচনিয়ার বড় জমি-মালিক বিন্ধ্যাচলী মিশিরের খেতি এবং খামারে কাজ করে। বছরের বাকি সময়টা কখনও ঠিকাদারদের কাছে, কখনও বড় গঞ্জের আড়তদারদের কাছে গিয়ে মাটি কাটা বা মাল বওয়ার কাজ জোটায়। অর্থাৎ চাষ টাষ ছাড়াও দু'টো পয়সার জন্য নানা উঞ্ছবৃত্তিও তাকে করতে হয়।

ধনেরি জিগ্যেস করে, 'ধারাবনিতে যে যাচ্ছিস—কোনো কামকাজের ধান্দায়?'

'তা ছাড়া আর কী?' চুনিয়া বলে, 'গতরচুরণ' পরিশ্রম করে পয়সা কামাই আব চারটে পেটের দানা জোগাড় করা, এ ছাড়া অন্য কোনোদিকে তাকানোর ফুরসত নেই তার।

'ধারাবনিতে কী কাজ পাবি?'

চুনিয়া বলে, এখন এই ঘোর বর্ষায় আড়তদার আর ঠিকাদারদের কাছে এবং বিন্ধ্যাচলী মিশিরের খেতে খামারে কোনো কাজ নেই। তবে ধারাবনিতে রোজ যে হাট বসে সেখান থেকে বাড়ির কাজ করার জন্য অনেকে লোক নিয়ে যায়। যেমন ঘর সাফ করা, ছাউনি মেরামত করা ইত্যাদি। অর্থাৎ দিনমজুরের কাজও সে করে থাকে। সেরকম কিছুর আশায় সে ধারাবনি চলেছে।

ধনেরি বলে, 'তুই তো অনেক কাম কাজ শিখেছিস দেখছি।'

চুনিয়া বলে, 'কা করে? সিরিফ পেটকা লিয়ে।'

ধনেরি চুনিয়ার সঙ্গে এ ব্যাপাবে সম্পূর্ণ একমত। সে বলে, 'হাঁ। আমাদের মতো গরিবদের বেঁচে থাকতে হলে কত কিছুই না করতে হয।'

চুনিয়া বলে, 'আমার কথা একগো একগো করে সবই তো শুনে নিলে। লেকেন বারহৌলি থেকে চলে আসার পর তোমাব সম্বন্ধে কিছুই জানি না।'

একটু চুপ করে থেকে নিজের কথা আস্তে আস্তে সমস্ত বলে যায় ধনেরি।

শোনার পর চুনিয়া বলে, 'তোমার ওপর দিয়েও ঝড় তুফান কম যায় নি!' তার গলায় দুঃখের সুর ফুটে ওঠে।

মুখ ফিরিয়ে কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে ধনেরি বলে, 'কী করব—এটাই আমার নসিব।'

খুব আন্তরিকভাবে চুনিয়া বলে, 'দুনিয়ায় একেবারে একেলা হয়ে গেলে। ঘরবালী না হয় পালিয়ে গিয়েছিল। লেড়কির তো অভাব নেই। আরেকটা ঘরবালী জুটিয়ে আনতে পারলে না?'

ধনেরি বলে, 'একটা পেট চালাতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। আরেক জনকে ঘরে আনলে তাকে কী খাওয়াব আর নিজেই বা কী খাব? এই ভালো আছি রে চুনিয়া।'

আস্তে মাথা নাড়ে চুনিয়া।

পাশ দিয়ে পরপর বারো চোদ্দটি লরি জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে, সমস্ত চরাচর সচকিত করে বেরিয়ে গেল। তারপর আবার দু'ধারের মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। রাস্তার পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের যে তার চলে গেছে, তার ওপর গুটিসুটি মেরে বসে ক'টা মাছরাঙা আর কাক সমানে ভিজছে। দূরে কিষানদের ছাড়া ছাড়া গাঁগুলো বর্ষার এই দুপুরে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ কী এক ব্যাকুলতা বুকের ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে উঠে আসতে থাকে ধনেরির। পনেরো বছর আগে যে মেয়েটাকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল, এত কাল বাদে সে তার পিঠের কাছে বসে আছে। গাড়ির দোলানির তালে তালে চুনিয়ার ভেজা শরীরের ছোঁয়া এসে লাগছে তার কাঁধে বা গলায়।

ধনেরি হঠাৎ বলল, 'তোর সেই কথাগুলো মনে আছে?'

চুনিয়া জিগ্যেস করে, 'কোনগুলো বল তো?'

ধনেরি বলে, 'আমাদের জাত আলাগ বলে তোর আর আমার শাদিটা হল না।'

'হো রামজি—' বলে ঘাড় সামান্য হেলিয়ে বৃষ্টিভেজা ভারী বাতাসে ঢেউ তুলে আচমকা হেসে ওঠে চুনিয়া। সে হাসি এমনই যে সহজে তার থামার লক্ষণ নেই।

চমকে মুখ ফেরায় ধনেরি। বলে, 'কা রে, কা হুয়া? পাগলের মতো এত হাসছিস কেন?'

প্রথমটা উত্তর দেয় না চুনিয়া। হাসির তোড় কিছুটা কমে এলে সে বলে, 'তুমি সেসব মনে করে রেখেছ নাকি?'

চুনিয়ার কথাগুলো মুখের ওপর চাবুকের মতো এসে পড়ে। তার জন্য এই মেয়েটারও তো একদিন চোখে ঘুম ছিল না। খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সে। আর আজ? চুনিয়ার প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে ধরা গলায় ধনেরি জিগ্যেস করে, 'তুই কি সচমুচ সব ভুলে গেছিস?'

'হো রামজি, হো কিষুণজি—' চুনিয়া গালে হাত রেখে মজার গলায় বলে, 'কত সাল আগে কী হয়েছিল সে কথা কেউ মনে রাখে নাকি! চার চারগো পেটের ধান্দা করতে আমার জান বলে চৌপট হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি কিনা—' ফের হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে সে।

অল্প বয়সের সেই দিনগুলোর স্মৃতির কোনো দামই নেই চুনিয়ার কাছে। কী আশ্চর্যভাবেই না বদলে গেছে মেয়েটা! সামনের দিকে ঝুঁকে ক্লান্তভাবে গাড়ি চালাতে থাকে ধনেরি।

এতক্ষণ বৃষ্টিটা ছিল ফিনফিনে, হালকা। হঠাৎ তার জোর বেড়ে গেল। সমস্ত চরাচর ঝাপসা করে দিয়ে লক্ষ কোটি সিসার ফলার মতো জল নেমে আসছে। উত্তর আর দক্ষিণ দিক থেকে পাহাড়ের মতো বিশাল কালো মেঘ বাতাসের ধাক্কা খেতে খেতে চারিদিকে এলোপাথাড়ি ছোটাছুটি করছে।

একনাগাড়ে কিছুক্ষণ ঝরার পর বৃষ্টির তোড় ফের কমে আসে।

পুরনো কথা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করল না চুনিয়া। হঠাৎ কী খেয়াল হতে ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করল, 'ধারাবনিতে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ধনেরি বলে, 'বড়ে জমি-মালিক রামবহালজির হাভেলিতে। খেলা দেখবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'ওখানে কতক্ষণ থাকবে?'

'তা কি বলা যায়? খেলা দেখাতে দেখাতে হয়তো সাম (সন্ধ্যা) হয়ে যাবে। যদি মালিক থেকে যেতে হুকুম করেন তা হলে কবে বারহৌলিতে ফিরব, ঠিক নেই। সবই রামবহালজির মর্জি।'

আকাশের ভাবগতিক ভালো করে দেখে নিয়ে চুনিয়া বলে, 'আসমানের যা হাল বারীষ আজ পুরা থামবে না। ধারাবনির হাটিয়ায় গিয়ে কামকাজ জুটবে কিনা বুঝতে পারছি না। কিছু পাওয়া গেলে, যারা কাজ দেবে তাদের সঙ্গে চলে যাব। না পেলে দুমরিয়ায় ফিরে যেতে হবে। তাই ভাবছিলাম—'

ধনেরি জিগ্যেস করে, 'কী ভাবছিলি?'

'তোমার খেলা জলদি শেষ হলে ফেরার সময় তোমার গাড়িতে করে অনেকটা রাস্তা যাওয়া যেত।'

'এক কাজ কর না—'

'কী?'

'রামবহালজির হাভেলিটা চিনিস?

'না।'

'যাকে পুছবি সেই বলে দেবে।'

'রামবহালজির হাভেলির কথা বলছ কেন?'

ধনেরি বলে, 'হাটিয়ায় গিয়ে কাজ না পেলে সিধা ওখানে চলে যাস। আমার খেলা দেখানো হলে তোকে গাড়িতে তুলে নেব। আর রামবহালজি থেকে যেতে বললে তোকে একেলীই ফিরতে হবে।'

চুনিয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

ধারাবনি টাউনে ঢোকার মুখে, ডান দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে হাট বসে। প্রচণ্ড বর্ষার কারণে আজ সেটা জমে নি। লোকজন খুব কম। বেশির ভাগ হাটের চালাই ফাঁকা পড়ে আছে। বাকিগুলোতে মালপত্র সাজিয়ে বসেছে দোকানদারেরা। কিন্তু কেনাকাটা করার লোক নেই বললেই হয়।

হাটের কাছে এসে চুনিয়া বলল, 'রুখো ইঁহা। গাড়ি থামলে সে নেমে পড়ল, 'আমি চলি—' হাটের চালাগুলোর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'তুমনি ইঁহা থোড়েসে ঠহর যাও —

ধনেরি শুধোয়, 'কায়?'

'মজুর নেবার জন্যে লোকজন এসেছে কিনা খবর নিয়ে আসি। যদি কেউ না এসে থাকে তোমার সঙ্গে রামবহালজির হাভেলিতে যাব। ওখানে কি কামকাজ কিছু জুটতে পারে?'

'জানি না।'

'রামবহালজিকে বলে দেখবে যদি উনি গরিব আওরতকে থোড়েসে কিরপা করেন—'

একটু চিন্তা করে ধনেরি বলে, 'ঠিক হ্যায়, বোলেগা। তুই তুরন্ত খোঁজ নিয়ে আয়।'

হাটের সারি সারি চালা যে :নে শেষ হয়েছে, তারপর ফুটিফাটা টিনের একটা মস্ত ছাউনি। সেটার তলায় চারিদিকের দিনমজুরেরা রোজ এসে জড়ো হয়। পয়সাওলা গেরস্তরা তাদের ভেতর থেকে পছন্দমতো কাজের লোক ে ছে নিয়ে যায়। আজ জায়গাটা সুনসান। যারা কাজ দেবে তারা তো আসেই নি, একটা মজুরকেও দেখা যাচ্ছে না।

কোনো আশাই যখন নেই তখন ফাঁকা ছাউনির তলায় বসে থেকে কী হবে? চুনিয়া রাস্তায় ফিরে আসে।

ধনেরি জিগ্যেস করে, 'কী হল রে?'

'কেউ আসে নি। কোঈ ভরোসা নেহী।'

'তা হলে আমার গাড়িতে উঠে পড়।'

পেছন দিক দিয়ে উঠে ফের সেই ঢাউস বাক্সটার ওপর বসে চুনিয়া।

শহরের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় তিন বিঘে জায়গার মাঝখানে রামবহাল ঝা'র বিশাল তেতলা বাড়ি। দেওয়ালগুলো চুন-সুরকির গাঁথনি দেওয়া। কম করে চল্লিশ ইঞ্চি পুরু। বিরাট বিরাট দরজা-জানালা। প্রতিটি দরজায় পেতলের গুল বসানো। গোটা বাড়িটাকে ঘিরে দশ হাত উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল। রাস্তার দিকে প্রকাণ্ড লোহার গেট। সেখানে গলায় টোটার মালা ঝোলানো দারোয়ান হামেহাল মজুত থাকে।

ধনেরিরা সেখানে এসে দেখল, গেটের পাল্লা দু'টো হাট করে খোলা। দারোয়ান একধারে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেতরে তখন হুলস্থূল কাণ্ড চলছে।

গেটের পর অনেকটা ফাঁকা জমি, তারপর মূল বাড়িটা। সামনের দিকে পনেরো হাত চওড়া শ্বেত পাথরের টানা বারান্দা। সেখানে ঘিউ-মালাই খাওয়া, ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা রামবহাল ঝা বাঘের মতো গজরাচ্ছেন, 'ভূচ্চরের ছৌয়াদের লাথ মেরে বার করে দেব। পাইসা দিয়ে আমি কতগুলো নিকম্মা পুষেছি। খেয়ে খেয়ে এককে হাঁথী হয়ে উঠছে। কামের বেলায় কুছ নেহী। নিকাল যা—নিকাল যা—' রাগে তার মুখ যেন ফেটে পড়বে।

বারান্দার তলায় বাঁধানো চত্বরে কয়েক গণ্ডা নৌকর ঝিপঝিপে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের বাইরে গাড়িটা থামিয়ে দিয়েছিল ধনেরি। ভেতরের দৃশ্যটা চোখে পড়তে ভীষণ দমে যায় সে। রামবহাল যেরকম ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন তাতে খেলা দেখার মতো মেজাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে গেছে। ক'টা টাকার আশায় প্রচুর লটবহর গাড়িতে তুলে সেই ভোর থেকে একটানা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এতটা রাস্তা এসেছে সে। খাটুনিটাই তার বরবাদ হয়ে গেল। তা ছাড়া চুনিয়াকে না বললেও মনে মনে ভেবে রেখেছিল, রামবহালজির হাতে পায়ে ধরে কিছু পয়সা ওকেও পাইয়ে দেবে। আদমিটার দিল খুব দরাজ। মনমেজাজ ভালো থাকলে কাউকে ফেরান না।

বন্দুকধারী দরোয়ানটা ধনেরিকে দেখতে পেয়েছিল। সে তাকে অনেকদিন ধরেই চেনে। রামবহালজি ধনেরির খেলার একজন বড় সমঝদার, তিনি তাকে খুবই পছন্দ করেন, এটা দারোয়ানের ভালো করেই জানা আছে। সে বলে, 'খেলা দেখাতে এসেছ বুঝি?'

'হাঁ—' ভয়ে ভয়ে, নিচু গলায় ধনেরি বলে, 'লেকিন বড়ে সরকার এত গুস্‌সা করে আছেন। কী করব, বুঝতে পারছি না। লৌট যায়গা—কা?'

দারোয়ানও ধনেরিকে কম পছন্দ করে না। রামবহাল তো একা ওর খেলা দেখেন না, বাড়ির কাজের লোকেরাও দেখে ধারবনি টাউনের লোকজনদেরও তিনি খেলার সময় ডাকিয়ে আনেন।

দারোয়ান ধনেরির একজন অত্যন্ত গুণমুগ্ধ দর্শক। সে এমন ওস্তাদ খেলোয়াড় আগে কখনও দেখে নি। বলল, 'এত কষ্ট করে এলে। ফিরে যাবে কেন? ভেতরে যাও—'

'লেকেন—'

'সরকার তোমাকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন—তাই না?'

'হাঁ।'

দারোয়ান জানে, না ডাকলে ধনেরি কখনও এখানে আসে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলল, 'তুমি হাভেলি পর্যন্ত এসে যদি দেখা করে না যাও সরকার তোমার ওপর গুস্‌সা করবেন।'

ধনেরি শুধোয়, 'ছে-সাত সাল আমি এ বাড়িতে আসছি। আগে কখনও বড়ে সরকারের এত চড়া মেজাজ দেখিনি। কী হয়েছে?'

'ঘোড়া ভেগে গেছে।'

'কিসের ঘোড়া?'

'অন্দর গেলেই বুঝতে পারবে।'

একরকম মরিয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত গাড়িটা চালিয়ে ভেতরের চত্বরে চলে এল ধনেরি।

গলার শিরা ছিঁড়ে এখনও তর্জন করে চলেছেন রামবহাল। হঠাৎ ধনেরিকে দেখে শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে যায় যেন তাঁর। কণ্ঠস্বর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'কী চাই এখানে? ভাগো—ভাগো ইঁহাসে—'

গাড়ি থেকে নেমে রামবহালের উদ্দেশে চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে হাতজোড় করে জড়সড় ভঙ্গিতে ধনেরি বলে, 'সরকার, আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন—' বলতে বলতে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আর দুই হাঁটু থরথর কাঁপছে।

রামবহালের হয়তো মনে পড়ে গেল। গলার স্বর সামান্য নামিয়ে বললেন, 'হাঁ, তা বলেছিলাম। লেকেন আজ খেলা দেখার সময় নেই। পরে আবার খবর দেব। এখন ভাগ—'

আর কিছু বলতে সাহস হয় না ধনেরির। এদিকে বৃষ্টি থামার আদৌ কোনো লক্ষণ নেই। অবিরাম ঝরেই চলেছে। ফের মাইলের পর মাইল গাড়ি চলিয়ে ভিজে ভিজে ফিরে যেতে হবে। হতাশায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম। ক্লান্তিতে হাত-পা ভেঙেচুরে আসছে তার, কিন্তু ফেরা ছাড়া আর উপায়ই বা কী।

গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে ধনেরি চালকের সিটে উঠতে যাবে, রামবহাল পেছন থেকে ডাকলেন, 'এ ধনেরি, রুখ যা।'

ধনেরি বেশ অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। রামবহাল তাকে কাছে ডেকে বলেন, 'তুই তো জবরদস্ত খিলাড়ি। আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি?'

ধনেরি বলে, 'কী কাজ সরকার?'

রামবহাল বলেন, 'তুই তো জানিস আমার ঘোড়ার খুব শখ।'

'জানি সরকার।'

ক'বছর ধরে নিয়মিত এখানে আসার কারণে রামবহালের মর্জি-মেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে ধনেরি। তাঁর হাভেলির পেছন দিকে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় তিনটে পুরনো মডেলের গাড়ি আছে। কিন্তু মোটরে তিনি কচিৎ কখনও চড়ে থাকেন। ফিটনই তাঁর বেশি পছন্দের। চার চারখানা হুড-খোলা ঘোড়ার গাড়িও আছে রামবহালের। তেজী ঘোড়াও রয়েছে পাঁচ ছ'টা। ফিটনে তো বটেই, মাঝে মধ্যে ঘোড়ায় চড়েও তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

ঘোড়াগুলোর বয়স বাড়লে যখন কমজোর হয়ে পড়ে, আগের মতো আর ছুটতে পারে না, সেগুলো বেচে নতুন ঘোড়া কেনেন রামবহাল। এইভাবেই বছরের পর বছর চলে আসছে।

রামবহাল বললেন, 'ক' মাহিনা আগে হরিহরছত্রের (শোনপুরের) মেলা থেকে একটা ঘোড়া কিনিয়ে এনেছিলাম। লেকিন জানবরটা এমন বেয়াড়া আর বেতমিজ যে কিছুতেই পোষ মানানো যাচ্ছে না।'

অনেকদিন রামবহালের হাভেলিতে আসে নি ধনেরি। তাই মেলা থেকে ঘোড়া কেনার খবরটা তার জানা ছিল না। কিছু না বলে সে তাকিয়ে থাকে।

রামবহাল বলতে লাগলেন, 'একবার ভেবেছিলাম ঘোড়াটাকে দূর করে দিই। তারপর মাথায় রোখ চেপে গেল, এত এত ঘোড়া শায়েস্তা করেছি আর এটাকে পারব না? পোষ মানাবার জন্যে তিন তিনগো আদমি ওর পেছনে লাগিয়ে দিলাম।'

ধনেরি জিগ্যেস করে, 'তবু কিছু হল না?'

'নেহী।'

'কাল বারীষ ছিল না। আমার আদমিরা ঘোড়াটাকে টহল দিয়ে আনার জন্যে পাক্কীতে গিয়েছিল। আচানক ওদের চাঁট মেরে জানবরটা পছিম দিকে জঙ্গলে ভেগে গেছে। কাল পুরা দিন আমার লোকেরা ওটাকে ঢুঁড়েছে, আজও বারীষ মাথায় নিয়ে জঙ্গলে গেছে, লেকেন ঘোড়াটার পাত্তা নেই।'

রামবহাল ঝা নৌকরদের চত্বরে দাঁড় করিয়ে কেন ধমক ধামক দিচ্ছেন এতক্ষণে তা বুঝতে পারছে ধনেরি। শুধু তাই না, এবার তিনি তাকে কী বলবেন সেটাও আন্দাজ করা যাচ্ছে। উদ্‌গ্রীব ধনেরি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

রামবহাল নৌকরদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'এই ভূচ্চরগুলোকে দিয়ে কিছু হবে না। ঘোড়াটা আমার ফেরত চাই। ওটা যদি তুই জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে আসতে পারিস, পাঁচশো রুপাইয়া বকশিশ পাবি। রাজি?'

নানা ধরনের খেলা দেখিয়ে কোনো বারই এক বেলা ভরপেট খাওয়া আর পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশি রামবহাল ঝা'র কাছ থেকে পায় নি ধনেরি। সেই লোক কিনা ঘোড়া ধরে এনে দেবার জন্য পাঁচশো টাকা দিতে চাইছে? নিজের কানে শোনার পরও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। নগদ এতগুলো রুপাইয়া হাতে পেলে তিনটে মাসের জন্য সে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ চুনিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। এই সুযোগে তারও যদি দু'টো পয়সা হয়ে যায়, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। বড় আশা নিয়ে মেয়েটা ধারাবনি এসেছে। ধনেরি ঘোড়া ধরে আনতে পারলে পাঁচশো টাকা পাবে আর চুনিয়া মুখ চুন করে, খালি হাতে তাদের গাঁয়ে ফিরে যাবে, এটা হয় না। চুনিয়ার জন্য সে চেষ্টা করে দেখবে। যদি কিছু হয় ভালো, নইলে নিজের টাকা থেকে ওকে কিছু দেবে।

ধনেরি বলল, 'কোসিস করেগা হুজৌর। লেকেন একগো বাত—'

রামবহাল ঝা বললেন, 'কী বলবি বল—'

'আমার সাথ একজন আছে, ঘোড়া ঢুঁড়বার জন্যে তাকে সঙ্গে নিতে চাই।'

'কে সে?'

'নিয়ে আসছি।'

গাড়ি থেকে চুনিয়াকে নামিয়ে রামবহালের সামনে হাজির করে ধনেরি। বলে, 'এর নাম চুনিয়া—'

রামবহাল জিগ্যেস করেন, 'তোর কে হয়—ঘরবালী?'

'নেহী নেহী—' ধনেরি চমকে উঠে বলে, 'ও আমাদের গাঁওয়ের মেয়ে। কামকাজের খোঁজে এখানে এসেছিল।'

দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেন না রামবহাল। সংশয়ের সুরে বলেন, 'ও একটা আওরত। ও কী পারবে?'

পাছে রামবহাল চুনিয়াকে নাকচ করে দেন, তাই ভীষণ ব্যগ্রভাবে ধনেরি বলে ওঠে, 'পারবে হুজৌর। চুনিয়া খুব তেজী আওরত।'

কী ভেবে রামবহাল বলেন, 'ঠিক হ্যায়, ওকে শ'ও রুপাইয়া দেব। লেকেন ঘোড়া ধরে আনতে না পারলে কেউ একগো পাইসাও পাবি না। রাজি?'

হাতে কাজকর্ম নেই, রোজগারের অন্য কোনো ফিকিরও মাথায় আসছে না, অথচ টাকা চাই। রামবহালের কথায় রাজি না হয়ে উপায় কী? ধনেরি বলে, 'ঠিক হ্যায়, আপনি যা বললেন তাই হবে সরকার। তবে আউর একগো বাত—'

'আবার কী হল?'

ধনেরি জানায়, সেই ভোর থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়ি চালিয়ে এতদূর এসেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পেটে একদানা খাদ্য পড়েনি। ভুখে পেট জ্বলে যাচ্ছে। হুজৌর যদি তাদের কিছু খাবার দিতে হুকুম দেন, খিদের জ্বালা থেকে রক্ষা পায়। রামবহাল একটা নৌকরকে দিয়ে অনেকগুলো চাপাটি আর লাড্ডু আনিয়ে ধনেরিদের দেন।

ধনেরি চুনিয়াকে সঙ্গে করে তার গাড়ি থেকে লাঠি, মোটা দড়ি, ছুরি, দা আর খাবারগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় যেতে যেতে চাপাটি টাপাটি খেয়ে নেবে।

পশ্চিম দিকের জঙ্গলটা ধনেরির অচেনা নয়। ওখানে একমাত্র বরা আর বিষাক্ত কিছু সাপ ছাড়া অন্য কোনো হিংস্র জন্তু নেই। বাদবাকি হল হরিণ, খরগোশ আর বুনো বেড়াল বা শিয়াল। তবু বন-বরা বা জংলি শুয়োরদের মতিগতি আগে থেকে আন্দাজ করা মুশকিল। কখন তারা খেপে উঠে তেড়ে আসবে, কে জানে। সাবধানের মার নেই, তাই ছুরি লাঠি সঙ্গে রাখা ভালো।

গাড়িটা রামবহাল ঝা'র বাড়ির চত্বরে রেখে দু'জনে বেরিয়ে পড়েছিল। যে পাকা সড়কটা ধরে ধনেরিরা এসেছিল সেটা ধারাবনি শহরের গা ঘেঁষে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। একসময় ওরা সেখানে চলে আসে। চাপাটি খেতে খেতে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরে এল। অজস্র জল ঝরানোর পর মেঘগুলো ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। সূর্যটাও মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে মুখ বাড়াতে শুরু করেছে। চারিদিকে এখন ফিকে, নিস্তেজ আলো। বোঝা যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণের ভেতর ঝলমলে রোদ দেখা দেবে। হাঁটতে হাঁটতে ধনেরি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'রওদ (রোদ) ফুটছে। ভালোই হল—কী বলিস?'

চুনিয়া তার কথায় সায় দিয়ে বলে, 'হাঁ। বারীষ চললে ঘোড়াটাকে খুঁজতে মুশকিল হত।'

একসময় ধনেরিরা পশ্চিমের জঙ্গলে পৌঁছে যায়।

জঙ্গলের সামনের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা। অল্প কিছু ঝোপঝাড়, ট্যারাবাঁকা চেহারার দু-চারটে সিসম, কেঁদ আর গরান গাছ ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে সেসবের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়।

'ধনেরি বলে, 'আমি বাঁ দিকটা দেখছি। তুই ডাইনে নজর রাখ।'

চুনিয়া আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ।'

'সামনের দিকটাও দেখবি।'

'হাঁ।'

খানিকটা এগুবার পর জঙ্গল ঘন হতে শুরু করে।

'ধনেরির কথামতো তীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে এবং সামনে তাকাতে তাকাতে চুনিয়া হঠাৎ বলে ওঠে, 'একটা কথা ভাবছিলাম।'

ধনেরিও সতর্কভাবে বাঁয়ে লক্ষ রাখছিল। সে জিগ্যেস করল, 'কী?'

'এই যে আমরা জঙ্গলে এসে এত মহনত করছি, কিছু ফায়দা হবে?'

'মতলব?'

চুনিয়া তার সংশয়ের কথাটা বুঝিয়ে বলে। রামবহালজির এতগুলো নৌকর দু'দিন ধরে নিশ্চয়ই জঙ্গল তোলপাড় করেছে। তারা যখন ব্যর্থ হয়েছে, চুনিয়ারা কি ঘোড়াটাকে খুঁজে বার করতে পারবে? নাকি খাটুনিটাই পুরোপুরি নিষ্ফল হয়ে যাবে?

ধনেরি বলে, 'জঙ্গলটা তো খুব ছোট নয়। এমনও হতে পারে, ঘোড়াটা যেখানে আছে, রামবহালজির নৌকরেরা সেদিকে যায় নি। চুনিয়ারা তো খালি হাতেই যে যার গাঁওয়ে ফিরে যাচ্ছিল। পয়সা রোজগারের একটা সুযোগ যখন হাতে এসেই গেছে, চেষ্টা করে দেখতে হবে না?

চুনিয়া তবু খুঁত খুঁত করতে থাকে, 'ঘোড়াটা আমাদেব জন্যে যে জঙ্গলে বসে থাকবে তার কি কিছু ঠিক আছে?'

ধনেরি রেগে যায়, 'বকবকানি থামাবি? ইচ্ছা না হলে ফিরে যা। আমি একলাই জঙ্গল টুঁড়ব।'

আপসের সুরে চুনিয়া বলে, 'গুস্‌সা করো না। আচ্ছা, আমি এ নিয়ে আর কিছু বলছি না।'

এতক্ষণে রোদ বেরিয়ে গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে বনভূমিতে এসে পড়েছে। ওরা চলেছে তো চলেছেই।

হঠাৎ দু'টো হড়হড়িয়া সাপ পাশ দিয়ে সর সর করে বেরিয়ে কোথায় অদৃশ্য হল। মানুষের পায়ের আওয়াজ পেয়ে অগুনতি পোকা উড়তে শুরু করেছে। চারিদিক থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক উঠে আসছে। সেই সঙ্গে গলা মিলিয়ে ব্যাঙেরাও ডেকে চলেছে। তার মানে বৃষ্টিটা আপাতত ধরে গেলেও পরে আবার নতুন করে শুরু হতে পারে। ব্যাঙেরা বৃষ্টির ব্যাপারটা আগেভাগে টের পায়।

দূরে, ডান দিকে কোনাকুনি চোখে পড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ মোটা মোটা গাছের আড়াল দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

অনেক দূর যাওয়ার পর খানিকটা জলা জায়গা পড়ল। তার পাড়ে প্রচুর কাঁক আর মানিক পাখি পাঁচমেশালি আওয়াজ করে চলেছে। ধনেরিদের দেখে তারা তুমুল হইচই বাধিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়তে লাগল।

হঠাৎ চুনিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, 'বরা—হুই—'বলে বাঁ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

সত্যিই একটা গরান গাছের তলায় দু'টো দাঁতাল শুয়োর দাঁড়িয়ে আছে। কুটিল দৃষ্টিতে তারা ধনেরিদের লক্ষ করছে।

ধনেরি এক টানে চুনিয়াকে তার পেছনে নিয়ে এসে লাঠি বাগিয়ে ধরল। কিছুক্ষণ শুয়োর দুটো কী ভাবল কে জানে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে উলটো দিকে চলে গেল।

ধনেরিরাও আর দাঁড়াল না। জলার ধার দিয়ে দিয়ে ওপারে চলে এল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় ধনেরি লক্ষ করে, মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ছে চুনিয়া। হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো। সারাদিনের ধকলে নিশ্চয়ই কাবু হয়ে পড়েছে। সে জিগ্যেস করে, 'কি রে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। বহুত থকে গেছিস?'

চুনিয়া লজ্জা পেয়ে যায়। জোরে জোরে পা চালাতে চালাতে বলল, 'নেহী। হামনি ঠিক হ্যায়।' একটু চুপ করে থেকে বলে, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় আসছে না।'

ধনেরি জিগ্যেস করে, 'কী?'

চুনিয়া জানতে চায়, উদ্দেশ্যহীন হাঁটাহাঁটি করে এত বড় জঙ্গলে ঘোড়াটাকে কিভাবে পাওয়া যাবে?

ধনেরি বলে, এলোপাথাড়ি সে হাঁটছে না। আপাতত তারা জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলেছে। এইভাবে সোজাসুজি শেষ মাথা পর্যন্ত যাবে। যদি ঘোড়ার দেখা পাওয়া যায় ভালো, নইলে তাদের ডান দিকে যেতে হবে। সেখানে না পেলে বাঁ ধারে।

চুনিয়া গালে হাত দিয়ে অবাক বিস্ময়ে বলে, 'হো রামজি!'

মুখ ফিরিয়ে ধনেরি বলে, 'কী হল রে?'

'পুরা জঙ্গল যদি এভাবে টহল দিয়ে বেড়াও, তাহলে দিন খতম হয়ে আন্ধেরা নেমে যাবে।'

'এছাড়া আর কী করতে পারি? আজ যদি ঘোড়াটাকে খুঁজে না পাই, রাতে ধারাবনিতে কোথাও থেকে যাব। ফের সুবে সুবে এসে টুঁড়তে শুরু করব।'

না, সারা জঙ্গল টহল দেবার দরকার হয় না। আরো খানিকটা চলার পর আচমকা চুনিয়ার একটা হাত ধরে থামিয়ে দেয় ধনেরি। চাপা, উত্তেজিত গলায় বলে, 'সামনে দ্যাখ—'

পনেরো কুড়ি হাত দূরে আগাছার ঝোপ। সেটার ওধারে একটা তেতর গাছের তলায় একটা তেজী বাদামি রঙের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সেটার মুখ অন্য দিকে ফেরানো। জন্তুটার গলায় চামড়ার সরু গলাবন্ধে অনেকগুলো পেতলের ঘুন্টি বসানো। পিঠে গদি।

ধনেরি বলল, 'এটাই বড়ে সরকারের ঘোড়া।'

চুনিয়া বলে, 'রামজিকা কিরপা, আমাদের পুরা জঙ্গল ঢুঁড়তে হল না।'

ধনেরি বলে, 'হোঁশিয়ার। এতটুকু আওযাজ করবি না। আয় আমার সাথ—'

ঘোড়াটা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে বলে ধনেরি আর চুনিয়াকে দেখতে পাচ্ছে না। ওরা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে জন্তুটার পেছনে তেতর গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়।

চুনিয়া কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে ধনেরিকে শুধোয়, 'এবার কী করবে?'

ধনেরি তেতর গাছটা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল। গাছটার একটা মোটা ডাল হেলে ঘোড়াটার মাথার কাছাকাছি চলে গেছে।

ধনেরি জিগ্যেস করে, 'গাছে চড়তে পারিস?'

চুনিয়া বলে, 'খুব উঁচা গাছ হলে পারব না।'

তেতর গাছের মোটা ডালটা দেখিয়ে ধনেরি শুধোয়, 'ওখানে উঠতে পারবি?'

ডালটা মাটি থেকে দশ-বারো হাত ওপরে। ভালো করে দেখে নিয়ে চুনিয়া বলে, 'পারব। লেকেন ওখানে উঠে কী হবে?'

ধনেরি তার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেয়। প্রথমে সে গাছে চড়ে ডালটার ওপর দিয়ে বুক ঘষে ঘষে ঘোড়ার কাছে চলে যাবে। তার পিছু পিছু আসবে চুনিয়া। তারপর দু'জনে ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে পড়ে ওটাকে রামবহালজির হাভেলিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে।

পরিকল্পনাটা তেমন মনঃপূত হয় না চুনিয়ার। সে বলে, 'তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো?'

'জানি। মাদারি খেল যখন দেখাতাম তখন শিখেছিলাম।'

'লেকেন আমি কখনও ঘোড়ায় চড়ি নি।'

'ঘাবড়ানেকা কুছ নেহী। জানবরটার পিঠে লাফিয়ে পড়ার পর তুই আমার কোমর জাপটে ধরে থাকবি। তারপর শালেকে কী করে দাবড়ে নিয়ে যেতে হয় সেটা আমি দেখব। সমঝি?'

চুনিয়া উত্তর দেয় না। অসীম দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে ধনেরির পিছু পিছু গাছ বাইতে থাকে।

কাজটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, আদপেই সেটা তা নয়। গাছের ডাল থেকে আচমকা দু'টো মানুষ পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়তে ঘোড়াটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে সামনের দিকে দু'পা তুলে গা ঝাড়া দিয়ে এক ঝটকায় ধনেরি আর চুনিয়াকে ছিটকে ফেলে দেয়। ধনেরি প্রায় দশ হাত দূরে একটা কাঁটাঝোপে গিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের চামড়া নানা জায়গায় কেটেকুটে রক্তাক্ত হয়ে যায়। চুনিয়া পড়ে যাবার সময় জন্তুটার চাঁট লাগে ডান উরুতে। ওটার পায়ের খুরে লোহার নাল বসানো। অসহ্য যন্ত্রণায় চুনিয়ার মনে হয়, পা'টা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

এমন একটা ঘটনার পর ধনেরির ভয় হয়েছিল, জানোয়ারটা এক মুহূর্তও আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না, দৌড়ে জঙ্গলের অন্য কোনো দিকে উধাও হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘোড়াটা এক কদমও নড়ে না। ঘাড় বাঁকিয়ে একটি হঠকারী পুরুষ এবং একটি আওরতকে লক্ষ করতে থাকে।

এদিকে কাঁটা ঝোপ থেকে নিজেকে বার করে এনেছে ধনেরি। তার মাথায় এখন রোখ চেপে গেছে। যে জানোয়ার তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে তাকে সে ছাড়বে না। চুনিয়াকে বলে, 'আমরা ফের ঘোড়ায় উঠব। আয়.....'

মাটিতে কাত হয়ে পড়ে উরু দু হাতে চেপে সমানে কাতরাচ্ছিল চুনিয়া। আতঙ্কগ্রস্তের মতো সে বলে, 'নেহী। ওটা বহোত খতারনাক জানবর।'

'কেত্তে বড়ে খতারনাক, আমি দেখব। তুরন্ত উঠে আয়।'

'নেহী। আমি ওটার ধারে কাছে যাব না।'

'তা হলে আমিই ওটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুই জঙ্গল থেকে একেলী বড়ে সরকারের হাভেলিতে যেতে পারবি?'

'যা চোট লেগেছে, পারব না।'

'এক কাজ কর। তুই এখানেই থাক। হাতের কাছে দা রাখবি। এটা জঙ্গল। হোশিয়ার রহনা—'

'ঠিক হ্যায়।'

এবার আর গাছে উঠে নয়, সোজাসুজি মাটি থেকেই লাফ দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ধনেরি। কিন্তু জন্তুটা তৈরি হয়েই ছিল, বিদ্যুৎগতিতে ঝাড়া দিয়ে তাকে ফেলে দেয়।

রক্ত মাথায় চড়ে যায় ধনেরির। একটা জানোয়ার তাকে নাস্তানাবুদ করছে, কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। দশ দশ বার ঘোড়াটার পিঠে ওঠে সে, প্রতি বারই ঝাড়া খেয়ে কখনও গিয়ে পড়ে মাটিতে, কখনও অন্য গাছের গুঁড়িতে, কখনও বা দূরের ঝোপঝাড়ে।

ঘোড়াটা এক জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে। ধনেরির দৌড় কতখানি, তার বেয়াদপি কতটা সহ্য করা যায় সেটাই বোধহয় দেখতে চাইছে।

বার বার আছাড় খেয়ে ধনেরির হাত পা বুক পিঠ থেঁতলে গিয়ে রক্ত ঝরছে। কিছু হাড়গোড় ভেঙেও গেছে বুঝিবা। সে ভীষণ হতাশ আর হয়রান হয়ে পড়েছিল। জোরে শ্বাস টানতে টানতে নির্জীব গলায় বলল, 'অ্যায়সা ভূচ্চরের ছৌয়া জানবর আমার সারা জীবনে আর একটাও দেখি নি। শালে আমার জান চৌপট করে দেবে।'

চুনিয়া বলে, 'ঘোড়া নিয়ে যাবার দরকার নেই। চল আমরা ফিরেই যাই।'

কী উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ বিজলি চমকের মতো মাথায় কিছু খেলে যায় ধনেরির। তেতর গাছের কাছে তাদের দড়ি লাঠি দা এবং ছুরি পড়ে রয়েছে। সে দৌড়ে গিয়ে দড়ির ফাঁস তৈরি করে দূর থেকে ছুড়ে ঘোড়াটার গলায় আটকে দিয়ে দড়ির অন্য দিকটা তেতর গাছটার গুঁড়িতে তিন চার ফেরতা দিয়ে বেঁধে ফেলে।

ঘোড়টা এটা ভাবতে পারেনি। অসহ্য রাগে টানাটানি করে বাঁধনটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু দড়িটা এতই মোটা আর শক্ত যে ছেঁড়া অসম্ভব।

ধনেরি চুনিয়াকে বলে, 'ও শালে এখানে বাঁধা রইল। তুইও থাক। আমি বড় সরকারের হাভেলি থেকে লোকজন নিয়ে তুরন্ত চলে আসছি।'

রামবহালজির বাড়ি থেকে তাঁর দশজন নৌকরকে সঙ্গে করে জঙ্গলে এসে ধনেরিরা সবাই মিলে আরো কয়েকটা দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ঘোড়াটাকে। তারপর সেটাকে আর চুনিয়াকে নিয়ে ফিরে যায়।

রামবহালজি ঘোড়া ফিরে পেয়ে বেজায় খুশি। কথামতো ধনেরিকে নগদ পাঁচশো আর চুনিয়াকে একশো টাকা দিয়ে তারিফের সুরে বললেন, 'শাবাশ।'

সেই আজব তিন চাকাওলা গাড়িটায় উঠে রামবহালজির হাভেলি থেকে বেরিয়ে একসময় ওরা বড় সড়কে চলে আসে। সামনে বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধনেরি। পেছনে পিঠের কাছে বাক্সের ওপর বসে আছে চুনিয়া।

সন্ধে অনেক আগেই নেমে গিয়েছিল। মেঘ কেটে গিয়ে নীলাকাশের অনেকটা অংশ এখন দেখা যাচ্ছে। সেখানে চাঁদির কটোরার মতো পুনমের গোল চাঁদ উঠেছে।

ডান উরু থেকে পা পর্যন্ত ভীষণ টাটাচ্ছিল চুনিয়ার। মাঝে মাঝে অস্ফুট, কাতর শব্দ করে উঠছিল সে।

ধনেরি জিগ্যেস করল, 'কি রে, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

চুনিয়া বলে, 'হোক। শ'ও রুপাইয়া তো পেলাম। এখন পাঁচ সাত রোজ পেটের জন্যে ভাবতে হবে না।'

'হাঁ, আমারও তাই। কয়েক রোজ ঘর থেকে এক কদমও বেরুব না।'

'লেকেন তোমার জন্যে একগো আপশোশ রয়ে গেল।'

বেশ অবাক হয়ে ধনেরি পেছন দিকে মুখ ফেরায়। বলে, 'কিসের আপশোশ?'

চুনিয়া বলে, 'খেল দেখাতে এসে জঙ্গল থেকে বড়ে সরকারের ঘোড়া ধরতে হল তোমাকে।'

ধনেরি বলে, 'কা করে। পেটের জন্যে কত কিছুই তো করতে হয়।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে চুনিয়া, 'হাঁ।'

মাইল কয়েক চলার পর চুনিয়া হঠাৎ বলে ওঠে, 'রুখো, রুখো—'

ধনেরি জিগ্যেস করে, 'কী হল?'

'আমি এখানে নামব।'

'এখানে কেন?'

'বা রে, ঘরে লৌটব না?'

এবার ধনেরির চোখে পড়ে, বাঁ দিকে যে সরু রাস্তাটা ধানখেত চিরে চলে গেছে ওটা দিয়েই দুমরিয়া গাঁওয়ে অর্থাৎ চুনিয়ার সসুরালে যেতে হয়। গাড়ি থামিয়ে দেয় সে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় তার।

চুনিয়া বলে, 'চলি—'

ধনেরি ভারী গলায় জিগ্যেস করে, 'তোর সাথ আর দেখা হবে না?'

চুনিয়া বলল, 'পেটের ধান্দায় তুমিও ঘুরছ আমিও ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে আজকের মতো আচানক কোথাও না কোথাও ফির দেখা হয়ে যাবে।' বলে আর দাঁড়ায় না, পাক্কী থেকে ওধারের সরু পথটায় নেমে গেল।

যতক্ষণ না ধানখেতের শেষ মাথায় চুনিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়, ধনেরি তার সিটে বসেই থাকে। তারপর পুনমের চাঁদ মাথায় নিয়ে বৃষ্টিভেজা ফাঁকা সড়কের ওপর দিয়ে ক্লান্তভাবে গাড়ি চালাতে শুরু করে।

প্রেম

ক'দিন আগে দিল্লি দূরদর্শনের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্পের চিত্রনাট্য লিখতে বসেছি। গল্পটির একটি দৃশ্য এইরকম। বাড়ির পুরুষেরা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে, মহিলারা ভরদুপুরে পরিপাটি দিবানিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত। এই সুযোগে সবার চোখ এড়িয়ে নায়িকা অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে ছাদে উঠে আসছে। ছাদ থেকে রাস্তার উলটো দিকের একটি বাড়ির চিলেকোঠা দেখা যায়। সেখানে কলেজ পালিয়ে এক যুবক তার জন্য প্রায় রোজই অপেক্ষা করে।

প্রায় তিরিশ ফিট দূরত্ব থেকে কথা বলার প্রশ্নই নেই। শুধু এক পলক দেখার জন্য মেয়েটিকে বিরাট ঝুঁকি নিতে হয়। ঝুঁকির কারণ, প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়।

প্রায় আশি বছর আগের লেখা এই গল্পের প্রেমিক-প্রেমিকার মতোই সেকালের যুবক-যুবতীরা ছিল ভীরু এবং লাজুক। তাদের ঘিরে সারাক্ষণ লোকলজ্জা, ভয় আর সংকোচ। সামাজিক পরিবেশটাই তখন এমন যে প্রেম করা বা দু'টি তরুণ-তরুণীর নিভৃত মিলন একটি অতি গর্হিত কাজ বা মারাত্মক ধরনের কুকর্ম। সে যুগে অসংখ্য যুবক-যুবতী দূর থেকেই পরস্পরকে দেখে হৃদয় সমর্পণ করে বসেছে, তার নীট ফল শুধুই হা-হুতাশ, আক্ষেপ, অশ্রুপাত এবং না ঘুমিয়ে রাত কাটানো। এইসব প্রেমের মৃত্যুহার খুবই বেশি।

ছাদের দৃশ্যটি যখন লেখা শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ পাশের বসবার ঘরে তুমুল হইচই এবং হাসাহাসির শব্দে চমকে উঠি। টের পাই, আমার ছোট মেয়ে তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে এইমাত্র কলেজ থেকে ফিরে এসেছে।

চিত্রনাট্যটি আজই শেষ করতে হবে। কাল হিন্দিতে সংলাপ অনুবাদ হবার পর পরশু থেকে শুটিং। হই-হল্লোড়ে আমার মনোযোগ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল বার বার। গলার স্বর একটু নিচু স্কেলে যাতে ওরা নামায় সেজন্য পাশের ঘরে যেতে হল। সেখানে দেখা গেল আমার ছোট মেয়ে, তার বন্ধু মালিনী এবং একটি অচেনা যুবক জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

মালিনীকে অনেক দিন চিনি। প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসে। দারুণ স্মার্ট এবং ঝকঝকে মেয়ে। পড়াশোনায় চৌকশ। আমার মেয়ের সঙ্গে আসছে বছর বি এ পার্ট-টু দেবে। শুনেছি. ওর বাবা স্টেট গভর্নমেন্টের মাঝারি মাপের একজন অফিসার। সচ্ছল মিডল ক্লাস বলতে যা বোঝায়, ওরা মোটামুটি তা-ই।

আমাকে দেখে হইহই থেমে যায়। সবাই উঠে দাঁড়ায়। মালিনী বলে, 'সরি মেসোমশাই, আপনি বাড়ি আছেন জানতাম না। নিশ্চয়ই লিখছিলেন? ভীষণ ডিসটার্ব করে ফেললাম।'

আমি সামান্য হাসি। অচেনা যুবকটিকে দেখিয়ে জিগ্যেস করি, 'একে তো চিনলাম না—'

মালিনী বলে, 'ও সঞ্জয়, হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করছে। একটা খবর দিই মেসোমশাই। আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে নেক্সট ইয়ারে আমরা বিয়ে করব। তার ভেতর ওর রিসার্চও শেষ হয়ে যাবে।'

এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। এভাবে কোনো মেয়েকে তার বিয়ের কথা ঘোষণা করতে আগে আর শুনিনি। রবীন্দ্রনাথের গল্পের সেই পরিবেশ থেকে উনিশশো সাতাশিতে ফিরে আসতে

আমার কিঞ্চিৎ সময় লাগে। একটু পরে শশব্যস্তে বলি, 'খুব সুখবর, তোমার মাসিমাকে জানিয়ে যেয়ো।'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা তোমরা গল্প কর।'

নিজের ঘরে ফিরে আসি। লেখায় মন বসে না। রবীন্দ্রনাথের সেই গল্পের নায়িকাটির সঙ্গে কত তফাত মালিনীর। আশি বছরে বাঙালি প্রেমিক-প্রেমিকারা বহুদূর এগিয়েছে নিঃসংশয়ে। সময়ের মাপে আট দশক, কিন্তু মানসিকতা এবং অ্যাটিচুডের দিক থেকে যেন কয়েক শতাব্দী।

কতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম, মনে নেই। পাশের ঘর থেকে এখন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার স্ত্রী রান্নাঘরে ছিলেন। এক কাপ চা নিয়ে এলেন। জানতে চাইলাম, মালিনীরা চলে গেছে কিনা। স্ত্রী জানালেন মালিনী এবং সঞ্জয়কে সুযোগ করে দিয়ে আমাদের ছোট কন্যাটি পাশের বাড়ি গেছে।

ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকছে। স্ত্রী বুঝিয়ে বললেন, মালিনী এবং সঞ্জয়ের বিয়ের ব্যাপারে কিছু সমস্যা আছে। আলোচনা করে তারা জট ছাড়িয়ে নিতে চায়। আমি যেন আপাতত ঘণ্টাখানেক বাইরের ঘরে না যাই।

বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করি, 'তা আমাদের এখানে?'

স্ত্রী জানান, কোথাও বসে নির্বিঘ্নে কথা বলার মতো নাকি জায়গা পাচ্ছে না মালিনীরা।

মজার গলায় বলি, 'আমাদের বাড়িটা প্রেমের স্যাংচুয়ারি হয়ে উঠল নাকি?'

মৃদু হেসে স্ত্রী চলে যান।

প্রেমের ব্যাপারে নানা সমস্যা চিরকালই রয়েছে। কিন্তু একটি তরুণ এবং একটি তরুণী কোথাও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে যে দু-এক ঘণ্টা সময় কাটাবে তেমন জায়গার যে অভাব ঘটেছে, এ দিকটা আগে কখনও ভাবিনি। প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে আজকাল 'স্পেস'ও যে একটা প্রবলেম, কে জানত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে যাদও আমার জন্ম, তখনকার কথা প্রায় কিছুই মনে নেই। তবে যুদ্ধের পর পুরনো ধ্যানধারণা ঠুনকো বাসনের মতো ভেঙে যেতে লাগল, সময় প্রবল এক আইকোনোক্লাস্ট হয়ে চুরমার করে দিতে লাগল যত সব জীর্ণ সংস্কার, বদলে গেল দীর্ঘকালের প্রাচীন ভ্যালুজ।

স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা অনেক আগে শুরু হলেও যুদ্ধের আগে রাস্তায় ক'টি আর মেয়ে দেখা যেত! কিন্তু পরে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা বেরিয়ে এল অন্তঃপুর থেকে। ভরে যেতে লাগল স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অফিস-আদালত। জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই সে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের গল্পের ভীরু কুণ্ঠিত নায়িকাদের বদলে আমরা পেয়ে গেলাম সাহসী উজ্জ্বল তৎপর তরুণীদের। দেশভাগের পর তো কথাই নেই। যে পঁচিশ তিরিশ লাখ উদ্বাস্তু কলকাতা এবং শহরতলিতে এসে আশ্রয় নিল তাদের মধ্যে কম করেও এক-দেড় লাখ তরুণী। তাদেরও বেরিয়ে পড়তে হল রাস্তায়—চাই শিক্ষা, চাই চাকরিবাকরি। বাঁচতে তো হবে।

জীবনের সকল দিকেই মেয়েরা তখন পুরুষদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে শুরু করেছে। মেলামেশার ব্যাপারে আগের সেই কড়াকড়ি নেই। একসঙ্গে যেখানে কাজ করতে হচ্ছে, ট্রামে-বাসে চলতে হচ্ছে, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে সেখানে এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এরই মধ্যে প্রেম তার কাজ করে চলেছে আরো ব্যাপকভাবে।

দেশভাগের পরও বেশ কয়ের বছর এই কলকাতা শহরে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা ছিল, ছিল অনেকগুলো সুন্দর পার্ক, চমৎকার ময়দান, লেক বা গঙ্গার ধার। জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক-প্রেমিকারা সেখানে গিয়ে বসতে পারত। তাদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারে কেউ নাক গলাত না, বিরক্ত করত না। শুধু সকৌতুকে কেউ কেউ তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যেত।

কিন্তু তারপর এই বিশাল মেট্রোপলিসের চেহারা দ্রুত পালটে যেতে লাগল। তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো শহরের তুলনায় এখানে পপুলেশন এক্সপ্লোসন বা জন-বিস্ফোরণ ঘটল ভয়াবহ আকারে। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা তো ছিলই, দানাপুর প্যাসেঞ্জার, মাদ্রাজ মেল বা আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বোঝাই হয়ে হাজার হাজার মানুষ আসতে লাগল রুজি-রোজগারের আশায়। কলকাতা তো কাউকে ফেরায় না, সবাইকেই মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে দেয়। মানুষের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বাড়তে লাগল ট্রাম-বাস, ঠেলা-রিকশা-অটো-মিনিবাস আর হাজার হাজার প্রাইভেট কার। এই মুহূর্তে সমীক্ষা চালালে হয়তো দেখা যাবে এই শহরে মাথাপিছু কুড়ি ফিটের বেশি জায়গা আছে কিনা সন্দেহ।

চারিদিকে এখন থিকথিকে ভিড়। বেশির ভাগ পার্কেই হয় সি এম ডি এ'র কিংবা পাতাল রেলের গো-ডাউন। যে ক'টিতে গুদাম নেই, সেগুলো অ্যান্টিসোশাল আর সাট্টাবাজদের দখলে। গঙ্গার ধারে, লেকের পাড়ে এত মানুষ যে আলাদাভাবে বসার উপায় নেই। ছোটখাটো রেস্তোরাঁয় পর্দা-ঢাকা কেবিনে গিয়ে যে প্রেমিক-প্রেমিকা ঘণ্টাখানেক বসবে, সেই সময়টুকুও মেলে না। চা'টা খাওয়া হতে না-হতেই 'বয়' বিল নিয়ে আসে। কেননা বাইরে লম্বা 'কিউ' অপেক্ষা করছে। তারা উঠলে অন্য এক জোড়া শূন্যস্থান দখল করবে। ফুটপাথ দিয়ে পাশাপাশি যে হাঁটবে তারও কি উপায় আছে? সেগুলো পুরোপুরি হকারদের দখলে।

এই শহরের বাতাস থেকে অক্সিজেন দ্রুত কমে যাচ্ছে, চারিদিকে গ্যাসোলিনের পোড়া গন্ধ, রাস্তায় জীবাণুর মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ, যেটুকু ফাঁকা জায়গা এখনও অবশিষ্ট আছে, সেখানে মুক্ত মূত্রাঙ্গন। মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি যুবক যে তার প্রেমিকাটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে তেমন জায়গা তো সেখানেও নেই। দুই কি আড়াই কামরার একটি ফ্ল্যাটে হয়তো সাত আটজন ফ্যামিলি মেম্বার।

তা হলে কি শুধু একটু জায়গার অভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারের 'প্রেমিক-প্রেমিকা' ক্লাসটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে? এই প্রশ্নটা মাঝে মাঝে আমাকে পেয়ে বসে। তখন খুবই বিষণ্ণ বোধ করি।

সেদিন পাতাল রেলের কালীঘাট স্টেশন থেকে জরুরি কাজে এসপ্ল্যানেডে যেতে হয়েছিল। দুপুরবেলা, তাই তেমন ভিড় ছিল না। ট্রেনে উঠতে উঠতে চোখে পড়ল, একটি তরুণ এবং একটি তরুণী পরিষ্কার ছিমছাম প্ল্যাটফর্মের একধারে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে নিচু গলায় কথা বলছে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে ফের কালীঘাটে ফিরে এসে দেখি সেই তরুণ-তরুণীটি একই জায়গায় নিজেদের মধ্যে বিভোর হয়ে আছে।

খুব ভালো লাগল। এত যে স্থানাভাব, তবু একালের প্রেমিক-প্রেমিকারা যেটুকু সুযোগ পাচ্ছে তা-ই কাজে লাগাচ্ছে। না, হতাশ হবার কিছু নেই।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের ব্যাপারে আমার একটি প্রস্তাব আছে। অভয়ারণ্যের মতো তাদের জন্য শহরের নানা প্রান্তে কয়েকটি সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থা করা যায় কি?

শহিদের স্ত্রী

দু সপ্তাহ আগে কাশ্মীরের সেনাশিবির থেকে রাজেশের শেষ চিঠি এসেছিল। সে লিখেছে, তিন চার দিনের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে। রাজেশ সেনাবাহিনীর একজন ল্যান্স নায়েক। আট বছর আগে সে ভারতীয় ফৌজে নাম লিখিয়েছিল। এখন তার বয়স একত্রিশ। মধ্যপ্রদেশের এক সেন্টারে বছরখানেক হাড়ভাঙা কঠোর ট্রেনিংয়ের পর তাকে পাঠানো হয় আসামে। সেখান থেকে রাজস্থান গুজরাট হয়ে দেড় বছর হল কাশ্মীরে আসে।

ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই থাক, ফি বছরই সতেরো জুলাইয়ের ঠিক আগে আগে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে নানকিপুরা টাউনে তাদের বাড়িতে চলে আসে রাজেশ। ছ'বছর আগে ওই তারিখে তার বিয়ে হয়েছিল। সতেরো জুলাই তার জীবনের একটা বিশেষ দিন। বাড়ি এসে ওই দিনটা বিমলার সঙ্গে কাটানো চাই-ই। বিয়ের পর থেকে এভাবেই চলে আসছে।

নানকিপুরা বিহারের অতি তুচ্ছ একটা শহর। দেশের মানচিত্রে কোথাও তার হদিস পাওয়া যাবে না। সেখানে আছে রাজেশের বুড়ো বাবা-মা—রামধারী এবং লছমী যাদব। আর আছে তার তিন বছরের ছেলে বাবুয়া এবং স্ত্রী বিমলা।

জুলাই মাস পড়লেই সারা বাড়ি জুড়ে তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। রাজেশ আসবে, তাই ঘরদুয়ার, সামনের চবুতর, সব ধুয়ে মুছে তকতকে করে তোলে বিমলা। যত ময়লা কাপড়চোপড়, বালিশের ওয়াড়, চাদর, জানালার পর্দা কেচে ইস্তিরি করে রাখে। ফৌজে ঢোকার পর নোংরা ময়লা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না রাজেশ। সে চায়, সেনা শিবিরের মতো বাড়িতেও সমস্ত কিছু ফিটফাট থাকুক।

বিমলাদের একটা টিভি আছে। এক রূপসী মহিলা প্রতি সপ্তাহে তাতে নানারকম লোভনীয় খাবার তৈরির কৌশল দর্শকদের শিখিয়ে দেন। মাট্রিক পাস বিমলা সেগুলো একটা খাতায় টুকে নেয়। রাজেশ ছুটি নিয়ে নানকিপুরায় এলে তার ভেতর থেকে বাছা বাছা কয়েকটি পদ রান্না করে খাওয়ায়।

এবছরও বাড়িঘর সাজিয়ে গুছিয়ে বিমলারা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না।

সেই যে রাজেশ লিখেছিল, তিন চারদিনের মধ্যে আসছে, তারপর আরো ছ'সাতদিন কেটে গেল কিন্তু সে তো আসেইনি, তার কোনো খবরও নেই। কেন আসতে দেরি হচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দু'দিন থানায় এবং একদিন এ অঞ্চলের জবরদস্ত পলিটিক্যাল লিডার রাজপুত ক্ষত্রিয় অযোধ্যানাথ সিংয়ের বাড়িতেও গিয়েছিল বিমলা। ওঁরা বলেছেন, ফৌজি দপ্তরে খোঁজ করে তাকে রাজেশ সম্পর্কে জানাবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি।

রাজেশ কাশ্মীরে বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বিমলারা সর্বক্ষণ প্রচণ্ড রকমের উৎকণ্ঠায় আছে। জায়গাটা যেন ভয়াবহ বারুদের স্তূপ। সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের সঙ্গে দিবারাত্রি বন্দুকের লড়াই চলছেই। যখন তখন বিস্ফোরণ আর খুন। গত বছর রাজেশ যখন ছুটিতে বাড়ি এসেছিল, বিমলা বলেছে, সে ফৌজ ছেড়ে দিক। রাজেশ বলেছিল, মুখের কথা খসালেই সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। তা ছাড়া বেরুবেই বা কেন? লোকটা অসীম সাহসী। সে আরো বলেছে, ফৌজে হাজার হাজার যুবক আছে। বিমলার মতো ওদের স্ত্রী বা মায়েরা যদি তাদের বেরিয়ে আসতে বলে, দেশটাকে বাঁচাবে কারা?

বিমলার উদ্বেগ আরো বেড়ে গিয়েছিল মাসখানেক আগে, যখন সীমান্তের ওপার থেকে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে শুরু করে। ওদের বেশির ভাগই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফৌজি। কোনো পক্ষই যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তবে ওখানে যা চলছে সেটা যুদ্ধই।

প্রতিদিনই যত বার টিভিতে খবর পড়া হয়, শ্বাসরুদ্ধের মতো বিমলারা সেটার সামনে বসে থাকে। সংবাদপাঠক লড়াইয়ের বিবরণ দিয়ে কত জন হানাদার খতম করা হয়েছে, কতখানি হারানো জমি আমরা পুনরুদ্ধার করেছি, এই সব জানাবার পর ভারি বিমর্ষ সুরে কোনোদিন বলেন, 'আজকের যুদ্ধে পাঁচজন ভারতীয় জওয়ান প্রাণ দিয়েছেন, সাতজন আহত হয়েছেন।' কোনোদিন মৃত্যুর সংখ্যা একটু কমে, কোনোদিন বা বাড়ে। সংবাদপাঠক হতাহতের নাম জানিয়ে তাঁদের ছবি দেখিয়ে আরো বলেন, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী নিহত সেনাদের জন্য গভীরভাবে শোকাহত, তাঁরা এই শহিদদের পরিবারগুলিকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছেন।

রোজ মৃত জওয়ানদের তালিকাটা পড়া হয়ে গেলে, বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে বিমলার। না, রাজেশের নাম তালিকায় নেই।

এইভাবে খবর শুনে শুনে সময় কেটে যাচ্ছিল। তার মধ্যে রাজেশের চিঠিটা এল। কী খুশি যে হয়েছিল বিমলা! কিন্তু তারপরেও তো কতগুলো দিন কেটে গেল! ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত, দিশেহারা বিমলা কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না।

অন্য দিনের মতো আজও সন্ধেবেলায় খবর শুনতে বসেছিল বিমলা, রামধারী আর লছমী। তিন বছরের বাবুয়া ঘরময় ঘুরে ঘুরে একটা খেলনা মোটর অক্লান্তভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

খবরের সময় হলে অদম্য আকর্ষণে বিমলারা টিভিটার সামনে যে চলে আসে তার কারণ একটাই। এই চতুষ্কোণ যাদু-বাক্সটা ছাড়া কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু জানার উপায় নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে খবর শুরু হল। প্রথমেই লড়াইয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে সুদর্শনা সংবাদপাঠিকা জানালেন, 'আজকের যুদ্ধে যে তিন বীর জওয়ান দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা হলেন গোর্খা রাইফেলসের রাইফেলম্যান গণেশ প্রধান, কুমায়ুন রেজিমেন্টের সিপাহী কেবলরাম ত্রিবেদী এবং ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নের ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদব। রাষ্ট্রপতি—'

বাকিটা আর শোনা হল না। রাজেশের মা, রুগ্ণ চেহারার লছমী বুকফাটা চিৎকার করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। তার চোখ থেকে পুরু লেন্সের চশমাটা দূরে ছিটকে গেল। রামধারী দু হাতে উন্মাদের মতো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ডুকরে ওঠে, 'ইয়ে কিয়া শুনায়া! ও মেরা বেটা রে—'

দাদা আর দাদীকে হঠাৎ ওভাবে কেঁদে উঠতে দেখে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল বাবুয়া। গাড়ি চালানো বন্ধ রেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

রাজেশের খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড ফেটে যেন চৌচির হয়ে গেল বিমলার। মনে হল সমস্ত শরীর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, দ্রুত অসাড় হয়ে যাচ্ছে। একটা প্রবল কান্না বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার করে গলার কাছে এসে ডেলা পাকিয়ে গেল, কিছুতেই সেটা বার করে আনতে পারছে না সে।

সংবাদপাঠিকা একটানা খবর পড়ে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো ক্লিপিং দেখানো হচ্ছে। মহিলা কী যে পড়ছেন, টিভির পর্দায় কিসের ছবি ফুটে উঠছে, কিছুই বিমলা দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিল না। মহিলাটির কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট গুঞ্জনের মতো কানে আসছে। সে টের পায়, গল গল করে ঘাম বেরিয়ে তার জামাকাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে। টিভির শব্দ এবং চারপাশের

দৃশ্যাবলি ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে একসময় বিলীন হয়ে যায়। বিমলার ঘাড় ভেঙে মাথাটা একপাশে ঝুলে পড়ে।

কতক্ষণ বেঁহুশ হয়ে ছিল, বিমলা জানে না। যখন জ্ঞান ফেরে দেখতে পেল, খাটে শুয়ে আছে সে। তার মাথা মুখ এবং বালিশ জলে ভেজা।

এখন বাড়িভর্তি প্রচুর লোকজন। তারাই তাব মাথায় জল ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়েছে।

লছমী অঝোরে কেঁদে চলেছে। রামধারী যাদব আগের মতোই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে একটানা আর্ত চিৎকার করে যাচ্ছে।

বিমলাদের টোলার কয়েকজন বয়স্ক মহিলা লছমীকে জড়িয়ে ধরে ভারী, বিষণ্ণ গলায় বলছে, 'রো মাত্ রাজুয়াকা মাঈ--রো মাত্—'

ক'জন আধাবয়সী পুরুষ রামধারীকে ঘিরে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। পাশের বাড়ির হরসুখের বিধবা বোন রাধিয়া বাবুয়াকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে না পারলেও দাদা-দাদীকে কাঁদতে দেখে বাবুয়াও এখন কাঁদছে।

বিমলাকে চোখ মেলতে দেখে নানা বয়সের ক'টি মেয়ে বউ তার পাশে গিয়ে বসল।

সারা বাড়ির পরিবেশ শোকাচ্ছন্ন, নিজের জীবনের চূড়ান্ত ক্ষতিটা হয়ে গেছে, তবু কাঁদতে পারছে না বিমলা। জ্ঞান ফেরার পরও বিহ্বলের মতো সে এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ভিড়ের ভেতর কারা যেন চাপা গলায় ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'বিলকুল পত্থর বন গয়ী!'

পড়শি এক বুড়ি, যাকে সবাই নাথুনির মা বলে ডাকে--কী ভেবে বাবুয়াকে রাধিয়ার কোল থেকে নিয়ে বিমলার কাছে বসিয়ে দেয়। ছেলেটা কাঁদছিলই, মায়ের ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিমলাব মধ্যে কী একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। দ্রুত উঠে বসে বাবুয়াকে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'হো ভগোয়ান, এ কী হল আমাব!' এতক্ষণে অবরুদ্ধ কান্নাটা হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসতে পারল।

নাথুনির মা হয়তো এটাই চাইছিল · বিমলা কাঁদুক--কেঁদে কেঁদে একটু হালকা হোক।

অনেকক্ষণ কান্নার পর রামধারী, লছমী এবং বিমলার ফুসফুসের দম যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় চারপাশের লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। পরক্ষণে ভিড় ঠেলে থানার একজন অফিসার ঘরে এসে ঢুকলেন। এখানকার শোকাবহ পরিবেশ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল যেন।

অফিসারটির নাম মহেশ্বর সহায়। খানিকক্ষণ বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তারপর ভিড়টার দিকে ফিরে নিচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এ বাড়িতে ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদবের কে কে আছে?'

পড়শিদের একজন রামধারীদের দেখিয়ে বলল, 'ওর বাবুজি মা স্ত্রী আর বেটা—' বিমলাদের নামগুলোও লোকটা জানিয়ে দেয়।

শোকাতুর মানুষগুলোকে দেখে সেরকমই আন্দাজ করেছিলেন মহেশ্বর। ওরা যে রাজেশের মৃত্যু সংবাদ জেনে গেছে সেটাও বোঝা যাচ্ছিল। একে একে রামধারী লছমী এবং বিমলার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। ভগোয়ান বিষ্ণুজি দুঃখ কাটিয়ে ওঠার মতো মনের জোর আপনাদের দিন।'

রামধারীরা কেউ কিছু বলে না। শুধু অবিরল তাদের গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে থাকে।

মহেশ্বর এবার জানান, পরশু ভোরে রাজেশের মৃতদেহ প্লেনে কাশ্মীর থেকে পাটনায় নিয়ে আসা হবে, সেখান থেকে ভারতীয় ফৌজের গাড়িতে 'অন্তিম সংস্কার'-এর জন্য আনা হবে

নানকিপুরায় তাদের বাড়িতে। মৃতদেহের সঙ্গে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আসবেন বড় বড় ফৌজি অফিসার এবং জওয়ানেরা। তা ছাড়া স্থানীয় পুলিশের বিশাল একটা বাহিনী তো থাকবেই। জেলার সদর থেকে আসবেন ডি. এম, এ. ডি. এম অর্থাৎ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা।

খবরটা দিয়ে মহেশ্বর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে পর পর এলেন এ অঞ্চলের বিখ্যাত জননেতা রাজপুত অযোধ্যানাথ সিং এবং তাঁর বিরোধী দুই পলিটিক্যাল পার্টির লিডার কমলাপতি দুবে আর রাসবিহারী দাস।

প্রথমে এসেছিলেন অযোধ্যানাথ। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে লোকটার বিশাল চেহারা দেখার মতো। একসময় কুস্তিগীর ছিলেন। একজোড়া কাঁচাপাকা জমকালো গোঁফ তাঁর প্রকাণ্ড চৌকো মুখটাকে ভীতিকর করে তুলেছে। ভারাক্রান্ত সুরে তিনি রামধারীদের, বিশেষ করে বিমলাকে একটানা বহুক্ষণ সান্ত্বনা এবং অপার সহানুভূতির কথা শুনিয়ে বললেন, 'বেটি, এই দুঃখের দিনে আমি আর আমার পার্টি সবসময় তোমাদের পাশে থাকব।' তিনি আরো জানালেন, 'পরশু রাজেশ বেটার অন্তিম সমস্কারের সময় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি খোদ উপস্থিত থাকবেন।' ত্রিলোকশরণ অযোধ্যানাথদের রাজনৈতিক দলের একজন বরিষ্ঠ নেতা এবং মন্ত্রী।

সামান্য এক ল্যান্স নায়েকের মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্য ত্রিলোকশরণের মতো বিপুল ক্ষমতার অধিকারী একজন মন্ত্রী ধুলোয়-ভরা, দুর্গন্ধওলা, অতি তুচ্ছ এই নানকিপুরা শহরে ছুটে আসবেন, এমন একটা চমকপ্রদ খবরও বিমলাকে নাড়া দিতে পারে না। আসলে তার স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো বিমলা বসে থাকে।

অযোধ্যানাথ চলে যাওয়ার পর এলেন কমলাপতি দুবে। ষাটের কাছাকাছি বয়স। প্রচুর পরিমাণে ঘি-মাখন খাওয়া, মাঝারি হাইটের গোলগাল চেহারা। গায়ের চামড়া থেকে এই বয়সেও জেল্লা ঠিকরে বেরুচ্ছে, মাথায় কদমছাঁট চুল কিন্তু মোটা জাঁকালো একটা টিকি রয়েছে, যার ডগায় একটি পরিপাটি গিঁট। চোখে গোল চশমা।

অযোধ্যানাথের মতোই রামধারী এবং লছমীকে প্রথমে সমবেদনা জানিয়ে বিমলার দু'টো হাত ধরে কমলাপতি বললেন, 'বেটি, তোমার কষ্টে আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তুমি যা হারিয়েছ তা কোনোদিনই ফিরে পাবে না। লেকিন এত ভেঙে পড়লে চলবে না। মনে সাহস আনো। সামনে তোমার বিরাট দায়িত্ব। ছোট একটা বেটা আছে। তাকে মানুষ করতে হবে। বুড়া শ্বশুর আর সাস আছে, তাদের দেখভাল করতে হবে। মনে রাখবে, তুমি একলা নও। তোমার কষ্টের হিস্যাদার আমি আর আমার পার্টি। বেটি চিন্তা কোরো না। তুমি আমাদের বাড়ি চেনো। যখন যা দরকার হবে খবর দিও। আমি চলে আসব। মনে রেখো, আমি তোমার পিতা-সমান।'

লোকটার গলার স্বর মিহি, মেয়েলি ধরনের। কথা বলতে বলতে চোখের জল ঝরতে লাগল তাঁর। নানকিপুরা টাউন এবং আশেপাশের বিশ তিরিশটা গাঁয়ের মানুষজন জানে রাজনৈতিক বক্তৃতার সময় মঞ্চে উঠে মুহূর্তে চোখের জল টেনে বার করতে পারেন কমলাপতি। অলৌকিক অভিনয়ের ক্ষমতা তাঁর। নৌটঙ্কীর দলে নাম লেখালে অনেক নাম-করা অভিনেতার নাক তিনি কেটে দিতে পারতেন।

এত চোখের জল ফেলেও বিমলার সাড়া পাওয়া গেল না। স্বামীর মৃত্যুশোক কি এত সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়?

কমলাপতির পর এলেন আরেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা রাসবিহারী দাস। তিনি লালদাসিয়া কায়াথ। বয়স চল্লিশের নিচে। মেদহীন, ধারালো চেহারা। গালে তিন-চার দিনের না কামানো দাড়ি। পরনে আধময়লা পাজামা, পায়ে মোটা চামড়ার চপ্পল।

রাসবিহারীদের পার্টি এ অঞ্চলে নতুন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও সেভাবে সাড়া জাগাতে না পারলেও সবাই মনে করে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত সৎ এবং তেজী। অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপস করেন না। মানুষের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সারাক্ষণ উন্মুখ হয়ে থাকেন। লোকের ধারণা, রাসবিহারীর জন্য ওঁদের পার্টির প্রভাব এ অঞ্চলে দু-চার বছরের ভেতরে ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে।

অযোধ্যানাথ এবং কমলাপতি যা করেছেন, রাসবিহারীও তাই করলেন। রামধারী আর লছমীকে সহানুভূতি জানিয়ে বিমলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বহেনজি, আমি রোজ এসে আপনাদের খোঁজ নিয়ে যাব। আমাকে আপনার বড় ভাই মনে করবেন।' তাঁর কণ্ঠস্বরে গভীর আন্তরিকতা এবং অপার সমবেদনা।

রাজনৈতিক নেতারা চলে গেলেও প্রতিবেশীদের বেশির ভাগই রাতটা বিমলাদের ঘিরে বসে কাটিয়ে দিল। এই দুঃসময়ে তিনটি শোকাভিভূত মানুষকে ফেলে কি যাওয়া যায়?

মাঝখানের একটা দিন অদ্ভুত আচ্ছন্নতার মধ্যে পেরিয়ে গেল। টিভিতে রাজেশের মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন সমানে বুক চাপড়ে কেঁদেছিল রামধারী, মাটিতে আছড়ে পড়ে লছমীও আছাড়ি পিছাড়ি খেতে খেতে কেঁদেছে। কাল রামধারী সর্বক্ষণ ঘরের কোণে দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছে। লছমী মাঝে মাঝে ডুকরে উঠেছে। আর বিমলার চোখ বেয়ে অবিরত জল ঝরেছে।

রামধারীরা কিছুই খাবে না, পড়শিরা ভাত ফুটিয়ে জোর করে ওদের সামান্য দু চার দানা খাইয়েছে।

বিমলার সিঁথিতে এখনও সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। পুরোহিত জানিয়েছে, রাজেশের নশ্বর দেহ চিতাভস্মে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর মর্মান্তিক ব্যাপারটা অর্থাৎ সিঁদুর মোছা এবং হাতের চুড়ি ভাঙার কাজটা করতে হবে।

সেদিন নানকিপুরা থানার অফিসার মহেশ্বরজি যা বলে গিয়েছিলেন তাই হল। সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে খানিকটা হেলেছে সেই সময় গোটা শহরটাকে তোলপাড় করে রাজেশের মৃতদেহ এসে গেল।

প্রথমে আটজন শববাহক জওয়ানের কাঁধে একটা ঢাকনি-খোলা কফিনে রয়েছে রাজেশের নিষ্প্রাণ শরীর। শবাধারটা ফুলে ফুলে ঢাকা, শুধু তার মুখটাই দেখা যাচ্ছে।

এদের ঠিক পেছনে সেনাবাহিনীর ব্যান্ড। বাজনদারেরা নানকিপুরার বাতাসে বিষাদের সুর ছড়িয়ে ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে। তারপর তিরিশ জন জওয়ানের সুশৃঙ্খল দু'টো লাইন, নিঃশব্দে একতালে তারা পা ফেলছে। তাদের হাতে রাইফেল। জওয়ানদের পর একদল পুলিশ। তাদের পেছনে নানা ধরনের গাড়ির বিরাট কনভয়—মিলিটারি ট্রাক, পুলিশের জিপ ছাড়াও একটা সাদা ধবধবে দামি গাড়িতে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি, তাঁর পাশে অযোধ্যানাথ। অযোধ্যানাথ কথা রেখেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণকে নানকিপুরায় এনে ছেড়েছেন। তাঁর বিরোধী দলের কমলাপতি দুবেও কম যান না। তাঁদের দলের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় সরকারে নেই কিন্তু রাজ্য সরকারে আছে। তিনি পাটনা থেকে তাঁদের মন্ত্রী বাঁকেলাল পাসোয়ানকে ফোন করে আনিয়েছেন। একটা মেরুন রঙের ঝকঝকে অ্যাম্বাসাডরের ব্যাক-সিটে তাঁরা বসে আছেন।

তবে এখানকার তিন নম্বর রাজনৈতিক দলের রাসবিহারী দাস অযোধ্যানাথ বা কমলাপতির তুলনায় আজ কিছুটা ম্রিয়মাণ। কেননা কেন্দ্রে বা রাজ্যে তাঁদের কোনো মন্ত্রী নেই। পার্টিও ছোট। কিন্তু এমন শোকাবহ ঘটনায় অন্য রাজনৈতিক দলগুলো নানকিপুরার রাস্তা গাড়িতে

গাড়িতে ছয়লাপ করে সাড়ম্বরে হাজির হবে আর তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন, তা তো হতে পারে না। তাই একটা রংচটা, পুরনো গাড়ি ভাড়া করে রাসবিহারী কয়েকজন দলীয় কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। এছাড়া আছেন ডি. এম, এ. ডি. এম, এস. পি এবং অন্য বড় বড় অফিসারেরা।

নানকিপুরা টাউনের ইতিহাসে কেন্দ্র এবং রাজ্যের দু দু'জন মন্ত্রী, এত সব ওজনদার রাজনৈতিক নেতা, এত জওয়ান, আর্মির বিরাট অফিসার, পুলিশ বাহিনী, প্রশাসনের জবরদস্ত কর্তারা একসঙ্গে এখানে আসবেন, কে ভাবতে পেরেছিল! নানকিপুরার ঢিলেঢালা, ঢিমে তালের জীবনযাত্রায় এমন ঘটনা আগে আর কখনও ঘটেনি। গোটা শহর তো বটেই, চারপাশের বিশ পঁচিশটা গাঁয়ের তাবৎ মানুষ একেবারে ভেঙে পড়েছে। মন্ত্রীদের গাড়ি, শ্রেণীবদ্ধ জওয়ান এবং পুলিশবাহিনী ইত্যাদি থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তারা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

একসময় শবাধারে শায়িত রাজেশ শেষ বারের মতো তাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল।

রামধারী, লছমী এবং বিমলা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। পড়শিরা তাদের ঘিরে রেখেছে।

শবাধার বাড়ির চবুতরে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে লছমী রাজেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন উন্মত্তের মতো কেঁদে উঠল যেন তার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে বেরিয়ে আসবে। টিভিতে ছেলের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর যা করেছিল হুবহু সেইভাবেই বুক চাপড়াতে লাগল। আর বিমলা মুখে আঁচল গুঁজে নিঃশব্দে কেঁদে চলল।

কর্নেল গ্রেওয়াল অন্তিম সংস্কারের জন্য মৃতদেহ নিয়ে এসেছিলেন। সাড়ে ছ ফিটের ওপর হাইট, বিশাল এই ফৌজি অফিসারের চোখ বিমলাদের দেখতে দেখতে ভিজে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। ওদের সঙ্গে রাজেশের সম্পর্কটা কী, প্রতিবেশীদের কাছে জেনে নিয়ে তিনজনকে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'শান্ত হো যাইয়ে, শান্ত হো যাইয়ে—' আরো জানালেন, মৃত ল্যান্স নায়েকের যাবতীয় প্রাপ্য এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কর্নেল সমবেদনা জানিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ানোর পর এগিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি। সত্তরের ওপর বয়স, চুল ধবধবে। পরনে দুধ-সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। তিনি লছমীর দু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কাঁদবেন না বহেনজি, কাঁদবেন না।' রামধারীকেও একই কথা বলে বিমলার কাছে এলেন। তাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আর্দ্র গলায় জানালেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজেশ আর তোমাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে অনেক কিছু ভেবে রেখেছে। কয়েকদিন পর নানকিপুরায় এসে বেটি তোমাকে সব জানাব। তোমার অনেক দায়িত্ব। পুরা সম্‌সার তোমাকে দেখতে হবে। ঈশ্বর তোমাদের শক্তি দিন।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পর স্টেট ক্যাবিনেটের সদস্য বাঁকেলাল পাসোয়ানও বিমলাকে জানিয়ে দিলেন, রাজ্য সরকারও তাদের জন্য অনেক কিছু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে তিনি এসে বলবেন।

রাসবিহারী দাস অবশ্য কোনো প্রতিশ্রুতি দিলেন না। প্রথম দিনের মতো শুধু বললেন, বিপদে আপদে সবসময় তিনি বিমলাদের সঙ্গে থাকবেন।

ঘণ্টাখানেক পর আবার শবাধার জওয়ানদের কাঁধে উঠল। এবার গন্তব্য শ্মশান।

মৃত সন্তানকে কিছুতেই যেতে দেবে না লছমী। প্রতিবেশীরা অনেক কষ্টে তাকে ধরে রাখল। বাবুয়াকেও যেতে দেওয়া হল না। রাজেশের শেষযাত্রায় এ বাড়ি থেকে সঙ্গী হবে শুধু রামধারী আর বিমলা।

ত্রিলোকশরণজি এবং বাঁকেলালজি, দুই মন্ত্রীই বিমলা এবং রামধারীকে বললেন, 'আমাদের গাড়িতে উঠে শ্মশানে চলুন।'

রামধারী যেন শুনতেই পেল না। ছেলের মৃত্যুতে সে এতটাই বিমর্ষ যে কে কী বলল সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। আচ্ছন্নের মতো শববাহক জওয়ানদের পিছু পিছু হেঁটে চলল।

সীমাহীন শোকের মধ্যেও বিমলার কিন্তু একটু চমক লাগল। রাজ্য এবং কেন্দ্রের দুই বিপুল ক্ষমতাশালী মন্ত্রী তার মতো এক সাধারণ ল্যান্স নায়েকের স্ত্রীকে গাড়িতে করে শ্মশানে নিয়ে যেতে চাইছেন, এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এত বড় সৌভাগ্যও বিমলাকে নাড়া দিতে পারল না। স্বামীর অন্তিম যাত্রায় মন্ত্রীর গাড়ির পুরু গদিওলা আরামদায়ক সিটে বসে তাঁর সঙ্গী হবে, বিমলার কাছে এটা সম্পূর্ণ অভাবনীয়। তা ছাড়া, দুই মন্ত্রীই নিয়ে যেতে চাইছেন। একটা মানুষের পক্ষে দু'টো গাড়িতে চড়ে যাওয়া যায় না।

বিমলার দু চোখ বেয়ে সমানে জল ঝরছিল। হাতজোড় করে সে বলল, 'ক্ষমা করবেন। আমি হেঁটেই যাব।'

এর মধ্যে মন্ত্রীরা জেনে নিয়েছেন, শ্মশান অন্তত দু মাইল দূরে। বললেন, 'এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে কষ্ট হবে।'

বিমলা বলল, 'হোক।'

বাঁকেলালজি বললেন, 'গাড়িতে উঠতে বলে আমারই ভুল হয়েছিল। স্বামীর এই শেষ সময়ে পত্নী আরাম করে যাবে, তা হয় না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে হেঁটে শ্মশানে যাব।' বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন।

এদিকে মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন ত্রিলোকশরণজি। তিন দফায় বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। যৌবনে সাধারণ পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হিসেবে মোটা চামড়ার চপ্পল পায়ে দিয়ে উত্তর ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে উদয়াস্ত ঘুরে বেড়াতেন, কিষানদের নিয়ে সংগঠন করতেন। সেসব দিনের ইতিহাস স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। নির্বাচনে জিতে প্রথম দু'বার এম. পি হয়ে দশ বছর কাটিয়েছেন, তারপর তিন বার হয়েছেন মন্ত্রী। এম. পি হওয়ার পর থেকেই হাঁটাহাঁটির অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে। মন্ত্রী হওয়ার পর তো কথাই নেই। মাটির সঙ্গে তাঁর পায়ের যোগাযোগ আজকাল কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু বাঁকেলাল পাসোয়ান নামে রাজ্যের মন্ত্রীটি যদি বিমলা আর রামধারীর সঙ্গে হাঁটতে থাকেন আর তিনি গাড়িতে চড়ে যান, সেটা ভীষণ খারাপ দেখাবে। এই অঞ্চলের মানুষজনের ওপর তার প্রতিক্রিয়াটা খুব সুখকর হবে না। ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদবের কারগিল রণাঙ্গনে মৃত্যু এবং তার পরিবার, বিশেষ করে বিমলাকে দেখার পর থেকে তাঁর মাথায় সুদূরপ্রসারী একটা পরিকল্পনা এসে গেছে। কেননা কয়েক মাসের মধ্যে নতুন আরেকটা নির্বাচন আসছে। বিমলাকে সামনে রেখে তিনি এই এলাকায় কাজ গুছিয়ে নিতে চান। বাঁকেলাল খুব সম্ভব কোনো একটা অভিসন্ধি নিয়ে বিমলার সঙ্গে হাঁটতে চাইছেন কিন্তু সেটা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। সুতরাং ত্রিলোকশরণকে গাড়ি থেকে নামতেই হল।

দুই মন্ত্রী নানকিপুরার ভাঙাচোরা রাস্তায় ছ ইঞ্চি ধুলোয় পা ডুবিয়ে হেঁটে হেঁটে রাজেশকে শ্মশানে পৌঁছে দেবেন, আর অন্যেরা গাড়িতে চড়ে যাবে, তা কখনও হয়? অযোধ্যানাথ, রাসবিহারী, কর্নেল গ্রেওয়াল থেকে শুরু করে ডি. এম, এ. ডি. এম—সবাই টপাটপ গাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নামেন। তাঁদের পেছন পেছন চলতে থাকে বিপুল জনতা। এমন অন্তিম যাত্রা নানকিপুরার মানুষ কেউ কখনও দেখেনি।

শ্মশানটা একটা মজা নদীর পাড়ে। সেটার একধারে বিশাল ঝুরিওলা বটগাছের তলায় ডোমের ঘর। আরেক পাশে খোলা আকাশের নিচে অনেকটা জায়গা জুড়ে মড়া পোড়ানোর নানা চিহ্ন ছড়িয়ে আছে—কাঠকয়লা, আধপোড়া কাঠের টুকরো, কিছু হাড়, ভাঙা মাটির কলসি। বটগাছের ডালে অগুনতি শকুন বসে আছে।

পুরনো চিতাগুলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে পরিষ্কার জায়গায় রাজেশের শবাধার নামানো হল। শ্মশানের ডোমকে আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল। সে নতুন চিতা তৈরি করে সেখানে অপেক্ষা করছে। রাজেশের মুখাগ্নি এবং তার দেহ সংকারের পর শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মের জন্য তাদের টোলার প্রতিবেশীরা একজন পুরোহিতকে সঙ্গে করে এনেছিল।

প্রথমে জওয়ানরা, পরে পুলিশবাহিনী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে রাইফেল ছুঁড়ে রাজেশকে শেষ অভিবাদন জানায়। তারপর পুরোহিত রামধারী এবং বিমলার কাছে এসে বলে, এবার মুখাগ্নি করতে হবে।

রামধারী দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে, 'হাম নেহী সাকেগা। আমি পারব না—পারব না।'

মুখাগ্নির প্রথম অধিকার পুত্রের কিন্তু তিন বছরের বাচ্চা বাবুয়াকে শ্মশানে আনা হয়নি। বিমলা নিজের মনকে শক্ত করে বলে, 'চলুন, আমিই করব।'

পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রপাঠের মধ্যে মুখাগ্নি হল। তারপর চিতায় আগুন দেওয়া হয়।

ঘণ্টা চারেক পর দাহ যখন শেষ হল, বিকেল আর নেই। রাত নেমে গেছে।

রাজেশের দেহ চিতাভস্মে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর পুরোহিত নদী থেকে রামধারী আর বিমলাকে স্নান করিয়ে আনল।

শ্মশানে আর কোনো কাজ নেই। এবার বাড়ি ফেরার পালা। দুই মন্ত্রী এবং কর্নেল গ্রেওয়াল, কেউ রামধারী আর বিমলাকে দু'মাইল হেঁটে যেতে দিলেন না। মন্ত্রীদের ইচ্ছা ছিল তাঁরাই গাড়িতে করে পৌঁছে দেবেন কিন্তু কর্নেল গ্রেওয়াল বিনীতভাবে জানালেন, যেহেতু রাজেশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন, তাঁদেরই উচিত ফৌজের গাড়িতেই বিমলাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। মন্ত্রীরা আপত্তি করলেন না।

ক'টা দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে সরকার রাজেশের যাবতীয় প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া বিমলাদের জন্য মোটা টাকা পেনসনের ব্যবস্থা করেছে।

এদিকে একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে একেবারে জবুথবু হয়ে গেছে রামধারী আর লছমী। দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। অনেকদিন ধরেই শরীর ভালো যাচ্ছিল না। ছেলের মৃত্যুশোক তাদের ভেঙেচুরে ফেলেছে যেন । রামধারী ঘর থেকে বেরোয় না, কারো সঙ্গে সহজে কথা বলতে চায় না, শূন্য চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে। লছমী দিনরাত বিছানায় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে গোঙানির মতো আওয়াজ করে কেঁদে ওঠে।

ফলে নিজের দিকে তাকানোর সময় নেই বিমলার। মৃত স্বামীর জন্য নির্জনে বসে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে তেমন ফুরসতটুকুও সে পায় না। বাবুয়া, বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি এবং সংসারের পেছনে হরদম ছুটতে ছুটতে তার দিন কেটে যায়।

পাড়াপড়শিরা খুবই সহৃদয়। সারাক্ষণ তারা বিমলাদের আগলে আগলে রাখে। তা ছাড়া অযোধ্যানাথ রাসবিহারী এবং বাঁকেলালের পার্টির স্থানীয় নেতা কমলাপতি কেউ না কেউ রোজ একবার করে তাঁদের খোঁজখবর নিয়ে যান।

রাজেশের শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে অযোধ্যানাথ এসে হাজির। বিমলাকে বললেন, 'বেটি, তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

বিমলা উৎসুক চোখে তাকায়, 'বলুন—'

অযোধ্যানাথ বলেন, 'আসছে এতোয়ারে নানকিপুরা কলেজের মাঠে আমাদের পার্টি একটা মিটিং ডেকেছে। ত্রিলোকশরণজি সভাপতি হবেন। স্রিফ তোমার জন্যে তিনি দিল্লি থেকে আসছেন। তোমাকে সভায় যেতে হবে। আমি এসে নিয়ে যাব।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে বিমলা। তার মতো সামান্য একটি মেয়েব জন্য ত্রিলোকশরণ হাজারটা জরুরি কাজ ফেলে ছুটে আসবেন, শুনে বিশ্বাস হতে চায না। সে বলে, 'স্রিফ আমার জন্যে মন্ত্রীজি এতদূর আসবেন কেন?'

একটু শুধরে নিয়ে অযোধ্যানাথ বলেন, 'তোমার--মতলব রাজেশের জন্যে।'

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হয় ন। বিমলা তাকিয়েই থাকে।

অযোধ্যানাথ বলেন, 'বুঝতে পারলে না? রাজেশকে ত্রিলোকশরণজি সেদিন সম্মান জানাবেন। ধরমপত্নী হিসেবে তোমার তাই সভায় থাকাটা খুবই জুরুরি।'

'আপনি যখন বলছেন, থাকব।'

আজ হল সোমবার। শনিবার পর্যন্ত অযোধ্যানাথদের পার্টির ছেলেরা জিপে করে মুখে মাইক লাগিয়ে আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তারস্বরে ঘোষণা করে যায়, 'শহিদ রাজেশ যাদব দেশের জন্যে জীবনদান করেছেন। তাঁর আত্মাকে সম্মান জানাতে রবিবার নানকিপুরা কলেজের মাঠে বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি স্বয়ং উপস্থিত থেকে এই সম্মান জানাবেন।'

মাইকের অবিরাম আওয়াজ বিমলার কানেও ভেসে আসে। ত্রিলোকশরণ এবং অযোধ্যানাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভবে যায়।

পড়শিদের মধ্যেও তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজিত মুখে তারা এসে বিমলাকে মাইকে ঘোষণার কথা জানিয়ে যায়। বলে, রাজেশের জন্য তাদেরও মর্যাদা বেড়ে গেছে। সে নানকিপুরা শহরের গৌরব।

রবিবারের জনসভায় কাতারে কাতারে মানুষ চারপাশ থেকে এসে জড়ো হয়। সবার চোখমুখে প্রবল উদ্দীপনা। তাদের শহরের একটি ছেলের জন্য একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বার বার এখানে আসবেন, কেউ কি ভাবতে পেরেছিল!

মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি গভীর আবেগের সুরে প্রায় এক ঘণ্টা ভাষণ দিলেন। বিষয়বস্তু কারগিলের যুদ্ধ এবং শহিদ রাজেশ যাদব। বললেন, রাজেশ সারা দেশের গর্ব। নিজের প্রাণ দিয়ে সে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছে। তার মৃত্যু দেশের মানুষকে, বিশেষ করে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। এমন মহান মৃত্যু যে কোনো দেশপ্রেমিকের কাম্য।

বক্তৃতার শেষ পর্বে ত্রিলোকশরণজি বললেন, 'ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদবের মৃত্যুতে আমরা একই সঙ্গে গর্বিত এবং ব্যথিত। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিবার--তার মা, বাবা, তিন বছরের একমাত্র ছেলে এবং স্ত্রী। যে ক্ষতি তাদের হয়েছে তা পূরণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই এই শোক সহ্য করার শক্তি ওঁদের দেবেন।' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'এ ব্যাপারে সবশেষে এটুকুই বলতে চাই, আমার বেটি-সমান বিমলার পাশে আমি আর আমার পার্টি চিরকাল থাকব। আর আমাদের তরফ থেকে বিমলাকে দু'লাখ টাকা দিতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে সভার চারিদিক থেকে একটানা কয়েক মিনিট হাততালি চলতে থাকে। জনতা এই অর্থদানের ঘোষণাটিকে গভীর উল্লাসে স্বাগত জানায়।

দু হাত তুলে বিশাল জনসভাকে শান্ত করতে করতে ত্রিলোকশরণ বিনীতভাবে বলেন, 'কেউ যেন মনে না করেন, রাজেশ যাদবের অমূল্য প্রাণের দাম মাত্র দু লাখ টাকা। ভারতবর্ষের

সমস্ত অর্থ আর সম্পদ দিলেও রাজেশের প্রতি আমাদের ঋণ শোধ হবে না। এই প্রাণের কোনো দাম হয় না। আমরা সামান্য কিছু দিয়ে নিজেরাই কৃতার্থ বোধ করছি।'

ত্রিলোকশরণের পেছনে পাথরের মতো ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দেহরক্ষী সশস্ত্র কমাণ্ডোরা। মঞ্চে অন্য যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন অযোধ্যানাথ এবং ত্রিলোকশরণের পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট ভুবনেশ্বর পাণ্ডে এবং বিমলা।

ত্রিলোকশরণ ভুবনেশ্বরকে কিছু ইঙ্গিত করতে তিনি পোর্ট ফোলিও ব্যাগ থেকে একটা লম্বাটে, সুদৃশ্য কারুকাজ-করা জয়পুরী কাঠের বাক্স—এক ফুট লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া—বার করে তাঁর হাতে দিলেন।

ত্রিলোকশরণ এবার বিমলার দিকে ফিরে বললেন, 'বেটি, আমার কাছে এসে দাঁড়াও।'

ঘোরের মধ্যে উঠে এল বিমলা। তার দিকে কাঠের বাক্সটা বাড়িয়ে দিয়ে ত্রিলোকশরণ বললেন, 'নাও। এর ভেতর চেক রয়েছে।'

খবরের কাগজের রিপোর্টার ফোটোগ্রাফার এবং টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানরা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। সাংবাদিকরা সভার খুঁটিনাটি বিবরণ টুকে নিচ্ছে আর ক্যামেরাম্যানরা অনবরত ছবি তুলে চলেছে।

ত্রিলোকশরণের হাত থেকে বাক্সটা নিতে নিতে বিমলা টের পাচ্ছিল, প্রচণ্ড আবেগে তার সমস্ত শরীর থরথর কাঁপছে।

ত্রিলোকশরণ, অযোধ্যানাথ, তাঁদের পার্টি এবং রাজেশ যাদবের নামে জয়ধ্বনিতে জনসভা গমগম করতে থাকে।

'ত্রিলোকশরণজি—'

'জিন্দাবাদ।'

'রাজেশ যাদব—'

'জিন্দাবাদ।'

ফের হাত তুলে জনতাকে শান্ত করেন ত্রিলোকশরণ। তারপর সস্নেহ, কোমল স্বরে বিমলাকে বলেন, 'বেটি, মাইকের সামনে এসে জনতাকে কিছু বল।'

বিহ্বলের মতো বিমলা বলে, 'আমি বলব!'

'হাঁ। সবাই তোমার কথা শুনতে চায়।'

মাইকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকায় ত্রিলোকশরণের কথা শ্রোতারা শুনতে পাচ্ছিল। তারা চেঁচিয়ে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, আমরা বিমলা বহীনের কথা শুনতে চাই।'

আশ্বাসের ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুলে সভার উদ্দেশে নাড়তে থাকেন ত্রিলোকশরণ। অর্থাৎ তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বিমলাকে বলেন, 'ওরা কী চাইছে, শুনলে তো?'

বিমলার গলা শুকিয়ে এসেছিল। সে বলে, 'না না, আমি পারব না।'

'খুব পারবে।'

'লেকেন এরকম মিটিংয়ে কখনও কিছু বলিনি। কী বলব আমি!'

বিমলার কাঁধে একটা হাত রেখে ত্রিলোকশরণ তাকে সাহস দেওয়ার সুরে বলেন, 'কোনো ভয় নেই। রাজেশের কথা বল—' মাইকের মুখোমুখি তিনি বিমলাকে দাঁড় করিয়ে দেন।

সামনে অসংখ্য মানুষ উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে আছে। প্রথমটা সমস্ত কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। তারপর প্রায় মরিয়া হয়েই শুরু করে বিমলা। তার নিজের তো বটেই, বুড়ো মা বাবা এবং একমাত্র ছেলের জীবন জুড়ে ছিল রাজেশ। ফি বছর জুলাই মাসে বিবাহ বার্ষিকীর আগে আগে

সেনাশিবির থেকে চলে আসত সে। দিন পনেরোর বেশি ছুটি পেত না। কিন্তু এই ক'টা দিন সবাইকে মাতিয়ে রাখত। এবারও তার আসার কথা ছিল, সেজন্য অন্য সব বছরের মতো বিমলারা অপেক্ষা করছিল কিন্তু জীবন্ত মানুষটা এল না।

বলতে বলতে গলা বুজে এল বিমলার। বুকের অতল স্তর থেকে উত্তাল কান্না স্রোতের মতো উঠে আসছে। কিছুতেই সেটা ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। দু হাতে মুখ ঢাকল সে।

ত্রিলোকশরণ বিমলাকে মাইকের সামনে এগিয়ে দিয়ে মঞ্চের একটা চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। শশব্যস্তে উঠে এসে তার কাঁধটা বেড় দিয়ে ধরে বলেন, 'রো মাত্ বেটি- –কেঁদো না। এত মানুষ তোমার কথা শোনার জন্য বসে আছে। নাও, ফির শুরু কর।'

নিজেকে ধীরে ধীরে সামলে নেয় বিমলা। মুখ থেকে হাত সরিয়ে আবার বলতে থাকে। বাজেশ নেই, লেকিন সে সবসময় তাদের মধ্যেই আছে। তার জন্যই হাজার হাজার মানুষকে আমাদের কাছে পেয়েছি। পেয়েছি অযোধ্যানাথজি আর ত্রিলোকশরণজির মতো মহান নেতাকে। আমার জন্য এত মানুষের এত মমতা ছিল আগে জানতাম না। আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সকলকে আমার প্রণাম।

বিমলার কথাগুলো বিশাল জনতাকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে তারা। তারপর শোকাতুরা একটি বিধবার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে ধীরে ধীরে হাততালি দিতে থাকে।

মাইকের কাছ থেকে সরে নিজের চেয়ারটিতে গিয়ে বসে বিমলা। অযোধ্যানাথ উঠে এসে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তাড়াহুড়ো নেই। মানুষজন আস্তে আস্তে মাঠ ছেড়ে চলে যায়।

বিমলা ত্রিলোকশরণকে বলেন, 'আপনি অনুমতি করলে আমি বাড়ি যাব। বুড়ো শ্বশুর, সাস আর বাচ্চাকে পড়শিদের কাছে রেখে এসেছি।'

ত্রিলোকশরণ বললেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই যাবে। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। অযোধ্যানাথজি তোমাকে পৌঁছে দেবেন।'

কিছুক্ষণ পর একটা অ্যাম্বাসাডরের পেছনের সিটে অযোধ্যানাথের পাশাপাশি বসে বাড়ি ফিরছিল বিমলা।

পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু গাছপালার ওধারে সূর্য খানিক আগে ডুবে গেছে। নানকিপুরা টাউনের ওপর ঝাপসা সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। রাস্তায় রাস্তায় আলকাতরা মাখানো কাঠের গুঁড়ির পোস্টগুলোতে মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে আলো জ্বলে উঠেছে।

জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে বিমলা। রাজেশকে জড়িয়ে তার জীবনের টুকরো টুকরো নানা ঘটনা, নানা দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠছিল।

মনে পড়ে, বিয়ের আগে রামধারী এবং এক বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখতে গিয়েছিল রাজেশ। এবং দেখামাত্র পরস্পরকে তাদের ভালো লেগে যায়। কিন্তু সে ফৌজি জওয়ান, জীবনটা পদ্মপাতায় জলের মতো, এই আছে এই নেই। লড়াই বাধলে চলে যেতে হবে রণাঙ্গনে। সেখান থেকে বেঁচে ফিরবে কিনা সে সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। জীবন যার এত অনিশ্চিত তার হাতে মেয়েকে তুলে দিতে ইচ্ছা ছিল না বিমলার বাবুজি ফেকুনাথ যাদবের। অনিচ্ছার কারণটা জানতে পেরে পরে একা গিয়ে রাজেশ তাকে বুঝিয়েছে, সেই একাত্তর সালের পর যুদ্ধ হয়নি। বড় রকমের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ভারতবর্ষের নেই। তা ছাড়া যুদ্ধ ছাড়া কি লোক মরে না? এই যে কত যুবক গাড়ি চাপা পড়ে কিংবা ট্রেনে কাটা পড়ে বা অসুখ

বিসুখে মারা যায়। জন্মালে মানুষকে কোনো না কোনোভাবে দু'দিন আগে হোক বা পরে হোক মরতেই হবে। তাই বলে তাদের বিয়ে হয় না?

শেষ পর্যন্ত, ফেকুনাথ যাদব বিয়েতে রাজি হয়েছিল। রাজেশ ছিল খুবই আমুদে, হাসিখুশি মানুষ। বিয়ের পর ক'টা বছর, যদিও তাকে সবসময় কাছে পেত না বিমলা, স্বপ্নের মতো যেন কেটে গিয়েছিল।

হঠাৎ পাশ থেকে অযোধ্যানাথের ডাক কানে এল, 'বেটি- –'

স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে আসে বিমলা। চমকে মুখ ফিরিয়ে অযোধ্যানাথের দিকে তাকায়, 'কিছু বলবেন?'

অযোধ্যানাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, 'হাঁ। তোমার ওপর মানুষের কত সিমপ্যাথি দেখলে?'

'হাঁ।'

'সিমপ্যাথির লহরটা ধরে রাখতে হবে।'

অযোধ্যানাথের এই কথাটা বুঝে উঠতে পারল না বিমলা। সহানুভূতির যে ঢেউ উঠেছে, সেটা ধরে রাখার মানে কি? বিমলা বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

অযোধ্যানাথ এ সম্পর্কে আর কিছু না বলে জিগ্যেস করেন, 'শুনেছি, তুমি লেখাপড়া জানো। স্কুলে পড়েছ?'

বিমলা বলল, 'আমি একটা মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছি, কলেজেও ভর্তি হয়েছিলাম। বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়া বন্ধ হয়ে গেল।'

দু চোখে অপার বিস্ময় ফুটে ওঠে অযোধ্যানাথের। বলেন, 'তুমি ম্যাট্রিক পাস!'

'হাঁ।'

'মিশনারিদের স্কুলে যখন পড়েছ, আংরেজি বলতে নিশ্চয়ই পার।' সাধারণ হিন্দি স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া অযোধ্যানাথের ইংরেজি সম্বন্ধে অসীম দুর্বলতা।

বিমলা সামান্য হেসে বলল, 'পারি। আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামেই তো পড়াশোনা করতে হয়েছে।'

অযোধ্যানাথের মনে হল, হঠাৎ একটা অমূল্য রত্ন তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। বিমলার প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর মন ভরে যায়। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর বলেন, 'তোমাকে নিয়ে ত্রিলোকশরণজি আর আমার একটা খুব বড় পরিকল্পনা আছে।'

'কিসের পরিকল্পনা?'

'আজ জানতে চেও না। আগে সব ব্যাপারটা পাকা হোক। তারপর তোমাকে বলব।'

একসময় বিমলা বাড়ি পৌঁছে যায়।

সেই যে অযোধ্যানাথরা নানকিপুরা কলেজের মাঠে মিটিং করেছিলেন তার দু'দিন পর সন্ধেবেলায় রাজ্যের মন্ত্রী বাঁকেলালজিদের পার্টির স্থানীয় নেতা কমলাপতিজি এসে হাজির। বিমলাকে তিনি বললেন, 'বেটি, আমি ক'দিন নানকিপুরায় ছিলাম না। জরুরি কাজে পাটনা গিয়েছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম লাস্ট এতোয়ারে তোমাকে নিয়ে অযোধ্যানাথজিরা বড় মিটিং করেছেন।'

বিমলা আস্তে মাথা নাড়ে, 'হাঁ।'

'দো লাখ রুপাইয়াও দিয়েছেন।'

'হাঁ।'

'বেটি, সামনের এতোয়ারে আমরা তোমাকে নিয়ে তার চাইতেও ভারী মিটিং করব। তোমাকে সেখানে যেতে হবে। তোমার পতিকে ওদের চেয়েও আমরা অনেক বেশি সম্মান দেব।'

ক'টা দিন কমলাপতিদের পার্টির যুবকেরা দশ-বারোটা জিপ নিয়ে নানকিপুরা টাউন তো বটেই, চারপাশের তিরিশ চল্লিশটা গ্রাম চষে ফেলে মাইকে মাইকে জানিয়ে দিল, আগামী রবিবার শহরের বিশাল গান্ধী ময়দানে মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদবকে সেখানে বিরাট সম্মান জানানো হবে। রাজেশের পত্নী শ্রীমতী বিমলা যাদব সভায় উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী বাঁকেলালজি। আপনারা দলে দলে যোগ দিন।

গান্ধী ময়দানটা আকারে নানকিপুরা কলেজের মাঠের প্রায় দ্বিগুণ। অযোধ্যানাথদের মিটিংয়ের মতো এখানকার জনসভাতেও মানুষ উপচে পড়ল। কমলাপতি এবং বাঁকেলাল ভাষণ দিলেন। বিমলাকেও আগের রবিবারের সভার মতো রাজেশ সম্পর্কে কিছু বলতে হল। হাততালিও কম হল না।

বাঁকেলালজি তাঁর দেড় ঘন্টার বক্তৃতায় দেশের জন্য রাজেশের আত্মত্যাগের বিবরণ দিয়ে বললেন, তার নাম জাতির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ভাষণের পর তাঁদের পার্টির তরফ থেকে বিমলাকে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হল। অর্থাৎ ত্রিলোকশরণরা যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে পঞ্চাশ হাজার বেশি।

অর্থদানের পর বাঁকেলালজি জানালেন, তাঁর পার্টি ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাতে মরণোত্তর 'পরমবীর চক্র'-এর সম্মানটি পায় সে জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা করবে। সব মিলিয়ে তাঁরা ত্রিলোকশরণজিদের ওপর অনেকটা টেক্কা দিয়ে গেলেন।

সেদিন বিমলাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন অযোধ্যানাথ। আজ সভার পর সে দায়িত্বটা নিয়েছেন কমলাপতি। গাড়িতে পাশাপাশি বসে যেতে যেতে তিনিও জানালেন, বিমলাকে নিয়ে তাঁদেরও একটা বড় আকারের পরিকল্পনা আছে।

দু দু'টো রাজনৈতিক দলের দুই জবরদস্ত নেতা তাকে নিয়ে একই রকম পরিকল্পনার কথা বলেছেন। কী উদ্দেশ্য ওঁদের? বিমলার মনে সংশয় দেখা দেয়। সে জিগ্যেস করে, 'আমাকে নিয়ে কী করতে চান আপনারা?'

মৃদু হেসে কমলাপতি বলেন, 'দু-চারটে দিন সবুর কর। তারপর নিজে এসে সব জানিয়ে যাব।'

বিমলা উত্তর দেয় না।

বাঁকেলালজিদের সভার দিনকয়েক পর হঠাৎ বিমলার কানে এল এ অঞ্চলের তিন নম্বর রাজনৈতিক দল, রাসবিহারী দাস যার নেতা, কুপন ছাপিয়ে রাজেশের নামে টাকা তুলছে। সে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক দলগুলোর কী যে মতলব সঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অযোধ্যানাথ আর কমলাপতির মতো এক রবিবার রাসবিহারীও বিমলাকে নিয়ে সভা করলেন। বললেন, তাঁদের দল ছোট, বড় পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর মতো তাঁদের টাকার জোর নেই। সাধারণ মানুষের কাছে রাজেশকে সম্মান জানানোর জন্য হাত পেতেছিলেন। জনগণ

তাঁদের ফেরায়নি। অকুণ্ঠভাবে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য করেছে। দেশবাসীর এই দান, মোট তেত্রিশ হাজার টাকা, বিমলাকে দিয়ে রাসবিহারীরা ধন্য হচ্ছেন।

এই সভার পর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সময় বিমলাকে সেই একই কথা বললেন রাসবিহারী। ওকে নিয়ে তাঁদেরও বিশাল পরিকল্পনা আছে এবং খুব শিগ্‌গিরই তা জানানো হবে।

দিন পনেরো পর অযোধ্যানাথ এসে বললেন, 'বেটি, তোমাকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম। আজ তোমাকে সেটা শোনাতে এসেছি।'

উদ্বিগ্ন মুখে বিমলা বলে, 'কী পরিকল্পনা?'

'আসছে চুনাওতে আমাদের পার্টি তোমাকে টিকিট দিচ্ছে। তোমাকে ভোটে লড়তে হবে।'

বিমলা চমকে ওঠে, 'আমি! পলিটিকস সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই তো নেই। লোকে আমাকে ভোট দেবে কেন?'

অযোধ্যানাথ বললেন, 'দেবে দেবে। রাজেশের জন্যে তোমার পক্ষে সিমপ্যাথির লহর উঠেছে। সেটা কাজে লাগাতে হবে।'

বিমলার মুখটা হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠে, 'ও, এই জন্যেই মিটিং করে আমাকে টাকা দিয়েছিলেন?'

বিব্রতভাবে অযোধ্যানাথ বললেন, 'ওভাবে বোলো না। রাজেশের আত্মাকে আমরা সম্মান জানিয়েছি। আমাদের পার্টি তোমার কাছে কিছু আশা তো করতেই পারে।'

'ক্ষমা করবেন। আমি রাজি নাই।'

অনেক অনুরোধ এবং অনুনয় করলেন অযোধ্যানাথ। কিন্তু বিমলাকে টলানো গেল না। মুখ কালো করে তিনি চলে গেলেন।

তারপর একে একে একই প্রস্তাব নিয়ে এলেন কমলাপতি এবং রাসবিহারী। তাঁদেরও ফিরিয়ে দিল বিমলা। তার স্বামীর জীবনদানের সুযোগটা সে কিছুতেই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিতে দেবে না।

ফেরিওয়ালা

আজ মাধাইপুরে 'গণপতি অপেরা পার্টি' 'রাবণবধ' পালা নামাবে। কাল নামিয়েছিল 'নল-দময়ন্তী'। দু'রাত গাওয়ার বায়না নিয়ে তারা এখানে এসেছে। অদ্যই শেষ রজনী।

মাধাইপুর এই এলাকার সবচেয়ে বড় গঞ্জ। পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে—দামিনী। গরম কালে আর শীতে শুকিয়ে, শীর্ণ হয়ে, সাপের খোলসের মতো পড়ে থাকে। তির তির করে যে স্রোত বয় তাতে হাঁটুও ডোবে না। কিন্তু জষ্টি মাসটি যেই শেষ হল, নামল অঝোরে বর্ষা, দামিনী কোনও অদৃশ্য খাপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। ফুলে ফেঁপে নদীর সে সময় অন্য চেহারা। তখন তার কী রোখ, দিবারাত্রি গজরানি। কী খাই, কী খাই করতে করতে তীব্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'ধারে। পাড় ভাঙে, গাছপালা ধানজমি গিলে খায়।

বর্ষার দামিনীর রোষ থেকে বাঁচানোর জন্য মাধাইপুর গঞ্জটা নদী থেকে খানিকটা দূরে বসানো হয়েছে। দামিনী থাবা বাড়ায় ঠিকই কিন্তু নাগাল পায় না।

এখানে ধানচালের মস্ত মস্ত আড়ত। তাছাড়া পাকা গাঁথনির দেওয়াল আর অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় সারি সারি দোকান—কোনওটা শাড়ি-ধুতির, কোনওটা রেডিমেড পোশাকের, কোনওটা লেপ তোশক বালিশের। রকমারি আরও অনেক স্থায়ী দোকানঘরও রয়েছে। লোহার কড়াই হাতা খুন্তির, মশলাপাতির, মনিহারি জিনিসের, কাঠের আর বেতের আসবাবের, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রবিবার রবিবার এখানে জাঁকিয়ে হাটও বসে। তাই একপাশে রয়েছে লাইন দিয়ে হাটের চালা। আশেপাশের বিশ-পঁচিশটা গাঁ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ এসে একেবারে হামড়ে পড়ে। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোর চেয়ে রবিবারে বিকিকিনি লাফিয়ে দশ বারো গুণ বেড়ে যায়।

এখন পৌষ মাসের মাঝামাঝি। মাঠ থেকে ফসল উঠে গেছে গেরস্থর ঘরে। সারা বছর খাটাখাটনির পর এক-দেড় মাস কাজকর্ম কম ; হাতে রয়েছে পয়সা। এখন ক'টা দিন আমোদের সময়। এবার ধানটা বেশিই ফলেছে। যা আশা করা গিয়েছিল ফলন হয়েছে তার দেড়া। চাষের সঙ্গে যাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বা স্বপ্ন জড়িয়ে থাকে তাদের প্রাণে এবছর একটু বাড়তি ফুর্তি জমেছে।

ফি সাল শীতের মরশুমে মাধাইপুরে দু'রাত যাত্রার আসর বসানো হয়। এই গঞ্জ এবং চারপাশের গাঁগুলো এখনও প্রায় মান্ধাতার বাপের আমলে পড়ে আছে। বেশির ভাগ মানুষজন যাত্রা ছাড়া অন্য কোনও আমোদের কথা ভাবে না। তার একটা বড় কারণ, ছ'মাস আগেও এই অঞ্চলে বিজলি বাতি আসেনি। এই নিয়ে বাসিন্দাদের ছিল প্রচুর ক্ষোভ। পনেরো কিলোমিটার দূরের মহকুমা শহর রাধানগরে গিয়ে বিডিও'র অফিসে কতবার যে আর্জি জানানো হয়েছে! দল বেঁধে স্থানীয় এম এল এ'র কাছে দরবারও করা হয়েছে। সবাই প্রতিশ্রুতির ঝুলি উপুড় করে দিয়েছেন কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোথায় বিদ্যুৎ?

তবে ভোট বড় মজার কারবার! আসছে বছর নির্বাচন। মানুষের মনে যে প্রচণ্ড উত্তাপ জমা হচ্ছে সেটা আঁচ করে তড়িঘড়ি কাঠের খুঁটি পুঁতে কোনওরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে রাধানগর থেকে ছ'মাস হল মাধাইপুর অবধি ইলেকট্রিসিটির লাইন বসানো হয়েছে।

বিজলি ছিল না। তাই টিভি আসেনি, সিনেমা-হলও করা হয়নি। যাত্রাই ছিল একমাত্র ভরসা, আনন্দের একমেব উৎস। এ-বছরটা যাত্রাপালা নিয়েই খুশি থাকতে হবে। পরের বছর নিশ্চয়ই টিভি এসে যাবে। সিনেমা হলও হয়তো তৈরি হবে।

হাটের চালাগুলোর পর অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফাঁকা মাঠ। সেখানে অন্য সব বারের মতো এবারও যাত্রার আসর বসেছে।

মাঠের মধ্যিখানে পর পর বারো-চোদ্দটা তক্তপোশ জোড়া দিয়ে স্টেজ। সেটার মাথায় তেরপলের ছাউনি। ওপর থেকে দশ-বারোটা তেজি বাল্‌ব ঝুলছে। আলোয় ঝলমল করছে মঞ্চ।

মঞ্চের দু'ধার ঘিরে বসেছে বাজনদারেরা। কারও হাতে ক্ল্যারিওনেট, কারও হাতে ফ্লুট, কারও আড়বাঁশি, কারও সামনে হারমোনিয়াম, কারও হাত ডুগি তবলায়। কেউ বসেছে পেল্লায় সাইজের পেতলের করতাল নিয়ে। কয়েকজন বেহালা, খঞ্জনি, দোতারা এমনি সব বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। ধীর তালে কনসার্ট চলছে।

সন্ধে পার হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। পালা শুরু হতে এখনও ঘণ্টা দেড় দুই। কনসার্টের সুরে আবহাওয়া তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে। পালা আরম্ভ হলে সুরটা ঝাঁই ঝাঁই করে দ্রুতলয়ে চড়তে থাকবে।

মঞ্চের চারপাশ ঘিরে ধানচালের খালি বস্তা পেতে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা। তবে গঞ্জের আড়তদার আর বড় বড় দোকানদারদের জন্য রয়েছে কিছু চেয়ার আর বেঞ্চি। খানিক দূরে মোটা চটের ঘেরের ভেতর সাজঘর। সেখানেও আলো জ্বলছে। মঞ্চ এবং সাজঘর ছাড়া আর কোথাও আলো নেই।

এই মুহূর্তে মঞ্চের গা ঘেঁষে একটা উঁচু জলচৌকির ওপর বসে আছে পশুপতি নস্কর—'গণপতি অপেরা পার্টি'র মালিক। পুরো দলটার একমাত্র স্বত্বাধিকারী। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। গোলগাল নাড়ুগোপাল-মার্কা চেহারা। মাঝারি হাইট। ঢুলুঢুলু চোখ। এই বয়সেও চশমার দরকার হয়নি। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি কেটে ঘন কাঁচাপাকা চুল পাট করে দুই কান আর ঘাড়ের ওপর দিয়ে লতিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরনে নকশা-পাড় ধুতি আর গরম পাঞ্জাবির ওপর চাদর জড়ানো। তার ওপর ধবধবে সাদা কাপড়ের পাক-দেওয়া উড়ুনি। কপালে গোলা সিঁদুরের মস্ত ফোঁটা।

পশুপতির তিনটি নেশা। তাড়ি, বিড়ি আর নস্যি। যেদিন পালা নামানো হয় সেদিন তাড়ি বাদ। পালাটা তার কাছে পুজোর মতো পবিত্র ব্যাপার। কালীভক্ত লোক। যেখানে পালা নামানো হয়, তার কাছাকাছি কোনও কালীমন্দিরে গিয়ে সে ভক্তিভরে প্রার্থনা সারে। পুরোহিতের হাত থেকে সিঁদুরের টিপ পরে আসে।

তাড়ি যেদিন খায় না সেদিনও তার চোখে ঘোর লেগে থাকে। আজও ঠিক তাই। কিন্তু যতই ঘোর থাক, নজরটি ভারী সজাগ। তার চোখ এড়িয়ে কিচ্ছুটি হবার যো নেই।

পশুপতির বউ মরে গেছে অনেককাল আগে। ছেলেপুলে নেই। সেদিক থেকে সে ঝাড়া হাত-পা। ইচ্ছে করলে বিয়ে কি করতে পারত না? কিন্তু করেনি। তাই বলে ব্রহ্মচারী হয়ে কি দিন কাটাচ্ছে? তেমনটা ভাবলে চলবে কেন? তার দলে যে কুন্তী কি কৌশল্যা সাজে সেই কেষ্টভামিনী অর্থাৎ কৃষ্ণভামিনীকে নিয়ে থাকে সে। সাত পাকের বাঁধন না হলেও সম্পর্কের একটা আলগা গিঁট আছে। একরকম বন্ধনহীন গ্রন্থি। যাত্রাদলে এমনটা নাকি কিছু কিছু হয়েই থাকে। তেমন দোষের নয়।

পশুপতি মঞ্চের চারপাশে যেখানে যেখানে দর্শকদের বসার জায়গা সেদিকে লক্ষ রাখছিল। মাধাইপুরের অনেক ছোট দোকানদার, ফড়ে, দালাল জড়ো হয়েছে। চারিদিকের গাঁগুলো থেকে লোকজন আসছে ঠিকই, তবে আসর এখনও সিকিভাগ ভরেনি।

বেশ উদ্বেগেই আছে পশুপতি। কাল অবশ্য প্রচুর দর্শক হয়েছিল। আজ যে আহবে, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তবে একটাই ভরসা, এ-বছর পালার ফাঁকে ফাঁকে এমন কিছু উত্তেজক গরম মশলা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে এই মরশুমে তাদের আগের পালাগুলো ভালোই লোক টেনেছে। গরম মশলাটি কী ধরনের, সে কথা পরে।

'গণপতি অপেরা পার্টি' এই অঞ্চলেরই দল। তিন পুরুষ ধরে চলছে। পশুপতির ঠাকুরদার হাতে এর পত্তন। তারপর বাবা আমরণ চালিয়ে গেছে। বাবার পর হাল ধরেছে পশুপতি।

'গণপতি অপেরা' পুরনো আমলের যাত্রার ধারাটা আঁকড়ে ধরে আছে। বেশ ক'বছর হল কলকাতা কি জেলা শহরের বড় বড় যাত্রার দলগুলো সিনেমার ভেজাল মিশিয়ে, চমকদার

লাইটের কেরামতি দেখিয়ে যা চালাচ্ছে সাবেক যাত্রাপালার সঙ্গে তার মিল সামান্যই। সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ধরনের পালা নামাচ্ছে তারা। ব্যবসার জন্য বাংলা সিনেমা তো বটেই, মুম্বাইয়ের ঝড়তি পড়তি বাতিল ফিল্ম আর্টিস্টদের এনে চমক দিতে চাইছে। আগে পালা গাওয়া হত রাতভর। এখন কাটছাঁট করে করা হচ্ছে তিন ঘণ্টার। ঠিক সিনেমা শোয়ের কায়দায়।

'গণপতি অপেরা' এখনও রামায়ণ মহাভারত এবং চিরকালের লৌকিক কাহিনি নিয়ে পালা গেঁথে তিন পুরুষ চালিয়ে আসছে। সিনেমা থিয়েটারের খাদ মিশিয়ে তারা সেকেলে যাত্রার চরিত্র নষ্ট করে দেয়নি। কোনওরকম ফক্কিকারি বা ফাঁকিবাজি নেই। ঠাকুরদার সময় থেকে তিন ঘণ্টা নয়, সন্ধের পর আটটা ন'টায় শুরু করে পুরো রাত তারা পালা গায়।

শহরে যাত্রা পার্টিগুলোকে দোষ দিয়ে কী হবে? কলকাতা শহরেই শুধু নয়, গাঁ-গঞ্জে যেখানে বিজলি বাতি এসেছে-- সেসব জায়গায় হু হু করে হিন্দি সিনেমা আর ভিডিও ঢুকে পড়ছে। রগরগে প্রেমের দৃশ্য, দেশবিদেশের সিনসিনারি, জলে স্থলে আকাশে হাড় হিম-করা ফাইট--এসবে আজকাল মানুষ, বিশেষ করে কম বয়সের ছেলেমেয়েরা একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। যাত্রায় এত আমোদ কোথায়? তাছাড়া আদ্যিকালের কিছু বুড়োধুড়ো ছাড়া মানুষের ভক্তিভাব আর তেমনটা নেই। কৃষ্ণ অর্জুন রাম বিদুর যুধিষ্ঠির, এদের নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। হিন্দি সিনেমার সঙ্গে টক্কর দিতে হলে চমকদার কিছু তো করতেই হবে।

কলকাতার দলগুলোর পয়সার জোর আছে। তারা সিনেমা থিয়েটারের কায়দাবাজি মিশিয়ে টিকে থাকতে চাইছে। কিন্তু শিরে সংক্রান্তি 'গণপতি অপেরা'র মতো গ্রামীণ ছোট ছোট দলগুলোর! তাদের টাকা তো নেইই, হিন্দি ফিল্মের নকল করে কেরদানি দেখাবার ইচ্ছেও নেই। ফলে বহু দল হেজে মজে শেষ হয়ে গেছে।

পশুপতির ঠাকুরদা ষষ্ঠীপদ নস্কর সিদ্ধিদাতা গণপতির নামে দলের নাম রেখেছিল। তাতে প্রথম দু'পুরুষ যথেষ্ট সিদ্ধিলাভ হয়েছে। কিন্তু পশুপতির আমলে গত দশ-বারো বছর ধরে বড়ই টালমাটাল অবস্থা। দর্শক হু হু করে কমে যাচ্ছে। শহরে কেউ তাদের ডাকে না। অজ পাড়াগাঁ, ছুটকো ছাটকা দু-একটা গঞ্জ ছাড়া বায়না মেলে না। তাতে ক'টা পয়সাই বা পাওয়া যায়? দলের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। হুট করে দল যে তুলে দেবে তাও পারা যাচ্ছে না। 'গণপতি অপেরা'র এতগুলো বাজনদার, গাইয়ে, অভিনেতা অভিনেত্রী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দল উঠে গেলে সবাই মহা বিপাকে পড়ে যাবে। কী করবে যখন ভেবে ভেবে পশুপতি তলকূল পাচ্ছে না, পুরোপুরি দিশেহারা, সেই সময় আচমকাই দেবকুমার সেন মশাই-এর সঙ্গে আলাপ। স্যুট-বুট পরা সাহেবসুবো মানুষ। কোত্থেকে ঠিকানা জোগাড় করে তিনি নিজেই এসে হাজির হয়েছিলেন।

একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল পশুপতি। দেবকুমারের মতো কেউ তার কাছে আসতে পারেন, কস্মিনকালে সে কি ভাবতে পেরেছে! সরাসরি কাজের কথায় চলে এসেছেন দেবকুমার। 'গণপতি অপেরা' সম্বন্ধে তাঁর কত যে কৌতূহল। দলে ক'জন লোক, তাদের পালার চাহিদা কেমন, ইত্যাদি ইত্যাদি সাতকাহন। পশুপতি করুণ মুখে জানিয়েছিল, টেনেটুনে আর দু-একটা বছর হয়তো চালানো যাবে, তারপর তিন পুরুষের দল বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সব শুনে দেবকুমার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন। তারপর দল বাঁচানোর জন্য জব্বর একটি টোটকা আর করকরে কিছু নোট পশুপতির হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তারই জোরে

'গণপতি অপেরা' এই মরশুমে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু দেবকুমারের কথা এখন নয়। আবার বলা যাবে।

পশুপতি সেই যে জলচৌকির ওপর এসে বসেছে, তারপর ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে। সন্ধের পর থেকে যাত্রা দেখতে অল্প অল্প লোক আসছিল। রাত একটু বাড়লে দেখা গেল, গাঁ-গুলো থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। তাদের মধ্যে জোয়ান বয়সের ছেলেমেয়েই বেশি।

এই মরশুমে মাধাইপুরে আসার আগে হটুগঞ্জে দু'রাত পালা নামিয়েছিল পশুপতিরা। এখানে একরাত হয়ে গেছে। তিন রাতই দেবকুমারের টোটকায় কাজ হয়েছে। তবু মনের মধ্যে খটকা একটা ছিলই। তিন রাত ভালো দর্শক হয়েছে বলে আজও হবে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। ক'বছর তাদের দর্শক বলতে ছিল গরিবগুরবো কিছু বুড়োধুড়ো। অনেক কাল বাদে কম বয়সের ছেলেছোকরারা তাদের পালা দেখতে আসছে। ওধারে কয়েকজন বড় আড়তদার শ্রীনাথ কুণ্ডু, তারানাথ সাঁতরা, বলাই জানা আর বটেশ্বর সরখেল এসে জাঁকিয়ে চেয়ারে বসেছে।

যে সংশয়টুকু মনের কোণে জমা হয়ে ছিল, লহমায় উধাও। বেজায় খুশি পশুপতি। পৌষের এই কনকনে শীতেও উত্তেজনায় তার পঞ্চাশ বছরের ঝিমিয়ে-পড়া রক্ত চান্‌কে উঠেছে। আজকের 'রাবণবধ' পালাও যে উতরে যাবে তা নিয়ে এখন আর লেশমাত্র দুর্ভাবনা নেই তার। পাঞ্জাবির বুকপকেটে রুপোর সরু চেনে বাঁধা 'ওয়েস্ট অ্যান্ড ওয়াচ কোম্পানি'র আদ্যিকালের একটা ঘড়ি রয়েছে। চাদরের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সেটা বার করে দেখে নিল সে। আটটা বেজে গেছে। অর্থাৎ পালার সময় হয়েছে। ঘড়িটা জায়গামতো রেখে ডানপাশের পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টিপ তুলে নিয়ে নাকে পুরে দিল। জোরে শ্বাস টানতে কড়া নস্যি স্নায়ুগুলোতে জোরে একটা ঝাঁকুনি লাগাল।

জলচৌকি থেকে শরীরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে উঠে পড়ল পশুপতি। দ্রুত দুই হাত নেড়ে নেড়ে বাজনদারদের সংকেত দিতে লাগল।

এতক্ষণ ঢিমেতালে কনসার্ট চলছিল। মুহূর্তে তার সুর চড়ে গেল। অর্থাৎ এবার পালা শুরু হবে।

পশুপতি আর দাঁড়াল না। সোজা সাজঘরের দিকে চলে গেল। চটের ঘেরের ভেতরে মোটা কাপড়ের পার্টিশান তুলে দু'ভাগ করে একধারে মেয়েদের, অন্য পাশে পুরুষদের মেক-আপের ব্যবস্থা। নটনটীদের সাজসজ্জার সময় পুরুষরা মেয়েদের এলাকায় পা বাড়ায় না। মেয়েদেরও পুরুষদের জায়গায় প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু পশুপতি হল কিনা 'গণপতি অপেরা পার্টি'র মালিক। দু'দিকেই তার অবাধ গতি। সোজা মেয়েদের সাজঘরে ঢুকে গেল সে।

সবার সাজগোজ হয়ে গিয়েছিল। এই যাত্রাদলের নায়িকা বা মক্ষীরানি হল মেনকা। 'রাবণবধ' পালায় সীতার পার্ট তার বাঁধা। মহাভারতের পালা হলে সে দ্রৌপদী, 'প্রবীর-জনা'য় জনা, 'সাবিত্রী-সত্যবান'-এ সাবিত্রী, ইত্যাদি।

আজকের পালায় তার সীতার পার্ট। কিন্তু যে মেক-আপটি নিয়ে সে একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে সেদিকে তাকালে চোখ কপালে উঠে যাবে।

সীতা হল সতীসাধ্বী, জনকনন্দিনী, রামের প্রাণাধিক পত্নী, নম্র, পবিত্র। তাকে দেখলে মন শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এ কী বেশ তার?

মেনকা খুবই সুন্দরী। যেন মায়াকাননের অপ্সরী। এমন মেয়ে গেঁয়ো যাত্রার দলে দুর্লভ। নামটাও লাগসই। মেনকা রম্ভা উর্বশী, এসব ছাড়া আর কী হতে পারে তার নাম? বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়। পাকা সোনার সঙ্গে লালচে আভা মেশালে যেমন হয় তেমনি গায়ের রং। ভরাট লম্বাটে মুখ, টানা চোখ, ফুরফুরে পাতলা নাক, সরু চিবুকে সামান্য ভাঁজ। সুগোল মসৃণ দু'টি হাত কাঁধ থেকে সটান নেমে এসেছে। অটুট, নিটোল, পরিপূর্ণ স্তন। সরু কোমর যেন মুঠোয় ধরা যায়। নীচের দিকটা ভারী, পেছন দিকটায় উলটে দেওয়া তানপুরার গড়ন।

এই মুহূর্তে তার পরনে খাটো, টাইট হাতাহীন জামা। কাঁচুলির চাইতে ঝুল সামান্য বেশি হতে পারে। স্তনের নীচে থেকে নাভির অনেকটা তলা অবধি শরীরের অংশটা পুরোপুরি খোলা। ভারী উরু, নিভাঁজ পায়ের গোছ।

কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত মেনকা পরেছে আঁটোসাঁটো ফিনফিনে যে পোশাক সেটা না প্যান্ট, না পাজামা। জামা এবং নীচের পোশাকটার রং গাঢ় লাল। সেগুলোর সামনে পেছনে এবং দু'পাশে বড় বড় সাদা হরফে লেখা আছে 'সান কোম্পানি', 'সান কোম্পানি'।

চোখে একটু মোটা করে কাজলের টান দিয়েছে মেনকা। পোশাকের মতো গালে ঠোঁটে হাত-পায়ের নখে উগ্র লাল রং। সারা গায়ে প্রচুর সেন্ট ঢেলেছে সে। উগ্র সুগন্ধে সাজঘরের বাতাস ম ম করছে।

চারিদিকে এই পালার কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী মন্থরা থেকে শুরু করে উর্মিলা, মন্দোদরীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

পুরনো যাত্রার ঘরানা বজায় রেখে 'গণপতি অপেরা'য় পালা শুরুর আগে সখীনৃত্য হয়ে থাকে। আট-দশ বছরের মেয়েদের একটা দল একই রকম সুন্দর পোশাক পরে সারা মঞ্চ জুড়ে নাচের হিল্লোল তুলে যায়। মূল পালার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কয়েকবার সখীদের এই নাচটা চলে।

সখীনৃত্যের নাচিয়েরা মেক-আপ নেয়নি। এককোণে চুপচাপ বসে আছে। কেননা, এই মরশুমে সখীদের নাচ বাদ।

মন্দোদরী কৌশল্যারা মেনকার দিকে তাকিয়ে ছিল। সাজঘরে যে পশুপতি ঢুকেছে, কেউ তা লক্ষই করেনি। মেনকাকে দেখতে দেখতে চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল পশুপতিরও। পলক পড়ছে না। বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেছে। আজ নিয়ে চারদিনের পালায় মেনকাকে এই বেশবাসে দেখল পশুপতি। সতীসাবিত্রী টাবিত্রী যে সাজে তার ভেতর এমন একটা চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো কারবার ছিল, কে জানত!

কিন্তু মেনকার রূপযৌবনে মজে থাকলে চলে না। পশুপতি দলের অধিকারী। হঠাৎ ঘোরটা কেটে গেল তার। তাড়া দিয়ে বলল, 'মেনকি, আর দেরি করিসনি, আসরে যা। শুনচিস না বাজনদারেরা কলসার্টের সুর চড়িয়ে দিয়েচে।' মেনকাকে আদর করে পশুপতি এবং দলের বয়স্ক নটনটীরা 'মেনকি' বলে ডাকে।

মেনকা বলল, 'এই যাচ্চি গ—'

পশুপতি ফিরে গিয়ে তার সেই জলচৌকিতে বসে পড়ল। খানিক পরেই মেনকা যেন উড়তে উড়তে মঞ্চে এসে উঠল। বুকের সিকিভাগ আর নীচের দিকে তলপেট অবধি খোলা। বিদ্যুতের চমক তুলে সারা মঞ্চ ঘুরে ঘুরে সে নাচ শুরু করল। আঁটোসাঁটো পোশাক ভেদ করে তার স্তন, তার উরু যেন বেরিয়ে পড়তে চাইছে।

শুধু নাচ আর অভিনয়ই নয়, চমৎকার গানের গলাও তার। যেমন সুরেলা, তেমনি মাদকতায় ভরা।

মেনকা গাইছিল—

'বাবুরা বিবিরা জোয়ান ছোঁড়ার দল
জোয়ান ছুঁড়ির পাল
শুনো সব্বজন—
কলিতে আজব জিনিস এনেচে
সাধের 'সান কোম্পানি'—
তার খপর (খবর) রাখো কি?
রাখো না তো?
ঠিক আচে, কইচি আমি শুনো দিয়ে মন
এনেচে সোনো (স্নো) পাউডার সেন্ট আর ঠোঁটের রং
লাগাও যদি তর হবে পরান
যদ্দিন বাঁচো থাকবে তুমার অনন্ত যৈবন।'

আগুনের ঘূর্ণির মতো মেনকার শরীর পাক খেয়ে খেযে নেচে চলেছে। লহমায় তার ঝলক ছড়িয়ে পড়ল চারপাশের দর্শকদের মধ্যে। জোয়ান ছোকরারা সমানে সিটি মেরে চলেছে। কেউ কেউ উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

'শালী বুকের ভেতরটা চান্‌কে দেছে রে—'

'ছুঁড়ি ঝ্যানো চাক্কু মাইরি।'

'কোতায় নাগে মল্লিকা সেরবাত (সেরওয়াত)!'

'করিনা কাপুরের নাক কেটে দিতে পারে এই মেনকা—'

ওধারে আড়তদারেরা উত্তেজনায় রি রি করে কাঁপছে। ষাটের কাছাকাছি তাদের বয়স, এই বয়সেও শীতল রক্তে যেন আগুন ধরে গেছে। শীৎকারের মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল তাদের গলা থেকে।

'চোখির সামনে কী দেকচি গ! কোথায় নাগে সিনেমা! নেশা ধরে গেল—'

'নাচ ছুঁড়ি, ঘুরে ফিরে—'

'ছুকরি চোখে তুবড়িবাজি দেকিয়ে দিলে—'

পশুপতি নস্করের নজর মঞ্চের ওপর তো বটেই, দর্শকদের দিকেও সমানে পাক খেয়ে চলেছে। আর বার বার দেবকুমার সেনের মোক্ষম টোটকার কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। তিনিই খাটো ফিনফিনে পোশাকে 'সান কোম্পানি'র নাম লিখে মেনকাকে দিয়ে এভাবে নাচাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পশুপতি প্রথমটা আঁতকে উঠেছিল। বলেছে, 'না না, বাবুমশাই, আমাদের রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পালা। তার ভেতরে এসব ঢুকোলে নোকে গায়ে থুতু দেবে।'

দেবকুমার বুঝিয়েছিলেন, 'রামায়ণ মহাভারত যেমন আছে তেমনি থাকবে। তার ভেতর এই নাচটা দিলে আপনারও লাভ, আমাদেরও লাভ। গ্রামে গ্রামে আমাদের কোম্পানির মালের কথা লোকে জানতে পারবে। খালি হাতে কিছু করতে হবে না।' বলে পকেট থেকে নোটের গোছা বার করে দিয়েছিলেন।

এবার আর 'না' বলতে পাবেনি পশুপতি। দেবকুমার তাদের তৈরি করা একটা গান দিয়ে বলেছেন, 'আপনাদের হিরো-ইন নাচের সঙ্গে এটাও গাইবে।'

গানটা এক পলক দেখে নিয়ে পশুপতি বলেছে, 'যা খটমট কথা নিকেচেন তা গাঁয়ের নোক বুঝবে নি, তাদের মাথার ওপর দে বেরিয়ে যাবে। গান আমরাই নিকে লেবো।'

এখন মঞ্চে মেনকা যা গাইছে সেটা পশুপতিরই লেখা।

ওদিকে আসর পুরো জমে উঠেছে। আগুনের হলকা ছড়িয়ে, চুল উড়িয়ে, কোমরে পাক দিয়ে দিয়ে নেচে আর গেয়ে চলেছে মেনকা।

'ও লো ঘরের নক্ষ্মী, তোর গুমরে আচে মন,
কারণ তোর ভাতার বড্ড উড়ু উড়ু
পড়ে থাকে মাগীর বাড়ি
ঘরেতে তার বসে নাকো মন।
'সান কোম্পানি'র সাবান মাখ, সোনো (স্নো) মাখ
থাকবে ভাতার তোর গায়ে লো সেঁটে
ঝ্যানো কাঁটালের আটা
পরেব দাঁড়ে আর বসবে না
'সান কোম্পানি'র এমনি মহিমা।'

এক-এক লাইন মেনকা গায়, মঞ্চে এক-এক পাক নাচে, তার সঙ্গে দর্শকদের হল্লোড় চলতে থাকে। চলতে থাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সিটি আর চিৎকার।

মেনকা নাচতে আর গাইতেই থাকে।

'ওলো ডাগর ছুঁড়ি উচ্‌কো বয়েস
বুক ঝ্যানো তোর জোড়া পাহাড়
উকুৎ হল থাম
কিন্তুক সবই ফক্কিকার—
না আছে তার দাম।
তোর পেরানে কুরকুরুনি
শরীল জুড়ে আনচানানি
কিন্তুক ছোঁড়ারা কেউ ফিরেও তাকায় না।
টোটকা আচে আমার কাচে
শোন রে দিয়ে মন,
'সান কোম্পানি'র সোনো (স্নো) লাগা, সাবান মাখ
দেখবি তোর ডাইনে নাগর, বাঁয়ে নাগর
বুকে নাগর, পিঠে নাগর
কারে ছেড়ে কারে রাকবি
ভেবে পাবি না।
'সান কোম্পানি'র এমনি মহিমা।'

'সান কোম্পানি'র মহিমা কীর্তনের পর সাজঘরে ফিরে গেল মেনকা। তারও আধঘণ্টা বাদে শুরু হল 'রাবণবধ' পালা।

মন্থরার কুমন্ত্রণায় রামকে বনবাসে পাঠানো, সীতাহরণ, জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ, সুগ্রীবের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের বন্ধুত্ব, হনুমানের লঙ্কাদহন, বানরসেনার সাহায্যে সেতুবন্ধন ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ঘটনার পর রাম রাবণের যুদ্ধ এবং অবশেষে রাবণবধ।

আবহমান কালের সেই রামগাথা। সতী সাধ্বী, জনমদুখিনী সীতার পার্ট যখন মেনকা করছে তখন তার শুদ্ধশান্ত চেহারা দেখে ভাবাই যায় না এই মেয়েই 'সান কোম্পানি'র হয়ে ওইরকম পাতলা, গা-দেখানো আঁটো পোশাকে নেচে গেয়ে গেছে।

সাবেক যাত্রাদলগুলোর রীতি ছিল পালার শুরুতে তো বটেই, প্রতিটি অঙ্ক শেষ হলে, সখীরা এসে কয়েক মিনিট নেচে যাবে। এটা রিলিফের কাজ করত। 'গণপতি অপেরা' এতকাল তাই করে এসেছে। কিন্তু এবার সখীনৃত্য পুরোটাই বাদ। পালার আরম্ভেই শুধু নয়, প্রতিটি অঙ্কের পর আঁটো পোশাক পরে নাচে গানে উগ্র ঝাঁঝ ছড়িয়ে, দর্শকদের মাতিয়ে দিয়ে 'সান কোম্পানি'র গুণকীর্তন করে গেছে মেনকা।

আজকের পালা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভোর হতেও বেশি দেরি নেই। বাইরে অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে।

এদিকে পালার শেষ অঙ্কের অন্তিম দৃশ্য অর্থাৎ রাম রাবণের লড়াই চলছে পূর্ণোদ্যমে। তলোয়ারের ঘন ঘন ঝনৎকারে আর বাজনদারদের চড়া কনসার্টে যুদ্ধ রীতিমতো জমে গেছে।

পশুপতি নস্কর সেই যে জলচৌকির ওপর থেবড়ে বসে ছিল, প্রায় সারা রাত সেইভাবেই বসে আছে। মনে যে-খটকাটা ছিল তা উধাও। দেবকুমারবাবু যে-টোটকার ব্যবস্থা করেছেন তার মার নেই। সেটা দলের পক্ষে সালসার কাজ করেছে। এখন থেকে প্রতিটি পালায় ওটি চালিয়ে যাওয়া হবে।

পশুপতির ধারণা, এর পর শুধু গাঁ আর ছোট ছোট গঞ্জ থেকেই তাদের বায়না আসবে না, শহরেও তাদের চাহিদা বেড়ে যাবে লাফিয়ে লাফিয়ে। এক-এক রাত পালা গাওয়ার জন্য এতদিন মেরেকেটে চার-পাঁচ হাজারের বেশি জুটত না। তাও আদায় করতে ঘুরে ঘুরে জিভ বেরিয়ে যেত। এখন থেকে দশ হাজারের কম সে কারও বায়না নেবে না। বাকিতে নয়, পুরোটা নগদে। দু-চার বছরের ভেতর টাকা আরও বাড়িয়ে দেবে। সস্তায়, প্রায় মিনিমাগনায় লোকে মেনকার ওইরকম ঝাঁঝালো নাচ, গান আর দাউ দাউ আগুনের মতো শরীর দেখবে—তাই কখনও হয় নাকি?

আজ একফোঁটা তাড়ি পেটে পড়েনি পশুপতির। তবু ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে সে বিভোর। যেন নেশার ঘোর লেগেছে। পকেট থেকে ডিবে বার করে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকে ঢুকিয়ে কষে টানতে লাগল আর তখনই চোখে পড়ল আড়তদার কুণ্ডুমশাই সরখেল মশাইদের পাশের একটা চেয়ারে বসে আছেন শশাঙ্কবাবু—শশাঙ্ক চৌধুরি। তিনি কখন এসে পালা দেখতে বসেছেন, সে টেরও পায়নি। তাঁকে দেখামাত্র অস্বস্তিতে বুকের ভেতরটা কেমন যেন আঁকুপাঁকু করতে থাকে পশুপতির। যে-আনন্দ আর উত্তেজনা তাকে মজিয়ে রেখেছিল আচমকা তা ম্যাড়মেড়ে হয়ে যেতে লাগল।

শশাঙ্ক চৌধুরি খুব পণ্ডিত মানুষ, কলেজে পড়ান, কলকাতায় থাকেন। আর সময় পেলেই পশ্চিম বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ছোট ছোট গ্রামীণ যাত্রা, টুসু, ভাদু, গম্ভীরা, আলকাপ ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখে, নোট নিয়ে কলকাতার নাম-করা সব কাগজে দামি দামি লেখা লেখেন।

'গণপতি অপেরা' সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন : 'এ দেশের যাত্রাদলগুলো থিয়েটার আর সিনেমার খাদ মিশিয়ে চিরন্তন পালাগানের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। সেদিক থেকে 'গণপতি অপেরা' উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। প্রচণ্ড অর্থকষ্টের মধ্যেও বাংলার আবহমান কালের সংস্কৃতিকে এঁরা ধরে রেখেছেন। লেশমাত্র কলুষিত হতে দেননি। এঁরা নমস্য, সত্যিকারের গুণী, শিল্পী...'

সেই শশাঙ্ক চৌধুরি নিশ্চয়ই পালার ফাঁকে ফাঁকে মেনকার নাচগান দেখেছেন। 'গণপতি অপেরা'র এই মহাপতন সম্পর্কে কী ভাবছেন, কে জানে।

শশাঙ্কর সঙ্গে পশুপতি নস্করের ভালোই আলাপ আছে। তিনি এ-অঞ্চলে এলে 'গণপতি অপেরা'র পালা দেখবেনই। এত বড় একজন পণ্ডিতের সুখ্যাতিতে পশুপতি ডগমগ, হাতের মুঠোয় যেন স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিল। শশাঙ্ককে যেখানেই দেখেছে তক্ষুনি তাঁর কাছে দৌড়ে গেছে ; হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে গদগদ হয়ে বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

কিন্তু আজ শশাঙ্ক চৌধুরির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না। একবার ভাবল গুটি গুটি উঠে চুপিসারে সাজঘরে লুকিয়ে বসে থাকবে। শশাঙ্ক চৌধুরি চলে গেলে সেখান থেকে বেরুবে। কিন্তু পারা গেল না। শশাঙ্ক চুম্বকের মতো তাকে টানতে লাগলেন।

অগত্যা পায়ে পায়ে তাঁর কাছে চলে আসে পশুপতি। চুরি ধরা পড়লে যেমন হয়, মুখে তেমন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব। হাতজোড় করে, মাথা নীচু করে, বারকয়েক ঢোক গিলে বলল, 'পেন্নাম বাবুমশাই, কখন এয়েচেন?'

নীরস গলায় শশাঙ্ক বললেন, 'কাল বিকেলে রাধানগরে আমার এক বন্ধুর বাড়ি এসেছি। সেখানে শুনলাম আপনারা মাধাইপুরে পালা নামাবেন। ভাবলাম দেখে আসি। বন্ধুকে সঙ্গে আসতে বলেছিলাম। তার জরুরি কাজ আছে, তাই আসতে পারল না। অগত্যা আমি একাই এলাম।' একটু থেমে প্রবল ধিক্কারের সুরে বলতে লাগলেন, 'আপনাদের ওপর আমার এত আশাভরসা ছিল কিন্তু ওইরকম নোংরা নাচ ঢুকিয়ে রামায়ণের জাত মেরে দিলেন! এতকালের পালারও সর্বনাশ করলেন। ছি—ছি -'

সারা শরীর দুমড়ে মুচড়ে নুয়ে পড়ল যেন পশুপতির। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'বাবুমশাই, কী করব, 'সান কোম্পানি'র এক সায়েব এসে কইলেন, মেনকিকে ওই রকম ডেরেস (ড্রেস) পরিয়ে নাচাও। অনেক টাকাও দিলেন। রামাযণ মহাভারত আমাদের মাথার ওপরেই আচে। কিন্তুক তা টিকিয়ে রাকতে অমন নাচ নইলে চলে না। শুধু রাম সীতা কিষ্ণ অর্জুন দিয়ে পালা বাঁধলে নোকে দেকতে চায় না। হিন্দি বইয়ের মতো নাচা-গানা চাই। ওইরকম নাচটাচ না ঢুকোলে দল তুলে দিতে হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর পশুপতি করুণ গলায় ফের শুরু করে, 'আপনি আমাদের সম্পক্কে কত সুখ্যাৎ করে নিকেচেন। আমরা আর্টিস্ট—শিল্পী। শিল্পী ছিলাম বাবুমশাই, একন 'সান কোম্পানি'র সাবান, সোনো (স্নো), পাউডার, সেন্টের ফিরিওলা হয়ে গেচি। বাঁচতে হবে তো।'

যে নস্যিটা পশুপতি নাকে টেনেছিল সেটা তালু অবধি উঠে গেছে। এবার তার ক্রিয়া শুরু হল। ঝাঁঝে ঘোলাটে চোখে জল এসে গেছে তার; সেটা কতটা নস্যির কারণে আর কতটা আক্ষেপে বুঝতে পারলেন না শশাঙ্ক চৌধুরি। বিমূঢ়ের মতো তিনি তাকিয়ে থাকেন।

বেলাশেষে

১৯৯৬

বিশাল পার্কটাকে ঘিরে চোখ-ধাঁধানো উঁচু উঁচু অগুনতি বাড়ি। সেগুলোর বয়স আট দশ বছরের বেশি হবে না। পুরনো বাড়িও কিছু আছে। এগুলোও বেশ ছিমছাম। দু'চার বছর পর পর সারিয়ে টারিয়ে নিয়মিত রং টং করা হয়। মনে হয় একেবারে নতুন, ঝকঝকে।

দক্ষিণ কলকাতার এই এলাকাটা খুবই নিরিবিলি। কোথাও আবর্জনা জমে নেই। যেদিকে তাকানো যাক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে, তাই গাড়িটাড়ির উৎপাত কম। পোড়া গ্যাসোলিনের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে না। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ নেই বললেই চলে। চারিদিকে ঘন সবুজ প্রচুর গাছপালা।

কলকাতা তো সারাক্ষণই উত্তেজনায়, আক্রোশে টগবগ করে ফুটছে। রোজই এখানে মিটিং, মিছিল, স্লোগান, তীব্র হইচই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যাম। ভাবাই যায় না, এই শহরের একধারে দ্বীপের মতো এমন শান্ত চোখ-জুড়ানো একটি ভূখণ্ড রয়েছে। এলাকাটার নাম 'ড্রিম গার্ডেন'—স্বপ্নের উদ্যান।

উঁচু স্তরের সফল, প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা 'ড্রিম গার্ডেন'-এর বাসিন্দা। কেউ বড় মাপের সরকারি আমলা, কেউ মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ, তাছাড়া ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যারিস্টার, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ড্রিম গার্ডেন'-এর ঠিক মাঝখানে মস্ত পার্কটা জুড়ে সবুজ জাজিম পাতা। একপাশে বাচ্চাদের খেলার রকমারি ব্যবস্থা। আছে সিমেন্টের ঘোড়া, উট, বাঘ এবং মস্ত একটা হাতি। সিঁড়ি দিয়ে হাতির পেটে ঢুকে ছেলেমেয়েরা স্লিপ কাটে, ছোট নাগরদোলায় পাক খায়। আছে তারের জালের ভেতর কত রকমের যে পাখি। বিরাট কাচের অ্যাকোয়ারিয়ামে লাল নীল সবুজ হলুদ, নানা রঙের অজস্র মাছের খেলা। গোটা পার্ক ঘিরে পাথরে বাঁধানো রাস্তার ধারে বসার জন্য রং-করা কাঠের বেঞ্চ; রয়েছে সারি সারি ল্যাম্প পোস্ট।

রোজ বিকেলে পার্কে এসে সাত-আট পাক হাঁটেন অমলেশ—অমলেশ দস্তোয়। একদমে নয়, দু'পাক ঘোরার পর কোনও একটা বেঞ্চে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর ফের হাঁটা শুরু। জোরে জোরে নয়, মাঝারি স্পিডে। একবার হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডাক্তারের পরামর্শে এইভাবেই তাঁকে হাঁটতে হয়।

বিকেলের এই ভ্রমণটা অমলেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই জরুরি। টাটকা বাতাস থেকে ফুসফুসে অক্সিজেন টানতে টানতে নিজেকে বেশ সতেজ লাগে তাঁর। মনে হয় জীবনীশক্তি আরেকটু বাড়ল।

সবে ষাট পেরিয়েছেন। বাইরে থেকে দেখলে বোঝাই যায় না ভেতরে ভেতরে হৃদ্‌যন্ত্র কতটা কাহিল হয়ে পড়েছে। তার হাঁটা চলা, ঘুম, বিশ্রাম, ওষুধ খাওয়া—সবই মেপে মেপে; ঘড়ির কাঁটা ধরে।

দুর্গাপুজো কালীপুজো ভাইফোঁটা—এবারের মতো বছরের বড় উৎসবের ঋতু সবে শেষ হয়েছে। সময়টা কার্তিকের শেষাশেষি। দিন ছোট হচ্ছে। শুকনো বাতাসে হিম মিশতে শুরু করেছে।

অন্যদিনের মতো আজও পার্কে দু'পাক দিয়ে একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন অমলেশ। একটা বেঞ্চে বসে জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে ক্লান্তিটা দূর হল।

এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। সূর্য পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ওধারে নেমে গেছে। চারিদিকের গাছের ছায়া দ্রুত লম্বা হচ্ছে। মরা মরা যে নিস্তেজ আলোটুকু এখনও রয়েছে, তা আর কতক্ষণ? খানিক পরেই ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে।

অমলেশের পরনে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবির ওপব হাত-কাটা হালকা উলের সোয়েটার। এর মধ্যেই হেমন্তের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বেশ শীত শীত লাগছে। বড জোর দু-এক সপ্তাহ। তারপর পাতলা সোয়েটারে হিম ঠেকানো যাবে না। তখন বিকেলে বেড়ানোর সময় শাল জড়িয়ে আসতে হবে।

এই পার্কে শুধু 'ড্রিম গার্ডেন'-এর বাসিন্দারাই নয়, চারপাশের অন্য সব এলাকা থেকেও প্রচুর লোকজন সকাল-বিকেল বেড়াতে আসে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষ আজকাল অনেক বেশি সচেতন। কলকাতায় যাদের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে তাদের বেশির ভাগই ব্লাডপ্রেসার আর ব্লাডসুগারে ভোগে। নিয়মিত দু'বেলা হাঁটাহাঁটি তাদের পক্ষে ভীষণ উপকারী।

হেমন্তের এই বিকেলে বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলারা সমানে চক্কর দিচ্ছে। পার্কের ডানদিকের কোনা থেকে বাচ্চাদের কলকলানি ভেসে আসছিল। ফাঁকা জায়গা আর খেলার নানারকম সরঞ্জাম পেয়ে তারা সমানে দাপাদাপি করে চলেছে।

অলস চোখে মানুষজন দেখছিলেন অমলেশ। স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বছর সাতেক আগে। ছেলেমেয়ে নেই। চোদ্দ শো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে তাঁর নিঃসঙ্গ, বাঁধাধরা জীবন। স্ট্রোকের কারণে দু'চার সপ্তাহের জন্য দূরে কোথাও যে বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসবেন তারও উপায় নেই। ডাক্তার অনেকগুলো গণ্ডি টেনে দিয়েছেন। সারা দিনরাত তাঁকে ফ্ল্যাটেই কাটাতে হবে। বিকেলে শুধু এক ঘণ্টার জন্য পার্কে আসার অনুমতি পাওয়া গেছে। এই সময়টুকু এত মানুষকে কাছে পেয়ে, তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে কী ভালোই যে লাগে।

একটু আনমনা হয়ে ছিলেন অমলেশ। হঠাৎ মনে হল, বেঞ্চের ওপাশটায় কেউ এসে বসেছে। মুখ ফেরাতেই চোখ পড়ল, একজন মহিলা। বয়স খুব সম্ভব বাহান্ন চুয়ান্ন। কিন্তু অতটা দেখায় না। রং সামান্য চাপা হলেও ভারি সুশ্রী। মাথায় নিবিড় কালো চুল, ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে রুপোর তার। ঘন পলকে-ঘেরা বড় বড় টানা চোখে গভীর, শান্ত দৃষ্টি। এই বয়সেও শরীরে ভাঙন ধরেনি। পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য। ভরাট মুখ, ফুরফুরে পাতলা নাক, ঠোঁট সামান্য পুরু। শরীরে বয়সের ভার পড়েনি। অটুট মেদহীন চেহারা। আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেও মসৃণ ত্বকে সূক্ষ্ম কোনও রেখা চোখে পড়বে বলে মনে হয় না। নাকে হিরের নাকছাবি, বাঁ হাতে সরু ব্যাণ্ডে দামি ওভাল শেপের ঘড়ি, ডান হাতে দু'টি সোনার চুড়ি, গলায় সোনার চেনে বড় চুনি-বসানো লকেট, পরনে হালকা হলুদ রঙের শাড়ি—সব মিলিয়ে হেমন্তের এই বেলাশেষে তাঁকে কেমন যেন অলোকিক মনে হয়।

মহিলার মুখটা চেনা চেনা লাগল অমলেশের। একটু ভাবতেই খেয়াল হল, আগেও তাঁকে দেখেছেন। এবং এই পার্কেই। অগুনতি ভ্রমণকারীর মতো তিনিও এখানে বিকেলে বেড়াতে আসেন। সকালেও আসেন কিনা, জানেন না। কেননা তখন অমলেশের বাইরে বেরুনো বারণ। মহিলাকে দেখলেও সেভাবে আগে তাঁকে লক্ষ করেননি।

খুব সম্ভব দু-এক পাক ঘুরে মহিলা তাঁর মতোই ক্লান্তি বোধ করছেন। তাই বেঞ্চে বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন।

চোখাচোখি হতে মহিলা হাসলেন। বললেন, 'রোজ বিকেলে আপনাকে পার্কে বেড়াতে দেখি। আলাপ অবশ্য হয়নি। আমার নাম চারুলতা সেন।'

মহিলা অর্থাৎ চারুলতার মধ্যে কোনওরকম আড়ষ্টতা নেই। খুবই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। প্রতি-নমস্কার করে, নিজের নাম জানিয়ে, মৃদু হেসে অমলেশ বললেন, 'আমিও আপনাকে দেখেছি।'

চারুলতা বললেন, 'ব্লাড সুগার ধরা পড়েছে। ডাক্তার ওষুধ দিলেন না। বললেন, সকাল-বিকেল দু'বেলা পার্কে দশ পাক করে ঘুরতে। ওটাই নাকি মেডিসিন।'

'আমার অবশ্য সুগার নেই। হার্টের ট্রাবল। আমার ডাক্তার একবারই হাঁটতে বলেছেন। বিকেলে আমার পক্ষে হাঁটাটা যথেষ্ট নয়, সারাদিনে বেশ ক'টা ট্যাবলেটও খেতে হয়।'

একটু চুপচাপ।

তারপর চারুলতা পার্কের বাইরে ডান দিকে দূরের একটা হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'আপনি তো ওই বাড়িটায় থাকেন। কী যেন নাম বাড়িটার? 'আকাশদীপ'।'

অমলেশ বেশ অবাকই হলেন।—'আপনি জানেন দেখছি।'

'হ্যাঁ। আপনার ফ্ল্যাটে চাঁপা বলে যে মেয়েটা ক'বছর আগে রান্না করত সে এখন আমার ফ্ল্যাটে কাজ নিয়েছে। তার কাছেই শুনেছি।'

সত্যিই চাঁপা বছর সাতেক আগে অমলেশের বাড়িতে রান্নার কাজ করত। বয়স কম। আচমকা একটা অটোর ড্রাইভারকে বিয়ে করে দমদম না বাগুইআটি কোথায় যেন চলে যায়। যাবার সময় জানিয়েও যায়নি। তাই ভীষণ সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন অমলেশ। আজকাল বিশ্বাসী কাজের লোক পাওয়া খুবই মুশকিল। চাঁপা চলে গেলে মাসখানেক খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত একজনকে পাওয়া গিয়েছিল। মাঝবয়সী মালতী, বিধবা। দায়িত্ববোধ আছে। কামাই টামাই নেই। ঘড়ির কাঁটা ধরে দু'বেলা এসে রেঁধে দিয়ে যায়।

বছর দেড়-দুই বাদে চাঁপার সেই বিয়ে কাটান ছাড়ান হয়ে যায়। ফের সে 'ড্রিম গার্ডেন'-এর পেছন দিকের একটা বড় বস্তিতে বাপের কাছে ফিরে আসে। অমলেশের ফ্ল্যাটে কাজের জন্য এসেছিল। ততদিনে মালতীকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। চাঁপাকে তাই রাখা যায়নি। সে যে চারুলতার ফ্ল্যাটে চাকরি পেয়েছে, সেটা জানা ছিল না।

চারুলতা বললেন, 'আপনার স্ত্রী তো অনেকদিন অসুস্থ থাকার পর মারা গেছেন। শুনেছি, খুবই কষ্ট পেয়েছেন।' তাঁর কণ্ঠস্বর একটু বিষণ্ণ শোনালো।

আস্তে মাথা নাড়লেন অমলেশ।—'হ্যাঁ, খুবই কষ্ট পেয়েছে ললিতা।'

ললিতা যে অমলেশের স্ত্রী, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না চারুলতার। বললেন, 'শুনেছি, আপনি একলাই থাকেন।'

দেখা যাচ্ছে, চাঁপার কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অনেক খবরই পেয়েছেন চারুলতা। হয়তো যে-মানুষটি বিপত্নীক, প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পেরুতে চলেছেন তাঁর প্রতি সহানুভূতিই হয়ে থাকবে মহিলার। অমলেশ বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন। স্ত্রীকে তো হারিয়েছিই, আমার কোনও সন্তানও নেই।' বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল হল, মহিলা তাঁর নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখেন অথচ বিকেলে বেড়াবার সময় আবছাভাবে চারুলতাকে দু'চারবার দেখা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তিনি। এই বয়সেও চোখ টেনে রাখার মতো সুন্দর, সাজগোজে উগ্রতা নেই, রয়েছে স্নিগ্ধ রুচির ছাপ। সিঁথিতে সিঁদুর চোখে পড়ে না। মহিলা কি চিরকুমারী, নাকি তাঁর স্বামী মারা গেছেন? অবশ্য সিঁদুর না থাকায় স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আজকাল স্বামী জীবিত থাকলেও অনেকেই শাঁখাসিঁদুর বর্জন করেছে। ও দু'টো বস্তু স্বামীর পরমায়ুর রক্ষাকবচ বলে তারা মানে না।

চারুলতা সম্পর্কে অমলেশের কৌতূহল হচ্ছিল। একটু সংকোচের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

পার্কের যে দিকটায় অমলেশদের 'আকাশদীপ' তার উলটো দিকে কোনাকুনি একটা হালকা সবুজ রঙের বাড়ি দেখিয়ে চারুলতা বললেন, 'ওই বিল্ডিংটায়। থার্ড ফ্লোরে। বাড়িটার নাম 'জয়-জয়ন্তী'।'

বাড়িতে আর কে কে আছেন তা নিয়ে প্রশ্ন করলেন না অমলেশ। মনে হল সেটা অশোভনই হবে।

দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। চারিদিক দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই আশপাশের বাড়ির আলো তো বটেই, পার্কের ভেপার ল্যাম্পগুলোও জ্বলে উঠেছে।

বসে বসে প্রায় অচেনা একটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে গল্প করার মধ্যে যতই মাদকতা থাক, হৃদ্‌যন্ত্রটি সচল, স্বাভাবিক রাখার কাজটা তার চাইতে অনেক বেশি জরুরি। অমলেশ উঠে পড়লেন। মৃদু হেসে বললেন, 'আমার আরও কয়েক পাক ঘোরা বাকি। আপনি তো রোজই আসেন। আবার দেখা হবে।'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল চারুলতার। তিনিও উঠে পড়লেন। —'আরে তাই তো, আমাকেও আরও কয়েক পাক ঘুরতে হবে। চলি—'

অমলেশ যেদিকে গেলেন, তার উলটো দিকে গেলেন চারুলতা। কিন্তু পার্কটা পাক দিতে দিতে আরও কয়েকবার দু'জনের দেখা হল। কিন্তু কেউ কিছু বললেন না, যতবার দেখা হল শুধু একটু হাসলেন।

আট পাক শেষ করতে করতে অন্ধকার আরও খানিকটা গাঢ় হয়েছে। অবশ্য চারিদিকে আলো রয়েছে অজস্র, তাই ততটা বোঝা যায় না। তবে হেমন্তের হাওয়া ঝপ করে আরও অনেকটাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বেশ শীত শীত লাগছে।

আজকের মতো ভ্রমণের রুটিনটা শেষ। পার্ক থেকে বেরুবার সময় একবার এধারে ওধারে তাকালেন অমলেশ। কিন্তু চারুলতাকে কোথাও দেখা গেল না।

'আকাশদীপ'-এ সিকিউরিটির বেশ কড়াকড়ি। গেটের কাছে তো বটেই, বিশাল হাই-রাইজটা ঘিরে কয়েকজন গার্ড সারাক্ষণই পাহারা দেয়। তিন শিফটে তাদের ডিউটি। আজকাল মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংগুলোতে নানারকম ক্রাইমের ঘটনা আকছার ঘটছে। খুন, ডাকাতি ইত্যাদি। তাই পাহারাদারির জোরালো ব্যবস্থা না করে উপায় নেই।

'আকাশদীপ'-এর যারা স্থায়ী বাসিন্দা তাদের কথা আলাদা। বাইরের অচেনা লোক হুট করে এখানে ঢুকতে পারে না। কার পেটের ভেতর কী অভিসন্ধি রয়েছে, মুখ দেখে তো বোঝা যায় না। অনেক জবাবদিহির পর গেটের পাহারাদার সন্তুষ্ট হলে তবেই এরা ভেতরে আসতে পারে।

পার্কের বাইরের রাস্তা পেরিয়ে 'আকাশদীপ'-এ চলে এলেন অমলেশ। যে মাঝবয়সী গার্ডটি গেটের কাছে টান টান দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁকে দেখে যান্ত্রিকভাবে একটু হাসল। অমলেশও হাসলেন।

গ্রাউন্ড ফ্লোরটা জুড়ে শুধুই গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। তার একধারে লিফট। অন্যমনস্কর মতো সেদিকে চলে গেলেন অমলেশ। চারুলতার সঙ্গে আজ হঠাৎই আলাপ। সামান্য, অতি সাধারণ দু-চারটে কথা হয়েছে। খুবই সৌজন্যমূলক। অবশ্য চারুলতা তাঁর সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখেন। বয়স্কা রূপসী মহিলাটির মুখ, তাঁর স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, কথা বলার ভঙ্গি, হাসি—সব

মিলিয়ে মৃদু সুগন্ধের মতো একটু ভালো লাগার রেশ মনের কোনও প্রান্তে যেন এখনও থেকে গেছে।

লিফটে করে পাঁচতলায় উঠে চাবি দিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকলেন অমলেশ। সব ঘরে এবং মাঝখানের সাজানো গোছানো মস্ত ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল-এ আলো জ্বলছে।

রোজ বিকেলে অমলেশের পার্কে বেরুবার আগে আগেই চলে আসে মালতী। রুটি, তরকারি, খুব কম তেল মশলা দিয়ে চিকেনের পাতলা ঝোল করে, সব হট-কেসে রেখে, দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে যায় সে। লকিং সিস্টেমে ওটা বন্ধ হয়ে যায়।

অমলেশের ফ্ল্যাটে দু'বেলার রান্না দু'বেলাই হয়। ওবেলা মাছ, ডাল, পেঁপে কি উচ্ছে সেদ্ধ, শুক্তো ইত্যাদি। দুপুরে কি রাত্তিরে টাটকা রান্না-করা খাবার তাঁর চাই।

সকালের দিকে ন'টা সাড়ে-ন'টায় চলে আসে মালতী। থাকে এগারোটা অবধি। তখন ফ্ল্যাটেই থাকেন অমলেশ। সেই সময়টা সারাক্ষণই তার সঙ্গ পান। রাঁধতে রাঁধতে একটু আধটু গল্পও করে মালতী। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। কষ্ট করে তাদের পড়াচ্ছে সে। ছেলেটা কলেজে পড়ে। মেয়েটা স্কুলের উঁচু ক্লাসে। মালতীর স্বপ্ন, ওদের যেভাবে হোক, মানুষ করে তুলবে। ছেলেটা একটা চাকরি বাকরি পেলে তার কষ্ট করা সার্থক হবে। ভালো পাত্র দেখে মেয়েটার বিয়ে দেবে। এইসব কথা রোজই বলে যায় মালতী। একঘেয়ে, মামুলি। তাছাড়া তাদের বস্তিতে কে কেমন মানুষ, তারা কতরকম ফন্দিবাজি করে সংসার চালায়—এমনি নানা গল্প। যত তুচ্ছই হোক, একটা মানুষের সঙ্গে তো কথা বলা যায়। সময়টা মন্দ কাটে না। বিকেলে অল্পক্ষণের জন্য তার সঙ্গে দেখা হয়। সন্ধের পর অমলেশ যখন পার্কে পাক খেয়ে ফিরে আসেন, মালতী ততক্ষণে চলে গেছে। অমলেশ তখন একেবারে একা। যতক্ষণ না ঘুম আসে তিনি পুরোপুরি বোবা। কথা বলার মতো কেউ তো থাকে না।

অন্যদিনের মতো ফ্ল্যাটে ঢুকে অমলেশ ড্রইংরুমের একটা সোফায় বসলেন। একটু দূরেই একটা স্ট্যান্ডের ওপর রঙিন টিভি'র সেট। সেটার সুইচ টিপে রিমোট কনট্রোলে চালিয়ে দিলেন।

আজকাল টিভিতে কত রকমের চ্যানেল। একশোরও বেশি। প্রতিটি চ্যানেলে রদ্দি মার্কা সিরিয়ালের পর সিরিয়াল। সেসব তিনি দেখেন না। তবে নানা চ্যানেলের নিউজ দেখেন। বি বি সি না দেখলে তাঁর ঘুম হয় না। তাছাড়া হিস্ট্রি চ্যানেল, ডিসকভারি—এসব তাঁর ভীষণ পছন্দের।

ন'টা অবধি নিউজ টিউজ দেখে টিভি বন্ধ করে দিলেন অমলেশ। তারপর বেডরুমের অ্যাটাচড্ বাথে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পালটে ফের হল-ঘরের ডাইনিং টেবলে। ডাক্তার সাড়ে ন'টার ভেতর ডিনার সেরে নিতে বলেছেন। ডাক্তারের নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকেন।

টিভি'র ভলিউম না কমিয়ে খাওয়ার টেবলে গিয়ে বসলেন অমলেশ। প্লেট, চামচ, জলের গেলাস, জাগ এবং হটকেস চমৎকার করে সাজিয়ে রেখে গেছে মালতী। তার কাজে লেশমাত্র খুঁত থাকে না।

ডাইনিং টেবল থেকেও টিভিটা দেখা যায়। যেসব প্রোগ্রাম অমলেশের খুবই প্রিয় সেগুলো আজকের মতো দেখা হয়ে গেছে। তবু যে ওটা চালিয়ে রেখেছেন তার কারণ একটাই। এই নির্জন, নিঝুম, বিশাল ফ্ল্যাটে রাত্রিবেলায় তাঁর সঙ্গী বলতে কেউ নেই। কিন্তু না-হোক জীবন্ত, তবু টিভির ওই মানুষগুলো চলাফেরা করছে, কথা বলছে—এসবই বা কম কী। মনে হয় ফ্ল্যাটে তিনি একা নন, আরও অনেকেই আছে। যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হয় টিভিটা চালুই থাকে।

খেতে খেতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার অমলেশের খেয়াল হল, পার্ক থেকে বেরিয়ে তিনি ফ্ল্যাটে এসেছেন, টিভি দেখেছেন, তারপর টিভির দিকে চোখ রেখেই খাচ্ছেন কিন্তু বারবার অন্য কোনও অদৃশ্য পর্দায় চারুলতার মুখটা ফুটে উঠছে।

খাওয়া শেষ হলে টিভি বন্ধ করে, হল-ঘরের লাইট নিভিয়ে নিজের বেডরুমে চলে এলেন অমলেশ। ডাক্তারের হুকুম, বেশি রাত করা চলবে না। এগারোটার ভেতরে শুয়ে পড়তে হবে।

শোবার ঘরটা ছিমছাম, যত্ন করে সাজানো। মাঝখানে একটা ডবল-বেড খাট, একদিকের দেওয়াল জোড়া ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবল ছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের ক্যাবিনেট। খাটের শিয়রের দিকে একটা ড্রয়ারওলা নিচু কাঠের আলমারি। মালতী একটা ছোট টিপয় টেবলের ওপর গেলাসে জল ভরে রেখে গেছে। অমলেশ ড্রয়ার খুলে ওষুধ বার করে খেয়ে নিলেন। এই সময় তাঁকে তিনটে ট্যাবলেট খেতে হয়, তার মধ্যে একটা ঘুমের।

ওষুধ খাওয়া হলে বিছানায় গিয়ে বসলেন তিনি। সুইচের দিকে হাত বাড়িয়ে ঘরের তেজী আলোটা নিবোতে যাবেন, ডান পাশের দেওয়ালে ললিতার ফোটোটা চোখে পড়ল। স্থির দৃষ্টিতে পলকহীন তাকিয়ে রইলেন তিনি।

বিয়েব আগে আগে ছবিটা তোলা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ওটা এনলার্জ করে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, চোখ-মুখ হাসিতে ঝলমল করছে। কত কাল আগের ছবি, কিন্তু এখনও জীবন্ত মনে হয়।

আশ্চর্য, আজ বিকেলে চারুলতার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ললিতার কথা একবারও মনে পড়েনি অমলেশের। চারুলতার মধ্যে কী এমন ম্যাজিক রয়েছে যা ক্ষণিকের জন্য হলেও ললিতাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল! নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হয় অমলেশের। রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ ফোটোর দিকে তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন অমলেশ। জোরালো আলোটা নিবিয়ে নাইট ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। নরম নীলাভ আলোয় ঘর ভরে গেল।

অন্যদিন শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়ে আসে। ওষুধ খাওয়ামাত্র স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে যায়। আজ কিন্তু ঘুম আসছে না। তাঁর চোখ বারবার চলে যাচ্ছে দেওয়ালের ফোটোটার দিকে। হালকা আলোতেও অমলেশ দেখতে পাচ্ছেন, ললিতা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

কখন যেন অদৃশ্য কোনও টাইম মেশিন তাঁকে তুলে নিল। উজান টানে পৌঁছে দিল সাইত্রিশ আটত্রিশ বছর আগের দিনগুলোতে।

পাইকপাড়ায় তখন থাকতেন অমলেশরা। অমলেশ, তাঁর মা এবং বাবা। তাঁর অন্য কোনও ভাইবোন ছিল না। তিনি এম. কম পাস করে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সির পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। ছোটখাটো একটা সেকেলে বাড়ি ছিল তাঁদের। বাবা স্টেট গভর্নমেন্টের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। মাঝারি ধরনের একজন অফিসার।

দারুণ ছাত্র ছিলেন অমলেশ। সেই স্কুল ফাইনাল থেকে চোখ-ধাঁধানো রেজাল্ট করে এসেছেন। পড়াশোনা এবং কেরিয়ার ছাড়া অন্য কোনও দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল না।

পাশের পাড়াতেই থাকত ললিতারা। তখন সে বি. এ পড়ছে। ছাত্রী বেশ ভালোই। সেও মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা একটা বড় জুট কোম্পানির হেড অফিসে কাজ করতেন। মা স্কুলের টিচার। ওদেরও একটা পুরনো বাড়ি ছিল। মা, বাবা, এক বিধবা পিসি আর ললিতা—এই নিয়ে তাদের ফ্যামিলি।

ললিতা সেই বয়সে ছিল খুব প্রাণবন্ত মেয়ে। লেখাপড়ায় মেধাবী হলেও শুধু বইয়ের পাতাতেই নিজেকে আটকে রাখেনি সে। হাসিখুশি, সপ্রতিভ। খেলাধুলোয় ছিল চৌকশ। ইন্টার-ইউনিভার্সিটি স্পোর্টসে একশো মিটার আর দু'শো মিটার দৌড়ে সে চ্যাম্পিয়ন। তাদের বাস্কেট টিম একবার চ্যাম্পিয়ন, দু'বার রানার্স-আপ হয়েছে। খবরের কাগজে খেলার পাতায় তার কত যে ছবি বেরিয়েছে! কাপ-মেডেলে দু'টো বড় কাচের আলমারি বোঝাই।

ললিতার সঙ্গে কীভাবে বইয়ের পোকার আলাপ হয়েছিল, এতকাল বাদে আর মনে নেই অমলেশের। মিশুকে আর সাবলীল মেয়ে। দারুণ হইচই করতে পারত। কথা বলত প্রচুর। হাসত তার চেয়েও বেশি। স্বচ্ছ, সুন্দর স্বভাব। তাকে দেখলে কোনও জলপ্রপাতের কথা মনে পড়ে যেত।

এই ললিতা কখন যে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, টেরও পাননি অমলেশ। কোনওরকম সংকোচ নেই। ললিতাও একদিন জানিয়েছিল সে তাঁকে ভালবাসে।

কোনও দিক থেকে বাধা আসেনি। দু'জনেরই মা-বাবা সম্পর্কটা খুশি হয়েই মেনে নিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল, চার্টার্ড অ্যাকাউটেন্ট হয়ে বেরুবার পর অমলেশ চাকরি নেবেন। এদিকে ললিতাও এম. এ পাস করবে। তারপর বিয়ে।

স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছিল। যা ঠিক করা হয়েছিল একসময় মসৃণভাবেই তা ঘটে গেল। ললিতা এম. এ পাস করল হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে। অমলেশও চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হয়ে একটা বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে উঁচু পোস্টে চাকরি পেয়ে গেলেন।

বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। দুই বাড়িতেই কেনাকাটা শেষ। পুরোদমে আয়োজন চলছে। সেই আমলে বড় বাড়ি বা হল টল ভাড়া নিয়ে বিয়ে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান খুব একটা হত না। কেটারিংয়েরও আজকালকার মতো এত রমরমা হয়নি। যে-যার বাড়িতে ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন।

অমলেশ আর ললিতাদের ছাদে ডেকরেটরদের দিয়ে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ চলছিল। পাশাপাশি পাড়ার এক বাড়িতে হবে বিয়ে, অন্য বাড়িতে বউ ভাত। দুই জায়গাতেই ওড়িয়া ঠাকুর দিয়ে ভোজ তৈরি করানো হবে। বসানো হবে ভিয়েন। তারও বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপানোও শেষ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গিয়ে সেসব দিয়ে আসাও শুরু হয়েছে। দুই বাড়িতেই নহবত বসানো হবে। তারও বায়না হয়ে গেছে।

অমলেশ বা ললিতাদের লোকবল কম। পাড়াপড়শিরা দু'জনকেই ভালবাসত। দুই বাড়িতেই খাটাখাটনির জন্য তারা হইহই করে এগিয়ে এসেছিল।

কিন্তু বিয়ের সপ্তাহখানেক আগে ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়েছে এমন ক'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে বাড়ি ফিরছিল ললিতা। পাড়ার কাছাকাছি এসে রাস্তা পেরুতে গিয়ে বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট। একটা বেপরোয়া লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিল সে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল সারা শরীর। লোকজন দৌড়ে এসে একদল ললিতাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ললিতাকে তারা চিনত। অন্য দলটা লরির ড্রাইভারকে বেধড়ক মেরে আধমরা করে ফেলে। তারপর লরিটায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

এমন একটা দুর্ঘটনার পর দুই বাড়িতেই গভীর বিষাদের ছায়া নেমে আসে। বিয়ের আয়োজন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। দু'জনেরই উৎকণ্ঠিত বাবা-মায়েরা এবং পাড়ার লোকজন সকাল-বিকেল হাসপাতালে দৌড়তে থাকে।

প্রথম দিকে ডাক্তাররা কোনও ভরসাই দেননি। দিন পাঁচেক মৃত্যুর সঙ্গে যুঝবার পর ধাক্কাটা খানিক সামলে ওঠে ললিতা। তার জ্ঞান ফেরে। ডাক্তার জানান, 'জীবনের ভয় নেই। কিন্তু—'

দু'জনের মা-বাবাই রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিন্তু কী?'

ডাক্তার বিমর্ষ মুখে বলেছেন, 'কোমর থেকে বডির নীচের দিকটা প্যারালিসিস হয়ে গেছে।'

'কী বলছেন!'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছেন ডাক্তার। আধফোটা গলায় বলেছেন, 'হ্যাঁ। ঠিকই বলছি।'

আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন দু'জনের মা-বাবা। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছেন, 'সারবে না?'

ডাক্তার ম্লান হেসেছেন।—'ডাক্তাররা কখনও না বলে না। এখনও পনেরো কুড়িদিন পেশেন্টকে হাসপাতালে রাখতে হবে। ডিসচার্জ করার পর বাড়িতে ফিজিওথেরাপি, ওষুধ ইঞ্জেকশন চলবে। একমাস পর পর চেক-আপ করিয়ে নিয়ে যাবেন। আপনাদের হাউস ফিজিসিয়ান আছেন নিশ্চয়ই?'

'আছেন!'

'তাঁর সঙ্গেও কনসাল্ট করবেন।'

পুরোপুরি সেরে উঠে কতদিন বাদে আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে ললিতা, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি ডাক্তার।

ললিতাকে বাড়ি নিয়ে আসার পর শুধু হাউস-ফিজিসিয়ানই না, আরও কয়েকজন স্পেশালিস্টকেও দেখানো হয়েছিল। কেউই তেমন ভরসা দেননি। হাসপাতালের ডাক্তার যা বলেছিলেন তাঁরাও তাই বলেছেন।

এদিকে অমলেশের চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছে। ললিতাকে নিয়ে মনে মনে যে স্বপ্নের মিনার তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা প্রায় ধুলিসাৎ। তবু আশা ছাড়েননি অমলেশ। ললিতাই তাঁর সর্বস্ব। রোজ অফিসের সময়টুকু ছাড়া কয়েক ঘণ্টা তিনি ললিতার খাটের পাশে বসে থাকতেন। তাকে নানাভাবে সাহস যোগাতেন।

ফিজিথেরাপি আর তেজী ওষুধের জোরে মাস ছয়েক বাদে পায়ের আঙুল খুব সামান্য নাড়তে পারল ললিতা।

ডাক্তাররা তাকে নিয়মিত দেখছিলেন। বলেছেন, 'এই পর্যন্তই। এর বেশি আর উন্নতির আশা নেই।'

ললিতার মা-বাবা জিজ্ঞেস করেছেন, 'তার মানে ললিকে বাকি জীবন এভাবেই বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে?' তাঁদের কণ্ঠস্বর হতাশার শেষ প্রান্ত থেকে যেন উঠে এসেছিল।

ডাক্তাররা উত্তর দেননি।

আরও কয়েক মাস কেটে যায়। অমলেশ রোজই যেমন আসছেন তেমনি আসতে লাগলেন। ললিতার খাটের পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সঙ্গ দিয়ে যেতেন।

কখনও এর হেরফের ঘটেনি।

হঠাৎ একদিন ললিতা বলেছিল, 'তোমাকে একটা কথা বলব?'

অমলেশ উৎসুক চোখে তার দিকে তাকিয়েছেন।

—'বল।'

'আমি আর ভালো হব না। এইভাবেই পঙ্গু হয়ে থাকতে হব। আমার জন্যে—' বলতে বলতে চুপ করে গিয়েছিল ললিতা।

'তোমার জন্যে কী?'

'নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিয়ো না।'

'এর মানে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেছে ললিতা। তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার অমলেশের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিচু গলায় বলেছিল, 'তুমি অন্য কোনও মেয়েকে বিয়ে কর।'

চমকে উঠেছেন অমলেশ।—'এ তুমি কী বলছ! স্ত্রী হিসেবে তোমাকে ছাড়া অন্য কারওকে আমি ভাবতে পারি না।'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ললিতা অধীরভাবে বলেছে, 'এ হয় না, এ হয় না, হতে পারে না।'

অমলেশ তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিতে নিতে বলেছেন, 'কেন হয় না ললিতা?'

ললিতার অধীরতা কমেনি, বরং আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। অমলেশের হাত থেকে নিজের হাতটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে সে বলেছে, 'কেন হয় না, বুঝতে পারো না? তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছুই নেই।'

ললিতা কী ইঙ্গিত দিয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি অমলেশের। তিনি বলেছেন, 'যেটুকু পাব, তাতেই আমি খুশি। তার বেশি আর কিছু চাই না ললি।'

অমলেশের মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, সবাই তাঁকে বুঝিয়েছে, আবেগের বশে একটা পঙ্গু মেয়ে, যার শরীরের নিচের দিকটা পক্ষাঘাতে অসাড়, তাকে নিয়ে সমস্ত জীবন কাটানো অসম্ভব। বিয়ের মধ্যে মানসিক একটা দিক নিশ্চয়ই থাকে, শারীরিক দিকটা উপেক্ষা করার ব্যাপার নয়, বিশেষ করে যুবা-বয়সে। এমনকী ললিতার মা-বাবাও তাঁকে আলাদাভাবে ডেকে বলেছেন, 'তুমি অন্য কারওকে বিয়ে কর বাবা।' নানা যুক্তির অবতারণা করে বুঝিয়েছেন, এ বিয়ে হলে পরে আক্ষেপের অবধি থাকবে না। মনে হবে মাথার ওপর একটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ।

অমলেশ বলেছেন, 'ধরুন, বিয়ের পর যদি অ্যাক্সিডেন্টটা হত, আমি কি ললিকে ফেলে দিতে পারতাম?'

ললিতার মা-বাবা হকচকিয়ে গেছেন। এ-দিকটা তাঁরা ভেবে দেখেননি। সত্যিই তো, বিয়ের পর দুর্ঘটনাটা ঘটলে কী হত? তাঁরা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়েই থেকেছেন। কোনও জবাব দিতে পারেননি।

এত বাধা, এত আপত্তি, কিছুই টলাতে পারেনি অমলেশকে। যে-মেয়েটিকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসেন, যে তাঁর শ্বাসবায়ুতে জড়িয়ে আছে, সে ছাড়া তাঁর জীবনে অন্য কোনও মেয়ে আসবে, এটা ভাবতেই পারতেন না তিনি।

শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তেই অবিচল থেকেছেন অমলেশ। অ্যাক্সিডেন্টের ঠিক এক বছর বাদে ললিতাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। আগের বার যেভাবে আয়োজন করার কথা ভাবা হয়েছিল, এবার জাঁকজমকটা তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রচুর আলো জ্বলেছিল, তিনদিন ধরে সানাই বাজানো হয়েছিল, ভোজের এলাহি ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা আগের চেয়ে দেড়গুণ। বিয়েটা হেলাফেলা করে করা হচ্ছে, এটা যেন কোনওভাবেই ললিতা বুঝতে না পারে, সে ব্যাপারে লক্ষ্য ছিল অমলেশের। কোথাও এতটুকু খুঁত রাখেননি তিনি।

অমলেশের মনে পড়ে, ফুলশয্যার রাতে বাড়ি যখন প্রায় নিঝুম, নিমন্ত্রিতেরা চলে গেছে, সানাইয়ের সুর বন্ধ, অজস্র ফুল দিয়ে সাজানো মেহগনি কাঠের খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে

বসে ছিল ললিতা। একটা লাল বেনারসি পরনে, সারা গায়ে ফুলের আর জড়োয়া গয়না, সিঁথিতে সিঁদুরের লম্বা টান, কপালে সিঁদুরের টিপ। ফুলের আর সেন্টের গন্ধে ঘর ম ম করছে।

শরীরের ওপরের দিকটা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। সেদিকে তাকালে বোঝাই যায় না, নিচের অংশটা পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট। মাথা থেকে কোমর অবধি কী সুন্দরই না তাকে দেখাচ্ছিল। মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছেন অমলেশ। একসময় ধীরে ধীরে স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসেছিলেন।

ললিতা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী দেখছ অত?'

অমলেশ গাঢ় স্বরে বলেছেন, 'তোমাকে—'

ললিতা বলেছে, 'জেদ ধরে তো বিয়েটা করলে কিন্তু কিছুই তো পাবে না।'

অমলেশ বলেছেন, 'একটা বছর এমন কথা নানাজনের কাছে শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আজকের দিনে তুমি আর সেটা বোলো না।' একটু থেমে ফের বলেছেন, 'পাওয়ার কথা বললে না? আমি কিন্তু সবটাই পেয়েছি।'

'সবটা কী পেয়েছ!' বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিল ললিতা।

অমলেশ বলেছেন, 'তোমাকে।'

এরপর তাঁদের বিবাহিত জীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল। অফিসের সময়টুকু বাদে বাকি দিনটা এবং রাতটা সারাক্ষণ অমলেশ স্ত্রীর কাছেই থাকতেন। নানারকম গল্প করতেন, একসঙ্গে টিভিতে সিনেমা দেখতেন। অফিস ছাড়া বাইরের জীবন বলতে কিছুই আর রইল না। ছেলেবেলা থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধব কম; আত্মীয় পরিজনদের বাড়িও বিশেষ যেতেন না। অল্প যে ক'জন বন্ধু ছিল তাদের আরও দূরে সরিয়ে দিলেন। আত্মীয়রা অমলেশদের বাড়ি বিশেষ আসত না। তবে তাদের নানা মন্তব্য বাতাসে ভাসতে ভাসতে তাঁদের কাছে পৌঁছে যেত।

'এমন বিদঘুটে বিয়ে জীবনে কখনও দেখিনি। অমলেশের মতো এত ভালো একটা ছেলে লাইফটা পুরোপুরি নষ্ট করে দিল।'

নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছিলেন অমলেশ। পৃথিবীর কে কী বলল তা আদৌ গ্রাহ্য করতেন না তিনি। নিজে তো সঙ্গ দিতেনই, ফিজিওথেরাপিস্টও দু'বেলা আসত। একটা আয়াও রেখে দিয়েছিলেন। যখন তিনি অফিসে সেই সময়টা আয়া ললিতার কাছে কাছে থাকত। তাছাড়া মা-বাবা তো ছিলেনই। পাশের পাড়া থেকে ললিতার মা-বাবাও রোজ আসতেন।

সময় কাটতে থাকে তার নিজস্ব নিয়মে। পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে মুহূর্তের জন্যও ছেদ পড়ে না।

ললিতাকে ভালোবাসেন অমলেশ, খুবই ভালোবাসেন। তাকে পেয়েওছেন, একরকম জেদ ধরেই নিজের করে নিয়েছেন। কিন্তু ললিতা বা আত্মীয়স্বজনরা স্থূল জৈব ব্যাপারটা সম্পর্কে যে ইঙ্গিতটা দিয়েছিল, প্রথম প্রথম তা গ্রাহ্য করেন নি তিনি। পরে মনে হতে লাগল, শরীরটা তুচ্ছ করার মতো ব্যাপার নয়। একটি পরিপূর্ণ তরুণী যার ওপর দিকটা সুস্থ, নিচের অংশটা অসাড়, যার কাছ থেকে পেয়েছেন অনেক কিছুই, কিন্তু না-পাওয়ার দিকটাও তো কম নয়। কোনও কোনও দিন রাত্তিরে ললিতার পাশে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসত না অমলেশের। শিরায় স্নায়ুতে আগুন ছুটতে থাকত। উত্তেজনায় শরীর আনচান করত। বিছানা থেকে উঠে পড়তেন, ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন। তারপর স্নায়ুমণ্ডলী কিছুটা শান্ত হলে জল খেয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়তেন। পাশে ললিতার চোখ তখন বোজা। মনে হত সে ঘুমোচ্ছে।

একদিন রাত্রে, সবেমাত্র শুয়েছেন, ললিতা হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'তোমাকে কিন্তু আগেই বলেছিলাম, তুমি অন্য কারওকে বিয়ে কর। শুনলে না।'

হতচকিত অমলেশ বলে উঠেছেন, 'না না, এভাবে বোলো না ললি।'

'রোজ রোজ উঠে গিয়ে সারা ঘরে ঘোরাঘুরি কর। জোর করে এই কষ্টটা নিজের জীবনে টেনে আনলে। আমার কী খারাপ যে লাগে! নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। ভাবি আরও বেশি করে বাধা দিয়ে কেন এই বিয়েটা আটকালাম না—' বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছে।

ললিতা যে ঘুমোয়নি, মধ্যরাতে তাঁর গতিবিধি লক্ষ করেছে, আগে টের পাননি অমলেশ। তিনি চমকে উঠেছেন। খুবই অনুতপ্ত, অত্যন্ত বিচলিত। দু'হাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, 'কেঁদো না ললি, প্লিজ কেঁদো না। বিশ্বাস কর, তোমাকে পেয়ে আমি সুখী।'

ললিতার কান্না থামেনি। সে বলেছে, 'আমার মধ্যে কিছু নেই। একটা ছিবড়ের মতো বিছানায় পড়ে থাকি। এমন মেয়েকে নিয়ে কি সারাজীবন কাটানো যায়? আমাকে মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও। যেদিন বলবে, সেদিনই তোমাকে ডিভোর্স দেব।'

বুকের মধ্যে শেল বিঁধে গিয়েছিল অমলেশের। সমানে না না করে গেছেন তিনি।—'এমন কথা আর কখনও মুখে আনবে না। তোমাকে ছাড়া একদিনও আমি বাঁচব না।'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্ত্রীকে শান্ত করেছিলেন অমলেশ।

বিয়ের দু'বছরের মাথায় ললিতার বাবা হঠাৎই মারা গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে তার মা-ও। মৃত্যু যেন দুই পরিবারের জন্য ওত পেতে বসেছিল। আরও মাস ছয়েক বাদে অমলেশের বাবাও চলে গেলেন।

পাইকপাড়া আর ভালো লাগছিল না অমলেশদের। ললিতার মা-বাবর মৃত্যুর পর বাড়িটা সে-ই পেয়েছিল। সেই বাড়ি এবং নিজেদের বাড়ি বিক্রি করে 'ড্রিম গার্ডেন'-এ চলে এলেন অমলেশরা। এখানে আসার পর দৈনন্দিন রুটিন কোনও হেরফের নেই। অফিসের কাজ শেষ হলে ফ্ল্যাটে ফিরে সঙ্গ দেওয়া, গল্প করা, একসঙ্গে টিভি দেখা। পাইকপাড়ার মতো এখানেও আয়া রাখা হয়েছিল। ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অমলেশের মা স্বর্ণময়ী চিরদিনই শান্ত ধরনের মানুষ। তাঁর উপস্থিতি অনেকটা ছায়ার মতো। বাড়িতে আছেন, বোঝাই যেত না। অমলেশের বাবার মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছিলেন। জপতপ পুজো, এইসব নিয়েই দিন কাটিয়ে দিতেন।

এদিকে ললিতার মধ্যে দ্রুত কিছু পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। কান্নাকাটি আর করত না। মাঝে মাঝে বলত, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়ে আমার মতো একটা মেয়েকে খুব তো মহত্ত্ব দেখিয়ে বিয়ে করলে। মুখে স্বীকার করছ না, কিন্তু মনে মনে এখন নিশ্চয়ই আপশোশ হচ্ছে, কী ভুলটাই না করেছি—' বলে নিঃশব্দে হেসে উঠেছে। সেই হাসিতে যতখানি শ্লেষ, হয়তো ততটাই বিষাদ মেশানো।

করুণ মুখে অমলেশ বলতেন, 'আ ললি, কী পাগলামো হচ্ছে।'

কোনও দিন হয়ত ললিতা বলত, 'আমি তোমাকে ঠকিয়েছি। কিন্তু আর কোনও উপায় নেই। মা-বাবা মারা গেছেন, এখন যদি ডিভোর্সও দিতে চাও, কোথায় গিয়ে উঠব? যাবার তো আর জায়গা নেই। তোমার কাঁধেই ঝুলে থাকব।'

হয়তো প্রবল অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করেছিল ললিতা। দিনরাত একই চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছিল। তার ধারণা সে অমলেশের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। মানসিক সংকটে ভুগতে শুরু করেছিল সে। তার তীব্রতা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।

অমলেশ সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছেন। স্ত্রীকে সবসময় আনন্দ ভরপুর করে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু উন্নতি তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

'ড্রিম গার্ডেন'-এ আসার বছর দু'য়েকের মধ্যে মা মারা গেলেন। ছায়ার মতো নিঃশব্দ মানুষটি চার পাঁচদিনের জ্বরে ছায়ার মতোই বিলীন হয়ে গেলেন। কারওকে ভোগালেন না, নিজেও ভুগলেন না। অমলেশের জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে গেল।

এদিকে শত চেষ্টাতেও ললিতাকে স্বাভাবিক করে তোলা গেল না। ক্রমশ শরীর ভাঙতে লাগল তার, অকালেই চুল সাদা হয়ে গেল। চোখের কোণে কালি। কণ্ঠাব হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, গাল ঢুকে গেছে, কপালে সরু সরু দাগের মতো বুড়িয়ে যাবার বলিরেখা। যে ক্লেশ, যে যন্ত্রণা ঘুণপোকার মতো ললিতার শরীর-মন ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিল তা কোনও ওষুধ বা সাইকিয়াট্রিস্টের সাধ্য ছিল না ঠেকিয়ে রাখে।

শরীর এমনই শীর্ণ আর নির্জীব হয়ে পড়েছিল যে ক্রমশ বিছানায় মিশে যাচ্ছিল ললিতা। অমলেশের দিকে থেকে যত্নের কোনও ত্রুটি ছিল না। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য জলের মতো টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই তাকে বাঁচানো গেল না। সাত বছর আগে সব শেষ হয়ে গেল।

ললিতার মৃত্যু অমলেশকে ভেঙে যেন চুরমার করে দিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরুতেন না, রাত্তিরে ঘুম আসত না, খেতে ইচ্ছে করত না। সমস্ত শহরে যখন ঘুমের আরকে ডুবে আছে, তখন জানালার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে বসে থাকতেন। অমলেশ সেইসময় সারাক্ষণ মুহ্যমান, বিষাদগ্রস্ত। তার মধ্যেই একটা স্ট্রোক হয়ে গেল তাঁর। কীভাবে অফিসের কলিগরা খবর পেয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। নাম-করা, অভিজ্ঞ হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ। তিনিই তাঁকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তুললেন। তবে তাঁর চলাফেরা, খাওয়া দাওয়ার ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।

শোক বা ক্লেশের তীব্রতা চিরকাল একইরকম থাকে না। ক্রমশ সব সন্তাপ জুড়িয়ে আসে।

স্ত্রীর মৃত্যুর সময় অমলেশের বয়স তিপান্ন। রিটায়ারমেন্টের তখনও সাত বছর বাকি। কিন্তু ভি আর এস নিয়ে নিলেন। স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়া। অফিস এবং সহকর্মীরা তাঁকে ছাড়তে চাননি কিন্তু তিনি কারও কথা শোনেননি। ললিতা চলে যাবার পর খরচ শতকরা আশি ভাগ কমে গিয়েছিল। তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন বলতে কিছু ওষুধ আর মাঝে মাঝে ডাক্তারের ভিজিট। একজন মানুষের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে হলে কত টাকা চাই? ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে বিপুল অর্থ পেয়েছিলেন অমলেশ। ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে যে ইন্টারেস্ট পাওয়া যাচ্ছে, তাঁর পক্ষে তা যথেষ্ট।

একটা উইলও করে রেখেছেন অমলেশ। তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাঙ্কের গচ্ছিত সব টাকা পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ম্যাড়মেড়ে, নিঃসঙ্গ, প্রতিটি দিনই তাঁর কাছে একরকম। একটা দিন যেন আর-একটা দিনের হুবহু ফোটোকপি।

কিন্তু কতকাল বাদে এই ষাট বছর বয়সে চারুলতার সঙ্গে দেখা হল। সামান্য দু-চারটে কথা। নেহাতই সৌজন্যমূলক। তবু রূপসী, বয়স্কা মহিলাটি তাঁর মনে হালকা একটা ছাপ রেখে গেছেন যেন। দেওয়ালে আটকানো ছবিতে প্রাণবন্ত, উচ্ছল ললিতাকে দেখতে দেখতে চারুলতাকে তাঁর ভাবনা থেকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন অমলেশ। এবার আর জেগে থাকা গেল না। দু'চোখ ঘুমে জুড়ে এল।

পরদিন সকালে ওঠার পর দৈনন্দিন রুটিন শুরু হয়ে গেল অমলেশের। মুখটুখ ধোয়ার পর অন্যদিনের মতো নিজের হাতে চা করে, দু' স্লাইস পাউরুটি সেঁকে নিলেন। চা খেতে খেতে

দু'খানা খবরের কাগজ এসে গেল। একটা বাংলা, একটা ইংরেজি। চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ না হলে তাঁর চলে না।

কাগজ পড়া শেষ হতে না-হতেই দুধ এল। একটা লোক ঠিক করা আছে। রোজ সকালে সে দুধ তো আনেই, বাজারও করে দেয়। ফল আনাজ মাছ চিকেন—যা যা আনতে হবে তার একটা লিস্ট করে কেনাকাটার জন্য টাকাও দিলেন। তার নাম সুবল। সুবল খুবই কাজের লোক। মাঝবয়সী। অত্যন্ত বিশ্বাসী। মাসে দু'বার তাকে ব্যাঙ্কে পাঠান অমলেশ। সে টাকা তুলে এনে দেয়। তাছাড়া লন্ড্রিতে যাওয়া, ওষুধ কেনা, এমনি টুকিটাকি বাইরের নানা কাজও করে দেয় সে।

সুবল বাজারের থলে নিয়ে চলে গেল। ফের কিছুক্ষণ কাগজ পড়ে টিভি'র নিউজ দেখতে লাগলেন অমলেশ।

আজ সোয়া ন'টায় মালতী এল। তার পরপরই বাজার করে দিয়ে গেল সুবল।

মালতীর প্রথম কাজটা হল দুধ জ্বাল দিয়ে এক কাপ দুধ আর কর্নফ্লেকস অমলেশকে দেওয়া। আজও দিল সে। তারপর ক্ষিপ্র হাতে ঘরটা পরিষ্কার করে রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

এগারোটা অবধি টিভি দেখে স্নান করতে গেলেন অমলেশ। বারোটায় দুপুরেব খাওয়া শেষ করে ফের দু'টো ট্যাবলেট। ডাক্তারের হুকুম, দিবানিদ্রা একেবারেই চলবে না। দুপুরের ঘুমে শরীরে মেদ জমে। যাদের হার্টের রোগ তাদের পক্ষে বাড়তি মেদ খুবই ক্ষতিকর। তবে বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা যেতে পারে।

রান্নাবান্না শেষ হলেই মালতী তার খাবার একটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে নিয়ে চলে যায়। আজও গেছে।

বিকেল না হওয়া অবধি লঘু ধরনের কিছু বই টই পড়ে কাটিয়ে দিলেন অমলেশ। কাল রাত্তিরে মাথা থেকে চারুলতার চিন্তাটা বার করে দিয়েছিলেন কিন্তু আজ ব্রেকফাস্ট করেছেন, খবরের কাগজ পড়েছেন, টিভি'র নিউজ দেখেছেন, স্নান করে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে বিশ্রাম করতে করতে আবছাভাবে চারুলতা তাঁর ভাবনায় ফের ঘোরাফেরা করতে লাগলেন।

সুন্দরী মহিলা অনেক দেখেছেন অমলেশ। তাঁদের অফিসেও এমন কিছু সহকর্মিণী ছিল যাদের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যেত না। ললিতা যখন দীর্ঘদিন ধরে রোগশয্যায় পড়ে আছে, সহানুভূতি দেখানোর ছলে তাদের অনেকে অমলেশের ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। ললিতা যখন থাকবে না তখন এদের কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে বাকি জীবনের জন্য জড়িয়ে যেতে প্রস্তুত, এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে কিন্তু সেসব নিয়ে কখনও তিনি মাথা ঘামাননি। ললিতা ছাড়া অন্য কারও কথা এতকাল ভাবেননি। ললিতা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তো বটেই, সে চলে যাবার পরও তার স্মৃতির মধ্যে তিনি মগ্ন হয়ে থেকেছেন।

কিন্তু জীবনের এই শেষ বেলায় চারুলতা কেমন যেন নাড়া দিয়ে গেছেন। তুচ্ছ একটা ঘটনা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেও যেন পারা যাচ্ছে না।

সাড়ে চারটে বাজলে মালতী এসে হাজির। অমলেশ বললেন, 'তাড়াতাড়ি চা করে দে। খেয়ে বেড়াতে বেরুব।'

মালতী জানে না, সামনের ওই পার্কটা অমলেশকে সমানে চুম্বকের মতো টানতে শুরু করেছে।

চা খেয়ে পার্কে যখন অমলেশ এলেন, অনেকেই এর মধ্যে এসে গেছে। ভ্রমণকারীরা কেউ খুব আস্তে আস্তে, কেউ মাঝারি স্পিডে, কেউ বা ঝড়ের গতিতে পা চালিয়ে পাক দিচ্ছে। তাদের ডাক্তাররা যেমন নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবেই তারা হাঁটছে।

অমলেশও স্বাস্থ্যান্বেষীদের ঝাঁকে মিশে হাঁটা শুরু করলেন। আর নিজের অজান্তেই বুঝিবা উৎসুক চোখে লক্ষ করতে লাগলেন, কিন্তু না, যাঁকে খুঁজছেন তাঁকে কোথাও দেখা গেল না।

এক চক্কর ঘোরার পর যখন তিনি দ্বিতীয় পাকটি দিচ্ছেন সেই সময় পেছন থেকে চারুলতার গলা কানে এল, 'অমলেশবাবু—'

সারা শরীরে চমকে খেলে গেল যেন। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন অমলেশ। চারুলতা ততক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছেন। বললেন, 'অন্যদিন আমি চারটে বাজতে না-বাজতেই এসে পড়ি। আজ বেশ দেরি হয়ে গেল। আপনি কখন এসেছেন?'

অমলেশ বললেন, 'খানিকক্ষণ আগে। এক পাক ঘোরা হয়ে গেছে।'

'দু'পাকের পর তো আপনার কিছুক্ষণ রেস্ট নেবার কথা! চলুন, একটা পাক একসঙ্গে ঘোরা যাক। তারপর আপনি বসবেন। আমি সেকেন্ড পাকটা দিয়ে বসব। কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে দু'জনে একসঙ্গে বাকি পাকগুলো দেব।' একটু থেমে কী ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার আপত্তি নেই তো?'

'না। কিসের আপত্তি?'

দু'জনে সেইমতো পার্কের চারপাশে শেষ ছ'চক্কর ঘুরলেন। হাঁটার সময় বেশি কথা হয়নি। এতটা পথ ঘুরতে ঘুরতে সন্ধে নেমে গেল।

চারুলতা বললেন, 'কাল আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর চারুলতা বললেন, 'ঠিক সাড়ে চারটেয় যদি আমরা এখানে আসি, একসঙ্গে সবগুলো পাক ঘুরতে পারি।'

অমলেশ বললেন, 'আমি কাল থেকে ঠিক সাড়ে চারটের সময় চলে আসব।'

সকালের চা'টা নিজের হাতেই করে নেন অমলেশ। কিন্তু বিকেলে কেমন যেন আলস্য লাগে। মালতী এবেলা আসে সাড়ে চারটে কি পৌনে পাঁচটায়। সে আসবে, চা করবে, সেই চা খেয়ে তিনি যখন বেড়াতে বেরুবেন, পৌনে পাঁচটা কি পাঁচটা বেজে যাবে। ওদিকে চারুলতা ঠিক সাড়ে চারটেয় এসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন। তাই আজ থেকে ঠিক চারটেয় নিজেই বিকেলের চা তৈরি করে, খেয়ে, যখন পার্কে এলেন তখনও সাড়ে চারটে বাজেনি। পাক্কা দু'মিনিট বাকি।

চারুলতা এলেন একটু পরেই। হেসে হেসে বললেন, 'বা, একেবারে ব্রিটিশ পাংচুয়ালিটি। সাড়ে চারটে তো ঠিক সাড়ে চারটে।'

অমলেশও হাসলেন,—'পাছে লেট হই তাই দু'মিনিট আগেই চলে এসেছি।'

'চলুন। হাঁটা যাক—'

সেই যে একসঙ্গে ভ্রমণ শুরু হল সেটা দু'জনের দৈনন্দিন রুটিনে ঢুকে গেল।

হাঁটাতে হাঁটতে চারুলতাও তাঁর জীবনের কথা জানাতে লাগলেন। একদিনে নয়, টুকরো টুকরো ভাবে, বেশ কিছুদিন ধরে। তাঁর স্বামী মল্লিনাথ সেন ছিলেন স্টেট গভর্নমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। চারুলতা একটা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে হিস্ট্রি পড়াতেন।

তাঁদের একমাত্র ছেলে রণো—যার ভালো নাম রণজয়। দাম্পত্য জীবন ছিল খুবই সুখের। কিন্তু হঠাৎ ধরা পড়ল মল্লিনাথের বোন-ক্যানসার। রোগটা এমন একটা স্টেজে পৌঁছেছে যে করার কিছু ছিল না। ছ'মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল। রণোর বয়স তখন ছয়।

চারুলতা একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। রণোর মুখের দিকে তাকিয়ে এত বড় শোকের আঘাত সামলে নিতে চাইলেন। সময় একটু লাগল, ভেতরে ভেতরে অবিরল কষ্টটা চলতেই থাকল কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। রণোকে মানুষ করে তুলতে হবে। মানসিক ক্লেশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে চলবে না।

বিয়ের পর কেয়াতলার একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন চারুলতারা। মল্লিনাথের মৃত্যুর পরও সেখানেই থেকে গেলেন তিনি। কেননা রণো কাছাকাছি একটা কো-এড স্কুলে পড়ত। চারুলতার স্কুলও ওখান থেকে খুব দূরে নয়। তিনি পড়াতেন মেয়েদের স্কুলে।

হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর বাঙ্গালোরে একটা নাম-করা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রণোকে ভর্তি করে দিলেন চারুলতা। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি পাওয়ার পর ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টে দিল্লির একটা মাল্টি-ন্যাশানাল ফার্মে ভালো চাকরি পেয়ে রণো সেখানে চলে গেল। বছরে বার দুই এসে দু'সপ্তাহ করে মায়ের কাছে থেকে যায়।

ওদিকে কেয়াতলার বাড়িটা ছিল পুরনো। বাড়িওলা সেটা একজন প্রমোটারকে বিক্রি করে দেয়। সেকেলে বিল্ডিং ভেঙে তারা একটা হাই-রাইজ তুলেছে। সেখানে তারা চারুলতাকে ফ্ল্যাট দেয়নি; তবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কয়েক লাখ টাকা দিয়েছিল।

সেই টাকার সঙ্গে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে 'জয়-জয়ন্তী'র একটা বারো শো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট কিনে 'ড্রিম গার্ডেন'-এ চলে এসেছেন চারুলতা। লোন শোধ করার পর স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। ব্যাঙ্কে জমানো তেমন কিছু নেই। রণো অবশ্য মাসে প্রচুর টাকা পাঠায়। আর্থিক দুর্ভাবনা তাঁর নেই। তবে অন্য একটা কষ্ট আছে।

স্বামী নেই। আঠারো বছর বয়সে রণো বাঙ্গালোরে চলে যায়, তারপর সেখান থেকে দিল্লিতে রয়েছে। এখন তার বয়স সাতাশ। ন'টা বছর একা-একাই কাটছে চারুলতার। অনেকটা অমলেশের মতোই।

রণো ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় আসার জন্য বহুদিন ধরে কোম্পানির কর্তাদের ধরাধরি করেছে কিন্তু তাঁরা রাজি নন। আরও সাত বছর রণোকে দিল্লিতে থাকতে হবে। তারপর কলকাতায় বদলির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

সময় এইভাবেই কেটে যাচ্ছে। বিকেল হলেই পার্কটা যেন অমলেশকে প্রবল আকর্ষণে টানতে থাকে। চারুলতার সঙ্গে দেড় দু'ঘণ্টা একটা নেশার ঘোরে কেটে যায়।

'আকাশদীপ'-এ ফিরে রাত্তিরের খাওয়া চুকিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যখন ফোটোতে ললিতার হাসিভরা উজ্জ্বল মুখের দিকে চোখ চলে যায়, একটু যেন বিব্রত বোধ করেন অমলেশ। কৈফিয়ৎ পেশ করার ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে বলেন, 'সারাটা জীবন তোমাকে নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছি। মৃত্যুর পরও তুমিই আমার সর্বস্ব। একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। খানিকটা সময় তার সঙ্গে কাটাই। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।' বলেন বটে, তবু মনে হয় কোথায় যেন একটা খিঁচ থেকে গেল।

একদিন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চারুলতা বললেন, 'বেশ কিছুদিন আলাপ হল কিন্তু আমরা কেউ কারও বাড়ি যাইনি। আজ হাঁটাহাঁটির পর আমাদের ফ্ল্যাটে চলুন না, একা একা

থাকি। কাঁহাতক আর টিভি দেখে সময় কাটানো যায়!' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'যাবেন?'

অমলেশ চমকে ওঠেন। তীক্ষ্ণ চোখে চারুলতার দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকেন। এই বয়সেও সদ্য কিশোরীর মতো সরল, নিষ্পাপ মুখ। কোনওরকম অভিসন্ধিই চোখে পড়ে না। কুণ্ঠিতভাবে তিনি শুধু বলেন, 'কিন্তু—'

চারুলতাও অমলেশকে লক্ষ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'আপনি একা থাকেন। আমার পক্ষে কি যাওয়া ঠিক হবে?'

চারুলতা মৃদু শব্দ করে হেসে ওঠেন।—'অসুবিধেটা কোথায়?'

'কেউ কিছু ভাবতে পারে।'

কৌতুকে দু'চোখ ঝিকমিক করতে থাকে চারুলতার। মজার সুরে বলেন, 'বুড়ো বুড়িরা কী বলছে, কী করছে, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। কারও অত সময় নেই।'

দ্বিধাগ্রস্তের মতো অমলেশ বললেন, 'আচ্ছা, চলুন—'

'জয়-জয়ন্তী' বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে চারুলতাদের ফ্ল্যাটটার পুব দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক খোলা। উত্তর দিকে একটা উঁচু বাড়ি উঠেছে, তাই ওধারটা একটু চাপা।

ভেতরে ঢুকে সব আলো জ্বালিয়ে দিলেন চারুলতা। এই ধরনের ফ্ল্যাট যেমন হয়, ঠিক তেমনটাই। একটা বড় হল-এর মতো জায়গা ঘিরে বেডরুম, কিচেন ইত্যাদি। হলটার একধারে সোফা টোফা দিয়ে সাজানো বসার ব্যবস্থা, আর-এক ধারে খাওয়ার টেবল। তাছাড়া কাচ দিয়ে ঘেরা ক্যাবিনেটে শ্বেত পাথর, পেতল এবং কাঠের গণেশ, নটরাজ আর যক্ষিণী মূর্তি ছাড়াও নানারকম সামুদ্রিক শঙ্খ, নটিলাস, ট্রোকাস ইত্যাদি রয়েছে। রয়েছে বইয়ের র‍্যাক। হলের কোণে কোণে বিচিত্র স· ক্যাকটাস, বনসাই। দরজায় জানালায় দামি পর্দা! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হল-ঘরে অমলেশকে বসিয়ে চারুলতা চা করে নিয়ে এলেন।

চা খেতে খেতে এলোমেলো কথা হতে লাগল। চারুলতা জানালেন তাঁদের বিল্ডিংয়ের অন্য বাসিন্দারা খুবই নিস্পৃহ, আত্মকেন্দ্রিক, যে-যার নিজেকে নিয়ে আছে। কেউ কারও ফ্ল্যাটে যায় না। প্যাসেজে কি লিফটে দেখা হলে 'কেমন আছেন', 'ভালো আছি' জাতীয় দু-একটা কথা। ব্যস, সম্পর্ক এর বেশি এগোয় না।

অমলেশ বললেন, 'আমাদের বিল্ডিংয়েরও একই হাল।'

চারুলতা বললেন, 'মানুষ যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে আজকাল। নিজের ফ্যামিলিটুকু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চায় না। এক-এক সময় হাঁপিয়ে উঠি। চারপাশে এত লোকজন। তবু মনে হয় নির্জন আইল্যান্ডে বাস করছি।'

আমলেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। তাঁরও অবস্থা প্রায় একইরকম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা কাঠের ক্যাবিনেটের ওপর স্টিলের ফ্রেমে এক যুবকের ফোটো চোখে পড়ল অমলেশের। অত্যন্ত সুপুরুষ। কয়েক লহমা তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর মুগ্ধ গলায় বললেন, 'কার ছবি ওটা?'

চারুলতা বললেন, 'আমার ছেলে রণোর—'

'ভারি সুন্দর তো। একেবারে প্রিন্স।'

চারুলতা হাসলেন। গর্বিত জননীর হাসি। বললেন, 'রোজ রাত্তিরে রণো ফোন করে অন্তত আধ ঘণ্টা কথা বলে। ওই সময়টুকু কী ভালো যে লাগে!'

এই মহিলার রাত্তিরে কথা বলার মতো একজন রয়েছে। হোক দূরভাষে, তবু নিজের ছেলের সঙ্গে তো গল্প করেন। তেমন কেউ নেই অমলেশের। কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করতে লাগলেন তিনি।

রাত হচ্ছিল, আরও কিছুক্ষণ গল্প করে অমলেশ বললেন, 'আজ ওঠা যাক—'

উঠতে যাবেন, চারুলতার পাশে রাখা তাঁর মোবাইল ফোনটি বেজে ওঠে। হাতের ইশারায় অমলেশকে বসতে বলে টেলিফোন তুলতে তুলতে চারুলতা চাপা গলায় বললেন, 'রণোর ফোন। অন্যদিন ন'টার আগে করে না। আজ একটু আগে আগেই করল।' বলে রণোর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন তিনি, 'হ্যাঁ, বল...অফিসে একটা প্রোমোশন হয়েছে। খুব ভালো খবর...অ্যাঁ, নেহারও হবে। বাহ্ চমৎকার। ডাবল সুখবর।... নেহা এখন তোর সামনেই বসে আছে?...কী, শুক্তো আর ভাপা ইলিশের রেসিপি জানতে চাইছে? ঠিক আছে...' একটানা অনেকক্ষণ কথা বলার পর বললেন, 'নেহাকে দে...' নেহাকে শুক্তো এবং ভাপা ইলিশ রান্নার প্রক্রিয়া বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

ওঁদের কথাবার্তা খানিকটা বুঝতে পারছিলেন অমলেশ। অনেকটাই বোধগম্য হচ্ছিল না। তিনি একদৃষ্টে চারুলতার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রান্না বোঝানো হলে চারুলতা নেহাকে বললেন, 'এবার রণোকে দাও—'

ওধারে ফোনটা হাতবদল হয়েছে। চারুলতা বললেন, 'তোকে একজন আঙ্কলের কথা বলেছিলাম যাঁর সঙ্গে রিসেন্টলি আমার আলাপ হয়েছে, তাঁকে আজ আমাদের ফ্ল্যাটে ধরে এনেছি।...নে, কথা বল—'

ফোনটা অমলেশের হাতে দিলেন চারুলতা। অমলেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন।

তাঁরা প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পেরুতে চলেছেন ঠিকই, তবু মায়ের সঙ্গে নির্জন ফ্ল্যাটে তিনি গল্প করতে এসেছেন, ছেলে এটা কীভাবে নিয়েছে তা ভেবে পাচ্ছিলেন না অমলেশ। পরক্ষণে খেয়াল হল, চারুলতা কোনও রকম লুকোচুরি করেননি। তাঁর কথা ছেলেকে জানিয়ে দিয়েছেন। এবার অস্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা কেটে গেল। ফোনটা কানে লাগিয়ে বললেন, 'রণো, আমি অমলেশ দত্তরায়—'

রণো ও-প্রান্ত থেকে বলল, 'আমার প্রণাম নিন। আপনার নাম আমি জানি। মা আপনার সম্বন্ধে আগেই সব বলেছে—'

'তোমার কথাও তোমার মায়ের মুখে অনেক শুনেছি, ছবিও দেখেছি। কিন্তু আসল হ্যান্ডসাম যুবকটিকে সামানাসামনি দেখা হয়নি। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

আপনাকেও। কিন্তু এখন কলকাতায় যাবার সম্ভাবনা নেই। কবে যেতে পারব বুঝতে পারছি না। যখন যাব, নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

'মাকে বলছিলে তোমার প্রোমোশন হয়েছে। খুব খুশি হলাম।'

'অনেক ধন্যবাদ আঙ্কল।'

একটু চুপচাপ।

এরপর রণোই ফের শুরু করল, 'আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব?'

অমলেশ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'মা তো একা থাকে। আপনি যদি আমাদের 'জয়-জয়ন্তী'র ফ্ল্যাটে এসে তাকে কম্পানি দেন—'

'তোমার মা চাইলে অবশ্যই দেব। তবে শুনেছ বোধ হয়, আমার শরীরও ভালো নয়। একটা বড় রকমের স্ট্রোক হয়ে গেছে। রোজ রোজ আসা তো সম্ভব নয়।'

'মাঝে মাঝে এলেই হবে।—মাকে ফোনটা দিন।'

'এই নাও।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন বন্ধ করলেন চারুলতা।

অমলেশ বললেন, 'চমৎকার ছেলে তোমার। ওর সঙ্গে কথা বলে মন ভালো হয়ে গেল।' বলেই ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়লেন।—'আরে, ভুল করে তুমি বলে ফেলেছি। ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল।'

চারুলতা হাসলেন।—'কীসের অন্যায়। তুমিটাই থাক না—'

'না না, তা হয় না।'

'আমিও না হয় তুমিই বলব। তাহলে হবে তো?'

বুকের ভেতব মৃদু ঝঙ্কার অনুভব করলেন অমলেশ। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'ঠিক আছে, তবে তাই হোক।' মনের কোণে আগেই একটু কৌতূহল জমা হয়েছিল। কথায় কথায় সেটা চাপা পড়ে গেছে। এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'নেহা কে?'

চারুলতা হাসলেন। —'আমার ভাবী পুত্রবধূ। দিল্লিতে গিয়ে চাকরির সঙ্গে ছেলে একটি প্রেমিকাও জুটিয়েছে। দু'জনে কলিগ। নেহা পাঞ্জাবি মেয়ে। বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করার জন্যে প্রাণপণে বাঙালি হতে চেষ্টা করছে।'

'ওই জন্যেই বুঝি ভাপা ইলিশ, শুক্তো টুক্তো—'

'ঠিক ধরেছ। শুধু তাই না, বাংলা ভাষাটাও শিখছে।'

'রণো নিশ্চয়ই তার মাস্টার—'

'তাছাড়া আর কে? বাংলাটা মোটামুটি শিখে গেছে। নেহা কাজ চালাবার মতো বলতে পারে।'

সেই যে 'জয়-জয়ন্তী'তে গিয়েছিলেন অমলেশ, তারপর বিকেলে ভ্রমণের পর প্রায়ই চারুলতা তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। তবে বেশিক্ষণ থাকেন না। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন। সাড়ে ন'টায় রাতের খাওয়া চুকিয়ে ওষুধ খেয়ে তাঁকে শুয়ে পড়তে হয়। চারুলতার সঙ্গে যেটুকু সময় কাটান, কী ভালো যে লাগে।

একদিন পার্কে বেড়াতে বেড়াতে চারুলতা বললেন, 'জানো, কাল রাত্তিরে ফোন করে রণো কী বলেছে?'

অমলেশ হেসে হেসে লঘু সুরে বললেন, 'কী করে জানবো? ও যখন ফোন করেছে তখন কি আমি তোমার কাছে ছিলাম? বল, কী বলেছে।'

চারুলতা বললেন, 'প্রোমোশন হবার পর মিনিমাম আরও দশ বছর ওকে দিল্লিতেই থাকতে হবে। তার মধ্যে কলকাতায় আসতে পারবে না। ওদিকে নেহার বাবা ভীষণ অসুস্থ, মায়ের শরীরও ভালো নয়। ওঁরা নেহা আর রণোর বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চান। আর সেটা দিল্লিতেই। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী বল?'

অমলেশ বললেন, 'মেয়ে বড় হলে যে কোনও মা-বাবাই তার বিয়ে দিতে চান। তার ওপর বাবা যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, উতলা তো হবেনই।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন চারুলতা। বিয়ের প্রসঙ্গে আর কোনও প্রশ্ন করেন না।

সময় কাটতে থাকে।

দিনের তাপাঙ্ক হঠাৎ অনেকটা কমে গেছে। শীত যে এবার আগে আগেই এসে পড়বে, সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে।

রোজকার রুটিন অনুযায়ী দু'জনের পার্কে বেড়ানো চলছেই। আগের মতোই কোনও কোনও দিন বিকেলের ভ্রমণ সেরে চারুলতাকে খানিকক্ষণ সঙ্গ দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন অমলেশ।

হঠাৎ একদিন পার্কে বেড়াতে বেড়াতে চারুলতা বললেন, 'কাল রাত্তিরে তুমি চলে আসার পর রণো ফোন করেছিল। কী বললে জানো?'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকান অমলেশ। —'কী?'

'সে নাকি খুব শিগ্‌গিরই আমাকে একটা সারপ্রাইজ দেবে। অনেক জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু কিছুতেই বলল না সারপ্রাইজটা কী ধরনের।'

অমলেশ হাসতে লাগলেন।—'বলেনি যখন, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। এই সময়টা অসুখ-বিসুখ বেড়ে যায়। অসাবধানে ঠাণ্ডা লেগেছিল অমলেশের। তিনি জ্বরে পড়লেন।

বাড়িতে জ্বরজারির ট্যাবলেট ছিল, অমলেশ তা খাচ্ছেন কিন্তু টেম্পারেচার কিছুক্ষণের জন্য নামে, তারপর আবার চড়ে যায়। কাজেই পার্কে বেরুনো বন্ধ। মাঝে মাঝে ভাবেন, চারুলতাকে ফোনে জানাবেন কিনা। পরক্ষণে খুবই সংকোচ বোধ করেন। তিনি ওঁদের ফ্ল্যাটে গেছেন ঠিকই কিন্তু চারুলতাকে কখনও নিজের ফ্ল্যাটে আসতে বলেননি। চারুলতাও নিজে থেকে কখনও আসতে চাননি। জ্বরে যখন তিনি বিছানায় পড়ে আছেন সেই সময় একজন অনাত্মীয়া মহিলাকে, তাঁর সঙ্গে যতই বন্ধুত্বই হোক, ফোন করা অনুচিত মনে হয়েছে। সব কিছুরই একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

জ্বরের তৃতীয় দিনে সকালবেলায় চারুলতার ফোন এল। —'কী ব্যাপার, দু'দিন দেখা নেই যে?'

ফোনটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে উত্তর দিতে একটু সময় লাগল। অমলেশ বললেন, 'জ্বর হয়েছে, তাই—'

'কী আশ্চর্য, আমাকে জানাওনি কেন?'

'জানাবার মতো কিছু হয়নি। সামান্য জ্বর। ওষুধও খাচ্ছি—

'আমি আসছি—' লাইন কেটে দিলেন চারুলতা। এবং মিনিট কুড়ির ভেতর চলেও এলেন।

এইসময় জ্বরটা বেশ বেড়েছে অমলেশের। চোখমুখ টসটস করছিল। কয়েক পলক তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকার পর চারুলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'নিজের চিকিৎসায় রোগ সারবে না। তোমার হাউস ফিজিসিয়ান কে?'

'এত চিন্তা করছ কেন? ও ঠিক সেরে যাবে।'

চারুলতা কোনও কথা শুনলেন না। ডাক্তারের নাম আর ফোন নাম্বার জেনে নিয়ে তাঁকে 'কল' দিলেন।

আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার নন্দী চলে এলেন। ভারী চেহারা, মাঝবয়সী, হাসিখুশি মানুষ। অমলেশের বুক পিঠ জিভ পালস, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে জানালেন, যে মামুলি

জ্বরের ওষুধ অমলেশ খাচ্ছেন তাতে কাজ হবে না। বুকে কফ জমেছে, কম করে চারদিন অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে, তাছাড়া আরও দু-একটা ওষুধ। সেই সঙ্গে হার্ট চাঙ্গা রাখার যে-সব ট্যাবলেট চলছিল সেগুলোও চলবে।

প্রেসক্রিপশন লিখে, ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। তার খানিক পরেই মালতী এল। সে আগে কখনও চারুলতাকে দেখেনি। সমীহ করার মতো চেহারা চারুলতার। বেশ অবাকই হল সে। সসম্ভ্রমে তাকিয়ে রইল। কিন্তু চারুলতা কে, এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করল না। হয়তো ভাবল, মহিলাটি অমলেশের আত্মীয়টাত্মীয় হবেন।

মালতীর কথা আগেই শুনেছিলেন চারুলতা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মালতী তো?'

মালতী আস্তে মাথা নাড়ে।

চারুলতা বললেন, 'একটু আগে ডাক্তার এসে তোমার দাদাবাবুকে দেখে গেছেন। বড় রাস্তায় ওষুধের দোকান আছে। এক্ষুনি তাঁর জন্যে ওষুধ নিয়ে এসো।'

মালতী মানুষটা ভালো, অমলেশের জ্বর পুরোপুরি ছাড়ছে না দেখে তার দুশ্চিন্তা ছিল। প্রেসক্রিপশন আর টাকা নিয়ে সে প্রায় ছুটেই চলে গেল।

মালতী ফিরে এলে অমলেশকে ওষুধ খাওয়ালেন চারুলতা। তাকে বললেন, 'এখন তোমার দাদাবাবু দুধ আর টোস্ট খাবেন! দুপুরে হাতে-গড়া রুটি আর হালকা মাছের ঝোল। রাত্তিরে চিকেন সুপ আর টোস্ট।'

অমলেশকে বললেন, 'দুপুরে আর সন্ধেয় ডাক্তার নন্দীর ওষুধ খেতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স পুরোটা শেষ করতেই হবে। একটাও বাদ দেওয়া চলবে না।—মনে থাকে যেন। আমি আবার বিকেলে আসব।'

সকাল বিকেল দু'বেলা আসতে লাগলেন চারুলতা। ওষুধ এবং খাবার ঠিকমতো খাওয়া হচ্ছে কিনা, তার খোঁজ নেন। খাটের পাশে চেয়ারে বসে গল্প করেন। অমলেশ ভাবেন, এই পৃথিবীতে তিনি নিঃসঙ্গ নন।

পাঁচদিনের দিন জ্বর একেবারেই ছেড়ে গেল। আরও তিনদিন বাদে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন অমলেশ। ফের তাঁর জীবন পুরনো রুটিনে ফিরে গেল। চারুলতাকে যত দেখছেন ততই মুগ্ধ হচ্ছেন তিনি। সেই কোন ছেলেবেলায় মা তাঁর যত্ন করতেন। বিয়ের পর থেকে নারীর সেবা কখনও পাননি। ললিতাকে যখন বিয়ে করলেন তখন সে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। তাকেই শুশ্রূষা করতে হত অমলেশকে। চারুলতার কথা যত ভাবেন, আপ্লুত হয়ে যান। কৃতজ্ঞতায়, অপার ভালো লাগায় অমলেশের মন ভরে যায়।

জ্বর সেরে যাবার সপ্তাহ দুই বাদে একদিন একটু বেলার দিকে চারুলতা অমলেশের ফ্ল্যাটে এলেন। সঙ্গে একজন সুপুরুষ যুবক। পরিচিত মুখ। এর ফোটো 'জয়-জয়ন্তী'র ফ্ল্যাটে দেখেছেন তিনি।

অমলেশ বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই রণো।'

রণো হাসল। —'চিনতে পেরেছেন!'

'তোমাদের ফ্ল্যাটে গেছি না? তোমার ফোটো আমার মনে গেঁথে আছে।'

মা আর ছেলেকে বসিয়ে নিজে তাদের মুখোমুখি বসলেন অমলেশ। বললেন, 'কালও বিকেলে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তুমি যে আসবে, আমাকে জানায় নি তো!'

'সেটাই তো সারপ্রাইজ। আমি এসেছি সন্ধের ফ্লাইটে। বাড়ি আসতে আসতে দশটা বেজে গিয়েছিল। আসব যে মাকে আগে বলিনি। আপনাকে জানাবে কী করে?'

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই চারুলতা বলে ওঠেন, 'আরও একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'কিরকম?' অমলেশ উৎসুক হলেন।

'রণো আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। দিল্লিতে যখন থাকতেই হবে তাই ও ওখানে একটা ফ্ল্যাট 'বুক' করেছে। সেজন্য যে টাকা ব্যাঙ্ক লোন নিয়েছে তা শোধ করতে অনেক বছর লেগে যাবে। তাই আমাদের 'জয়-জয়ন্তী'র ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিতে চাইছে, তাতে লোনের বেশির ভাগটাই ফেরত দেওয়া যাবে। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।' বলে একটু চুপ করলেন চারুলতা। তারপর বললেন, 'ওরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে নোটিশ দিয়েছে। আমি গেলেই বিয়ের অনুষ্ঠানটা হবে। নেহার বাবার শরীর আরও খারাপ হয়েছে। তিনি চাইছেন, এই মাসেই বিয়েটা হয়ে যাক। এই অবস্থায় না গিয়ে উপায় কী?'

সমস্ত শরীর আমূল কেঁপে যায় অমলেশের। ঝাপসা গলায় বললেন, 'তা তো বটেই।'

রণো বলল, 'আমার বিয়েতে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে আঙ্কল—'

অমলেশ বললেন, 'আমার হার্টের যা হাল, এতটা জার্নি করার ধকল নিতে পারব না। ডাক্তারও পারমিশান দেবে না। আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।'

অনেকক্ষণ নীরবতা।

তারপর অমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানকার ফ্ল্যাট বিক্রির ব্যবস্থা কি হয়ে গেছে?'

রণো বলল, 'না। যাবার আগে কাগজে অ্যাড দিয়ে যাব। যারা কিনতে চায়, দিল্লিতে আমার ঠিকানায় তাদের যোগাযোগ করতে লিখব। সব ঠিকঠাক হলে মা'র কাছ থেকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিয়ে এসে বিক্রি করে যাব। আচ্ছা, চলি আঙ্কল—'

রণো আগে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল। চারুলতা দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, 'এখনও তবু চলতে ফিরতে পারছি। আরও বয়েস হলে কী যে হবে? ছেলে ছাড়া—' বলতে বলতে থেমে গেলেন।

অমলেশ ধরা ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে দিল্লি যাচ্ছ?'

'দু'তিন দিনের ভেতর।'

অমলেশ উত্তর দিলেন না।

এবার ভারী গলায় চারুলতা বললেন, 'ভালো থেকো—' ধীরে ধীরে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অমলেশ। আয়ুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে চকিতের জন্য জীবনে অলৌকিক কিছু এসেছিল। ফের যেন অপার শূন্যতায় কেউ তাকে ছুড়ে দিল। টের পেলেন বুকের ভিতর অবিরল হাহাকার চলছে।